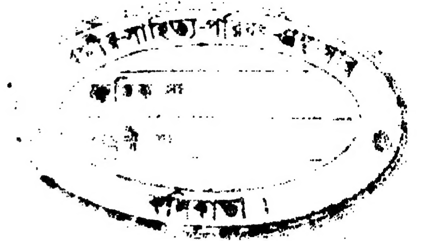
ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক পরিচালিত



প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্‌ এ, বি এল্‌ সম্পাদিত

ষষ্ঠ বর্ষ

১৩২৩

বর্ষসূচী

অ

আ

উ

এ

ক

গ

চ

ভ

ম

য

র

ল

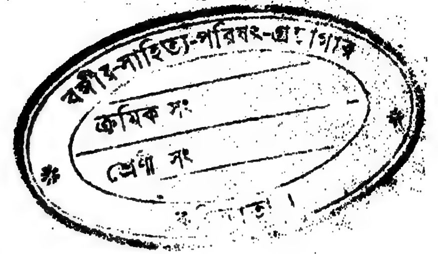
ব

শ

১৩২৩ সনে

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বা প্রকাশ্যমান গ্রন্থাবলী

কবিগান	...	শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দত্ত সংগৃহীত ...
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ	...	শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত
পূর্ববঙ্গের মেয়েলী শ্লোক	...	শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দত্ত সংগৃহীত ...
ভাটীয়াল গান	...	শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র নন্দী সংগৃহীত ...
দীনচেতন (ভূমিকা সহ)	...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্, এ, সম্পাদিত



প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ   বৈশাখ ১৩২৩   ১ম সংখ্যা

বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও আদি প্রকৃতি *

উপক্রমণিকা

যে কোনও জাতির সাহিত্য বুঝিতে হইলেই সেই জাতির প্রকৃতি প্রথমতঃ জানা আবশ্যক। সাহিত্যে জাতির মনের ও দেশের অবস্থা যথাযথভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। আবার, যে কোনও জাতির সাহিত্যের অনুধাবনা করিলেই, সেই সেই জাতির প্রকৃতি, সমাজ ও দেশের অবস্থা অনেকাংশে অবগত হওয়া যায়। বাঙ্গালীর সাহিত্যেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং, বাঙ্গালা সাহিত্যের পর্য্যালোচনায় পূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সর্ব্বপ্রথম জানা দরকার, বাঙ্গালী কাহাকে বলে। বাঙ্গালাদেশের অধিবাসী বলিলে বর্ণনা পরিস্ফুট হয় না। এখন যাহা বাঙ্গালা বলিয়া পরিচিত, বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগে এক যুগে তাহারই বিভিন্ন অংশ গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, সমতট প্রভৃতি নামে আখ্যাত ছিল; পূর্ব্বযুগে যাহা বঙ্গদেশ ছিল, তাহারও আবার কতক অংশ এখন বাঙ্গালাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাই। দেশের প্রান্তঃসীমা সময়ে পরিবর্তিত হইয়া থাকে; সে পরিচয়ে জাতির নাম নির্ণীত হইতে পারে না। অন্যদিকে, সকল দেশের অধিবাসীগণই সচল; পূর্ব্ব-পূর্ব্ব শতাব্দীতে যিনি কান্যকুব্জ, মহারাষ্ট্র, পঞ্চনদ বা রাজপুতানার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারই কত সন্তান বর্ত্তমান সময়ে পুরা বাঙ্গালী হইয়া বসিয়াছেন; আবার, বাঙ্গালার পুরাযুগের কত অধিবাসীর সন্ততিগণও এখন আসাম, নেপাল, পাঞ্জাব, এমন কি, সুদূর সিংহল বা যবদ্বীপের লোক হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা এই সকল গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সহজ কথায় বলিব, বাঙ্গালা যাঁহার মাতৃভাষা, তিনিই বাঙ্গালী, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কণৌজিয়া হিন্দুই হউন, বা পাঞ্জাবী পাঠানই হউন।

এই বাঙ্গালীর প্রকৃতির আলোচনায় বিষয়ই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। শোণিত ও দেশ উভয়ই জাতি-

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গঠনের প্রধান উপাদান; অতএব, বাঙ্গালীর শোণিত ও দেশের পরিচয় লওয়া আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বাঙ্গালী অধিকাংশই হিন্দুস্থানের আর্য্যজাতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইতিহাস এই তথ্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। ভারতের আদিম অধিবাসী আর্য্যেতর জাতির সহিত যে ইহাদের সংমিশ্রণ কতক পরিমাণে হয় নাই, তাহা বলি না। কিন্তু ভারত, এসিয়া বা ইউরোপখণ্ডের কোন্ আর্য্যজাতিতে একেবারে বিশুদ্ধ শোণিত রক্ষিত হইয়াছে?

আর্য্যজাতি বুদ্ধি ও বীর্য্যের জন্য জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। এই দুই প্রধান গুণ লইয়াই আর্য্যজাতি বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন ও দেশটা আপনার করিয়া লইলেন। অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণ সর্ব্বত্রই ঘটিয়াছে; এদেশের ইহাতে কোনও অহিতের কারণ হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু যে দেশে তাঁহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন, সে দেশের জলবায়ুর প্রভাব তাঁহারা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই দেশ সম্বন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র গাহিয়া গিয়াছেন "সুজলাং, সুফলাং মলয়জশীতলাং, শস্যশ্যামলাং;—গীতির এই চরণ বাঙ্গালাদেশের প্রতি বর্ণে বর্ণে প্রযোজ্য। সামান্য কর্ষণেই এদেশের ক্ষেত্রসমূহ সোনালী শস্যে ছাইয়া যায়; বিস্তৃত জলরাশি মৎস্যে পরিপূর্ণ; দক্ষিণ হইতে মলয় পবন জলসংস্পর্শে সুশীতল হইয়া সকল অঙ্গ জুড়াইয়া দিয়া যায়। আর্য্যেরা এমন দেশে আসিয়া জীবিকার জন্য গলদঘর্ম্ম হইতে ভুলিয়া গেলেন, তাঁহারা তদ্‌পরিবর্ত্তে আরামে সুশীতল সমীরণ উপভোগ করিতে লাগিলেন; ফলে, তাঁহাদের বল, বীর্য্য অটুট রহিল না; প্রভূত বলবীর্য্যশালী হিন্দুস্থানী ক্রমে কোমল, শৌর্য্যহীন বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্র হইতে কতক পরিমাণে অপসৃত হওয়ায়, এদেশবাসী আর্য্যের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তি অবাধলীলায় প্রবৃত্ত হইল; নিশ্চিন্ত মনে দেশের মলয় পবন উপভোগ করিতে সক্ষম হওয়ায়, এই দুইটি গুণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাই বাঙ্গালী বীর্য্যহীন ও কোমলপ্রাণ, কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় ও ভাবপ্রবণতায় ভারতীয় জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানবিজয়ের কাল হইতেই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী, পশ্চিম বা পূর্ব্ব হইতে যে সামরিক জাতি দেশে প্রবেশ করে, তাহারই পদানত হইয়া পড়ে। কঠোর সমরপ্রাঙ্গনের নিষ্ঠুরতা তাহার নিকট অসহ্য বোধ হয়। বাঙ্গালী যে ঠিক কাপুরুষ তাহা নহে; পরসেবায় আত্মবিসর্জ্জন দিতে, ভাবের উত্তেজনায় জীবনকে অগ্রাহ্য করিতে সে এখনও প্রস্তুত; কিন্তু মনোবৃত্তির অতিরিক্ত বিকাশে একান্ত সুসভ্য হইয়া পড়ায়, নিষ্ঠুর রক্তপাতে তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে।

সাময়িক পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারা কোনও সাহিত্যেরই সুসাধ্য নহে। বাঙ্গালীর সাহিত্যে আলোচনায় দেখা যাইবে, ইহাও সেই প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু উল্লিখিত গুণাবলী যে এই সাহিত্যের বহুস্থানে প্রকট দেখা যাইবে, তাহাতেও অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধপ্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ

(খৃঃ ৮০০ হইতে খৃঃ ১২০০)

মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কপিলবাস্তু নগরে রাজার বংশে যে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মরাজ্যে যে এক মহাপরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত করিয়া যান, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যৌবনকালেই ভোগসুখকর রাজ্যসংসার পরিত্যাগ করিয়া বহুকালব্যাপী তপস্যার পর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। তখন তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেব নামে অভিহিত হইলেন। বুদ্ধদেব শুধু নিজের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য মহাত্যাগ অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার হৃদয় জগতের লোকের রোগশোকজরামৃত্যুদর্শনে প্রপীড়িত হইয়া উহার প্রতীকার চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, তিনি সিদ্ধিলাভের পর যথার্থ ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া ব্রতী রহিলেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যেরা সেকালে পরিচিত জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই বহুল প্রচারের ফলে এখনও জগতের একতৃতীয়াংশ লোকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। ভারতের রাজন্যবর্গ রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনদৃষ্টান্তে ও উপদেশে বিগলিত হইয়া নিজেরা মুক্তিপথের পথিক হইয়া পড়িলেন, আর, লোকের

হিতার্থে শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার প্রচারে রত হইলেন। এমন যুগ ভারতে আর আসে নাই; আবার হইবে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। চীন, জাপান, যবদ্বীপ, সিংহলাদি আবিষ্কার ও তথায় ধর্ম্ম ও শিক্ষা সংস্থাপন প্রভৃতি মহাগৌরবের কর্ম্ম এই যুগেই সংসাধিত হইয়াছিল। বরবদরে এবং অজন্তা ও ইলোরার গুহায় যে জগজ্জয়ী তক্ষণশিল্পের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই শিল্পের প্রতিষ্ঠাও এই কালেই হইয়াছিল। মোগল-যুগের পূর্ব্ব সময়ের যে সকল ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন আমরা ভারতের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, তাহারও অধিকাংশই বোধ হয়, এই বৌদ্ধ যুগেরই প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মহাপুরুষ ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রভাবে ভারতে যে আর এক মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, আমরা এখন তাহারই উল্লেখ করিব। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত ইহারই সম্পর্ক অধিক। এই পরিবর্ত্তন ভাষা-জগতে।

ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম আভিজাত্যগৌরবে স্ফীত। মহা উন্নত ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াও, আর্য্যেরা দেশবাসী অনার্য্য ভ্রাতৃদিগকে সেই ধর্ম্মের রসাস্বাদন করাইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গের করতলস্থ ছিল, অন্য লোকের উহার উপর পাপ চক্ষু নিবিষ্ট করা গর্হিত কার্য্যজ্ঞানে নিষিদ্ধ ছিল। অনার্য্য জাতিদিগের বর্ণনায় অসুর, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগেই আর্য্যেরা কি ভাবে বিজিত বা আদিম দেশবাসীদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই কারণে দেশের ভাষার উপরও আর্য্যেরা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। দেবভাষা সংস্কৃতই তাঁহাদের গ্রন্থের অবলম্বন ছিল; ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা তাঁহাদের নিকট অতি হেয় ও অসম্ভব কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। ভগবান্ বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্য-বর্গ আর্য্য-অনার্য্যের বিচার পরিত্যাগ করিলেন। যাহা সত্য, যাহা মোক্ষলাভের প্রকৃত পন্থা, তাহা সমগ্র জগতের লোককে জানাইয়া দেওয়া বুদ্ধদেব, ও তাঁহার দৃষ্টান্তে ও উপদেশে তাঁহার শিষ্যবর্গের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল। তাই তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা ছাড়িয়া চলিত ভাষার আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থাদির উৎপত্তি এইখানে। এমন কি বুদ্ধদেব ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিনিধিগণের সাধারণ লোকের প্রতি অবজ্ঞার ভাব দর্শন করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন, কিরূপে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কালে এইরূপ গণ্ডীবিশেষে আবদ্ধ না হইয়া পড়ে; ফলে, তিনি আদেশ দিয়া গেলেন যে, প্রাকৃত ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় যেন তাঁহার ধর্ম্ম ও প্রচারগ্রন্থাদি প্রণয়ন করা না হয়। চলিত ভাষার তিনি যে আদর করিয়া গেলেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সে ভাব রক্ষিত হইল।

বাঙ্গালা দেশেও এই একই কারণে চলিত সাহিত্যের বিকাশ হইল। বাঙ্গালা কথিতভাষার সৃষ্টির বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিতেছি না; কোন্ যুগে এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের প্রয়াস আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের রাজত্ব-সময়ে বৌদ্ধভাবের উপদেষ্টারাই এই ভাষায় রচনা সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান, এই আমাদের বিশ্বাস। বৌদ্ধ ভাবের গ্রন্থই বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রের প্রথম রচনা। বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সময় বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হয়ত সৃজিতও হয় নাই—বঙ্গ-প্রাকৃতে এই কর্ম্ম তখন সংসাধিত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষার আদিম কালের নিদর্শন-স্বরূপ যে সকল পুথি এখন পাওয়া যায়, তাহা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার ভাবে পূর্ণ—বৌদ্ধতান্ত্রিকতার যুগে রচিত। বাঙ্গালাদেশে তখন মুদ্রাযন্ত্র অপরিজ্ঞাত। গ্রন্থাদি হস্তলিখিত পুথির আকারে নিবদ্ধ হইত। অনেক রচনা আবার লোকমুখে প্রচারিত ও বংশপরম্পরাক্রমে পরিচালিত হইতে থাকিত। কত রচনা এই প্রকারে লুপ্ত হইয়া আছে, বা একেবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের বিদিত নাই। বর্ত্তমানের কৃতী সাহিত্যসেবীগণের সযত্ন অনুসন্ধানে মাত্র কয়েকখানি গ্রন্থ লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। নেপালে এই সময়ের দুইখানি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার একখানির নাম "বোধিচর্য্যাবতার" ও অন্যখানি "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়"। অন্য একখানি আবিষ্কৃত গ্রন্থ রামাই পণ্ডিত

প্রণীত "শূন্যপুরাণ"। একালের ভাষার নমুনা ও সমাজের কতক প্রকৃতি বুঝিবার জন্য নিম্নে এই পুথির বিবরণ বিবৃত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপাল কুমার দত্ত।

তন্ত্রতত্ত্ব *

গ্রন্থ-পরিচয়

আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত আর্থার এবেলন্ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সমালোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থও সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। এবেলন্ সাহেব তন্ত্রশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা ও তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য অশেষ যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তিনি কেবল মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অনুবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; Tantrik Text নাম দিয়া অন্যান্য প্রসিদ্ধ তন্ত্রগুলিও প্রকাশিত করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন যে যে গ্রন্থের আলোচনা ও অনুবাদের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে, তিনি সেই সেই গ্রন্থেরও অনুবাদ করিতেছেন। তাঁহার Piniciples of Tantra এই শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থ।

কাশীর সর্ব্বমঙ্গলা সভার সম্পাদক সুবিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক পরলোকগত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় তন্ত্রতত্ত্ব নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ সেই তন্ত্রতত্ত্বেরই প্রথম ভাগের অনুবাদ। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের তন্ত্রতত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগও কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত জে, জি, উড্রফ মহাশয়ের অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আর্থার এবেলন্ সাহেব উক্ত দ্বিতীয় ভাগেরও অনুবাদ করিবেন বলিয়া এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে পাঠক মহাশয়দিগের মনে প্রথমতঃ এই প্রশ্নই উদিত হইবে যে, তন্ত্রতত্ত্বের মত অতি আধুনিক গ্রন্থের অনুবাদের আবশ্যকতা কি? সঙ্কলয়িতা স্বয়ং ভূমিকায় এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ,—

তন্ত্রের ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান,—কেবল তাহাই কেন?—যে কোন ধর্ম্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বুঝিতে হইলে, বিশেষজ্ঞদিগের নীরস বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ যথেষ্ট নহে। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। সময় ধর্ম্মবিশ্বাস ও আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন করে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাস অতীতের বিশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব পিতার অনেক গুণ সন্তানে দৃষ্ট হওয়ারই কথা। বর্ত্তমানের অনুশীলনে প্রাচীন দলিল বা গ্রন্থাদির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। প্রাচীন গ্রন্থাদিকেই আলোচনার একমাত্র ভিত্তি করিলে, অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এই কারণে তান্ত্রিক তন্ত্রের মূলতত্ত্বের এক আধুনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। যিনি ব্যাখ্যাকর্ত্তা, তিনি স্বয়ং তান্ত্রিক, এবং এই শাস্ত্রের পরম্পরাগত ব্যাখ্যা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছেন। আমরা সম্প্রতি ঐতিহ্য বা পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধাবান্ হইতেছি। সর্ব্বত্রই ঐতিহ্য সত্যনির্দ্ধারণের একমাত্র উপায়। *

তারপর তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, তন্ত্র অতি গুহ্য-শাস্ত্র। কেবলমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে তন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তন্ত্র বুঝিবার জন্য এই কারণেও অনুষ্ঠানরত সাধকের সাহায্য আবশ্যক।

---

* Principles of Tantra. Part I. Edited with an Introduction and Commentary by Arthur Avalon.

* For the understanding of the Tantrik, or indeed, any other beliefs and practices, the usual dry-as-dust investigation of the savant is insufficient. In the first place, a call should be made upon actual present experience. ***

তন্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট কুসংস্কার আছে। ইউরোপীয়গণ এই শাস্ত্রের প্রতি এরূপ সুললিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে তন্ত্রের প্রতি দারুণ বিদ্বেষ না জন্মিয়া পারে না। আর্থার এবেলন্ সাহেব তাহার কিছু কিছু নমুনা মুখবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ডব্লিউ ওয়ার্ড (W Word) সাহেব তাহার A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

পৃথিবীতে যত প্রকার পৌত্তলিকতার অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতা সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশূন্য, অপবিত্র ও ঘৃণিত। হিন্দুরা অলস, রমণীর মত দুর্ব্বলচিত্ত, দুশ্চরিত্র ও উদ্দামকল্পনাপরায়ণ। তাহারা যে দেবমন্দিরে গমন করে, সে কেবল তাহাদের পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবারই জন্য, উপাসনার জন্য নহে। এই তথাকথিত সর্ব্বব্যাপী নৈতিক অবনতির ফল, ওয়ার্ড সাহেব একটী উৎকট অভিযোগ আকারে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এই যে ভারতবর্ষের কোটী কোটী হিন্দুর মধ্যে একটীও পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী নাই।*

হায়, যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশের এই অপবাদ! বাস্তবিক হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও চরিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার কুৎসা প্রচারিত হইয়াছে, বোধ হয় আর কিছুরই সম্বন্ধে তদ্রূপ হয় নাই। অথচ এই ওয়ার্ড সাহেব যে হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, অথবা হিন্দুচরিত্র জানিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, তাহা নহে উইলসন সাহেবই লিখিয়াছেন যে, ওয়ার্ড সাহেব কেবলমাত্র শোনা কথার উপর নির্ভর করিয়া তন্ত্রাদির আলোচনা করিয়াছেন; কোনও মূলগ্রন্থ পাঠ করেন নাই। উইলসন নিজেও তন্ত্রের বিবরণ দিয়াছেন, এবং তাঁহার তন্ত্রসমালোচনাও বিদ্বেষপূর্ণ। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রসম্পর্কিত কোন কোন গ্রন্থ তিনি নিতান্ত তাড়াতাড়ি উল্টাইয়া গিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান নিতান্ত ভাসা-ভাসা। এ কথা না বলিলেও চলিত। কারণ, তাঁহার তন্ত্র-বিবরণ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। আর্থার এবেলন্ তাহা কতক কতক দেখাইয়া দিয়াছেন। "মুদ্রা" অর্থে উইলসন সাহেব অঙ্গভঙ্গী (gesticulation) লিখিয়াছেন। বীজের অর্থ তাহার জানা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ আরও ভ্রমপ্রমাদ

It is obvious that the course of time effects changes. But whatever these may be, present beliefs are the descendants of those of the past. Much, therefore, which was in the parent will be found in the child. A study of the present will help to an understanding of ancient documents which, if made the sole basis of research, often prove the source of error. For these reasons I have selected a modern exposition of the general basis of the Tantrik doctrine by one who, as its adherent, has inherited its traditions (vaktiadvaktrena). We are now recommencing to value tradition, which everywhere provides the key to truth.

* "Hindu system is the most puerile, impure and bloody of any system of idolatry that was ever established on earth" amongst 'an idle, effeminate, and dissolute people' of disordered imaginations,' who 'frequent their temples, not for devotion, but for the satisfaction of their licentious appetites. The result of their alleged general depravity is stated in the extraordinary charge that "a chaste woman faithful to her husband is scarcely to be found in all the millions of Hindus."

উইলসনের গ্রন্থে অপ্রচুর নহে। উইলসনের পরে যে সব ইউরোপীয়েরা তন্ত্রালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই ওয়ার্ড ও উইলসনের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছেন। আর্থার এবেলন্ লিখিয়াছেন, কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু না পড়িয়াও বিদ্বেষ-প্রণোদিত মতামত প্রকাশ করিতে কেহই পশ্চাদপদ হন নাই।

তন্ত্রের বিশেষত্ব

আর্থার এবেলন্ বলেন যে, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপগুলি বড় মহিমময় এবং গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তান্ত্রিক অনুষ্ঠান কুসংস্কারাপন্ন নয়; কিন্তু Singular, rational, and psychologically profound,—যুক্তিবাদের সহিত বিরোধ নাই; মনস্তত্ত্বের হিসাবে উহা অতি গভীর।

তন্ত্রের আর এক বিশেষত্ব এই যে স্ত্রী-শূদ্র সকলেরই উহাতে অধিকার আছে। রমণীর প্রতি সম্মান তন্ত্রেই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, জগৎকারণকে শক্তিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক রমণীই শক্তির অংশ এবং শক্তি অর্থাৎ রমণীর প্রতি অত্যাচার ও অবজ্ঞা তন্ত্রমতে গুরুতর অপরাধ। দবিস্তানের সুফীমতাবলম্বী গ্রন্থকার এই তত্ত্ব অতি মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, এবং উইলসন সাহেব ও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে রমণীর সহমরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে; কেবলমাত্র তন্ত্রশাস্ত্রেই রমণীকে মন্ত্রদানের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এমন কি, তন্ত্রমতে রমণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। পুত্র যদি মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে, তবে অষ্টগুণ ফললাভের অধিকারী হইয়া থাকে। আর্থার এবেলন্ বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশে রমণীর সম্মান ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে সত্য, কিন্তু এখনও সেখানে রমণীকে ধর্ম্মোপদেষ্টার পদে আরোহণ করার অধিকার প্রদান করা হয় নাই।

তন্ত্র-বিদ্বেষের কারণ

তন্ত্রের প্রতি লোকের এতদূর বিরাগ হওয়ার কারণ কি? ইংরেজি শিক্ষা। আর্থার এবেলন্ বলেন, আরও একটা গূঢ় কারণ আছে। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষা এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহারা সকলেই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের বিরোধী। ফলতঃ, রোমান কাথলিক্‌দিগের ক্রিয়াকলাপ-বহুল উপাসনাপদ্ধতির প্রতিবাদ করিবার জন্যই প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এদিকে তান্ত্রিকসাধনাপদ্ধতিও ক্রিয়াকলাপবহুল, অনুষ্ঠানভূয়িষ্ঠ। কাজেই ইংরেজিশিক্ষার প্রবর্ত্তকদিগের মনে অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা তন্ত্রের প্রতিই বিশেষ বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় শিক্ষকেরা যাহা বুঝাইয়াছে, তাঁহাদের এদেশীয় ছাত্রবৃন্দও তাহাই বুঝিয়াছে; কারণ, এদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা ইউরোপীয়-দিগের 'ল্যাজ ধরিয়াই আছেন'।* ইউরোপীয়েরা যে তন্ত্র সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ, এবং তাহারা যে তাহাদের চিরন্তন সংস্কারবশে অপরিচিত এবং বিদেশাগত সত্য গ্রহণ করিতে একেবারে অসমর্থ, সে কথা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ইহার ফলে ভারতবর্ষে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হয়। তাহা এখনও ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হয় নাই; ইউরোপ হইতে ত হয়ই নাই। আর্থার এবেলন্ বলিয়াছেন যে, অনেক মতবাদ ইউরোপ হইতে পরিত্যক্ত হওয়ার পরেও ভারতবর্ষে নির্ব্বিচারে গৃহীত হইয়াছে। বেন্থাম, মিলের অতি সংকীর্ণ হিতবাদে দীক্ষিত হইয়া অনেক ভারতবাসী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমস্ত ধর্ম্মই যাজকদিগের জুয়াচুরির ফল

* "As this matter (Sacramental and ritualistic character of Tantric worship) presented itself to the English teachers, so it did to the Indian students who, to use a Bengali expression, 'held their tail'."—Introduction to the Principles of Tantra, p. V.

বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; এবং পৃথিবীতে যত প্রকার ঘৃণিত উপাসনাপদ্ধতি আছে, তন্মধ্যে তন্ত্রকেই সর্ব্বনিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। আর্থার এবেলন্ একথা বলিতেও বিস্মৃত হন নাই যে, ইংরেজিশিক্ষা অনেক স্থলে এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে ভারতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, এবং কথাশিল্পে যাহা কিছু প্রাচীন এবং প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর নিজস্ব, তাহারই প্রতি দারুণ বিদ্বেষ উদ্রিক্ত করিয়াছে। তবে জাতীয় আন্দোলনের (National movement) পরে এই ভাবের কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তন্ত্রের দুর্ভাগ্য এই যে, তন্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে কিরূপ বস্তু, তাহা বুঝিবার জন্য কি ইউরোপীয়, কি শিক্ষিত ভারতবাসী, কেহই চেষ্টা করেন নাই; এবং তন্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা এবং তাহার অপব্যবহার, এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতে অগ্রসর হন নাই। আর্থার এবেলনের তন্ত্রসম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মূল্য এইখানে। তিনি বিনা অধ্যয়নে পণ্ডিত নহেন। এবং কোনরূপ সহজাত সংস্কার লইয়াও তিনি এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। ইউরোপে আর যাহাই থাকুক না কেন, উদারতা বা পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা (Toleration) নাই। কাজেই আর্থার এবেলনের উদারতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি তন্ত্রের ব্যাখ্যাকল্পে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা আমরা তৎপ্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সমালোচনাকালেই বলিয়াছিলাম। অতীত হইতে বর্ত্তমানে আসিবার চেষ্টা না করিয়া, বর্ত্তমান হইতে অতীতে যাওয়াই আধুনিক সমালোচনার রীতি। কেবল গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া পরম্পরাগত ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করা, সাধনপ্রণালীর গ্রন্থগত বর্ণনায় পরিতৃপ্ত না হইয়া ব্যবহারগত প্রয়োগ দেখিয়া উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ অভিনব। আমাদের সৌভাগ্য যে এরূপ বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও উদার-প্রকৃতি মহাত্মা তন্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় হইলেও হিন্দুর চক্ষুদ্বারাই এ বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার আলোচনার ফলে আমাদের তন্ত্রসম্পর্কিত অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। হিন্দুর অন্যান্য শাস্ত্র বেদপুরাণাদিও যদি এইরূপ শ্রদ্ধাবান্, সহানুভূতিসম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা আলোচিত হইত, তবে আমরা আমাদের শাস্ত্রের অনেক বিকৃত ব্যাখ্যা ও অকারণ অপবাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতাম।

যুগশাস্ত্র

কিন্তু তন্ত্র কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র নহে। তান্ত্রিক বলিলে সাধারণতঃ একটী নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বুঝায় বটে, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। শ্রুতিই সকল ধর্ম্মের মূল। সমস্ত শাস্ত্রই শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকায় বলিয়াছেন, শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক। এই তান্ত্রিক শ্রুতিই কলিযুগের শাস্ত্র। কলিযুগে তন্ত্রের বিধানের দ্বারাই সকল সম্প্রদায় শাসিত। ইহার কোন কোন বিধান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনেক বিধানই সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রযোজ্য; যেমন, মন্ত্রতত্ত্ব। কেবল শক্তিমন্ত্র নয়, শিবমন্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্রও তান্ত্রিক। তান্ত্রিক সন্ধ্যায় সকলেরই অধিকার আছে; আমাদের পূজা, অর্চ্চনা সমস্তই তন্ত্রমতে হইয়া থাকে। তবে হোমের উৎপত্তি অবশ্যই বৈদিক; এবং আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তনের সহিতও তন্ত্রের সম্পর্ক নাই। যেমন শৈবপুরাণ আছে, তেমন শৈবতন্ত্রও আছে, আবার রাধাতন্ত্রও আছে। অথচ এই তন্ত্র সম্বন্ধেই আলোচনার অভাব এবং ভ্রান্ত ধারণা! বিদ্যার্ণব মহাশয় এইজন্যই তন্ত্রতত্ত্ব লিখিয়াছিলেন।

মারণোচ্চাটন বশীকরণ

তন্ত্রের বিরুদ্ধে দুই গুরুতর অভিযোগ আছে, (১) মারণোচ্চাটন বশীকরণ, (২) পঞ্চতত্ত্ব। অনেকেরই ধারণা তন্ত্রে কেবল যাদুবিদ্যার আলোচনা এবং তান্ত্রিকেরা সকলেই বুজরুক। এ সম্বন্ধের আর্থার এবেলন্ তৎপ্রকাশিত মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রের মুখবন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ দুষ্প্রাপ্য। ঘটনাক্রমে আর্থার এবেলন্ সমগ্র গ্রন্থ একজন নেপালী পণ্ডিতের

নিকট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি সমগ্র গ্রন্থ নকল করিয়া নিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে পণ্ডিত মহাশয় অস্বীকৃত হন। পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে, গ্রন্থের যে অংশে ষট্‌কর্ম্ম মন্ত্র আছে, সে অংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদানে তিনি অসমর্থ। কারণ, ঐ সব মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার অন্য ধর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই; সুতরাং দুষ্ট লোকের হাতে পড়িলে উহা দ্বারা লোকের অনিষ্ট হইতে পারে। আর্থার এবেলন্ বলিলেন যে, প্রবেশবিধি না জানিলে কোন মন্ত্রই ফল প্রসব করে না; কিন্তু তাহাতেও পণ্ডিত মহাশয় স্বীকৃত হইলেন না। অতএব সমস্ত তান্ত্রিককেই বুজরুক মনে করিবার কারণ নাই। ফলতঃ, কেবলমাত্র বুজরুকিই যদি তন্ত্রের বিশেষত্ব হইত, তবে তন্ত্রশাস্ত্র কখনও যুগশাস্ত্র বলিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু তন্ত্রে যে কিছুই নিন্দনীয় নাই, আর্থার এবেলন্ তাহা বলেন না; এবং ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, এতকাল পরে তন্ত্র-মহীরুহে যে কিছু পরগাছা জন্মিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পঞ্চতত্ত্ব

পঞ্চ ম'কার সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, শক্তিপূজায় রাজসিক পঞ্চতত্ত্ব বিহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তন্ত্র কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে, তন্ত্র কেবল শাক্তদিগের শাস্ত্র নহে। অনেকের মনেই এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তান্ত্রিক হইলেই শক্তিপূজক হইতে হইবে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে প্রথমেই ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে কৃষ্ণপূজা, নারায়ণ পূজা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক, তন্ত্রে সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই ব্যবস্থা আছে। সুতরাং তন্ত্র কেবল শাক্তদিগের জন্যই রচিত হইয়াছিল, এবং পঞ্চ মকারই তান্ত্রিক উপাসনায় একমাত্র অবলম্বন, এরূপ মনে করা অন্যায়। এই পঞ্চ মকারের এদেশে যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য পাষণ্ডেরা শক্তিপূজার নাম করিয়া যত প্রকার দুর্নীতিপরায়ণতার আশ্রয় নিয়াছে; এই কারণেই সাধারণ লোকের মনে তন্ত্রের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছে এবং তাহারা তান্ত্রিক উপাসনা বলিতে পঞ্চ মকারসহ শক্তিপূজাই বুঝিয়াছে। কারণ, সাধারণ লোকের শাস্ত্র পড়িবার অবসর বা সামর্থ্য নাই; তাহারা যেরূপ দেখিয়াছে, সেইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের অপব্যবহারের জন্য শাস্ত্রকে দায়ী করা কি উচিত? কোন্ জিনিষের এ সংসারে অপব্যবহার হয় নাই? ধর্ম্মের নামে যুগে যুগে কত অধর্ম্মের স্রোত বহিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য কি ধর্ম্মত্যাগ করা বা নাস্তিক হওয়া সঙ্গত হইবে?

সুতরাং অপব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃতপক্ষে তন্ত্রে এবিষয়ে কি লিখিত হইয়াছে, তাহা জানিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পঞ্চতত্ত্ব কেবলমাত্র এক সম্প্রদায়ের উপাসনায় বিহিত হইয়াছে। কিন্তু শাক্তদিগের মধ্যেও সকলকে সে অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। তন্ত্রে মনুষ্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে:—পশু, বীর, ও দিব্য। ইহার মধ্যে কেবল বীরের পক্ষেই রাজসিক পঞ্চ-তত্ত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশুর পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং;' সেইরূপ, 'মৈথুনং-তৎকথালাপং তৎগোষ্ঠীং পরিবর্জ্জয়েৎ।" সাধারণের পক্ষে এই ব্যবস্থা। দিব্যভাবের উপাসনায় পঞ্চতত্ত্ব রূপকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৈবল্য-তন্ত্রানুসারে তথায় মদ্য অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান, যাহাতে সাধক বাহ্য জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়। মাংস অর্থ ভগবানকে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ। মৎস্য অর্থ সর্ব্বভূতে আমিত্ব-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা; সর্ব্বভূতের সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ বলিয়া অনুভব করা। মুদ্রা অর্থ সর্ব্বপ্রকার মোহপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য অসৎ সংসর্গ ত্যাগ করা; মৈথুন অর্থ সাধকের নিজের শরীরের মধ্যেই শক্তিকুণ্ডলিনীর সহিত শিবের মিলন সাধন করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কি পশুভাবের উপাসনা, কি দিব্যভাবের উপাসনা, ইহার কোনটাতেই নিন্দনীয় কিছু নাই। কিন্তু বীরভাবে মদ্যমাংসাদি শক্তি-উপাসনার অঙ্গরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ইহার কারণ কি? সকলের পক্ষে না হউক,

একজনের পক্ষেই বা এরূপ বিধান থাকিবে কেন? বৈষ্ণব-দিগের সখীভাব এবং শাক্তদিগের রহস্যপূজার উল্লেখ করিয়া আর্থার এভেলন বলিয়াছেনঃ—

মনুষ্যের রিপুগুলিকে শাসন না করিলে উহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এগুলির সংযম করা এবং ইহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন করাই বৈষ্ণবীয় সখীভাব ও শাক্তরহস্যপূজা উভয়েরই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য। *

পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্যকে উৎসাহিত করাই যে তন্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, তাহা ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, বীরের পক্ষেও পূজাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে পঞ্চতত্ত্বের সেবা করা তন্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক রিপুদমনের উপদেশ তন্ত্রের নানা স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্ত্রে বীরের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী সত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ ॥
কামাদি বলিদানশ্চ স বীর ইতি গীয়তে ॥

এরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাধক অল্পই মিলে। কোন কোন তন্ত্রের মতে কলিতে বীরভাব বা দিব্যভাব নাই, একমাত্র পশুভাবের উপাসনা দ্বারাই লোকে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তান্ত্রিকদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। যাহা হইক, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অবিজিতেন্দ্রিয় লোকের দ্বারা ইহার যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু অপব্যবহার শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। আর্থার এভেলন বলিয়াছেন,—

হিন্দুরা মানবহৃদয়ের (রিপুগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া) রিপুগুলিকে কার্য্যে লাগাইয়াছেন; ইহাতে তাঁহারা সুবিবেচনারই পরিচয় দিয়াছেন; কারণ, তাঁহারা জানেন যে নিজের পুঁজি অনুসারেই বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইবে। একথাও বলা আবশ্যক যে, রুচিবিকারগ্রস্ত লোকের মনে হইতে পারে যে, হিন্দুরা কুৎসিতভাবে সবিস্তারে রিপুগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা মনে করে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রিপুর ক্রিয়াতে এমন কিছুই নাই, যাহাতে শঙ্কিত বা ভীত হওয়া উচিত; তবে উহাদের অপব্যবহার লজ্জা ও ভয়ের কারণ বটে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুদের শাস্ত্রেও উহার অপ-ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।*

* A radical analysis of these theories and rites will, I believe, disclose a common ground and object, namely, that the control and spiritualisation of those passions which, if left to themselves, become so formidable impediments of spiritual progress"—Arthur Avalon's Introduction to Tantrik Texts Vol III.

* তান্ত্রিকেরা বলেন যে, পঞ্চতত্ত্বের আরও একটা গূঢ় কারণ আছে। পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার তৎকৃত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের টীকায় বলিয়াছেন যে, এই গূঢ় কারণ দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না; সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশ করা নিষেধ। ইহা বুঝিতে হইলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, তন্ত্রে বিষই বিষের ঔষধরূপে প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা প্রবৃত্তি বাড়ে বই কমে না; অথচ তন্ত্রে প্রবৃত্তির সেবা দ্বারাই উহার মূলোৎপাটনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং বহুদর্শী ও বিচক্ষণ চিকিৎসক আবশ্যক। যদি ঔষধপ্রয়োগে ভুল হয়, তবে রোগীর রক্ষা নাই। এই মূল কারণের কথা আর্থার এভেলন স্বয়ং কতক প্রকাশ করিয়াছেন,—

The other secret argument here referred to is that by which it is shewn that the particular may be raised to the universal life by the vehicle of those same passions, which, when flowing only in an outward and downward current, are the most powerful bonds to bind him to the former.—Introduction to Mahanirvan Tantra p. cxvii.

"ত্যাগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।" তন্ত্রে ভোগের মধ্য দিয়াই সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু সকলেই কি তাহা পারে? সকলে যে পারে না, তাহা ঠিক। এইজন্য সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। অধিকারভেদবাদের আর অর্থ কি? মুক্তিলাভের যদি এক সরল রাজপথ থাকিত, তবে বড়ই সুবিধা হইত। কিন্তু তাহা নাই। বিশ্বস্রষ্টাই মনুষ্যপ্রকৃতিকে বৈচিত্রময় করিয়া রাখিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহা জানি না; তথাপি এই বৈচিত্র, এই বিভিন্নতা যে কাল্পনিক নয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বৈচিত্র বিস্মৃত হইয়া, যদি একের উপযোগী বিধি অপরের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তবে কুফল ফলিবেই। কিন্তু তাহা ব্যবস্থার দোষ নয়, প্রয়োগের দোষ। *

তন্ত্রের বয়স

তন্ত্রের বয়স কত? আর্থার এভেলন ভূমিকায় এই প্রশ্নেরও আলোচনা করিয়াছেন। এখানেও তাঁহার বিশেষত্ব দেখিতে পাই। সাধারণ ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের ন্যায় তিনি এ বিষয়েও ধাঁ করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। এখানেও তিনি খাঁটি হিন্দুরা এ বিষয়ে কি বলেন, প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৩১৭ সনের আশ্বিনের সাহিত্য-সংহিতায় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্কালঙ্কার 'তন্ত্রের প্রাচীনত্ব' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আর্থার এভেলন্ প্রথমতঃ সেই প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় সে প্রবন্ধে নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া তন্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সকল কথা উল্লেখ করিবার স্থান এখানে নাই। বঙ্গের বাহিরে তন্ত্রের প্রচলন কোনও কালে ছিল কি না? ইহার উত্তরে পণ্ডিত মহাশয় অন্যান্য প্রমাণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পুরুষোত্তমের পাণ্ডারা সকলেই শাক্ত, এবং কামাখ্যাদেবীর পুরোহিতেরা সকলেই বৈষ্ণব; দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিতও শাক্ত, ইত্যাদি। মহাযান বৌদ্ধমত হইতে তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে, তান্ত্রিক সাধনায় অধিকারভেদ দৃষ্ট হয়; বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা দেখা যায় না। বৌদ্ধেরা নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন, তন্ত্রে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ রহিয়াছে। জীবহিংসা বৌদ্ধধর্ম্মে নিষিদ্ধ, তন্ত্রে পশুবলিদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং মহাযান পন্থা হইতে তন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া তন্ত্র হইতেই মহাযানের উদ্ভব হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। তান্ত্রিক সাধনায় অনার্য্য প্রভাব আছে কিনা, সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাসিয়া প্রভৃতি হইতে উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে! আর, তাহা হইলে, ভারতের সর্ব্বত্র এই শক্তিপূজার প্রচলন দেখা যায় কেন? অতঃপর তিনি নানা শাস্ত্র হইতে বচনোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্বত্রই তন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দেবীসূক্তের কথা সকলেই জানেন; বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য পাতঞ্জল-দর্শনের আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রকৃত পাতঞ্জল দর্শনের টীকায় তন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে তান্ত্রিক ষট্‌চক্রের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কেশবপূজা তন্ত্রমতে বিহিত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণেও তন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণের বলা, অতিবলা বিদ্যা তান্ত্রিক। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে তান্ত্রিক মন্ত্রের উল্লেখ আছে। শান্তিপর্ব্বে পঞ্চরাত্রেরও নামোল্লেখ আছে। পঞ্চরাত্র একখানা তন্ত্রগ্রন্থ। শান্তিপর্ব্বের যে অংশে এই সবের উল্লেখ আছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত নহে; কারণ,

---

* A psychological investigation proves great differences with respect to inner nature among men; so that we must assume that they need different spiritual sustenance, and must differ from one another in religion. —Harold Hoffding on William James in 'Modern Philosophers.' p. 215.

রামানুজ-স্বামী তৎকৃত শ্রীভাষ্যে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদে, উপনিষদে ও পুরাণাদিতে যে তন্ত্রমতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ও তন্ত্রতত্ত্বে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব উল্লেখ করিয়া আর্থার এভেলন্ লিখিয়াছেন যে, এই সময়নিরূপণ-ব্যাপার পাশ্চাত্যদিগের দ্বারা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। খাঁটী হিন্দুর নিকট সকল শাস্ত্রই অনাদি। তাঁহারা বলেন, চিনি যেখানেই উৎপন্ন হউক না কেন, বা যেই উৎপন্ন করুক না কেন, তাহা মিষ্ট লাগিবেই। ৺বিদ্যার্ণব মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, আর্য্যদিগের মতে সমস্ত শাস্ত্রই অনাদি; সুতরাং শাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ করার উপায় নাই। এখনও দেখা যায় যে, প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে অপর সমস্ত শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহার পর আর্থার এভেলন বলিয়াছেন যে, খাঁটী ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সময়-নিরূপণের জন্য যে প্রমাণ আবশ্যক, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তার পর তিনি বলেন যে, একদিকে হিন্দুরা যেমন তাঁহাদের শাস্ত্রাদি অতি প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন, অপরদিকে ইউরোপীয় সমালোচক এবং তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যবর্গও হিন্দুর শাস্ত্র, সাহিত্য, ও শিল্পের প্রাচীনতার দাবী খণ্ডনের জন্য এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করেন, যেন বোধ হয়, ইহা তাঁহাদের একটা রোগ। এ বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, প্রথমতঃ মূল তান্ত্রিক মত ও অনুষ্ঠান কি, তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। তার পর, তান্ত্রিকমত ও তান্ত্রিক গ্রন্থাদিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে চলিবে না। গ্রন্থ আধুনিক হইতে পারে. কিন্তু গ্রন্থনিবদ্ধ মত ও অনুষ্ঠান প্রাচীন হইতে পারে। ললিতবিস্তারে তান্ত্রিকদিগের নিন্দা আছে। ঐ গ্রন্থের রচনাকালের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেও, এতদ্দ্বারা এই পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধেরা তান্ত্রিকদিগের উপর বিরূপ ছিল। তান্ত্রিকমত যদি বৌদ্ধমত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এই বিদ্বেষের কারণ কি? রাজতরঙ্গিণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক মশাহরু অনজেকি (Mosaharu Anezaki.) বলেন যে, নাগার্জ্জুনের (২০০ খৃঃ অঃ) পূর্ব্ব হইতেই তান্ত্রিক সাধনার পত্তন হয়। ইহাদের মতে বৌদ্ধধর্ম্মই তান্ত্রিকধর্ম্মের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল। তন্ত্রে অনার্য্য প্রভাব আছে কি না, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদির আরও আলোচনার প্রয়োজন। তৎপর আর্থার এভেলন বলেন, এ পর্য্যন্ত তন্ত্রসম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তদপেক্ষা গভীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সাধারণতঃ তন্ত্রের যে সময় নিরূপণ করা হয়, তদপেক্ষা তন্ত্র অনেক প্রাচীন। এই কথার এরূপ অর্থ নয় যে, প্রচলিত কোন তন্ত্র বা তান্ত্রিক মতবাদ আধুনিক নহে। মেরু-তন্ত্রে লণ্ডনের নাম দেখা যায়; সুতরাং অন্ততঃ ঐ শ্লোকটী যে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা, এ কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রচলিত অনেক তন্ত্র যে প্রাচীন তন্ত্রের আধুনিক সংস্করণ নয়, তাহা কে বলিল? আর, হিন্দুদিগের মতে শাস্ত্র এখনও রচিত না হওয়ার কারণ নাই। ৺বিদ্যার্ণব মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, এখনও তন্ত্র রচিত এবং সাধকপরম্পরায় তাহা পৃথিবীতে প্রচারিত হইতেছে। তৎপর আর্থার এভেলন বলেন যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ভারতবর্ষীয় প্রবাদের মর্ম্ম ঠিকরূপে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় বা অসার নহে। সর্ব্বশেষে, বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকায় উইলসন্ সাহেব পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে কয়টী সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আর্থার এভেলন তন্ত্রের সময়নিরূপণ-প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও যে পুরাণোক্ত মতবাদ, উপাখ্যান ও প্রতিষ্ঠানাদি প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষাৎ এবং অবস্থাঘটিত প্রমাণ আছে; অতএব পুরাণসমূহের অধিকাংশের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা অস্বীকার করা নিরর্থক ও অযৌক্তিক। কিন্তু, এই সমস্ত মতবাদ, উপাখ্যান. এবং প্রতিষ্ঠানাদির উৎপত্তি ও পরিণতি এক দিনে হয় নাই। সুতরাং যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্দ্দিষ্ট করা হয়, সেই প্রমাণের

তাহাই তাহাদের আরও অনেক প্রাচীন কালে বিদ্যমান থাকাও প্রতিপন্ন হয়। বোধ হয়, প্রাচীন জগতের কোনও প্রতিষ্ঠান, উপাখ্যান বা ধর্মবিশ্বাস পুরাণের প্রাচীনতাকে অতিক্রম করিতে পারে না। পাশ্চাত্যেরা সাধারণতঃ তন্ত্রকে পুরাণের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন। আর্থার এভেলন বলেন, তন্ত্র পুরাণের পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল, ইহা মানিয়া লইলেও, তন্ত্রশাস্ত্রকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। এতদ্ভিন্ন পুরাণ সম্বন্ধে উইলসন্ সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তন্ত্র সম্বন্ধেও তাহা অনেক পরিমাণে প্রযোজ্য। সাধারণ ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ও তাঁহাদের ভারতীয় উপাসকসম্প্রদায়ের সহিত আর্থার এভেলনের পার্থক্য কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা এ বিষয়টী অপেক্ষাকৃত সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম।*

তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি

তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি অদ্বৈতবাদ। যে তন্ত্র পঞ্চ ম'কার ও মারণোচ্চাটন-বশীকরণের জন্য এত নিন্দিত, সেই তন্ত্রেই খাঁটী বেদান্তের কথা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসের ১০০—১৪০ শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের মুক্তিলাভ হইতে পারে না, এ কথা তান্ত্রিকেরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু সেই জন্য ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদির আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধনা ব্যতীত জ্ঞান জন্মে না। কেবল বেদান্তের বক্তৃতা দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে না। বেদান্তের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা দ্বারা লোকে পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ, এ কথা বলিলেই, অথবা যুক্তিতর্ক দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিতে পারিলেই কি জীবের মুক্তি হয়? এই সত্য উপলব্ধি করা চাই। তন্ত্রমতে সাধনা ভিন্ন ইহার প্রকৃত উপলব্ধি হইতে পারে না। কিন্তু সাধনা যে দ্বৈতবাদের অঙ্গ। যেখানে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ নাই, সেখানে উপাসনার প্রয়োজন কি? কে কাহার উপাসনা করে? ইহার উত্তরে তান্ত্রিকেরা বলেন, দ্বৈতজ্ঞান যাহার তিরোহিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে উপাসনার প্রয়োজন নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে ব্রহ্মোপাসনার প্রারম্ভে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ;—পরব্রহ্মকে দুই উপায়ে জানা যায়। কেহ কেহ তাঁহার যথাযথ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানেন। তাঁহার স্বরূপ কি? না, তিনি সৎ, নিত্য, অবাঙ্মনসোগোচর; এই মায়াময় জগতে তিনিই একমাত্র সত্য। যাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত, যাঁহাদের সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, যাঁহারা সন্দেহমুক্ত, এবং দেহ ও আত্মা সংক্রান্ত ভ্রান্তিবর্জ্জিত, তাঁহারা পরব্রহ্মের এই স্বরূপ সমাধিযোগে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, এবং ইহা তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আবার তাঁহাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে; ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। যাহারা এই লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্যই নিম্নলিখিত সাধনা বিহিত হইল। এই বলিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্র সাধনা-প্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, দ্বন্দ্বাতীত, জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য সাধনা বিহিত হয় নাই। তান্ত্রিকেরা বলেন যে, এরূপ ব্যক্তির সাধনার প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু সংসারে এরূপ লোক অতি বিরল; এবং এরূপ লোক দেখা গেলেও,

* Indian History, like Indian philosophy and Indian art, is a part of Indian religion. The scientific basis is there; the chronological sequence is not disregarded, but just as all Indian art aims at shewing the relation between the seen and the unseen, between the material universe and the spiritual, so Indian history is much more concerned with the b aring which human events and actions have upon human conduct than with compiling a bare record of the events and actions themselves.—E. B. Havell's Ideals of Indian Art, p. 125.

...ন করিতে হইবে যে, পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলেই তাহাদের দ্বৈত জ্ঞানের নাশ হইয়াছে। অতএব তান্ত্রিকদিগের অভিপ্রায় এই যে, দ্বৈতজ্ঞানের মধ্য দিয়াই অদ্বৈতে পৌছিতে হইবে। কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানের মধ্য দিয়া অদ্বৈতে পৌছান যায় কি? বলা বাহুল্য যে, এ প্রশ্নের নিঃশেষ আলোচনা এ প্রবন্ধে হইতে পারে না। তবে প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন এতৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা উচিত। তান্ত্রিকেরা বলেন, দ্বৈতজ্ঞান ভ্রম হইতেই উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এই ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। বস্তুতঃ, জগৎ মিথ্যা হইলেও, সাধারণ মানবের নিকট উহা ব্যবহারতঃ সত্য। বেদান্ত-পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ মিথ্যা হইলেও সংসারীর পক্ষে তাহা মিথ্যা নয়; যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধি না হয়, তাবৎ উহা সত্য। মায়াপাশ না কাটাইতে পারিলে, 'তুমি আমি' ভেদজ্ঞান তিরোহিত না হইলে, কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে, তোমরা আমার মত মায়িক জীবকে জগৎ সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এবং আমরা সকলেই তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া ও থাকি। নতুবা, সুখ পাইলেই উৎফুল্ল হই কেন? দুঃখ পাইলে, কাঁদি কেন? সতত কর্ম্মেরই বা অনুষ্ঠান করি কেন? মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেহিগণ কর্ম্মব্যতিরেকে ক্ষণার্দ্ধ অবস্থিতি করিতে পারে না। সকল কর্ম্মই দ্বৈত-জ্ঞানাত্মক। অতএব যখন কর্ম্ম করিতেই হইবে, তখন শুভ কর্ম্ম কর, উপাসনা কর, সাধনা কর। বলা যাইতে পারে যে, শুভকর্ম্মের দ্বারাই বা মুক্তি হইবে কিরূপে? মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেই ত উক্ত হইয়াছে যে, ফলবাসনায় যাহারা শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাও কর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। (চতুর্দ্দশ উল্লাস, ১০৮ শ্লোক) এইখানে এ বিষয়টারও একটু আলোচনা করা যাউক। সকাম কর্ম্ম করিতে করিতেও কি নিষ্কাম কর্ম্ম করা যায় না? আমার নিজের হিতের জন্য কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া আমি কি জগতের হিতের জন্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না? নিজের স্বার্থই (Self-interest), সকল কর্ম্মের আদি প্রেরণা সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ নিজের স্বার্থই লক্ষ্য থাকে। উহাই কর্ম্মে একাগ্রতা জন্মাইয়া দেয়। তারপর নিজের স্বার্থের সহিতই সমাজের স্বার্থ আসে, এবং সমাজের স্বার্থের সহিতই জগতের স্বার্থ আসিয়া পড়ে। Self-interest হইতেই enlightened self-interest, altruism প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, 'আত্মহিতায়' হইতে 'জগদ্ধিতায়' বড় বেশী দূরে নয়। এবং 'জগদ্ধিতায়' হইতে 'কৃষ্ণায়'ও অতি নিকটে। এরূপ অনেক দ্বৈতবাদী দেখা গিয়াছে, যাঁহারা ভক্তির প্রগাঢ়তার গতিকে সংসারের সুখদুঃখে কিছুতেই বিচলিত হন না। 'ভগবান্ যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন; আমার তজ্জন্য ভাবনার প্রয়োজন নাই।' ইঁহারা প্রকাশ্যতঃ নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা বলেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ নিষ্কাম কর্ম্মী যে স্থানে উপনীত হন, তাঁহারাও ঠিক সেই স্থানে উপনীত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, উপাসনার শেষ অবস্থা কি? না, উপাস্যের সহিত তন্ময় হইয়া যাওয়া। বৈষ্ণবেরা বলেন যে, তখনও উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে একটু ভেদ থাকে; তান্ত্রিকেরা বলেন যে, তাহা থাকে না, সাধক পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কালীসাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে বেদান্তের সার সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অবশ্য, সকলের এক জীবনে এরূপ ঘটে না। কিন্তু এ জন্মে যাহা অপূর্ণ রহিল, পরজন্মে তাহা পূর্ণ হইতে পারে।

যাহা হউক, আমরা আর প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে পারি না। ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় তৎকৃত তন্ত্রতত্ত্বে এ বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন; কৌতুহলী পাঠক তাহা অধ্যয়ন করিতে পারেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, উহা দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

অবিমারক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রবেশক

অঙ্গরাগের বাক্স হস্তে মাগধিকার প্রবেশ

মাগ। বন্ধুবান্ধবেরা কি অসাবধান! সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত ঘরগুলিও সাজান হয় নি। কুটুম্বদেব কোলাহলও ত শুনছি না! কি হ'ল? সাবা রাত জেগে বুঝি সকাল বেলা সকলেই ঘুমুচ্ছে! যাই, ততক্ষণ রাজকুমারীকে ঘুম থেকে জাগাই গিয়ে।

পাখা হাতে বিলাসিনীর প্রবেশ

বিলা। মাগধিকা, দাঁড়া না একটু।

মাগ। ওগো, আমাকে আর দাঁড়াতে বল না। রাজকুমারীর জন্য আমাকে ফুল, বিলাসচূর্ণ ও অঙ্গরাগেব আর আর জিনিস আনতে হবে!

বিলা। রাজকুমারীর অঙ্গরাগের জিনিসেবই বা কি দরকার, আর অলঙ্কারেরই বা কি দরকার?

মাগ। যা মুখে আস্‌ছে, তাই বলছ? অমঙ্গলের কথা বলছ কেন? রাজকুমারীর গায়ে যেন চিরকাল অলঙ্কার শোভা পায়।

বিলা। যে কথা বুঝি, তাই বল্‌ছি! বল্‌ছি যে রাজকুমারীর রূপই অলঙ্কার।

মাগ। দূর পাগলী! পুষ্পে কি গন্ধ থাকতে নেই?

বিলা। হাঁ, বটে। যারা স্বভাবতঃই সুন্দব, অলঙ্কার পবলে, তাদের সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে যায়, এ কথা ঠিক!

মাগ। বিলাসিনি, রাজকুমাবীর রূপের উপযুক্ত বরের সঙ্গেই তাঁর মিলন হবে!

বিলা। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন! রাজকুমারের পাশে রাজকুমারীকে পদ্মিনী রমণীর মতই দেখাবে।

মাগ। ঠিক কথাই বলেছ বটে! আমারও মনে হয়, ভগবান কন্দর্প শরীর ধরে এলে যেমন দেখাত, রাজকুমারকেও ঠিক তেমন দেখায়!

বিলা। তাই রাজকুমারী মুহূর্ত্তমাত্রও রাজকুমারকে ছাড়া হয়ে মনে সুখ পান না।

সজল নয়নে নলিনিকার প্রবেশ

নলি। লোকে যে বলে সুখেব পথে অনেক কাঁটা, কথাটা ঠিক। রাজকুমাবীর সঙ্গে এক বছর ধরে অনবরত কেবল সুখভোগ ক'রে সখীদের ভাগ্যেও উত্তর কুরুবাস ঘটেছিল। কিন্তু মহারাজ সব কথাই জেনেছেন, এ কথা শুনে অবধি শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। লজ্জা, ভয় ও কন্দর্পদেবের তাড়নায় রাজকুমারীও অচেতনপ্রায় হয়ে গেছেন। এই দালানটা নিবান বাতিব মত বোধ হচ্ছে। রাজকুমার ছেড়ে যাওয়া অবধি আর কোন জিনিসই ভাল লাগছে না। রাজকুমার ভালয় ভালয় পালিয়েছেন শুনে, আজ মনটা একটু প্রফুল্ল হয়েছে। এখন কন্যাপুরে খুব কড়া পাহারা বসেছে। এই যে সখীরা। মাগধিকা, এটা কি?

মাগ। কি জিজ্ঞাসা ক'রছ নলিনিকা? রাজকুমারীর বেশ-বিন্যাসের সময় হল যে?

নলি। সে উৎসব শেষ হয়ে গেছে, মাগধিকা। (রোদন)

উভয়ে। এ কি স্বপ্ন! বল—সব খুলে বল, তাহ'লেই সকলে সমান হতে পারব।

নলি। রাজকুমাব চলে গেছেন।

উভয়ে। কি!

নলি। রাজকুমারীর দুঃখ সইতে না পেরে, আমি এখানে চলে এসেছি।

মাগ। রাজকুমারীর এই অবস্থা দেখতে পারব না। তথাপি রাজকুমারীকে সান্ত্বনা কত্তে হবে!

উভয়ে। চল, তাই করি গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

অবিমারকের প্রবেশ

অবি। (সদুঃখে) কন্যাপুর থেকে কোন মতে বেরিয়েছি। আমার ভাগ্যাবশেষ শরীরটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু

মন প্রিয়াবিরহিত হয়ে এখনও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছে না, আর শরীরের প্রতিও উদাসীন হয়ে আছে।

কুরঙ্গীর অবস্থা না জানি কি হবে? পরিচারিকাদের কথা শুনে লজ্জা পাবে, রাজার আদেশে কন্যাপুরে বিশেষভাবে আবদ্ধ হয়ে ভয় পাবে, আমাকে না দেখতে পেয়ে জলভরা চোখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে, আর রাত্রিকালে যে কি করবে, তা বলতে পারি না।

বেশ হয়েছে! উপায় একটা ঠাউরেছি। আমাকে হারিয়ে কুরঙ্গী প্রাণ রাখতে চাইবে না। আমিও তার জন্য প্রাণ দেব।

(পরিক্রমণ করিয়া) কতদিন প্রবাসে কাটালুম। কিন্তু আজ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অসহ্য হয়েছে। সরল মনে পরিচিত হয়ে এতদিন আমার জন্য যাঁর ভালবাসা বেড়েই গিয়েছে, যাঁর রূপের ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়, যাঁর নূতন যৌবন, যিনি মনোহারিণী, এক মুহূর্ত্ত তাঁকে ছেড়ে থাকা আর নিজকে বঞ্চনা করা, একই কথা! পৃথিবীতে এত কষ্টকর আর কি কৃতঘ্ন ভাব থাকতে পারে?

এখন কিন্তু মদন-তাপে আমার অন্তর পুড়ে', (শরীরটাও) ছাই হতে আরম্ভ হয়েছে। সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবও অন্তর-দগ্ধ হয়ে ছাই হচ্ছেন।

(চারিদিকে দেখিয়া) অহো! গ্রীষ্মকাল কি ভীষণ।

বোধ হচ্ছে যেন পৃথিবীর জ্বর হয়েছে। গাছগুলি এত দাবাগ্নিতপ্ত হ'য়েছে যে, এদের আর ছায়া দেওয়ার ক্ষমতা নাই. (যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে যেন) বিশুষ্ক হ'য়ে গেছে।

বড় বড় গুহা দেখে বোধ হচ্ছে যেন অবসন্ন হয়ে পর্ব্বত-গুলি হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। সমস্ত জগৎ যেন প্রখর রবিতাপে দগ্ধ হ'য়ে সংজ্ঞাহীন ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। *

কি ক'রবো? আর চলতেও যে পারি না—উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বালুকণিকাগুলি দিয়ে গা ঢেকে দিচ্ছে। তপ্ত পাতা দিয়ে গাছগুলি যেন সেক দিচ্ছে। সূর্য্য দাবদগ্ধ হয়ে যেন গলে পড়ছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তপ্ত রৌদ্রের তাপে সমস্ত পৃথিবী যেন শীর্ণ হয়ে গেছে।

প্রিয়তমে, সুন্দরি, আমার কথার জবাব দাও। (মূর্চ্ছা)

(দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ও উপর দিকে তাকাইয়া) ভগবান সহস্রকিরণ মেঘে ঢেকে গেলেন!

বায়ুচালিত মেঘগুলি ছড়িয়ে প'ড়ে সূর্য্যকে ঢেকে দেবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে, যে তপ্ত সূর্য্য আমার অন্তর দগ্ধ কচ্ছে, মেঘগুলি যদি সেই সূর্য্যকে ঢেকে দেয়, তা'হলে, আশ্চর্য্যের বিষয় হবে বটে!

এই জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে আর লাভ কি? এই প্রাণ বিসর্জ্জন করব।

(উঠিয়া পরিক্রমণ) কি করব? হাঁ, তাই করব। এই পর্ব্বতের তড়াগেই ডুবে মরব। কিন্তু আমার এই মরণে যে অধর্ম্ম হবে! মোহে ও অভিমানে আচ্ছন্ন হয়ে আমি মহাপথ ভুলে গেলুম! আর কোন উপায় দেখতে হচ্ছে!

(দেখিয়া) হাঁ, তাই করব। ঐ যে অদূরেই দাবাগ্নি দেখ্ছি। এই দাবাগ্নিতেই প্রাণ বিসর্জ্জন করব। (অগ্রসর হইয়া ও প্রণাম করিয়া) ভগবান অগ্নি! (তোমাকে নমস্কার)।

যদি অগ্নি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির অভীষ্ট সিদ্ধ করে, তা'হলে পরকালে আমার প্রিয়তমা মাত্র আমাতেই অনুরক্তা হবে!

(অগ্নিপ্রবেশ ও কুতূহলের সহিত) এ কি হ'ল! গাছগুলি অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছে, আর সেই অগ্নিশিখা আমার গায়ে মলয়চন্দনলেপনের ন্যায় শীতল বোধ হচ্ছে। মদনাতুর ব্যক্তিকে অগ্নি অত্যন্ত দয়া করেন (পুড়ে ফেলেন), কিন্তু হৃষ্ট হয়ে পিতা যেমন পুত্রকে আলিঙ্গন করে, অগ্নি আমাকে তাই কল্লেন!

এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? আগুনও আমাকে পোড়াল না? হ'তে পারে, এরও কোন কারণ আছে? অন্য উপায় দেখা যাক।

(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে সম্মুখে অত্যুচ্চ পর্ব্বত। (এই পর্ব্বতের) কাল মেঘে আবৃত শৃঙ্গগুলি অস্পষ্ট.

* রবিপাকনষ্টহৃদয় = রবির দশায় যেন সমস্ত লোক অভিভূত হয়ে আছে, যেন তাদের মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে।

গগনবিহারী পক্ষিকুলের নিরাপদ আশ্রয়, কবিকল্পনার এক অভিনব উপাদান, প্রীতিমিলনের রমণীয় ভূমি, আবার নিষ্ফলৈশ্বর্য্য নীচমনা রাজার মত !

এই উপায় আশ্রয় করেই প্রাণ বিসর্জ্জন করব। যে উচ্চ প্রদেশে (প্রবল) বায়ু বয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে পড়ে যদি আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করি, তা হলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আচ্ছা যাই, এই বেলা পর্ব্বতে উঠি।

(উঠিয়া ও চারিদিকে দেখিয়া) পাহাড়ের গায়ের এই জলে স্নান ও আচমন করে মন্ত্র পাঠ করব। (স্নান ও আচমন করিয়া মন্ত্রজপ)।

বিদ্যাধরীর সঙ্গে বিদ্যাধরের প্রবেশ

বিদ্যাধর। প্রত্যুষ কাটিয়েছি উত্তর কুরুতে। স্নান করেছি মানসসরোবরে। মন্দর পর্ব্বতের কন্দরতটে যৌবনসুখ উপভোগ করেছি। হিমালয়ের গুহায় ঘুরে ক্রীড়া করেছি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে নয়ন চরিতার্থ করেছি; এখন মলয় পর্ব্বতের চন্দনবনে গিয়ে মধ্যাহ্নটা ঘুমিয়ে কাটাব।

(আকাশে উঠিয়া)

সৌদামনি, দূরস্থিতা ভগবতী বসুন্ধরা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, একবার চেয়ে দেখ।

বড় বড় পর্ব্বতগুলি হস্তিশাবকের মত, মহাসাগর ক্রীড়াসরোবরের মত, গাছগুলি শৈবালের মত, পৃথিবীর উপরটা সমভূমির মত, নদীগুলি সীঁতির মত এবং প্রকাণ্ড দালানগুলি বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। আর যা যা দেখা যাচ্ছে, সমস্তই (গতি-বেগে) বক্র বলে বোধ হচ্ছে। সমস্ত জগৎটাই যেন ছোট হয়ে গেছে।

দেখ সৌদামনি, সাবধান হও, মলয় পর্ব্বত শীতল চন্দনের নিলয়। আমরা সেখানে যাব।

সৌদা। আর্য্য, বেশ। (উভয়ের আকাশে আরোহণ) আর্য্য, একটু বিশ্রাম না করে যেতে পারব না।

বিদ্যা। আচ্ছা, তা' হ'লে কোন একটা পর্ব্বতে থানিক বিশ্রাম করে যাব।

সৌদা। হাঁ, আর্য্য, আমি তাই চাই।

(উভয়ের আকাশ হইতে অবতরণ)

বিদ্যা। সৌদামনি, চেয়ে দেখ,

আমাদের গতিবেগে মেঘমালাগুলি দূরে চলে যাচ্ছে। সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবী যেন উপরে উঠে আসছে। আর প্রাবৃটকালের মেঘমালার ন্যায় পর্ব্বতগুলি স্পষ্ট হয়ে যেন আবির্ভূত হচ্ছে।

দেখ সৌদামিনি, এই পর্ব্বতেই আমরা থানিক বিশ্রাম কত্তে পারব। তার পরে শ্রান্তি দূর করে আবার চলব।

সৌদা। হাঁ, আর্য্য, তাই।

বিদ্যা। সৌদামনি, পুষ্পিত তরুর ষষ্ঠভাগ গ্রহণ আমাদের ধর্ম্ম। এস, বৃক্ষগুলিকে ঋণমুক্ত করি।

সৌদা। আচ্ছা, আর্য্য, তাই করা যাক। (পুষ্পচয়ন)

বিদ্যা। (অবিমারককে দেখিয়া) একি! এটি কে! হাঁ, বুঝেছি। ইনি শাপগ্রস্ত বিদ্যাধর। তা না হলে, অন্যের কি এমন রূপ হয়? ভাগ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। বেশ, যে সকল কথা তাঁর মনে নাই, আমি তারই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করব।

অবি। দেবকার্য্য ত হ'ল। এবার পড়ব। (পাশে চাহিয়া বিদ্যাধরকে দেখিয়া) ইনি আবার কে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না, আমি ত জেগেই আছি! কথা আছে, মরণকালে লোকে নানা জিনিসই দেখে থাকে। তাই হবে। কিন্তু এটা হচ্ছে মোহগ্রস্তদিগের পক্ষে। আমার ত সংজ্ঞালোপ হয় নি! আচ্ছা, এঁকে প্রশ্ন করেই দেখি। দেখুন, আপনি কোন্ কুল ও বংশ অলঙ্কৃত করেছেন?

বিদ্যা। শুনুন। আমার নাম মেঘনাদ। আমি বিদ্যাধর। ইনি হচ্ছেন আমার কুটুম্বিনী—নাম সৌদামনী। আজ মলয় পর্ব্বতে ভগবান অগস্ত্যের পূজার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। বিদ্যাধরেরাই সেই উৎসবে যোগ দেবে। সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদিগকেও সঙ্কেত করা হয়েছে। এখানে একটু বিশ্রাম করে যাব, তাই আকাশ থেকে নেমেছি। আমাদের কথা হচ্ছে এই। আচ্ছা, এখন

বলুন দেখি, আপনি কি জন্য এই ক্ষিতিতলকে দেবলোক ক'রে তুলেছেন?

অবি। (স্বগতঃ) কি বলব? মরণকালে মিথ্যা বলব না। (প্রকাশ্যে) আমি সৌবীর রাজার ছেলে। আমার নাম অবিমারক।

বিদ্যা। (স্বগত) এটা মিথ্যা কথা। মানুষের এমন রূপ হতে পারে না। (প্রকাশ্যে) (তা'হলে) আপনি একা এখানে এসেছেন কেন?

অবি। (স্বগত) কি বলব? (অধোমুখে অবস্থান)

বিদ্যা। আচ্ছা, আমিই জেনে নিচ্ছি সব। (মন্ত্রবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ) কি দুঃখ! ইনি যে সাক্ষাৎ ভগবান অগ্নির ছেলে। আত্মপরিচয় জানেন না! কুন্তিভোজ-রাজার কন্যা কুরঙ্গীকে পাওয়ার জন্য ক্রীড়াকৌতুকে (কন্যাপুরে) কিছুদিন গোপনে কাটিয়ে সব জানাজানি হওয়ায়, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। সেখানে ঢুকবার আর কোন উপায় না দেখে প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হ'য়ে খুব উঁচু জায়গা থেকে পড়বেন ব'লে এই পর্ব্বতে উঠেছেন। কুরঙ্গীও সেখানে জীবন্মৃত হ'য়ে আছে। যা হ'ক, আমাকে এর এই কাজে সহায় হ'তে হবে। (প্রকাশ্যে) অবিমারক, বন্ধুর মনে কোন কপটতা থাকে না। আমি যা জানি, তা তুমি গোপন কত্তে পারবে না।

অবি। বলুন।

বিদ্যা। আজ থেকে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'ক। তোমার সব কথা আমি জানতে পেরেছি। আচ্ছা, তুমি প্রাণ বিসর্জন করার জন্য এই পর্ব্বতে উঠেছ কি না বল ত?

অবি। হাঁ, বন্ধু, তাই।

বিদ্যা। তোমার এই সরলতায় সন্তুষ্ট হলুম। যদি তুমি সেখানে গোপনে ঢুকতে চাও, তার উপায় আমি কত্তে পারব। তুমি কি করবে বল।

অবি। (সহর্ষে) কথা কি আর! আবার ঢুকব। সে জন্যেই ত আমার এত অস্বস্তি।

বিদ্যা। বন্ধু, এই আংটিটা একবার চেয়ে দেখ দেখি! (আংটি প্রদর্শন)।

অবি। বন্ধু, এই আংটি দিয়ে কি হবে?

বিদ্যা। এই আংটি ডান হাতের আঙ্গুলে পড়লে (তোমাকে) কেউ দেখতে পাবে না, আবার বাঁ হাতের আঙ্গুলে পড়লে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

অবি। হাঁ, বন্ধু, তাই।

বিদ্যা। এটা আমি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। বন্ধু, আমাকে কি দেখতে পাচ্ছ?

অবি। হাঁ, দেখছি।

বিদ্যা। আচ্ছা, এ বেলা সাবধান হও।

অবি। হাঁ, সাবধান হ'য়েছি।

বিদ্যা। (ডান হাতের আঙ্গুলে আংটি পরিয়া) বন্ধু, এখন কি আমাকে দেখছ?

অবি। বন্ধু, তোমার ছায়াও দেখছি না! শরীর ত দূরের কথা। এরকম লোকই বাস্তবিক পৃথিবীতে সুখী। পত্নীর সঙ্গে যারা আকাশে ঘুরে বেড়ায়, সমস্ত বিদ্যা * আয়ত্ত করে যারা পর্ব্বতমূলে ক্রীড়া করে, আবার মন্ত্রের বলে সমস্ত জানতে পেরেও (ইচ্ছামত) দৃশ্য ও অদৃশ্য হ'য়ে মনের সুখে নানাস্থানে যেতে পারে, (তারা বাস্তবিকই সুখী)। এই আংটির বলে (কন্যাপুরে) ঢুকেই গেছি মনে কত্তে পারি।

বিদ্যা। (বাঁ হাতের আঙ্গুলে আংটি পরিয়া) এই নাও, বন্ধু, আংটি।

অবি। (লইয়া) নিতান্ত অনুগৃহীত হলুম।

বিদ্যা। এমন কথা বল না। আমিই অনুগৃহীত হলুম। যার রত্নের প্রয়োজন আছে, এরূপ উপযুক্ত পাত্রে রত্ন দান করে যতটা আনন্দ হয়, সুজন রত্ন লাভ করে ততটা আনন্দ ভোগ করে না।

---

* All kinds of arts—কৃতোপদেশাঃ=(১) যারা সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করেছে (২) যারা অন্যকে উপদেশ দেয়।

অবি। আমার কেবল একটা সংশয়। কিন্তু আমার নিজ শরীরে পরীক্ষা করে দেখব, একথা বলা সঙ্গত নয়।

বিদ্যা। বেশ ত ডান হাতের আঙ্গুলে প'রেই দেখ।

অবি। আচ্ছা (সেরূপকরণ)

বিদ্যা। সখা, খড়্গ হাতে নাও।

অবি। আচ্ছা (খড়্গ হস্তে লইয়া সবিস্ময়ে) অহো, খড়্গের কি প্রভাব!

বজ্র যেন (কোনমতে) প্রচ্ছন্নরূপী হ'য়ে আছে। তড়িৎ স্ফুরণ যেন খড়্গারূপী হ'য়েছে। সূর্য্যের তেজ অতিক্রম করে যেন দবাগ্নি সহসা বনে জ্বলে উঠেছে।

বিদ্যা। আহা! অগ্নির ছেলের কি তেজ! এই খড়্গের প্রভাব খুব কম বিদ্যাধরেই সহ্য কত্তে পারে। অগ্নিদেবই তাকে রক্ষা কচ্ছেন।

অবি। (খড়্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) অহো! এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানেরই বা কি প্রভাব!

স্বর্গবাসীর প্রকৃতি লাভ করেছি, গুণেও বিশিষ্ট হ'য়েছি, কিন্তু আমি নামে যে অবিমারক, সেই অবিমারকই রয়েছি। যতক্ষণ এরূপ থাকব, ততক্ষণ নির্গুণ মানব আমার যে শরীর আছে, একথা জানতে পারবে না।

বন্ধু, আমার কাজ ত হয়েছে, এখন তোমার অসি ফিরে নাও।

বিদ্যা। যা তোমার ইচ্ছে। সখা, প্রথম যে অদৃশ্য হবে, তাকে যে ছুঁয়ে থাকবে, সেও অদৃশ্য হবে, আবার তাকে যে ছুঁয়ে থাকবে, সেও অদৃশ্য হবে।

অবি। বন্ধু, বড়ই প্রীত হয়েছি। এ আবার সোনায় সোহাগা হ'ল! সখা, আমার জন্য তোমার বিলম্ব হচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। আর বেলা ক'রে লাভ নাই।

বিদ্যা। তোমার কাছে বিদায় নিয়ে আবার যেতে পারি।

অবি। বেশী আর কি বলব সখা—

তোমার মত ষার সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত আছে, তার প্রত্যুপকারের কথা মনে ভাবা আমার মত লোকের (ধৃষ্টতা)। (তবে এই মাত্র বলতে পারি যে) জীবন দান ক'রে তুমি আমাকে কিনে ফেলেছ। এই ভৃত্য তোমার কি (উপকার) করবে বলে দাও।

বিদ্যা। তোমার বুদ্ধি যে সরল, তা আমি জানি। যদি আমার অভিপ্রায় শুনতেই তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা' হ'লে, আমার সখীকে (রাজকুমারী কুরঙ্গীকে) আমার কথা ও তার (সৌদামনীর) কথা ব'লো, আর তুমি আমার কথা মনে রেখো। আমার গমনকালে আমাকে দেখো (?)। ক্রীড়ারসে রাজকুমারীকে ভুলিয়ে রেখো। অবকাশ মত আমি তোমার কাছে আসব।

বাস্তবিক এইরূপ লোককে ছেড়ে যেতে মন চায় না। সখা, এখন তবে আসি।

অবি। হাঁ, এস সখা, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

বিদ্যা। আচ্ছা! (বিদ্যাধরীর সঙ্গে বিদ্যাধরের আকাশে গমন)।

অবি। (ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া) এই যে সেই মেঘনাদ আকাশসমুদ্রে ডুবে গেল! তার মাথার সম্মুখের চুলগুলি বায়ুবেগে উড়তে আরম্ভ করেছে, মেঘমালার ঘর্ষণে অঙ্গরাগ নষ্ট হয়ে গেছে, কটিদেশ ভাল ক'রে বাঁধা রয়েছে, আর মধ্যদেশ যুবতীপত্নীর বাহুবেষ্টনে বদ্ধ হয়েছে! উত্তরীয়টি বায়ুতে উড়ে যাচ্ছে, মুকুটমণিগুলি আকাশের নক্ষত্রগুলিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। উপরদিকে বেগে যাচ্ছে ব'লে এই সুন্দরকান্তি বিদ্যাধর ক্রমশঃই যেন ক্ষুদ্র হ'য়ে অগ্রসর হচ্ছে!

বিদ্যাধরীও বিজ্ঞানবলে প্রিয়তমের অনুসরণ কচ্ছে। তারও মাথার পাশের চুলগুলি গতিবেগে শিথিল হয়ে খুলে গেছে; বক্ষঃস্থলের কম্পনে সুন্দর কটিদেশ খিন্ন হয়ে গেছে! শরীরের উপরিভাগ আকাশে পতিকে আশ্রয় ক'রে আছে, এবং বিদ্যুতের মত মেঘমালায় একবার দেখা যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যাধর মেঘনাদ চলে গেলেন। আমিও আজই নগরের দিকে যাত্রা করব। আচ্ছা, এই বেলা পর্ব্বত থেকে নেমে পড়ি। (নামিয়া) শ্রান্ত হয়েছি ব'লে

বোধ হচ্ছে। আচ্ছা এই পাথরের উপরে ব'সেই খানিক ক্ষণ বিশ্রাম ক'রে তবে যাব।

(উপবেশন)

বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। কি কষ্ট! প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা সৌবীররাজের কি দুর্দ্দশা! বহুদিন অপুত্রক থেকে, বহু ব্রতনিয়ম পালন ক'রে, দেবতার অনুগ্রহে মনুষ্যলোকে দুর্লভ পুত্র লাভ করেও আবার সেই অবস্থা হল! আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে বলে এবং বন্ধুজনের দুর্ভাগ্য বলে কুমার নিরুদ্দেশ হয়েছেন! রাজকুমারী আজ বলেছেন, "কুমার নিরাপদে পালিয়েছেন।" অথবা সুকুমারদেহ রাজকুমার কন্দর্পপীড়িত হয়ে নিরুদ্দেশ জীবনে যে কুশলে আছেন, তাই বা কে বলতে পারে? আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি, সমস্ত পৃথিবী ঘুরে রাজকুমারকে বা তার শরীরকে খুঁজে বের করব। যদি খুঁজে বের কত্তে না পারি, তা হ'লে পরকালে তার সঙ্গী হব। পরিশ্রান্ত হয়েছি! এই গাছটার ছায়ায় খানিক ক্ষণ বসে বিশ্রাম করে তবে যাব।

অবি। সন্তুষ্টের অবস্থা না জানি কি হয়েছে! আমি পালিয়েছি, এ কথা শুনে থাকলেই ভাল। যদি না শুনে থাকে, তা হ'লে এই ব্রাহ্মণের বিপদ ঘটবে। অথবা তাকে ছেড়ে আমার এসমস্ত চেষ্টারই বা প্রয়োজন কি? সে বন্ধুজনের সমাজে (সকলকে) হাসাতে পারে, যুদ্ধে বীরপুরুষের মত যুদ্ধ কত্তে পারে, শোকে গম্ভীর ভাব ধারণ কত্তে পারে, শত্রুর সম্মুখে সাহস দেখাতে পারে; আর, সে আমার হৃদয়ের উৎসবস্বরূপ। বেশী আর কি বলব, আমার শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

(চারিদিকে দেখিয়া) কে এই পথিক গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে! (অগ্রসর হইয়া) এই যে আমার হৃদয়ের মঙ্গলের নিদান হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে! এর সঙ্গে কোলাকুলি করার জন্য আমার মন বড় উৎসুক হয়েছে!

বিদূ। (জাগিয়া) অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। এখন পথ চলি আবার। যার মনোরথ সিদ্ধ হচ্ছে না, তার আবার বিশ্রাম কি? একি! এ যে রাজকুমার অবিমারক!

অবি। একি! এ যে সখা সন্তুষ্ট! (উভয়ের আলিঙ্গন)

বিদূ। (উচ্চ হাস্য করিয়া) বয়স্য, এতদিন তুমি কি করেছ বল।

অবি। বয়স্য, এই দেখ যা করেছি। (ডান হাতের আঙুলে আংটি পরিয়া অদৃশ্য)

বিদূ। হায়! হায়! রাজকুমার কোথায়? তাঁকে আর দেখছি না কেন? তাঁরই চিন্তায় ডুবেছিলাম ব'লে কি তাঁকে দেখছি বলে মনে করেছিলুম। তাঁকে বের কত্তেই হবে। সখা, যদি আর তুমি লুকিয়ে থাক, তা হ'লে তোমাকে শাপ দেব।

অবি। বয়স্য, এই যে আমি।

বিদূ। কোথায়? কোথায় তুমি?

অবি। (বাঁ হাতের আঙ্গুলে আংটি পরিয়া) সখা, এই যে আমি!

বিদূ। আগে ছিলে খাঁটি অবিমারক, আর এখন হয়ে মায়া-অবিমারক। হে মায়াবী, তুমি কন্যাপুরে অদৃশ্য থেকে ঘুরে বেড়াও না কেন?

অবি। বয়স্য, সবে মাত্র এই (আংটি) পেয়েছি!

বিদূ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এখন এটা কোথা থেকে এল?

অবি। সব কথা অন্তঃপুরেই বলব, এস!

বিদূ। এখন যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে।

অবি। মূর্খ, যেখানে এই বিদ্যা প্রয়োগ কত্তে হবে, শীঘ্র সেখানে চল। তোমার হাত ছাড়িও না।

বিদূ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমিও যে অদৃশ্য হয়ে গেছি। আমার কি শরীর আছে, না নেই? এই থুথু ফেলে উচ্ছিষ্ট করব।

অবি। মূর্খ, আর বিলম্ব করে কাজ নেই। প্রিয়তমাকে দেখবার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। (আকর্ষণ)

বিদূ। আমার মনে বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবি। খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব।

বিদূ। খানিক সময় বিশ্রাম করে যাব।

অবি। কুরঙ্গী কি আমাকে মনে করে?

বিদূ। নম্মা অন্ধ শ্রমণিকা কি বেঁচে আছে?

অবি। বয়স্য, তোমাকে অনুনয় কচ্ছি, শীঘ্র এস।

বিদূ। সমাবর্ত্তন সম্পন্ন করে ছাত্র যেমন ঘরের দিকে ধাবিত হয়, তুমিও যে তেমনি ধাবিত হচ্ছ!

অবি। মূর্খ, এদিকে।

বিদূ। টেনো না, আমি তোমার অনুসরণ কচ্ছি।

অবি। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে সম্মুখে নগর!

বিদূ। নগরের শোভা দেখে নি।

অবি। এই যে রাজবাড়ী—

এই সেই রাজবাড়ী। কত ভীত হয়ে রাত্রিকালে সাহস আশ্রয় করে ঢুকেছিলুম। আবার মায়াসহায়ে দিনের বেলায়ই অশঙ্কিত চিত্তে সাধুর বাড়ীতে যেমন লোক প্রবেশ করে, তেমন ভাবে প্রবেশ করব। (পরিভ্রমণ করিয়া) এখন কুরঙ্গী নিশ্চয়ই স্নান করে অন্তঃপুরে অবস্থান কচ্ছে।

বিদূ। যেখানে ইচ্ছে, সেখানে ঢুকব। ভিক্ষার সময় চলে গেল।

অবি। এস, অন্তঃপুরেই ঢুকে পড়ি। (প্রবেশ করিয়া)

অনেক দিন (আপন) গৃহে রাজধানীতে সুখে বাস করেছি, কিন্তু দুর্লভ বস্তু লাভের আশায় (প্রশস্তমনা) আমরা এখানে এসেছিলাম। (ভগবানের অনুগ্রহে) আমরা কৃতার্থ হয়েছি, আমাদের অন্তরাত্মা হৃষ্ট হয়েছে, মায়াবিদ্যা লাভ করে আমরা নিরাপদেই প্রবেশ কত্তে পেরেছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

—৹—

চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ

(১৬)

বিবিধকথা—সামাজিক সৌজন্য

যদিও তর্কালঙ্কার মহাশয় সেরপুরসমাজে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহার পিতামহের সময় হইতেই সমুন্নত সেরপুরসমাজের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, তথাপি তাঁহার জীবনের সামাজিক অংশটা যেন পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে পরিপূর্ণ থাকিত। আমরা পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি,তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পিতামহ 'মুক্তাগাছা মানকোন' গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেরপুরে বাস স্থাপন করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রায় সকল বিষয়েই সেরপুরের সহিত জড়িত ছিলেন, কেবল সামাজিক ব্যাপারে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহসমাজের মুখাপেক্ষা করিতে ভালবাসিতেন। আমরা তাঁহার প্রথম জীবনের সহিত তেমন পরিচিত নহি, কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় সামাজিক বিষয়ে সর্ব্বাংশে পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। ঐ সমাজের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগসূত্র প্রকৃত পক্ষেই দৃঢ় ছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় সমাজ সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মতামত প্রায় প্রকাশ করিতেন না। সমাজশক্তির উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। সমাজশক্তির উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বহুবার বহু কথা বলিয়াছেন। সমাজের প্রাচীন ও ক্রমাগত নিয়মাবলীর প্রতি তিনি কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজের প্রতি তুল্যভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন। এবং এমন একটী বিনয়সম্ভ্রমযুক্ত সামাজিক শ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয়ে ছিল যে, তিনি সারা জীবন শুধু সেই সুন্দর শ্রদ্ধামণ্ডিত ভাবটীর মাধুর্য্যে সকল সমাজেরই মনোরঞ্জন করিতে, শুধু তাহাই নহে,—নেতৃত্ব করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি সামান্য ব্যাপারে তাঁহার হৃদয়ের সকল প্রকার সদবৃত্তি সাড়া

দিয়া উঠিত, তিনি 'ছোট খাট' বিষয়েও সমাজের মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতেন।

এই শ্রেণীর সমাজের মুখাপেক্ষা-ব্যাপারেও একটু বিশিষ্টতা ছিল। সমাজের প্রকৃতপক্ষেই হিতকর অনুষ্ঠানে তিনি সাধারণের মতামতের প্রতীক্ষা করা সঙ্গত বোধ করিতেন না, কিন্তু সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বা মন্দির-সংস্কারে যদি কখনও হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইতেন, তখন সমাজের সকলেরই মতামতের অপেক্ষা করিতেন। আমরা বলিয়া আসিয়াছি, যখন তর্কালঙ্কার মহাশয় 'শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা পরিব্যক্ত করেন, তখন সমাজের বহু ব্যক্তি উহার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও সমাজের মনে আঘাত করিয়া নহে, বরং প্রণিধান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন সমাজের সহিত বেশ 'মিলাইয়া মিশাইয়াই' তাঁহার আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সামাজিক শ্রদ্ধা বিশেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় সমাজের প্রতি যে সম্ভ্রম পোষণ করিতেন, তাহার মূলে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকিত না; মূলে থাকিত একমাত্র সমাজের কল্যাণ ও তাহারা রক্ষা।

সামাজিক ব্যক্তিগণকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহার সেই শ্রদ্ধার মূল কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইয়াছি যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় কখনও কাহাকে কেবল সন্তুষ্ট করিবার জন্যই কোনও কিছু করে নাই, বিশেষতঃ, ধর্ম্ম বা সমাজ সম্পর্কে। তর্কালঙ্কার মহাশয় সমাজকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন সত্য, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিবেকের বিসর্জ্জনবিনিময়ে নহে,—তাঁহার ব্যক্তিত্বও আবার কখনও বিবেক বুদ্ধিকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই, বরং বিবেকটীকে প্রবল করিতে যাইয়া, সমাজের সকলকে বিবেক ও ন্যায়পথে পরিচালিত করিবার ব্যপদেশে, তিনি নিজকে লুটাইয়া দিয়াছেন; তিনি যে কোনও ব্যক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিতে সংকোচ বোধ করিতেন না। তাঁহার অতি বড় বন্ধুব্যক্তিও তাঁহাকে কোন সময়ের জন্য বিবেক ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বস্থাপনের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বিনয় ও সৌজন্যের আধার ছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কলিকাতা অবস্থিতিকালে এদেশের বহু ছাত্র ইংরাজী উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য কলিকাতার কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা মেস্ করিয়া থাকিতেন। ময়মনসিংহ জেলার ছাত্রগণ অনেক সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে যাইতেন, নানা প্রকারে সাহায্য পাইতেন; এবং তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন। মেসের ছাত্রগণের অধিকাংশই সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান, সুতরাং উচ্চশিক্ষার আলোকে তাঁহাদের সহজস্বচ্ছ হৃদয় অধিকতর আলোকিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; সেই আলোকে তাঁহারা নিজেদের সমাজের অনেক শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। সত্যের অনুরোধে ইহাও বলা সঙ্গত হইবে যে, তখনকার দিনে সভাসমিতি করিয়া বক্তৃতা দ্বারা সামাজিক দুর্দ্দশার কাহিনী প্রচার করাও উচ্চশিক্ষার একটা অপরিহার্য্য সার্থকতা বলিয়া গণ্য হইত; চারিদিকেই সভাসমিতির ছড়াছড়ি ও বক্তৃতার হুড়াহুড়ি। আমাদের ময়মনসিংহের ছাত্রসমাজও কোন একটী সামাজিক সংস্কার-ব্যপদেশে সকলে যুক্তি আঁটিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, অভিপ্রেত সামাজিক সংস্কারটী অবিলম্বে সম্পাদন করিতে হইবে, তর্কালঙ্কার মহাশয়কে সভাপতি করিয়া তাঁহারা সকলে সভা করিবেন, এবং এই সংকল্প সাধন করিবার জন্য সমস্ত অনুকূল অনুষ্ঠান করিতে তাঁহারা প্রস্তুত। তর্কালঙ্কার মহাশয় জানিতেন, শুধু একদিনের জন্য সভাসমিতি করিয়া দেশের চিরপ্রচলিত রীতির মূলে কুঠারাঘাতের চেষ্টা করিলেও উহা সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সামাজিক

কোনও বিষয়ের সংস্কার করিতে হইলে সমাজের অধিকাংশ মান্য গণ্য লোকের সমবেত চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া থাকে। তর্কালঙ্কার মহাশয় জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশের সংস্কারের মূল স্থানের কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, সভাসমিতি দ্বারা কেবল সাময়িক উত্তেজনা ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল 'হৈচৈ' ছাড়া বড় বেশি কিছু হইয়া উঠে না ; বাঙ্গলার মাটিতে সকল বীজই বেশ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্থায়ী রসের অল্পতায় বেশি দিন সমান তেজে টিকিয়া থাকিতে পারে না। তর্কালঙ্কার মহাশয় সমাগত ছাত্রদের প্রতি অতি বিনীতভাবে প্রকাশ; করিলেন যে, "আমি বিশাল সমাজের একজন নগণ্য ব্যক্তি মাত্র কেবল আমার দ্বারা এরূপ সংস্কার সাধিত হইতে পারে না, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যদি এবিষয়ে চেষ্টা করেন, তবে আমার ক্ষুদ্র শক্তি তাঁহাদের চেষ্টার সহায়তা করিতে পারিবে"। ছাত্রগণ বড় আশা করিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিতে পারিলেন তাহাতে, বিশেষতঃ, তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয় ফিরিলেন। এবং নিজেদের সংকল্পসিদ্ধির জন্য কিছুদিন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রদর্শিত পন্থার অনুবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর কি হইয়াছিল, আমরা অবগত নাহি।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ছাত্রগণকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তাঁহার নিজের আর্থিক সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি অনেক সময় বিদেশীয় ছাত্রগণকে আহারাদি করাইতে পারিতেন না বটে, কিন্তু ময়মনসিংহবাসী ছাত্রগণকে প্রায়ই ডাকিতেন ; ইঁহাদিগকে ডাকিতে তিনি বড়ই আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেন। দেশের প্রতি তাঁহার বিশাল শ্রদ্ধা ছিল,—দেশের ছেলেদের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ছিল।

বোধ হয় ১৩০৩ সনে,—তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অম্বালিকা দেবীর শুভ বিবাহ কলিকাতা নগরীতে সম্পন্ন হয়। বর, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ গোবিন্দপুরনিবাসী শ্যামাচরণ রায়। প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত প্রতাপবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীতে বিবাহসভা হইয়াছিল। অম্বালিকা দেবীর বিবাহে তর্কালঙ্কার মহাশয় বেশ আয়োজন করিয়াছিলেন; কন্যা ও জামাতার জিনিসপত্রে, বস্ত্রে-অলঙ্কারে—অনেক টাকা খরচ করিয়াছিলেন ; তা ছাড়া, সে সময়ে কলিকাতাপ্রবাসী সমস্ত ময়মনসিংহবাসী ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল,—বলা বাহুল্য, তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বড় প্রিয় মেসের ছাত্রগণও নিমন্ত্রিত হইলেন। ঐ বিবাহে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের স্বদেশ হইতেও আত্মীয়গণের আহ্বান হইয়াছিল। বিবাহের রাত্রে প্রতাপবাবুর বাড়ীতে সমাগত ভদ্রগণ বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিলেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রত্যেকের আছে হাতজোড় করিয়া নিজের ত্রুটি প্রকাশ করিতেছিলেন। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, তর্কালঙ্কার মহাশয় সকলেরই নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বর ও কন্যাকে বিবাহস্থানে লইবার বন্দোবস্ত করিলেন। সন্ধ্যার একটু পর হইতেই একদিকে নিমন্ত্রিতগণের আহারাদি চলিতেছিল ; তর্কালঙ্কার মহাশয় সেখানে যাইয়াও সকলের নিকট ত্রুটিমার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছিলেন। ময়মনসিংহ-মেসের ছাত্রগণ তখনও কেহ কেহ আহার করিতে পারেন নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহাদিগকে নিতান্ত 'আপনার লোক' বলিয়া বিবাহের পরে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া-ছিলেন। এদিকে বিবাহ আরম্ভ হইল,—দেখিতে দেখিতে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল,—এইবার তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজেই অভুক্ত ছাত্রগণকে আহার করাইবার জন্য বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাদের খুঁজিলেন, কিন্তু বড়ই লজ্জার বিষয় যে, কএকটী ছাত্র, কি জানি কিসে, একটু অসন্তুষ্ট হইয়া না খাইয়াই মেসে চলিয়া যান। শুনিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি সেই রাত্রেই 'মেসে' যাইয়া তাঁহাদের ফিরাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তত রাত্রে অজ্ঞাত মেসে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের যাওয়া কাহারই পরামর্শসিদ্ধ হইল না ; সুতরাং তাঁহার খাওয়া ঘটিল না, একটা অশান্তি ও মর্ম্মবেদনা লইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই রাত্রিটা কাটাইয়া দিলেন। পরদিন নিজে একখানা গাড়ী করিয়া মেসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন,—এবং নিজের ত্রুটীজনিত গত রাত্রের দুর্ঘটনা ব্যক্ত করিলেন; যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন

তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন,—তখনকার অবস্থা দেখিয়া ছাত্রগণ লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, যে দু'চারিজন ছাত্র এরূপ ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধ, দেশপূজ্য তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মনে আঘাত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর আত্মপ্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। ছাত্রগণ সকলেই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; তিনি কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাঁহাদিগকে তিনি খাওয়াইবেন; কিন্তু খাওয়াইতে গেলেই ত তাঁহাদের নাম প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইল না বলিয়া, তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই দিনকার রাত্রের জন্য আবারও সকল ছাত্রের নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বাসায় আসিয়া প্রচুর আয়োজন করিলেন। যথা-সময় ছাত্রগণ আসিয়া লজ্জা ও পরিতোষের সহিত ভোজন করিলেন, তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বহস্তে 'মিষ্টি' পরিবেশন করিলেন—তাঁহার সমস্ত দুঃখ ও ক্ষোভ মিটিয়া গেল, মহাপুরুষ এইবার নিজকে ভারমুক্ত মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার জীবনে কাহাকেও রূঢ় কথা বলেন নাই, কাহারও মর্ম্মপীড়া উৎপাদন করেন নাই ; অতি বড় নিষ্ঠুর কার্য্যও তাঁহার জীবনে সম্পাদিত হয় নাই ; যদি কিছু কখনও প্রত্যাখ্যান করিবার প্রয়োজন হইত, তাহা বিনয় ও সৌজন্যের সহিত, বিজ্ঞতা ও ধীরতার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন ; কোনও বিষয়ের জন্য প্রার্থীকে তিনি প্রায়ই বিমুখ করিতেন না ; যদি বা কখনও বিমুখ করা আবশ্যক হইত, তাহাতেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে ভুলিতেন না। শত্রুমিত্র সকলেই অমায়িক ব্যবহারে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার বাড়ীতে যে কেহ গেলেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন, এবং প্রায়ই সদর দরজা পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া অভ্যাগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার মাতাপিতার শ্রাদ্ধে যখন যখনই খাওয়ান হইয়াছে দেখিয়াছি, তখন তখনই তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের মধুর মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রচুর আয়োজন করিতেন, ইচ্ছামত খাওয়াইতেন, আহারের সময়ে সকল শ্রেণীর নিমন্ত্রিতের প্রতি সমান শ্রদ্ধার সহিত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন, এবং রাত্রে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদের পর্য্যন্ত আহার শেষ হইলে, নিজে আহার করিতেন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

কলিকাতায় অবস্থান কালেই কি, আর সেরপুরে থাকা কালেই কি, যে কোনও ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই তর্কালঙ্কার মহাশয় শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহার অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর অবিচলিত চিত্তে প্রদান করিতেন ; এবং সম্ভবপর হইলে, প্রায়ই পরদিন সেই ভদ্রলোকের বাসায় যাইয়া নিজে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। যাঁহারা বন্ধুভাবে শুধু দেখা করিবার জন্যই তাঁহার বাসায় যাইতেন, পরদিন তাঁহাদের বাসায় একবার যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। দেশের কোনও আত্মীয় ব্যক্তি রুগ্ন হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতা গেলে, অথবা কেহ কোনও রোগী লইয়া কলিকাতা গেলে, তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক সময় নিজ বাসায় তাঁহাদিগকে স্থান দিয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, অনেক সময়ে পরিচিত চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া আত্মীয়ের উপকার করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র স্থানে রোগী থাকিলেও, অনেক সময় নিজে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছেন; তিনি যেন নিজের সামাজিক জীবনকে, নিজের দেশবাসীর মধ্যে বিকাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার মধ্যে সামাজিক জীবনের যে সমুন্নত আদর্শ অতি বিস্ময় ও ভক্তির সহিত অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার মত ভাষা আছে কি না জানি না, থাকিলেও, এ অকিঞ্চন প্রবন্ধলেখক সেই ভাষার সহিত পরিচিত নহে ; সে শুধু জানে, তেমন সৌজন্য, তেমন অমায়িক ব্যবহার বুঝি পৃথিবীর জিনিস নহে, বুঝি তাহা প্রাণে প্রাণেই শুধু অনুভব করিবার যোগ্য ; যে দেখিয়াছে, সে বুঝিয়াছে ; যে বুঝিয়াছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে ; যে মুগ্ধ হইয়াছে, সে শুধু অন্তরের দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে যেন, জন্মে জন্মে

এমন মহাপুরুষের চরণধূলি পাইয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

শশাঙ্ক

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে ফাসিয়ান্ বা ফাহিয়ান নামক চীন দেশীয় পরিব্রাজক তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ফাসিয়ানের পূর্ব্বে অন্য কোন চৈনিক শ্রমণ এদেশে আগমন করার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদনন্তর বহু চীন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইয়াংচোয়াং সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি স্থলপথে মঙ্গোলিয়ার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। খৃষ্টাব্দের ৬৩০ অব্দে ইয়াংচোয়াং, বোধ হয়, কপিশা প্রদেশের অন্তর্গত সলোক বিহারে বর্ষাবাস করেন। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্য সময়ে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। ইয়াং চোয়াং তাঁহার ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। জুলিয়ান সাহেব প্রথমে এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিয়ৎকাল হইল ওয়াটার্স সাহেব এই গ্রন্থের এক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইয়াং চোয়াং মহাযানসম্প্রদায়ী বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি যখন এদেশে আসেন, সে সময়ে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য উত্তরাপথে সম্রাট ছিলেন; কান্যকুব্জ নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

এই সময়ে দক্ষিণাপথে চালুক্য বংশীয় পুলকেশী (২য়) সম্রাট ছিলেন। শীলাদিত্যের সহিত সংঘর্ষে নর্ম্মদা নদী উভয়ের সাম্রাজ্যের সীমা অবধারিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী বাতাপিনগরের অধীশ্বর বলিয়া কথিত, কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ে, বোধ হয়, নাসিক তাঁহার রাজধানী ছিল। ইয়াংচোয়াং ৬৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজধানীতে আগমন করেন। বাতাপি এক্ষণ বাদামি বলিয়া কথিত হয়; এই স্থান বিজাপুর জেলায় অবস্থিত। ৬৪২ খৃঃ অব্দে কাঞ্চীনগরীর অধীশ্বর পল্লববংশীয় নরসিংহ বর্ম্মার সহিত যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশী মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ইয়াং চোয়াঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে বাঙ্গালা দেশের তদানীন্তন বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের বৃত্তান্ত ইয়াং চোয়াঙ্গের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাকবি বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের চরিত বর্ণনা করিয়া তিনি 'হর্ষচরিত' নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও শশাঙ্কের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাণভট্ট হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম', 'গৌড়ভুজঙ্গ' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন।

হর্ষচরিত, ইয়াং চোয়াঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত, রোটাস দুর্গে প্রাপ্ত একখানা শিলালিপি, মাধববর্ম্মার তাম্রশাসন এবং কতিপয় মুদ্রা শশাঙ্কের ইতিহাসের উপাদান।

হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ভাস্করবর্ম্মা কামরূপ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।

ইয়াং চোয়াং লবণনীল হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ২০০ লি পথ অতিক্রম করিয়া হিরণ্যপর্ব্বত (Ilana pofato) প্রদেশে আগমন করেন। ২০০ লি প্রায় ২০ ক্রোশ হইবে। ইয়াং চোয়াং লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশের পরিধি ৩০০০ লি হইতে অধিক; ইহার রাজধানীর পরিধি ২০ লি অর্থাৎ ২ ক্রোশ। ইহার উত্তরদিকে গঙ্গানদী প্রবাহিত। এই প্রদেশের এক বিহারে ভগবান্ তথাগত একবার বর্ষাবাস করেন। এই সময়ে বকুল নামক এক যক্ষ ভগবানের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল।

হিরণ্যপর্ব্বতের নাম পরে মুদ্গগিরি হইয়াছিল, বর্ত্তমান নাম মুঙ্গের। যে বিহারে বুদ্ধদেব বর্ষাবাস করেন, সে স্থানের

বর্ত্তমান নাম ইউরেন পর্ব্বত। (ক)। ইউরেন পর্ব্বত হিরণ্যপর্ব্বত শব্দের অপভ্রংশ। ওয়াডেল সাহেব ইউরেন পর্ব্বতের সংস্থান নির্ণয় করিয়াছেন (ক)।

ইয়াং চোয়াং লিখিয়াছেন যে, এই প্রদেশে তিনি আগমন করার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী অন্য প্রদেশের নিরপতি হিরণ্যপর্ব্বতের অধিপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন, এবং রাজধানীতে দুইটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এই প্রদেশ দান করিয়াছেন। এই দুই সঙ্ঘারামে প্রায় দুই সহস্র সর্ব্বাস্তি-বাদী সম্প্রদায়ী শ্রমণ বাস করেন।

ইয়াং চোয়াঙ্গের বর্ণনামতে হিরণ্যপর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে ৩০০ লির উর্দ্ধ ব্যবধানে গঙ্গানদীর দক্ষিণতটে (Champa) চম্পা প্রদেশ। এখানে কোন নরপতি ছিলেন, কি ছিলেন না, ইয়াং চোয়াং তাহা লিখেন নাই। চম্পার বর্ত্তমান নাম ভাগলপুর।

চম্পা হইতে পূর্ব্বদিকে ৪০০ লির অধিক ব্যবধানে কজঙ্গল (Kiechuwenkilo) প্রদেশ। কানিংহাম সাহেবের মতে কজঙ্গল বর্ত্তমান রাজমহল।

কজঙ্গল হইতে ইয়াং চোয়াং পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন এবং গঙ্গানদী পার হইয়া ৬০০ লির উর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া (Punnafatanna) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে আগমন করেন। এই প্রদেশ সম্বন্ধে শ্রমণবর লিখিয়াছেন যে, ইহার পরিধি ৪০০০ লি হইতে অধিক; রাজধানীর পরিধি ৩০ লি হইতে অধিক। এই প্রদেশের অধিবাসীগণের অবস্থা ভাল। এখানে স্থানে স্থানে জলাশয়, ধর্ম্মশালা, এবং পুষ্পোদ্যান দৃষ্ট হয়। এই প্রদেশের ভূমি সমতল; মৃত্তিকা রসাল। এস্থানের ভূমি উর্ব্বরা, প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে কাঁঠাল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বায়ু স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীগণ বিদ্যার আদর করিয়া থাকেন।

(ক) J. A. S. B 1. 892. p. 1.

Hanna = হিরণ্য; Profato = পর্ব্বত।

এস্থানে ২০টি সঙ্ঘারাম আছে; তাহাতে তিন সহস্র শ্রমণ আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কতক হীনযান এবং অবশিষ্ট মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে শতাধিক হিন্দু দেবালয় আছে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক দিগম্বর নির্গ্রন্থগণ বাস করেন (খ)।

রাজধানী হইতে ২০ লি পশ্চিমে এক মনোরম সঙ্ঘারাম আছে; ইহার কক্ষগুলি আয়তনে বৃহৎ; এখানে ৭০০ শ্রমণ বাস করেন। ইহারা সকলেই মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগের কতিপয় প্রসিদ্ধ শ্রমণ এখানে আছেন। সঙ্ঘারামের নিকটেই সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত এক স্তূপ আছে। যে স্থানে শাক্যসিংহ তিন মাস কাল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সেই স্থানের স্মরণার্থ এই স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই স্থানের নিকটে পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের পরিক্রমের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ইহার অনতিদূরে অবলোকিতেশ্বরের এক মন্দির আছে (গ)।

(খ) নির্গ্রন্থ শব্দে এখানে জৈন বুঝাইতেছে।

(গ) পূর্ব্বতন বুদ্ধগণ—কনকমুনি, ক্রকুচ্ছন্দ এবং কাশ্যপ।

কপিলবস্তু হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে ক্রকুচ্ছন্দের জন্মস্থান। যে স্থানে ক্রকুচ্ছন্দের জন্ম হয়, বুদ্ধ হওয়ার পরে প্রথমে যে স্থানে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং যে স্থানে তাঁহার পরিনির্বাণ হয়, সম্রাট অশোক এই তিন স্থানে তিনটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন এবং শেষোক্ত স্থানের স্তূপের সম্মুখে এক প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন; এই স্তম্ভ ২০ হাত উচ্চ; ইহার শীর্ষস্থানে একটি সিংহমূর্ত্তি ছিল।

কপিলবস্তু হইতে তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে একটি নগর ছিল। এখানে বুদ্ধ কনকমুনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থানে, বুদ্ধ হওয়ার পরে পিতার সহিত প্রথম সাক্ষাতের স্থানে, এবং তাঁহার পরিনির্বাণের স্থানে সম্রাট অশোক তিনটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত পরিনির্বাণ স্থানে একটি প্রস্তরময় ২০ফুট উচ্চ স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশেও একটি সিংহমূর্ত্তি ছিল।

ইয়াংচোয়াং এই সকল স্তম্ভ এবং স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে মোট ১৭টি অশোকস্তম্ভ দেখিয়াছেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পূর্ব্ব দিকে ৯০০লির উর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া ইয়াং চোয়াং এক বৃহৎ নদী পার হইয়া কামরূপে উপনীত হন। তথা হইতে তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ১২।১৩ শত লি অতিক্রম করিয়া (Sammotata) সমতট প্রদেশে আগমন করেন। সমতটের বিস্তৃতি এবং সংস্থান সম্বন্ধে শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে এই প্রবন্ধের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ইয়াং চোয়াং লিখিয়াছেন যে, সমতট প্রদেশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী; ইহা নিম্ন স্থান ; ইহার মৃত্তিকা রসাল। এই প্রদেশের পরিধি ৩০০০ লি হইতে উর্দ্ধ ; রাজধানীর পরিধি ২০ লি হইতে উর্দ্ধ। এখানে ৩০টি সঙ্ঘারাম আছে, তাহাতে দুই সহস্র শ্রমণ বাস করেন। ইহারা সকলেই স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত। দেবমন্দিরের সংখ্যা ১০০। দিগম্বর নিগ্রন্থগণের সংখ্যাও অধিক। রাজধানীর নিকটে অশোকের স্তূপ আছে। বুদ্ধদেব এখানে সাত দিন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। এই স্তূপের নিকটে এক সঙ্ঘারামে গাঢ় নীলবর্ণ প্রস্তরময় বুদ্ধদেবের এক মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তি ৮ আট হাত উচ্চ।

সমতটের উত্তরপূর্ব্বদিকে পর্ব্বতময় স্থানে শ্রীক্ষত্র প্রদেশ ছিল। তাহার দক্ষিণপূর্ব্বে এক উপসাগরতটে কামলঙ্কা প্রদেশ ; তাহার পূর্ব্বদিকে দ্বারবতী প্রদেশ ; তাহার পূর্ব্বদিকে ঈশানপুর প্রদেশ, তাহার পূর্ব্বদিকে মহাচম্পা প্রদেশ, এবং তাহার দক্ষিণপশ্চিমে যবনদ্বীপ প্রদেশ।

ইয়াং চোয়াং শ্রীক্ষত্র প্রভৃতি শেষোক্ত প্রদেশে গমন করেন নাই।

সমতট হইতে পশ্চিমদিকে ৯০০ লি ব্যবধানে (Tanmolipti) তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত প্রদেশ। ইহার পরিধি প্রায় ১৪০০ লি, রাজধানীর পরিধি দশ লি হইতে অধিক। রাজধানী সমুদ্রের এক খারির তটে অবস্থিত। ভূমি নিম্ন, রসাল; ফলপুষ্প প্রচুর। বায়ু উষ্ণ। অধিবাসীগণের আচরণ বিনয়শূন্য; কিন্তু তাহারা সাহসী। বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম্ম এ প্রদেশে প্রচলিত। দশটি সঙ্ঘারাম আছে, তাহাতে সহস্রাধিক শ্রমণ বাস করেন ; দেবমন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশ হইতে অধিক।

তাম্রলিপ্তের উত্তরপশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ প্রদেশ; তাম্রলিপ্ত হইতে অন্যূন ৭০০ লি ব্যবধান। এই প্রদেশের পরিধি প্রায় ৪৪৫০ লি; রাজধানীর পরিধি ২০ লি হইতে অধিক। এখানের অধিবাসীগণের বসতি ঘন এবং তাহারা ধনী, সচ্চরিত্র এবং শিক্ষিত। এ স্থানের বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। ফল ও পুষ্প প্রচুর উৎপন্ন হয়। এখানে দশটি সঙ্ঘারামে দুই সহস্র শ্রমণ আছেন। তাঁহারা সম্মতীয় সম্প্রদায়ী। দেবমন্দিরও পঞ্চাশটি আছে। এখানে দেবদত্তের মতাবলম্বী শ্রমণগণের তিনটি সঙ্ঘারামে আছে (ঘ)। ইহারা দুগ্ধ এবং দুগ্ধোৎপন্ন কোন বস্তু পান বা আহার করেন না।

রাজধানীর নিকটেই- রক্তমৃত্তিক নামক প্রসিদ্ধ বিহার। এখানে বহু প্রসিদ্ধ শ্রমণ আগমন করিতেন। দক্ষিণাপথ হইতে পূর্ব্বকালে একজন বৌদ্ধ শ্রমণ এবং একজন জৈন যতি এই স্থানে আগমন করেন। উভয়ের মধ্যে তর্কের বিচার হয়;

শ্রাবস্তী হইতে ৬ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে কাশ্যপ বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণস্থানে এবং বুদ্ধ হওয়ার পরে তিনি যে স্থানে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেস্থানে সম্রাট অশোক দুইটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথের সঙ্ঘারামে তিনি বাস করিতেন ; এই সময়ে কিকি নামে এক ব্যক্তি বারাণসীর নরপতি ছিলেন। বোধিদ্রুমের অনতিদূরে উত্তরপশ্চিম দিকে কাশ্যপ বুদ্ধের এক মন্দির ছিল। বুদ্ধগয়ার নিকটে যে স্থানে কাশ্যপবুদ্ধ সমাধিতে বসিয়াছিলেন, সেস্থানে সম্রাট অশোক এক প্রস্তরময় স্তম্ভ স্থাপনকরেন।

শুদ্ধোদনতনয় সিদ্ধার্থে চতুর্থ বুদ্ধ। পঞ্চম এবং শেষবুদ্ধ মৈত্রেয় ; তিনি অদ্যাপি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

(ঘ) দেবদত্ত সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র ; ইনি বৌদ্ধ সঙ্ঘে কলহ জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবদত্ত সিদ্ধার্থকে বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি কাশ্যপ, ক্রকুচ্ছন্দ, এবং কনকমুনি, এই তিন জনকে বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।

বিচারে শ্রমণ জয় লাভ করেন। এজন্য এই প্রদেশের তদানীন্তন নরপতি এস্থানে এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। এই বিহারের নিকটে সম্রাট অশোকের সময়ের অনেকগুলি স্তূপ ছিল। ভগবান্ তথাগত এস্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

কর্ণসুবর্ণ হইতে ইয়াং চোয়াং উড়িষ্যা প্রদেশে গমন করেন।

চীন পরিব্রাজকের বৃত্তান্তে দৃষ্ট হয় যে, এই সময়ে বাঙ্গালাদেশ চারি প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথাঃ—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত, এবং কর্ণসুবর্ণ। বাঙ্গালার বৃত্তান্ত মধ্যে ইয়াং চোয়াং কোন প্রদেশের কোন নরপতির নামের উল্লেখ করেন নাই; অথবা এই চারি প্রদেশের কোন রাজনৈতিক বৃত্তান্ত লিখেন নাই। তিনি তীর্থদর্শন, বৌদ্ধ-ইতিহাস সঙ্কলন, এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য অতি কষ্টে পদব্রজে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তৎকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা অবগত হওয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের নরপতির বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী; এইজন্য প্রসঙ্গক্রমে স্থানান্তরে তাঁহার নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়াং চোয়াং যে প্রদেশ কর্ণসুবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ প্রদেশের নাম রাঢ় প্রদেশ, ইহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণের ভগ্নাবশেষ এখন রাঙ্গামাটি (রক্তমৃত্তিক) বলিয়া কথিত হয়; ইহা মুর্শিদাবাদ হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে। ঘটকদিগের গ্রন্থে কানসোনা বলিয়া কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে শশাঙ্ক রাঢ় প্রদেশের নরপতি ছিলেন। একখানা শিলালিপি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, পুর্ব্বে শশাঙ্ক একজন সামন্ত ছিলেন।

খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরে রাজত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার পুত্র সুবিখ্যাত সমুদ্রগুপ্তের কাহিনী প্রয়াগের অশোকস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে। সমুদ্রগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, তদনন্তর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত, তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্কন্দগুপ্ত এবং তদভাবে দ্বিতীয় পুত্র পুরগুপ্ত; তদনন্তর পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, তদভাবে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

বর্ণিত গুপ্ত সম্রাটগণ ব্যতীত আরও কতিপয় গুপ্ত নরপতির বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে এই গুপ্তগণ বোধ হয় সামন্ত ছিলেন, পরে গুপ্ত সম্রাটগণের অভাবে শেষোক্ত গুপ্ত নরপতি আদিত্য সেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। শেষোক্ত গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণগুপ্ত, হর্ষগুপ্ত, জীবিতগুপ্ত (১ম), কুমারগুপ্ত (৬), দামোদরগুপ্ত, মহাসেনগুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত 'নৃপ' বা 'ভূপতি' উপাধি গ্রহণ করিতেন। গয়া জিলার অফ্‌সড় শিলালিপিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন। আদিত্য সেনের পরে এই বংশে দেবগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত, এবং দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের নাম পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত পর্য্যন্ত নৃপগণ পরবর্ত্তী গুপ্তবংশ বলিয়া কথিত হন।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, শশাঙ্ক পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয় মহাসেন গুপ্তের পুত্র নরেন্দ্রগুপ্ত; তাঁহার মতে নরেন্দ্রগুপ্ত এবং শশাঙ্ক অভিন্ন ব্যক্তি।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ডাক্তার বুলার বলিয়াছেন যে হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে রাজ্যবর্দ্ধন-নিহন্তার নাম নরেন্দ্রগুপ্ত লেখা আছে। হর্ষচরিতের প্রচলিত গ্রন্থে রাজ্যবর্দ্ধন-নিহন্তা শশাঙ্ক বলিয়া লেখা আছে। ডাক্তার বুলার কোন পুথিতে সে স্থলে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম দেখিয়া থাকিলে, তাহা লিপিকরপ্রমাদও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর যে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নহে। অতএব শশাঙ্ককে নরেন্দ্রগুপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না (১)।

---

(৬) ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্তদ্বয় হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস ৮০। ৮১। ৮২ পৃষ্ঠা।

গৌড়রাজমালালেখক শশাঙ্ককে নরেন্দ্রগুপ্ত প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করেন নাই।

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ শশাঙ্ককে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধিপতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা প্রকৃত নহে। রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃত অভিধানে 'গৌড়' শব্দের পর্য্যায়ে 'পুণ্ড্র' 'বরেন্দ্র', এবং 'নীবৃৎ' লেখা আছে (২)। ইহা সমর্থন করার জন্য তিনি ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা,—

'পুণ্ড্রাঃস্যু বরেন্দ্রী গৌড় নীবৃতি'। এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে গৌড়দেশের অন্তর্গত বরেন্দ্রই পুণ্ড্র।

সকলেই অবগত আছেন, সংস্কৃত ভাষায় অমরকোষের আসন সমস্ত অভিধানের উপরে। ত্রিকাণ্ড বলিতে অমরকোষ বুঝা যায়। অমরের বহুকাল পরে পুরুষোত্তম অমরের পরিশিষ্ট-স্বরূপ যে অভিধান রচনা করেন, তাহার নাম ত্রিকাণ্ডশেষ।

অমর বলেন :—

"নীবৃজ্জনপদোদেশ বিষয়োত্তুপবর্ত্তনম্।"

ভূমিবর্গঃ।

দেখুন, 'নীবৃৎ' শব্দে দেশ, জনপদ বুঝায়।

জৈন যতি হেমচন্দ্র বলেন :—

'দেশোজনপদোনীবৃৎ রাষ্ট্রনির্গশ্চ মণ্ডলম্।"

অভিধানচিন্তামণি।

দেখুন, নীবৃৎ শব্দের পর্য্যায় কি?

ত্রিকাণ্ডশেষের বাক্যের অর্থ এই :—

গৌড়নীবৃতি গৌড়দেশে পুণ্ড্রাঃ স্যুঃ বরেন্দ্রীঃ।

উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে মহানন্দা, দক্ষিণে পদ্মাবতী, পূর্ব্বে করতোয়া, এই স্থান বরেন্দ্র প্রদেশ। প্রাচীন গৌড়নগর অর্থাৎ লক্ষণাবতী বরেন্দ্র প্রদেশের অন্তর্গত নহে। গৌড় বলিতে বরেন্দ্র বুঝায় না।

বরেন্দ্রঅনুসন্ধানসমিতির কর্ণধার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মৈত্রেয় মহাশয় বলেন,

"বাঙ্গালাদেশের সকল অংশের সাধারণ নাম 'গৌড়দেশ'; সকল অংশের সকল বাঙ্গালির সাধারণ নাম 'গৌড়জন'।"

সাহিত্য, ১৩১৯।৯৪১ পৃষ্ঠা।

"বাঙ্গালাদেশের প্রকৃত নাম গৌড়"।

প্রকৃতিবাদ অভিধান

পঞ্চগৌড় বলিতে বুঝায় এই :—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যাসোত্তরবাসিনঃ॥"

"নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তম।"

লিঙ্গপুরাণ।

শ্রাবস্তী নগর অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। গুপ্তসম্রাটগণ প্রথমতঃ পাটলিপুত্র নগরে রাজত্ব স্থাপন করেন; পরে রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে স্থাপিত হয়। ভগবান্ সুগতের সমসাময়িক প্রসেনজিতের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে ছিল। প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক কপিলবস্তু নগর ধ্বংস করেন। শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ গোরক্ষপুর হইতে ৩৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে নেপালগঞ্জের উত্তরপূর্ব্বে অচিরবতী নদীর তটে। ইহা এক্ষণে নেপালপ্রদেশের অন্তর্গত। অচিরবতী নদীর বর্ত্তমান নাম রাপ্তি নদী।

"অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বীনাম নগরী।"

বিষ্ণুশর্ম্মা

কেহ কেহ বলেন যে, কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে কোশাম্ বলিয়া কথিত হয়। কৌশাম্বী প্রয়াগ হইতে ১৪ ক্রোশ অন্তরে যমুনাতটে অবস্থিত ছিল। বাস্তবিক কৌশাম্বীর সংস্থান নির্ণয় হয় নাই।

"গৌড়ান্তর্গতকান্ত বিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে"

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত বৈদিক কুলমঞ্জরী।

ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌড় বরেন্দ্রীর পর্য্যায় হইতে পারে না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

(২) গৌড়রাজমালা, ৭ পৃষ্ঠা

কাল বৈশাখী

এখনো নিবে নি তার চিতার আগুন,
সে যে ছিল বসন্তের ফুলন্ত ফাগুন ;
শিমুলে সিন্দুর তার আজো লেগে আছে,
অঙ্গের লাবণী জাগে অশথের গাছে ;
দাড়িম্বে রয়েছে তার তাম্বুলের রাগ,
অশোকে কিংশুকে লাল আল্‌তার দাগ !

সেই দিন রাঙ্গা সাঁজে—চৈত্রের চিতায়
শোয়ায়ে রেখেছি মোর সোনার সীতায় !
কেন আর মিছা সখা কর ঘটকালি,
নিয়ে যাও বেলা-যূঁই-মল্লিকার ডালি ;
প্রাণের পেয়ালা ভাঙা—চলে গেছে সাকী,
ছুঁও না, ছুঁও না মোরে, হে কাল বৈশাখী !

শ্রীকুলচন্দ্র দে ।

সম্পদ লক্ষ্মীর ব্রত

এক রাজা আর রাণী পাশা খেলেন। রাজা পণ করিলেন, খেলায় যদি রাণী জিতেন, তবে রাণীকে সোনার পুরী তৈয়ার কইরা দিবেন। খেলায় রাণীই জিতিলেন। কয়েক দিন যায়, রাণী বল্লেন, কই, আমারে না সোনার পুরী তৈয়ার কইরা দিবেন ? রাজা কামার ডাইক্যা পুরী তৈয়ার কইরা রাণীকে বল্লেন, দেখ গিয়া তোমার পুরী তৈয়ার হৈছে। রাণী সইকে নিয়া সোনার পুরী দেখ্‌তে গেল ; সোনার পুরী দেইখা সই বল্ল, রাণী, তোমার সম্পদ আমারে দেও, আমার বিপদ তুমি নেও। রাণী তখন আইচ্ছা বইলা, তার সম্পদ সইকে দিল সইর বিপদ নিজে লইয়া বাড়ী আস্‌তে রাজার সঙ্গে দেখা হইল। রাণীর হাতে ছিল সম্পদলক্ষ্মী বর্ত্তের ডোর। সম্পদ লক্ষ্মীর ছলনায় রাজার মনে অহঙ্কার হইল। আমি অত বড় রাজা, আমার রাণীর হাতে সুতার ডোর ! এই বইলা ডোর-গাজ টাইনা ছিঁরা ফেল্লেন। এই হইতে তাগর নানারকম বিপদ হইতে লাগ্‌ল। রাজার হাতীশালে হাতী মরে—ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে।—রাজ্যের লোকজন, ধনদৌলত যত আছে, সব বিনাশ হইল। রাজার হাতে গোদ, পায়ে গোদ, চোকে ঢেলা, কাণে ঘাঁ হইল। পুরীতে খস্‌খইসা লতের ঝাড়, গুণালতের ভার বাঁধল। এই পুরীতে আর থাক্‌তে না পাইরা রাজা বল্লেন, চল, মহাদেবী ! তোমার মা-বাপের বাড়ীতে যাই। মা-বাপের বাড়ী গিয়া দাসদাসীকে বল্ল, তোমার ঠাকুর ঠাইরেনরে বল গিয়া, তাগর ঝি-জামাই আস্‌ছে। দাস-দাসী গিয়া খবর দিল—আপনাগো ঝি নাকি কে—জামাই নাকি কে—তারা আইছে। মা-বাপ আইসা দেইখা বল্ল, এই বুঝি আমার ঝি ! আর, এই বুঝি আমার জামাই ! আমার যে দিন ঝি-জামাই আবে, সে দিন সোনার দোলা আবে, সোনার ঘোড়া আবে। হাস-হাসী কেলি করবে। ময়ূর পেখম খুল্‌বে। তপী নৃত্য কর্‌বে। গন্ধর্ব্বে গীত গাইবে। দাস-দাসী বাতাস কর্‌বে। শাঁখারী শাঁখা বানাইবে। বাইনা ঘর বানাইবে। দুধের পুষ্করিণী দিবে। কড়ির জাঙ্গাল দিবে। কাপড়ের আঙ্গারী টানাবে; তবে ত আমার ঝি-জামাই আবে। কই থাইক্কা জানি এক বেটা-বেটী আইছে। একসের চা'ল দেও, আজ্ঞের ডাইল দেও, এক বেনুনের লবণ দেও, এক বেনুনের তেল দেও, এক বেনুনের মরিচ দেও, এক পাজা লাকড়ি দেও, একটা পাতিল দেও, বাইর মণ্ডবে বাসা দেও, রাইত পোয়াইলে বিদায় দাও। রাজা এইগুলি পাইয়া, মণ্ডবে এক গাতার ভিতর রাইখা তার উপরে মাটী দিল্লেন। আর রাণীকে বল্লেন, সম্পদের বার ভাই, বিপদের কেউ নাই। আপনার সম্পদ পরকে দিলাম, পরের বিপদ আইনা বিড়ম্বনা পাইলাম। চল রাণী, তোমার কন্যার বাড়ী যাই। কন্যা, মাসী, পিসি, সই, সবের বাড়ী হইতেই এ রকমে ফেরৎ আইলেন। তখন আর কোন উপায় না দেইখা রাজা তান্ বন্ধুর বাড়ী গেলেন। গিয়া দাস-দাসীকে বল্ল, তোমাগর ঠাকুর ঠাইরেনরে বল গিয়া, তাদের বন্ধু-বন্ধাইন আইছে। তারা গিয়া খবর দিল। রাজার বন্ধু আইসা রাজারাণীকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। রাণী

তার বন্ধুর ছাওয়াল তুইলা কোলে লইলেন। রাণীর ছোঁয়ায় ছাওয়ালের গায়ের সোনার অলঙ্কার রাঙ হইয়া গেল। রাণী রাজাকে গিয়া বল্ল, আমি বন্ধুর ছাওয়াল তুইলা কোলে কর্‌তেই ত তার গায়ের সোনার অলঙ্কার রাঙ হইয়া গেল। বন্ধু না জানি কয় যে, আম্‌রা বিপদে পইরা সোনার অলঙ্কার নিয়া রাঙের অলঙ্কার বদলাইয়া দিছি। চল, আমরা এইখান হইতে চইলা যাই। তখন রাজারাণী এক পুষ্করণীর পাড়ে গিয়া বইসা রইলেন। কয়জন দাসী সেই ঘাটে জল আনতে গেছে। রাজারাণী তাগরে বল্ল—ওগো, তোম্‌রা কার দাসী? বুড়া এক দাসী বল্‌ল, আমরা অই বেশ্যার দাসী। আচ্ছা বুড়া, তুমি গিয়া তোমার ঠাইরানকে বল, আমাদের রাখেন কি না। বুড়া দাসী গিয়া বেশ্যাকে বলিল, পুকুরপারে দুই জন লোক বইসা আছে। তাদেরে রাখবেন কি না, তারা জানতে চাইছে। বেশ্যা বল্ল, আচ্ছা নিয়া আইস। বুড় দাসী গিয়া রাজারাণীকে লইয়া আইল। বেশ্যা রাজাকে জিগাইল, তুমি কি কাজ কর্ত্তে পার। রাজা বল্লেন, হাট কর্‌তে পারি, বাজার কর্ত্তে পারি, এক টাকা দিয়া পাঁচ টাকার সদায় কিনতে পারি। রাণীরে জিগাইল, তুমি কি কর্ত্তে পার গো। রাণী বল্ল—চুল বান্‌তে পারি, সাজ করাইতে পারি, অলঙ্কার মাজতে পারি, ঘর শুরতে পারি, কেবল কেওর পাতের আইটা খাই না—কেবল কেওর পাতের আইটা ছুঁই না। বেশ্যা বল্ল, আচ্ছা বেশ থাক। এই দিন চৈত্র মাসের সংক্রান্তি, আজ সম্পদলক্ষ্মীর বর্ত্ত। বেশ্যা রাজাকে বাজারে পাঠাল। রাণীকে বল্ল গয়না মাজতে। রাণী ঘর শুর্‌তে দেখ্‌লেন, একটু পিটালি পড়ে আছে। রাণী ডাইন হাতে ঘর সুরতে সুরতে বাঁ হাতে বাসী পিটালীটুক দিয়া এক ময়ূর বানাইল। ময়ুর গিলা গয়না গিয়া ফেল্ল। রাণী ত দেইখা তাজ্জব। বেশ্যার কাছে গিয়া বল্ল—ঠাইরেন গো, ভয়ে বলুম্ না নির্ভয়ে বলুম্। বেশ্যা কইল—নির্ভয়ে কও। রাণী কইল—আমি পিটালী দিয়া একটা ময়ূর বানাইছিলাম। সেইটা গিয়া আপ্‌নার গলার হার ছড়া খাইয়া ফেল্‌ছে। বেশ্যা এই কথা বিশ্বাস করলনা; রাগের চোটে রাণীকে মাইরা, বইকা বাইর কইরা দিল। রাণী গাঙ্গের পার গিয়া বইসা রইল। রাজা গাঙ্গ পার গিয়া বল্লেন, উঠ ছান্ কর। চল, বাড়ী যাই। রাণী বল্ল, আমি আর এই বাড়ী যামু না। রাজা বল্লেন, কি করবে।—আপনার সম্পদ পরকে দিলাম, পরের বিপদে বিড়ম্বনা পাইলাম। যে আছিল আমার দুয়ারের বেশ্যা, তার গুণে হইল প্রাণরক্ষা। এখন উঠ—চল যাই। অনেক সাধাসাধির পর রাণী উঠে ছান করতে গাঙ্গে গেল। সেখানে রাণী দেখ্‌ল, কয়জন বর্তি সম্পদলক্ষ্মীবর্ত্ত কইরা সেই ঘাটে নির্ম্মালি ফালাইতে আসছে। রাণী জিগাইল, তোম্‌রা কি বর্ত্ত কর্‌ছ গো। তারা বল্ল—সম্পদ লক্ষ্মীর বর্ত্ত। রাণীর তখন সম্পদ লক্ষ্মীর বর্ত্তের কথা মনে হইল। রাণী বল্ল, অখন কৈ আর কি পাইবেন। এই দেখেন গাঙ্গ দিয়া একটা সূতার নাটাই ভাইসা যায়। আমারে নাটাইটা আইনা দেন। রাজা সাতার দিয়া সূতার নাটাই আইনা দিলেন। রাণী তখন ৩০ ত্রিশ নাল সূতা লইয়া একটা ডোর তৈয়ার কল্ল। বর্ত্তের আর আর জিনিস কৈ পাইবেন? সম্পদ লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে পন্নাম কইরা ডোর হাতে দিলেন। ডোর হাতে দিতেই সম্পদলক্ষ্মীর কৃপা হইল। সোনার দোলা, সোনার ঘোরা রাজারাণীর জন্য আইসা উপস্থিত হইল। রাজা বল্লেন, চল আমরা বেশ্যার সঙ্গে দেখা কইরা যাই। রাজারাণী বেশ্যার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেল। আর বল্ল—আমরা ত বাড়ী যাইতে চাই। বেশ্যা বল্ল, বাড়ী যাইতে চাও, যাও। তখন রাণী পিটালীর ময়ূরের পেটটা ছিড়্যা সোনার হার ছড়া বাইর কইরা দিয়া তারা বিদায় হইল। বেশ্যা তাহার পাছে পাছে লোক পাঠাইয়া বল্ল, দেখ, তারা কিছু নিয়া টিয়া যায় নি। লোক গিয়া দেখে যে, তারা রাজ্যের রাজারাণী। তখন দৌড়াইয়া আইসা বেশ্যাকে বল্ল—অরা ত আর কেওই নয়—তারা যে রাজা আর রাণী। তখন বেশ্যা গলবস্ত্র হইয়া রাজারাণীর পায়ের তলে পল্ল, আর বল্ল—রাজা মশয়! পরিচয় দিতেন, তবে ভাণ্ডারী রাইখা দিতাম তেল দিতে, দাই রাইখা দিতাম জল দিতে, গাই রাইখা দিতাম দুধ খাইতে। না জানাইয়া

কেন আমার এমন আক্কল দিলেন! অখন আমারে কি করবেন, করেন। রাজা বল্লেন, সঙ্গের বেশ্যা সঙ্গে লও। রাজারাণী রওনা হইলেন। রাজা বল্লেন, চল তোমার মা বাপের বাড়ী হইয়া যাই। মা-বাবার বাড়ী গিয়া দাসদাসীরে বল্লেন, খবর দেও। মা-বাবা আইসা দেইখা বল্ল, এই ত আমার ঝি, এই ত আমার জামাই আস্‌ছে! এই ত দেখ্ সোনার দোলা—সোনার ঘোড়া আস্‌ছে। হাস হাসী কেলি করছে। ময়ুর পেখম ধরছে। তপা নৃত্য করছে। গন্ধর্ব্ব গীত গাইছে। দাসদাসী বাতাস করছে। শাঁখারী শাঁখা বানাইছে। বাইনা ঘর বানাইতেছে। দুধের পুষ্করিণী হইছে। কড়ির জাঙ্গাল দিছে। কাপড়ের আঙ্গারী টানাইছে। এই ত আমার ঝি-জামাই আস্‌ছে। সপ ফেল, পাটী ফেল। ঝিক বসাও—জামাইক বসাও। মেড়া মার, খাসী মার, ঝিক খাওয়াও—জামাইক খাওয়াও। বুচকা বইরা কাপড় আন, বাটা ভইরা টাকা আন, ঝিক দেও, জামাইক দেও। রাজা বল্লেন, বুচকা ভইরা কাপড়, বাটা ভইরা টাকা দিয়া কি করুম্? মেড়া খাসী খাইয়া কি করুম্? সপের মধ্যে, পাটীর মধ্যে বইসা কি করুম্? বিপদে পইরা আসছিলাম, একসের, চাইল, আজ্জের ডাইল, এক বেমুণের তেল, এক বেণুণের মুণ, এক বেমুণের মরিচ, এক পাজরা লাকরী, একটা পাতিল দিছিলা। বাইর মণ্ডপে বাসা দিছিলা—রাইত পোয়াইতে বিদায় দিছিলা। তোমার জিনিস তুমি নেও। মণ্ডপ ঘরের মাইজাল হইতে জিনিসগুলি তুইলা—রাণীর মা বাপরে দিয়া বল্লেন, সম্পদের বার ভাই, বিপদের কেওই নাই। আপনার সম্পদ পরকে দিলাম, পরের বিপদে বিড়ম্বনা পাইলাম। যে আছিল আমার দুয়ারের বেশ্যা, তার গুণে হইল প্রাণ রক্ষা! চল মহাদেবী, তোমার কন্যার বাড়ী যাই। এম্‌নে এম্‌নে কন্যা, মাসী, পিসি, সই, সক্কলের বাড়ী হইতে দেখা কইরা—শেষে বন্ধুর বাড়ী গেল। দাস দাসী গিয়া খবর জানাইল। বন্ধু বন্ধাইন আইসা রাজারাণীরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। আর বল্ল, বন্ধু! সেইবার আসছিলেন, না কইয়া চইলা গেলেন; এই বার কয়দিন থাইকা যান! সপ্ পাইরা পাটী পাইরা, বসাইলেন, মেড়া খাসী মাইরা খাওয়াইলেন। বুচকা ভইরা কাপড়, বাটা ভইরা টাকা দিলেন। ব্যাভার আচার করলেন। তার পর রাজা রাণী বাড়ী গেলেন। এই দিন বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি। রাণী বল্লেন, আজ আমার সম্পদ লক্ষ্মীর বর্ত্ত। কি কি লাগবে, রাজা জিজ্ঞাস্ করলেন। পান, সুপারী কলা, নাইরকল, আতপ চাউল, মিঠাই, মণ্ডা, দই, দুধ, যা যা লাগবে, রাণী সব বল্ল। এইবার সোনার ডোরের কথাও কইল। রাণী বর্ত্তের আয়োজন করলেন। ব্রাহ্মণ আইসা পূজা কইরা দক্ষিণা লইয়া গেলেন। রাণী তার পর রাজার "বানা" দিলেন। রাজার হাতের গোদ, পায়ের গোদ, চোখের ডেলা, কানের ঘাঁও সব গেল। আর সেই বাড়ী, সেই ঘর, সেই পুরী, সেই লোকলস্কর সব হইল। রাণী এখন বৎসরে বৎসরে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে ৩০টা পান, তিন ৩০টা সুপারী ৩০ গাছ দূর্ব্বা, ৩০টা তুলসী পাতা, ৩০ টা লাড়ু, ৩০টা লাল সূতার ডোর দিয়া বর্ত্ত কইরা ডোর হাতে দেন, বৈশাখ মাস ভইরা "কথা" কন। তারপর বৈশাখের সংক্রান্তির দিন তিন ৩০টা পান, তিন৩০টা সুপারী, ৩০টা তুলসী পাতা, তিন ৩০টা লাড়ু, তিন ৩০গাছ দূর্ব্বা তিন ভাগে দিয়া বর্ত্ত করেন। হাতের ডোরসহ—জলনারায়ণের ভাগ জলে ভাসান। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভাগ দিয়া রাজারে 'বানা' দেন। সম্পদ লক্ষ্মীর ভাগ নিজে নেন। যে এই ব্রত করে, তার বিপদের ভয় নাই—সুখে সম্পদে দিন কাটে।

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন।

সোসিয়ালিজ্‌ম্

(৬)

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি ও সোসিয়াল্ ডিমক্রেশী

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি—আন্তর্জাতিকতা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমাদের মনে কোনও প্রবল ভাবতরঙ্গের উদয় হইলেই, উহা দেশ ও সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দুরদুরান্তরে আঘাত করিয়া থাকে। বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ভাববিনিময় আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। উত্তর ভারতের একটী নগণ্য পল্লীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার হইলেও, পৃথিবীর একতৃতীয়াংশ লোক আজও ভক্তিভরে মহাত্মা শাক্যসিংহের চরণে প্রণত হইতেছে। তবে, সেকালে যখন সর্ব্বত্র যাতায়াতের কোনও সুবিধা ছিল না, আজকালকার মত টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, তখন এই আন্তর্জাতিকতার গতিবেগ তাদৃশ প্রবল ছিল না; কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার শক্তি ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইউরোপে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে, "শিল্প-বিপ্লবের" সূচনা হয়, এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শ্রমজীবীগণের অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধি ও মূলধনী সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান্ নির্ভরতার বিষয় প্রথম অধ্যায়েই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। টাকা থাকিলে, লোকে নানা রকমেই সুখ সুবিধা করিয়া লইতে পারে। নূতন সৃষ্ট মূলধনীসম্প্রদায়ও এ বিষয়ে কিছুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। মজুরদের সহিত সামান্য একটু গোলমাল হইলেই, অর্থশালী মূলধনীরা অন্য দেশ হইতে সস্তায় মজুরের আমদানী করিয়া ঠেকা কাজ চালাইয়া লইতেন। সকল দেশের মূলধনীদেরই একই প্রকার স্বার্থ; শ্রমজীবীগণকে সর্ব্বদা পদানত, ও তাহাদিগকে যতদূর সম্ভব কম মজুরী দিতে পারিলেই, ইঁহাদের লাভ; সুতরাং প্রথম হইতেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মূলধনীরা মজুর-মুনীব গোলমালে পরস্পর একজোট হইয়া কাজ করিতেন। ফলে, শ্রমজীবীদের সমস্ত দাবী দাওয়া ও অভাব অভিযোগ ক্রমেই পদদলিত হইতে থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পদে পদে এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়া শ্রমজীবীরা ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, তাহারাও যদি মূলধনীদের মত সকলে একমত ও একজোট হইতে পারে, তবেই তাহাদের মুক্তি সম্ভবপর হইবে। কিন্তু কোনও বিষয়ে একটা ধারণা করা, ও সেই ধারণা কার্য্যে পরিণত করা, এতদুভয়ে যথেষ্ট পার্থক্য। যাহাদের অধিকাংশই একেবারে অক্ষরজ্ঞানহীন, এবং যাহাদিগকে প্রতিদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই পেটের ভাতের জন্য পরের নিকট হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহাদের পক্ষে অন্নদাতা মূলধনীসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হইয়া কাজ করা কতদূর কষ্টসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। কার্‌ল্ মার্ক্সের দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং এই জন্যই সোসিয়ালিজ্‌মের ইতিহাসে তাঁহার স্থান এত উচ্চ।

অনিয়ন্ত্রিত শাসনপ্রথার পক্ষপাতী রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক ফরাসীবিপ্লবের দমন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরোপ হইতে গণতান্ত্রিক মতের এককালীন উচ্ছেদ হয় নাই। স্বেচ্ছাচারী নৃপতিবর্গও ইহা বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন এবং স্ব স্ব রাজ্য হইতে সাধারণতন্ত্রমতাবলম্বীগণকে নিষ্কাশিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের শাসন-দণ্ডের মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম ছিল না। জার্ম্মাণি, রুশিয়া, ও অষ্ট্রিয়াতেই এই অনিয়ন্ত্রিততার মাত্রা কিছু চরমে পৌঁছিয়াছিল। এই জন্য এই সমস্ত দেশের সাধারণতন্ত্রমতাবলম্বী অনেককেই স্বেচ্ছায় বা রাজাজ্ঞায় মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইতে হয়; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীনগরীই এই নির্ব্বাসিত সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা ছিল।

প্যারীনগরবাসী নির্ব্বাসিত জার্ম্মাণগণ ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে "ন্যায়পন্থী সঙ্ঘ" (The League of the Just) নামে একটী গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করে। ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রচলিত শাসনব্যবস্থাসমূহের উচ্ছেদ সাধনই ইহার প্রধান মতলব ছিল। কিন্তু ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের প্যারীর

প্রজাবিদ্রোহের সহিত জড়িত হইয়া পড়াতে, ফরাসী গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ফরাসী রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হয়। তখন ইহারা লণ্ডনে আড্ডা গাড়ে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই সময়ে ইংলণ্ডেও অনেক নির্ব্বাসিত জার্ম্মাণ অবস্থান করিতেছিল। লণ্ডনে আসিবার পর, ইহাদের সহিত ষড়যন্ত্রকারীদের আলাপ পরিচয় ও যুক্তি পরামর্শ হয়। তাহার ফলে গুপ্তসমিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। বিপ্লবপন্থীগণ এতদিনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা দুই একটী আকস্মিক বিদ্রোহ সংঘটিত করিতে পারিলেই, তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত আবশ্যক, কিন্তু উহারা এক্ষণে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে; সুতরাং তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, জনসাধারণকে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করা,—তাহাদের হৃদয়ে অভিনব আশা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা। এবং একমাত্র প্রচারকার্য্য দ্বারাই ইহা সম্ভাবিত হইতে পারে।

এই সময়ে ইহারা মার্ক্সেরও প্রভাবাধীনে আসে। এই সময়ে মার্ক্স প্রচার করিতেছিলেন যে, সামাজিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা সময়ে সময়ে সম্প্রদায়বিশেষের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এবম্বিধ পরিবর্ত্তন ঐ সম্প্রদায়ের ক্রমবিকাশের ধারার অনুকূল হওয়া চাই; নতুবা এতদ্দ্বারা হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা। ক্রমাভিব্যক্তির এই ধারা বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ঐ সম্প্রদায়ের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস বিশেষরূপে জানা দরকার। অতএব জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ও তাহাদের ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতে হইলে, তাহারা পূর্ব্বে কি ছিল, এবং এক্ষণে কেনই বা এমন হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। উহাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মার্ক্স বলেন যে, দারিদ্র্যই ইহার মূল হেতু। সুতরাং উহাদের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাহাদের ধনাগমের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে নিয়ত পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিতে না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মার্ক্সের মতবাদের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া "ন্যায়-পন্থী"গণ তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার করিতে থাকেন, এবং পরিশেষে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডন সহরে উভয় পক্ষের একটী মন্ত্রণা-সমিতির অধিবেশন হয়। এই মন্ত্রণার ফলে "শ্রমজীবী-সঙ্ঘ" (The Communist League) নামে একটী সমিতি স্থাপিত এবং মার্ক্স ও এন্‌জেল্‌সের প্রতি উহার কার্য্যপদ্ধতি ও নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার অর্পিত হয়। এই মন্ত্রণা-সমিতির অনুষ্ঠানপত্রের প্রথম দফায় লিখিত হইয়াছে যে, "বর্ত্তমান সমাজ-সৌধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজে এরূপ কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা থাকিবে না,—উহাতে সকলেরই তুল্য অধিকার ও আধিপত্য থাকিবে। সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিতে হইবে এবং কাহারও কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না।" ইহা হইতেই শ্রমজীবী-সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্যও অনেকটা বুঝা যাইবে।

মন্ত্রণা-সমিতির আদেশক্রমে মার্ক্স ও এনজেল্‌স্‌ এক প্রচারপত্র প্রণয়ন করেন। ১৮৪৮খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ইউরোপীয় প্রজাবিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হয়, এবং সোসিয়ালিজ্‌মের ইতিহাসে ইহাই ১৮৪৭ অব্দের প্রসিদ্ধ ঘোষণাপত্র নামে পরিচিত। ইহাতে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মনুষ্য সমাজে সম্প্রদায়বিভাগ আবহমান কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও, বর্ত্তমান সময়ে বহুবিধ কার্য্যকারণপরম্পরার সমবায়ে সমগ্র সমাজ দুইটীমাত্র পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হইয়াছে,—অর্থশালী মূলধনীসম্প্রদায় এবং নিঃসম্বল ভিক্ষোপজীবী শ্রমজীবী-সাধারণ। এই ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, প্রতিপক্ষদল নীরবে মার্ক্সের সিদ্ধান্ত মানিয়া লন নাই। মার্ক্সের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে, সমাজের যে মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে, তাহারা নানা উপায়ে তাহা প্রতিপন্ন

করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিপক্ষদল বলিতে লাগিলেন যে, মার্ক্সের দল প্রকারান্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন; এবং এতদ্দ্বারা পরিবারপ্রথা একেবারে উঠিয়া যাইবে, ও স্বদেশপ্রেম-বলিয়া কোন জিনিসেরই অস্তিত্বও থাকিবে না। মার্ক্সও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন যে, মূলধনীদের চক্রান্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভোগের অধিকার অনেক দিনই ইউরোপীয় সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। শ্রমজীবীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উৎপন্ন করে, তাহার বিক্রয়লব্ধ লভ্যের পৌনে ষোল আনাই মুষ্টিমেয় মূলধনীরা আত্মসাৎ করিয়া থাকে, শ্রমজীবীদের কপালে যাহা মিলে, তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনেরই সংস্থান হয় না। মজুরদের মধ্যে পরিবারপ্রথাও উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়; পেটের দায়ে স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক বালকবালিকা পর্য্যন্ত কলকারখানায় ঢুকিতেছে, ও তাহার ফলে, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি নিতান্ত অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। আর, স্বদেশ প্রেম? যাহার নিজের দেশ আছে, তাহার পক্ষেই স্বদেশপ্রেম সম্ভবপর। শ্রমজীবীদের নিজের দেশ কোথায়? যে দেশে ইচ্ছামত খাটিয়া খাইবার অধিকার পর্য্যন্তও তাহাদের নাই, তাহাকে তাহাদের স্বদেশ বলিলে, কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা দেওয়া হয় মাত্র।

এই ঘোষণাপত্রের প্রথম প্রচারের অব্যবহিত পরেই ইউরোপের প্রায় যাবতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং ঐ সকল দেশের শ্রমজীবীগণ দলে দলে ইহার পতাকাতলে সম্মিলিত হইতে থাকে। ন্যায়পন্থীগণের বীজমন্ত্র ছিল. মানুষ মাত্রেই ভাই (All men are brethern)। এখন হইতে সঙ্ঘবাদীগণের বীজমন্ত্র হইল,সকল দেশের নিঃসম্বল শ্রমজীবীগণ, একতাবদ্ধ হও। (Proletarians of all lands unite.)।

প্রবল পরাক্রান্ত অনিয়ন্ত্রিতাকাঙ্ক্ষী রাজশক্তি কর্তৃক ১৮৪৮ খৃঃঅব্দের প্রজাবিদ্রোহ অনায়াসে দমিত হইলেও, উহা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। রাজন্যবর্গ অতঃপর স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, প্রজাগণের দাবী দাওয়ার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন আর তাহাদের পক্ষে নিতান্ত নিরাপদ নহে। তাই তাঁহারা এখন হইতে প্রজাদের দাবী দাওয়া ক্রমে ক্রমে পূরণ করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের আর একটী ফল এই হইয়াছিল যে, এই গোলযোগের অবসরে অনেক নির্ব্বাসিত ব্যক্তিই জার্ম্মাণীতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া জনসাধারণকে নানা রকমে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। শ্রমজীবী-সঙ্ঘের দ্বারা এতদপেক্ষা আর কোনও লাভ হয় নাই। ১৮৪৮ হইতে ১৮৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা শ্রমজীবী-সঙ্ঘের প্রচার-কার্য্যের পক্ষে আদৌ অনুকূল না হওয়ায়, উহা ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই উঠিয়া যায়। চৌদ্দ বৎসর পরে ইহাকে আবার আমরা অন্য আকারে দেখিতে পাই।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে লণ্ডন সহরে একটী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর (The International Exhibition) অনুষ্ঠান হয়। তদানীন্তন ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের সম্মতিক্রমে ও অর্থ-সাহায্যে ফরাসী শ্রমজীবীদের তরফ হইতে এক দল প্রতিনিধি (Deputation) এই প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়। বিলাতের শ্রমজীবীগণ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করে, এবং শ্রমজীবী-মাত্রেরই স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন, তৎসম্বন্ধে উভয় পক্ষে অনেক কথাবার্ত্তা হয়।

ইহার পর বৎসরেই পোলণ্ডীয় প্রজাদের সহিত রুশিয়ার সম্রাটের গোলমাল উপস্থিত হয়। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ও রুশিয়া এই তিন শক্তির মধ্যে সমগ্র পোল্যাণ্ড দেশটীকে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং এই গোলমালে প্রকারান্তরে উক্ত ত্রিশক্তিই জড়িত হইয়া পড়ে। পরস্পরের সাহায্যের জন্য রুশিয়া ও প্রাশিয়াতে একটী সন্ধিও স্থাপিত হয়। প্রাশিয়া চিরকালই ফ্রান্সের এবং অষ্ট্রীয়া, রুশিয়ার শত্রু। সুতরাং এই গোলমালের সুযোগে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান রুশিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও পোলদিগের অনুকূলে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিকে উত্তেজিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডকেও এই গোলমালে টানিয়া আনিবার জন্য ১৮৬৩ খৃ অব্দে নেপোলিয়ানের যত্নে ও অর্থ-সাহায্যে ফরাসী শ্রমজীবীদের আর একদল প্রতিনিধি লণ্ডন

প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইল। উদ্দেশ্য, ইংরেজ জনসাধারণকে পোল্যাণ্ডের অনুকূলে উত্তেজিত করিতে পারিলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই আসরে নামিতে হইবে। কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করে এক রকম, হয় তাহার ঠিক উল্টা। ইংলিস উপসাগর অতিক্রম করিয়াই ফরাসী প্রতিনিধিগণ শুধু নিজেদের কথাবার্ত্তাতেই মাতিয়া গেল,—নেপোলিয়ান্ ও পোল্যাণ্ডের বিষয় তাহারা একেবারে ভুলিয়াই গেল। কিরূপে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করা যায়, সে সম্বন্ধে ইংরাজ ও ফরাসী শ্রমজীবীদের অনেক দিন ধরিয়া যুক্তি পরামর্শ চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ২৮ শে সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনসহরের সেণ্ট মার্টিন্ হলে (St. Martin Hall) অধ্যাপক বীস্‌লির (Professor Beesly) সভাপতিত্বে শ্রমজীবীসাধারণের একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। মার্ক্স নিজেও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার নির্দ্দেশানুসারে বিভিন্ন দেশের ৫০জন প্রতিনিধি লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়, এবং এই অভিনব আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার সেই কমিটীর উপর প্রদত্ত হয়। শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, যে সভাস্থাপনের পর দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই উহার প্রবল প্রতাপে সমগ্র-ইউরোপীয় জগৎ বিকম্পিত হইয়াছিল, এবং যাহা শ্রমজীবীমহলে এক অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার এই প্রথম অধিবেশনে তিন পাউণ্ড বা ৪৫৲ টাকার অধিক চাঁদা আদায় হয় নাই।

কমিটীর আদেশানুসারে মার্ক্স নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতির নিয়মাবলী ও উহার প্রথম অভিভাষণ প্রণয়ন করেন এবং সমিতি কর্ত্তৃক উহা পরিগৃহীত হয়। এই অভিভাষণে শ্রমজীবিগণকে বিশেষরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে,শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমগ্র দেশের অর্থসমষ্টির অভূতপূর্ব্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকিলেও, উহাতে শ্রমজীবীদের অবস্থা কিন্তু উত্তরোত্তর খারাপই হইতেছে। তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধনের একটী মাত্র উপায় আছে, এবং সে উপায় তাহাদের নিজেদেরই হাতে। যদি সকল দেশের শ্রমজীবীগণ একতাবদ্ধ হইয়া অবিচলিত ভাবে তাহাদের ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার দাবী করিতে পারে, তবেই মূলধনী সম্প্রদায় তাহাদের দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবেন। এই জন্যই আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির প্রতিষ্ঠা। সকল দেশের শ্রমজীবীই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ইহার সভ্য হইতে পারিবে। কিন্তু শুধু নামে সভ্য হইলেই চলিবে না। কোনও অধিকার ভোগ করিতে চাইলেই, তাহার অনুরূপ দায়িত্বও বহন করিতে হইবে অধিকার ও দায়িত্ব পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।

বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবীসমিতিসমূহের কার্য্যপদ্ধতির সমন্বয়সাধন ও বার্ষিক অধিবেশনাদির আয়োজন প্রভৃতির জন্য লণ্ডন সহরে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির একটী সাধারণ বা কেন্দ্রসভার (General Council) প্রতিষ্ঠা হয়, এবং নিয়ম করা হয় যে, ইংরাজ সভ্যদের মধ্য হইতেই এই সাধারণ সভার সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবে। তবে বিভিন্ন দেশের সমিতিসমূহের সহিত সমন্বয় রাখিবার জন্য ঐরূপ প্রত্যেক সমিতির এক একজন প্রতিনিধি মূল সভার সভ্যরূপে গৃহীত হইবে। যতদূর সম্ভব, প্রত্যেক দেশে একটী মাত্রই সমিতি থাকিবে; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না, সেখানে এক বা ততোধিক সমিতি থাকিতে পারিবে, এবং প্রত্যেকের এক একজন প্রতিনিধি মূল সভাতে গৃহীত হইবে। মূল উদ্দেশ্যের কোনও হানি না করিয়া, প্রত্যেক সমিতি স্বাধীনভাবে ও স্ব স্ব সুবিধা অনুসারে যাবতীয় কাজ করিবে; মূল সভা তাহাতে কোনও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে বেল্‌জিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্ নগরে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীসমিতির প্রথম অধিবেশন হইবার কথা ছিল; কিন্তু বেল্‌জিয়ামের গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা উপস্থিত করাতে, ঐ বৎসর কোনও অধিবেশন হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তী বৎসরে জেনেভা সহরে প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান ও তাহাতে মার্ক্স-প্রণীত প্রাগুক্ত নিয়মাবলী গৃহীত হয়। শ্রমজীবীগণকে যাহাতে দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী কাজ

করিতে না হয়,এবং যাহাতে তাহাদের সর্ববিধ শিক্ষার যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করা হয়, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাবও এই অধিবেশনে গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা ইহাতে উঠে নাই। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের অধিবেশনে কিন্তু সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে অনেক কথাই উঠিয়াছিল। এই সময়ে টেলিগ্রাম ও রেলবিভাগ প্রভৃতিতে মূলধনীদেরই একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। ইহাতে শ্রমজীবীগণের নানারূপ অসুবিধা ও ক্ষতি করিয়া তাহারা নিজের স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে পারিত। অতএব প্রস্তাব করা হয় যে,অতঃপর এই সমস্ত বিভাগ হইতে মূলধনীদের আধিপত্যের উচ্ছেদ করিয়া, তৎসমুদয় সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে লওয়া হউক। যাহাতে শ্রমজীবীদের মধ্যে নানাবিধ সমবায়সমিতির বহুল প্রচলন ও দৈনিক মজুরীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, তৎসম্বন্ধে এই অধিবেশন যথাসম্ভব উৎসাহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রাগুক্ত ব্রাসেল্‌স্ সহরে সমিতির তৃতীয় অধিবেশন হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, জার্ম্মাণি, বেল্‌জিয়াম, সুইজার্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে অন্যূন ৯৮ জন প্রতিনিধি ইহাতে উপস্থিত ছিলেন, এবং এইবারেই সমিতির আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়া পড়ে। প্রস্তাব করা হয় যে, টেলিগ্রাম ও রেলবিভাগ তো গবর্ণমেণ্টের হাতে লইতেই হইবে; তা ছাড়া, দেশের যাবতীয় জমী, খনি ও ব -বিভাগও গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে লইয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ উপযুক্ত সর্ত্তে শ্রমজীবীসমিতিসমূহের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। কলকারখানার জোরেই মূলধনীরা আজ এত প্রভাবশালী। সুতরাং তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, সমবায়-সমিতি প্রভৃতির স্থাপনা দ্বারা শ্রমজীবীগণকে নিজেদের কলকারখানা-সমূহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বগামী প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। অতিরিক্ত এই বলা হয় যে, সময়াভাবেই শ্রমজীবীরা লেখাপড়া শিখিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের কার্য্যকালের পরিমাণ আবশ্যকমত কমাইতে হইবে। মূলধনীরা সুদ, খাজনা, লভ্যাংশ প্রভৃতি নানা উপায়ে অযথা লাভবান হইতেছে। সমিতি এতৎ সমুদয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে যে, শ্রমজীবীরা যাহাতে তাহাদের পরিশ্রমের সম্যক প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বাগ্র তাহার যথোচিত ব্যবস্থার নিতান্ত দরকার। (To labour the full product of labour)। এই সময়ে ফ্রান্স ও প্রাশিয়াতে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়াতে, সমিতি এক বাক্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্থির করে যে, এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ শ্রমজীবীগণেরই সমূহ ক্ষতির কারণ; কেন না,নিজেদের মধ্যে শত্রুতা না থাকিলেও অনেক সময়ে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতে হয়। সুতরাং যাহাতে এই প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, শ্রমজীবীদের তাহাই করা উচিত এবং আবশ্যক হইলে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট প্রভৃতির দ্বারাও সমরেচ্ছু গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধবিগ্রহ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতেই আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবীসমিতির মূল উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটী একটা ধারণা জন্মিবে। যতই দিন যাইতে লাগিল, ইহার প্রসার প্রতিপত্তিও ততই বাড়িতে লাগিল। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ ট্রেড ইউনিয়ানিষ্টগণ (Trade Unionists) প্রকাশ্যভাবে ইহার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করে, এবং ১৮৬৮ অব্দে দক্ষিণ জার্ম্মাণীর প্রায় ১২২টী শ্রমজীবী সমিতি উহার সহিত মিলিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে আমেরিকার প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমজীবীও ইহার সহিত যোগদান করে।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকে ইহার সভ্য হইলেও আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী সমিতিতে এতকাল মার্ক্সেরই একাধিপত্য ছিল। কিন্তু এই আধিপত্য আর বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে আনার্কিষ্ট বা অরাজকতাবাদী বাকুনীন স্বীয় দলবলসহ এই সমিতিতে প্রবেশ করে এবং প্রথম হইতেই মার্ক্সের সহিত তাহার বিষম মতান্তর উপস্থিত হয়। অবশেষে ১৮৭২ অব্দের হেগ্ (The Hague) সহরের অধিবেশনে আনার্কিষ্ট দল বিতাড়িত হয়—

কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক সমিতির প্রাণশক্তিও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। হেগ-ব্যাপারের পরে "সাধারণ সভা" লণ্ডন হইতে নিউইয়র্কে উঠাইয়া আনা হয়। ইহার পর সমিতির আর একটী মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল, এবং তদনন্তর উহার প্রাণবায়ু আপনা হইতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়।

এইরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে আন্তর্জ্জাতিক সমিতি উঠিয়া যায়। অনেকে ইহাকে শ্রমজীবীদের একটী ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই একতরফা ধারণা নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। সমাজব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রে শ্রমজীবীদেরও যে কিছু বলিবার কহিবার আছে, তাহারা যে মানুষ ও মানুষের মত ব্যবহার পাইবার দাবী তাহারা রাখে, এবং সম্মিলিত হইতে পারিলে, কেহই যে তাহাদের গতিরোধে সমর্থ হইবে না, জগৎ সমক্ষে, বিশেষতঃ শ্রমজীবী মহলে ইহার প্রচারের জন্যই আন্তর্জ্জাতিক সমিতির আবশ্যক হইয়াছিল, এবং শত্রুমিত্র সকলেই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, সমিতির এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে। আজকাল মূলধনী সম্প্রদায় হাজার শক্তিসম্পন্নই হউক, বা গবর্ণমেণ্ট হাজার অনিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাচারী হউক না কেন, শ্রমজীবীদের সহিত আর পূর্ব্বের ন্যায় অমানুষিক ব্যবহার করিতে বা তাহাদের দাবী দাওয়ার প্রতি সঘৃণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না।

মার্ক্স্-প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমিতি উঠিয়া গেলেও, শ্রমজীবীগণ উহা হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাই, কিছুদিন পরে ইহা আবার নূতন আকারে পুনরাবির্ভূত হইল। এবারে সকল দেশের সকলে একত্র সম্মিলিত না হইয়া স্ব স্ব দেশে নিজ নিজ অবস্থা ও সুবিধা অনুসারে শ্রমজীবী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে বেলজিয়মের অন্তঃপাতী ঘেণ্ট (Ghent) সহরে এইরূপ এক সমিতির অধিবেশন হয়। কিন্তু ইহাতে কোনও উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে ফরাসীবিপ্লবের শততম বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে প্যারী নগরীতে যে মহতী সভার অধিবেশন হয়, শ্রমজীবীদের ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই তুলনা-রহিত। ইহার পরে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ব্রাসেল্‌সে, ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে জুরিকে এবং ১৮৯৬ অব্দে লণ্ডনে সকল দেশের শ্রমজীবীগণ পরস্পর মিলিত হইয়াছিল।

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান ঐক্য দেখিয়া শাসকসম্প্রদায়ও বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে সুইজারল্যাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য একটী আন্তর্জ্জাতিক সভা আহ্বানের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে খোদ জার্ম্মাণ সম্রাটই অনুরূপ আর একটী প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা শ্রমজীবীদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখদুর্দ্দশা দূর না হইলেও, ইহার পর হইতেই সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই ক্রমে ক্রমে শ্রমজীবীদের অনুকূলে আইনাদির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ সোসিয়াল ডিমক্রেসী—১৮৬২ খৃঃ অব্দে "নিখিল-জার্ম্মাণ-শ্রমজীবী-সমিতির" প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই উহার প্রতিষ্ঠাতা ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেল দেহত্যাগ করেন। ল্যাসেলের পর উপযুক্ত চালকের অভাবে সোসিয়াল ডিমক্রেসীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে, এবং উহার তহবিল ক্রমে ১৮ শিলিং বা মাত্র ১৩॥০ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়! আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ নিতান্ত শোচনীয় হইলেও, উহার মুখপত্র "সোসিয়াল ডিমক্র্যাট" (Sozialdemokrat) দ্বারা এই সময়ে ল্যাসেল-প্রতিষ্ঠিত শ্রমজীবীসমিতির প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগে স্বোয়েজার (Schweitzer) কর্ত্তৃক ইহার প্রতিষ্ঠা হয়, এবং মার্ক্স, এন্‌জেল্‌স্ প্রমুখ সোসিয়ালিষ্ট নেতৃগণ প্রথমাবস্থায় উহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই লিখিতেন। স্বোয়েজার অনেকটা সুবিধাবাদী ছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, তদানীন্তন প্রাশীয় গবর্ণমেণ্ট ও মধ্যবিত্ত মূলধনী সম্প্রদায়, ইহাদের কাহারও সহিতই শ্রমজীবীদের

স্বার্থের একেবারে মিল নাই। কিন্তু তাহারা যেরূপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সুতরাং দুর্ব্বল, তাহাতে তাহাদিগকে জল দিয়াই জল বাহির করিতে হইবে। স্বোয়েজার দেখিলেন যে, চেষ্টা করলে গবর্ণমেণ্টকে অনেকটা শ্রমজীবীদের পক্ষে আনা যাইতে পারে, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত তাহাদের একেবারে 'দা-কুমড়া' সম্বন্ধ; এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তিধ্বংসের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইজন্য তাঁহাকে বিসমার্ক প্রভৃতিকে নিতান্ত তোষামোদ করিতে না হইলেও, অনেক সময়েই নিতান্ত সংযতভাবে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে হইত। মার্ক্স প্রভৃতি কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত চটিয়া যান ও 'সোসিয়াল্ ডিমক্র্যাটে' লেখা একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। দেশকালপাত্র বিবেচনায় স্বোয়েজার যে ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই সময়ে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ জাতির সবে মাত্র প্রতিষ্ঠা হইতেছিল। সুতরাং এই গোলমাল ও অশান্তি উপদ্রবের মধ্যে শ্রমজীবীসমিতির পক্ষে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে প্রাশিয়া কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে উত্তর জার্ম্মাণীর অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া একটী 'মণ্ডল' (The North German Confederation) স্থাপিত এবং সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার ক্রমে একটী জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা (The North German Diet) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর বৎসরেই স্বোয়েজার 'নিখিল-জার্ম্মাণশ্রমজীবীসমিতি'র সভাপতি পদে বরিত হন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাশিয়া ও উত্তর জার্ম্মাণির রাজ্যসমূহের মধ্যেই ল্যাসেলের প্রসার প্রতিপত্তি কিছু বেশী ছিল। কিন্তু স্যাক্সনি ও দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে মধ্যবিত্ত মূলধনী সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। শ্রমজীবীরা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করুক বা তাহাদের শিক্ষাপ্রদানের যথোচিত ব্যবস্থা করাহোক, ইহাতে মূলধনীদের কোনও আপত্তি ছিল না; বরং শ্রমজীবীদিগকে এই দুইটী অধিকার দিতে হইলে তৎপূর্ব্বে তাহাদিগকেও ইহা দিতে হইবে এবং তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতাও অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। সুতরাং এইজন্যও মূলধনীরা এই দুই অধিকার লাভের জন্য শ্রমজীবীদিগকে নিয়ত উত্তেজিত করিত। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়, ইহা কখনও তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে যাহাতে ল্যাসেলপ্রচারিত মতবাদ প্রবেশ করিতে না পারে, তদভিপ্রায়ে মূলধনীরা দক্ষিণ জার্ম্মাণির অনেক স্থানেই শ্রমজীবীদের জন্য "শিক্ষাসমিতির" (Arbeiterbildungsvereine—Working men's educative associations) প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেই ফ্রাঙ্কফর্ট (Frankfurt) সহরে এই সমস্ত সমিতির এক সম্মিলিত অধিবেশন হয়। বিধাতার ইচ্ছা বুঝা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। মূলধনীরা এই সমস্ত সমিতির দ্বারা ল্যাসেলের প্রতিপত্তি নষ্ট করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে ইহাদের দ্বারা ল্যাসেলের মত প্রচারের অভূতপূর্ব্ব সুবিধাই হইয়াছে। উইলহেলম্ লাইবনেকট্ (Wilhelm Liebnecht) ও অগষ্ট বেবেল (August Bebel), প্রধানতঃ এই দুই জন কর্ম্মবীরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই এই মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের প্রজাবিদ্রোহের সহিত লাইবনেকট্ বিশেষভাবে জড়িত থাকায় তাঁহাকে জার্ম্মাণি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। ইহার ফলে তিনি বিশেষভাবে মার্ক্সের প্রভাবাধীনে আসেন এবং ক্রমে ক্রমে একজন পাকা সোসিয়ালিষ্টে পরিণত হন। ল্যাসেলপ্রতিষ্ঠিত সমিতিতেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দিনই ল্যাসেলের বিশ্বাসী হইতে পারেন নাই। অগষ্ট বেবেলের সহিত লাইবনেক্টের অচ্ছেদ্য প্রণয় ছিল। নিতান্ত দরিদ্রের ঘরে বেবেলের জন্ম হয় এবং অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় দাতব্য স্কুলেই তাঁহার লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি করিতে হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিমাণই কোনও কালে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিরূপে গৃহীত হয় নাই। মনুষ্যত্ব স্বতন্ত্র জিনিস এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধি ব্যতীও উহাত

বিকশিত হইতে পারে। অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য অধ্যবসায় এবং প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রতিভা ও চরিত্রবত্তার গুণে বেবেল শীঘ্রই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতৃপদ দখল করিয়া লইলেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণ জার্ম্মাণির শিক্ষাসমিতির সহিতই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন,—কিন্তু কোনও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সমস্ত শক্তির নিঃশেষ করিবার জন্য এরূপ লোকের সৃষ্টি হয় না। যতই দিন যাইতে লাগিল, বেবেলের প্রসার প্রতিপত্তি ততই বাড়িতে লাগিল, দক্ষিণ জার্ম্মাণির শ্রমজীবীশিক্ষাসমিতিসমূহ ততই তাঁহার নেতৃত্বাধীনে উন্নততর মার্গে আরোহণ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক অধিকারপ্রাপ্তির বিষয়ে মূলধনীদের কোনও আপত্তি ছিল না। তদনুসারে ১৮৬৫ খৃঃ অব্দের শিক্ষাসমিতি-সমূহের সম্মিলিত অধিবেশনে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের প্রার্থনা উপস্থিত করা হয়। কিন্তু একটা ক্ষমতার আস্বাদ একবার অনুভব করিতে পারিলে, লোক শুধু তাহাতেই চিরকাল পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না—নিত্য নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য তাহার হৃদয়ে স্বতঃই একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়া থাকে। ইহা মানুষের স্বভাব, শিক্ষাসমিতিও সেইরূপ সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের প্রার্থনা লইয়াই চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই—নিত্য নূতন অধিকার লাভের দাবী করা যেন উহার স্বভাবে পরিণত হইল। এইরূপে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের অধিবেশনে উহা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবীসমিতির সহিত সকল বিষয়েই আপনাকে একমত বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহার পরবর্ত্তী বৎসরে ইসেনাক্ (Eisenach) সহরে শিক্ষাসমিতির সম্মিলিত অধিবেশন হয়, এবং তাহার ফলে "সোসিয়াল ডিমক্রেটিক শ্রমজীবী সমিতির" (The Social Democratic Working Men's Party) প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ বৎসরের আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির অধিবেশনে কয়েকজন প্রতিনিধিও পাঠান হয়। এইরূপে ১৮৬৯ অব্দ হইতে সমগ্র জার্ম্মাণিতে দুইটী শ্রমজীবীদলের সৃষ্টি হইল—ল্যাসেল-প্রতিষ্ঠিত নিখিলজার্ম্মাণশ্রমজীবী-সমিতি ও পূর্ব্বোক্ত "ইসেনাক্ দল"। স্বোয়েজার প্রথমোক্ত সমিতির সভাপতি এবং লাইবনেক্‌ট্ ও বেবেল শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন।

উত্তরজার্ম্মাণপ্রতিনিধিসভায় উভয় দলেরই প্রতিনিধি ছিল বটে, কিন্তু নেতাদের মধ্যে বিষম মতভেদ ছিল। স্বোয়েজার এই প্রতিনিধিসভাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবেচনা না করিলেও, উহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই মনে করিতেন। পক্ষান্তরে, লাইবনেক্‌ট্ ও বেবেল, ইহাকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার যন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন—কারণ, তৎকালে প্রতিনিধিসভার বাহিরে স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা জার্ম্মাণিতে কাহারও ছিল না। ১৮৭০—৭১ খৃঃ অব্দের ফ্রাঙ্কোপ্রাশীয় যুদ্ধের সময়ে এই উভয় দলের মতপার্থক্য বিশেষরূপে স্পষ্টাকার ধারণ করে। স্বোয়েজারের দল সামরিক ঋণ-গ্রহণ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু বেবেলের দল আগাগোড়াই এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং তাহার ফলে অনেককে জার্ম্মাণি হইতে নির্ব্বাসিত হইতেও হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ল্যাসেল কর্ত্তৃক শ্রমজীবী সমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই সোসিয়ালিষ্টগণকে পদে পদে জার্ম্মাণ পুলিসের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে—পুলিশের হুকুমে সভাসমিতি বন্ধ হইয়াছে, সংবাদপত্র উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে বিড়ম্বিত হওয়াতে উভয় দলের লোকেই পরস্পর একতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে লাগিল। পরস্পর শত্রুও যখন একই বিপদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন আর তাহাদের মধ্যে শত্রুতা থাকে না, উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া সাধারণ বিপদের প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হয়। এই দুই দলেরও তাহাই হইল। ঠিক এই সময়ে স্বোয়েজার নিখিল জার্ম্মাণ শ্রমজীবী সমিতির সভাপতির আসন হইতে অবসর গ্রহণ করায়, উভয় দলের মিশিবার একটী অচিন্তিতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের গথা (Gotha),

নগরের অধিবেশনে এই মিলনকার্য্যের সংঘটন হয় এবং অতঃপর এই সম্মিলিত সমিতির নাম হয়—'জার্ম্মাণ সোসিয়া-লিষ্টিক শ্রমজীবী সমিতি' (The Socialistic Working Men's Party of Germany)। এই শক্তিসমবায়ের ফলে জার্ম্মাণির সর্ব্বত্রই সোসিয়ালিষ্টিক মতের অতি দ্রুত বিস্তৃতি হইতে লাগিল। এবং তাহাতে বিসমার্ক-পরিচালিত প্রাশীয় গবর্ণমেণ্টও অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে আর এ দুটী ঘটনাতে শাসকসম্প্রদায়কে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িতে হয়। ১৮৭৮ অব্দে হডল (Hodel) ও নোবিলিং (Nobiling) নামক দুইজন আততায়ী জার্ম্মাণ সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস হয় যে, সোসিয়ালিষ্টদের প্ররোচনাতেই এই সমস্ত ঘটনা হইতেছে এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে সোসিয়ালিষ্টদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কড়া আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিদ করিয়া নিজেদের পছন্দমত আইন তৈয়ার করিয়া লন। (অক্টোবর, ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ)। এই আইনানুসারে সোসিয়ালিষ্টিক মতপ্রচারক সংবাদপত্রসমূহের প্রচার বন্ধ ও সোসিয়ালিষ্টিক সভাসমিতিসমূহ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

প্রথমে সোসিয়ালিষ্ট নেতৃগণ ইহাতে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সে ভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

সভাসমিতি প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেলেও তাহারা পরস্পর মিলিত থাকিবার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে ১৮৯০ খৃঃ অব্দে সোসিয়ালিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনাদি রদ করা হয়। গবর্ণমেণ্টের কড়া আইনে সোসিয়ালিষ্টদের যে মূলে কোনও হানি হয় নাই, তাহা পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভোটের সংখ্যা হইতেই প্রমাণিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে সোসিয়ালিষ্ট পক্ষে ১০২০০০ ভোট ও তাহাদের মাত্র দুইজন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়। ১৮৭৪ অব্দের নির্ব্বাচনে তাহাদের পক্ষে ৩৪০,০০০ ভোট ও নয় জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে দুই দলের মিলন হয় এবং ১৮৭৭ অব্দের সোসিয়ালিষ্টগণ প্রায় ৫ লক্ষ ভোট পায় এবং তাহাদের ১২ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। ১৮৭৮ অব্দে সোসিয়ালিষ্টদের বিরুদ্ধে অনেক কড়া আইন পাশ হয়। তাহার ফলে ১৮৮১ অব্দের নির্ব্বাচনে ভোটের সংখ্যা কমিয়া ৩১২,০০০ তে দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা ক্ষণিক মাত্র। ১৮৮৪ অব্দ হইতেই ভোটসংখ্যা আবার বাড়িতে থাকে। ঐ অব্দে মোট ভোট সংখ্যা ছিল ৫৪৯,০০০, কিন্তু ১৮৮৭ অব্দে ৭৬৩,০০০ এবং ১৮৯০ অব্দে ১,৪২৭,০০০ হয় এবং জার্ম্মাণ পার্লামেণ্টে (Reichstag) সোসিয়ালিষ্টগণই আজকাল সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দল। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে এই সমস্ত কঠোর আইন কানুনের রদ করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই সোসিয়ালিষ্টগণ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য হল (Hall) সহরে সমবেত হয়। এই অধিবেশনে একটী পরিচালন সমিতি গঠিত ও বার্লিন হইতে প্রকাশিত ভরওয়ার্টস্ (Vorwarts) নামক পত্রিকা উহাদের মুখপত্ররূপে নির্দ্ধারিত হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে আরফার্ট (Erfurt) সহরে সোসিয়ালিষ্টগণ পুনরায় সম্মিলিত হইয়া তাহাদের কার্য্যপ্রনালী নির্দ্ধারিত করে। জার্ম্মাণ সোসিয়া-লিজমের ইতিহাসে এই অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ শ্রমজীবীগণের দুরবস্থা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার ফলে সোসিয়াল ডিমক্র্যাটিক সম্প্রদায় যে যে অধিকার পাইবার দাবী উত্থাপন করে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

১। স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক (বিশ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক) সকলকেই সমান ও সাক্ষাৎভাবে ভোট প্রদানের অধিকার দিতে হইবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচনক্ষেত্রের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ব্যবস্থাপক সভার নূতন নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সরকারী ছুটীর দিন ব্যতীত অন্য দিনে নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে পারিবে না। প্রতিনিধিগণকে বেতন দিতে

হইবে। বিশেষ অপরাধ না করিলে, কাহারও স্বাভাবিক নৈতিক অধিকারের সীমা খর্ব করা যাইবে না। ব্যালট (Ballot) দ্বারা ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২। জনসাধারণ সাক্ষাৎভাবে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিতে পারিবে, এবং তাহাদের মতামতানুসারেই ঐ প্রস্তাব গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইবে। সাম্রাজ্য ও তাহার বিভাগ ও উপবিভাগসমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রথার প্রবর্তন আবশ্যক। যাবতীয় সরকারী কর্মচারী জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং তাহাদিগকে জনসাধারণের নিকটেই জবাবদিহী থাকিতে হইবে। কর প্রভৃতি মাত্র এক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা হইবে।

৩। সর্বসাধারণকেই সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে। বেতনভোগী সৈন্য থাকিবে না। যুদ্ধ বা সন্ধি প্রভৃতি বিষয় জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃকই নির্দ্ধারিত হইবে। আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদ আপোষে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। সভাসমিতির আহ্বান ও স্বাধীন মতামত প্রকাশে কিছুমাত্র বাধা থাকিবে না।

৫। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সকলপ্রকার অধিকার তুল্যরূপে ভোগ করিতে পারিবে।

৬। লোকে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে ধর্মমত পোষণ করিতে পারিবে। ধর্মমতসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে সরকারী তহবিল হইতে কোন টাকা খরচ করা হইবে না।

৭। বিদ্যালয়ে কোনও ধর্মমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না। বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতির প্রবর্তন ও উপযুক্ত বালকবালিকার জন্য অবৈতনিক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। জনসাধারণের নির্বাচিত বিচারকের দ্বারা বিনা ব্যয়ে বিচার সমাধার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যায়রূপে কাহারও শাস্তি হইলে, তাহাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রদ করিতে হইবে।

৯। বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১০। আয়ের অনুপাতে আয়কর ধার্য্য হইবে।

শ্রমজীবীগণের স্বার্থসংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়—

(ক) কেহ দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশী মজুরদিগকে খাটাইতে পারিবে না।

(খ) ১৪-বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকাগণকে কলকারখানা প্রভৃতিতে লইতে পারিবে না।

(গ) সাধারণতঃ রাত্রিতে মজুরদের কোনও কাজ থাকিবে না।

(ঘ) প্রত্যেক সপ্তাহে অন্ততঃ একাদিক্রমে ৩৬ ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) শ্রমজীবীদিগকে কোথায় কিরূপভাবে খাটান হইয়া থাকে, তাহার যথোচিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) শ্রমজীবীরা আবশ্যকমত দলবদ্ধ হইতে পারিবে।

(ছ) শ্রমজীবীগণের সহকারিতায় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে তাহাদের জীবনবীমার সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৮৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ সোসিয়াল ডিমক্রেসীর শাস্ত্র যেরূপ ছিল, তাহা বর্ণিত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হইবে যে, ইহা জার্ম্মাণির শ্রমজীবীমণ্ডলে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ইহার প্রভাবাধীনে শ্রমজীবীদের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে—তাহারা পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হইতে এবং পরস্পরের আপদবিপদে সাহায্য ও সহানুভূতি করিতে শিখিয়াছে। ইহার একটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াই বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার করিব। আগষ্ট হাইন্স্ (August Heinsch) নামে একজন সাধারণ শ্রমজীবী ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের নির্বাচনে সোসিয়ালিষ্ট-পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট খাটিয়াছিল; প্রধানতঃ তাহার চেষ্টাতেই বার্লিন সহরে সোসিয়ালিষ্টদের জয় লাভ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই ক্ষয়রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তখন মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ লক্ষাধিক শ্রমজীবী নরনারী নগ্নপদে ও নগ্নমস্তকে শবানুগমন করে। শ্রমজীবীদের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর কখনও এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

নবাবিষ্কৃত অশোক অনুশাসন

সম্প্রতি হায়দরাবাদ-অধিপতি নিজামের রাজ্যে মৌর্য্য সম্রাট্‌ অশোকের একখানি নূতন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই আবিষ্ক্রিয়ার কথা প্রচারিত হয়। গত ডিসেম্বর মাসে নিজাম গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন*। তৎসাহায্যে নিম্নে এই শিলালিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

আবিষ্কার কাহিনী—হায়দরাবাদ রাজ্যের রাইচুর জেলার অন্তর্গত লিঙ্গসাগর তালুকের অধীনে 'মাস্কি' নামক গ্রামে অনেক পুরাতন স্বর্ণ-খনি আছে। ইঞ্জিনিয়ার বীডন সাহেব এই সমুদয় খনির পরিদর্শন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে গুহাদ্বারে অবস্থিত এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে তিনি তিন লাইন উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পান। কয়েক দিন পরে রাইচুর থানার তালুকদার মৌলবী বসির উদ্দীন আহম্মদের সাহায্যে আরও চারি লাইন লিপি আবিষ্কৃত হয়। এই সংবাদ পাইয়া হায়দরাবাদের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ১৯১৫ সনের ৪ঠা জুলাই তারিখে 'মাস্কি' নগরে গমন করেন। তিনি এই লিপির অষ্টম পংক্তি আবিষ্কার করেন, এবং প্রয়োজনীয় ফটোগ্রাফ, ছাপ প্রভৃতি লইয়া আসেন।

ইতিমধ্যে বীডন সাহেব রাও সাহেব কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট এই নূতন লিপির সংবাদ জ্ঞাপন করেন। রাও সাহেব নিজাম সরকারের অনুমতিক্রমে মাস্কি গ্রামে গমন করিয়া শিলালিপির ফটো ও ছাপ তুলিয়া লইয়া আসেন, এবং ইহার সম্পাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

মূলপাঠ—রাওসাহেব কৃষ্ণ শাস্ত্রী আলোচ্য শিলালিপির নিম্নলিখিত রূপ পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন ;—

(১) দে (বা) ন (া)ম (্)পিয়স অসোক ( ) স............ চ ত ( )।

(২) .(নি) ব সানি (য) ং অং সুমি বু (পা) শকে .. ..f (তি) রে (কে)

(৩) . মি (স)ং ঘ (ং) (উপ) গতে (বা) ......দ্বি উ(প) গতে পুরে জং বু

(৪). (f) স .. ..(দেবা হুসু) তে দ (া) নি মিসিভূতা ইয় অঠে খুদ

(৫) কে (ন) (f) হ ধম যু(তেন) সকে অধিগতবে ন হেবং দখিতবিয়ে (উডা)

(৬) লকে ব ইম অধিগ (ে) ছ য়া তি খু (দকে চ উডা) লকে চ বত

(৭) বিযা হেবং সে (ক) লং তংভ দ(কে ঠে তি) ....ত ( ) ক ( ) চ বটি

(৮) সিতি চা দিয় ঢিয় (ে) হ স তি *

ব্যাখ্যা—রাও সাহেব কৃষ্ণ শাস্ত্রী ইহার যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার মূল ও বাঙ্গালা তর্জ্জমা নিম্নে দেওয়া গেল। এখানে বলা আবশ্যক যে, রূপনাথ ও সাসেরাম নামক স্থানে অশোকের যে ... প পাওয়া গিয়াছে, আলোচ্য লিপিখানিও অনেকাংশে তাহার অনুরূপ। উক্ত লিপি দুইখানির সহিত সাদৃশ্য থাকাতেই এই লিপির ব্যাখ্যাকার্য্য সুসাধ্য হইয়াছে।

"(This is the word , (or command) of the Beloved of the gods, (king) Asoka............ (during) the two years and a half that I am (i. e. have been) a lay disciple......more than ......(I) approached the community of the (Buddhist) monks (Samgha), and approached (it) with zeal. (Those who) were formerly

* "The New Asokan Edict of Maski"
Hyderabad Archaeological Series No I.
Price One Rupee.

* যে সকল স্থল সন্দেহযুক্ত, তাহা বন্ধনী মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। যে সকল অক্ষর কোন্ হ্রস্বস্বর্ণসংযুক্ত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, সেই সকল অক্ষরের পরে কেবল মাত্র বন্ধনী চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

gods in Jambu (dvipa)......these have now become false. This result is possible Indeed to be achieved by the small man (Khudaka) who applies himself to Dhama, (one) ought not to think thus: that only the great man (Udalaka) could achieve this (result). Both the small man and the great man should thus be told......(This shall be) of long duration and will prosper; (and) will become one and a half (times as great)".

"দেবগণেব প্রিয় (রাজা) অশোকের (ঘোষণাপত্র):—

...সার্দ্ধ দুই বৎসর (পর্য্যন্ত) আমি উপাসক ছিলাম। ...... অধিক হইল...(আমি) উৎসাহেব সহিত (বৌদ্ধ) সংঘের অন্তর্ভুক্ত হইযাছি। (যাহারা) পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) দেবতা বলিয়া গণ্য হইত, তাহাবা এক্ষণে কৃত্রিম (মিথ্যা) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ যেন মনে না করে যে, কেবল মহৎ ব্যক্তিরাই এইরূপ ফললাভে কৃতকার্য্য হন ক্ষুদ্র ব্যক্তিও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইলে এইরূপ (ফল) লাভে সমর্থ হয়। ক্ষুদ্র ও মহৎ উভয়কেই এইরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত।......(ইহা) দীর্ঘকালস্থায়ী ও সমৃদ্ধিশালী (হইবে) (এবং) দেড়গুণ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে)।"

কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমি সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে পারি না। এই প্রবন্ধ বিচারতর্কের স্থল নহে, তথাপি বিষয়ের গুরুত্ববোধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি। শাস্ত্রী মহাশয় একটি বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষে যাঁহারা দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন, অশোক তাঁহাদিগকে কৃত্রিম প্রমাণিত করিয়াছেন।' এখানে মূলের 'মিসিভূতা' কথাটিকে তিনি সংস্কৃত "মৃষীভূতা"র প্রাকৃত রূপান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অশোক-লিপির এই অংশের ব্যাখ্যা লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে বিচার বিতর্ক চলিতেছে, তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তিনি নিঃসংশয়ে এই প্রাচীন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গত ১৯১১ সনের "জুর্ণাল এশিয়াটিক" নামক ফরাসী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিল্‌ভান লেভি সর্ব্বপ্রথমে প্রতিপন্ন করেন যে, সংস্কৃত 'মৃষা' হইতে যে প্রাকৃত পদ সিদ্ধ হয়, তাহা 'মিষা' নহে, 'মুষা';—আর অশোকের কালেও যে ইহাই প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাইযাছেন যে, অশোকের 'ভাবড়া'-লিপিতে 'মুষা'পদের ব্যবহার আছে। সিল্‌ভান্ লেভির বিবেচনায় সংস্কৃত 'মিশ্র' হইতেই প্রাকৃত 'মিস' নিষ্পন্ন হইয়াছে। সিলভান্ লেভির এই মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর (১), টমাস (২), হুল্‌ শ্‌ (৩), এবং টি, কে, লাড়ু (৪) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিল্‌ভান্ লেভির এই মত গ্রহণ করিলে, অশোক ভারতবর্ষের দেবতাগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিযাছেন, এরূপ কোন ব্যাখ্যাই হইতে পারে না—কারণ, যে শব্দকে সংস্কৃত মৃষার (মিথ্যা) রূপান্তর বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, সিল্‌ভান লেভি তাহার অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। নবাবিষ্কৃত অশোকলিপির 'মিসিভূতা' কথাটি সিলভান লেভির মতের সমর্থন করে। রাওসাহেব কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত 'মৃষীভূতা' হইতে 'মিসিভূতা' উৎপন্ন; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'মৃষীভূতা' এরূপ কোন পদ সিদ্ধ করা যায় না, এ কথা উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং জোর করিয়া একটি শব্দের কল্পনা করিয়া তাহা হইতে আলোচ্য পদটি সিদ্ধ না করিয়া, সংস্কৃত 'মিশ্রীভূতা' হইতেই 'মিসিভূতা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করাই অধিকতর সঙ্গত। মাস্‌কি-শাসন অল্প কয়েক দিন হইল মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং এখনও ইহা পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারাধীনে আসে নাই। এই বিচারের সম্বন্ধে

(১) Indian Anitquary, 1912 P. 170

(২) Journal of the Royal Asiatic Society 1912—P. 480

(৩) Do, 1911—P. 1114

(৪) Do. —P. 1117

আবিষ্কৃত হইলে, এ সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইবে। সুতরাং রাও সাহেব কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না।

ঐতিহাসিক মূল্য—(১) ঐতিহাসিকগণের নিকট 'মাস্কি'-লিপির বিশেষ মূল্য এই যে, ইহাতে 'অশোকের' নামের উল্লেখ আছে। এ পর্য্যন্ত মহারাজা অশোকের বহুসংখ্যক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এই সমুদয় লিপিতেই তিনি 'দেবানাং প্রিয়', 'প্রিয়দর্শী' প্রভৃতি নামে পরিচিত; ইহার কোন লিপিতেই তাঁহার নাম ব্যবহৃত হয় নাই। প্রিন্সেপ যখন প্রথমে অশোক লিপির পাঠ উদ্ধার করেন, তখন ঐতিহাসিকগণের নিকট ইহা একটি গুরুতর সমস্যার বিষয় ছিল। তখন প্রশ্ন হইয়াছিল এই, গান্ধার হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত যাঁহার লিপি পাওয়া যায়, সেই মহারাজ 'প্রিয়দর্শী' কে? পুরাণে যে রাজগণের তালিকা আছে, তাহার মধ্যে এই নাম নাই, এবং আর কোন উপায়েই এই রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ প্রিয়দর্শীর পরিচয় জানা গেল না। অবশেষে টার্ণার সাহেব সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন যে, মৌর্য্যরাজ অশোকের একটী উপাধি ছিল প্রিয়দর্শী। এই প্রমাণের বলে আবিষ্কৃত লিপিসমূহের 'প্রিয়দর্শী' ও মৌর্য্যরাজ প্রিয়দর্শী অশোক অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইল, কিন্তু তথাপি সন্দেহের অবসান হয় নাই। মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠিত, বাস্তবিক অশোকই এই সমুদয় লিপির কর্ত্তা কি না। কারণ, অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজ দশরথও 'প্রিয়দর্শী' এই উপাধি ভূষিত ছিলেন। ১৯০১ সালের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় এই প্রিয়দর্শী ও অশোকের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য লিপিতে 'অশোক' এই নামের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় সকল সন্দেহ ও সকল আলোচনার অবসান হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(২) আলোচ্য লিপির সাহায্যে মহারাজা অশোকের সাম্রাজ্যের দক্ষিণতম সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

(৩) এই অঞ্চলে অশোকের যে সমুদয় লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাদেশিক রাজধানী 'সুবর্ণগিরির' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মাস্কি অঞ্চলে বহু স্বর্ণখনি বিদ্যমান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসম্ভব নহে যে, ইহারই নিকটে সুবর্ণগিরি অবস্থিত ছিল। অবশ্য, ইহা কেবল অনুমান মাত্র, উপযুক্ত প্রমাণ না পাইলে, বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুবর্ণগিরি [illegible] এই অনুমানের আরও একটি কারণ আছে। মাস্কি লিপিতে অশোকের নাম আছে, অন্য কোন লিপিতে [illegible] কারণ এরূপ হইতে পারে যে, প্রাদেশিক [illegible] সম্রাটের আজ্ঞাপত্র প্রেরিত হইত, সুতরাং এতে [illegible] রাজার নামের উল্লেখ থাকিত। প্রাদেশিক রাজধানীর এই মূল আজ্ঞাপত্রের অনুকরণে প্রদেশস্থিত বিভিন্ন স্থানে অনুরূপ আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হইত, কিন্তু সম্রাটের প্রতি সম্মানবশতঃ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এই সকল আজ্ঞাপত্রে সম্রাটের নামের পরিবর্ত্তে উপাধি মাত্র ব্যবহার করিতেন। অবশ্য ইহাও অনুমান মাত্র; এবং পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে অশোকের কোন লিপি আবিষ্কৃত না হইলে, এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

সভাপতির অভিভাষণ *

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা—পূরে কি আশা!"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্প-সৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালার একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার [illegible] ও অমূল্য রত্ন রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গ[illegible] নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের [illegible] হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে, এ কথা সত্য, [illegible] বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বৰ্দ্ধিষ্ণু বঙ্গ-বাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্রকর্ষণ পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন, অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জলসেচনের প্রয়োজন, তখন জল, যখন আতপনিবারণের প্রয়োজন, তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের এখন সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন। কত আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে, দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে, ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসি-মাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্ব্বরতা যেন কতগুলি আবর্জ্জনা-জনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

[illegible]কাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য, উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন, বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ সেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তির অবসরবিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে, বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই

* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে (রঙ্গপুর) পঠিত, এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত।

থাকে পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষায় আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্র গতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর, সেই সঙ্গেই আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইবে, তাহাও ভাবিতে হইবে কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্বপ্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলায় বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর ভাবে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও সে উচ্চাসনে তাঁহারা অধিকারী থাকিবেন সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে হয় ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে, যথায় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব, এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপটভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুষ্পার্শ্বর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লীর এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় অনেকটা দায়ী; কেন না, লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক যদি তাঁহারা বিবেচনাসহকারে লোকমত পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লানমনে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষিতগণের শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীত ভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না। স্বজাতিকে

আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশমত কেহ ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতা-পূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যদ্ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা, ইংরাজী শিক্ষিত-গণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, লোক-সমাজের স্পৃহনীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচারব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে, সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং বিপদ, এই দুইএরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ, বিপদ, উভয়ই নির্ভর করিতেছে,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জন-সঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়,—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়,—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহা-জাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্ম-সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও

দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ, ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু না কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশ-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, কোন পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয় এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়, প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই, অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার অঙ্গপুষ্টি বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতিপদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন দুর্নীতির আশ্রয়বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে,—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষের পরিহার ও গুণের গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহ কালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার মনে করিয়া কার্য্য করার ফলে ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিততরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহার দূর [illegible] রাখিয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয়-সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতঃপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

তার'পর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য—নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়সমূহের আলোচনা অপেক্ষা এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্যনাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তারুণ্যের অরুণ আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধানসহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্যনাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাসকৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কিনা,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর

আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজচিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্যনাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে, সাধারণের মানসসম্পদের উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই আমাদের নবজাতা জাতীয়তা সুগঠিত হইবে, এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদি সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না, যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্ব্বথা গ্রাহ্য; আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা, আত্ম-পর-জ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা পথ ছাড়া ইহার অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও, আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাই নহে; তাহাতে আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা, ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন ইউরোপীয় বিবাহপদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন,—এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কারপরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমার সমাজের বা জাতীয়তায় পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ, উত্তরকালে তোমারই দেশের শতসহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অনুকরণে তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত, অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জন-সমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গ-সাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত, তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর, তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমার স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও, তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও,

দেখিয়া, তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও; তাহারা এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ত্যাগ করিয়া অন্য দেশের ভায়লেট্ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে, তাহারাই পরের দ্বারা উপহসিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে তোমার নিজের সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে। নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা (বা পার্লিয়ামেণ্ট)। তোমার দেশের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ সভার উপযোগিতা কত দূর, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের প্রজাতন্ত্র যেরূপভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। সে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশেরও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেদে, দেশের পরিচালন সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে ঐ উভয় পদ্ধতিরই দোষগুণের আলোচনা কর, এবং দেশবাসিদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোনটা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্য প্রকৃতির ন্যায়, নিরপেক্ষ হইয়া লোকের হিতকামনায় সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার বিফলাশ হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক ধান্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আশু ধান্যের বীজ বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ক্ষয়ে ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষার দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে, দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুকরণে সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বল চিত্র নিরপেক্ষরূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝিতে দাও যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও কারণ, এ কথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। যদি এই জটিল কঠিন সমস্যা মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই প্রকৃতপক্ষে তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক তোমার প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিবে। পথ যদি উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়াসম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভাল, নিষ্পাপ, এবং নির্দ্দোষ, তাহার সেবা কে না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ব্বক, তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া সদংশ, যাহা এদেশের অনুকূল, ঐ অংশ, যদি তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে তাহাই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই—ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকিয়াও এদেশবাসীয়া ইউরোপের শিক্ষার উত্তম ফলে বঞ্চিত থাকিবে না, প্রত্যুত, ক্রমেই তৎ-তৎ ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায়-বলেই অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয়ে সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অশ্বের উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া, যাহারা দর্শকদিগের প্রীতি ও কৌতুক উৎপাদন করে, তাহারা যেমন প্রধানতঃ সর্ব্বদাই স্মরণ রাখে যে, "অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই," তদ্রূপ আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া স্খলিত না হই। অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই। আমাদের রাজনীতি প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকার এমনই একটা গুণ আছে যে, এখানে ধর্ম্মভাববর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এ পর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক না

হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না।—সে চিত্র, গোধূলি-গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শপুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলরব কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয়-সাহিত্যসঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা আচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক; আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল; এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই, তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্য কোন বাধাবিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না; লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য, প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি উপাসকগণ অম্লান-বদনে, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—আমেরিকার পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক গহনবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই! তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির-নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক। অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া নিবন্ধনই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের বিনষ্টসম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মংগলচক্র ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দু জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার ব্যবহার, সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহনীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্যকানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায় তুমি ভক্তের ভাণ করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এইভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতঃপূর্ব্বে অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে, রোমের প্রাচীন সম্পদ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয় দর্শনে রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তাগঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিপুষ্ট থাকিতে পারিল না। পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে, ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে, গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীসের কলাবিদ্যা, গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিতের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে, রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তার বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার, তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন

রোমের সেই নানারত্নখচিত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরাজনিত পলিত অঙ্গ জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক হেঁট হইল।

কিন্তু এই গ্রীস-রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন সম্পদ্ তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার শূন্য ছিল, হয় ত গৃহের কোন এক কোণে, দু'একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়াছিল, তাই রোমীয়গণ দু হাতে গ্রীসের যতটা পারিয়াছে, দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে। তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আমাদের প্রাচীন সম্পদ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে, তাহার কোন একটিরও সর্ব্বনাশের হানি হইতে পারে, এমন কোন পদার্থ আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ, আমাদের যাহা নাই, অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ, যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি, গৃহ পূর্ণ করিব ; আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ সরঞ্জাম, তাহা যদি অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে অম্লান হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শ করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জ্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহারপূর্ব্বক কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ, এই দুইই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু, প্রাচীন শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্পকলা, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অবহানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি, কদাচ যেন জাতীয়তার বিসর্জ্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ ঐ বস্তুর কোনক্রমে কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধপরিকর হই। নিজের যাহা আছে, তাহা ত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না, সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বড় গৌরব করে, যাহা বরণীয়, অথচ আমার নাই তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে কদাচ আমি ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব না। কেবল পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্পদের আলোচনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি. আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত, তাহা উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাবপুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। যে বায়ু মধুকণা বহন করে না, তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে, তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে, সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী-যমুনা যে দেশের প্রবাহিনী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ-মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব।

আপনারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন,— বঙ্গবাণীর চরণপ্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশপূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা,— এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুকরণীয় হউক, যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় অবাধিত গতিতে, উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়,

মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে সুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে॥

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ　　জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩　　২য় সংখ্যা

স্বপ্নতত্ত্ব ও সাহিত্যে স্বপ্ন *

বাঙ্গালী কবি প্রিয়তম মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ বর্ণনা করিতে গাহিয়াছেন—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"। সম্ভব ও অসম্ভবের এমন মধুর সম্মিশ্রণ বলিয়াই স্বপ্নরাজ্য এত মনোহর ; শরৎকালের কৌমুদীমিশ্রিত পর্ণচ্ছায়ার ন্যায়, বঙ্গদেশের বিলে নীল জলে সবুজ ধানের ন্যায় এত লোভনীয়। তাই সভ্যতার আদিম কাল হইতে দার্শনিক, জ্যোতিষী, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এই 'স্বপ্ন' লইয়া কত তত্ত্বান্বেষণ, কত কল্পনা, কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, কত ভবিষ্যতের রেখাপাত করিয়া সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে আপনাদের নিকট তাহারই ক্ষীণ আভাস দিতে প্রয়াস পাইব।

(১) স্বপ্নের প্রকৃতি

স্বপ্নের প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা প্রথমেই অনুভব করিতে পারি যে, কল্পনা বা ইংরেজীতে যাহাকে Imagination বলে, তাহাই স্বপ্নের জননী। এই কল্পনা কিন্তু একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের কল্পনা ভিন্ন অপর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কল্পনা নহে। তাই পৃথিবীর সভ্য ভাষাতে 'স্বপ্নদর্শনের' অনুরূপ শব্দই বিদ্যমান আছে। ইংরেজীতে স্বপ্নের অপর নাম Vision; আমরা বাংলায় "স্বপ্ন দেখি" ভিন্ন "স্বপ্ন শুনি না"; যদিও কিছু কখনো শুনি, তাহা হইলে তাহা দেখার আনুষঙ্গিক মাত্র। স্বপ্নের দ্বিতীয় প্রকৃতি হইতেছে একবারে আত্ম-বিস্মৃতি। যখন আমরা বায়স্কোপে ছায়াচিত্রের মত কিম্বা সেক্সপীয়র-বর্ণিত ব্যাঙ্কোর (Banquo) ছায়ামূর্ত্তির মত স্বপ্নের ঘটনা দর্শন করিয়া যাই, তখন তাহা হাজার অসম্ভব হউক না কেন, তাহা যে প্রকৃত জীবনে অসম্ভব, ইহা আমরা ভাবিতে পারি না। এখানে কল্পনার রথ, পক্ষিরাজ ঘোড়া অপেক্ষাও দ্রুতগামী ; এ মানসিক রথ বায়ু হইতেও লঘুচারী বিদ্যুৎ হইতেও ক্ষিপ্রকারী, এবং আলোকরশ্মি হইতেও তূর্ণগতি।

স্বপ্নের ক্ষিপ্রগতি সম্বন্ধে ডাক্তার হল্যাণ্ডের (Dr. Holland) একটী বিবরণ আছে। তাহা এই যে, একটী বাক্য শুনিতে শুনিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন, এবং এক কি দুই সেকেণ্ডের

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

মধ্যে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি বহু দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন এবং সেখানে নানা কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু দুই সেকেণ্ড মধ্যেই তাঁহার নিদ্রা বা স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেলে তিনি সেই পঠ্যমান বাক্যটীর উপসংহার শুনিয়া সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এক রাজার গল্প আছে। তাহাতে কথিত আছে যে, রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার সভার সম্মুখে তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত কে একটী শ্বেত অশ্ব আনিয় বাঁধিয়া রাখিল। রাজার একটু তন্দ্রার মত আসিল। তিনি দেখিলেন যেন সেই অশ্বে চড়িয়া দূর হিমাদ্রিপ্রস্থে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। বহুদূর যাইয়া অরণ্যে পথহারা হইলেন ; ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রায় জীবন্মৃত, পানীয় বা আহার্য্যের চিহ্নও নাই তাঁহার পরিজনবর্গ কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। এমন সময় দেখিলেন যে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটী কিরাতকন্যা, কাহার জন্য যেন খাদ্য ও পানীয় লইয়া যাইতেছে। তৃষ্ণাতুর রাজা তাহা ভিক্ষা চাহিলে কন্যা বলিল, যদি রাজা তাহাকে পরিণয় করেন, তবে সে খাদ্যপানীয় দিতে পারে। ওষ্ঠাগত-প্রাণ রাজা অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। পরে দীর্ঘ বৎসর ঐ কিরাত-পল্লীতে অবস্থান করিয়া বহু সন্তানের পিত হইয়া বীভৎস জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন বাস-কানন দাবাগ্নিদগ্ধ হইলে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোনওস্থানে আশ্রয় লইলেন এবং নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরই আবার সেই পরিচিত রাজসভা। বিস্মিত-নয়নে রাজা মন্ত্রীকে সমুদায় বিবরণ বলিলে, অধিকতর বিস্ময়সহকারে মন্ত্রী কহিলেন যে, নিমেষমাত্র রাজা তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। আপনারা ওয়াসিংটন্ আর্ভিং (Washington Irving) প্রণীত মহম্মদের জীবন চরিতেও এমন একটী ঘটনা পড়িয়া থাকিবেন।

স্বপ্নের তৃতীয় প্রকৃতি 'অতি রঞ্জন' বা Exaggerated intensity। অতি সামান্য একটু বাহ্যিক কারণ বর্ত্তমান থাকিলেই, সেই তিলকে তালে পরিণত করাই স্বপ্নের স্বভাব। ডাক্তার জেমস্ গ্রেগারি (Dr. James Gregory) নামক একজন স্বপ্নতত্ত্ববিদ্ একদিন পায়ের নীচে একপাত্র গরম জল রাখিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন ; স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি এট্‌না Etna নামক আগ্নেয় পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন। ডাক্তার রীডের (Dr. Reid) মাথায় একটা ফোস্কা পড়িয়াছিল; তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার লাল অধিবাসীগণ (Red Indians) তাঁহাকে নিহত করিয়া কুঠার দ্বারা তাঁহার মাথার খুলি তুলিয়া ফেলিতেছে! আমরাও নিত্য জীবনে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিব যে, যদি কোনও দিন হয় তো সর্দ্দিতে একটু গলা কি বুক ধরিয়াছে, অমনি স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক সমুদ্রের পারে প্রকাণ্ড এক দৈত্য আসিয়া বুকে চাপিয়া বসিয়াছে, কিম্বা কোনও দস্যুদল অর্থলোভে পর্ব্বতগুহায় আবদ্ধ করিয়া জীবন্ত সমাহিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছে! কখনো কখনো স্বপ্নের আর একটী বিশেষত্ব দেখা যায় এই যে, এক স্বপ্নে পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য স্বপ্নের বিষয় পুনর্দ্দর্শন হয়। বোধ করি এই জন্যই লর্ড বায়রন্ (Lord Byron) লিখিয়াছেন।—

"Our life is twofold; Sleep hath its own world
* * * * * *
And a wide realm of wild reality,
And dreams in their development have breath
And tears and tortures, and the touch of joy.
* * * * The mind can make
Substance and people planets of its own
With beings brighter than have been, and give
A breath to forms which can outlive all flesh,"

The Dream.

(২) স্বপ্নের নিদান বা কারণ—

(ক) বৈজ্ঞানিক কারণ

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই স্বপ্নদর্শনরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার অতি প্রাচীন কাল হইতে মানব-চিত্তকে নানা ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, এবং অবশ্যই ইহার কারণ অনুসন্ধানে মানবকে কৌতূহলী করিয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ২১৬ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে লিখিত আছে,—

"প্রসন্নৈরিন্দ্রিয়ৈর্যদ্ যৎ সংকল্পয়তি মানসম্।
তত্তৎ স্বপ্নেঽপ্যুপগতে মনোহৃষ্যন্নিরীক্ষতে।"

"মন, প্রসন্ন ইন্দ্রিয়গণের সহিত যে যে বিষয় সংকল্প করে, স্বপ্নসময় উপস্থিত হইলে সেই সেই বিষয় নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।" (বর্দ্ধমানরাজবাটীর অনুবাদ)।

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রুড্ (Freud) সম্প্রতি স্বপ্নসম্বন্ধে যে একখানি বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন,তাহাতেও এই কথা আছে; যাহা দেখা যায় নাই, শোনা যায় নাই বা পূর্ব্বে অন্য ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রাহ্য হয় নাই, তেমন বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক অবস্থা দ্বারাও স্বপ্নের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। পাকস্থলী অথবা মস্তিষ্ক কিম্বা হৃদ্‌যন্ত্র উত্তেজিত থাকিলে সুনিদ্রার অভাবে অদ্ভুত ও অসম্বদ্ধ স্বপ্ন দেখা যায়। ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, যে দিন "পেট্ গরম" হয়, সে দিন যেন মন পাগল সাজে। কত অসম্ভব, কত অবাস্তব বস্তু চক্ষুর সম্মুখ দিয়া শোভা-যাত্রা করিয়া যেন কোথায় চলিয়া যায়। তাই হিন্দু-স্বপ্ন-বিজ্ঞানে :—

"ব্যাধিতেন, সশোকেন, চিন্তাগ্রস্তেন জন্তুনা।
দুরাকাঙ্ক্ষেণ মত্তেন দৃষ্টঃ স্বপ্নোনিরর্থকঃ।"

বলিয়া কথিত হইয়াছে। উল্লিখিত শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় স্বপ্নের কোনও মূল্য নাই; তাহা কেবল কল্পনার উদ্দাম লীলালহরী মাত্র।

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। প্রশ্ন হইতে পারে, "নিদ্রা হইলেই কি স্বপ্ন দেখিতে হইবে?" এক দল দার্শনিক, যথা, ডেকার্টে, কাণ্ট, স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন প্রভৃতি বলিয়াছেন, 'হাঁ তাই বটে'। ('Whether we recollect our dreams or not we dream.'—Hamilton)। চিন্তার স্রোত অপ্রতিহত। তাহার কখনো বিরতি হইতে পারে না। "যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।" তাহা হইলে, স্বপ্নেও চিন্তারূপ মনোধর্ম্মের বিরাম হইতে পারে না। ব্যাসদেবও শান্তিপর্ব্বে তাহাই বলিয়াছেন। লক্ (Locke) প্রভৃতি আর এক দল দার্শনিক আছেন, যাঁহারা ইঁহার বিপরীত মত পোষণ করেন;—প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে স্বপ্নদর্শন হইতে পারে না। তখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ন্যায় মন নামক ইন্দ্রিয়ও সুষুপ্তির সুখ উপভোগ করে। মন তখন নিষ্ক্রিয়, ইত্যাদি। কিন্তু 'স্বপ্ন' বিষয়টীর পর্য্যবেক্ষণ (Observatcon) এত জটিল, এত কুহেলিময় যে, ইহার কোন্ মতটী অভ্রান্ত সত্য, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

শারীর যন্ত্রের বৈকল্যহেতু নানা স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে, এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কাল হইতেই চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নির্ণয় করিতে অন্যান্য বিষয় মধ্যে নির্দ্দিষ্ট প্রকার স্বপ্নদর্শনকে অন্যতম লক্ষণ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক জগতে হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) ও গ্যালেন্ (Galen) হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের ডাক্তার পর্য্যন্ত রোগবিশেষে বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন সন্দর্শন হওয়ার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে জগতের আদিচিকিৎসাপ্রবর্ত্তক হিন্দু চরক ও সুশ্রুত কি বলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপতঃ সেই স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিব। চরক-সংহিতার "ইন্দ্রিয় স্থানের" প্রথম অধ্যায়ে রোগীর অরিষ্ট-লক্ষণসকলের কার্য্য-কারণ জানিবার উপদেশ আছে। উহা হিন্দু শারীর-বিজ্ঞানের (Physiology) অঙ্গ-বিশেষ। কোন্ রোগী কত দিন বাঁচিবে, যে চিকিৎসক তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে রোগীর বর্ণ, স্বর, আচার, আকৃতি, তন্দ্রা, স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে স্বপ্নদর্শনের বিষয় পঞ্চম অধ্যায়ে সবিস্তর কথিত হইয়াছে। আমরা কয়েকটী উদাহরণ সঙ্কলন করিতেছি :—

"ভগবান্ আত্রেয় বলিলেন—অন্যান্য সুদারুণ রোগের কতকগুলির পূর্ব্বরূপ বলিতেছি। মৃত্যু ঐ সকল রোগের অনুবর্ত্তী হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কুক্কুর, উষ্ট্র বা গর্দ্দভসমূহে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ মুখে গমন করে, যক্ষ্মারোগে তাহার

মৃত্যু হয়।…যে ব্যক্তি অদূরে আকাশকে লাক্ষারঞ্জিতের ন্যায় স্বপ্নে দর্শন করে, রক্তপিত্তরোগে তাহার মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে রাক্ষসদিগের সহিত নাচিতে নাচিতে জলে মগ্ন হয়, উন্মাদরোগে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।" চরকসংহিতা আরো বলিতেছেন,—"অনতিনিদ্রিত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পতি মনের বশে অনেক প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে। সেই সকল স্বপ্ন কখনো সফল, কখনো নিস্ফল হয়। স্বপ্ন সাত প্রকার,—দৃষ্ট অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তুর স্বপ্ন; শ্রুত বস্তুর স্বপ্ন; প্রার্থিত বস্তুর স্বপ্ন; অনুভূত বস্তুর স্বপ্ন; নিতান্তই কল্পনামূলক স্বপ্ন; ভবিষ্যৎ ফলাফলের স্বপ্ন; ও শরীরদোষজ (Due to bodily disturbance) স্বপ্ন। তন্মধ্যে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকগণ কেবল শেষ দুই প্রকার স্বপ্ন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ও দোষজ স্বপ্নই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। দিবা-স্ব, অতি হ্রস্ব ও অতি দীর্ঘ স্বপ্ন নিস্ফল হইয়া থাকে।"

"নাতি প্রসুপ্তঃ পুরুষঃ সফলান ফলানপি।
ইন্দ্রিয়েশেন মনসা স্বপান্ পশ্যত্যনেকধা॥
দৃষ্টং শ্রুতানুভূতঞ্চ প্রার্থিতং কল্পিতং তথা
ভাবিকং দোষজঞ্চৈব স্বপ্নং সপ্তবিধং বিদুঃ॥
তত্র পঞ্চবিধং পূর্ব্বমফলং ভিষগাদিশেৎ॥
দিবাস্বপ্নমতিহ্রস্বমতিদীর্ঘঞ্চ বুদ্ধিমান্॥
—ইন্দ্রিয়স্থান, ৫ম অধ্যায়, ২৮—৩০ শ্লোক।

সুশ্রুত-সংহিতায় পুরুষের সাত প্রকার প্রকৃতি (Temperament) নির্ণয় করিয়া, তাহার লক্ষণ বর্ণনার সময় কোন্ প্রকৃতির পুরুষ স্বভাবতঃ কি রকম স্বপ্ন দর্শন করে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা দুই একটী উদাহরণ দিতেছি—বাতিক ব্যক্তি (Windy person) "বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ"—স্বপ্নে আকাশেও গমন করিয়া থাকে। পিত্তপ্রকৃতিক ব্যক্তির (Bilious persons) অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এইরূপ হইয়া থাকে:—

"মেধাবী নিপুণমতি র্বিগৃহ্য বক্তা
তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনক পলাস কর্ণিকারান্
সম্পশ্যেদপিচ হুতাশ বিদ্যুদুল্কাঃ। সুশ্রুত, শাঃ ৪অঃ।

শ্লেষ্মপ্রকৃতিক ব্যক্তি (Phlegmatic person) অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এইরূপ লক্ষণ ধারণ করে—

"শুক্লাক্ষঃ স্থির কুটিলাতিনীলকেশো।
লক্ষ্মীবান্ জলদমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
সুপ্তঃ সন্ সকমলহংসচক্রবাকান্
সম্পশ্যেদপিচ জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্॥ ঐ

আমরা এখানেই বৈদ্যক গ্রন্থের স্বপ্নতত্ত্ব শেষ করিলাম, নচেৎ পুঁথি বহু বাড়িয়া যাইবে।

(খ) অলৌকিক কারণ

স্বপ্নের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি। তা ছাড়া, প্রাচীন জগতে স্বপ্নকে আরো এক ভাবে লক্ষ্য করা হইত; এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব। আধুনিক গবেষণার ফলে ইহা জানা যায় যে, কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতীয় মানবের মধ্যেই 'স্বপ্ন' যে দেবতাপ্রেরিত, এই বিশ্বাস ছিল। কখনো বা স্বপ্নে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেবতার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইত; কখনো বা নানা রকম রূপকে দেবতার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইত। এই রূপক স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার নিয়মাবলী নানা প্রাচীন জাতিতে শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হইয়া আছে। এই স্বপ্নের অর্থ করিবার জন্য প্রাচীন রাজসভায় রাজপণ্ডিতগণ থাকিতেন।

বাইবেলের ডেনিয়েল্ পরিচ্ছেদে (Book of Daniel) রাজা নেবুকাড্‌নেজার (Nabuchadnezzar) নানা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। উহা ঈশ্বরপ্রেরিত। রাজা একদিন স্বপ্নে একটী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তাহার মস্তক সুবর্ণে মণ্ডিত, বক্ষ ও হস্তদ্বয় রৌপ্যে পরিশোভিত, উদর ও উরুদেশ পিত্তলনির্ম্মিত, পদযুগল লৌহ ও মৃত্তিকায় গঠিত। আরো দেখিলেন, হস্তের সাহায্য ব্যতীত একখানা পাথর আসিয়া ঐ মূর্ত্তির পদযুগল ভগ্ন করিল, এবং সোনা, হিব্রু রূপা, পিতল, লোহা ও মাটী চূর্ণ হইয়া একত্র মিশিয়া গেল; বায়ু সে চূর্ণগুলি লইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল, এবং যে পাথরখানা ঐ

মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়াছিল, তাহা প্রকাণ্ড পর্ব্বতে পরিণত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বসিল। রাজসভার পণ্ডিতগণ এই স্বপ্নের অর্থ করিতে না পারিয়া রাজাদেশে নিহত হইলেন। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ডেনিয়েল্ (Daniel) তাহার ঠিক অর্থ করিয়া দিলেন। ডেনিয়েল বলিলেন যে, ঐ স্বর্ণমস্তক, রৌপ্যবাহু প্রভৃতি নেবুকাড্‌নেজারের পরবর্ত্তী রাজ্য; ক্রমে তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং অবশেষে এমন একটী রাজত্ব আসিবে, যাহা পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল ভাবে কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে। ডেনিয়েল্ আরো স্বপ্ন দেখিয়া তাহারও অর্থ করিয়াছিলেন। দেবদূত গাব্রিয়েল তাহার একটীর অর্থ করিয়া দেন। বাইবেল খুঁজিলে আরো বহু স্বপ্ন ও তাহার অর্থ করার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীক

গ্রীককবিকুলচূড়ামণি হোমর 'স্বপ্নকে' দেবপ্রেরিত বা দেবদূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্বপ্নের নাম হইতেছে, Theios Onieoros বা স্বপ্ন-দেবতা। ইনি দেবরাজ জ্যুসের (Zeus) আদেশমত স্বর্গের খবরবার্ত্তা লইয়া পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া নিদ্রাকালে তাহা জানাইতেন। ট্রয়ে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে রাজা আগামেম্‌নন্ (Agamemnon) এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল্ (Aristotle) ও প্লেটো (Plato) স্বপ্ন সম্বন্ধে এবং স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা আজিও কুতূহলের সহিত সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে।

লাটিন

রোমদেশেও স্বপ্নের অর্থ করা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। রোমের প্রখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সিসিরো (Cicero) প্রণীত De Divinatione ই বিখ্যাত। সিসিরো বলিয়াছেন যে, দেবতারা মনুষ্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা যে স্বর্গ হইতে স্বপ্নরূপে আদেশ প্রেরণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? তবে মানুষ নিজের দুর্ব্বলতা-বশতঃ সকল সময় স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমে ও দুঃখে পতিত হয়। দেশ, কাল, পাত্রভেদে কোন্ স্বপ্নের কিরূপ অর্থ করিতে হয়, তাহার নিয়মাবলী জানা থাকিলে মনুষ্য দেবাদেশ বা দেবাভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিরাময় হইয়া দীর্ঘজীবন লাভকরতঃ সুখে কালাতিপাত করিতে পারে।

পারসীক ও আরব

পারস্য ও আরব দেশেও স্বপ্নবিজ্ঞানের বিস্তৃত নিয়মাবলি আছে বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক দুষ্প্রাপ্য ও তাহার অনুবাদ না থাকায় আমরা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারি নাই।

ইংরেজী

ইংরেজী ভাষায় ব্র্যাণ্ড (Brand) প্রণীত স্বপ্নাভিধান (Dictionary of Dreams) আছে। তাহাতে নানারকম স্বপ্নের অদ্ভুত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এক্ষণে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ে কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তথাপি এক সময়ে উহার প্রচুর প্রভাব বিদ্যমান ছিল, এবং অদ্যাপি একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই। আপনারা অনেকেই য়্যাডিসনের (Addison) Spectator এ Popular Supersition সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। "Dreams go by contraries." ইহাও সেই Dream Divination বা স্বপ্নফল-বিজ্ঞানেরই প্রবচন।

হিন্দু

আমরা এক্ষণে হিন্দু স্বপ্নফল-বিজ্ঞানের আলোচনা করিব। হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে স্বপ্নদর্শনের প্রভাব সকলেই অবগত আছেন। আমরা অনেক বিষয়ই সেকেলে বলিয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিতে শিখিয়াছি। কিন্তু ধীরচিত্তে একটু প্রণিধান করিয়া সমস্ত স্বপ্নই নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। ক্ষমা করিবেন, এই বিষয়ের প্রারম্ভেই আমার নিজের দুই একটী অভিজ্ঞতার কথা বলিব; ইহার কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই, কিন্তু ঘটনা সত্য ইহাতে সন্দেহ নাই। চট্টগ্রামের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার বিক্রমপুরবাসী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন যে, বহু যত্নে লালিত, তৎকালে কঠিন রোগের কবল হইতে মুক্ত, কিশোর পুত্র আসিয়া বলিতেছে, "বাবা! আমি

চলিলাম, তোমরা বৃথাই আমাকে রাখিতে যত্ন করিয়াছিলে।" স্বপ্নভঙ্গে প্রভাতে বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে টেলিগ্রাম আসিল যে, সেই রাত্রিশেষে স্বপ্নের সময়েই তাঁহার পুত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ আরো দুই একটী নিজের জীবনে ও বন্ধুগণের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হয় তো কাকতালীয় ন্যায়ে তাহা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলিয়া সত্যই হইয়াছে। যাক্,এ সকল বিষয় ও স্বপ্নে ঔষধ প্রাপ্তি প্রভৃতি আত্মিক-তত্ত্বে আলোচনা করাই সমীচীন। আমরা এক্ষণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে সুখ-স্বপ্নের কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
তত্রৈব কাণ্বশাখায়াং পুণ্যকাণ্ডে মনোহরে।
সুব্যক্তো যশ্চ সুস্বপ্নঃ সংবৎপুণ্যফলপ্রদঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

সুতরাং এখানে বৈদিক গ্রন্থেও স্বপ্ন-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইতেছে। পুরাণ বলিতেছেন—

"রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখিলে এক বৎসরে, দ্বিতীয় প্রহরে আট মাসে, তৃতীয় প্রহরে তিন মাসে, চতুর্থ প্রহরে ১৫ দিবসে, সূর্য্যোদয়কালে দৃষ্ট স্বপ্ন সাত দিনে এবং প্রাতঃস্বপ্ন সদ্যঃফলদায়ক হইয়া থাকে।" কিন্তু যে সকল স্বপ্ন চিন্তা ব্যাধি সমাযুক্ত হইয়া, কিম্বা দিবসে নিরন্তর তত্তৎ বিষয় চিন্ত করিয়া কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা নিরর্থক। স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিতে নিদ্রা গেলে, সে স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। কাশ্যপ গোত্রীয় কোনও ব্যক্তির নিকট দৃষ্ট স্বপ্ন বলিলে তাহার ফল হয় না। [ভরসা করি এ সভায় কাশ্যপগোত্রীয় কেহ নাই!] নীচ ব্যক্তির নিকট বলিলে পীড়িত হয়; স্ত্রীর নিকট বলিলে ধনহানি হয়; রাত্রিতে বলিলে চৌরভয়প্রাপ্তি হয়। স্বপ্নে প্রাসাদে, পর্ব্বতে, হস্তিপৃষ্ঠে বা বৃক্ষে আরোহণ; ভোজন, রোদন, কম্বা নিজ শরীর বিষ বা রক্ত দ্বারা লিপ্ত দেখিলে, কিম্বা অস্ত্রবিদ্ধ হইলে অর্থলাভ হয়। স্বপ্নে যদি কেহ নদীর তীরে দই-ভাত কিম্বা পায়স ছেঁড়া পদ্মপাতায় করিয়া আহার করা দেখে, তাহা হইলে সে রাজা হইয়া থাকে। যাহাকে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী হাতে করিয়া ফল দেন, সে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করিবে। স্বপ্নে চন্দ্র, সূর্য্য, কিম্বা সর্পদষ্ট হইয়াছে দেখিলে রোগমুক্তি হইবে।'

মৎস্যপুরাণের ২৪১ অধ্যায়ে দুঃস্বপ্নদর্শনের ফল লিখিত হইয়াছে। পুথি বাড়িবার ভয়ে সংক্ষেপে তাহার দুই চারিটী কথার উল্লেখ করিব।

"স্বপ্নে পাককরা মাংস, তৈল, মুগের পিঠা ভক্ষণ, নর্ত্তন, হাস্য, গান ও বিবাহ দর্শন করিলে; দেব, দ্বিজ, রাজা ও গুরুর ক্রুদ্ধ হওয়া; গৃহের পতন; গৃহ মার্জ্জন করা; গৈরিক বসন ধারণ, দক্ষিণ দিকে গমন; স্বীয় অঙ্গহানি দর্শন, রক্তমাল্যানুলেপন ধারণ প্রভৃতি দুঃস্বপ্ন ও অমঙ্গলের বার্ত্তাবহ। দুঃস্বপ্ন দেখিয়া লোকের নিকট বলিবে, কিম্বা রাত্রিতে আবার নিদ্রা যাইবে। ব্রাহ্মণপূজা, তিল দ্বারা হোম ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিবে।"

ইহাই সংক্ষেপতঃ হিন্দু স্বপ্নফল-বিজ্ঞান। কালিকা-পুরাণ, দেবীপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণেশখণ্ড, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে স্বপ্নফলের সুবিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণেও "কাঞ্চনং পাদপং দৃষ্ট্বা পুনর্জীবিতু মিচ্ছসি" ইত্যাদি স্বপ্নফলের কথাই বর্ণিত আছে।

(৩) স্বপ্ন ও বিচার-শক্তি

স্বপ্নদর্শনের আর একটা দিক্ সম্বন্ধে একটু আলোচনার আবশ্যক। ইহা সাধারণতঃ বলা হয় যে, স্বপ্নে বিচার কিম্বা ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য অতি কম। তাই অনেকে স্বপ্নকে উন্মাদের প্রলাপের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। স্বপ্নপ্রয়াণ নাটকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জন্যই স্বপ্নের বর্ণনা করিয়াছেন :—

"অচেতনে চেতন! ঘুমন্তে জাগা!
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড গোড়া নাই আগা।
স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা॥"

কিন্তু বস্তুতঃই কি তাই? ইংরেজ কবি কোল্‌রিজ (Coleridge) স্বপ্নে 'কুব্লে খাঁ' (Kubla Khan) লিখিয়াছিলেন; ফরাসিস্

লেখক কণ্ডিল্যাক্(Condilac)তাঁহার একখানি গ্রন্থ স্বপ্নাবস্থায় সমাপ্ত করিয়াছিলেন; আপনারা বিদ্যাসাগরের 'আখ্যান মঞ্জরী'তে পড়িয়াছেন, একজন ছাত্রের দুরূহ অঙ্কের সম্পাদ্য সমাধান স্বপ্নাবস্থাতেই সংঘটিত হইয়াছিল। আমার পরিচিত একজন বাঙ্গালী, স্বপ্নে এই ইংরাজী কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, অথবা 'দেখিয়াছিলেন'; নিদ্রা হইতে উঠিয়াই তিনি তাহা কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নিদ্রার পূর্ব্বে তিনি উপনিষদ্ পড়িতেছিলেন:—

In the morning light of life, thy bells of
 fame were rung,
And stealing fragrance from the woods
 thy sweetest songs were sung,
My Country! but on thy lone and luck-
 less, voiceless shore
The Lyre divine, that once was thine,
 alas! doth sound no more!

একটু প্রণিধান করিলে, আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যদিও অধিকাংশ স্বপ্ন, বিশেষতঃ অজীর্ণাবস্থার স্বপ্নগুলি উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অসংবদ্ধ (incoherent), তথাপি এমন অনেক স্বপ্ন আছে, যাহাতে বিচারশক্তির প্রভূত আধিপত্য বিদ্যমান থাকে।

যদি কোনও মানসিক ভাব বা Idea মূলে স্বপ্ন-দর্শন হয়, তবে সেই ভাবের সহিত সম্বদ্ধ ভাবগুলিও স্বপ্নে দৃষ্ট হইবে। মনোবিজ্ঞানে যাহাকে ভাব-সাহচর্য্য অথবা Association of ideas বলে, স্বপ্নে তাহার লীলা সামান্য নহে। মনে করুন, আপনি কোনও ঐশ্বর্য্যের ভাবে প্রণোদিত হইয়া বিপুল ধনাগম স্বপ্নে দেখিতেছেন, আপনি সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের সহচর দালানকোঠা, গাড়ীঘোড়া, দাসদাসী ও ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ প্রচেষ্টাসকলও নিশ্চয়ই স্বপ্নে দেখিবেন, যদি স্বপ্ন দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। এই স্বপ্ন-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া ফরাসী পণ্ডিত মরি(Maury)ইচ্ছা-মত সুখস্বপ্ন দেখা যায় কি না, তাহার পরীক্ষা করিতেন। যেমন, নিদ্রাকালে একটী লোক কাণের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া কোনও সুখকর কথা বলিলে Association of ideas এর বলে দীর্ঘ সুখস্বপ্ন দেখারই সম্ভব, ইত্যাদি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে নিদ্রিত শ্রীমন্তের কাণে কাণে মৃদু কথা বলিয়া চণ্ডীকর্ত্তৃক খুল্লনার স্বপ্ন দর্শান, ইহার একটী উদাহরণ।

আমরা এতক্ষণ স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক দিক্ আলোচনা করিয়াছি। 'স্বপ্ন' পর্য্যবেক্ষণ করা এতই দুঃসাধ্য যে, ইহার প্রকৃতি নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের এক দুরূহ অধ্যায়। এ বিষয়ে যতই অধিক আলোচনা হইবে, ততই অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। স্বাধীনভাবে ইহার আলোচনা করা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত।

(৪) সাহিত্যে স্বপ্ন

আমরা দেখিয়াছি, 'স্বপ্ন' কল্পনাজননীর স্বভাবসুন্দর শিশু। তাই 'কল্পনা' যে সাহিত্য-রাজ্যের অধীশ্বরী, সেখানে তাঁহার স্বপ্নশিশুর অবারিত গতি। অধরে বাঁধুলী, অঙ্গুলিতে চাঁপাকলি, দেহে জমাট-বাঁধা জ্যোৎস্না, হাসিতে শরৎফুল্ল কুমুদিনী, নয়নে অপরাজিতা, কণ্ঠে দয়েল, কোয়েল, বুল বুল; চরণে স্থলপদ্ম, অঙ্গভঙ্গীতে গিরিনদীর চঞ্চলতা এবং সমস্ত জীবনটুকুতে ক্ষুদ্র শেফালির মনোজ্ঞ গন্ধ লইয়া মূর্ত্তিমান আনন্দ-স্বরূপ শিশু যেমন জননীর আশেপাশে, চারি ভিতে, নিভৃত গৃহকোণে, কি পর্ণকুটীরে, কি মর্ম্মরখচিত রাজপ্রাসাদে নৃত্য করে, হাস্য করে, বিচরণ করে, কূজন করে বা কখনো গম্ভীর বদনে বসিয়া থাকে; কল্পনার এই প্রিয় স্বপ্ন-শিশুটীও তেমনি সাহিত্যক্ষেত্রে নানা বেশে, নানা ভঙ্গীতে, শরীরে নানা অলঙ্কার লইয়া কখনো হাসিয়া আকুল, কখনো কাঁদিয়া আচ্ছন্ন, কখনো ভয় দেখাইয়া আনন্দিত, কখনো বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত গম্ভীর। এমন রসাল, এমন কুহেলিময়, এমন ছায়াবাজীর মত স্বপ্ন যে কল্পনা-সাহিত্যে বিশেষ ও প্রভূতভাবে নিয়োজিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

কাব্যসৃষ্টিতে স্বপ্নের আসন আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। কিন্তু কবিসৃষ্টিতেই স্বপ্নের আবশ্যক। গ্রীক

কবি 'পিণ্ডার' স্বপ্নে দেখিলেন, এক ঝাঁক মৌমাছি তাঁহার অধরোষ্ঠে বসিয়াছিল। হিব্রু কবি 'ইসাইজার' অধরোষ্ঠে স্বয়ং ভগবান জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করাইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবির, "শিয়র দেশে, উরিয়া মায়ের বেশে, চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে" ; তার পর কবি যখন

"ক্ষুধা, ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেলা সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।"

তখন

"করিয়ে পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা করিতে সঙ্গীত॥"

তার পর ভারতচন্দ্র সম্বন্ধেও সেই স্বপ্ন :—

"অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
* * * *
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥"

আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের উদাহরণ প্রধানতঃ প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু কাব্য হইতেই সংগ্রহ করিব। কারণ, জগতের সমস্ত কাব্যের স্বপ্নের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কি সম্ভবপরও হইতে পারে না —

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।"

১। কোনও অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করিতে স্বপ্নের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনীতে :—

"উষা বাণস্য দুহিতা স্বপ্নে প্রাদ্যুম্নিনা রতিং।
কন্যাহলভত কান্তেন প্রাগদৃষ্ট শ্রুতেন বা॥"

বাণ রাজার কন্যা কুমারী উষা, অদৃষ্টঅশ্রুতপূর্ব্ব কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নে সমাগম লাভ করিলেন। নিদ্রোত্থিতা হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় সখী চিত্রলেখা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, এক অদৃষ্ট-অশ্রুতপূর্ব্ব যুবাকে স্বপ্নে দর্শনের বিষয় বলিলেন। চিত্রকলাবিদুষী চিত্রলেখা একে একে ত্রিজগতের যাবতীয় যুবার চিত্র অঙ্কিত কিরিয়া উষাকে দেখাইতে লাগিলেন। অনেক চিত্রের পর অনিরুদ্ধের ছবিটী অঙ্কিত হইল। তার পর নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে খাটশুদ্ধ উষার মন্দিরে আনয়ন করা হইল, ইত্যাদি। এই অদ্ভুত গল্পের সবই অদ্ভুত। তাই সর্ব্বকার্য্যক্ষম স্বপ্নের আবশ্যক হইয়াছে।

২। কখনো বা স্বপ্ন বিষাদকাহিনী বিষণ্ণতর করিতে নিয়োজিত হইয়া থাকে :—

মেঘদূতের যক্ষ দুর্ব্বহ বিরহে কাতর হইয়া রাত্রিতে প্রিয়তমাকে স্বপ্নে দেখিতেছে, কিন্তু হায়! সে স্বপ্নলব্ধ মিলনও অচিরস্থায়ী। সেই সুখস্বপ্নভঙ্গে যক্ষের দুঃখে বন-দেবতারাও কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন :—

"মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি পুরঃ স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলা স্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥"

হর-বিরহবিধুরা উন্মনা উমা রাত্রির তৃতীয় প্রহরে কথঞ্চিৎ তন্দ্রাবিষ্টা হইয়া মহাদেবকে স্বপ্নে দেখিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসি?" তাহা দেখিয়া বনান্ত-সঙ্গীতসখীগণ রোদন করিতেছে।

শকুন্তলার বিরহবেদনায় ক্লিষ্ট দুষ্যন্তের নিদ্রা আসিতেছে না ; তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—.

"প্রজাগরাৎ খিলীভূত স্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।"

—অনিদ্রায় তাঁহার স্বপ্নদর্শন অসম্ভব হইয়াছে।

আর, বাঙ্গালী কবি পুত্রস্নেহে কাতরা, বৎসলা যশোদার মুখে গাহিলেন— .

"শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালো।"

(৩) আবার দেখিতে পাই, আনন্দ-জোয়ারে স্বপ্নেরই ঢেউ খেলিতেছে। সে দিন বসন্তের দক্ষিণা বহিতেছিল, নববধূর মত কোকিলা দুটী একটী কথা কহিতেছিল, সে কাকলি "শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ।" তখন বৈষ্ণবকবি মৈথিল বিদ্যাপতি গাহিলেন :—

"সরস বসন্ত সময় ভল পাওলি
দছিন পওন বহু ধীরে
সপনহু রূপ বচন এক ভাখিয়ে
মুখ সঁ দুরি করু চীরে।"

বুঝি বা এত সৌন্দর্য্যের লীলা স্বপ্নাবেশ ভিন্ন তেমন রসাল হইয়া জমে না। বিরহে কৃষ্ণস্পর্শের আনন্দস্মৃতি স্বপ্নেই রাধিকার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছে। চণ্ডীদাস গাহিতেছেন :—

"পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে ;
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে ॥"

(৪) কখনো বা স্বপ্ন কোনও মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া লোকলোচনসমক্ষে উপস্থিত হয়। রঘুবংশে কুশ পৈত্রিক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুশাবতীতে অবস্থান করিতেছেন। পিতৃবিয়োগের পর রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যক্তা, হতশ্রী, নিরাভরণা হইয়া আছে। তাই অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'অর্দ্ধরাত্রে, স্তিমিত প্রদীপে শয্যাগৃহে' কুশের নিকট স্বপ্নের (vison) ন্যায় আবির্ভূত হইয়া দুঃখকাহিনী কহিতেছেন।

মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গেও হোমরের (Homer) স্বপ্নদেবতার (Theios Onieoros) অনুকরণে মায়াদেবী সৃষ্ট হইয়াছেন।

"কৈলাস সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদু স্বরে কহিলা পার্ব্বতী ॥"

(৫) রূপক অথবা Allegory লিখিতে হইলে স্বপ্নেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বিদ্যা-বিষয়ক' স্বপ্ন অথবা হেমচন্দ্রের 'আশাকাননের' স্বপ্ন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাল্যকালে প্রায় সকলেই "চারুপাঠ" পড়িয়াছেন, সুতরাং বিদ্যাবিষয়ক স্বপ্নের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কবি হেমচন্দ্র দামোদরনদের তীরে তীরে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রান্তি-অভিভূত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

"ক্রমে নিদ্রাঘোরে, অবসন্ন তনু
পরাণী আছন্ন হয়,
স্বপন-প্রসাদে সংসার-ভাবনা
পাসরিনু সমুদয়।
ভাবি যেন নব নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই,
আসি কত দূর, ছাড়ি কত দেশ,
কানন দেখিতে পাই।"

ক্রমে 'আশা' নামক এক প্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাহার সঙ্গে ছয়দ্বারবিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রের শক্তি, অধ্যবসায়, সাহস, ধৈর্য্য, শ্রম, ও উৎসাহ এই ছয়জন প্রহরীকে দর্শন করিয়া যশঃ-শৈলের শিখরদেশে বাল্মীকিকে দর্শন করিলেন।

এইরূপে সমগ্র মানবজীবনের লীলাগুলি প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। স্নেহ, ভক্তি, প্রণয়, বাৎসল্য, পরিণয় প্রভৃতি মূর্ত্তিবদ্ধ হইয়া প্রতিভাত হইল ; মাতৃস্নেহ, সান্ত্বনা, বিবেক, শোক চক্ষুর্বিষয়ে অবস্থান করিল ; পরিশেষে হতাশের মূর্ত্তি দেখিয়া কবির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

"নিদ্রাভঙ্গে পুনঃ সেই তরুতল,
হেরি দামোদর ধার।"

(৫) তার পর,প্রাচীন রীতি অনুসারে কৃতী লেখকগণ স্বপ্ন-দর্শনকে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভাসরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন ; "Coming events cast their shadows before" এই নীতি অবলম্বন করিয়া স্বপ্নদ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেন। ইংরাজীতে ইহাকে Prescience

বলে। বাংলায় উহাকে "অনাগত-বস্তুজ্ঞান" বলা যাইতে পারে এরূপ স্বপ্নবর্ণন প্রচলিত নাটক উপন্যাসে সচরাচর দেখা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন অথবা 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর স্বপ্ন সুনিপুণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। কুন্দনন্দিনীর ভাবী দুঃখময় পরিণাম, শৈবলিনীর অতীত জীবনে স্বামীর নিকট অপরাধের জন্য আত্মগ্লানি ও বিবেকদংশন অতি আশ্চর্য্য-রূপে স্বপ্নের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে।

'পলাশির যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলার পাপরাশি স্বপ্নাকারে তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। সে কি ভীষণ স্বপ্ন!—"বলিতে শোণিত কণ্ঠে শুকাইয়া যায়।" এমন কে আছেন, যিনি "সিরাজ! আমি রে তোর পিতৃব্যকামিনী," অথবা, "আমি রে হোসেনকুলি, ওরে দুরাচার!" ইত্যাদি লাইনগুলি পড়িয়া লোমাঞ্চিত না হইবেন? স্বপ্নদর্শন কি অপূর্ব্ব কৌশলে, কি অপূর্ব্ব শক্তিতে নিয়োজিত হইয়াছে।

(৬) পরিশেষে, স্বপ্নের আশ্রয় লইয়া রবীন্দ্রনাথ বিদ্রূপের বিষ-বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কেবল অর্থহীন শব্দরাশি অনুকরণ করিয়া যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্ব অনুশীলন করেন, যে শব্দরাশি গভীর দার্শনিক তত্ত্বের প্রকাশক বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ তাহা নিরর্থক Cant মাত্র, কাহারও কোনও উপকারে আসে না, কেবল শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। আমাদের মনে হয় ইহাই 'হিং টিং ছটের' অর্থ।

"স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবু চন্দ্র ভূপ।
অর্থ তার ভেবে ভেবে গবু চন্দ্র চুপ।
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটা বাঁদরে,
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে।
সহসা আসিল এক বুড়ী থুড় থুড়ি,
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড় সুড়ি।
এমন সময় তথা এলো এক বেদে,
পাখী উড়ে গেছে বলি মরে কেঁদে কেঁদে।"

নানা অত্যাচারে—

পাখীর মতন রাজা করে ছট্ ফট্
বেদে কানে কানে বলে হিং টিং ছট্।
স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অমৃত সমান।
গৌড়ানন্দ কবি কহে শোনে পুণ্যবান্।"

"এই হিং টিং ছটের" অর্থকরণ লইয়া রাজ্যে মহা হুলস্থূল ব্যাপার। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর এক গৌড়ীয় (বাঙ্গালী) পণ্ডিত তাহার 'অতি পরিষ্কার' অর্থ করিলেন; অনেক মাথামুণ্ড শব্দযোজনার মধ্যে—

"আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি—
আদ্যাশক্তি স্থূল শক্তি প্রকাশ প্রকট্—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্!"

উপসংহার—

আমার বক্তব্য শেষ করিয়াছি। কবি দেবেন্দ্রনাথের রাধিকা, সখীকে বলিতেছেন:—

"সাজাইয়া দে লো আজি বাসন্তিয়া বসনে,
শিরে কর্ণিকার ফুল,
কানে নাগেশ্বর দুল;
অতসী কুসুমে দে রে নূপুরিয়া চরণে;
ঝলকিয়া অলকেরে চামেলী ও বকুলে;
সাজাইয়া দে লো আজি মোহনিয়া দুকূলে,
গলেতে মালতীমালা
পরাইয়া দে লো বালা!
মনোলোভা চামেলি ও মতিয়ার মুকুলে,
শ্যাম যেন বলে হেন বধূ নাহি গোকুলে॥"

আমরাও সেইরূপ বলিতেছি যে, স্বপ্নসখী সাহিত্যরাণীর নানা অঙ্গ কুসুমপেলব নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া তাহাকে রস-গ্রাহীর নিতান্তই লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে।

পুঁথি বড় বাড়িয়া গেল। কিন্তু বহু সংক্ষেপ করিতে চাহিয়াও পারি নাই। আরো যে কত বলিবার ছিল! যাহা হউক, এখানে আমি সবিনয়ে আপনাদের ধৈর্য্যকে ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

সোসিয়ালিজ্‌ম্‌

(৭)

আনার্কিজ্‌ম্‌ বা অরাজকতাবাদ

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেই সোসিয়ালিজ্‌মের প্রথম উদ্ভব ও জার্ম্মাণিতে উহার বিশেষ পরিপুষ্টি সাধিত হইলেও, এই সকল দেশে কখনও আনার্কিজ্‌ম্‌ (Anarchism) বা অরাজকতা-বাদের বহুল প্রচার হইতে পারে নাই। দু'চারি জন বিপ্লবপ্রয়াসীব্যক্তি যে সময়ে সময়ে অরাজকতাবাদ প্রচারের বা বিপ্লব-সংঘটনের চেষ্টা করে নাই, তাহা নহে; কিন্তু ইংরাজ, ফরাসী বা জার্ম্মাণ জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইহা কোন কালেই তেমন ভাবে আদৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে, স্পেন, ইটালি বা রুশিয়াতে সোসিয়ালিজ্‌মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বগ্রাসী অরাজকতা-বহ্নি একেবারে দিগন্তপ্রসারিত হইয়া পড়ে। একই কারণ হইতে এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যোৎপত্তির প্রকৃত হেতু নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, উভয় শ্রেণীর দেশসমূহের পূর্ব্বাপর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের সবিস্তর আলোচনার দরকার।

ইংলণ্ডের ইতিহাসের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, বহুকাল হইতেই ইংরাজ জনসাধারণ দেশের শাসনসংরক্ষণাদি ব্যাপারে নানা রকমে সংশ্লিষ্ট আছে; এইরূপ সংশ্লিষ্ট থাকাতে রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে তাহাদের একটা সহজাত সংস্কার জন্মিয়াছে। হাতে-কলমে লব্ধ অভিজ্ঞতার একটা প্রধান গুণ এই যে, এতদ্দ্বারা অনুরূপ দায়িত্ব-জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। যাহার প্রকৃত দায়িত্ব-জ্ঞান আছে, সে কখনই সর্ব্ববিধ্বংসী বিপ্লব বা অরাজকতার পক্ষপাতী হইতে পারে না। ইংলণ্ডে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনবরতই ভাব-বিনিময় হইয়া থাকে; সুতরাং উভয়েই উভয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত থাকিতে পারে। যেখানে কোনও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের কোনরূপ সুবন্দোবস্ত নাই, সেখানে একের নির্দ্দোষ কার্য্যও অন্যের নিকট দোষাত্মক প্রতীয়মান হওয়া আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে; এবং এরূপ স্থলে কুচক্রীগণও একের বিরুদ্ধে অন্যকে উষ্‌কাইয়া দিয়া নিজেদের মতলব সিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য একদল স্বাধীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহারা উভয়ের সহিতই সর্ব্বদা মিশিতে পারে; সুতরাং একের অবস্থা অন্যের নিকট যথাযথরূপে ব্যক্ত করিতে ইহারা যেরূপ সমর্থ, অন্য কেহই সেরূপ হইতে পারে না। ইংলণ্ডে এইরূপ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর ইংরাজ রাজপুরুষগণ জন-মতকে যথোচিত সম্মান করিতে শিখিয়াছেন; তাঁহারা যখনই দেখেন যে, কোনও বিষয়ে জনমত অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে ও বিশেষ সুস্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে, তখনই তাঁহারা উহা পদদলিত না করিয়া, বরং যাহাতে উহাকে দেশের হিতকর কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, ইহাই ইংরাজ-চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। বলা বাহুল্য যে, এমতাবস্থায় রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে কোন জনমতই ক্রমশঃ জমাটবদ্ধ হইয়া পরিণামে বিপ্লবানল প্রজ্বলিত করিতে পারে না। ফরাসী বা জার্ম্মাণ জন-সাধারণের ইংরাজদের ন্যায় এতটা অধিকার নাই এবং সেইজন্যই ইংলণ্ডে যেমন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত, ফ্রান্স বা জার্ম্মাণিতে তেমন নহে। তথাপি অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসী ও জার্ম্মাণগণ অনেক প্রকার অধিকার ভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং এই দুই দেশেও আজকাল সাধারণতঃ বিশেষ কোনও বিপ্লবের সৃষ্টি হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত ছিল। একদিকে দায়িত্ব-বোধহীনকর্ম্মচারি-পরিসেবিত স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, ও অপর দিকে নিরক্ষর, রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কৃষককুল—সমগ্র রুশীয় সমাজ এই দুইটী মাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। রুশিয়াতে কোনও মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকাতে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনও রূপ ভাব-বিনিময় হইতে পারিত না বলিলেই হয়। সম্রাট মনে করিতেন, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা; তাঁহার উপরে কথা বলে, এ পৃথিবীতে এমন কেহই নাই; এবং

তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্যকরূপে প্রতিপালন করাই প্রজাসাধারণের একমাত্র কর্ত্তব্য। রাজকর্ম্মচারীগণ বিবেচনা করিতেন যে, তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতেই বেতন পান, সুতরাং যদি তাঁহাদের কোনও কর্ত্তব্য থাকে, তবে তাহা একমাত্র সম্রাটের নিকট; একমাত্র সম্রাটই তাঁহাদের কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারেন—প্রজাসাধারণের এ বিষয়ে কিছুমাত্র অধিকার নাই। প্রজারাও তেমনি দেশের শাসন-সংরক্ষণাদি ব্যাপারের কোনও খোঁজ-খবর রাখা নিতান্ত অনাবশ্যক ও অনধিকার চর্চ্চা বলিয়াই মনে করিত। কৃষিই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল, এবং শীতগ্রীষ্মনির্ব্বিশেষে বার মাস ক্ষেত্রের কাজ করিয়া রাজনীতি বা সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা করা তাহাদের সময়ে কুলাইয়া উঠিত না। এ সমস্ত করিতে হইলে, অবসরের দরকার—অবস্থাও সচ্ছল হওয়া চাই। যাহাদিগকে এক দিন ক্ষেত্রের কাজে অমনোযোগী হইলে, সারাটী বৎসর স্ত্রীপুত্রসহকারে অনশনের যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনা তাহাদের কাজ নহে। বরং, স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া নিরুদ্বেগে দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পারিলেই ইহারা আপনাদিগকে মহা ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলে, রুশিয়াতে একদল শাসন করিত, আর একদল শাসিত হইত; এতদুভয়ের অন্তবর্ত্তী কোন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল না; সুতরাং এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও ভাব-বিনিময় হইত না, বা তৎকালীন অবস্থাতে ভাববিনিময়ের কোনও দরকারও ছিল না।

যত দিন উভয় সম্প্রদায়েরই এইরূপ অবস্থা ছিল, তত দিন রুশিয়াতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোনও গোলমাল ঘটে নাই। কিন্তু চিরদিনই সমান যায় না। রুশ সম্রাট মহামতি পিটার (Peter the Great) পার্শ্ববর্ত্তী ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে প্রভূতক্ষমতাশালী দেখিয়া তাঁহাদের সমকক্ষ হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, ইউরোপের সমকক্ষ হইতে হইলে, রুশ জনসাধারণকে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতিতে বিভূষিত করিতে হইবে। রুষ সম্রাট পিটারই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য আদর্শ পরিবর্জ্জন করিয়া প্রতীচ্য আদর্শের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণ তাঁহার এই উদ্দেশ্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার জন্য যথাসম্ভব যত্ন-চেষ্টায় কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই।

১৮৫৪-৫৬ খৃঃ অব্দে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্রিমীয় যুদ্ধে (The Crimean War) সম্মিলিত ইংরাজ ও ফরাসী শক্তি কর্ত্তৃক রুশিয়ার ভয়ানক পরাজয় হয়, এবং এই সাংঘাতিক পরাজয়ের পর শিক্ষিত রুশমাত্রের মনেই একটা প্রবল ধারণা জন্মে যে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত সমকক্ষতা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে, ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। তদানীন্তন রুষ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের (Alexander II) মনেও এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি শিক্ষা ও শাসনাদি বিষয়ে ইউরোপীয় আদর্শে বহুবিধ সংস্কারের প্রবর্ত্তন করেন। যাহারা এতকাল কোনও রূপ অধিকার ভোগের কল্পনাও করিতে পারে নাই, তাহারা এক্ষণে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অধিকারের সুমধুর পরিচয় পাইয়া আরও অধিকার লাভের জন্য একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। অধিকার ভোগ করিতে হইলে যে অনুরূপ দায়িত্বজ্ঞান থাকাও আবশ্যক, এই অভিনব আন্দোলনকারীগণ তাহা সম্যক বুঝিতে পারিল না—ফলে, তাহারা গবর্ণমেণ্টের সমালোচক হইল বটে, কিন্তু সহযোগী হইতে পারিল না। সম্রাটের অনুগ্রহদত্ত অযত্নসুলভ অধিকারের প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের জন্মিল না। দায়িত্ববোধহীন আন্দোলনকারীদের একটা স্বভাবই এই যে, তাহারা প্রায়ই নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া দাঁড়ায়; কোনও বিষয়ে দাবী করিলে, তাহা পাইতে যদি কিছুমাত্র দেরী হয়, তবে বিলম্বের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান বা তাহাদের দাবীপূরণ সম্ভব, কি অসম্ভব, তাহা কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, প্রতিপক্ষের প্রতি অমূলক উদ্দেশ্যের আরোপ করিয়া থাকে। অপিচ, এইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান-হীন হইয়া একপক্ষ চরমে গেলেই, ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়মানু-

সারে প্রতিপক্ষও অনেক সময়ে অপর চরমে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকে; তাহার ফলে উভয় পক্ষের দূরত্ব ও মনোমালিন্য ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এক্ষণে রুশিয়াতেও ঠিক তাহাই হইল। নব্যতান্ত্রিকগণ যতই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে লাগিল, ততই বিরোধী আর একদল লোকের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সকল বিষয়েই পুরাতনের সমর্থন ও নূতনের বিরুদ্ধাচরণ করাই ইহাদের কাজ হইল। এইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সংস্কারকের দল অনেক সময়ে বুদ্ধিবিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিল না। ইহাতে কিন্তু প্রতিপক্ষ দলেরই সুবিধা হইল। তাহারা সম্রাটকে বুঝাইতে লাগিল যে, তিনি যে সমস্ত সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতেই এই সমস্ত অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি হইতেছে—সুতরাং ঐগুলি রদ করিলেই, গোলমাল থামিয়া যাইবে। আলেকজাণ্ডার প্রথম প্রথম ইহাদের অযাচিত উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু নব্যতান্ত্রিকগণের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান অন্যায় ও অবিচার দেখিয়া প্রবর্ত্তিত সংস্কারের ফলাফল সম্বন্ধে সম্রাটের মনেও ক্রমে ক্রমে সন্দেহ উপস্থিত হইল, এবং অবশেষে তিনি তৎসমুদয় রদ করিতে বাধ্য হইলেন।

প্রাচীনপন্থীগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু তাহারা সম্রাটকে যে আশার বাণী শুনাইয়াছিল, তাহা কিন্তু পূর্ণ হইল না; অশান্তির মাত্রা কিছুমাত্র না কমিয়া বরং হুবহু বাড়িয়াই চলিল। গবর্ণমেণ্টের কৃত কার্য্যের প্রতি অমূলক দোষারোপ করিবার লোকের পূর্ব্বেও অভাব ছিল না—এক্ষণে তাহাদের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল—তাহারা আগুনে ঘি ঢালিতে লাগিল। ফলে, উভয় পক্ষই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করিয়া পরস্পরের ধ্বংস-সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল, এবং অরাজকতা-বহ্নির লেলিহান্ জিহ্বা সমগ্র রুশিয়া দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

রুশীয় আনার্কিজ্ম্‌কে সাধারণতঃ তিন স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) নিহিলিজ্ম্ (Nihilism) বা নেতি-বাদ। দেশভেদে, দেশবাসীভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে এবং দেশের শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতির ভেদে, দেশের সমাজ ও শাসনব্যবস্থা প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন যে অবশ্যম্ভাবী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নিহিলিষ্টগণ ইহা আদৌ বুঝিতেই পারে নাই। যে যে ব্যবস্থা ও রীতিনীতি প্রচলিত থাকাতে, ইংলণ্ড বা ফ্রান্স সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, রুশিয়াতেও তৎসমুদয়ের অবিকল প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেই রুশিয়াও যে ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জের সহিত একাসনে উপবিষ্ট ও সকল বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষতা করিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে ইহাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহই ছিল না। সুতরাং যাহা কিছু রুশীয় ও প্রাচীন, তাহাই পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক যাহা কিছু নূতন ও ইউরোপীয়, তাহার প্রবর্ত্তন করাই নিহিলিষ্টদের ইষ্টমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে উন্নত, সুতরাং রুশ নব্যতান্ত্রিকেরা "বিজ্ঞান," "বিজ্ঞান" বলিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত সনাতন ধর্ম্ম অপেক্ষা একটী ভেকের দেহচ্ছেদলব্ধ জ্ঞানকেই ইহারা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পিটারের সময় হইতেই রুশিয়াতে ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা প্রচলনের আরম্ভ হয়। প্রথম দু'চার বৎসরে ইহার কোনও ফল দেখা যায় নাই সত্য; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন এক দল নব্যসম্প্রদায় গঠিত হইল, যাহারা বংশপরিচয়ে রুশীয় হইলে, শিক্ষায় দীক্ষায়, হাবে ভাবে, এবং রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপে একেবারে খাঁটী ইংরাজ, ফরাসী বা জার্ম্মাণ হইয়া দাঁড়াইল। জন্মাবধি তাহারা সম্পূর্ণ বিদেশীয় আদর্শেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছিল—নিজেদের কি আছে, বা কি ছিল, তাহা জানিবার সুযোগ তাহারা কখনও পায় নাই; সুতরাং তাহাদের দৃষ্টিও যে স্বদেশকে অতিক্রম করিয়া সেই বিদেশের উপরই নিবদ্ধ হইবে, তাহারা যে সর্ব্বদাই সামান্য এতটুকু জিনিসের জন্যও পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতীতের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, ভবিষ্যতের সৌধ যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে

পারে না, কার্যেকর্ম্মে তৎসম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা লাভের কোনও সুযোগ তাহাদের ছিল না। সুতরাং তাহারা সকল বিষয়েই নূতনত্বের পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইল, এবং পুরাতনের ধ্বংস সাধনের স্রোত সর্ব্বত্রই প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজপুরুষগণ ইহাতে নিতান্ত সন্ত্রস্ত হইয়া নব্যতান্ত্রিকগণের গতিরোধের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন—এমন কি, শীঘ্রই অপর চরমে গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৮৫৫-৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পনের বৎসর কাল নিহিলিজ্‌মের প্রবল বন্যাবেগে রুশীয় প্রাচীন রীতিনীতিসমূহ একেবারে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সুপ্রসিদ্ধ রুশ ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভের (Turgeniev) উপন্যাসসমূহে এই সময়ের চিত্র অঙ্কিত আছে।

বলা বাহুল্য, এইরূপ সর্ব্ববিধ্বংসী নেতি-বাদ কোন সমাজেই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না,—শূন্যে অবস্থান করা মানুষের স্বভাব নহে। প্রচলিত রীতিনীতি ও শাসনতন্ত্র প্রভৃতির নিতান্ত একদেশদর্শী সমালোচনা দ্বারা তৎসমুদয়ের প্রতি জনসাধারণের মনে গভীর সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার ভাব উৎপাদন করাই ইহার কাজ; তাহা করিতে পারিলেই, অথবা সমালোচিত পক্ষ সমালোচনার মুকুরে নিজেদের দোষ সংশোধন করিয়া লইলেই, ইহা স্বতঃই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শীঘ্রই এই প্রাথমিক অবস্থার পরিসমাপ্তি হইয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দ হইতে রুশীয় আনার্কিজ্‌মের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ হয়।

(২) নিরক্ষর ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সোসিয়ালিষ্ট ও আনার্কিষ্ট মতবাদের প্রচার কার্য্যই এই দ্বিতীয় যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব, এবং ইহার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন—মাইকেল বাকুনিন্ (Michael Bakunin)।

বাকুনিন্ অতি অদ্ভুত লোক ছিলেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে একটি অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম হয় ও যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সমরবিভাগে প্রবেশ করেন। কিন্তু সেখানে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের অবিচার ও যথেচ্ছচারিতা দেখিয়া শীঘ্রই সরকারী কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া ক্রমে ফ্রান্সে উপস্থিত হন। ফ্রান্সে তখন প্রুধোঁর একাধিপত্য বিরাজমান ছিল—বাকুনিন্ তাঁহার নিকটেই আনার্কিজ্‌ম্ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। *

১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ড্রেসডেন্ (Dresden) সহরের প্রজাবিদ্রোহের সহিত লিপ্ত থাকার অপরাধে বাকুনিন্ কারারুদ্ধ ও প্রায় ৮ বৎসর কারাবাসের পর সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হন। কিন্তু সেখান হইতে কোনও রকমে পলাইয়া ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন।

১৮৪৭-৪৮ খৃঃ অব্দের ইউরোপব্যাপী প্রজাবিদ্রোহের দমনের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণ নীরবে থাকিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ অব্দের পর হইতেই তাহারা আবার মাথা তুলিতে থাকে। বাকুনিন্‌ও ঠিক এই সময়েই লণ্ডনে আসিয়া হাজির হন, এবং রুশিয়াতে প্রবেশ করিতে না পারিলেও, রুশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণকে উত্তেজিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে তিনি "সোসিয়াল্ ডিমক্র্যাটিক্ সম্মিলন" (The Social Democratic Alliance) নামে একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু শীঘ্রই উহা উঠিয়া যায়। পর বৎসরে তিনি মার্ক্স-প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতিতে প্রবেশ করেন, কিন্তু আনার্কিষ্ট মতাবলম্বী বলিয়া সেখান হইতেও বিতাড়িত হন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে বাকুনিনের মৃত্যু হয়।

"ঈশ্বর ও রাষ্ট্র" (Dieu et l'Etat—God and the State) নামে বাকুনিনের লিখিত একখানি পুস্তক আছে। এই পুস্তক হইতে তদীয় মতবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। বাকুনিন্ বলেন যে, একমাত্র "প্রাকৃতিক নিয়মের" (The Laws of Nature) বশ্যতা ছাড়া আর যে কোনও নিয়মের বশ্যতা স্বীকারই মানুষের অবাধস্বাধীনতার নিতান্ত পরিপন্থী; এমন কি, লোকে সাধারণতঃ যাহাকে ঐশ্বরিক বিধান

* প্রুধোঁর মত পূর্ব্বেই সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

রূপে অভিহিত করিয়া থাকে, তাহা মানিয়া চলিতে হইলেও, স্বাধীনতার কিছু না কিছু খর্ব্বতা সাধিত হয়। অবাধস্বাধীনতা-লাভই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। প্রাকৃতিক নিয়মপালনে স্বাধীনতার খর্ব্বতা নাই। একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই উহার প্রকৃতি ও সীমা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সাধন মানুষের চরম উন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাকুনিন্ বলেন যে, সকলেই যদি যথাযথভাবে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি পালন করে, তাহা হইলে কোনও প্রকার আইনকানুন বা শাসনতন্ত্রের কোনই দরকার হয় না। শ্রেণীবিভাগই সর্ব্ব প্রকার অসামঞ্জস্যের ও তৎপ্রসূত দুঃখদুর্দ্দশার মূল হেতু; সুতরাং সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন, সকল প্রকার সম্প্রদায়-বিভাগই উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৎপ্রতিষ্ঠিত সোসিয়াল্ ডিমক্রেটিক সম্মিলনের অনুষ্ঠান-পত্র হইতেও অনেক কথা জানিতে পারা যায়। এই অনুষ্ঠান-পত্রে সমিতির সভ্যগণকে প্রকাশ্যভাবে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহারা বলে যে, বিজ্ঞানের জ্ঞান না হইলে মানুষের এক মুহূর্ত্তও চলে না—কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দ্বারা লোকের কিছুই আসিয়া যায় না। তাই ইহারা বিজ্ঞানকেই ধর্ম্মের আসনে বসাইয়া পূজা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। স্ত্রী-পুরুষভেদে অধিকারগত কোনও পার্থক্য হইতে পারে, তাহাও ইহারা মানে না। ইহারা বলে যে, মানুষ মাত্রেই সমান—তা' সে স্ত্রীলোকই হউক, আর পুরুষই হউক। সকলেই যখন সমান, তখন পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবক বা সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির দ্বারা কাহাকেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। সুবিধা বোধ করিলে লোকে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিবে, এবং অসুবিধা হইলেই, ঐ সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া আবার নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিবে! ফল কথা, ইহাদের মতে মানুষের কার্য্য-স্বাধীনতার কিছু মাত্র বাধা থাকা উচিত নহে। উত্তরাধিকার-প্রথাও ইহারা একেবারে উঠাইয়া দিতে চাহে। ইহারা বলে যে, লোকে পরিশ্রম করিয়া যাহা রোজগার করে, তাহার ভোগে তাহার কিছু অধিকার থাকিতে পারে বটে; কিন্তু একের সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই অন্যের পরিশ্রমে উপার্জ্জিত বিষয়ে কাহারও স্বত্বস্বামিত্ব জন্মিতে পারে না—উহাতে আপামর-সাধারণ সকলেরই সমান অধিকার।

বলা বাহুল্য, প্রতিনিয়তই এইরূপ বৈপ্লাবিক মত প্রচারের জন্য রুশীয় গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন, এবং ইহার প্রতিকারের জন্য কোন্ উপায় অবলম্বন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ হইবে, সহসা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এই সময়ে অনেক রুশ ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যাশিক্ষার জন্য অবস্থান করিতেছিল। রুশ গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন যে, ইহারা যদি ঐ সকল দেশ হইতেই বৈপ্লবিক মতে দীক্ষিত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যাহাতে এই অনিষ্ট সাধিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রুশ গবর্ণমেণ্ট প্রবাসী ছাত্রগণকে অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু রুশ গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতে-ছিলেন, বহুপূর্ব্বেই তাহা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রবাসী ছাত্র ও ছাত্রীগণের অনেকেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহারা দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আত্মীয়স্বজন ও জন-সাধারণের মধ্যে সোসিয়ালিজ্‌ম্ ও আনার্কিজ্‌ম্ বিষয়ক মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইল। এতদুপলক্ষে রুশ যুবকযুবতীগণ যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বটে, এবং মনে হয় যে, যদি এই সমস্ত পথভ্রান্ত যুবকযুবতীগণকে সৎপথে চালাইবার উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর কতই না উন্নতি সাধিত হইতে পারিত।

ইহারা গোপনে গোপনে কার্য্যারম্ভ করিলেও, গবর্ণমেণ্টের তাহা জানিতে বেশী বিলম্ব হইল না, এবং ১৮৭৩—৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এই বিপ্লব প্রচারকদের প্রায় সকলেই একে একে কারারুদ্ধ হইল। ইহার পর হইতে রুশীয় আনার্কিজ্‌ম্ তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে।

(৩) বিপ্লবপন্থীগণ প্রথমতঃ জনসাধারণকে গবর্ণমেণ্টের

বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ইহারা এক্ষণে অন্য উপায়ে আপনাদের অভিসন্ধিসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজপুরুষগণের গুপ্তহত্যা এই তৃতীয় যুগের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সেন্টপিটার্সবার্গ সহরের পুলিসের বড় কর্ত্তা ভেরা স্যাস্থলিস্ (Vera Sassoulitsch) নাম্নী জনৈক রুশ যুবতীর হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জুরীর বিচারে ভেরা বেকসুর খালাস হয়, এবং পুলিশ তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করিলে, উত্তেজিত জনসঙ্ঘ তাহাকে পুলিশের হাত হইতে ছিনাইয়া লয়, ও ভেরা সুইজারল্যাণ্ডে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে।

ইহার পর হইতেই রুশিয়াতে নরহত্যা ও গুপ্তহত্যার প্রবল স্রোত বহিতে থাকে, এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আততায়ীর গুপ্তাঘাতে নিহত হইয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। শুধু কর্ম্মচারী নিহত করিয়াই বিপ্লবপন্থীগণ ক্ষান্ত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যতই কড়াকড়ি হইতে লাগিল, ইহাদের কার্য্যতৎপরতাও ততই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে, ১৮৮১ খৃঃ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখে রুশ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। রুশীয় আনার্কিজমের একটী প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে রুশ যুবতীগণের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। সোফিয়া পেট্রস্কাইয়া (Sophia Petrovskaia) নাম্নী কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রুশ যুবতীর মুখাবগুণ্ঠনের সঙ্কেতে পরিচালিত হইয়াই আততায়ীগণ সম্রাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বাকুনিনের প্রচারিত অরাজকতাবাদ দক্ষিণ ইউরোপেও কম কার্য্যকারী হয় নাই। প্রধানতঃ তাঁহার প্ররোচনাতে ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে স্পেনে প্রজাবিদ্রোহের সংঘটন হয়। ইটালিতেও বাকুনিনের অত্যন্ত প্রভাব ছিল; এমন কি, উহার গতিকে ম্যাজিনির (Mazzini) প্রভাবও এক সময়ে অত্যন্ত হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল।

বাকুনিনের মতবাদ হইতে ফ্রান্সেও নানা প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে লিয় (Lyons) ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইহার প্রায় তিন বৎসর পরে প্রায় ৬৬ জন বিপ্লবপন্থী ধরা পড়ে। সুবিখ্যাত প্রিন্স্ ক্রোপট্কিন্ (Prince Kropotkin) এই ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম ছিলেন।

প্রিন্স ক্রোপট্কিনের জীবন-কাহিনী বড়ই বিচিত্র। বাকুনিনের মত তিনিও এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, উহা রুশিয়ার বর্ত্তমান রাজবংশ অপেক্ষা কম সম্মানের পাত্র নহে।

তাঁহার পিতার অনেক নফর (Serf) ছিল; ইহাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ইহা দেখিয়া বালক ক্রোপট্কিনের মনে নফর-প্রথার উপর বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হয়, এবং পতিতগণের উদ্ধার কামনা তাঁহার মনে নিতান্ত বলবতী হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি রাজদরবারে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু সেখানকার কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া উহার উপরেও তিনি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হন। এই সময়েই তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, সোজাসুজী ভাবে রুশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনও প্রকার সংস্কারের আশা করা নিতান্ত বৃথা। অতঃপর তিনি রাজদরবার পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ ও শীঘ্রই ইউরোপব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ঠিক এই সময়েই ইউরোপের সর্ব্বত্র সোসিয়া-লিজ্‌মের প্রচার হইতে থাকে, এবং ক্রোপট্কিন অবিলম্বে সোসিয়ালিষ্টদের সহিত মিলিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শীঘ্রই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কয়েক বৎসর কারাবাসের পর তিনি পলাইয়া সুইজারল্যাণ্ডে উপনীত হন, এবং সেখান হইতে সর্ব্ববিধ্বংসী অরাজকতাবাদের প্রচার করিতে থাকেন। বাকুনিন্ ও ক্রোপট্কিনের মতে মূলতঃ বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বাকুনিনের মত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কোন কোন চিন্তাশীল লেখক রুশীয় আনার্কিজম্‌কে সোসিয়ালিজ্‌মের ব্যাধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সোসিয়ালিজম্ ও আনার্কিজম্ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক নহে। দেশ, কাল ও পরিবেশের বিভেদবশতঃ একই জিনিসের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সোসিয়ালিজম্ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণির সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার ক্রমাভিব্যক্তির একটি অবস্থা মাত্র। যে যে কারণে এই সকল দেশে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, অন্যান্য দেশে ঠিক সেই সেই কারণের সমাবেশ হইলে, তবে সোসিয়ালিজ্‌মের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু কোনও দুই দেশে সকল বিষয়ে একই প্রকার অবস্থার সমাবেশ কখনও দেখা যায় না। সুতরাং একদেশের সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা হইতে যাহা উদ্ভূত হইয়াছে, ঐ দেশের পক্ষে তাহা যতই ভাল হউক না কেন, ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত দেশে তাহার হুবহু প্রবর্ত্তন করিতে গেলেই একটা মহাবিপ্লবের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অনুকরণ দ্বারা কোনও কালে সুফল লাভের প্রত্যাশা করা যায় না। রুশ গবর্ণমেণ্ট যথেচ্ছাচারী বা অনিয়ন্ত্রিত ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু ইউরোপীয় সোসিয়ালিজ্‌মের হুবহু পরিবর্ত্তন করিলেই যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইবে, এরূপ আশা বৃথা, এবং রুশীয় আনার্কিজম্ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

কোন জাতির মতি, রতি ও আশপাশের প্রকৃতি দ্বারাই ঐ জাতির শাসনতন্ত্রের প্রকৃতিও গঠিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতে রুশ জাতির প্রকৃতি ও আশপাশের অবস্থা যেমন ছিল, রুশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত হইয়াছিল। বরং রুশিয়ার পূর্ব্বাপর ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তৎকালীন অবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রই রুশিয়ার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। জাতীয় প্রকৃতির ক্রমপরিবর্ত্তনের সহিত শাসনতন্ত্রের বা সমাজব্যবস্থার ক্রমপরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা সময়সাপেক্ষ হইলেও, এতদ্দ্বারাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। মানুষ যেমন ক্রমবিকাশের ফলে বর্ত্তমান সভ্যাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ সমাজ ও শাসনতন্ত্রও ক্রমবিকাশ-পরম্পরাতেই বিকশিত হইয়া থাকে—প্রাচীনের ভিত্তির উপরেই নূতনের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে হয়। নতুবা তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না, এবং সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

রুশ বিপ্লববাদীগণ এই সনাতন নিয়মের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসমূহের অত্যুন্নত অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছিল, এবং পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ঠিক না রাখিয়া নিমেষের মধ্যে তাহাদের সমকক্ষ হইতে যাইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর মাতৃভূমির স্নেহময় বক্ষ ভ্রাতৃশোণিতরাগে রঞ্জিত করিয়াছিল—কিন্তু তাহারা এতদ্দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

ট্রাইট্স্কে

যে সকল চিন্তাবীরগণের যুক্তিতর্ক ও উত্তেজনার ফলে বর্ত্তমান জার্ম্মাণ জাতির মনে প্রচণ্ড বিজিগীষা ও রণলিপ্সার সঞ্চার হইয়াছে, তন্মধ্যে ট্রাইট্স্কের নাম অতীব সুপরিচিত। ইতিহাসের অধ্যাপক, প্রজাসভার প্রতিনিধি, এবং সংবাদপত্রের লেখকরূপে তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ জার্ম্মাণগণের একজাতীয়ত্বের এবং জার্ম্মাণ জাতির পক্ষে দিগ্বিজয়-সাধনের অবশ্যকর্ত্তব্যতার প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ট্রাইট্স্কের পক্ষে যুদ্ধব্যাপারকে প্রীতির চক্ষে দেখা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার পিতা সৈন্যবিভাগে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে বোহিমিয়ার প্রান্তদেশস্থ কনিগষ্টাইন দুর্গের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ট্রাইট্স্কের মাতা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া ছিলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ড্রেস্‌ডেন নগরে ট্রাইট্‌স্কের জন্ম হয়। বাল্য-কালেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। চারি বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভকালেই তাঁহার জ্ঞানলাভে অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। অষ্টমবর্ষ বয়ক্রমকালে তাঁহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, এবং তিনি অনতিবিলম্বে সহপাঠীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার রণরঙ্গের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি সাগ্রহে গ্রীক ভাষা শিক্ষাকরতঃ তাঁহার পিতার যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া হোমর-বর্ণিত যুদ্ধসকলের পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিতেন। মাতার অপেক্ষা পিতার প্রতি অধিক টান ছিল বলিয়া তিনি পিতার সহিত সেনানিবাসে যাতায়াত করিতে এবং সৈন্যগণের সহিত মেলমেশা করিতে ভালবাসিতেন। বস্তুতঃ, অল্প বয়সেই জলবসন্ত রোগে শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হইয়া যাওয়াতে তাঁহার সেনাশ্রেণীভুক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিত হইলেও, এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সৈনিকের কার্য্যের প্রতি যে অনুরাগ সঞ্জাত হয়, তাহা কখনও বিনষ্ট হয় নাই।

দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে ট্রাইট্‌স্কে ড্রেস্‌ডেনের উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, এবং সত্বরই সমপাঠীগণের মধ্যে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। সপ্তদশবর্ষ বয়সে তিনি যোগ্যতার সহিত তত্রত্য শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখানে পাঠকালেই তাঁহার হৃদয়ে অপরিমেয় স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তে এই বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাটিন বিষয়ক পাঠ্যের প্রাধান্য কমাইয়া জার্ম্মাণ বিষয়সমূহের অধ্যাপনার প্রবর্ত্তন হওয়াতে এ বিষয়ে সাহায্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়ত্যাগকালে পুরস্কার-বিতরণ সভায় তিনি স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। উহাতে জাতীয়-সম্মান রক্ষাকল্পে বৈরসাধন দ্বারা মনুষ্যত্বলাভার্থ সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে উৎসাহিত করা হয়। এই বিদ্যালয়েই ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হয়, এবং অতঃপর তিনি ঐ বিষয়েই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের সংকল্প করেন।

অনন্তর উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ ট্রাইট্‌স্কে প্রথমতঃ বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, এবং তত্রত্য প্রসিদ্ধ ইতিহাসাধ্যাপক ডাহ্‌ল্‌মানের (Dahlmann) সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। ডাল্‌মানের বক্তৃতার সহজ সরল ভাষায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং ডাল্‌মানের নিকট হইতেই তিনি স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ আদর্শের উন্মাদনা প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। কিন্তু যাঁহারা তখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্ম্মাণগণকেঐক্যবদ্ধকরতঃ এক সুবিশাল জার্ম্মাণজাতি সংগঠনের স্বপ্ন দেখিতেন, ডাহ্‌ল্‌মান তাঁহাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার এই স্বপ্নের উন্মাদনা শিষ্য ট্রাইট্‌স্কের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে মাতাইয়া তোলে। এই সময়ে কর্ণপীড়া বৃদ্ধি পাওয়াতে অধ্যাপকগণের বহু বক্তৃতাই তাঁহার শ্রবণগোচর হইত না, কিন্তু ভগবদনুগ্রহে অটল বিশ্বাস এবং জার্ম্মাণীর নবীন আদর্শের অনুপ্রাণনায় তাঁহার তজ্জনিত মনঃকষ্টের লাঘব হইত।

যাঁহারা জার্ম্মাণগণের একজাতীয়ত্বের আদর্শ পোষণ করিতেন, তাঁহাদের চিন্তা সমগ্র জার্ম্মাণ দেশ লইয়া ব্যাপৃত থাকিত, এবং শক্তিশালী প্রাশিয়া রাজ্য তাঁহাদের আশার স্থল ছিল। কাযেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বতন্ত্রসত্তামূলক সংকীর্ণ আদর্শ তাঁহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত না। এই কারণে এবং তনয়কে পরিশেষে লাইপজিক (Leipzic) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ্যার অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার উদ্দেশ্যে ট্রাইট্‌স্কের পিতা যখন তাঁহাকে বন্ পরিত্যাগ করিতে বলেন, তখন অনিচ্ছার সহিতই পুত্র পিতৃআজ্ঞা পালন করেন। বস্তুতঃ, বন্ পরিত্যাগ করিতে হইলে বরং তাঁহার জার্ম্মাণীর নব্য আদর্শের প্রচারস্থল হাইডেল্‌বর্গে (Heidelberg) বা বার্লীনে (Berlin) যাইবার ইচ্ছা ছিল। যাহা হউক, পিতার আদেশে লাইপ্‌জিকে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, শ্রবণশক্তির হ্রাস হওয়াতে আর তাঁহার পক্ষে অধ্যাপকগণের বক্তৃতা শুনিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অধ্যয়নার্থ তিনি শিক্ষকগণের পাতড়াগুলি ও গ্রন্থশালার পুস্তকরাশির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন।

বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে তিনি সতীর্থগণের সহিত

জার্ম্মাণীর সরস স্ফূর্ত্তিময় ছাত্রজীবনের আমোদপ্রমোদে কাল কাটাইতেন, কিন্তু লাইপজিকের সহপাঠীবর্গের সহিত তাঁহার মনের মিল হইত না। তাই কিছুকাল পরে তিনি বন্ নগরে ফিরিয়া গিয়া ব্যবহারশাস্ত্র, রাষ্ট্রেতিহাস,, প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি রকাউ (Rochau) প্রণীত গ্রন্থে "রাষ্ট্র শক্তিরই নামান্তর" এই মতের সহিত পরিচিত হন। দেখা যাইবে যে, ট্রাইট্‌স্কেও রাষ্ট্রসম্বন্ধে এইরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন।

ইহার পরে কিছুকালের জন্য তিনি টুবিঙ্গেন (Tubingen) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এ স্থানেও তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সংকীর্ণ-চিত্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিরক্ত হন। তৎপর দুই মাস কাল ফ্রাইবার্গে (Freiburg) অবস্থান করতঃ ডাক্তার উপাধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন, এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিংশবর্ষ বয়সে লাইপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ উপাধি লাভ করেন। অতঃপর হাইডেল্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাইজেলবাকের (Keiszelbach) নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করেন। এইরূপে ছাত্র-জীবন পরিসমাপ্ত করিয়া তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মভূমি ড্রেসডেন নগরে ফিরিয়া আসেন।

ইহার পর হইতে ট্রাইট্‌স্কে অধ্যাপকপদ লাভের জন্য আয়োজন করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা তখন ড্রেসডেন নগরের সামরিক শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সাক্‌সনিরাজের অনুগত প্রজা ছিলেন। আজীবন যাহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই সাক্‌সনী রাজ্যের স্থিতি ও উন্নতি ব্যতীত তাঁহার অন্য কামনা ছিল না। কিন্তু পুত্র ট্রাইট্‌স্কের মতে, প্রাশীয়ার প্রাধান্যে জার্ম্মাণীর একজাতীয়ত্ব সাধনকল্পে, প্রয়োজন হইলে, সাক্‌সনী প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলির বিলোপ পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। কাযেই বাড়ীতে কোনরূপ রাজনৈতিক আলোচনা সম্ভবপর ছিল না। এরূপ অবস্থায় বাড়ীতে থাকিতে ভাল না লাগায় কিছুকাল পরে তিনি গটেনবার্গ (Gottenberg) নগরে চলিয়া যান। যাঁহারা অধ্যাপকপদপ্রার্থী হইতেন, প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাদের স্বরচিত একটি প্রবন্ধের গুণাগুণ বিচার দ্বারা যোগ্যতার নির্ণয় করা হইত। গটেনবার্গে থাকিয়া ট্রাইট্‌স্কে এই প্রবন্ধ রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত হন। কিন্তু ঐ সময়ে অন্যবিধ উপজীবিকা অবলম্বন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে এক একবার উদিত হইত না এরূপ নহে। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কবিতারচনার অভ্যাস ছিল। গটেনবার্গে আসিয়া তিনি স্বরচিত দুইখানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত করেন। তাঁহার কবিতায়ও তিনি ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণ জাতির গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেন, এবং কাব্য-রচনায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন কিনা ভাবিতেন। পিতৃপ্রদত্ত মাসহারায় ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া তিনি এই সময় হইতেই সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। এই সকল প্রবন্ধের সমাদর দেখিয়া, এবং পাছে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দোষে শিক্ষাদান-কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের লেখক ও সম্পাদকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ হইতেন। সম্পাদকপদ লাভে উপার্জ্জন করিবার সম্ভাবনাও দু এক বার ঘটিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি লাইপজিকে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পরীক্ষা প্রবন্ধের রচনা করেন, এবং বিচারফলে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি জীবনে শিক্ষক-বৃত্তি ত্যাগ করেন নাই।

ট্রাইট্‌স্কের ক্ষুদ্ররাজ্যবিরোধী রাষ্ট্রীয় মত অনেকের বিদিত ছিল বলিয়া, তাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষকতা-কার্য্যে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কিছু আপত্তি উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি অধ্যাপকতা-কার্য্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার হানি হয় নাই।

এই সময় তাঁহার উন্নত ও বলিষ্ঠ দেহ সকলের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; তাঁহার গুম্ফশোভিত মুখমণ্ডলে পুরুষোচিত ভাব বিরাজিত ছিল; চক্ষুর্দ্বয়ে কখনও কবিজনোচিত কোমল ভাবাবেশ দেখা যাইত, আবার কখনও বা বীরত্ব-দ্যোতক বিদ্যুৎপ্রভা প্রকটিত হইত। শ্রোত্রবিকলতাবশতঃ তিনি কণ্ঠস্বরের তীব্রতা-বোধে অসমর্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার

গলার আওয়াজ কিছু উচ্চ গ্রামে উঠিত বটে, কিন্তু তাঁহার পৌরুষব্যঞ্জক আকৃতিতে প্রচারকের গাম্ভীর্য্য ও আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইত। বস্তুতঃ তাঁহার আকৃতি, বক্তৃতাশক্তি, ও প্রচণ্ড আবেগ, এবং বর্ণিত বিষয়ে পারদর্শিতা ও বিষয়-বিন্যাসে দার্শনিকের উপযুক্ত সর্ব্বমুখীনতা প্রভৃতি গুণে বিদ্যার্থীগণের চিত্ত এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, অতি অল্পকাল মধ্যেই শ্রোতৃবর্গের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহার জন্য বৃহত্তর বক্তৃতাগৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়।

ট্রাইট্‌স্কে অধ্যাপকের আসন হইতেই জার্ম্মাণীর একত্বসংসাধনরূপ আদর্শের প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন যে, এতৎকল্পে প্রাশীয় রাজ্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, এবং সাক্‌সনী প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সত্তার বিলোপসাধন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সাক্‌সনী রাজ্যের অন্তর্গত লাইপ্‌জিক নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়াই এতাদৃশ মতের প্রচার সকলের পক্ষে গ্রহণীয় হইতে পারে না। ফলতঃ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন 'প্রাশীয় রাজ্যের ইতিহাস' সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, তখন ছাত্রসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অপর দিকে ছাত্র-মহলে তাঁহার প্রতিপত্তি অসাধারণ হইয়া উঠে। এই সময়ে জার্ম্মাণ যুক্ত-মণ্ডলের (The German Confederation) ইতিহাস প্রণয়নোদ্দেশে তথ্যসংগ্রহার্থ ট্রাইট্‌স্কে লাইপজিক ত্যাগ করিবেন শুনিয়া বহুছাত্র সম্মিলিত হইয়া এক আবেদনপত্রে তাঁহাকে লাইপজিকেই থাকিতে অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি বৎসরকালের জন্য ছুটি লইয়া স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনার্থ মিউনিকে (Munich) চলিয়া যান। এই সময়ে তিনি প্রাশীয়ার সংবাদপত্রসমূহে সে সকল স্বরচিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তাহাতেও তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের ছায়াপাত হইত। যাঁহারা কেবল প্রজাপুঞ্জকে নিরুপদ্রবে রক্ষা করাই রাষ্ট্রবিধানের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, ব্যক্তি বা সমাজের কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করা রাষ্ট্রবিধির পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ যাঁহারা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের হানিকর বলিয়া প্রচার করেন, ট্রাইট্‌স্কে তাঁহাদের মতের খণ্ডন করিতে তৎপর ছিলেন।

মিউনিক হইতে লাইপজিকে প্রত্যাগমন করিলে পর কর্তৃপক্ষের সুনজরে না থাকিলেও মোটের উপর ট্রাইট্‌স্কে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ভাবেই কাল কাটান। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে একমতাবলম্বী কবি ফ্রেটাগ (Freytag) প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জোটে, এবং ছাত্রসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অধ্যাপনা কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি সত্ত্বেও তিনি সামাজিকতা রক্ষায় কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। ইহার পরেও তিনি কিরূপে প্রবন্ধাদি লিখিবার সময় পাইতেন, তাহা-আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সকল প্রবন্ধাদিতে পূর্ব্বোক্তরূপ মতামত প্রচারিত হইত। ফলে কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের মাত্রা কমিল না, কিন্তু ছাত্রমহলে তাঁহার পসার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাই, যখন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেডেন রাজ্যান্তর্গত ফ্রাইবার্গ (Freiburg) বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া লাইপজিক পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থ আলোকমালাসজ্জিত শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষীগণ প্রীতির পরিচয় দিয়াছিল।

এই সময় হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশীয়া ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে যুদ্ধঘটনা পর্য্যন্ত ট্রাইট্‌স্কে ফ্রাইবার্গে রাজনীতি-বিদ্যার সহকারী অধ্যাপকের কার্য্য করেন, এবং নানাবিধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনা লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্লেজুইগ-হলষ্টাইন (Schleswig Holstein) নামক রাজ্যদ্বয় লইয়া বিবাদের ফলে প্রাশীয়া ও অষ্ট্রীয়া রাজ্যের সৈন্যদল কর্ত্তৃক ডেনমার্কের পরাজয় হইলে, তিনি বিসমার্কের মত সমর্থন করেন *।

* ভিয়েনার সন্ধির ফলে ডেনমার্ক এই দুই রাজ্যের কর্তৃত্বভার ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর ইহাদের শাসন কি ভাবে হইবে তাহা লইয়া সমস্যা উপস্থিত হয়। অষ্ট্রীয়া ও অন্যান্য জার্ম্মাণ রাজগণের মত হয় যে অগাষ্টেনবার্গের ডিউকের (Duke of Augustenburg) অধীনেএই দুইটি দেশ লইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হউক। বিসমার্কের মন্ত্রণায় প্রাশীয়া-রাজের অভিপ্রায় হয় যে এই

এই সময়ে 'বুণ্ডেসষ্টাট ও আইনহ্‌ষ্টাট' (Bundesstaat and Einheitsstaat) নামক প্রবন্ধে জার্ম্মাণীর ঐক্যসাধনোদ্দেশে যুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পরিবর্ত্তে একরাষ্ট্রের প্রস্তাব করিয়া ট্রাইট্‌স্কে স্বকীয় মত লিপিবদ্ধ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ধুরন্ধরগণ যখন খোলাখুলি মত প্রকাশ করা অসমীচীন মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ট্রাইট্‌স্কে অশেষ লিপিকুশলতা সহকারে প্রকাশ্য ভাবে লিখিলেন যে, শ্লেজুইগ-হলষ্টাইন প্রাশীয়ার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিতে হইবে এবং জার্ম্মাণীর ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিলোপ পূর্ব্বক প্রাশীয়রাজের অধীনে একটিমাত্র বৃহৎ রাজ্য গঠিত করিতে হইবে; প্রয়োজন হইলে, শক্তিশালী প্রাশীয়া রাজ্য বলপ্রয়োগে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধ্বংসসাধন করিবে। ইহার কয়েক মাস পরে "শ্লেজুইগ-হলষ্টাইন সমস্যার সমাধান" সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধেও তিনি অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। ইহাতে ট্রাইট্‌স্কের পিতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এতাদৃশ মত পরিত্যাগ করিতে বলেন; কারণ, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের অন্যতম সাকসনী দেশের রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। অপর দিকে প্রাশীয় রাজমন্ত্রী বিসমার্ক স্বমতপ্রচারক এই অধ্যাপকটির প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং ট্রাইটস্কে বার্লীনে সংরক্ষিত প্রাচীন দলিলাদি অধ্যায়ন করিবার অনুমতি চাহিলে, তদুপলক্ষে তাঁহাকে একখানি সুন্দর চিঠি লেখেন। শ্লেজুইগ-হলষ্টাইন ব্যাপারের পরিণামফলে অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রাশীয়ার অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধে বেডেন রাজ্য যদি অষ্ট্রীয়া পক্ষে যোগদান করে, তবে প্রাশীয়ার পক্ষপাতী ট্রাইট্‌স্কের পক্ষে বেডেন রাজ্যে কর্ম্ম করা অসম্ভব হইবে বলিয়া, এই সময় বিসমার্ক তাঁহাকে মোটা মাহিনায় বার্লীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাধিকারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের পদ দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও জার্ম্মাণগণের একজাতীয়ত্বসাধনকল্পে ট্রাইট্‌স্কে প্রাশীয় প্রাধান্যের পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি এই সময় তিনি প্রাশীয় রাজ্যের বিসমার্ক বাঞ্ছিত আভ্যন্তরীন নীতির যথেচ্ছচারিতার সমর্থন করিতে পারিতেন না। সুতরাং বার্লীনে কার্য্যগ্রহণ করিলে তাঁহার স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবে আশঙ্কায় তিনি বিসমার্কের আহ্বান গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু প্রাশীয়ার পক্ষ সমর্থনের ফলে তাঁহার বেডেন রাজ্যে তিষ্ঠান উত্তরোত্তর কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাঁহার বিরুদ্ধে পুস্তিকাদি বাহির হইতে লাগিল, এবং নানারূপ ভয়প্রদর্শনেরও ত্রুটি হইল না। এমন কি, তাঁহার আবাসস্থল নিরাপদ রাখিবার জন্য পুলিস প্রহরীর বন্দোবস্ত করিতে হইল। পরিশেষে, বেডেন অষ্ট্রীয়ার পক্ষ গ্রহণ করিলে ট্রাইটস্কে নিজেই কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বার্লীনে আসিয়া Preuszische Jahrbucher নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক হইলেন। তল্লিখিত প্রবন্ধাদিতে যুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, ফলে তাহাই ঘটিয়াছিল দেখা যায়। এই সময়ে তদ্রচিত প্রবন্ধাদির ক্ষুদ্ররাজ্যবিধ্বংসী মতপ্রকাশে তাঁহার পিতা এতাদৃশ বিরূপ হন, যে কিছুকাল পুত্রের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকার করেন; কিন্তু পরিশেষে উভয়ের স্নেহবন্ধের দৃঢ়তায় বিবাদ মিটিয়া যায়।

দেশদ্বয় প্রাশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হউক। যাহা হউক, সংপ্রতি স্থির হয় যে হলষ্টাইন অষ্ট্রীয়া কর্ত্তৃক এবং শ্লেষুইগ প্রাশীয়া কর্ত্তৃক শাসিত হইবে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ট্রাইট্‌স্কে কীয়েল (Kiel) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং পর বৎসরের প্রথম ভাগে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে তিনি অধ্যাপক-পদ প্রাপ্ত হইয়া হাইডেলবার্গে গমন করেন। এ স্থানেও তিনি অনায়াসেই ছাত্রমহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় তৎকালের রাজনৈতিক ঘটনাদি লইয়া আলোচনা করিতেন। এই সময়ে তাঁহার শ্রবণশক্তি একেবারে রহিত হইয়া যায়। ঠোঁটনাড়া দেখিয়া তাঁহাকে লোকের মনোভাব বুঝিতে হইত, এবং সময়ে সময়ে কাগজে লিখিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে হইত। তিনি আজন্ম শিশুগণকে লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় এক্ষণে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য শিশু-কণ্ঠের মধুর ধ্বনি শুনিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত

হইতে হইল। তথাপি তিনি অদম্য উৎসাহে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন কি অবকাশ সময়ে তিনি স্পেন, ইংলণ্ড, হলাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভ্রমণার্থ যাতায়াত পর্য্যন্ত করিতেন।

তাঁহার হাইডেলবার্গে অধ্যাপকত্বকালে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো প্রাশীয় (Franco-Prussian) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংগ্রামের প্রাকালে যুদ্ধকার্য্যে যোগদানোস্থত ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপক ট্রাইট্স্কের নিকট হইতে বিপুল উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধান্তে বেভেরীয়া প্রভৃতি কোন কোন ক্ষুদ্র রাজ্য কিছু অতিরিক্ত অধিকার লাভ করে। এরূপ ব্যবস্থা জার্ম্মাণীর একরাষ্ট্রীয়ত্বের পরিপন্থী বলিয়া ট্রাইট্স্কে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এই সময়কার হাইডেলবার্গ বাস ট্রাইট্স্কের জীবনে অত্যন্ত সুখের কাল বলিতে হইবে। অধ্যাপকরূপে তিনি ছাত্রগণের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইতেন, এবং পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীর সহানুভূতিপূর্ণ আদরযত্নে তাহার গৃহ সুখস্বর্গে পরিণত হইয়াছিল। তথাপি সঙ্কল্পিত জার্ম্মাণ ইতিহাস রচনা কার্য্যে সুযোগলাভার্থ তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়া বার্লীনে গমন করেন।

ইতিমধ্যে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেই তিনি জার্ম্মাণগণের পার্লিয়ামেণ্ট সভার (Reichstag) প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বক্তৃতাশক্তিতে তিনি হীন ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বলিবার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর প্রথম প্রথম ভাল লাগিত না। তথাপি তদীয় আদর্শের প্রচণ্ড উন্মাদনা, এবং স্বীয় শক্তিতে ও স্বীয় আদর্শের প্রকৃতত্বে স্থির বিশ্বাসের অনুপ্রাণণার প্রভাব অতিক্রম করা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। ফলে, যদিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিত, তথাপি তাঁহার মত অত্যধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত।

বার্লীনে আসিবার পর অধ্যাপক, সম্পাদক, ও প্রজাসভার প্রতিনিধিরূপে ট্রাইট্স্কের এত কায করিতে হইত যে, তিনি বিন্দুমাত্র সময় পাইতেন না। চিরপোষিত আদর্শের সমর্থনকল্পে বক্তৃতা, প্রবন্ধরচনা, ইত্যাদি নানা কার্য্যে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত; কিন্তু তিনি কোনও প্রকারে পশ্চাৎপদ না হইয়া অকুতোভয়ে এবং অদম্য উৎসাহে সর্ব্বদাই এই আদর্শের ধারণা ও পরিরক্ষণার্থ তৎপর থাকিতেন। যাঁহারা এইরূপে একটি অনমনীয় আদর্শের পোষণ করেন, তাঁহাদের যেমন একদল বন্ধুলাভ হয়, তেমনই আর একদলকে হারাইতে হয়। ট্রাইট্স্কের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীকরণার্থ যাহা কিছু আবশ্যক, তিনি তাহাই সতেজে সমর্থন করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। এইরূপে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিসমার্কের নূতন বাণিজ্যনীতির সমর্থনের ফলে ট্রাইটস্কে জাতীয় উন্নতি-পন্থীদের (Liberals) দল ত্যাগ করেন। পর বৎসরে ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনে, স্থিতিশীল (Conservative) খৃষ্টানগণের দলে যোগদান করতঃ তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মালোচনা প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিবার পক্ষপাতী হন। ইহার ফলে তাহাকে Prueszische Jahrbucher পত্রের সম্পাদকত্ব ছাড়িয়া দিতে হয়। এতৎ সত্ত্বেও তিনি স্বীয়মত বিসর্জ্জনে স্বীকৃত না হইয়া বরঞ্চ যাহাতে জার্ম্মাণীর একতাবন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়, তদর্থে প্রজাসভায় সরকারের পক্ষই সমর্থন করিতে থাকেন। এইজন্য সোসিয়ালিষ্ট, পোলাণ্ডবাসী, ক্যাথলিক ধর্ম্মামতাবলম্বী, এবং ইহুদীগণের সহিত তাঁহাকে অহরহ বিবাদে লিপ্ত থাকিতে হইত। ত্রয়োদশবর্ষাধিক এইরূপে কাটাইয়া অবশেষে প্রতিনিধি-কার্য্যে তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া যায়, এবং বহু বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি অতঃপর প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে অস্বীকার করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, অষ্টাদশবর্ষব্যাপী প্রভূত পরিশ্রমের ফলে তদ্রচিত 'ঊনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পঞ্চম খণ্ড ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এই খণ্ডে স্থান পায়। ট্রাইট্স্কে ইতিহাস রচনায় র‍্যাঙ্কের (Ranke) ন্যায় নিরপেক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার জার্ম্মাণ ইতিহাস পাণ্ডিত্যের

পরিচায়ক হইলেও, পক্ষপাতিত্বশূন্য নহে। রাষ্ট্রনৈতিকতা তাঁহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। তাই যে যুগে বা যে ব্যক্তিবর্গ দ্বারা জার্ম্মাণ জাতীয়তাসংগঠনের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, স্বদেশপ্রীতি হেতু তৎসমুদয়ের আলোচনাতেই তিনি সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু তথাচ ঘটনাদির নিঃশেষ বর্ণনায়, আশ্চর্য্যকর লিপিচাতুর্য্যে, এবং সর্ব্বোপরি, স্বদেশ-হিতৈষণার সুতীব্র উন্মাদনায় ট্রাইটস্কের গ্রন্থ ঐতিহাসিক সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। এইজন্য তিনি জার্ম্মাণীর মেকলে (Macaulay) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

প্রথম জীবনের অতিদ্রুত সংঘটিত উন্নতির প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপই যেন তাঁহার শেষ জীবনে নানা দৈববিড়ম্বনা উপস্থিত হইতে লাগিল। একমাত্র পুত্র চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইল। পতিপ্রাণা পত্নী স্নায়বিক বিকার-বশতঃ এক আতুরাশ্রমে আশ্রয় লইলেন। কন্যাটি বিবাহিতা হইয়া বার্লীন পরিত্যাগ করিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিসমার্কের অধঃপতনে তিনি একজন প্রবল পরিপোষক হারাইলেন। ক্রমশঃ কেবল অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনার কার্য্য লইয়া ট্রাইট্‌স্কে লোকলোচনের অতীত হইয়া পড়িলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বধিরতার সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিরও বিশেষ হ্রাস হইয়া গেল।

কিন্তু এইরূপে নানাপ্রকারে দৈববিড়ম্বিত হইলেও, ট্রাইট্‌স্কে প্রার্থিব সম্মান লাভে বঞ্চিত হন নাই। র‍্যাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনিই প্রাশিয়ার রাজ-ঐতিহাসিক (Historiographer Royal) নিযুক্ত হন। প্রবীণ ঐতিহাসিক সীবেল (Sybel) লোকান্তর গমন করিলে ট্রাইটস্কেই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সংবাদ-পত্রের (Historische Zeitschrift) সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি বিদ্বৎসভার (Academy of Sciences) সদস্যও নির্ব্বাচিত হন। তদীয় ইতিহাস-গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালে দুরারোগ্য মূত্রাশয় রোগের উপর শোণের আক্রমণে যখন ১৮৯৬ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন, তখন সমগ্র জার্ম্মাণ জাতি তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করে, এবং স্বয়ং সম্রাট তারযোগে শোক বিজ্ঞাপন করেন।

আমরা ট্রাইটস্কের জীবন-কথা একরূপ সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর যে সকল মতামতের জন্য ট্রাইটস্কে জার্ম্মাণ 'কুলটুরের' (Kultur) প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হন, এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান সমরোপলক্ষে জার্ম্মাণ জাতির মনোভাব পর্য্যালোচনা করিলে কয়েকটি প্রধান লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহাদের মতে যুদ্ধকার্য্য গৌরবের কার্য্য, ইহাতে কোনরূপ অন্যায় নাই। ইংরাজ জার্ম্মাণের চক্ষে ঘোরতর বিদ্বেষের পাত্র। ইংরাজের সহিত বোঝাপড়া করাই তাহাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে; ইংরাজের ন্যায় জার্ম্মাণেরও পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ড স্বীয় অধিকারভুক্ত করিতে হইবে। এইসকল বিষয়ে জার্ম্মাণীর যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাহা ট্রাইট্‌স্কেতেও অতিরিক্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

প্রথমতঃ, রণগৌরব-ঘোষণা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, জার্ম্মাণীতে যুদ্ধ-ব্যাপারের গুণগান করিবার লোকাভাব কখনও হয় নাই। প্রসিদ্ধ বিজয়ী নরপতি ফ্রেডরিক (Frederic the Great) হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ণহার্ডী (Bernhardi) পর্য্যন্ত যাঁহারা এ কার্য্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, ট্রাইট্‌স্কেকে তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান বলিতে হইবে। অধ্যাপকের আসন হইতে, রণরঙ্গের মহিমাখ্যাপন করিয়া তিনি যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাব কম হয় নাই। নানা প্রকার যুক্তিতর্কের দ্বারা তিনি স্বমতপোষণের চেষ্টা করিয়াছেন।

ট্রাইট্‌স্কে বলেন যে, সাধারণতঃ রাষ্ট্রগঠন-কার্য্যে যুদ্ধ অপরিহার্য্য। বাহুবলে স্বাভিপ্রায়সাধনের শক্তিতেই রাষ্ট্রের সার্থকতা। আবার, জাতীয় জীবনে অবসাদ আসিলে সংগ্রাম-সংঘটনা দ্বারা তাহা দূরীভূত হয়। যুদ্ধের উত্তেজনায় অন্তর্গত স্বদেশহিতৈষণা ফিরিয়া

আসে। ফলতঃ সংগ্রামে জাতির দৈহিক, নৈতিক, ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা হয়। রাষ্ট্র ও জাতির পক্ষে যুদ্ধের এরূপ আবশ্যকতা যিনি ঘোষণা করেন, তাঁহার মতে রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তির মূল্য কি, তাহা সহজেই অনুমেয়। যুদ্ধেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, আবার যুদ্ধ দ্বারাই উহার সমৃদ্ধি রক্ষা পায়; অতএব প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপরিরক্ষণার্থ সকল ব্যক্তিরই প্রাণ দিতে হইবে। শক্তিসংস্থিত রাষ্ট্র ব্যক্তির হিতে লক্ষ্য রাখিবে না, রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তিসংরক্ষণার্থ সাধারণ ন্যায়ান্যায়ের বিচার করিলে চলিবে না।

বলা বাহুল্য যে, রাষ্ট্রসম্বন্ধে এতাদৃশ ধারণা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে, এবং ট্রাইট্‌স্কেও আগাগোড়া এরূপ মত পোষণ করিতে পারেন নাই। প্রজাহিতেই রাষ্ট্রের সার্থকতা, পরজীবনে তাঁহাকেও এই মত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, ধীর বিচারশক্তির অভাব বশতঃই হউক, বা অসংযত স্বাদেশিকতার ফলেই হউক, রাষ্ট্রশক্তি ও যুদ্ধ-ব্যাপার সম্বন্ধে যিনি উল্লিখিত ধারণা পোষণ করিতেন, তিনি যে শান্তি-নীতিকে অবজ্ঞা করিবেন, তাহা স্বাভাবিক বটে। জাতীয় অবনতি ও ধ্বংসের কারণানুসন্ধান করিলে কোন একটি বিষয়কে তাহার নিদান বলা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে বহুকাল-প্রচলিত বহু কারণপরম্পরার ফলে জাতীয় জীবনে ধ্বংসাবস্থা সমুপাগত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধবাদী ট্রাইটস্কের মতে জাতির পক্ষে এ বিষয়ে শান্তির ন্যায় অভিশাপ আর নাই; শান্তি বিরাজিত থাকিবার ফলে মানবচিত্তের মহীয়সী বৃত্তিগুলির বিলোপ সাধিত হয়, এবং লোকসমাজে ঘোরতর স্বার্থপরতা ও তজ্জনিত দুর্নীতি প্রসূত হয়। ট্রাইট্‌স্কের মতে সর্ব্বসাধারণের মনে যুদ্ধের প্রতি যে বিরূপতা রহিয়াছে তাহা ভ্রান্তিমূলক। যুদ্ধঘটনা দৈব ব্যাপার। মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে স্বকীয় জীবনের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করে, এবং এক বোধাতীত বিশাল অজ্ঞেয় শ্রেষ্ঠ শক্তির টানে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়; কঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম পর্য্যন্ত বলিদান করিয়া 'অহং' ভাব ভুলিয়া যায়। ফলতঃ, তাঁহার মতে যুদ্ধের ফল আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, এবং শান্তির ফলে বিষয়-বাসনার প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহার মতে শান্তির মাহাত্ম্যপ্রচার করা বাতুলের কার্য্য; কারণ স্থায়ী শান্তি অসম্ভব এবং সুনীতিবিঘাতক। রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ-ব্যাপারের জন্য সদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে, বিশ্বের সমক্ষে নিজ শক্তির প্রচণ্ডতা দেদীপ্যমান রাখিতে হইবে, জাতির হৃদয়ে উচ্চ অভিমান পোষণ করিতে হইবে, এবং যে কারণেই হউক, জাতীয় সম্মানের সামান্য লাঘব ঘটিলেই যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে।

এই সকল মত শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সংগ্রাম অনিবার্য্য না হইলেও, উহা যে মানব সমাজের অমঙ্গলকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় যে ইউরোপেও ইহা দেখাইয়া দিবার লোকের অভাব হয় নাই। ট্রাইট্‌স্কে যখন অধ্যাপকের আসন হইতে এই সকল ভয়ঙ্কর মত প্রচার করিয়া জার্ম্মাণ জাতির যুদ্ধলালসা প্রজ্বলিত রাখিতেছিলেন, সেই সময়েই ইউরোপ-খণ্ডের এক মনীষী ইহার বিপরীত মত প্রচার করিয়াছেন। যুদ্ধের জয়গান ট্রাইটস্কের পক্ষে বক্তৃতামাত্র, পরন্তু টলষ্টয় স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া যুদ্ধ-ব্যাপারকে ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন।

যুদ্ধবাদী ট্রাইটস্কে সংগ্রামার্থ যাহা প্রয়োজনীয় তৎসমস্তেরই বিজয়গান করিতেন। তিনি বলেন, বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্পকলাদির সাধনায় জাতি-নির্ব্বিশেষে সকল মানবই যোগদান করিতে পারে, কিন্তু জাতীয় সৈন্যশ্রেণীতে যোগদান করা একটি বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণেরই বিশেষত্বজ্ঞাপক। ফলতঃ, জাতীয় সৈন্য-দলকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সমগ্র জাতির রূপান্তর বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। অতএব, ট্রাইটস্কের মতে সকল ব্যক্তিকেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।

সাধারণভাবে যুদ্ধের গৌরবগান করিয়াই ট্রাইট্‌স্কে ক্ষান্ত হন নাই; জার্ম্মাণজাতির পক্ষে যুদ্ধ যে অত্যাবশ্যক, বিশেষ করিয়া সেই মতেরও প্রচার করিয়াছেন। জার্ম্মাণ-গণকে যুদ্ধার্থ স্থায়ীভাবে বিশাল সেনাদল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কেবল ইহার সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যতীত এতৎসম্বন্ধে প্রজাসভার

অপর কোন অধিকার থাকিবে না। যোদ্ধা যতদূর প্রয়োজন নির্ম্মম হইবে, ইহাও ট্রাইট্‌স্কের মত।

যুদ্ধব্যাপার যে জার্ম্মাণজাতির পক্ষে সর্ব্বথা অনিবার্য্য, জার্ম্মাণীকে যে সদাই যুদ্ধার্থ সজ্জিত থাকিতে হইবে, ইংরাজের সহিত বোঝাপড়া করাই তাহার একটি মুখ্য কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জার্ম্মাণগণের ইংরাজ-বিদ্বেষ যে বর্ত্তমান যুদ্ধসম্পর্কে বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে, এবং ট্রাইট্‌স্কেও যে অনুরূপ মতাবলম্বী, পূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

মিলটন, স্পেন্‌সার, প্রভৃতি কবিগণের রচনা ট্রাইট্‌স্কে সমাদর করিতেন না, এরূপ নহে। কিন্তু এই সকল কবিগণের কাব্যাদিতে ইংরাজজাতির যে আত্ম-প্রতিষ্ঠ শক্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাঁদের রচনাবলীতে রাষ্ট্রীয় জীবনের যে মহত্ত্বের ছবি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার দিকেই ট্রাইট্‌স্কের দেশহিতব্রত চিত্ত সমধিক আকৃষ্ট হইত। অপর পক্ষে ট্রাইট্‌স্কের মতে, ইংরাজের শাসনপ্রথা প্রশংসার যোগ্য হইলেও, জার্ম্মাণীর পক্ষে গ্রহণীয় নহে; কারণ জার্ম্মাণীর শাসনপ্রথাই তদ্দেশের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী এবং স্বাভাবিক। ইংরাজের প্রথায় তাহাদের কায চলিতে পারে, কিন্তু অস্বাভাবিক হইবে।

ইংরাজজাতি অশেষক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে। ট্রাইট্‌স্কের মতে, ইহা অপরাপর ইউরোপীয় রাজ্যের অসতর্কতার ফল। তজ্জন্যই ইংরাজ এরূপে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। ইংরাজের কিছুই ট্রাইট্‌স্কের চক্ষে ভাল নয়। ইংরাজের সেনাদল বেতনভোগী; দেশবাসী সকলকে যুদ্ধকার্য্য শিখিতে হয় না। ইহা তাহাদের উদার শিক্ষার অভাবজনিত বলিতে হইবে। ইংরাজ সৈনিক শারীরিক সামর্থ্যে হীন নহে। কিন্তু ট্রাইট্‌স্কের মতে, যেরূপ ঘুষাঘুষি ও শিক্ষার তাড়নে ইংরাজ সৈন্যগণ এরূপ সামর্থ্য লাভ করে, তাহার ফলে উহাদের দেহটিমাত্র গড়িয়া উঠে, মানসিক শক্তিতে তাহারা জাতীয় সৈন্যদলের সমকক্ষ হইবে না। সৈন্যাধ্যক্ষগণের আত্মীয়তা-লেশবিহীন নিয়ম-নিগড়বদ্ধ ব্যবহারফলে এই সকল সেনাগণ দ্বারা যন্ত্রের কায চলে বটে; কিন্তু উহাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের উত্তেজনার স্ফূর্ত্তি সম্ভবও নহে, এবং তদর্থে উৎসাহ লাভও ঘটে না।

ইংরাজ নৌবলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী; কিন্তু ট্রাইট্‌স্কে বলেন যে, জার্ম্মাণীকে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। নৌ-বল ইংরাজজাতির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। জলপথে তাহারা কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, এবং তাহাদের এই প্রভুত্ব তাহারা বজায় রাখিতেই চাহিবে। কিন্তু ট্রাইট্‌স্কে বলেন যে, জার্ম্মাণী এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, নৌবলে ইংরাজের অপ্রতিহত প্রভাব নষ্ট করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে।

ইংরাজগণ নানা উপায়ে ভূমণ্ডলের বহুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইংরাজ-জাতি যুদ্ধপ্রিয় না হইয়াও এরূপ সুবিধা ভোগ করিবে, ইহা ট্রাইট্‌স্কের চক্ষুশূল। তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্দ্ধনশীল জনসংখ্যার উপযুক্ত বাসস্থান সংগ্রহার্থ জার্ম্মাণীরও উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে। কেবল ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট নহেন। উপনিবেশ সংস্থাপন জার্ম্মাণী পক্ষে একটা বৈষয়িক প্রয়োজনমাত্র নহে; পরন্তু এ বিষয়ে তাহার একটা নৈতিক দায়িত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ত্তমান রহিয়াছে। জার্ম্মাণীকে দেশবিদেশে সভ্যতা বিস্তার করিতে হইবে। এইরূপে প্রতিবিষয়েই ইংরাজের শ্রেষ্ঠ ট্রাইট্‌স্কের বিষদৃষ্টিতে পড়িত। তাই ইংরাজের নিন্দা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি ছাড়িতে পারিতেন না।

ট্রাইট্‌স্কের জীবন-কথা আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, এক সাম্রাজ্যের অধীনে সমস্ত জার্ম্মাণগণের ঐক্যসাধন তাহার আদর্শ ছিল। জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য-গঠনের ইতিহাস তিনটি প্রধান স্তরে সজ্জিত করা যায়। ১৮১৫-১৮৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার প্রথম স্তর। সম্মিলিত জার্ম্মাণ রাজগণের সেনা সাহায্যে নেপোলিয়নের পরাভব হইতে প্রথম স্তরের আরম্ভ। ঐ সময় অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর ক্ষুদ্রবৃহৎ রাজ্যগুলি 'জার্ম্মাণ যুক্তমণ্ডল' (The German Confederation) নামে পরস্পরের সাহায্যার্থ একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই মণ্ডলে প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য

স্বীকৃত ছিল। পরিশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া ও প্রাশীয়ার যুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার পরাজয় হইতে অষ্ট্রীয়ার প্রাধান্য অস্বীকৃত হয়, এবং ঐ সময়েই উত্তরাংশের জার্ম্মাণ রাজ্যগুলি প্রাশীয়ার কর্ত্তৃত্বে 'উত্তর জার্ম্মাণ যুক্তমণ্ডল' (The North German Confederation) নামে একতাবদ্ধ হয়। এই সময় হইতে দ্বিতীয় স্তরের আরম্ভ। তৎপর ১৮৭০ খৃঃ অব্দে প্রাশীয়ার সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধকালে সমস্ত জার্ম্মাণ রাজ্যগুলি প্রাশীয়ার সহিত মিলিত হইয়া ফ্রান্সের পরাভব সাধন করে। যুদ্ধান্তে প্রাশীয়ার চক্রবর্ত্তিত্বে এই সকল রাজ্যের সম্মিলন-সূত্রে সমগ্র জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে তৃতীয় স্তরের সূত্রপাত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে বিসমার্কের মন্ত্রণাশক্তি ও মল্কের (Moltke) যুদ্ধকৌশলই আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্য-স্থাপনার কারণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু ফিক্‌টে (Fichte) যেমন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জার্ম্মাণ যুবকগণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া প্রাশীয় রাষ্ট্রবীর শার্ণহর্ষ্টের কার্য্যের (Scharnhorst) সহায় হইয়াছিলেন, সেইরূপ ড্রয়সেন, সীবেল, ট্রাইট্‌স্কে প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ইতিহাসের শিক্ষাদীক্ষার সহিত জাতীয়তা-গঠনের সম্পর্ক দেখাইয়া দিয়া, জার্ম্মাণগণকে জাতীয়তা-গঠনে উত্তেজিত করিয়া, লোকমত সংগঠনপূর্ব্বক সাম্রাজ্যগঠনকার্য্যের সহায়ক হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ট্রাইট্‌স্কে ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

পরিণামে যে বিশিষ্ট আকারে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে তাহা ট্রাইট্‌স্কের মতানুযায়ী হয় নাই বটে। তাহার কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া প্রাশীয়া রাজ্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া একটি বিশাল রাজ্যে সমগ্র জার্ম্মাণজাতির সম্মিলিত হওয়াই তাঁহার একজাতীয়ত্বের আদর্শ রূপ ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরের ছয়মাসব্যাপী সভায় প্রাশীয়া রাজ্যের অধীনে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা যখন বিফল হইয়া যায়, তখন তিনি কিশোরবয়স্ক বালক-মাত্র; কিন্তু তখন হইতেই তিনি জার্ম্মাণীর একজাতীয়ত্ব সাধনার্থ বাহুবলের প্রয়োগও ন্যায্য মনে করিতেন। তাঁহার মত ছিল, জার্ম্মাণগণের একজাতীয়ত্বসংঘটনকল্পে বিভিন্ন রাজ্যের সত্তালোপ আবশ্যক এবং প্রবল প্রাশীয়া রাজ্য ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা এ কায সম্ভব হইবে না। তাঁহার অধ্যাপকীয় বক্তৃতায় ও রচিত ইতিহাসাদিতে তিনি এই মতেরই প্রচার করিয়াছেন, এবং প্রাশীয়া যে এই কার্য্যের জন্য বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাহাও দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রাশীয়ার প্রাধান্যেই গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বেভেরিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজ্যগুলির স্ব স্ব রাজ্যশাসন কার্য্যে প্রভুত্ব সম্পূর্ণই বজায় রহিয়াছে। কিন্তু যে রূপেই হউক, সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে পর যাহাতে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় ও সবল হয়, অতঃপর সংবাদপত্রে, অধ্যাপকের আসনে, বা প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি-সভায় এতদর্থে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতে ট্রাইট্‌স্কে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচিরঞ্জীব মজুমদার।

শূণ্যপুরাণ *

বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশে তান্ত্রিকতায় পরিণত হওয়ার পর ইহা হইতে ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মপূজার প্রধান একজন প্রতিষ্ঠাতা রামাই পণ্ডিত। তিনি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার অন্তর্বর্ত্তী কোনও এক স্থানে বসবাস করিয়া গিয়াছেন। শূণ্যপুরাণে পদ্যে ও গদ্যে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি ও উৎপত্তি আদি বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত গ্রন্থের যে সকল প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে রচনা সর্ব্বত্র অবিকৃত অবস্থায় থাকে নাই,—পরবর্ত্তী প্রতিলিপিকারদের হস্তে পড়িয়া ক্রমে কতক কতক অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাংলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু,

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত "বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও আদি প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ।

ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া অনেক স্থলে রচয়িতার ভণিতাও রক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রচনার কতক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) অথ বারমাসি (৭০ পৃঃ) :—

বৈশাখ গেলে জৈটমাস বৃস রাসি। হে হরিহর বার ভাই বার আদিত্ত হাত পাতি নেহ সেবকর অর্ঘ পুষ্পপানি সেবক হবু সুখী আমনি ধমোৎ কম্নি গুরুপণ্ডিত দোলা দানপতি সাংসুর ভোক্তা আপান সন্ন্যাসী গতি জাইতি গাএন বাএন দুয়ারি দুয়ারিপাল। ভাণ্ডারি ভাণ্ডারপাল। রাজদূত কোখি কোটাল পাব সুখ মুকতি এহি দোলে পড়িব জঅ জঅকার। দাতা দানপতির বিঘ্ন হব নাশ।

(২) অথ ধর্ম্মস্থান (৫৭। ৫৮ পৃঃ)

আইদ ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম জথা আইক স্থান।
নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী
ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান ॥১
চানক দিল মানিকভাণ্ডার পুখুর আড়র উপর।
চিত্রগড়র কামিনা বিসান্তর ॥২
চিরিআ বা অতি পার্থ পাসান চিরিআ।
কন বলিএ ধরিলা সূতর ধার ॥৩
উত্তর দখিন পচ্ছিম ভাণ্ডার ঘর।
পুরবে রাখিল দুআর তিন খানি
ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছ ভর ॥৪
আড়ার মাইজ থানে দপ্পন সোভা করে।
বিচিত্র ভাণ্ডার ঘর ভাণ্ডার পানের স্তম্ভ লাগে চন্দনর
নাদন ॥৫

(৩) নম সত্ত সত্ত কর তার।
নিরঞ্জন নৈরাকার ॥১
উদআস্তি হইলেন গোসাঞি সুন্দর সঞ্চার।
ভেদ নহি তিনে সেই করতার ॥২
অবিকার বিকার ধম্ম ধবল মুর্ত্তি।
ধবল বন্নর ধম্ম করিলা আকার স্থিতি ॥৩
নকারে নমো নিরঞ্জন। অকারে নমো বস্তা।
সকারে নম বিষ্টু। মকারে নমো মহাদেব। সঅ
মামে সিব সক্তি। ভঅতারন অনাদি জুগপতি।
নিসক লক্ষিরূপ সুন্নধর। তাহারে ভজে জত অমর ॥
হয় পাপ বিমোচন।
সার করেন নিরঞ্জন ॥৪
রামাঞির বাচা সিদ্ধ
ভকতা বর দেহ অনাদ্য ॥৫

গ্রন্থখানির প্রধান একটি বিষয়—"সৃষ্টি পত্তন"। এই অদ্ভুত সৃষ্টির বৃত্তান্তটি বিবৃত করিতেছি।

প্রথমে—
নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥২ (১ পৃঃ)
"সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার" (২ পৃঃ)

একমাত্র ছিলেন—নিরাকার "পরভু করতা"। তার পর "পরভুর" সৃজনের ইচ্ছা জন্মিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন—

শূন্য ত ভরমন পরভুর সূন্যে করি ভর।
কাহারে জম্মাব পরভু ভাবে মাআধর ॥১৩
মহাসূন্য মধ্যে পরভুর জনমিল পবন
তাহা হইতে জনমিল অনিল দুইজন ॥১৪
অনিল হইতে পরভুর হএ গেল দআ।
ঠাকুরের পারিসদ হইল কত মাআ ॥১৫ (২ পৃঃ)

তারপর, "পরভু" কলেবর ধারণ করিয়া "নিরঞ্জন" নাম গ্রহণ করিলেন। গ্রন্থকারের ভাষায় সেই বৃত্তান্ত শুনুন :—

বিসার উপরে পরভুর উপজিল দআ।
আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ ॥১৯
দআর সাগর পরভু হএ গেল থিত।
দেহ হইতে পুনৰ্জ্জন্ম জম্মে আচম্বিত ॥২০
জনমিল পুরুস তার নহিক হাত পাও।
রজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও ॥২১
জনমিল পুরুস তার নহি দুটী আঁখি।
আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি ॥২২
দেহেত্তে জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।

তারপর—
দআর আসনে ধর্ম্ম বসিল আপনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্ত জানে ॥ ২৫
চৌদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।
উর্দ্ধ নিস্বাসে জনমিলেন পক্ষ উল্লুকাই ॥ ২৬

উল্লুক উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু "পরভুর" ডাকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। "মহাপরভুর"

সাক্ষাতে পঁহুছিয়া উল্লুক মুনি—তথা পক্ষী—প্রণিপাত করিলে তিনি উল্লুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।"কুথা হইতে আইল পক্ষ কুথা তুহ্মার ঘর।" (৪ পৃঃ)। 'মহাপরভু"র এই একটি বিশেষত্ব আমরা তাঁহার প্রত্যেকটি জীবসৃষ্টির পরই লক্ষ্য করিয়াছি,—তিনি প্রভূতক্ষমতাশালী, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, ও মহাব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও পরিচয় ভিন্ন তাঁহার নিজসৃষ্ট জীবের বৃত্তান্ত ঠাহর পাইয়া উঠেন না। সম্ভবতঃ অনাদিকাল হইতে অবস্থানহেতু কতকটা ভীমরথিত্ব তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তা যাই হউক—উল্লুককে আশিষান্তে নিজ সেবায় নিযুক্ত করিতে "মহাপরভু"র কালবিলম্ব হইল না। উল্লুক পক্ষপুট আসনরূপে প্রদান করিল। বিরামপ্রদ আসন পাইয়াই 'মহাপরভু' ধ্যানে বসিয়া গেলেন—

উল্লুকের পৃষ্ঠে প্রভু বৈসে জোগ-ধেআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভুর এক বস্ত জানে॥ ৪২

এদিকে—

খুধায় তৃসায় পক্ষর দহেন্ত কলেবর।
উল্লুক বলেন্ত পরভুর সহিতে নারি ভর॥ ৪৩

"মহাপরভু" আশ্রিতবৎসল; অনুগতকে যথাসাধ্য অনুগ্রহপ্রদানে তাঁহার কোনও দ্বিধা নাই,—কিন্তু বর্ত্তমানে আবশ্যক আহারের উপায় উদ্ভাবন তাঁহার বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠিল না। উল্লুক পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ভক্তবৎসল নিরঞ্জন "বদনের লাল দিল উল্লুকের মুখে'। সব লাল এক উল্লুকের ভোগ্য হইল না,—"কিছু সংহারিল, কিছু সুন্যে হইল ক্ষিতি"। ইহাতে এক উৎপাত ঘটিল—"পরভুর বিম্বুকে জল হইল আচম্বিতি।" জল সৃজনের পর "মহাপরভু" ও তাঁহার অনুচরের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা শুনুন,—

নীরেত নিরমল কাআ নাম নিরঞ্জন।
মহাতেজে ভইল জল ভাসে দুই জন॥ ৫১
দুহুত ভাসিল জলে করন্তি টলমল।
উল্লুক সহিতে নারে জায় রসাতল॥ ৫২
জলের হিল্লোলে দুহে করে লাট পাট।
দুহেত পড়িলন্ত জলে বাড়িল বিসম্বাদ॥ ৫৩

একটি লাভ হইল—উল্লুকের "বার পাক" খসিয়া পড়ায় তাহা হইতে এক "পরমহংস" জন্ম গ্রহণ করিল। জন্মলাভ করিয়াই "পরমহংসের" দূরে উড়িয়া যাইবার চেষ্টা, ঠাকুরের আকর্ষণে তাঁহার নিকট আগমন, ও ভোলা "পরভু" কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াও পরিচয়প্রদান যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন "পরভু"র পরমহংসের পৃষ্ঠে আরামে অবস্থান করিবার ইচ্ছা জন্মিল।

আইস বাছা পরমহংস থাক মোর দিঠে।
তিলেক বিরাম আক্ষি করি তব পিঠে॥ ৬৫

আবার সেই পুরাতন পালা অভিনীত হইল। "মহাপরভু" সুখাসন লাভ করিয়া 'বস্তজ্ঞানের' "ধেআনে" বসিয়া গেলেন এদিকে, হংস মহাশয় বহুযুগ পরেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া "পরভু"কে, ফেলিয়াই পলায়ন করিল। তখন—

প্রলয় হইলাক জল বড় বলবান।
পদ্ম হস্ত দিল জলে স্বরূপ নারান॥ ৭১
পদ্ম হস্ত দিয়া পরভু বলে থির থির।
পদ্মহস্তে জনমিল জে কুম্মর সরীর॥ ৭২

আবার পূর্ব্ববৎ সব ঘটিয়া উঠিল; সুখাসন প্রাপ্ত হইয়া "মহাপরভু" পূর্ব্বস্মৃতি সব ভুলিয়া বসিলেন, বাহনকে একটু বিরাম বা বদল দিয়া যে সুস্থ করিয়া লইবেন, সে সম্বন্ধে আর তাঁহার বিবেচনা রহিল না। আবার সেই,—

মহাশূন্যে পেএ পরভু বসিলা ধিআনে।
কত সত যুগ গেল এক বস্ত গেআনে॥ ৭৪

পরে কূর্ম্মরাজের আরোহী ত্যাগ করিয়া পলায়ন—আর নিরঞ্জন ঠাকুরের "জলের হিল্লোলে" উলট পলট খাওয়া। তখন মন্ত্রীবর উল্লুক পরামর্শ দিলেন, "জলের উপরে কর ছিষ্টীর সাজন।' কথাটা ঠাকুরের মনঃপূত হইল। কিন্তু, সৃষ্টির উপায় তিনি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আবার উল্লুকের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন—

আক্ষা হইতে বুদ্ধিমান্ পুত্র উল্লুকাই।
কেমনে করিব ছিষ্টি থল নাহি পাই॥ ৯০

উল্লুক যুক্তি দিলেন, "কনকপৈতে ছিঁড়ে ফেলি দেহ জলে"।

দ্বিজ রামাই পণ্ডিত পৈতা ত্যাগ করিয়া তাম্রধারণ করিলেও, পৈতার মাহাত্ম্য একবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই তাঁহার আদিদেবতা নিরঞ্জনকে কনকপৈতা-বিভূষিত বলিয়া

কল্পনা করিয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বহু দেবদেবী ও আচারের উপর শ্রদ্ধা সে কালের তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরে এই প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য অটুট রাখার জন্য এক নিরঞ্জন মহাপ্রভুকে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দুর অনেক প্রধান দেবদেবীকেই যথাক্রমে পরবর্ত্তী শ্রদ্ধার আসনসমূহে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

তারপর সৃষ্টিতত্ত্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কনক পৈতা হইতে "জনমিল বাসুকি নাগ সহস্রেক মাথা"। ডোম পণ্ডিত মহাশয়ের পুরাণ গ্রন্থে হিন্দুদের সকল পদই আছে, সেই জল-প্লাবন—সেই বাসুকি, পরে আরও দেখিবেন—সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা। কিন্তু সকলেই যেন স্বগুণ ও স্বরূপ ত্যাগ করিয়া সং সাজিয়া আসিয়াছেন।

জনমিআ বাসুকি পুন খাইবারে ধাএ।
ঠাকুর উল্লূক দুহে পলাইয়া জাএ॥ ৯০

এত বড় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মজ্ঞানী অনাদিপুরুষ, তিনির প্রাণভয়ে অস্থির না হইয়া পারিলেন না। এখন নাগের আহার না জুটাইতে পারিলে ত নিরুপায়! আবার উল্লূক পরামর্শদাতা হইল।

উল্লূকের বাক্য সুনিএ পরভু নারাঅন।
কানের কুণ্ডল জলে ফেলিলেন্ত তখন॥ ৯৮
ফেলাইয়া দিল জলে হীরে জনম কড়ি।
জনমিল ভেক তার হইল চাইর ভরি॥ ৯৯

সরলান্তঃকরণ ঠাকুর উল্লাসে ও কৃতজ্ঞতায় বলিয়া উঠিলেন—

আহ্মা হইতে অধিক পুত্র তুহ্ম বুদ্ধিমান্। (১০পৃঃ)

কথাটা আমাদেরও ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এমন মুক্তকণ্ঠে নিজ ত্রুটি স্বীকার করায় মহত্ত্ব আছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এখন সৃষ্টির প্রকরণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

ছিষ্টির কারণ হেতু ত্রিদসর নাথ।
আপুনার গলেত পরভু দিল পদ্মহাত॥ ১০৫
গলার মলা লএ পরভু ভাবেন্ত তখন।
রাখিব বাসুকি মাথে বোলে নিরঞ্জন॥ ১০৬
তিলেক পরমান মলা নিল নারাঅন।
ঠাকুর উল্লূক দুহে কহিল বচন॥ ১০৭
সেই অঙ্গমলা দিল বাসুকির মাথে।
ছিষ্টির সাজন পরভু কৈল হেন মতে॥ ১০৮
বাসুকির মাথে পরভু রাখিল বসুমতী।
নঅদীব বসুমতী রাখিল খিআতি॥ ১০৯

বসুমতীর উপর প্রভু নিরঞ্জনের আদেশ হইল,—

জনম হইল বসুমতী হও গো চিরাই।
আহ্মি জাক জনমাইব তাক দিও ঠাঁই॥ ১১৪

তার পর ঠাকুর উল্লূককে সঙ্গে করিয়া পৃথিবীপরিভ্রমণার্থ বাহির হইয়া পড়িলেন। এদিকে—"দেগেত বাড়িআ চলে দেবী বসুমাই।

পূর্ব্ব হইতেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, রামাই পণ্ডিতের "মহাপরভু" স্বকৃত কর্ম্মের খোঁজ রাখেন না—অলক্ষিতে, আচম্বিতে লোকসৃষ্টি করিয়া পরে তাহাদের পরিচয় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। পৃথিবী পরিভ্রমণকালেও এরূপ ঘটিল।

পৃথিবী ভরমিআ দুহে পরিশরম হইঞা।
অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরভু ফেলিল মুছিঞা॥ ১২১
তাতে আদ্যাশক্তির জনম হইল আচম্বিতে।
ঘামেত জনমিল শক্তি চলিল তুরিতে॥ ১২২

সহচর উল্লূক মুনিও এই জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। তাঁহার এরূপ অলক্ষিত কর্ম্ম পছন্দ হইল না; ফলে, ঠাকুরের তাহাকে মিষ্টবাক্যে প্রবোধ মানাইয়া রাখিতে হইল। কথাটা গ্রন্থকারের ভণিতায় ব্যক্ত করা আবশ্যক।

উল্লূক কহেন্তি বাক্য সুন নারাঅন।
আহ্মার অগোচরে জনম দিলা কুন জন॥ ১৩২
ঠাকুর বোলেন সুন পক্ষ উল্লূকাই।
জদি জনম দিলাম আমি তুহ্ম ছাড়া নাই॥ ১৩৩

তারপর তিনজন মিলিয়া আলাপ পরিচয় ও পরে সদ্যসম্ভূতা দেবীর নামাকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।

দুইজনা জুক্তি করি বোলে দুইজন।
আদ্যাসক্তি বোলে নাম রাখিল ততখন॥ ১৪০
ঠাকুর উল্লূকে দুহে বাজিল জে কথা।
উল্লূক তুহ্মার খুড়া আহ্মি তুহ্মার পিতা॥ ১৪১

এস্থলে একটুকু বক্তব্য এই যে কতক পংক্তি

পূর্ব্বে "আহ্মা হইতে অধিক পুত্র তুহ্মি বুদ্ধিমান্" বলার সময় উল্লুকের সহিত ঠাকুর নিজের যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, এখানে দেখা যায়, তাহা ভুলিয়া গিয়া, নূতন এক সম্বন্ধ পাতাইয়া বলিলেন। তারপর মহাপরভু

সিরজিল বল্লুকা-নদী বল্লুকার জল।
উল্লুক বলিআ দিলা সে তপস্যার থল॥ ১৪৮
তপিস্সার থলে পরভু বসিল দিআনে।
চৌদ্দ জুগ গেল পরভু এক বস্ত-গেআনে॥ ১৪৯

ঠাকুর মধুমক্ষিকার মতন সৃষ্টির মৌচাক গাঁথিয়া যাইতেছেন; অথচ কোন্টা কি হইল, নিজে কিছু বুঝিতে পারেন না। ভাগ্যক্রমে প্রথমেই উল্লুকাইকে জন্ম দিতে পারিয়াছিলেন,তাই বল্লুকাদির পরিচয় তাঁহার ঘটিয়া উঠিল। ঠাকুরের আর এক অভ্যাস, মনে করিয়া দিলেই তিনি ধ্যানে বসিয়া যান তা আবার কি ধ্যান—বার যুগ, চৌদ্দ যুগের কম শেষ হয় না। তার পরেও অন্য লোকে "অত্তিষ্ঠ" হইয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া বা খোঁচাইয়া তুলিয়া দিলে তবে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়।

এবারেও আদ্যাশক্তির ঘরবর কিছু হইল না। তাঁহাকে একা ফেলিয়া ঠাকুর যুগের পর যুগ বল্লুকার তটে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। ইহাতে শক্তি অধীর হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার অধৈর্য্য দেখিয়া "কামদেব ঠাকুর" জন্মগ্রহণ করিলেন ও ঠাকুরাণীর আজ্ঞায় "মহাপরভুর" ধ্যান ভাঙ্গাইতে চলিয়া গেলেন। সৌভাগ্যবশতঃ মহাপরভু মহাধীর, শান্ত প্রকৃতির ছিলেন, তাই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে গিয়া হিন্দু পুরাণের কামদেবের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, আমাদের এই কামদেবের সে দুর্ভোগ ভুগিতে হইল না। মহাপরভু সজাগ হইয়া চিরসহচর উল্লুককে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে,

উল্লুক বোলন্তি পরভু সুনহ বারতা।
আদ্যাকে জনম দিএ রেখে আইলে কুথা॥ ১৬০
তুহ্মারে ন দেখিএ আদ্যা কামে জনমাইল।
তপিস্সার ভঙ্গ হেতু কামেক পঠাইল॥ ১৬১

তখন

তপিস্সা ছাড়িআ পরভু বাড়াইলা পা।
আদ্যার মন্দির গিআ তুলিলেক পা॥ ১৬৮

তারপর আদ্যার ঘরে বিষমধুর একভাণ্ড রাখিয়া দুইজনে তাঁহার পাত্রের খোঁজে আবার বল্লুকাতে চলিয়াগেলেন। আদ্যাশক্তি আবার অধীর হইয়া পড়িলেন এবং জীবনপরিত্যাগ করার সংকল্পে পাত্রস্থ বিষমধু পান করিয়া বসিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মরণ হইল না—সন্তান-সম্ভাবনা হইল। এই গর্ভ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্টু ও সদাশিব জন্মগ্রহণ করিলেন।

তার পরের ঘটনা শুনুন—

ভুমিস্টি হইয়া তিনি তপিশ্স্যাঅ গেল।
সব রূপ হৈএ পরভু ছলিতে চলিল॥ ১৮৮

পরভু প্রথমে বম্ভার নিকট গেলেন। "দুর্গন্ধ পাইয়া বম্ভা ভাইসিতে লাগিল।" পরে, "বিষ্টুর" নিকট গেলে, তিনিও "ভাসাইআ দিআ দিলা তারে দিআ তিন অঙ্গুলি।" শিব, কিন্তু নিরঞ্জন দেবের ছলনায় ঠকিলেন না।

ধেআনেত জানিল এহি পরভু নারাঅন
বুঝিতে তিনজনার মন আসিলা সনাতন॥ ১৯৫
দুহাতে ধরিআ মরা তুলিঞা লইল।
দুর্গন্ধিত শব লএ শিব নাচিতে লাগিল॥ ১৯৬
"শ্রীধর্ম্ম বোল্লেন তুহ্মি আহ্মারে চিনিলে।
দুই চক্ষু অন্ধ ছিল ত্রিলোচন হইলে॥ (১৯পৃঃ)

শিবের মরা কান্ধে করিয়া নাচাও ঠিক আছে; তাঁহার ত্রিনেত্র লাভ করাও হিন্দুর পৌরাণিকী কথা; কিন্তু, রামাই ঠাকুর—হিন্দু পুরাণের কাঠামে উদ্ভট হাস্যাস্পদ মূর্ত্তি সব গড়িয়া তুলিয়াছেন! শূণ্যপুরাণের বম্ভা, বিষ্ণু বা সদাশিব কেহই উন্মুক্তচক্ষুসহ জন্মলাভ করেন নাই। মার্জ্জারশাবকের দৃষ্টান্তে বোধ হয় পণ্ডিত মহাশয়ের এই অপরূপ জীবগঠনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। যাই হউক, শিব স্বার্থপর ছিলেন না। তিনি ভাই দুজনের জন্যও চক্ষু লাভের বর চাহিয়া লইলেন। তারপর নিরঞ্জন দেব হিন্দুপুরাণানুযায়ী দেবতাত্রয়ের কর্ম্মবিভাগ করিয়া দিলেন।

বম্ভারে বোলিল কর ছিসৃটির পত্তন ॥ ২১১
বম্ভা ছিসৃটি করিব জে বিষ্টু করিব পালন।
ত্রিলোচনে দিল ভার সংহারের কারন ॥ ২১২

পার্ব্বতীর এ জন্মে আর বর জুটিল না। তাই,মহাপরভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "মহেস করিব বিভা জন্মজন্মান্তরে।" মহাপরভুর বাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। হিন্দুযুগে এই বিবাহ যথার্থই সংঘটিত হইল।

রামাই পণ্ডিত বর্ণিত বিষয়টি যতই উদ্ভট করিয়া থাকুন না কেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে প্রধান একজন বলিয়া তিনি মহাসম্মানের যোগ্য, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই আদিকালে বঙ্গভাষায় তিনি যে কিছু কবিত্বপ্রসূন প্রস্ফুটিত করাইতে পারিয়াছিলেন, সেই টুকুর জন্যই তিনি সমগ্র বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র।

শূণ্যপুরাণের "পুষ্পতোলন" অধ্যায়ে সে কালের এতদ্দেশে পরিচিত সর্ব্ববিধ পুষ্পের নাম পাওয়া যায়। শ্রোতার কৌতুহল নিবারণের জন্য ফুলের নামগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমেত কোঙর বক নাপালি সিআলি
কাল্যা কাসন্দর ইন্দীবর ফুল লইল তুলি ॥ ৭
অশোক কিংশুক জাতি তুবটী কুরুবক
করবী লবঙ্গলতা কদম্ব কনক ॥ ৮

আবার,—

সতেক ভার কওল নিরীখন করিআ তুলে ॥ ১৩
কাননে কুসুম তুলিলা রঙ্গন আর ঝাটি।
চামলী গন্ধলি তুলিলা শ্রীফল দুইবটী ॥ ১৪
চন্দন বানাত তুলি বেলাল সিকড়
তোআল পিআল সাইল দুহি আকড় ॥ ১৫
জাই জুই তুলেন্ত পুজিবাক নিরঞ্জন।
নানা পুষ্প তুলে বড়ু করিঞা লিখন ॥ ১৬

অন্যত্র—
কুন্দকুড়চি ফুল তুলিল দুলাল টগর।
সেঅতি মালতী জাতি চম্পা নাগেশ্বর ॥ ২১
বেল্যা গোঁওচি ভোচা আকড়া নিঅলি
জাহাত হইব তুষ্ট সে রূপর মুরুলী ॥ ২২
অখণ্ড ধুতুরা ঝিটি মারুআ কাচলি।
(মধু নাঞি সেহি ফুলে নাই বইসে অলি) ॥ ২৩
জবা সে তুলসী তুলি ধর্ম্মর পীরিতি।
উড়ক করঞ্চ বেলা তুলিল মালতী ॥ ২৭
কিআলা কেতকী মতি পলাস কাঞ্চন
আমজান তুলিলেন্ত পূজিবাক নিরঞ্জন ॥ ২৮

"চাস" অধ্যায়ে ভিক্ষা হইতে চাষের কাজ কেন, কত শ্রেষ্ঠ, তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মের ভিখারী বাঙ্গালী এখনও ইহা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে।

জখন আছেন গোসাঞি হআ দিগম্বর।
ঘরে ঘরে ভিখ মাগিআ বুলেন ঈসর। ৩
রজনী পরভাতে ভিকৃথার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ ন পাই ॥ ৪
হতুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোশাঞি ভিকৃথাএ ভাত ॥ ৫
আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চসচাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস ॥ ৬
পুখরী কাঁদাএ লইব ভুম খানি।
আয়সা হইলে জেন ছিচএ দিব পানি ॥ ৭
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছাএ ধান্ন আনিব দাইআ ॥ ৮
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব ॥ ৯
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘর দড় ॥ ১০
তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ
কত না মাখিব গোসাঞি বিভুতিগুলা গাএ ॥ ১১
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পঞ্চামর্তর আস ॥ ১২
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই জেন ধম্ম পূজার বেলা ॥ ১৩

নিম্নে উদ্ধৃত পদগুলিতে ধানের অসংখ্য নাম দেখিতে পাইবেন। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, বাঙ্গালাদেশে ফসলের অবস্থা তখন কি প্রকার প্রীতিকর ছিল, দেশের লোক খাওয়াপরা বিষয়ে তখন কি সুখস্বচ্ছন্দে বসবাস করিত।

জেঠ ধান বুনেন গোসাঞি হিদুরা আমলো।
আলাচিত ফেকরি দেখিতে জেবা কালো ॥ ৫৭
সনা খড়কি দুগ্‌গাভোগঅ
আস মুক্তাহার বুনেন দিগুন জার ফল ॥ ৫৮

কালা মুগড় বুনেন গোসাঞি ছড়া মারিবার তরে।
নাগর জুআন বুনেন পরভু বাছিআ ভাঙ্গরে ॥ ৫৯
তুলা শালি বুনেন পরভু তুলা জার গাএ
আসত্তির বুনেন পরভু বাস গন্ধ বাএ ॥ ৬০
ধান মাঝে ধান বুনেন বক কড়ি।
গোতম পলাল বুনেন পাতল জার ছড়ি ॥ ৬১
পাঙ্গুসিআ ভাঙ্গমুখ বুনেন খেমরাজ।
ভুলন ধান বুনেন বিরিঞ্চি দুদুরাজ ॥ ৬২
গুজুরা বোআলি দাড় হাতি পাঞ্জর।
বুড়া মাজ্রা ধান বুনেন দেখিতে সুন্দর ॥ ৬৩
হাটিআ হাটিয়া কআ তিল সাগরি আর।
জার মুক্তাস ধম্ম হৈল আস্তসার ॥ ৬৪
লতামৌ মৌকলস আর খেজুর ছড়ি।
পব্বত জিরা গন্ধতুলসী আর দলাগুড়ি ॥ ৬৫
বন্ধি বাঁস গজা আর সীতামালী।
ছকুলি হরি কলি বুলেন কুসুমমালী ॥ ৬৬
রক্তসাল চন্দনসাল বুনেন এক ভিতে।
রাজদল নৌকলস বুলেন তুরিতে ॥ ৬৭
উড়াসালী বিন্ধমালী আর লাউমালী।
নানা ধান বুনেন পরভু ধান জে ভাদোলী ॥ ৬৮
রাজদল নৌকলস আজান সিঅলি।
কালা কাত্তিক মেগি বুলিলেন ভুলি ॥ ৬৯
খীরকন্ধ বুলেন পরভু পছাল রণজয়
কামদধান বুলেন পরভু জেবা বাতি জলে হয় ॥ ৭০
খুদ্দ দুদুরাজ বুলেন ভজনা বাঁকই।
মুগা মুক্তাহার পরভু বুনেন একু ঠাঁই ॥ ৭১
পিপিড়া বাঁসগজা বুলেন ককচি।
মধু মাধব লতা বুলেন বাগন বিচি ॥৭২
কোটা মোটা রাঅগড় তোজনা আর জের।
কোঙর ভোগজলা রাঙ্গি আর কনকচুর ॥ ৭৩
লালকামিনি সোলপনা বুনে পাচ্ছা ভোগ।
অন্ধোর কুলি ঘুমলে উলি আর গোপালভোগ ॥ ৭৪
বুখি আজান লক্ষী বুলেন বাঁসমতী
লাল ছাটী পসি কাঁওদ গন্ধমলিতী ॥ ৮৫
আম পাবন গআ বালি বুলেন পাথরা।
মসি লোট ঝিঙ্গাসাল বুলেন তসরা ॥ ৭৬
সমধুনা সুআ সান বুনেন টাঙ্গন
হরি মহীপাল বাঁকসাল বুনে মঙ্গলন ॥ ৭৭
বাঁকচুর পুআন বিড়ি গেঁড়ি গোপাল।
ছড়া বাঁস কাটাবুনে মরিচ মইপাল ॥ ৭৮
জলার ধান বাকুই বুনে লোটাইআ জয়
আথল পলিএ দাম বিড়াবঅ লা অ ॥ ৭৯

শূণ্যপুরাণের শেষ অধ্যায়ের শীর্ষলিপি "শ্রীনিরঞ্জনের রুম্মা।" অধ্যায়টি সকল হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায় না। ঘটনা এবং রচনাও রামাই পণ্ডিতের পরবর্ত্তীগণের বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, বিষয়টী বিশেষ কৌতুকাবহ বলিয়া শ্রোতৃ-বর্গের-সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

জাজপুর পুরবাদি সোলস ষরবেদি
বেদি লয় কন্নর যুন।
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন ॥১
মালদহে লাগে কর দিলঅ কন্ন যুন।
দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞি পায়
সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥২
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর
জালের পাঞিক দিসাপাস।
বলিষ্ট হইল বড় দসবিস হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস ॥৩
বেদ করে উচ্চারন বেরাাঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান ॥৪
এইরূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে ডাকিআ ধম্ম মনেত পাইআ মর্ম্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥৫
ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া একনাম ॥৬
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥৭
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম হৈল সুলপানি

গনেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥৮
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্রসূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥৯
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহঁ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নুর।
জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥১০
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফির্‌য়া খায় রঙ্গে
পাথড় পাথড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥১১

বৌদ্ধরাজগণের রাজত্বের অবসানে বাঙ্গালার বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ হিন্দুরাজগণের আশ্রিত ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিনিধি-বর্গ দ্বারা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও প্রপীড়িত হইয়াছিল। এই দুই মতাবলম্বী লোকের সংঘর্ষে দেশেও নানারূপ অশান্তি ও অরাজকতার উদ্ভব হইয়াছিল। অবশেষে, হিন্দুগণই প্রধান ও প্রবল হইয়া উঠিল। পরে যখন পাঠানেরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া দেবালয়, প্রাসাদ আদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল, তখন ধর্ম্মপূজকেরা বৈরি-নির্য্যাতন-সুখ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতে লাগিল। এইরূপ এক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই এই কৌতুককর অধ্যায়টি রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীভূপালকুমার দত্ত।

সোহাগিনী

পূজার প্রয়োজন দেখে না প্রিয়জন
বিফল আয়োজন হায়;
আমারে পূজিবারে চাহে সে বারে বারে
নূতন হলো এ কি দায়!

নমিতে গেলে সে যে বক্ষে টানি লয়,
চরণে বসিলে সে চুমিয়া কথা কয়,
চপল শ্যেন সম কাড়িয়া লয় মম
কুসুম দিতে গেলে পায়।

দেখিলে দূর হতে ছুটিয়া গলা ধরে,
অর্ঘ্য-থালি মোর ভূমে যে লুটে পড়ে,
সকল বন্দনা ভকতি কল্পনা
সোহাগ-বানে ভাসে তায়।

উলটা রীতি তার মরিয়া যাই লাজে,
জানি না কি যে আছে অবলা নারী মাঝে,
যাহাতে মিছি মিছি আমারি পায়-ছি, ছি,
সে কথা বলা নাহি যায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

পাখীর কথা

(৫)

সকল পাখী উড়িতে পারে না।

পাখীর সংস্কৃত নাম বিহগ; আকাশে ভ্রমণ করে বলিয়াই পাখীরা বিহগ, বিহঙ্গ, খগ, খেচর প্রভৃতি আখ্যা লাভ করিয়াছিল। আমরা সচরাচর যে সকল পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে এই সকল নামে দাবী আছে। গৃহপালিত হাঁসও তাহার গুরুভার দেহ লইয়া ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে। আর মোরগেরাও উড়িয়া গিয়া গাছের ডালের উপরই চড়িয়া বসে; বৌদ্ধজাতকের কুক্কুট তাহার প্রণয়প্রার্থী ধূর্ত্ত

মার্জ্জারের কথার উত্তর বৃক্ষশাখা হইতেই দিয়াছিল; ছেলেবেলার গল্পের মোরগও গাছ হইতে নামিয়া গিয়া শেয়ালের সহিত বন্ধুত্ব করিতে রাজি হয় নাই! ডাহুক ও জলপিপি সচরাচর হাঁটিয়া বেড়াইলেও, প্রয়োজন হইলে উড়িতে অক্ষম নহে। কিন্তু এমন কতগুলি পাখী আছে, যাহারা বিহগ বা খেচর নহে। তাহাদের কাহারও হয় ত পাখা আছে, কাহারও বা পাখা প্রয়োজনানুরোধে ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু তাহা দ্বারা তাহারা কখনও ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়া উপরে উঠিতে পারে না। যে সকল পাখী উড়িতে একেবারেই অক্ষম, তাহারা সকলেই বিদেশী। ইহাদের মধ্যে পেঙ্গুইন আবার দক্ষিণ মেরুর চিরতুষারসেবিত সাগরতীরের অধিবাসী। তাই আমাদের দেশের চিড়িয়াখানায় তাহাদের স্থান হয় নাই। কলিকাতার যাদুঘরে পেঙ্গুইনের দেহ রক্ষিত হইয়াছে।

যাহা দেখি নাই, তাহার কল্পনা করা কঠিন। তাই এই সকল উড়িতে অক্ষম পাখীর অস্তিত্ব কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু কেমন করিয়া যে ইহারা প্রকৃতিদত্ত আকাশভ্রমণের ক্ষমতা হারাইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। দেহ পরীক্ষা করিয়া তাহাদের এই ক্ষমতালোপের কাল-নির্ণয়ও করা যাইতে পারে। যে সকল পাখী উড়িতে পারে, তাহাদের বক্ষে জাহাজের গলুইর মত একখানা সূক্ষ্মাগ্র পাতলা হাড় থাকে। যে সকল পাখী উড়িবার ক্ষমতা একেবারে হারাইয়াছে, তাহাদের দেহেও এই অস্থির অস্তিত্ব দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাহাদের উড্ডয়ন-ক্ষমতার হানির কাল নিতান্ত আধুনিক। আবার, পাখীর গঠন ও মাংসপেশীর জটিলতার কম বেশী হইতেও বিমানবিহারের ক্ষমতালোপের সময়নির্দ্দেশ সম্ভবপর। অবশ্য, খেচর পাখীদের মধ্যেও পাখার গঠনের, মাংসপেশীর জটিলতার ও বক্ষের "গলুই হাড়ের" বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। তাহার ফলেই বিভিন্ন পাখীর উড়িবার শক্তির কমবেশী দেখা যায়। পারাবতের লঘু দেহ ও সবল

উড়িবার ক্ষমতালোপের কাল-নির্ণয়

পক্ষ তাহার আকাশভ্রমণে ও দ্রুত গগনে যেরূপ সাহায্য করে, মোরগপ্রভৃতি ভূচর পাখীদের দেহের গঠন সেরূপ ত্বরিত গমন ও শূন্যমার্গে দীর্ঘকাল বিচরণের উপযোগী নহে। খেচর পাখীদের মধ্যে যেরূপ উড়িবার শক্তির ও প্রণালীর তারতম্য আছে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের প্রণালীভেদে ও তাহার অনিবার্য্য প্রভাবে, উড়িতে অক্ষম পাখীদের মধ্যেও বিচরণের প্রণালীর তারতম্য হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম, ক্রমবিকাশ-নীতি ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের ফলেই অধুনালুপ্ত কোন সরীসৃপ হইতে খেচর পাখীদের উদ্ভব হইয়াছে। এই সরীসৃপের দল তাহাদের বাহু দুইটিকে আকাশভ্রমণের উপযোগী করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং প্রকৃতির প্রভাবে তাহাদের বাহুর পূর্ব্ব আকার ঘুচিয়া পাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, ভূচর সরীসৃপের খেচর হইবার সাধ জন্মিল কেন? মানুষের ন্যায় তাহাদের ত অনুসন্ধিৎসা নাই, অথবা একটা "নতুন কিছু" করার ইচ্ছাও ত তাহাদের মধ্যে থাকিবার কথা নয়। খুবই সম্ভব, শত্রুর আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষা ও সহজে খাদ্য আহরণের চেষ্টায়ই পক্ষীজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা কাউণ্ট জেপেলিনের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিমানবিহারে উদ্যোগী হইয়াছিল। যে কারণে তাহারা প্রথম উড়িবার শক্তি লাভ করিয়াছিল, সেই কারণের অনুপস্থিতিতে ও চর্চ্চার অভাবেই তাহাদের বংশধরদিগের উড়িবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে; ভূচর সরীসৃপের বংশধর খেচর পাখীর বংশে আবার ভূচর পাখীর উদ্ভব হইয়াছে। উড়িতে অক্ষম পাখীদের বাসস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। সাধারণতঃ যে সকল দেশে প্রচুর আহার পাওয়া যায়, ও মাংসাশী স্তন্যপায়ী জন্তু বিরল, সেই সকল দেশের পাখীরই চর্চ্চার অভাবে আকাশভ্রমণের ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পায়। অবশ্য, পাখীরা যে ক্রীড়াচ্ছলে কেবলমাত্র আনন্দের জন্যও উড়িয়া বেড়ায় না, তাহা নহে; কিন্তু শত্রুর হাত

উড্ডয়ন-শক্তির লোপের কারণ

হইতে সহজে আত্মরক্ষা ও সহজে খাদ্য আহরণের চেষ্টাই তাহাদের আকাশভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সকল দেশে ভূপৃষ্ঠেই বিনা চেষ্টায় নিরাপদে খাদ্যসংগ্রহ সম্ভব, সে সকল দেশের পাখীরা আর উড়িবার পরিশ্রম করিতে যাইবে কেন? তাই কয়েক পুরুষের মধ্যেই ব্যবহারের অভাবে ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীর হাতের মত এই সকল শ্রমবিমুখ পাখীর পাখাও আর উড়িবার কাযে আসে না। নিউজীলণ্ডের কাকাপো (Kakapo or Owlparrot) বা পেচক-তোতা ইহার একটি উদাহরণ। তোতাজাতীয় অপরাপর পাখীর তুলনায় ইহাদের আকার বেশ বড়; কিন্তু ইহারা ক্রমশঃই বিরল হইয়া উঠিতেছে। অন্যান্য তোতাদের ন্যায় ইহারাও যে এক সময় গাছের উপর বাস করিত এবং তখন ইহাদেরও যে উড়িবার উপযোগী সুগঠিত ডানা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প দিন হইল ইহাদের উড়িবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। পেচক-তোতা প্রথম যখন নিউজীলণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে, তখন সেখানে কোন প্রকার মাংসাশী স্তন্যপায়ী পশু ছিল না; স্তন্যপায়ী শত্রুদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই পাখাদের পাখার ব্যবহার অধিক করিতে হয়। শত্রুভয় না থাকিলে ফলভোজী পাখীরাও অনায়াসে ভূপৃষ্ঠ হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। যেখানে গাছপালা খুব বেশী, সেখানে গাছের তলা হইতে ঝরা ফল কুড়াইয়া লইলেও তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। এই কারণেই নিরাপদ নিউজীলণ্ডে আসিয়া কাকাপো পক্ষীজাতি আত্মরক্ষার প্রধান উপায় উড়িবার ক্ষমতা হারাইয়াছে। এখন তাহারা বৃক্ষকোটরের পরিবর্ত্তে পাহাড়ের ফাটালে বা মাটিতে গর্ত্তে বাস করে। উড়িবার শক্তি হারাইবার পর কাকাপোর দেশে নিশ্চয়ই কোন শত্রুসমাগম হইয়াছিল। তাই, একদা দিবাচর তোতা এখন প্রাণের দায়ে নিশাবিহারী হইয়া দিবানিদ্রা ও নৈশ ভ্রমণ অভ্যাস করিয়া লইয়াছে। কিন্তু নিউজীলণ্ডে য়ুরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর পেচক-তোতার জীবনরক্ষা দুঃসাধ্য হইয়াছে। যদি মানুষ একাকী সেখানে ঘর বাঁধিত, তাহা হইলে বোধ হয় নিশাচর কাকাপোর বিশেষ আশঙ্কার কারণ ছিল না। কিন্তু মানুষের সাথে সাথে সেখানে কুকুর, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুরও আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা ডিম ভাঙ্গিয়া, ছানা মারিয়া কাকাপো-তোতার বংশ ধ্বংসের নিকটে আনিয়াছে। বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতেই তোতাবর্গের এই অক্ষম পক্ষী পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

পেচক-তোতা

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে কাকাপোর দুই একটি জ্ঞাতিও সমকারণে উড়িবার ক্ষমতা হারাইতে বসিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি দেবী ইহাদের আকাশভ্রমণের ক্ষমতাহানির ক্ষতিপূরণ বিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন; যে সকল পাখী উড়িতে পারে না, তাহাদিগকে ভূমিতে দ্রুত বিচরণের নিমিত্ত তিনি সুদীর্ঘ চরণ প্রদান করিয়াছেন। পারাবত, তোতা, কোকিল ও ধনেশ (Horn-bill) প্রভৃতি তরু-নিবাসী পাখীর পা শরীরের অনুপাতে নিতান্ত ছোট। কিন্তু ইহাদের যে সকল জ্ঞাতি খেচরত্ব হারাইয়াছে, তাহাদের সকলেরই পা অতিশয় লম্বা।

ক্ষমতাহানির ক্ষতিপূরণ

নিউজীলণ্ডের ওয়েকা রেইল নামক পাখীও উড়িতে পারে না। ইহাদের মাঝারি আকারের পাখা আছে, কিন্তু তাহার দ্বারা আকাশভ্রমণ অসম্ভব। নিউজীলণ্ড দ্বীপের Water-Hen বা পানি-মোরগের নাম এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাখী জীবিত অবস্থায় ধৃত হইবার বহু পূর্ব্বে ইহার একটি ফসিল্ বা প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া যায়। তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহা কোন বিলুপ্তবংশ পক্ষীর প্রস্তরীভূত দেহ; সম্ভবতঃ ইহারা উড়িতে অক্ষম ছিল। প্রস্তর-দেহ পাওয়ার বহু বৎসর পরে একটি জীবিত পানি-মোরগ পাওয়া গেল। তার পর ১৮৯৮ সালে আবার একটি জীবিত পানি-মোরগ ধৃত হয়। সম্ভবতঃ এখন এই পাখীর বংশ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ওয়েকা রেইল ও পানি-মোরগ

উড্ডয়নে অক্ষম প্রায় সকল পাখীই কঠিন জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেছে না। ইতিপূর্ব্বে যে তিনটি পাখীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের সকলেরই বংশলোপ আসন্ন; আবার, কতকগুলি পাখী ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ডোডো (Dodo), সলিটেয়ার (Solitaire) এবং গ্রেট অকের (Great Auk) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি পাখীর বংশলোপ নিতান্ত আধুনিক। তাই কোন কোন যাদুঘরে ইহাদের অস্থি ও ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ডোডো

উপরে যে তিনটি পাখীর নাম করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ডোডোই সমধিক পরিচিত। ভারত মহাসাগরের মরিস্‌স্ দ্বীপে এই পাখীর নিবাস ছিল। প্রাচীন পর্য্যটকেরা বলেন যে, ডোডো আকারে সোয়ান বা সরালের সমান বড়। মাঝে মাঝে দুই একটি ডোডো ইয়ুরোপে লইয়া গিয়া কেহ কেহ বেশ দু-পয়সা রোজগার করিত। সার হেমন্ লিষ্ট্রেঞ্জ (Sir Hamon Lestrange) বলেন, (১৬৩৮) "লণ্ডনে বেড়াইতে বেড়াইতে এক দিন একটা আশ্চর্য্য পাখীর ছবি দেখিলাম। ঘরে ঢুকিয়া যে জীবন্ত পাখী দেখিলাম, তাহা আকারে অতি বৃহৎ টার্কি-মোরগ (Turkey Cock) অপেক্ষাও বড়। ইহার চরণের গঠন ও টার্কির চরণের গঠনের অনুরূপ। রক্ষকের মুখে শুনিলাম ইহার নাম ডোডো। সে ইহাকে বড় বড় নুড়ি খাওয়াইয়া দেখাইল।" ডাক্তার নিউটনের মতে এই পাখীটিরই মৃতদেহ অক্সফোর্ডে রক্ষিত হইয়াছিল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই অধুনালুপ্ত পক্ষীর দেহ বিনষ্ট করিবার আদেশ হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহার একখানি পা ও মাথাটি নষ্ট হয় নাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে ডোডোর এই দুইটি অঙ্গ ও রোল্যাণ্ড সেভারি কৃত একখানি চিত্র সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। মরিসস্ দ্বীপে শূকরের আমদানি ডোডোর বংশলোপের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শূকরেরা দ্বীপময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশভ্রমণে অশক্ত ডোডোর ডিম্ব ও শাবক নষ্ট করিয়া বেড়াইত।

সলিটেয়ার ডোডোর নিকট জ্ঞাতি ও প্রতিবেশী। জন্মঋতু ভিন্ন অন্য সময়ে ইহারা একাকী থাকিতে ভালবাসিত বলিয়া, ইহাদের নাম হইয়াছিল, সলিটেয়ার বা নিরালা পাখী।

সলিটেয়ার

বিখ্যাত পর্য্যটক লিগট্ (Legaut) এই পাখীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "এই পাখী মোটেই উড়িতে পারে না; ইহাদের পাখা এত ছোট যে, তাহা দ্বারা দেহের ভার বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাড়া না করিলে কখনও কখনও ইহারা মানুষের খুব নিকটে আসে, কিন্তু কখনই পোষ মানে না। ধরা পড়িলে, "নিরালা-পাখী" কোন প্রকার শব্দ না করিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকে। তার পর অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে।

ইহাদের পাকস্থলীতে মুরগীর ডিমের মত বড় বাদামী রঙ্গের একখানা পাথর থাকে। বোধ হয়, জন্মকাল হইতেই এই পাথর পাকস্থলীতে থাকে। কারণ, ছোট বড় সকল নিরালা-পাখীর পেটেই এইরূপ একখানা পাথর পাওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, ইহাদের গলনালী যেরূপ সঙ্কীর্ণ, তাহাতে বড় একখণ্ড পাথর গিলিয়া ফেলা একেবারে অসম্ভব। আমরা এই পাথরে ছুরি শাণ দিয়া দেখিলাম যে, আর কোন পাথরেই এমন ধার হয় না।

শাবকপালনকালে ইহারা স্বজাতীয় কোন পাখীকেই বাসার ২০০ গজের মধ্যেও আসিতে দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন পুরুষ নিরালা-পাখী কোন পক্ষিণীর উপর উপদ্রব করে না। কোন পক্ষিণীর বাসার নিকট আসিলে নিরালা-জনক পাখার শব্দ করিয়া আপনার সঙ্গিনীকে সংবাদ দেয়। পক্ষীমাতা আগন্তুককে নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে তাড়াইয়া দিয়া আসে। আবার, কোন পুরুষ-পক্ষী বাসার নিকট আসিলে, তখন পুরুষ-নিরালাই তাহাকে তাড়াইবার ভার গ্রহণ করে। আমি অনেকবার নিরালা-পাখীর এই আশ্চর্য্য প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছি।"

মেগিলন প্রণালীর ষ্টিমার-হাঁসও (Steamer-Duck)

উড্ডয়নে অক্ষম পাখীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাপ্তেন কিং (Captain King) এই পাখীর সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "হংস-জাতীয় যে সকল পাখী আমি দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ইহারাই সকলের চেয়ে বড়। ইহাদের পাখা অত্যন্ত ছোট বলিয়া দেহভার বহন করিতে পারে না, কিন্তু সন্তরণকালে এই দুইখানি পাখা দাঁড়ের মত ব্যবহৃত হয়। এই পাখার দাঁড় ও চরণের সাহায্যে ষ্টীমার-হাঁস ঘণ্টায় ১২ হইতে ১৫ মাইল বেগে সাঁতরাইয়া যাইতে পারে। ভয় পাইলে, ইহারা এত তাড়াতাড়ি পাখার বাড়ি মারিয়া পলাইতে থাকে যে, তখন মনে হয় যে, পাখা দুইখানি চাকার মত ঘুরিতেছে। বিখ্যাত পণ্ডিত ডারউইনের বিশ্বাস ছিল যে, ষ্টীমার-হাঁস এক সময়ে দুইখানি পাখা না চালাইয়া একখানির পর আর একখানি দ্বারা জলে আঘাত করে। ইহাদের ওজন ৬ সের পর্য্যন্ত হয়।

ষ্টীমার-হাঁস

বয়ঃপ্রাপ্ত ষ্টীমার-হাঁস উড়িতে একেবারে অক্ষম; শাবকাবস্থায় ইহারা স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। প্রথমবার পালকপরিবর্ত্তনের পরই ইহাদের আকাশভ্রমণের ক্ষমতা একেবারে তিরোহিত হয়। সুতরাং ইহাদের খেচর-গৌরবের হানির কাল নিতান্ত আধুনিক মনে করিতে হইবে।

ডোডো এবং সলিটিয়ারের ন্যায় গ্রেট অকের অস্তিত্বও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে, এখনও ইহাদের মৃতদেহ ও অণ্ড পৃথিবীর বহুদেশের যাদুঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার সন্নিহিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Newfoundland) দ্বীপে গ্রেট অকের নিবাস ছিল। তখন আমেরিকাযাত্রী জাহাজগুলিতে সদ্য মাংসের খুব অভাব ছিল। প্রত্যেক জাহাজেই নাবিকদের জন্য লোণা মাংস থাকিত। কিন্তু লোণা মাংস খাইতে সদ্য মাংসের মত সুস্বাদ ত নহেই, অধিকন্তু ক্রমাগতঃ লোণা মাংস খাইলে স্কার্ভি(Scurvy) রোগ জন্মে। তখন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও অপর কয়েকটি দ্বীপে দলে দলে গ্রেট অক বিচরণ করিত। ইহারা মনুষ্য-সমাগমে এতই অনভ্যস্ত ছিল যে, নির্ভয়ে মাংসলোলুপ নাবিকদের নিকটে আসিত। মানুষের উৎপাতে ও নিষ্ঠুরতায় এখন আর পৃথিবীর কোথাও জীবিত গ্রেট অক পাওয়া যায় না।

গ্রেট অক

উট পাখী, রিয়া, এমু, এপটরিক্স প্রভৃতি আরও অনেক উড্ডয়নাক্ষম পাখী আছে। তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। বিশেষতঃ, আলিপুরের বাগানে অনেকেই হয় ত এমু ও রিয়া বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। সম্প্রতি পালকের ব্যবসায়ের জন্য আমেরিকার উটপাখী পোষা হইতেছে। উটপাখী দৌড়াইবার সময় তাহার স্বল্পায়তন পাখা মেলিয়া চলে। রিয়ার ডানা নিতান্ত ছোট না হইলেও, দেহের অনুপাতে যে খুব ছোট তাহাতে সন্দেহ নাই। এমু ও এপটরিক্সের ডানা এত ছোট যে বিশেষ করিয়া না দেখিলে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা কঠিন।

দক্ষিণ মেরুর পেঙ্গুইনের কথা বলিয়াই আমরা পাখীর কথার বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব। পেঙ্গুইনের পক্ষ বা তাহার বিকৃত অবশেষ বাস্তবিকই কৌতুহলোদ্দীক। এই পক্ষ এক সময় আকাশবিহারের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত; কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়া এখন ইহার তদুপযোগী আকারান্তর হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমান প্রয়োজনে জলচর স্তন্যপায়ী তিমির চরণ ও জলচর পাখী পেঙ্গুইনের পাখা একই আকার লাভ করিয়াছে। আবার, সরীসৃপ জগতেও যে হস্তপদের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত নাই, তাহা নহে।

পেঙ্গুইন

মনে করুন, কোন দূর অতীত কালে টিকটিকিজাতীয় কোন সরীসৃপ সমুদ্রতীরে থাকিতেই ভালবাসিত। আনন্দের জন্যই হয় ত তাহারা প্রথম প্রথম সাগরজলে একটু সাঁতার কাটিত; তার পর হয় ত সন্তরণপটুতা লাভ করিয়া সেই আদিম যুগের টিকটিকি দেখিল, সমুদ্র হইতে

খাদ্য সংগ্রহ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। সাগরের আকর্ষণ কাটাইতে না পারিয়া, সে তখন সাগরবাসীই হইয়া দাঁড়াইল। মনে রাখিবেন, এতগুলি পরিবর্ত্তন এক, দুই বা তিন পুরুষে হয় নাই। সাগরবাসের ফলে তাহার দেহের আকৃতি ও প্রকৃতি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার লেজ মৎস্যের লেজের, ও হস্তপদ মাছের ডানার অনুরূপ আকার ধারণ করিল। এই জন্তু এখন লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের পরিশ্রমের ফলে মৎস্য-টিকটিকি বা ইকৃথিয়োসরাসের (Ichthyosaurus) প্রস্তরদেহ পাওয়া গিয়াছে।

কেবল সরীসৃপেরাই যে সলিলনিবাসের ফলে প্রকৃতির অনুযায়ী আকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; স্তন্যপায়ী দলেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তিমি, শুশুক প্রভৃতি জন্তুরা জলচর হইলেও স্তন্যপায়ী, এবং সেই হিসাবে মৎস্য অপেক্ষা মানুষের সহিতই তাহাদের সম্পর্ক নিকটতর।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আহার-বিহারের প্রণালী-ভেদে জীবজন্তুদের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়েরও আকারান্তর হয়।

পেঙ্গুইন, সিন্ধুঘোটক ও টার্টল বা সামুদ্রিক কচ্ছপ

সরীসৃপ-জগতে সামুদ্রিক কচ্ছপ বা টার্টলের (Turtle) পা, পক্ষি-জগতে পেঙ্গুইনের পাখা ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সিল, জলসিংহ (Sealion) এবং সিন্ধুঘোটকের (Walrus) পা ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। টার্টলের চারিটি পদই অঙ্গুলিহীন চর্ম্মের দস্তানার মধ্যে আবদ্ধ। জলচর স্তন্যপায়ীদের হস্তপদও দস্তানায় আবদ্ধ, কিন্তু তাহাদের অবিভক্ত অঙ্গুলিগুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়; আর পেঙ্গুইনের বাহু বা পক্ষও অঙ্গুষ্ঠহীন।

তিন শ্রেণীর জীবের এই প্রকার অঙ্গসাদৃশ্য বাস্তবিকই আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাহারা এক বলিয়া বোধহয়, তাহারা বাস্তবিক বিভিন্ন জাতীয়। মৎস্যের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও তিমি মাছ নহে। সর্পের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও সর্প ও কুচে এক জাতীয় প্রাণী নহে কেবল অঙ্গসাদৃশ্য দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করিলে, তাহাতে ভুল থাকিবারই সম্ভাবনা।

নানা পরিবর্ত্তনের ফলে পেঙ্গুইনের পক্ষ অন্যান্য পাখীর পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি লাভ করিয়াছে।

পেঙ্গুইনের পক্ষ

প্রকৃত পক্ষে ইহাকে পেঙ্গুইনের দেহসংলগ্ন দুইটি দাঁড় বলিলেই চলে। পেঙ্গুইন সমুদ্রবিহারের সময়ে এই দাঁড়ের দ্বারাই তাহার দেহ-তরণী বাহিয়া চলে। অন্যান্য সন্তরণশীল পক্ষীর ন্যায় পেঙ্গুইন সন্তরণ কার্য্যে চরণের ব্যবহার করে না। খেচর পাখীদের গগন-বিহারকালে পা দুইখানি যেমন স্থির, নিশ্চল থাকে, আকাশ-ভ্রমণে অক্ষম পেঙ্গুইনের পাও সাগরবিহারকালে সেইরূপ স্থির, নিশ্চল থাকে। বিহগেরা উড়িবার সময় যেরূপ পক্ষ সঞ্চালন করে, পেঙ্গুইনেরা সন্তরণকালে সেইরূপ পক্ষ সঞ্চালন করে। তবে, অন্যান্য পাখীর পাখা অপেক্ষা পেঙ্গুইনের পাখা অনেক বেশী চওড়া। সাধারণ পাখীর পাখার ন্যায় ইহা খোলা ও বন্ধ করা যায় না;—পেঙ্গুইনের দাঁড় বা পাখা সর্ব্বদাই খোলা থাকে। পেঙ্গুইনের পাখায় কুইল পালকও থাকে না।

উড়িবার শক্তির লোপের সঙ্গে সঙ্গে পাখার সম্পূর্ণ তিরোধানও হইতে পারে, অথবা রূপান্তরিত পক্ষ কোন নূতন কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। পাখীর পক্ষহানি মোটেই ক্ষতিজনক নহে। কারণ, তাহাদের পক্ষের পরিপোষণের জন্য যে শক্তি বা খাদ্য অপব্যয়িত হইত, তাহাতে অবশিষ্ট দেহের অধিকতর পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বিবাহ-সমস্যা

বংশগত ধর্ম্ম, তা সে ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, পুরুষপরম্পরাক্রমে সংক্রামিত হয়, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। এত বড় একটা সত্য ও অত্যাবশ্যক বিষয়ে সাধারণের যতটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, তাহা যে হয় নাই, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সভ্য সমাজে আজ আমরা যে সকল শারীরিক ও মানসিক রোগ দেখিতে পাই, তাহাদের অনেক-গুলিই যে পুরুষপরম্পরাগত রোগপ্রবণতা ও স্বাস্থ্যহীনতার ফল, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

বর্ত্তমান সভ্যতার একটা প্রধান দোষ এই যে, ইহা বংশগত রোগগুলিকে সরাইতে চেষ্টা না করিয়া, তাহার কর্ষণ ও ব্যাপ্তির পক্ষে অনবরত চেষ্টা করিতেছে। সভ্য জগতে মানুষের চালচলন, আহারবিহার, কাযকর্ম্ম, সকলই যেন অস্বাভাবিক; সভ্য জগতে মানুষের যেন কিছুতেই শান্তি নাই, কিছুতেই বিশ্রাম নাই। তাহার জীবন যেন চির-চঞ্চল, চিরউদ্বেগময়। সভ্য মানুষ তাহাকে প্রকৃতির ক্রোড় হইতে যতই বিচ্ছিন্ন করিতেছে, রোগ ও দেহের হীনতা তাহাকে ততই আশ্রয় করিয়া বসিতেছে। প্রকৃতির একটা মহা নিয়ম এই যে, সে অযোগ্যকে সরাইয়া যোগ্য জনের জন্য স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখে। বর্ত্তমান সভ্যতা প্রকৃতির সেই সনাতন নিয়মের পথে বিবিধ বাধা উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছে। সভ্য জগতে যে ব্যক্তি অযোগ্য, তাহারও স্থান আছে—সে সমাজে কাহারও কথা ভুলে না।

কিন্তু অসভ্য সমাজে অন্যরূপ ব্যবস্থা। সেখানে অযোগ্যকে সরাইবার পথে প্রকৃতিকে বাধা দিতে কেহ নাই। সেখানে দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ, খঞ্জ, পঙ্গুদের কোনই স্থান নাই। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী সামর্থ্য যাহার নাই, প্রকৃতি তাহাকে নির্ম্মমভাবে সরাইয়া ফেলে। সেই জন্যই ত অসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য সমাজে প্রায় সকলকেই শারীরিক স্বাস্থ্যবলে বলীয়ান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্য সমাজে তাহার উপায় নাই। এখানে দুর্ব্বল, চিররুগ্ন এবং অক্ষম ব্যক্তিরাও সুশ্রূষার গুণে, চিকিৎসার বলে টিঁকিয়া থাকিতে সমর্থ হয়। বিজ্ঞান ও সভ্যতা ইহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটায়, যাহাতে অক্ষমতাসত্ত্বেও ইহাদের জীবনধারণ সম্ভবপর হয়। ইহার পর যথাসময়ে এই সকল ব্যক্তি বিবাহাদি করিয়া তাহাদেরই অনুরূপ দুর্ব্বল, অক্ষম সন্তান আনয়নে প্রয়াসী হয়। এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে আমরা নিরন্তর বিবাদে রত হই।

আমরা অযোগ্যদের তিরোভাবনীতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতির এই মহৎ উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ করিতে সমর্থও হইয়াছি। কিন্তু মনুষ্যজাতির সৌভাগ্য এই যে, আমাদের এই কৃতকার্য্যতা নিতান্ত সাময়িক, কথনই চিরস্থায়ী নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের বলে অযোগ্যদের একদিন তিরোধান ঘটিবেই ঘটিবে; আমরা কেবল সেই শুভ দিনটা কিছুকালের জন্য পিছাইয়া রাখিতেছি মাত্র। অপেক্ষা-কৃত অসভ্য ও আদিম সমাজে যে সকল দুর্ব্বল ও অযোগ্য ব্যক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে না, তাহাদের তিরোধান ঘটিতে মোটেই কাল বিলম্ব হয় না; কিন্তু আমরা আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রভাবে তাহা হইতে দেই না; অযোগ্যদের তিরোধান বিষয়ে কাল-বিলম্ব ঘটাই, কিন্তু স্থায়ীভাবে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না। আমাদের চেষ্টা ও যত্নের ফলে একপুরুষ, কি দুপুরুষ, নয় ত, খুব জোর তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ইহাদের বংশ স্থায়ী হইতে পারে, তাহার পর প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের আর কিছুই করিবার শক্তি থাকে না।

ক্লিষ্ট, রুগ্ন এবং অযোগ্য ও অসমর্থদের জন্য যে সকল সদনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, আমরা যে তাহার বিরোধী, ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। বংশরক্ষা বিষয়ে প্রকৃতির ইঙ্গিতটা যে কি আমরা কেবল তাহাই ব্যক্ত করিতেছি মাত্র; আমরা কেবল এই কাজটি সমাজের সকলকে স্মরণ রাখিতে বলি যে, রোগ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি পিতা হইতে পুত্রে, মাতা হইতে দুহিতায়, এবং পিতা মাতা হইতে সন্তানাদিতে সঞ্চারিত হয়। ইহার সহিত জাতীয় উন্নতি অবনতির বড় কম সম্বন্ধ নাই।

বংশানুক্রম বিষয়ে সাধারণের যাহা জ্ঞান থাকা উচিত, তাহা আছে বলিয়া মনে হয় না, অন্ততঃ জ্ঞানটাকে কাযে লাগাইবার পক্ষে কোন চেষ্টাই দেখা যায় না। আমরা গরু, ঘোড়া প্রভৃতির বংশের উন্নতির চেষ্টায় যতটা চেষ্টিত, নিজের নিজের বংশের উন্নতির জন্য তাহার শতাংশের এক ভাগ চেষ্টিত কি না সন্দেহ। ইহা হয় ত আমাদের অজ্ঞতা-বশতঃ, নয় ত উদাসীনতার ফল। এরূপ অবস্থায় বিষয়টার গুরুত্ব যাহাতে সাধারণের মনে গভীর ভাবে মুদ্রিত হইতে পারে, তাহার জন্য চিকিৎসক মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে এটা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। বংশগত ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরায় প্রবাহিত হইতে পারে, জীবজগতে সর্ব্বত্রই প্রকৃতির ইহাই নিয়ম, এ কথাটি সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মৃগী, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রকন্যাগণ প্রাপ্ত হইতে পারে, এ বিষয়ে সকলের সম্যক জ্ঞান থাকিলে, বিবাহ ও বংশ-বিস্তার বিষয়ে অনেকেই সাবধান ও সংযত হইতে পারেন, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

মানুষের যে সব সহজাত সংস্কার আছে, তাহাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে গেলে অনেক স্থলেই অকৃতকার্য্য হইতে হয়, ইহা আমাদের অবিদিত নয়। এ সব স্থলে কামনা ও রিপুরই প্রাবল্য হয়, যুক্তিকে অনেক সময় ঘাড় হেঁট করিয়া ফিরিতে হয়, ইহা আমরা বিলক্ষণই জানি। তাই বলিয়া নীরব থাকিতে হইবে তাহার কি অর্থ আছে? আমাদের কথা অগ্রাহ্য হইবে, তবুও যাহা সত্য তাহা সাধারণের সম্মুখে স্থাপন করিতে আমরা একান্ত বাধ্য। সত্যকে লোকে অনাদর করিবে, সেই ভয়ে ভ্রম দেখাইয়া দিতে ও পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে বলিতে আমরা কোন মতেই বিরত হইব না। আমাদের বিশ্বাস, সমাজে এখন অনেক চিন্তাশীল সুধীজন আছেন, তাঁহারা যদি ঠিক বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ ও বংশবিস্তার করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে স্বেচ্ছায়, সানন্দ চিত্তে বিবাহাদি ব্যাপারে বিরত হইবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিবাহবিষয়ে সংস্কার আবশ্যক। আমাদের সমাজে অন্য বিষয় দুর্লভ হইলেও বিবাহ একবারেই দুর্লভ নয়। অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, উন্মাদ, বুদ্ধিহীন, কাহারও বিবাহ বন্ধ থাকে না। বিবাহ বিষয়ে এইরূপ স্বাধীনতা থাকায় জাতির যে কি অবনত হইতেছে, তাহা বলা যায় না।

যাহারা একেবারে অক্ষম ও অযোগ্য, তাহাদের বিবাহ না করাই উচিত সে বিষয়ে দ্বিধা থাকিতে পারে না। কিন্তু সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ঠিক পূর্ব্বোল্লিখিতদের মত অতটা মন্দ নহে, অতি সামান্যমাত্র। বিবাহ বিষয়ে ইহাদের কি করা কর্ত্তব্য? ইহাদের বেলায় বিবাহ করিতে মানা নাই বটে, কিন্তু এ সকল স্থলে পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এখন সব বংশ হইতে পাত্রপাত্রী আনিতে হইবে, যাহাদের বংশে বংশগত দৌর্ব্বল্যের কোন ইতিহাস নাই। এরূপ করিলে, বংশগত দৌর্ব্বল্যভাব বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা না করিয়া যদি নিজেরই মত কোন বংশগত দৌর্ব্বল্যযুক্ত বংশে বিবাহ করা হয়, তাহা হইলে এই বিবাহের ফলে যে সকল সন্তানাদি জন্মিবে, তাহাদের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না।

কেহ কেহ বলেন আইনের সাহায্যে অন্যায় বিবাহ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় ইহার জন্য আইন কানুনের সৃষ্টি আবশ্যক নাই। আমরা বলি অজ্ঞতাই এই দুর্নীতি এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সাধারণের মনে বিষয়টার গুরুত্ব ও সত্যতা দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারিলেই, শীঘ্র সুফল সম্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে সর্ব্বদা আলোচনা ও আন্দোলন হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

দীক্ষা

সিন্ধু ধূমায়মান
জ্বালিছে সূর্য্য ; গ্রহের তূর্য্য
গাহে বন্দনা-গান,
হে ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণ।

তুঙ্গ তুষার-স্তূপ
তব ভাস্বর যজ্ঞের বেদী
তুমি বরেণ্য ভূপ।

মোদের পিতৃগণ
তোমারি সত্য বিচিত্র পথ
করেছে অন্বেষণ ;

তাঁদেরি পাদক্ষেপে
উঠিতেছে ধ্বনি, প্রতিধ্বনিতে
জনমন ওঠে কেঁপে ;

ছোটে বিদ্যুৎ-কণা,
কত দধীচির অস্থি-রচিত
অস্ত্রের নাগ-ফণা।

আমরা ভাগ্যবান্
দিগন্তরের ও পারে ধ্বনিত
অপৌরুষেয় গান ;

দাঁড়ায়েছি গরীয়ান্,
অন্ধকারের নিগূঢ় রন্ধ্র
ছিদরে জ্যোতির বাণ—

জননী-গর্ভ-বাসে
শিশু শুকদেব ঋষিত্ব লভি'
অবিদ্যা-মায়া নাশে।

এসো গো দুঃসাহসী,
ললাট হইতে উঠাও সবলে
দুর্ভাবনার মসী,

লঙ্ঘি দেশ-বিদেশ
শৈলারোহণ গৌরবে মোরা
বরিব কৃচ্ছ্র-ক্লেশ ;

সংশয় কশাঘাত
কণ্টকে জানু ক্ষত-বিক্ষত
হোক্ সে দিবস-রাত

স্বর্ণ-মরুতে ছুটে
তৃষিত কণ্ঠে মৃগ-তৃষ্ণিকা
ভরিব না কর-পুটে,

বালিয়াড়ি গুঁড়া করে'
ফিরিবে জোয়ার সপ্ত সাগরে
গড়ায়ে বেলার 'পরে।

চলি দিবা শর্ব্বরী,
জনম হইতে জনমান্তরে
অজেয় শক্তি ধরি।

পুরুষকারের রথে
চূর্ণ করিয়া অদৃষ্ট বাধা
ধাইব সিদ্ধি পথে ;
কালের পরিধি-শেষে
পদার্থ যেথা পরমার্থের
অমৃতার্ণবে মেশে—
মূল্য-পুরস্কার,
জয়-পরাজয়, পুণ্য পাতক
হ'য়ে যায় একাকার ;

"অশোক অভয় ঠাঁই,
অপ্রমন্বিব, নিষ্ফলতার
কল্পনা যেথা নাই ;

দলি' পার্থিব ধূলি
মাহেন্দ্র যোগে মহা প্রস্থান,
আনন্দ-ধ্বজা তুলি'।
সিন্ধু ধূমায়মান
গ্রাসিছে সূর্য্য ; গ্রহের তূর্য্য
গাহে বন্দনা-গান,
হে ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণ।

শ্রীকরুনানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শশাঙ্ক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৌড়-রাজমালাতে রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন যে শশাঙ্ক কান্যকুব্জাভিমুখে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। (৩) স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে ইয়াং চোয়াং বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কর্ণ-সুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক ব্যতীত অপর কোন প্রদেশের নরপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং সম্ভবতঃ অন্যান্য প্রদেশের রাজবংশ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল। (৪)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক এইমত সমর্থন করিয়াছেন। (৫)

(৩) গৌড়রাজমালা ৭ পৃঃ
(৪) ঐ ১৩ পৃ
(৫) সাহিত্য ১৩২৯ ৪৬৪ পৃ

পূর্ব্বোদ্ধৃত স্থলে রমাপ্রসাদ বাবু বঙ্গ এবং সমতট দ্বারা পূর্ব্ব বঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছেন। ইয়াং চোয়াং লিখিয়াছেন যে লম্ব এবং নগর দুইটি প্রদেশের রাজবংশ কপিশারাজ্যের নরপতি কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল, এবং লম্ব এবং নগর রাজ্যদ্বয় পরিব্রাজকের সময়ে কপিশারাজ্যের অধীন ছিল। এই সমস্ত রাজ্য ভারতের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। বাঙ্গালা দেশের নিকটবর্ত্তী কজঙ্গলের রাজবংশ প্রদেশান্তরের নরপতি কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইয়াছিল এ বিষয় ইয়াং চোয়াং লিখিয়াছেন। যদি সমতট পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং তাম্রলিপ্তের নরপতিগণ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া থাকিবেন, তবে পরিব্রাজকের তাহার উল্লেখ না করার কারণ কি ?

দ্বিতীয় বিষয়, ইয়াং চোয়াং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট এবং তাম্রলিপ্তের নরপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারাও কোন অনুমান হইতে পারে না। শশাঙ্কের নাম উল্লেখ করার কারণ আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

ইয়াং চোয়াং কাশ্মীর প্রদেশে গমন করার সময় তিনি বরাহমুল পথে (Bara mula pass) কাশ্মীরে গমন করেন। এই গিরিসঙ্কটের বাহিরে নরপতির মাতুল পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। এখানে অশ্ব এবং শকটাদি যান নরপতির আদেশে রাখা হইয়াছিল। রাজধানী হইতে এক যোজন ব্যবধানে নরপতি স্বয়ং এক ধর্ম্মশালার নিকট পরিব্রাজকের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এ স্থান হইতে ইয়াং চোয়াং এক হস্তীতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে গমন করেন। সেখানে প্রথম দিন তিনি জয়েন্দ্র বিহারে অবস্থান করেন। পরিশেষে নরপতির আহ্বানে তিনি দুই বৎসর কাল রাজপ্রাসাদে নরপতির অতিথি স্বরূপ বাস করেন। কিন্তু ইয়াং চোয়াং কোন স্থানেই এই নরপতির নাম উল্লেখ করেন নাই।

ইয়াং চোয়াং ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে যে প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশে নরপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। এ জন্য সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, এবং তাম্রলিপ্ত রাজ্য শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত থাকা অনুমান হইতে পারে না।

বাস্তবিক সমতট তৎকালে শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত না থাকা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ঢাকা জিলার আসরফপুরে খড়্গ বংশীয় নরপতির দেবখড়্গের দুইখানা তাম্র শাসন পাওয়া গিয়াছে। উভয় তাম্রশাসনের দাতা দেবখড়্গ নরপতি এবং সম্প্রদান বৌদ্ধসংঘ। এই দুই তাম্রশাসন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে এই প্রদেশে খড়্গোদ্যম নামে একজন নরপতি ছিলেন। তাহার অভাবে তৎপুত্র জাতখড়্গ এবং তদভাবে তৎপুত্র দেবখড়্গ নরপতি ছিলেন। এই দেবখড়্গ তাম্রশাসনদ্বয়ের দাতা। দেবখড়্গের পুত্র কুমার রাজরাজভট।

চীন দেশীয় পরিব্রাজক ইচিং লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বে সেংচি নামক অপর একজন চীন শ্রমণ এ দেশে আগমন করেন। ইংচি সমতটে রাজভট নামক আর একজন নরপতিকে দেখিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন যে সেংচি খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমতটে আগমন করেন। (৬)

সেংচি বর্ণিত রাজভট এবং আসরফপুরের তাম্রশাসনের কুমার রাজরাজভট অভিন্ন ব্যক্তি। নগেন্দ্র বাবু তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। (৭)

সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে খড়্গ বংশীয় জনৈক নরপতি সমতটের অধীশ্বর ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পণ্ডিতবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শশাঙ্ককে গৌড়, মগধ এবং রাঢ় দেশের অধিপতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (৮)

তিনি লিখিয়াছেন যে রোহিতাশ্ব দুর্গমধ্যে (বর্ত্তমান রোটাসগড়) একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে :—

"শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য"

এই মহাসামন্ত শশাঙ্ক এবং কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করি।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে ইয়াং চোয়াং শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের নরপতি বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি রাঢ় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। বাণভট্ট তাঁহাকে গৌড়াধিপ বলিয়াছেন। গৌড় বলিতে উত্তর বঙ্গ বুঝায়। সুতরাং শশাঙ্ক গৌড় অর্থাৎ উত্তর বঙ্গের অর্থাৎ বরেন্দ্রের অধিপতি ছিলেন।

গৌড় শব্দ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। একণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কথিত 'গৌড়' শব্দ দ্বারা উত্তর বঙ্গ বুঝা যায় কিনা দেখা আবশ্যক। প্রকৃতিবাদ অভিধানে একটি প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত আছে :—

"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়পুরী"

অতএব গৌড় বলিতে যে উত্তর বঙ্গ বুঝায়, ইহা আমরা স্বীকার করিতে অক্ষম। প্রকৃত পক্ষে শশাঙ্ক রাঢ় প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, এবং রাঢ়ের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ মগধের কিয়দংশ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল। উত্তর বঙ্গ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত থাকার কোন প্রমাণ নাই।

ইয়াং চোয়াং মাত্র চারিস্থানে শশাঙ্কের উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

১ম। শশাঙ্ক প্রভাকরবর্দ্ধনের জেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকে বিশ্বাসঘাতক স্বরূপে হত্যা করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে হর্ষবর্দ্ধন প্রথমতঃ সিংহাসন আরোহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবনতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করার জন্ত পরে হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১০)

২য়। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁহার অস্থি ভারতের তদানীন্তন ৮ জন নরপতি বিভাগ করিয়া লইয়া যান। সম্রাট অশোক এই বিভাগের স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্তূপ হইতে প্রায় দুইশত লি পশ্চিমে একজন ধনী বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ এক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। শশাঙ্কের উৎপাতে এই বিহারের শ্রমণগণ এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। (১১)

(৬) গৌড়রাজমালা ১৪পৃষ্ঠা

(৭) রাজন্যকাণ্ড পৃষ্ঠা

(৮) বাঙ্গালার ইতিহাস ৮২পৃঃ

(৯) Fleet's Gupta Inscriptions. p. 283

(১০) Watters vol I p. 343.

(১১) Watters vol. II p.43

৩য়। সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের পাদচিহ্ন অঙ্কিত একখণ্ড শিলা পাটলিপুত্র নগরে আনয়ন করেন। শশাঙ্ক তাহা গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পাদচিহ্ন প্রস্তর পুনঃ স্বস্থানে আসিয়াছিল। (১২)

৪র্থ। ইদানীন্তন সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী শশাঙ্ক বোধিদ্রুম সমূলে বিনষ্ট করেন; কিন্তু কতিপয় মাস পরে অশোকের শেষ উত্তরাধিকারী পূর্ণবর্ম্মা নানাপ্রকারে যত্ন করিয়া সেই বৃক্ষ পুনঃ সঞ্জীবিত করেন। পরে পূর্ণবর্ম্মা ইহার চারিদিকে ষোল হাত উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণ বোধিদ্রুম প্রাচীর হইতে দশ ফিট উচ্চ। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে বুদ্ধদেবের যে মূর্ত্তি আছে তাহা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য শশাঙ্ক যে চেষ্টা করেন তাহাও পরিব্রাজক বলিয়াছেন। (১৩)

শশাঙ্ক বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ফেলিয়া দিয়া সেখানে মহাদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে একজন কার্য্যকারকের প্রতি ভার অর্পণ করেন। সে কার্য্যকারক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল; সে এই আদেশে মহাবিপদে পতিত হইল। নরপতির আদেশ পালন না করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন, অথচ পালন করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়; এ জন্য কার্য্যকারক বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে এক প্রাচীর দিয়া তাহার সম্মুখে মহাদেব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইয়াং চোয়াং বৌদ্ধধর্ম্মের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে শশাঙ্কের নামোল্লেখ করিয়াছেন; নতুবা শশাঙ্কের নাম উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মহাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতে অবগত হওয়া যায় যে স্থাণ্বীশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই পুত্র এবং এক কন্যা বর্ত্তমান ছিল। জেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন পিতার অভাবে সিংহাসন আরোহণ করেন। কান্যকুব্জাধিপতি মৌখরি বংশীয় গ্রহবর্ম্মা প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। মালবাধিপতির সহিত যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মা নিহত হন; মালবরাজ রাজ্যশ্রীকে কারাবদ্ধ করেন; রাজ্যশ্রী গোপনে কারাগার হইতে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেন।

(১২) Watters vol. II p.92.

(১৩) Watters vol. II pp 115—6.

রাজ্যবর্দ্ধন এই সংবাদ অবগত হইয়া মালবাধিপতিকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করার জন্য এবং ভগিনীর উদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন।

শশাঙ্ক মালবাধিপতির সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, পরিশেষে তিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।

শশাঙ্কের রাজ্যবর্দ্ধনকে এইরূপে নিহত করার বৃত্তান্ত বাণভট্টের গ্রন্থে এবং ইয়াং চোয়াং প্রণীত ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে পাওয়া যায়। অতএব ইহা অবিশ্বাস করার কারণ নাই। বাণভট্ট এবং ইয়াং চোয়াং উভয়ে পরামর্শ করিয়া যে এতাদৃশ মিথ্যাকথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

রমাপ্রসাদ বাবু এই বৃত্তান্ত এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি উৎপাত করার বৃত্তান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঙ্গালাদেশে শশাঙ্কের সময়ে অনেক সঙ্ঘারাম ছিল, তাহা বিনষ্ট না করিয়া অন্যত্র তাহা চেষ্টা করার কি কারণ হইতে পারে? প্রথম দৃষ্টে এই যুক্তি ভালই বোধ হয় কিন্তু এই যুক্তি দ্বারা আমরা চীন পরিব্রাজকের বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করিতে পারি না।

বৌদ্ধগয়া, কুশীনগর বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। বৌদ্ধগয়ায় সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন; কুশীনগরে তাঁহার মহাপরিনির্বাণ হয়। পাটলিপুত্র রাজর্ষি অশোকের রাজধানী। অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় সমগ্র এসিয়া খণ্ডে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। বোধ হয় এজন্য শশাঙ্ক প্রথমতঃ এই তিন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধে তিনি রাজ্যচ্যুত না হইলে, বোধ হয়, বাঙ্গালাদেশেও ঐরূপ উৎপাত করিতেন।

পণ্ডিতবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, ইয়াং চোয়াং ঘোরতর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন এবং হর্ষবর্দ্ধন হইতে নানাপ্রকার সাহায্য ও উপহার পাইয়াছেন; বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন। (১৪)

(১৪) বাঙ্গালার ইতিহাস ৮৮ পৃষ্ঠা

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই যুক্তি সম্বন্ধে আমরা কোন প্রতিবাদ করার আবশ্যকতা অনুভব করি না। এইরূপ যুক্তিতে এতাদৃশ মহাত্মাগণের বাক্য অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই।

শশাঙ্ক বাঙ্গালাদেশের এক প্রদেশের নরপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রকৃত বোধ করিলে, আহ্লাদের কারণ হইত; কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ করিতে আমরা রমাপ্রসাদ বাবুর যুক্তি অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। ইয়াং চোয়াং এবং বাণভট্ট উভয়েই হর্ষবর্দ্ধন এবং শশাঙ্কের সমসাময়িক ব্যক্তি; একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, অপরব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; একজন ভারতবাসী, অপরব্যক্তি চীনদেশবাসী। ইহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা-বৃত্তান্তে একই প্রকারে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

বাণভট্টের বিবরণ প্রকৃত নহে, ইহা প্রমাণ করার জন্য রমাপ্রসাদ বাবু হর্ষবর্দ্ধনের সাময়িক উৎকীর্ণ লিপি হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথাঃ—

রাজানো যুধি দুষ্ট বাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ।
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ॥
উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং।
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ॥

ইহার মধ্যে দৃষ্ট হয় যে "যঃ সত্যানুরোধেন অরাতিভবনে প্রাণান্ উজ্ঝিতবান্।"

ইহা দ্বারা বাণভট্টের বিবরণ অপ্রমাণিত হয় না; বরং তাহা সমর্থিত হয়।

শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধে কামরূপের অধীশ্বর ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষাবলম্বন করেন। নিধনপুরে ভাস্করবর্ম্মার এক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; ইহা কর্ণস্থবর্ণ হইতে প্রদত্ত; ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভাস্করবর্ম্মা কিয়ৎকাল কর্ণস্থবর্ণের অধিপতি ছিলেন।

শশাঙ্ক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।

শশাঙ্ক স্বরাজ্য হইতে অধিকার-চ্যুত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে অরণ্যময় প্রদেশে গমন এবং উড়িষ্যার দক্ষিণস্থ অরণ্যময় প্রদেশে রাজত্বস্থাপন করেন। গঞ্জামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মার ৩০০ গোপ্তাব্দের তাম্রশাসন এবং অন্যান্য বিবরণ হইতে ইহা অনুমান হয়।

হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে উড়িষ্যা কেশরী বংশীয় নরপতির শাসনাধীন ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কেশরী খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির তিনি নির্ম্মাণ করেন।

ইয়াং চোয়াং লিখিয়াছেন যে তিনি কর্ণসুবর্ণ হইতে ৭০০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রদেশে গমন করেন। এই প্রদেশে চরিত্র নামক এক নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, এই নগর হইতে নানা স্থানে অর্ণবযান গমনাগমন করিত। চরিত্র বোধ হয় বর্ত্তমান পুরী নগরী।

উড়িষ্যা হইতে ইয়াং চোয়াং ১২০০ লি দীর্ঘ অরণ্যময় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে কুঙ্গ্যুটো (Kungyuto) নামক প্রদেশে গমন করেন। এই প্রদেশ পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। ইহার পরিধি ১০০০ লি অর্থাৎ ১০০ ক্রোশ, অধিবাসীগণ দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ। এ স্থানের অধিবাসীগণ সাহসী এবং পরাক্রান্ত ছিল। এখানে মুদ্রার পরিবর্ত্তে কপর্দ্দক এবং মুক্তা প্রচলিত ছিল। বৃহৎকায় কৃষ্ণবর্ণ হস্তী এখানে পাওয়া যাইত।

গঞ্জামে মাধববর্ম্মার একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহার অব্দ ৩০০ গোপ্তাব্দ অর্থাৎ ৬১৯ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে লেখা আছে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালে ইহা প্রদত্ত হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনের দাতা কোঙ্গোদ প্রদেশের অধিপতি। কিলহর্ণ সাহেব বলেন যে এই কোঙ্গোদ ইয়াং চোয়াঙের বর্ণিত Kungyuto প্রদেশ।

ইহা দ্বারা এই অনুমান হয় যে শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া অরণ্যময় প্রদেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই বোধ হয় তাঁহার জীবনলীলা শেষ হয়।

(সমাপ্ত)

শ্রীরেবতীমোহন গুহ।

সমসাময়িক ভারত

(গ্রন্থ-সমালোচনা)

সমসাময়িক ভারত। প্রথম কল্প। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত।

সংবাদপত্রে যখন অধ্যাপক সমাদ্দারের এই বিরাট উদ্যোগের কথা পড়িয়াছিলাম, তখন মন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়াছিল। ইউরোপ বা আমেরিকায় যে কার্য্যের ভার হয় ত কোন পণ্ডিতই একাকী গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না, অধ্যাপকপ্রবর স্বেচ্ছায় সেই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি হইয়াছিল। তখন মনে করিয়াছিলাম, এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনেই তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইবে। তারপর তিনি যখন অসাধারণ ক্ষিপ্রতা সহকারে 'সমসাময়িক ভারতের' কতিপয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, তখন আর আমাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ড পাঠ করিয়া আমাদের ভক্তি ও বিস্ময় এককালে তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ কদর্য্য বাঙ্গালা উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যগ্রন্থে শীঘ্র আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের প্রতি পত্রে, অনেক স্থলে প্রতি ছত্রে, অসাবধানতা ও ক্ষিপ্রতাসম্ভূত তাচ্ছিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যে কর্ত্তব্যকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত বলিয়া মনে করা উচিত ছিল, তাহা যেন বাল্যক্রীড়ার মত তুচ্ছ অনুষ্ঠানের মধ্যে টানিয়া আনা হইয়াছে। বঙ্গবাণীর চরণে নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত নির্গন্ধ কুসুমেরও অঞ্জলি প্রদানের অধিকার প্রত্যেক সন্তানেরই আছে; কিন্তু যদি কেহ মায়ের শ্রীকণ্ঠে কণ্টকমাল্য পড়াইতে যায়, তাহাকে কখনই ক্ষমা করা যায় না।

এই দুই খণ্ডের মালমসলা, এমন কি পাদটীকাসঙ্কলনেও সমাদ্দার মহাশয়কে কোন কষ্টই করিতে হয় নাই। সুতরাং মৌলিকতা বা অনুসন্ধিৎসার গৌরব তিনি দাবী করিতে পারেন না। ভূমিকালেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যতই বলুন না কেন, তাঁহার "প্রেমাস্পদ" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার যে "অদম্য উৎসাহে ভারত ইতিহাসের উপাদান-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রত্ন আহরণ" করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। তিনি প্রেমাস্পদকে যে গৌরব দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত অধিকারী 'সোয়ানবেক', 'ম্যাকক্রিণ্ডল', 'বীল', 'ওয়াটার্স' প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণ। আলোচ্য খণ্ডদ্বয় 'ম্যাকক্রিণ্ডলের' সঙ্কলনের অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অনুবাদে অধ্যাপক মহাশয় যে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই গৌরবজনক নহে। অনেক সময়ই মনে হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালাভাষার প্রশ্নপত্রে to write in simple and chaste Bengali লিখিয়া ইহার খানিক তুলিয়া দিলেই চলিতে পারে।

নিম্নে কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।—

১। খৃষ্টীয় চতুর্থ পূর্ব্ব শতাব্দীতে টিসিয়াস নামক এক গ্রন্থকার … (১ম খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা)

২। এতদ্ব্যতীত ক্লাসিক গ্রন্থে অনেকস্থলে প্রাচীন ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১ম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা)

৩। ঐ সকল জাতির মধ্যে কোন কোনটি ভ্রমণশীল ১ম খণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা। (অধ্যাপক মহাশয় যাযাবর অর্থে ভ্রমণশীল প্রয়োগ করিয়াছেন।)

৪। অন্ত এক জাতীয় ব্যক্তিগণ ভ্রমণশীল। (১ম খণ্ড ১৮পৃষ্ঠা)

৫। অত্যাশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতার জন্য অহঙ্কারী (১ম খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা)

৬। এক লেখকের বর্ণনার সহিত অপর লেখকের সাদৃশ্য দেখা যায় না (১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা)

৭। নিয়ার্কাস্ নদী দ্বারা বর্দ্ধনশীল ভূমির নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (১ম খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠা)

৮। যখন ইটিসিয়ান বাতাস প্রবাহিত হইত, তখন অনবরত বারি পতন হইত। আর্কটুরাস উদিত হইলে বারি পতন বন্ধ হইয়াছিল। হাইডাসপিস তীরে কিছুদিন রণতরী নির্ম্মাণে অতিবাহিত করিয়া, তাঁহার প্লিয়াডিসের অস্তগমনের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পাল বিস্তার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। (১ম খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। (এক প্লিয়াডিস্ ব্যতীত অন্য কোন গ্রীক শব্দের ব্যাখ্যা তিনি পাদটীকায় করেন নাই)।

৯। সূর্য্যের উত্তাপ এ দেশে লম্বমানভাবে পতিত হয় (১ম খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক পৃষ্ঠা হইতেই আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম।

আমাদের বিশ্বাস, ইংরাজী ভাষায় অজ্ঞ বঙ্গবাসীগণের নিমিত্তই বাঙ্গালা ভাষায় সমাদ্দার মহাশয় ইতিহাসের এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কারণ, যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা এই অনুবাদের অনুবাদ অপেক্ষা ম্যাক্রিণ্ডলের সঙ্কলনেরই বেশী আদর করিবেন। তাই এই গ্রন্থের পাদটীকায় ইংরাজী কোটেসনের বা উদ্ধৃত বাক্যের বঙ্গানুবাদ যে স্থানে স্থানে কেন দেওয়া হয় নাই তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। গ্রন্থকার ষ্টাডিয়া, ফাদম, ড্রাকমা, পালিবোথ্রা প্রভৃতি শব্দ গ্রন্থ-কলেবরে ব্যবহার না করিলেই পারিতেন। পাদটীকায় বা পরিশিষ্টে এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা-সমন্বিত উল্লেখ থাকিলেই চলিত। অথচ গ্রন্থকার যে কেবল মূলানুগত অনুবাদের খাতিরেই এরূপ করিয়াছেন তাহা মনে করিতে পারি না; কারণ প্রাচীন ভারতের কোথাও সমাদ্দার মহাশয় ট্যাক্সিলার ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু তক্ষশীলা লিখিয়াছেন। তবে পাটনার বেলায় পালিবোথ্রা কেন হইল? ইহা কি পৌর্ব্বাপর্য্য সঙ্গতি-রক্ষার বিষয়ে অসাবধানতার পরিচায়ক নহে? প্রত্যেক ড্রাকমা =৯¾ পেন্স, কি বাঙ্গালী পাঠকের জন্য লিখিত? দার্শনিক জাতি (১ম খণ্ড ৬৪ পৃঃ) যে ব্রাহ্মণ তাহা বুঝাইবার কোন ইঙ্গিত নাই।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। তিনি ম্যাক্রিণ্ডলের ভূমিকায় চর্ব্বিতচর্ব্বণ ব্যতীত নূতন কথা কিছুই বলেন নাই, অথচ তাহার ঋণ স্বীকার করেন নাই। অযোগ্য অনুবাদ ও অক্ষম ভূমিকা সমসাময়িক ভারতের প্রথম খণ্ডকে একেবারে অপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। আমরা ত কেবল সমালোচনার জন্যই এই "মথিলিখিত সুসমাচার" পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি। বাঙ্গালী পাঠক এই পাত্রী বাঙ্গালার ২৫০ পৃষ্ঠা যে কি করিয়া পড়িবেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় খণ্ডে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটি উপাদেয় ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত না হইলেও প্রবন্ধে প্রগাঢ় পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ভূমিকার আরম্ভে সত্যই বলিয়াছেন "তবে আমি এ কথাও বলিতে বাধ্য, কথায় বলে,—সাত নকলে আসল খাস্তা"। অনুবাদের অনুবাদ, তস্য অনুবাদ, তাহার উপর নির্ভর করিয়া একখানি লুপ্ত গ্রন্থের পরিচয় দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ মনে করি।" সমাদ্দার মহাশয় এ কার্য্যে কেন অগ্রসর হইলেন তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। বিশেষতঃ, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী প্রভৃতি প্রাচীন ও নবীন য়ুরোপীয় ভাষা-সমূহে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় মূল গ্রীক হইতে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থাংশগুলি অনুবাদ করিবার পর প্রাচীন ভাষায় জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে এবম্বিধ চেষ্টাকে পণ্ডশ্রম বলিতে হইবে। রজনী বাবুর

গ্রন্থ তাঁহার গৌরবে, পাদটীকার সম্পদে, ছাপা কাগজ ও বাঁধাইয়ের উৎকর্ষে সর্ব্বাংশেই যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই উৎকৃষ্টতর গ্রন্থখানির মূল্যও সমসাময়িক ভারতের আলোচ্য খণ্ডের মূল্য অপেক্ষা অধিক নহে। সুতরাং বিলাতী পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করিয়া যোগীন্দ্র বাবু অধ্যাপক গুহ মহাশয়ের গ্রন্থখানি সমসাময়িক ভারত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারিতেন এবং তৎসঙ্গে গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থ অনুবাদের ভার রজনীবাবুর যোগ্যতর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে একাকী এই বিরাট গ্রন্থমালা প্রণয়নের গৌরবের একটু হ্রাস হইতে পারিত বটে, কিন্তু সমাদ্দার মহাশয়ের সম্পাদিত সমসাময়িক ভারত বাঙ্গালা সাহিত্যে বাস্তবিকই একটি গৌরবের বিষয় হইত।

আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে সমাদ্দার মহাশয় তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত গ্রন্থগুলির ভাষা অপর কাহারও দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইবেন। যদি বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ-বৃদ্ধির বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও থাকে, তবে আমরা আশা করি, কেবল ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ না করিয়া তিনি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত সহযোগী সন্ধান করিয়া লইবেন। বাঙ্গালা দেশে এখন নানা ভাষাবিদ উৎসাহী ব্যক্তির অভাব নাই। বঙ্গদেশীয় উন্নত-হৃদয় কতিপয় ধনাঢ্যের বদান্যতায় সস্তায় যশ কিনিতে যদি কেহ অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থদ্বয়ে আচরিত পন্থাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। কিন্তু অধ্যাপক সমাদ্দার উচ্চতর উদ্দেশ্য লইয়াই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাই আমরা বিশ্বাস করিতে চাই।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন।

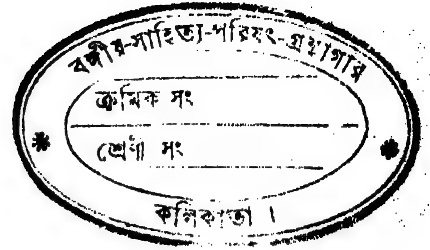
পুস্তক সমালোচনা

(১) "বিবাহ ও তাহার আদর্শ"—শ্রীযুত গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি, এ প্রণীত হিন্দু বিবাহ বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ। গ্রন্থখানির ভাষা সুষ্ঠু ও সুসংযত এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের যুক্তি বহু শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। হিন্দু বিবাহের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সহিত হিন্দু ভারতবাসীর মতদ্বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, হিন্দু শাস্ত্র সর্ব্বদাই বাল্য বিবাহের প্রতিকূল এবং বঙ্গদেশ মুসলমান শাসকের অধীন হওয়ার পর হইতেই এই কুপ্রথা দেশে প্রচলিত হয়—এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলে একমত হইবেন এরূপ ভরসা করা যায় না। তবে, গঙ্গাচরণ বাবুর মত যে বর্ত্তমান সময়ে দেশের পক্ষে কল্যাণকর এবং উক্ত গ্রন্থভুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সে সম্বন্ধে আমাদের সংশয় নাই।

হংসরাজ

(২) "জীবনের স্তর ও তাহার অভিব্যক্তি—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী প্রণীত। একখানি প্রবন্ধ বহি। বিষয়টি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, ভাষা ও ভাব অনেকাংশে তদনুরূপ হইয়াছে। দুইটি প্রবন্ধ "মন্ত্র জাগরণ" এবং "স্থান মাহাত্ম্য ও কাল মহিমা" সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে এগুলি "তাঁহার অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা" এবং উহাতে "স্থানে স্থানে ভাষায় অতিরিক্ত ঝঙ্কার ও শব্দাড়ম্বর রহিয়া গিয়াছে।" অন্যত্র তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ অথচ সরল হইয়াছে। নরেন্দ্র বাবুর রচনায় বিশিষ্ট জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

হংসরাজ



প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ আষাঢ় ১৩২৩ ৩য় সংখ্যা

সোসিয়ালিজ্‌মের বর্ত্তমান অবস্থা

এ যাবৎ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে যে নিতান্ত একদেশদর্শী, স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তনশীল ও কেবলমাত্র আত্ম-সর্ব্বস্ব শিল্প ও বাণিজ্য প্রথার উদ্ভব হয়, সোসিয়ালিজ্‌ম্ তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইংলণ্ডেই এই ব্যবসা-নীতির প্রথম প্রচলন হয়, সুতরাং সোসিয়ালিজ্‌ম্‌কেও আমরা সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডেই দেখিতে পাই; ভাবোন্মত্ত ফরাসীজাতি উহার শুষ্কদেহে প্রাণসঞ্চার করে মাত্র। কিন্তু ইহা চিরকালই এই দুই দেশের সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আপনাকে অবরুদ্ধ রাখে নাই। যে সকল কারণে ইংলণ্ডে সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদের উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তৎসমুদয় অন্যান্য দেশেও বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে, এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ও তত্তৎদেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে। শুধু তাহাই নহে; খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর একচক্ষু ইউরোপীয় সভ্যতা পৃথিবীর যেখানেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানেই সোসিয়ালিজ্‌মের অল্পবিস্তর প্রচলন হইয়াছে বা হইতেছে। তবে, দেশভেদে, দেশবাসীভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ইহা রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। বর্ত্তমান অধ্যায়ে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে সোসিয়ালিজ্‌মের বর্ত্তমান অবস্থা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

হল্যাণ্ড—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানে সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদের বিশেষ প্রচলন ছিল না। এই অব্দেই হল্যাণ্ডে সোসিয়াল্ ডিমক্র্যাটিক সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং তাহার পর হইতেই ইহা অতি দ্রুতবেগে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনোপলক্ষে সোসিয়ালিষ্টদের পক্ষে মাত্র ১৩,০০০ ভোট হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৫ অব্দের নির্ব্বাচনে এই ভোটের সংখ্যা ৬৫,০০০ হইয়াছিল এবং সোসিয়ালিষ্ট পক্ষে ৭জন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হয়।

ডেন্‌মার্ক—বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ডেন্‌মার্কই ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশালী

দেশ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতেই এখানে সোসিয়ালিজ্‌মের চল আছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়ে সোসিয়ালিষ্টেরা ৭৭,০০০ ভোট পায় এবং তাহাদের ২৪ জন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

নরওয়ে ও সুইডেন্—এই দুই দেশেও সোসিয়ালিজ্‌মের প্রভাব বড় কম নহে। পূর্ব্বে নরওয়ে ও সুইডেন্ একই রাজার শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু সোসিয়ালিষ্টদের চেষ্টাতে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল ইহা দুইটী স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে।

বেল্‌জিয়াম্—বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বেল্‌জিয়ামের সোসিয়ালিষ্টগণ যেরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কেহই পারে নাই। বহুসংখ্যক সমবায়-সমিতির (Co-operative Societies) প্রতিষ্ঠাই বেল্‌জিয়ান্ সোসিয়ালিজ্‌মের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। ইংলণ্ডেই সর্ব্বপ্রথম সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় বটে, কিন্তু বেল্‌জিয়ানদের হাতেই উহার পূর্ণ পরিণতি সাধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, এবম্প্রকার সমবায়-সমিতি কর্ত্তৃক শ্রমজীবী-জগতে বাস্তবিকই এক যুগান্তর আনীত হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির সোসিয়ালিজ্‌মবাদের যাহা কিছু ভাল, বেল্‌জিয়ানেরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে তাহাদের অন্যতম নেতা ভেণ্ডারভেল্‌ড্ (Vendervelde) বলেন যে, "বেল্‌জিয়ানেরা ইংলণ্ড হইতে স্বাবলম্বন ও সমবায় প্রথা, জার্ম্মাণি হইতে রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যপদ্ধতি এবং ফ্রান্স হইতে মূল আদর্শ গ্রহণ করতঃ এতৎসমুদয়ের সমষ্টি হইতে নিজেদের অবস্থোপযোগী সোসিয়ালিজম্-বাদ গঠন করিয়া লইয়াছে।" বেল্‌জিয়ান পার্লামেণ্টের মোট সভ্যসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশই খাঁটী সোসিয়ালিষ্ট মতাবলম্বী।

স্পেন—এখানে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অঞ্চলে, এনার্কিজ্‌মেরই প্রাধান্য বেশী।

সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়া—অতি অল্প দিন পূর্ব্বে এই দুইটী দেশ স্বাধীন অস্তিত্ব লাভ করিলেও, ইউরোপীয় রীতি-নীতির ক্রমশঃ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সোসিয়ালিজ্‌মও ধীরে ধীরে দেখা দিতেছে। মার্ক্স-প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-সমিতির আদর্শে সম্প্রতি এখানে কয়েকটী সভাসমিতিরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া—এখানে সোসিয়াল্ ডিমক্রেটদেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিপত্তি। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীতে জার্ম্মাণ, জেক্ (Czech), পোল্, ইটালিয়ান্, ম্যাগিয়ার (Magyars) প্রভৃতি বহুসংখ্যক জাতির বাস। এতদিন পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে কোনও ঐক্যবন্ধন বা মনের মিল ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির সোসিয়ালিষ্টগণ কিন্তু বেশ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে। ইহাদের মূল আদর্শ দুইটী,—স্বরাষ্ট্র (National autonomy) ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। একই সম্রাটের শাসনাধীনে থাকিলেও, ইহারা জাতীয় বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র রাজী নহে। সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার পাইবার জন্য ইহারা দীর্ঘকাল তীব্র আন্দোলন করে, এবং অবশেষে বিগত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়াই এই অধিকার প্রদান করিতে হইয়াছে। তদনুসারে যে রাইক্‌স্‌রাথ্ (Reichsrath) বা পার্লামেণ্ট গঠিত হয়, তাহাতে সোসিয়ালিষ্টদের পক্ষে ৮৭ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়। এই নির্ব্বাচনোপলক্ষে ইহারা মোট ৭২২,০০০ ভোট পাইয়াছিল।

রুশিয়া—সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, রুশসম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার গুপ্ত ঘাতকের হস্তে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপরবর্ত্তী সম্রাট তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দেশ হইতে নিহিলিজ্‌ম্ ও সঙ্গে সঙ্গে সোসিয়ালিজ্‌মের নিষ্কাশনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। সম্রাটের আজ্ঞায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিকার হ্রাস হইল; দোষী-নির্দ্দোষী শত শত ব্যক্তি রুশিয়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা সাইবেরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইল। ইহাতে কিছু দিনের জন্য নিহিলিষ্টদের বাড়াবাড়িটা কমিয়া গেল বটে, কিন্তু সোসিয়ালিজ্‌মের মূলোচ্ছে

হইল না; বরং উহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া তেজ ও দীপ্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ "উইটে" (Witte) রাজস্ব-সচিবের পদ প্রাপ্ত হন। শিল্পবিষয়ে রুশিয়াকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও, জার্ম্মাণির সমকক্ষ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলাই উইটের প্রধান মতলব ছিল, এবং তদভিপ্রায়ে তিনি বৈদেশিক আমদানীর উপর অত্যধিক শুল্ক স্থাপন ও অন্যান্য বিবিধ উপায়ে দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যেই রুশিয়াতে ইউরোপীয় আদর্শে বহুসংখ্যক কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও এক দল মূলধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। "উইটের" উদ্দেশ্য সাধিত হইল বটে, কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পপ্রথার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদও রুশিয়ার মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইল।

এত দিন রুশিয়াতে যে নিহিলিজ্‌ম্ ও সোসিয়ালিজমের প্রচলন ছিল, তাহা সাধারণতঃ বিদেশপ্রত্যাগত শিক্ষিত যুবকযুবতী ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আনার্কিষ্টদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রুশ জনসাধারণ এই আন্দোলনে যোগ দেয় নাই; বরং অনেক সময়ে বিরুদ্ধাচরণই করিত; কিন্তু এক্ষণে ইউরোপীয় প্রথায় মূলধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা-সর্ব্বস্ব শ্রমজীবীদলেরও উদ্ভব হইল। আন্দোলনকারীগণ এই সুযোগ পরিত্যাগ করে নাই; এখন হইতে তাহারা অধিকতর সফলতার সহিত এই শ্রমজীবীদের মধ্যে সোসিয়ালিজ্‌ম্ ও আনার্কিজমের প্রচার করিতে লাগিল। কৃষকসম্প্রদায় হইতেই শ্রমজীবীদের উৎপত্তি; সুতরাং একের অসন্তোষ অপরে সঞ্চারিত হইতে বড় বেশী সময় লাগিল না; ফলে, রুশিয়ার জনসাধারণ শীঘ্রই মূলধনী ও অভিজাতকুলের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেল।

এই সময়ে রুশজাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে অতিকায় রুশিয়ার ভীষণ ও নিতান্ত লজ্জাজনক পরাজয়ের ফলে গবর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের বিরাগের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশমন্ত্রী আনার্কিষ্টের গুপ্ত বোমায় নিহত হইলে, প্রিন্‌স্ মির্‌স্কী (Prince Mirski) তৎপদে নিযুক্ত হন। শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে মির্‌স্কীর খুব উদার মত ছিল। শাসনকার্য্যে প্রজাসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি নিতান্ত আবশ্যক ও তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ অধিকার প্রদান শাসকমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এই সময়ে কতিপয় আনার্কিষ্ট সম্রাটকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করাতে, সম্রাট মির্‌সকীকে পদচ্যুত করিয়া জেনারেল ট্রেপফ্‌কে (General Trepoff) সেণ্টপিটার্সবার্গের ডিক্টেটার (Dictator) বা একচ্ছত্র ও সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। ট্রেপফ্ এ কার্য্যের জন্য বিশেষরূপেই উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কঠোর দণ্ড-নীতির ফলে জনসাধারণ শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যন্ত চটিয়া গেল। কিছুদিন পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে চলিলে, রুশ গবর্ণমেণ্ট তদীয় শাসননীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ডুমা (Duma) বা রুশ পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং অক্টোবর মাসে ট্রেপফ্ পদচ্যুত ও উইটে প্রধান মন্ত্রীর পদে পুনঃ নিযুক্ত হইলেন। স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সভাসমিতি স্থাপন প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর আইন করা হইয়াছিল, ৩০ শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র জারী করিয়া তৎসমুদয় রদ করা হইল। ইহাতে রক্ষণশীল (Conservative) সমাজ বিশেষ প্রীত হইল। শিপফ্ (Shipoff) ইহাদের নেতা ছিলেন। ইতিহাসে এই সম্প্রদায় সাধারণতঃ "অক্টোব্রিষ্ট" (Octobrists) নামে পরিচিত। অধ্যাপক মিলিউকফ্ (Professor Miliukoff) আর এক দলের নেতা ছিলেন। ইহারা আনার্কিষ্ট বা নিহিলিষ্ট না হইলেও, রুশ সম্রাটের অনিয়ন্ত্রিত শাসনশক্তির ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সাধারণতঃ ইহারা ক্যাডেট্ (Cadets) নামে পরিচিত।

ঠিক এই সময়ে নৌবিভাগে ও মস্কো (Moscow)

সহরে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট এক হাতে যেমন বজ্রমুষ্টিতে বিদ্রোহ দমন করিতে লাগিলেন, তেমনি অপর হস্তে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তাহাদের দাবীদাওয়াও পূরণ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় সকলকেই পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া হয়। এই নির্ব্বাচনের ফলে যে ডুমা গঠিত হয়, তাহাতে প্রাগুক্ত "ক্যাডেট্" দলেরই সংখ্যাধিক্য হয়। উইটের স্থলে "গোরেমিকিন্" (Goremykin) প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন, কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীসমাজে "ষ্টোলিপিন"ই (*Stolypin*) সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবগঠিত ডুমা শীঘ্রই সকল বিষয়ে স্বাধীনতার পরিচয় প্রদান ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের কৈফিয়ৎ তলব করিতে লাগিল। ইহাতে রুশ সম্রাট ডুমার অধিবেশন বন্ধ (Dissolution) করিয়া ষ্টোলিপিন্‌কেই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিলেন। পক্ষান্তরে, "ক্যাডেট" দল ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ফিন্‌ল্যাণ্ডে (Finland) সমবেত হইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ভাইবর্গ-ঘোষণাপত্রের" (Viborg Manifesto) প্রচার করিয়া পার্লামেণ্টের পুনরধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত জনসাধারণ যাহাতে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট না হয়, বা গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদান বা অন্য কোনও প্রকার সাহায্য না করে, তজ্জন্য যথাসাধ্য তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিল। এদিকে মন্ত্রী ষ্টোলিপিন্ "ভাইবর্গ ঘোষণাপত্রে" স্বাক্ষর ও উহার অনুষ্ঠাতৃবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করার অপরাধে শত শত লোককে শাস্তি দিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে ভাবিলেন যে এইবার বোধ হয় প্রতিপক্ষ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে, এবং এই আশ্বাসে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের আহ্বান করা হইল। কিন্তু এবারেও ক্যাডেট্‌দেরই সংখ্যাধিক্য হইল দেখিয়া অনতিবিলম্বেই পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিদ করতঃ সোসিয়ালিষ্টদের উপরে বিশেষ জুলুম করা হইতে লাগিল। এইবারে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় সফল হইল—নবনির্ব্বাচনে অক্টোব্রিষ্ট দলেরই জয়লাভ হইল।

ইহার পরে ডুমা অনেক অধিকার লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে ইহার আরও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ফ্রান্স—১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রজাবিদ্রোহের (The Rise of the Communes) দমনের পর সোসিয়ালিষ্টগণ কিছুকাল যাবৎ নীরবে থাকিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রমজীবীদের প্রথম কংগ্রেস আহূত হয়। জুলেস্ গেস্‌দে (Jules Guesde) ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা অপরাধে তিনি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "সাম্য" (L' Egalite) নামে একখানি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রথমতঃ আনার্কিষ্টদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও মার্ক্সের মত প্রচলনের চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রধানতঃ গেস্‌দের চেষ্টাতেই ফ্রান্সের আনার্কিষ্টদল অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী নগরীতে শ্রমজীবীদের একটী আন্তর্জাতিক সমিতি আহ্বানের আয়োজন করেন—কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধাচরণবশতঃ এই অধিবেশন হইতে পারে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন, ইহাতেই বোধ হয় শ্রমজীবীদল ভীত হইবে; ফলে কিন্তু আন্দোলনের প্রবলতা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল; লোকে দলে দলে সোসিয়ালিষ্টদের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্টগণও (Trade Unionists) সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল, এবং পরবর্ত্তী বৎসরে মার্সেল্ (Marseilles) সহরে শ্রমজীবীদের একটী বিরাট অধিবেশন হয়। ইহাতে বিপ্লবপন্থীগণের সংখ্যাধিক্য থাকিলেও, গেস্‌দে ও লাফার্গের (Lafargue, মার্ক্সের জামাতা) নেতৃত্বেই সমস্ত অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল লোককে সমান ভাবে চালাইতে পারে, ফ্রান্সে এমন নেতা ছিল না; সুতরাং দুই তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই ফরাসী

সোসিয়ালিষ্টগণ দুই তিনটী দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। প্যারী সহরের মেয়র (mayor) পল্ ব্রুসে (Paul Brousse) এক দলের নেতা ছিলেন। প্রচলিত শাসনব্যবস্থা প্রভৃতির প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার দ্বারা ক্রমে ক্রমে সোসিয়ালিজ্‌মের প্রবর্ত্তন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই দল সাধারণতঃ "সম্ভববাদী" (Possiblists) নামে খ্যাত। আর এক দলের নেতা ছিলেন পূর্ব্বোক্ত গেস্‌দে। ইহারা মার্ক্সের মতাবলম্বী ছিল, এবং বলিত যে, কোনও প্রকার সংস্কার দ্বারাই বর্ত্তমান দূষিত শাসন ও সমাজতন্ত্রের সংশোধন নিতান্ত অসম্ভব; যাহারা এক্ষণে ক্ষমতা ভোগ করিতেছে, কিছুতেই তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। সামাজিক বিপ্লব-সংঘটনের দ্বারাই শ্রমজীবীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। ইতিহাসে ইহারা "অসম্ভববাদী" (Impossiblists) নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া জরে (Jaures), মিলের‍াঁদ (Millerand) প্রভৃতি প্রখ্যাত সোসিয়ালিষ্টগণ কোন দলভুক্তই ছিলেন না; ইহারা "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" (Independent) বা অনন্যাধীন নামে পরিচিত।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোসিয়ালিষ্টগণ এইরূপ ছিন্ন ভিন্ন ছিল। এই সময়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ড্রেফু-ব্যাপারে (১) প্রায় সমস্ত দল আবার একত্রিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ফ্রান্সে সোসিয়ালিষ্টেরা বিশেষ প্রবল। তাহাদের অন্যতম নেতা এম্ ব্রায়াণ্ড (M. Briand ১৯০৯-১৯০১১ পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে সোসিয়ালিষ্ট প্রতিনিধিগণ মোট চৌদ্দ লক্ষ ভোট পাইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্ট দলও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। একই প্রকার ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবীগণের পরস্পরের সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্রমজীবীদের যে সমস্ত সমিতি আছে, তাহারই নাম ট্রেড ইউনিয়ন। রাষ্ট্র নীতির সহিত ইহারা কোন সংশ্রব রাখা দরকার মনে করে না। দেশভেদে ট্রেড ইউনিয়নেরও আকৃতি ও প্রকৃতিগত যথেষ্টই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ফ্রান্স ও ইটালীর ট্রেড ইউনিয়নিষ্টগণ অনেকটা আনার্কিজম্ মতাবলম্বী বা বিপ্লবপন্থী। ফরাসী ট্রেড ইউনিয়নিষ্টগণ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ শত্রু মনে করে, এবং যাবতীয় শিল্পব্যবসায় করায়ত্ত করিয়া সকল বিষয়েই

(১) কাপ্তান ড্রেফু (Captain Dreyfus) জাতিতে ইহুদি ছিলেন। তিনি ফরাসী গোলন্দাজ বিভাগে কাজ করিতেন। জার্ম্মাণীর নিকট সামরিক রহস্য ভেদ করা অপরাধে ড্রেফু নির্ব্বাসিত হন। প্রথমতঃ ইঁহার অপরাধ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তা কর্ণেল পিকার্ট (Colonel Picquart) প্রকাশ করেন যে, ড্রেফু সম্পূর্ণ নিরপরাধ, এবং যে চিঠির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, উহা জাল। কিন্তু তৎকালীন মন্ত্রীসমাজ এ সম্বন্ধে কোনও অনুসন্ধান আবশ্যক বোধ করিলেন না; বরং যাহারা ড্রেফুর পক্ষে কথা বলিত, তাহারাই মন্ত্রীসমাজের কোপদৃষ্টিতে পড়িত। মন্ত্রীসমাজের এইরূপ যথেচ্ছাচারিতার ফলে ক্লিমেন্‌সোঁ (Clemenceau), জরে (Jaures), জোলা (Zola), আনাটোল ফ্রাঁস (Anatole France) প্রভৃতি প্রখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট নেতৃগণ ড্রেফুর পক্ষে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু মন্ত্রীসমাজকে সহসা টলাইতে পারিলেন না; বরং পিকার্ট, জোলা প্রভৃতিই দণ্ডিত হইলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল হেনেরী নামক এক ব্যক্তি স্বীকার করে যে, যে চিঠিপত্রের উপর নির্ভর করিয়া ড্রেফুর শাস্তি বিধান করা হইয়াছে, তৎসমুদয় হেনেরী নিজ হাতে জাল করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াই হেন্‌রী আত্মহত্যা করে। ড্রেফুর নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না বটে, কিন্তু যে বিচার একবার শেষ হইয়া গিয়াছে, মন্ত্রীসমাজ তৎসম্বন্ধে পুনরালোচনা করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। ইহাতে আন্দোলনের স্রোত আরও বেগে বহিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী-সমাজের পরিবর্ত্তন হয় এবং নূতন মন্ত্রীসমাজ কর্ত্তৃক ড্রেফু কারামুক্ত ও স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রেণীর সমিতির একাধিপত্য স্থাপন করাই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইটালির সিণ্ডিক্যালিষ্টগণও (Syndicalists) অনেকটা এইরূপ মতাবলম্বী।

গ্রেটব্রিটেন—খ্রীষ্টান সোসিয়ালিষ্ট আন্দোলনের তিরোভাবের পর দীর্ঘকাল যাবৎ ইংলণ্ডে সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কোনও আন্দোলন ছিল না বলিলেই হয়। মার্ক্স যখন লণ্ডনে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইংরাজ শ্রমজীবীদের অনেকেই এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু উহা ক্রমশঃই অরাজকতার ভাব প্রকাশ করাতে ইংরাজেরা আস্তে আস্তে উহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ইংরাজদের মধ্যে সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই হয় নাই। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে হেনরী জর্জের (Henry George) 'উন্নতি ও দারিদ্র্য' (Progress and Poverty) নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়, এবং এই পুস্তক ইংরাজ-সমাজে এক যুগান্তর আনয়ন করে। জর্জ্জ ঠিক সোসিয়ালিজ্‌ম্-বাদের প্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার লেখা হইতেই ইংরাজ-সমাজের তৎকালীন অসামঞ্জস্য ও দুরবস্থার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডীয় অর্থনীতির পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। সমাজের নিম্ন স্তরের দারিদ্র-সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকেই চেষ্টিত হয়। সময়ও খুব সুবিধাজনক ছিল। উদারনৈতিক দলই সাধারণতঃ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তন-নীতির পরিপোষক। কিন্তু নানা কারণে এই সময়ে লিবারেল্ দলের প্রভাব খুব কম হইয়া আসিয়াছিল। আয়র্লণ্ডে তাঁহারা জমীজমা সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন-কানুনের প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন, তৎসমুদয়ের ব্যর্থতা হইতেই জন-সাধারণের মনে উদারনৈতিকদের কার্য্যকুশলতা ও উহাদের প্রচারিত অর্থনীতি সম্পর্কীয় মতবাদের প্রতি গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। এক্ষণে নিজেদের সমাজের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিপতিত হওয়াতে, এই সন্দেহ ক্রমে বিশ্বাসে পরিণত হইল। যখন সকলের মনেই এইরূপ হইতেছিল, তখন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মার্ক্সের ভক্ত শিষ্য মিঃ হাইণ্ডম্যানের (Mr. Hyndman) "নেতৃত্বে সোসিয়াল্ ডিমক্রেটিক সমিতি" (The Social Democratic Federation) নামক একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং সেই হইতেই সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে পুনরায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইংলণ্ডের প্রখ্যাতনামা কবি উইলিয়ম্ মরিশ্‌ও (William Morris) এই সমিতির অন্যতম নেতা ছিলেন। ইহার মুখপত্রের নাম ছিল—"ন্যায়-বিচার" (Justice)। এতদুপলক্ষেই মিঃ হাইণ্ডম্যানের 'ইংলণ্ডীয় সোসিয়ালিজ্‌মের ঐতিহাসিক ভিত্তি" (Historical Basis of Socialism in England) নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণীত হয়।

মরিস অনেকটা অরাজকতাপন্থী ছিলেন। প্রধানতঃ এই কারণেই অনেকের সহিতই তাঁহার মতানৈক্য উপস্থিত হওয়াতে সমমতাবলম্বী আরও কয়েকজনের সহিত তিনি "সোসিয়ালিষ্ট লিগ্" (The Socialist League) নামে একটী স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করেন। মরিস্ প্রণীত "ভূ-স্বর্গ" (Earthly Paradise), "অজ্ঞাত দেশের খবর" (News from Nowhere) প্রভৃতি, এবং অন্যতম নেতা বেল্‌ফর্ট ব্যাক্স্ (Belfort Bax) প্রণীত "সোসিয়ালিজ্‌ম্-নীতি" (Ethics of Socialism) নামক পুস্তক হইতে এই সম্প্রদায়ের মতামত সবিশেষ জানা যায়। "সাধারণের ইষ্ট" (Common weal) নামে ইহার এক মুখপত্র ছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই সমিতি ও উহার মুখপত্র, দুইই উঠিয়া যায়।

এই দুইটী সমিতির একটী ছিল মার্ক্সের মতাবলম্বী ও অন্যটী ছিল অনেকটা আনার্কিষ্ট ধরণের, সুতরাং অনেকেই এই দুইটীর কোনটীতেই সম্পূর্ণ ভাবে যোগ দিতে পারিত না। সেই জন্য এই উভয় সমিতির উৎকৃষ্ট ও ইংলণ্ডের তদানীন্তন অবস্থার উপযোগী মতসমূহ লইয়া অধ্যাপক টমাসডেভিডসনের (Professor Thomas Davidson) নেতৃত্বে শীঘ্রই আর একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। কিছুদিন পরে ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফেবিয়ান্ সমিতি (Fabian Society) নামে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত হয়।

আনার্কিজ্‌মের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ আছে, ইংলণ্ডের মাটিতে এমন কোন বীজেরই অঙ্কুরোদ্গম সম্ভবপর নহে। সুতরাং উইলিয়ম মরিসের সোসিয়ালিষ্ট লিগ শীঘ্রই উঠিয়া গেল, এবং হাইণ্ড্‌ম্যানের সমিতিও ক্রমে ক্রমে কতিপয় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু ফেবিয়ান সমিতি উত্তরোত্তর ও অতি দ্রুত গতিতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। রীতিমত কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির মত ইহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সমিতির সভ্যগণ ইংলণ্ডের সামাজিক, আর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলি পূর্ব্বে নিজেরা বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন, এবং কোনও বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা ধীর চিত্তে বিবেচনা না করিয়া একদেশদর্শী কোন মতের প্রচার করিতেন না। একটা প্রকাণ্ড হৈ-চৈর সৃষ্টি করা ইহাদের মতলব ছিল না, বা সাময়িক আন্দোলন দ্বারা সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার স্থায়ী ও মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভবপর, তাহাও ইহারা বিশ্বাস করিত না। বিশেষ বিবেচনাসহকারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে, আপামর সাধারণকে ধীরে সুস্থে তাহা বুঝাইয়া দিয়া ক্রমশঃ জনমত সংগঠন করার দিকেই ইহাদের প্রধান ঝোঁক ছিল; এবং এইরূপ কার্য্যপদ্ধতি ইংরাজচরিত্রের উপযোগী হওয়াতে ইহারা আশাতীত সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিল। সাধারণতঃ সান্ধ্য বক্তৃতা, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন ও বিতরণের দ্বারা ইহারা আপামর সাধারণের মধ্যে নিজেদের মতের প্রচার করিত। এই সমস্ত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী জনসাধারণের বোধগম্য সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হওয়াতে, ঐ সমস্ত পুস্তিকার যথেষ্ট কাটতি হইত। কথিত হয় যে, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইন" (The Workmen's Compensation Act) সম্বন্ধে এই সমিতি হইতে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, বৎসর শেষ না হইতেই তাহার ১,২০,০০০ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল! এই সমিতির কতিপয় সভ্য মিলিত হইয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'সোসিয়ালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে ফেবিয়ান্ প্রবন্ধাবলী' (The Fabian Essays on Socialism) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে এই সোসাইটীর মতামতসমূহ অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। মিঃ ও মিসেস্ সিড্‌নি ওয়েব্ (Mr. and Mrs. Sidney Webb) প্রণীত বিখ্যাত পুস্তকদ্বয়, The History of Trade Unionism ও Industrial Democracy, প্রধানতঃ ফেবিয়ান্ সোসাইটীর উদ্যোগেই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। মিঃ জি. বি. শ (Mr. G. B. Shaw) ও মিঃ এইচ্, জি. ওয়েল্‌সের (H. G. Wells) লেখনীও ফেবিয়ান্ মত প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। নিম্নে এই সোসাইটীর মূল উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতি (The Basis of the Fabian Society) সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল:—

(১) সোসিয়ালিজ্‌ম্ মতাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই এই সমিতির সভ্য হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে শিল্প ও জমী-জমাসংক্রান্ত মূলধন (Land and Industrial Capital) কতিপয় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি ও সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের নি[illegible] হইতে এই মূলধনের উদ্ধার করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ন্যায্যভাবে তাহার বণ্টন করিয়া দেওয়াই এই সমিতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের প্রাকৃতিক ও অধিগত (Acquired) সম্পদরাজির সর্ব্বসাধারণের তুল্যভাবে উপভোগ করিবার ইহা ছাড়া আর কোনও উপায় আছে বলিয়া সমিতি মনে করেন না।

(২) জমীজমাতে যাহাতে কোনও ব্যক্তিগত বা পুরুষ-পরম্পরাগত স্বত্বস্বামিত্ব জন্মিতে না পারে, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যাহাতে খাজানাদি লইয়া অধিকতর ধনশালী হইতে না পারে, তজ্জন্য এই সোসাইটী বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন।

(৩) যে সকল শিল্প-ব্যবসা শ্রমজীবীদের সমিতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক সহজেই পরিচালিত হইতে পারে, ঐ সমস্ত সমিতির সাহায্যে তৎসমুদয়ের প্রবর্ত্তন করাও সোসাইটীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

সোসাইটী বিবেচনা করেন যে, এই সমস্ত বিষয়ের সম্যক্ প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সোসিয়ালিজ্‌ম্

মতের বহুল প্রচার নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ মত প্রচার দ্বারা জনমত গঠন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে পারিলেই প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনগুলি কার্য্যে পরিণত করা অনেক সহজ-সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের সমান ও তুল্য অধিকার ভোগের ব্যবস্থা থাকা সমিতি নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও উহার উদ্দেশ্য সাধনের একান্ত অনুকূল মনে করেন। সমিতি এই সমুদয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, ব্যক্তি ও সমাজ এতদুভয়ের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন।

সম্প্রতি সোসাইটী নিম্নলিখিত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করিবেন—

(ক) সোসিয়ালিজ‌্ম্ সংক্রান্ত নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা-সমিতির আহ্বান।

(খ) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা ও উপকরণ সংগ্রহ।

(গ) সমাজ-তন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ পুস্তকাদির প্রচার।

(ঘ) সোসিয়ালিষ্টিক সভা-সমিতি প্রভৃতি ছাড়াও অন্যান্য সভা-সমিতিতেও যাহাতে সোসিয়ালিজ‌্ম্ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) সাধারণ সভা-সমিতিসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণপূর্ব্বক তৎসমুদয়ে সামাজিক প্রশ্নের উত্থাপন ও আলোচনা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ফেবিয়ান সোসাইটীর লণ্ডন শাখার সভ্যসংখ্যা ২৫০০ ছিল। প্রাদেশিক শাখাসমূহের সভ্য-সংখ্যাও বড় কম ছিল না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্টগণ সাধারণতঃ রাজনীতির সহিত কোনও সংশ্রব রাখা দরকার মনে করে না। কিন্তু ফেবিয়ান্ সোসাইটীর অত্যধিক উন্নতি হওয়াতে ও লোকে দলে দলে এই সোসাইটীতে ভর্ত্তি হওয়াতে ইংরাজ ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্টগণ রাজনৈতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিলেন, এবং তদনুসারে আপনাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্ট ও শ্রমজীবী-সমিতি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে কি না তজ্জন্য উভয় পক্ষের অনেকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং তাহার ফলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাড্ফর্ড (Bradford) সহরে, ফেবিয়ান্, ট্রেড্ ইউনিয়নিষ্ট ও অন্যান্য অনেক সোসিয়ালিষ্ট সমিতির এক বিরাট অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। এই যুক্তি-পরামর্শের ফলে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি (Independent Labour Party)বা "স্বাধীন শ্রমজীবী-সমিতি" নামে একটী সমিতির সৃষ্টি হয় এবং মিঃ কেয়ার হার্ডি (Mr. Keir Hardie) এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সোসিয়ালিজ‌্ম্ মতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সমিতিসমূহের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন ও রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা শ্রমজীবী সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন, এই দুইটী বিষয়ই এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহারা প্রথম হইতেই উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল—উভয় সম্প্রদায়ের কার্য্যেরই তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে মিঃ কেয়ার হার্ডি পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন এবং মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতেও এই দলের প্রতিপত্তি দিন দিনই বাড়িতে লাগিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে "স্বাধীন শ্রমজীবী-সমিতি", "ফেবিয়ান সোসাইটী" প্রভৃতি মিলিত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য "শ্রমজীবী-প্রতিনিধি-কমিটি" (Labour Representation Committee) নামে একটী কমিটী গঠিত হয়। ঐ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে এই কমিটীর পক্ষ হইতে মাত্র দুইজন প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। (কিছুদিন পরে আরও দুইজন নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।) কিছুদিন পর্য্যন্ত এই কমিটী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া ইহা শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং ১৯০৬ অব্দের

নির্বাচনে ইহার কার্য্যতৎপরতা ও শক্তি সামর্থ্য দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক একেবারে বিস্মিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে অন্যূন ৩০ জন শ্রমজীবী-প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই "শ্রমজীবী-প্রতিনিধি-কমিটীর" নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহার নাম রাখা হয়—"শ্রমজীবী-দল" বা Labour Party। ১৯০৯ অব্দে বহুসংখ্যক ট্রেড ইউনিয়নও আসিয়া ইহার সহিত যোগদান করে। পরবর্ত্তী বৎসরের (১৯১০) নির্ব্বাচনে ৪০ জন শ্রমজীবী সভ্য পার্লামেন্টের মেম্বর নির্ব্বাচিত হন। (পরে আরও দুই জন নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন)। কেয়ার হার্ডির মৃত্যুর পর মিঃ জে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (Mr. J. Ramsay Macdonald) এই দলের নেতৃত্ব করিতেছেন।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই খ্যাত ছিল। সুতরাং এখানে সোসিয়ালিজ্‌মের প্রচার তখন পর্য্যন্তও হইতে পারে নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইউরোপীয় প্রথায় শিল্প ও ব্যবসার সূত্রপাত হয়; এবং অনেক পরে আরম্ভ করিলেও ক্ষিপ্রকারিতায় আমেরিকা ইউরোপকেও পরাস্ত করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সোসিয়ালিজ্‌ম্ ইউরোপীয় শিল্প-প্রথারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। সুতরাং ইউরোপীয় প্রথার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাতেও যে সোসিয়ালিজ্‌মের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সোসিয়ালিজম্ প্রচারের আরও একটী কারণের উদ্ভব হইয়াছিল। ইউরোপ হইতে নির্ব্বাসিত অনেক সোসিয়ালিষ্টই আমেরিকায় আশ্রয় লইত এবং সেখানে নিজেদের মত প্রচারের চেষ্টা করিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৮৭০—৭২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নানা স্থানে মার্ক্সের আদর্শে আন্তর্জাতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র তাদৃশ অনুকূল না হওয়াতে সেগুলি শীঘ্রই উঠিয়া যায়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "সোসিয়ালিষ্ট শ্রমজীবী সম্প্রদায়" (The Socialist Labour Party) নামে একটী সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু জার্মানিজম্ মতের জন্য ইহা জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে "আমেরিকার সোসিয়াল ডিমক্রেসী" (The Social Democracy of America) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং তদবধি আমেরিকাতে সোসিয়ালিজ্‌ম্ অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রাগুক্ত "সোসিয়ালিষ্ট শ্রমজীবী সম্প্রদায়" ইহার সহিত যোগদান করে। ১৯০৪ ও ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নির্ব্বাচনোপলক্ষে শ্রমজীবী-প্রতিনিধি ইউজিন্ ভি ডেবস্ (Eugene V. Debs) যথাক্রমে ৪০৮,০০০ ও ৫০০,০০০ ভোট পাইয়াছিলেন।

জাপান—জাপান ইউরোপেরই মন্ত্রশিষ্য। সকল বিষয়েই সে ইউরোপের অনুকরণ করিতে সিদ্ধহস্ত। ইউরোপের আদর্শে জাপানে বহু কারখানার সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ও দেখা দিয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মার্ক্সের আদর্শে এখানে একটি সোসিয়ালিষ্ট সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা গবর্ণমেণ্টের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। অনেক সোসিয়ালিষ্ট নেতা গবর্ণমেণ্টের বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত, এমন কি, মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ক্যানেডা, আর্জেণ্টাইন (Argentine), চিলি (Chili), অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি যেখানেই ইউরোপীয় আদর্শে শিল্পবাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেখানেই ধীরে ধীরে সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ও আবির্ভূত হইয়াছে।

সোসিয়ালিজ্‌মের উৎপত্তি ও পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেরই উহার বিস্তৃতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্পষ্টই প্রতীত হইবে।

(১) বর্ত্তমান একদেশদর্শী অর্থনীতির মূলোচ্ছেদপূর্ব্বক সমাজের সকল স্তরের আর্থিক সচ্ছলতা সাধনই সোসিয়ালিজমের মূল উদ্দেশ্য। এখন যেমন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের হস্তেই দেশের যাবতীয় মূলধন সঞ্চিত হইতেছে, এবং

ইহারা যথেচ্ছামত তাহার ব্যবহার করিতেছে, সোসিয়ালিজম্ তাহা পছন্দ করে না। সোসিয়ালিষ্টেরা সমাজের হস্তেই অর্থের উৎপত্তি, (Production), বণ্টন (Distribution), ও বিনিময়ের (Exchange) ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছুক।

(২) রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত এই পরিবর্ত্তন সাধনের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্য দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার অধিগত করিয়া লইবার জন্য আধুনিক সোসিয়ালিষ্টগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

(৩) ভবিষ্যতের দায়িত্বপূর্ণ অধিকারসমূহের যাহাতে যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধনের চেষ্টাই বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের প্রধান কাজ। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও সকল বিষয়েই যথোপযুক্ত আন্দোলনাদির দ্বারা তাহারা এই উদ্দেশ্য সফল করিতে চেষ্টা করিতেছে।

(৪) প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই যাহাতে ভোট প্রদানের সমান ও তুল্য অধিকার পায়, তজ্জন্য বিধিমত চেষ্টা হইতেছে। কারণ, এই অধিকার প্রাপ্ত হইলে রাজ্যের সকল বিষয়েই যেমন জনসাধারণের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে, সেইরূপ এতদ্দ্বারা জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের পথও প্রশস্ততর হইবে।

(৫) ইহারা বিবেচনা করে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে শ্রমজীবীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের আশা সুদূরপরাহত।

(৬) সংবাদপত্রের ও অন্যান্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং যাহাতে সকলেই বিনা বাধায় আবশ্যকমত জোটবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে, তাহার সম্যক ব্যবস্থা—তাহারা উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বোধ করে।

(৭) শ্রমজীবীদের কার্য্যকালের পরিমাণ কমাইয়া শিক্ষা-প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের আত্মোন্নতির সুযোগ প্রদান করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইতেছে।

(৮) যুদ্ধবিগ্রহাদির মূলোৎপাটনের জন্যও ইহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে।

(৯) ইহারা উপনিবেশ-স্থাপনের ভয়ানক বিরোধী। ইহারা বলে যে, এতদ্দ্বারা অতি অল্পসংখ্যক লোকে অত্যল্প কালের মধ্যে প্রভূত ধনশালী হইয়া দেশে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে, ঔপনিবেশিকগণ সাধারণতঃ অত্যমাত্রায় যথেচ্ছচারী ও কর্তৃত্বপ্রিয়ও হইয়া থাকে।

এই আন্দোলনে যে সুফল না হইয়াছে, তাহাও নহে। এখনও প্রায় সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই অল্পবিস্তর সোসিয়ালিজম্ আন্দোলনের বিরোধী হইলেও, শ্রমজীবীরাও যে একটী শক্তি ও দেশে শান্তি রক্ষা ও উহার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের মতও যে গ্রহণীয়, ইহা আজকাল প্রায় তাহাই নহে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেশসমূহের গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সর্ব্বসাধারণের মতামত গ্রহণ করা আজকাল একটা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করেন।

অর্থনীতি শাস্ত্রেও এতদ্দ্বারা যুগান্তর সূচিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য" ও "স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তন-নীতি"র দিন চলিয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও লোকের ধারণা বদলিয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত, উন্নতিশীল বা লিবারেল সম্প্রদায় বলিতেন যে, দেশে শান্তি রক্ষা করাই গবর্ণমেণ্টের একমাত্র কার্য্য, ব্যক্তিগত বিষয় গবর্ণমেণ্টের অধিকারের বহিঃসীমায় অবস্থিত। এখন আর এই একদেশদর্শী মতের প্রতি লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই।

সমাপ্ত।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

অবিমারক

পঞ্চম অঙ্ক

কুরঙ্গী ও নলিনিকার প্রবেশ

নলি। রাজকুমারি, দুঃখ করে আর কি হবে? আসুন, (কন্যাপুরের দালানের) ছাতে উঠে নয়নরঞ্জন করা যাক।

কুর। নলিনিকা, তুমি কি আমার মনের (দুঃখ) বুঝতে পেরেছ? (আমার) অনেক সখী আমার হৃদয়রঞ্জনের জন্য বর্ষাকালে প্রীতিপ্রদ বকুল, সরল, সর্জ, অর্জ্জুন, কদম্ব, নীপ, নীচুল প্রভৃতি সুগন্ধি ফুল এনে আমার মনের উন্মাদনা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার চেয়ে দেখ, ময়ূরগুলি রাজবাড়ীর সকলের মনেই একটা যেন (পালোষানের ক্রীড়াজনিত) আনন্দ জাগিয়ে তুলছে। আমিই এগুলিকে সর্ব্বদা পুষেছি, কিন্তু দেশকালের অবস্থা না জেনে এরূপ ভাব প্রকাশ কচ্চে যেন এরাই অনেক বিষয়ে (আমার চেয়ে) অভিজ্ঞ। শুকশারিকাগুলিও গল্প বলতে আরম্ভ করেছে। আমার মনের দুঃখ না জেনে মন্ত্রী মশায়ের (ভূতিকের) শারিকাটিও সকলের বৃত্তান্তই বলব মনে করে এসে উপস্থিত হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন আমার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করে বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে। তাই আমিও মনে কচ্চি খানিকক্ষণ ছাতের উপর বসব।

নলি। রাজকুমারী, যাতে মনে সুখ হয় তাই কত্তে হবে।

[উভয়ের ছাতে আরোহণ।

কুর। নলিনিকা, ঐ দেখ এখানেও কাল মেঘগুলি বিদ্যুৎ প্রদীপ লয়ে ঘোর অনর্থের মত দেখা দিয়েছে।

নলি। রাজকুমারি, উৎকণ্ঠিত হবেন না। দেখুন, দেখুন নূতন মেঘে সূর্য্য ঢেকে গেছে, আর প্রবিরল জলধারায় গগন-তল কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

কুর। হাঁ, বাস্তবিকই আকাশ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

অবিমারক ও বিদূষকের প্রবেশ

অবি। সখা, কুরঙ্গীকে দেখছ?

অসুখ বলে অসময়ে গায়ে অগুরু ও চন্দন মেখেছে, অলঙ্কার সব খুলে ফেলেছে, লীলাবিলাস প্রকাশ কচ্চে না। আর যাঁর শরীরখানি প্রকৃতি-বশেই রমণীয় তাঁর সেই সুন্দর শরীরখানি বিচারশক্তি রহিত বেদনার ন্যায় বোধ হচ্ছে।

বিদূ। সখা তোমার কথা শুনে ভারি খুসী হলুম। তুমি সর্ব্বদাই গর্ব্ব করে থাক যে তোমার মত এমন সুপুরুষ আর নেই। কিন্তু রাজকুমারী কুরঙ্গীর প্রকৃতি-রমণীয় শারীরিক সৌন্দর্য্য তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করেছে। তবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার বিরহেই রাজকুমারী এতটা কৃশাঙ্গী হয়েছেন। কিন্তু তা'হলে কি হয়। রাজকুমারী নবীন চন্দ্রলেখার ন্যায় এ অবস্থায়ও আমাদের নয়ন-রঞ্জন কচ্ছেন।

অবি। সখা, তুমি ত ভারি পণ্ডিত হয়েছ দেখছি! ঠিক নয় কি?

বিদূ। সখা, সর্ব্বদা আমাকে দেখছ কি না, আমার বিদ্যা তোমার চোখে সাধারণ বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি আমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারবে না। আমিও এটা জেনেই এই সহরে কারুর সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা করি নি।

অবি। এখন ঔদাসীন্য দেখিও না সখা। প্রিয়তমা সর্ব্বদাই সখীদের সঙ্গে থাকেন বলে তাকে সান্ত্বনা করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। এখন ছাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে হবে।

বিদূ। বেশ কথা বলছ সখা। এস ছাতে উঠা যাক্।

অবি। সখা, বেশ সাবধানে চড়তে হবে যেন শব্দ না হয়।

বিদূ। সখা, তা আমি পারব না। উচ্ছিষ্ট না করে কি কেউ খেতে পারে? আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। তুমিই ছাতে চড়।

অবি। যদি তোমাকে ছেড়ে যাই তা হ'লে কিন্তু তোমাকে দেখতে পাবে।

বিদূ। তাই ত, এ কথা যে আমি ভুলে গিয়েছি। এ কথাটা আমায় বার বার মনে করে দিও সখা।

অবি। এদিকে এস। (উঠিয়া ও চারিদিকে দেখিয়া) সখে এই যে প্রিয়তমা কুরঙ্গী নলিনিকার সঙ্গে শিলাতলে বসে আছেন! চেয়ে দেখ,

কামদেবের প্রভাব বর্ষাকালে সইতে না পেরে তিনি (কুরঙ্গী) বাঁ হাতের উপর সুদীন মুখখানি রেখে যেন খানিক অচঞ্চল নয়নে অশ্রু নিবারণ করার জন্য উপর দিকে তাকিয়ে উন্মনস্ক হয়ে কি চিন্তা কচ্ছেন।

কুর। (স্বগত) এইভাবে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে আর ফল কি? (প্রকাশ্যে) নলিনিকা, স্নানের জিনিস নিয়ে মাগধিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

নলি। রাজকুমারীকে একাকিনী ফেলে যাওয়া কি উচিত? এখানে যে কেউ নেই!

হরিণিকার প্রবেশ

হরি। রাজকুমারীর জয় হ'ক। রাজকুমারি, রাণী মা আপনার মাথাধরা এখন কেমন আছে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন! এই ওষুধটা লেপে দিতে হবে।

কুর। নলিনিকা, তুমি এখন যাও। বৃষ্টি পড়ছে বলে বোধ হচ্ছে। বৃষ্টির নূতন জলে স্নান কত্তে আমার বড় সাধ হচ্ছে। স্নানের জিনিস নিয়ে এস, শীগ্‌গির।

নলি। রাজকুমারীর যা ইচ্ছে!

অবি। তিনি কি কত্তে যাচ্ছেন?

কুর। ওগো, এস ত?

অবি। রাজকুমারি, এই যে আমি।

কুর। নলিনিকা, তোমার শরীরটি ত বড় ঠাণ্ডা।

অবি। কি জানি, রাজকুমারি।

কুর। এস, আমাকে আলিঙ্গন কর।

অবি। আচ্ছা, রাজকুমারী। (আলিঙ্গন)

কুর। নলিনিকা, তোমার শরীর বড় মনোহর ও ঠাণ্ডা।

নলি। রাজকুমারী, তোমার কথা শুনে অনুগৃহীত হলুম।

কুর। নলিনিকা, এখন আমার গায়ের জ্বালা অনেকটা কমতে আরম্ভ করেছে। (স্বগত) সখীর সঙ্গে আলিঙ্গন করা হল। আজ থেকে (এই হতভাগিনীর) সঙ্গে আর আলিঙ্গন কত্তে পাবে না। (প্রকাশ্যে) এখন তবে তুমি যাও।

নলি। রাজকুমারীর যে আজ্ঞা! [প্রস্থান]

হরি। রাজকুমার, রাণীমাকে কি বলব?

কুরঙ্গী। বলবে, আজ আর আমার অসুখ নেই। অসুখ সেরে গেছে।

হরি। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি করে জানলে?" তা'হলে আমি কি বলব?

কুর। তুমি বেশ কথাটি জিজ্ঞাসা করেছ। বলবে এই ওষুধেই সেরে গেছে।

হরি। রাজকুমারীর যেরূপ আদেশ! [প্রস্থান।

অবি। তিনি কি কত্তে যাচ্ছেন?

কৃশাঙ্গী (কুরঙ্গী) উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ কচ্ছেন, পুনঃ পুনঃ চারিদিকে তাকাচ্ছেন। জলভরা চোখে তিনি কি কত্তে যাচ্ছেন?

কুরঙ্গী। তাই করব। গায়ের উত্তরীর দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরব (সেইরূপ করিতে গিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিয়া) কে আছ, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও!

অবি। সখে, আর ত উপেক্ষা করা যায় না (বাঁ হাতের আঙ্গুলে আংটিটি পরিয়া) প্রিয়তমে, ভয় নেই, ভয় নেই, ভয় নেই! (কুরঙ্গীকে উদ্ধার)

কুর। (সহর্ষে) যা দেখছি, তাকি সত্যি? আমি যে মুগ্ধ হ'য়ে গেছি!

অবি। প্রিয়তমে ভয় নেই (আলিঙ্গন)।

কুর। কি আশ্চর্য্য, মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার শরীরের সমস্ত জ্বালা দূর হল!

অবি। প্রিয়তমার আলিঙ্গনটি
চিরপরিচিত, গাঢ় অনুরাগ হেতু মধুরতর! অনেক অপেক্ষা করে মিলন হয়েছে বলে, কোনও নরপতি রণক্ষেত্রের শিরোদেশে সাহস-সহায়ে বিজয় লাভ কল্লে যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, আমিও ঠিক তাই কচ্ছি!

বিদূ। একি কাঁদতে আরম্ভ কল্লে যে! এত দুঃখ করে ফল কি? তবে কি আমিও কাঁদতে আরম্ভ করব না কি? এটা কিন্তু আমার পক্ষে বড় দুর্লভ! আমার চোখ থেকে কখনও জল বেরোয় না। বাবা যখন মারা যান, অনেক চেষ্টা করে কাঁদতে আরম্ভ কল্লুম বটে, কিন্তু চোখের জল বেরুল না! অন্য দুঃখে কি আর চোখের জল বেরুবে। যাক্, ইচ্ছা না থাকলেও কাঁদতে আরম্ভ কত্তে হবে!

অবি। ঠাট্টা এখন রেখে দাও। ভালবাসায় কুটিলতা থাকে না!
তোমার বুদ্ধির নিন্দা আমার করা উচিত নয়, তাতে আমিই উপহাসের পাত্র হব। বুদ্ধিমান আর মূর্খ ব্যক্তি দুজনেই যখন কোন কাজে লিপ্ত হয়, তখন সূক্ষ্ম বুদ্ধি দুজনেরই সমান ভাবে প্রকাশ পায় না।

নলিনিকার প্রবেশ

নলি। হরিণিকা, হরিণিকা দরজা বন্ধ কেন?
মনে হচ্ছে দরজা বন্ধ করে সকল দুঃখ দূর কচ্ছেন। হরিণিকা, হরিণিকা কি হল! তাই বুঝি ঘটেছে!

অবি। নলিনিকার কণ্ঠস্বর না? সখা, দরজা খোল।

বিদূ। তোমার যা ইচ্ছে! আসুন, আসুন।

নলি। একি! এখন এখানে পুরুষ এল কোথা থেকে?

বিদূ। আপনি ঠিক বুঝেছেন। এই হচ্ছে রাজবংশের বিশেষত্ব! অন্তে দেখে কি আমাকে পুরুষ বল ত? আমি একটি স্ত্রী!

অবি। নলিনিকে, আসুন, ঘরের ভিতর আসুন।

নলি। কে! রাজকুমার! রাজকুমার, প্রণাম গ্রহণ করুন।
এই লোকটি কে?

বিদূ। আমি একজন পরিচারিকা—নাম পুষ্করিণী।

অবি। আমি সর্বদা যে সন্তুষ্টের নাম করে থাকি ইনি সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট।

নলি। হাঁ, নগরের বড় দালানের বাইরের দরজার প্রকোষ্ঠে ওঁকে পূর্ব্বেও দেখেছি।

বিদূ। হাঁ, ঠিকই! পৈতা আছে বলে ব্রাহ্মণ। কিন্তু লাল কাপড় পরেছি বলে জল্লাদ *। গায়ের কাপড় খুলে ফেল্লে শ্রমণক হয়ে পড়ব। আচ্ছা, এগুলি কি বলুন ত?

নলি। রাজকুমারীর স্নানের জিনিস!

বিদূ। যিনি ক্ষুধা পেয়েছে বলে কাঁদছেন, তাঁকে এ সকল স্নানের জিনিস দিয়ে কি দরকার? যাও, শীগগির খাবার নিয়ে এস।
(পংক্তির) প্রথম আসনটিতে আমিই বসব।

নলি। দুর্ব্রাহ্মণ, (এখনও) এই খাবার কথা ভাবছ। আচ্ছা এ সকল কথা থাকে। বলুন ত, রাজকুমার, দিনের বেলায় রাজপথে এত লোক, এর মধ্যে কি করে (কন্যাপুরে) ঢুকলেন।

অবি। সন্তুষ্টই আপনাকে সকল কথা বলবে এখন।

নলি। এইরূপে সম্মানের কথা বলে আমাকে বিদায় কল্লেন! আচ্ছা যাই, ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করে আঙ্গিনায় (চতুঃশালে) গিয়ে সকলের সঙ্গে বসে এই বৃত্তান্তটা শুনি গিয়ে। বামুন ঠাকুর, এস আমার সঙ্গে।

বিদূ। ব্রাহ্মণ বধ হল! ব্রাহ্মণ বধ হল!

কুর। এই ব্রাহ্মণ ত বড় লোক-হাসানে।

অবি। সখা, বাস্তবিকই তুমি লোক-হাসানে।

বিদূ। কে এমন কথা আমাকে বলতে পারে! আমি লোক-হাসানে! আমি লোক-হাসানে নই, রাজকুমারীই লোক-হাসানে। নিজের অবস্থা বুঝে একটা অকার্য্য কত্তে গিয়ে মেঘের ডাকে সব ভুলে

* রক্তপটঃ=জল্লাদ, সন্ন্যাসী।

গিয়ে পড়ে গেলেন! তিনি আবার বলছেন, আমি লোক-হাসানে।

কুর। এরা কি এটাও দেখেছে।

নলি। থামুন ঠাকুর, তোমাকে অনুনয় কচ্ছি। এখানে এস।

বিদূ। যদি খেতে দাও যেতে রাজি আছি। অতিথিকে খেতে দাওয়াই ভাল। এতে মঙ্গল হয়।

নলি। এস, আমার সব অলঙ্কার তোমায় দেব।

বিদূ। ঘির নাম শুনে পিত্ত নষ্ট হয় না। আমার হাতে দাও তা হলে।

নলি। আচ্ছা। [অলঙ্কার খুলিয়া প্রদান।

বিদূ। আপনি তা হলে শুনুন।

নলি। মুর্খ ব্রাহ্মণ, আঙ্গিনায় সকলের সঙ্গে বসে তবে শুনব।

বিদূ। রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করে আসি তবে।

নলি। তুমি ত বেশ লোক দেখছি! আমার সমস্ত অলঙ্কার হাতে করে গাঁট হয়েছ! শীগ্‌গির এস। [বিদূষকের হস্ত গ্রহণ।

বিদূ। দেখুন, এমন কথা বলবেন না। আমি বড় ভাল লোক।

নলি। হাঁ, জানি তুমি ভাল লোক। ভাল লোক হলে শীগ্‌গির এস।

বিদূ। এই যাচ্ছি, আমি। (উভয়ে প্রস্থান।

অবি। প্রিয়তমে, চেয়ে দেখ বর্ষাকালের কাল কাল মেঘগুলি কেমন সুন্দর!

এই নীল মেঘমালা নৃত্যগীতকুশলের মত নানা ভাবে বর্ষাকালের আগমন ঘোষণা কচ্ছে! এরা দেবরাজের (সকৃৎ প্রসূতা) গাভীগুলির মত! নক্ষত্রমালার যবনিকা-স্বরূপ তড়িৎরূপ সর্পের মত, বল্মীকাবাসের মত, আকাশ, পথের ঝোপের মত, কন্দর্পদেবের শর ধার দেওয়ার পাথরটির মত, পাহাড় স্নান করাবার কলসীর মত, সমুদ্রসলিলরাশির হারের মত, রবি ও ইন্দুর অর্গলের মত, (আকাশের) কোয়ারার মত।

কুরঙ্গী। হাঁ, আর্য্যপুত্র এখন সুন্দর দেখাচ্ছে বটে।

অবি। কি চমৎকার! বৃষ্টির ধারা বিপুল অথচ বিরল! আকাশ-সমুদ্রের উর্ম্মির মত মেঘগুলি গর্জ্জন কচ্ছে! জলধারা মেঘের অঙ্কুরের মত পড়্‌ছে! রাক্ষসীর ভ্রূকুটির মত বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছে! প্রথম যৌবনের ধনভুত কাল সমুপস্থিত হয়েছে!

কুর। আর্য্যপুত্র, বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হল!

অবি। প্রিয়ে! এস ভিতরে যাই।

কুরঙ্গী। (সহর্ষে) আর্য্যপুত্রের যা ইচ্ছা। [উভয়ের প্রস্থান]

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় অস্ত্র চিকিৎসা *

প্রদাহ ও সদ্যব্রণ। ব্রণ উৎপত্তির কারণ— আঘাত জন্য অথবা আগন্তুক বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে বায়ু কর্ত্তৃক উক্ত স্থানে যন্ত্রণা হয়; পিত্ত কর্ত্তৃক পাকিয়া উঠে; এবং কফ কর্ত্তৃক তাহাতে পূযঃ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব প্রদাহ পরিপাক কালে, বায়ু, পিত্ত, কফ, তিন দোষই প্রদাহকে পরিপাক করে। বায়ু সর্ব্বব্যাপির পরিচালক বলিয়া, বিভিন্ন কারণে বায়ু কুপিত হইয়া স্থানবিশেষের শোণিতগতি বৃদ্ধি করিয়া দেয়, এবং সেই কারণেও তত্রত্য রক্তবহা নাড়ী ফুলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্নায়ু ও অপরাপর গঠনাবলিতে চাপ প্রদান করে; তাহাতে ঐ সমস্ত গঠনাবলীও ঐ প্রকারে কুপিত হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং উত্তেজিত স্থান উঁচু হইয়া উঠে।

ব্রণের তিনটী অবস্থা—আম, পচ্যমান, ও পক্ক।

আম অবস্থা—স্থিতিকাল তিন হইতে সাত দিবস, কিন্তু সান্নিপাতিক বা বিসর্পিত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেও পচ্যমান অবস্থা আরম্ভ হইতে দেখা গিয়াছে।

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

লক্ষণ—ফুলা, গরম, বেদনা, কাঠিন্য, ও চর্ম্মের বর্ণের সামান্য ভাবে পরিবর্ত্তন। বাত জনিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ, খস্‌খসে, স্থানে স্থানে কোমল এবং চঞ্চল হয়, টাটানী বা সূচীবিদ্ধনবৎ বেদনা অনুভূত হয়। পিত্ত প্রধান হইলে গাঢ় লাল বা পীতাভ, শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত, ও শীঘ্র প্রসরণশীল হয়। কফ জনিত হইলে পাণ্ডু বা কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন, স্নিগ্ধ, চুলকানী যুক্ত হইয়া থাকে।

কোষ সকল অত্যধিক রক্তপূর্ণ হয়, পার্শ্ববর্ত্তী স্নায়ু সমূহে চাপ পড়িয়া বেদনার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পচ্যমান অবস্থা—এই অবস্থায়ই প্রদাহের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ, রক্তবহা নাড়ীসমূহ সজোরে পূর্ণ হইয়া গেলেই এই ক্রিয়া মন্দীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকেই স্তম্ভন বলে। এই স্তব্ধভাব প্রথমতঃ শিরাসমূহে আরম্ভ হয়, পরে ধমনীতেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় রক্ত-কণিকা সকল রক্তবহানাড়ীগুলি বিদারণ পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তি মাংসের গঠনাবলীতে পতিত হইয়া সেই স্থলও এইভাবে আক্রমণ করায় প্রদাহের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে; এই সময় আম অবস্থার লক্ষণাবলী ব্যতীত প্রদাহের স্থলে পীপীলিকা দংশন বা সঞ্চলনবৎ অনুভূত হয়। পীড়িতস্থান অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ অথবা অগ্নি বা ক্ষার দ্বারা দগ্ধ হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রোগী, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কোন অবস্থাতেই শান্তি-প্রাপ্ত হয় না। প্রদাহিত স্থান অতিশয় উচ্চ হইয়া উঠিলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা ও অরুচি হইয়া থাকে।

পক্ক অবস্থা—এই অবস্থায় বেদনা কমিয়া যায়। ফুলা অপেক্ষাকৃত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পীড়িত স্থানের উপরিভাগের ত্বক্, পাণ্ডুবর্ণ ও বলির ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়। অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে টোপ্ পড়ে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় উচুঁ হইয়া উঠে। জ্বর, পিপাসা, দাহ প্রভৃতি উপসর্গ কমিতে থাকে, কোন কোন স্থলে চামড়া ফাটা ফাটা হইয়া পচ্যমান রেখা অঙ্কিত হয়। ব্রণের উপরি দুই হস্তের অঙ্গুলী স্থাপন পূর্ব্বক, এক হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা চাপ প্রদান করিলে অপর হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা ব্রণ মধ্যে দ্রব বস্তুর অনুভূত হয়। এই অবস্থায় পুঁজ নিঃসৃত না হইলে, পুঁজ সর্ব্বশরীরে শোষিত হইয়া ক্ষয়-জ্বরের আক্রমণে রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। অনেক কফজ ব্রণে এইসকল লক্ষণ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলিয়া, অপক্ক ব্রণকে পক্ক, ও পক্ক ব্রণকে অপক্ক বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। ইহা নির্ণয় করিবার জন্যই চিকিৎসকের বিশেষ অভ্যাস ও শিক্ষার প্রয়োজন।

বিসর্পিত অবস্থা—কফই শরীরের জলীয় অংশ ও পুঁজ উৎপত্তির কারণ। কিন্তু পিত্তের দ্বারা কফ একেবারে ধ্বংস হইয়া গেলে, ব্রণ বিসর্পিত অবস্থায় পরিণত হয়। পিত্তের সহিত বায়ু প্রবল থাকিলে, প্রদাহিত স্থান দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় হইয়া যায়, তাহাতে কোন প্রকার পুঁজ বা ক্লেদ বর্ত্তমান থাকে না। ইহাকেই বাতপিত্ত বা অগ্নি বিসর্প বলিয়া থাকে। যদি কফ বিকৃত অবস্থায় থাকিয়া পিত্তকে প্রশমিত করিয়া পুঁজ উৎপন্ন করিতে না পারে, তবেই পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। ইহাতে প্রথম অবস্থায় পুঁজ থাকে না, কিন্তু রক্তমিশ্রিত ক্লেদ বিদ্যমান থাকে। এই উভয় প্রকার অবস্থাই সান্নিপাতিক। ইহা দেখিলে সহজেই নির্ণয় করা যায়। রোগী ভয়ানক জ্বালা পোড়া ও টাটানী অনুভব করে। প্রবল জ্বর, দাহ, অন্নে অরুচি, এবং অনিদ্রা হইয়া থাকে। শরীরের জলীয় ভাগ হ্রাস হইয়া, গাত্র, জিহ্বা, ওষ্ঠ প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায়, প্রবল পিপাসা থাকে, এবং কোন কোন স্থলে হিক্কাও হয়। মধুমেহ, প্লীহা অথবা শোথ বা রক্তের অল্পতা ঘটিলেও ব্রণের স্থান পচিতে আরম্ভ করে।

চিকিৎসা—আম অবস্থা। এই অবস্থায় কুপিত দোষের সমতা বিধান করিয়া রক্তের গতি হ্রাস, এবং স্নায়বিক উত্তেজনা থাকিলে, তাহার প্রশমন করিতে হইবে। ইহাই আম অবস্থার চিকিৎসা। জ্বর, ও কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, তৎ-প্রতীকারেরও চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু যদি দোষ সকল স্বীয় স্বীয় স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রশমিত হইতে থাকে

তবে বিশেষ কোন চিকিৎসার আবশ্যক হয় না। জানিতে হইবে, প্রকৃতির নিয়মেই দোষ সংশোধিত হইতেছে। এরূপ স্থলে ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ই বিপরীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পিত্তঘ্ন শীতবীর্য্য প্রলেপ বা পুলটীশই ব্যবহার করিবে। অনেক স্থলেই কাঁচা মলমের পটীতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। কাঁচা মলম স্নিগ্ধ ও মধুর গুণ বিশিষ্ট। পুলটীশ এবং প্রলেপাদিতে আশানুরূপ ফল না হইলে রক্তমোক্ষণের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু রক্ত মোক্ষণ না করিয়া পারিলেই ভাল হয়। ইহাতে রোগীর শরীরে রক্তাভাব ব্যতীতও শিরাবন্ধ করা অথবা জলোকা প্রয়োগের উত্তেজনায় প্রদাহ অনেক সময়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ই; তাহা ব্যতীত রক্তস্রাব আদি অন্যান্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। অনিবার্য্য কারণে রক্তমোক্ষণ একান্তই আবশ্যক হইলে, শুশ্রুতের প্রণালী মতে জলোকার শ্রেণী-বিভাগ ও শিরাবিদ্ধ করিবার উপায় আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে। অত্যধিক স্নায়বীয় উত্তেজনা বিদ্যমান থাকিলে রুক্ষ ও উত্তেজক প্রলেপ, যথা, আদা, সজিনার ছাল, কুড় ইত্যাদি ফলোপধায়ক হয়। কিন্তু তাহা না হইলে স্তম্ভন অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া পড়ে, এবং যে সকল মাংসাঙ্কুর গলিয়া পুঁজ উৎপন্ন হয়, তাহা শুষ্ক হইয়া পুঁজ উৎপাদনে বিলম্ব ঘটায়। এবম্ভ পুঁজ হইলেও সামান্যমাত্র পুঁজ গহ্বরে সঞ্চিত হইয়া প্রদাহের অবশিষ্টাংশ শক্ত হইয়া যায়। ফলে, ব্রণে অস্ত্র প্রয়োগের পরে যে ক্ষত হয়, তন্মধ্যেই সুস্থ মাংসের পরিবর্ত্তে ফাঁপা জলীয় মাংসাঙ্কুর দৃষ্ট হয় বলিয়া ক্ষত আরোগ্য হইতে দীর্ঘ সময় আবশ্যক হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলেই অধিকাংশ সময়, ব্রণ, নালীতে পরিণত হয় এবং ঐ নালীর মধ্যেও ফাঁপা মাংসাঙ্কুর থাকার জন্য ইহা আরাম করাও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। আম অবস্থায় গরম প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একমাত্র বাতশ্লেষ্মজ প্রদাহ হইলে গরম পুলটীশ ও প্রলেপাদি প্রদান করা যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে শৈত্য ও শীতবীর্য্য প্রলেপাদি ব্যবহার করিলে পুঁজ উৎপত্তিকালে সহজেই পচনে পরিণত হইতে পারে। আম অবস্থায় বেতের অগ্রভাগ ও তিলের শাঁসের পুলটীশই সমধিক ফলপ্রদ। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ বা পারুল ছাল, পাটপাতা, কাজী ঘৃত ও তিল আদির পুলটীশ ও প্রলেপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীকে বিশ্রামে রাখিবে। শরীর যাহাতে রুক্ষ হইতে না পারে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহা করিতে হইবে। পথ্য লঘু এবং বলকারক হইবে।

পচ্যমান অবস্থা—সহজে আম অবস্থা প্রশমিত না হইলে যত সত্বর পচ্যমান অবস্থা আরম্ভ হয় ততই মঙ্গল। এই অবস্থায় পিত্ত সমধিক প্রকুপিত হইয়া থাকে বলিয়া পিত্তের প্রকোপে ব্রণ যাহাতে বিসর্পিত অবস্থায় পরিণত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কাঁচা মলমের পটী ও তিল বেতাগের পটী এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। ইহাতে কথনই ব্রণ বিসর্পিত অবস্থায় পরিণত হইতে পারিবে না। অধিকন্তু প্রদাহ সংকুচিত হইয়া পুঁয উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে, তিষি, ময়দা, তিল, ও থৈ প্রভৃতির পুলটীশও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই ঈষদুষ্ণ ঘৃত প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোটের উপরে কফবর্দ্ধক প্রলেপ ও পুলটীশ ব্যবহারেই প্রদাহের বিস্তৃতি কমিয়া গিয়া পিক্ এক স্থানে সংগৃহীত হইবে। এই সময় দধি, শিমূলের ছাল এবং পক্ক কদলীর পুলটীশ অব্যর্থ ফলপ্রদ। নিম্বপত্র, তিল, দন্তি, উচ্ছে, হেলেঞ্চা, তুলসীপত্র, যজ্ঞডুমুর, ধাইফুল প্রভৃতির প্রলেপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগীকে বিশ্রামে রাখিবে। এই অবস্থায় ছেদন করিলে শিরা, স্নায়ু, অস্থি অথবা সন্ধিস্থল বিদ্ধ এবং ছিন্ন হইয়া থাকে, প্রদাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ এই অবিবেচক চিকিৎসককে "চণ্ডাল" বলিয়া গালি প্রদান করিয়া থাকেন। জ্বরের জন্য বিশেষ কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া স্বাভাবিক স্নান ও আহার প্রদান করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক।

পক্ক অবস্থা—ব্রণ এই অবস্থায় উপনীত হইলে, দধি, শিমূলের ছাল, পক্ককদলী অথবা আলুর পাতা বা পুঁইশাকের পত্র দ্বারা অর্থাৎ পিচ্ছিল পদার্থ দ্বারা পুলটিশ বা প্রলেপ দিলে

ব্রণ সংকুচিত হইয়া পিক-গহ্বরে নিয়মিত হইয়া আসিবে, বাত প্রধান হইলে তৈলের সহিত, শ্লেষ্মাপ্রধান হইলে ঘৃতের সহিত, এবং পিত্তপ্রধান হইলে উভয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপাদি প্রয়োগ করিতে হইবে; এবং পিক্-গহ্বরের বাহিরে তাহার পরিধি স্পষ্ট অনুভূত হইলে অস্ত্র-প্রয়োগের দ্বারা পূঁজ নিষ্কাশিত করিয়া ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হইবে।

রোগী অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে ভীত হইলে পিকের চাপ বৰ্দ্ধিত হইয়া পিকগহ্বরের উপরিস্থ আবরণ যাহাতে ছিন্ন হইয়া যায়, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই জন্য দুইটি প্রণালী বিহিত হইয়া থাকে। প্রথমটি পিকের চাপ বৰ্দ্ধিত করণ; দ্বিতীয়টী পিকের গহ্বরের উপরিস্থিত চামড়া যাহাতে ধ্বংস হইয়া যায়, এরূপ ক্ষার-প্রয়োগ আদি অবলম্বন। দুই প্রণালীই প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর ও রোগের অবস্থা এবং নালী অথবা বিসর্পিত হইবার কারণ আছে কিনা, বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে হইবে। অস্ত্রপ্রয়োগই বহু প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ ও সমধিক ফলোপধায়ক। এই অবস্থায় অস্ত্রপ্রয়োগে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে শাস্ত্রকারগণ তাহাকে বিশেষ নিন্দার ভাজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে পূঁজ নিঃসরণ না হইলে তাহা শরীরে শোষিত হইয়া ক্ষয়জ্বরে রোগী ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। প্রদাহের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন স্বাভাবিক গহ্বর অথবা যন্ত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলে উহা নষ্ট হইয়া, অথবা অস্থি কিম্বা সন্ধিস্থল বর্ত্তমান থাকিলে ক্রমান্বয়ে উহা পূঁজ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া চিকিৎসা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

অতসী ফুল।

আমার অতসীরাণী, আমার প্রেয়সী,
বিজন গহনবনে কনকরূপসী।
অচেনা দেশের কোন্ অজানা কাহিনী,
অদেখা বীণার কোন্ অশোনা রাগিণী,
শুনাইতে তুমি আজি হৃদি-মূলে মম
নীরবে উঠেছ ফুটি? আত্মহারা সম
একাকী ভ্রমিতেছিনু নিঝুম সন্ধ্যায়
কার ধ্যানে ডুবি যেন শ্যাম পত্রছায়
শ্যাম সোহাগিনী হেন ঈষৎ হাসিয়া
ইঙ্গিতে ডাকিলে মোরে! তৃষ্ণাতুর হিয়া
লভিল অমিয়া বুঝি! আনন্দে শিহরি'
হেরিলাম যার লাগি দিবসশর্ব্বরী
ফিরিতেছি শূন্য মনে, সেই তুমি হায়,
মাগিতেছ বাহুপাশে একান্তে আমায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সাহিত্যে জয়দেব।

(রঙ্গপুর উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)।

একদিন পবিত্র তমসা নদী তীরে বাল্মীকির পূতকণ্ঠ-গর্ভোচ্চারিত "মা নিষাদ—" রবে যে সাহিত্যের উদ্বোধন সূচিত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ সভায় কাকপক্ষ কুশীলবের কলকণ্ঠগীতিতে যাহার উন্মেষ, বাণীবরপুত্র কালিদাসপ্রমুখ মহাকবিগণের হস্তে যাহার পূর্ণাভিব্যক্তি, জয়দেবের সুললিত অমৃতপদ সঙ্গীত হইতেই তাহা কালগর্ভে লীন হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি ভারত-মন্দিরে যে বাণী-প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মহাকবি ভবভূতিপ্রমুখ মনীষিগণের সুগন্ধি কাব্যকুসুমে দীর্ঘ শতাব্দি যাবৎ অর্চ্চনার পর জয়দেব যে তাঁহার ভক্তি-সঙ্গীতের অমৃত-হ্রদে সে প্রতিমার বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার নিন্দার কিছুই নাই। ইহা মহাকালের কুটিল প্রেরণা, তিনি নিমিত্তমাত্র—অথবা, ইহা ভাষাজননীরই ইঙ্গিতানুসারে সম্পাদিত, বলা যাইতে পারে। আমরা বিজয়া দশমী দিনে সৌধমন্দিরের ব্যাকুলকরা শূন্যতার মাঝখানে ভগ্ন সাহিত্যের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহার কঙ্কাল স্থাপনা করিয়া পূর্ণবৎসরের আশায় বসিয়া রহিয়াছি।

জানি না, এ পূর্ণবৎসর আবার কবে আসিবে, আবার কবে আমরা এ মন্দিরে পূর্ণ প্রতিমার সাক্ষাৎ পাইব।

জয়দেব বাঙ্গালার কবি—এ কথা বলিলে জয়দেবকে বাঙ্গালা ভাষার কবি বলিয়া বুঝা যায় না। যে বাক্যের প্রতিপদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আপন হৃদয়ে গৌরবের একটা গুরু স্পন্দন অনুভব করে, জয়দেব সেই বাঙ্গালা দেশের কবি। বাঙ্গালী যে জয়দেবের নিকট শুধু কাব্য নহে, স্বর্গীয় ভগবৎ প্রেম ও ভক্তিলাভ করিয়া বিশ্বকে আপনার করিয়া লইতে শিখিয়াছে, সেই প্রেমিক ভক্ত কবি জয়দেবকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে বলিয়া বঙ্গভূমি আজ পর্য্যন্তও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা বর্দ্ধন করিতেছেন। ভক্তকবি জয়দেবের জীবনী সম্বন্ধে আপনারা অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছেন; সুতরাং আমি এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিব সে ইচ্ছা আমার নাই। ভক্ত কবির কাব্য হইতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, আমি তাহারই অবতারণা করিয়া বাস্তবের ভিতর হইতে প্রাচীন সত্যের উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী—প্রথমতঃ "শ্রীভোজদেব-প্রভবস্য বামাদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য। পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্ত।" কবির এই শেষ সঙ্গীতে আমরা তিন ব্যক্তির নাম পাই। শ্রীভোজদেব কবির পিতা, বামাদেবী জননী, এবং পরাশর তাঁহার প্রিয় বন্ধু। প্রবাদ আছে, বামাদেবী জয়দেবকে শৈশবাবস্থায় স্বামীর হস্তে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। আর যিনি বিশ্ব-প্রেমিক তাঁহার নিকট "বসুধৈব কুটুম্বকং"; সুতরাং তাঁহার পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুগণের উপরই শুধু তাঁহার কাব্যের কবিত্ব নির্ভর করে না। তাঁহার ভক্তশিষ্য বৈষ্ণব বাঙ্গালীর উপরও প্রকারান্তরে ইহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গে "কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণেন"—এই শ্লোকে জয়দেব তাঁহার জন্মস্থানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন্দুবিল্ব তাঁহার জন্মস্থান ও আবাস-ভূমি। কেন্দুবিল্বের আধুনিক নাম কেন্দুলি। ইহা বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরে অবস্থিত। শোনা যায়, সেখানে কবিপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের অদ্যাপি সেবা হইয়া থাকে, এবং প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে বৃহৎ মেলার অনুষ্ঠান হয়।

কবিবরের কাব্যের প্রথমেই আমরা তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজনের পরিচয় পাই। কবি বলিয়াছেন,—

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরঃ ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।"

জয়দেব এই শ্লোকে তাঁহার সমসাময়িক কবি উমাপতিধর, শরণ গোবর্দ্ধনআচার্য্য এবং কবিরাজ ধোয়ীর নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার এই প্রশংসাকে ব্যাজস্তুতি মনে করিয়া কাব্যোৎকর্ষে কবির অহংকারিত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে ভক্ত জয়দেবের উচ্চ আদর্শ চরিত্রকে অনেকটা নীচতার ভিতরে ফেলিতে হয়। শব্দের অর্থকে কুটিলতার ভিতরে টানিয়া আনিয়া প্রকাশ করায় টীকাকার-গণের পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব ভক্তকবি জয়দেবের সরল চিত্তে অন্যের কাব্যোৎকর্ষ দর্শনে ঈর্ষার আরোপ করা তাঁহাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না। অন্য কবির এরূপ কবিত্ব প্রশংসায় জয়দেবের সাত্ত্বিক হৃদয়ের বৈষ্ণবসুলভ "তৃণাদপি সুনীচত্বই প্রকাশ পায়, এবং ইহা তাঁহার দীনতারই পরিচায়ক। কবিবর উমাপতিধর, শরণ গোবর্দ্ধনাচার্য্য, এবং কবিরাজ ধোয়ীর সঙ্গে জয়দেব সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন এইরূপে প্রসিদ্ধি।

তারপর শ্রীগীতগোবিন্দের দশম সর্গে শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন-ছলে জয়দেব তাঁহার গম্ভীর পরিচয় দিয়া গাহিয়াছেন,

ইতি চটুলচাটুপাটুচারুমুরবৈরিণো
রাধিকাবচনমধিজাতং।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবি-
ভারতী ভণিতমতিশাতং।”

পদ্মাবতী তাঁহার পত্নীর নাম। পদ্মাবতীর পিতা দক্ষিণ বঙ্গের একজন দরিদ্র হরিভক্ত ব্রাহ্মণ। অপুত্রক ব্রাহ্মণের ভগবানের নিকট করুণ প্রার্থনার ফলে পদ্মাবতীর জন্ম হয়। পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আদেশে পিতা জয়দেবের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। আশৈশব সংসারত্যাগী জয়দেব যখন অজয় নদীর কূলে ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে হরি নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, হরি-নামানুকীর্ত্তনই যখন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তখন এই নদীকূলে পদ্মাবতী তাঁহার নয়নপথে প্রথম পতিত হয়। এই খানেই তাঁহার ভক্তি-কোমল চিত্তের কঠোর পরীক্ষা। কামিনীকাঞ্চনত্যাগী হরিভক্ত সন্ন্যাসীকে দেবাদেশে আবার গৃহী হইতে হইবে। তাই তিনি দেবা-দেশ শিরে ধারণ পূর্ব্বক পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিয়া সংসারী হইলেন। ইহা আধুনিক সাধারণ গৃহস্থের সংসার নহে। এ সংসার তাঁহার সংযমের হানি করিতে পারে নাই। তিনি পবিত্রতা, সরলতা ও সংযমের মাঝখানে তাঁহার সংসার পাতিলেন। তৎকালীন বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহাদের এই পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করেন। এতদিন যে ভক্তি বুকে ধরিয়া তিনি প্রহ্লাদের ন্যায় শৈশবে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, এতদিন যে ভক্তি তাঁহাকে সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আনন্দের বিমল রাজ্যে লইয়া যাইতেছিল, আজ সেই ভক্তির সঙ্গে পদ্মাবতীর প্রেম সম্মিলিত হইয়া জয়দেবের চিত্তে প্রয়াগ তীর্থের সৃষ্টি করিল এবং তত্রত্য অক্ষয় বটস্বরূপ গীত-গোবিন্দ আজ পর্য্যন্ত সে তীর্থের মহিমা বিস্তার করিতেছে। পদ্মাবতীর সঙ্গে হরি-মন্দিরে এবং হরিভক্ত বঙ্গবাসীর দুয়ারে দুয়ারে তাহার গভীর প্রেমাভিব্যঞ্জক গীতগোবিন্দের ললীত পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া এবং অজয় নদীর কূলে প্রাপ্ত শ্রীরাধামাধবের সেবায় তিনি তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার এই সেবার ভার গ্রহণ করেণ। সে আজ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির পূর্ব্বের কথা।

কাব্যবর্ণনা—তারপর তাঁহার কাব্যের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে যে ব্রজলীলার বর্ণনা করিয়াছেন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাহারই এক খানা ভাষ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের উপর ব্রজ-গোপীগণের জীবত্ব-বুদ্ধিকেই কেন্দ্র করিয়া জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে শ্রীরাধিকার প্রেমময়চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কাব্য সাহিত্যের যাহা কিছু মধুর ও উৎকৃষ্ট উপাদান, সেই উৎকৃষ্ট প্রসাদগুণ বৈদর্ভী রীতি অনুসারে গীতগোবিন্দ রচিত হয়; এবং এ রচনায় কবির ভাব-গাম্ভীর্য্য ছন্দ ও সকল রচনার কুশলতাই প্রকাশ পায়। কাব্যে শৃঙ্গার রসের আধিক্য হেতু বর্ত্তমান সমাজের রুচি বিরোধী বলিয়া অনেকেই গীতগোবিন্দকে অবহেলা করেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এ বিষয়ে কবিকে আমরা দোষী বলিয়া মনে করিতে পারি না। ভাব-সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া কবি সরল হৃদয়ে প্রেম ও ভক্তি সূত্রে যে মালাটি রচনা করিয়া তাহার অভীষ্ট দেবতার গলায় পরাইয়া দেয়, সমাজের তলে থাকিয়া কলুষপঙ্কিল হৃদয়ে আমরা তাহা ব্যর্থতার মাঝখানে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করি, এ দোষ কবির, না, আমাদের? গীতগোবিন্দ সংযমীর কাছে অমৃত, ভোগীর নিকট গরল; ইহা প্রেমিকের নিকট প্রিয়, ভক্তের অশ্রুজল, বিষয়ীর সম্ভোগ, ত্যাগীর জ্ঞান, সাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার সমন্বয়—

সংস্কৃতভাষা একদিন বাঙ্গালীর মাতৃভাষা ছিল; বাঙ্গালী এ কথা এক রকম ভুলিয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গালায় থাকিয়া বাঙ্গালী যে ভাষাকে আপন করিয়া লইয়াছে সেই বঙ্গভাষা সংস্কৃতভাষা হইতে সমুদ্ভূত। জয়দেব গীতগোবিন্দে শব্দের সারল্য-সম্পাদনে এ কথার আভাস দিয়া গিয়াছেন। গীত-গোবিন্দ হইতে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুস্বার বিসর্গগুলির লোপ করিলে সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভূত হয় না। তাহাকে দীর্ঘ সমাসের অনুবন্ধনে রাখিয়া জয়দেব তাহাও আবার অনেকটা কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টার ফলে তাঁহার কাব্যে সমাস-বাহুল্য দোষ ঘটিতে পারে, সত্য, কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে তিনি যে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বাঙ্গালীর একটা মহৎ গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

ভাব ও ঝঙ্কার—ভাব ও ঝঙ্কারের সমসমাবেশে কাব্যের মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হয়; তাই আমরা কবি কালিদাসের মেঘ-দূতকে উচ্চস্থান দান করিয়াছি। তাই মেঘদূত এত সুন্দর। আর জয়দেবের গীতগোবিন্দও এই সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অনেকে গীতগোবিন্দকে শ্রীহর্ষের নৈষধের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন; ইহা বাঙ্গালার কবি জয়দেবের পক্ষে গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু নৈষধের অনেক স্থলে দেখা যায়, কবি ঝঙ্কারের অন্তরালে ভাব স্থাপনা করায় ভাব আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। গীতগোবিন্দের ভাব ভক্ত-হৃদয়ে অমৃত-হ্রদের সৃষ্টি করে। ঝঙ্কার সে স্থির—প্রশান্ত হ্রদে তরঙ্গ তুলিয়া ভক্তকে ভগবানের জন্য ব্যাকুল করিয়া তোলে। ইহাই গীতগোবিন্দের বিশেষত্ব। যাঁহারা গীতগোবিন্দ প্রাণ দিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা স্পষ্টই অনুভব করিয়াছেন।

প্রেম ও ভক্তির একত্র সম্মিলন—

গীতায় প্রেমের সহিত ভক্তির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিতেন, যে শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র অদর্শনে আপনাকে শক্তিহারা মনে করিতেন, অবশেষে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যাঁহাকে চিরদিনের জন্য আপনার করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্ময়ে ভয়ে মহাবীরের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল। তাই তিনি বিহ্বল হৃদয়ে ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিলেন;—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং॥"

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এই মহৎ ভাব প্রেমের ভিতর দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না। বিস্ময়-বিহ্বলতায় ভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গীতায় এই খানেই প্রেম ও ভক্তির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ভক্ত প্রেমিক জয়দেব ভক্তির সহিত প্রেমের সংমিশ্রণ করিয়া হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মহান দশাবতারের বিরাট রূপরাশি বুকে ধরিয়া যে জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রথমেই ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

"প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদং।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।" ইত্যাদি,

তিনিই আবার কাব্যের দশম সর্গে প্রেমপুলকিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের ভাবে গাহিয়াছেন,

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং'।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র কাব্যতীর্থ।

বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা

সূচনা—ইতিহাসের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আখ্যান বা গল্পই এই বিষয়টির ভিত্তি। ইতিহাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ History। এই শব্দটি দুই খণ্ড করিয়া Story শব্দটি পাওয়া যায়, সুতরাং ইহা হইতেও Story বা গল্প যে ইতিহাসের ভিত্তি, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটলের প্রাণি-বিজ্ঞান আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি প্রথমতঃ প্রাণী-বিষয়ক কতকগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এইরূপ বিষয়-সংগ্রহ হইতে সাধারণ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে হয়, তাঁহার মতে ইহাই ইতিহাস। বাস্তবিক ইতিহাসের ইংরেজি প্রতিশব্দের (History) ব্যুৎপত্তি (Historia) পর্য্যালোচনা করিলেও এই ধারণাই আমাদের মনে আসিয়া থাকে। ইতিহাসের (History) মূল হিষ্টরিয়া (Historia) শব্দ কোনও বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহের অনুসন্ধানকেই বুঝাইয়া থাকে (Enquiry of any kind) আরিষ্টটল ইতিহাস বা History যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, পণ্ডিত প্লিনিও (Pliny) ইতিহাস সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' নামকরণটি প্লিনিই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ইতিহাসের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আরিষ্টটলেরই মতাবলম্বী।

বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস বলিলে মানব-সমাজের ঘটনা-সমষ্টিকেই বুঝাইয়া থাকে, এবং প্লিনিই প্রথমে ইতিহাস এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই সকল বিষয় বিচার করিয়া বলিতে পারা যায় যে, মানবজাতির অতীত ঘটনা লইয়াই ইতিহাস। সূক্ষ্মভাবে ইতিহাস বলিলে মানব-সমাজ-সঙ্ঘের বিবরণই লক্ষ্য হইয়া থাকে। স্থূলভাবে কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিবরণের নামও ইতিহাস। এই হিসাবে মানব বিজ্ঞান, (Anthropology) প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতিও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে ইতিহাস বলিলে সমাজ-বিবরণীকেই (Biography of Societies)বুঝিতে হইবে। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতীয় মানব-সমাজে বিভিন্ন আদর্শের চরিত্র, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিবরণমূলক মানব-জীবনের যে চিত্র তাহারই নাম সমাজ-বিবরণী বা বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস। সুতরাং চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, সাহিত্য-কলার সহিতও ইতিহাসের সাদৃশ্য রহিয়াছে। সাহিত্য-কলাও মানবজীবনের অভিব্যক্তি। কিন্তু মানবজীবনের একটা বিশেষ দিক ইতিহাসের বিশেষত্ব। সোজা করিয়া এই কথাটা বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ধারাবাহিকভাবে মানবজীবনের (humn life) ঘটনাবলীর শ্রেণীবদ্ধ বিবৃতিই ইতিহাসের বিশেষ দিক্। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাস সমাজবদ্ধ মানবসঙ্ঘের সময়ানুক্রমিক শ্রেণীবদ্ধ বিবৃতি।

ইতিহাসের উপযোগিতা—চিন্তা করিলে দুইটা দিক দিয়াই ইতিহাসের উপযোগিতা বিশেষভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমতঃ ইতিহাস যে সকল তথ্য প্রদান করে তাহা না পাইলে জীবনের একটা দিকের কল্পনা ও বিচারশক্তির উন্মেষ আদৌ হয় না। আবার, বর্ত্তমানের ঘটনাবলীর যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে তাহারা যে সকল স্তরের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেই সকল স্তরের বিকাশের একটা ধারণা আমাদিগকে করিয়া লইতে হয়। জাতির ধর্ম্ম, নীতি, অর্থশাস্ত্র, শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি অতীত জ্ঞান-সংস্কার (Experience) যুগে যুগে রক্ষা করিয়া অতীত হইতে বর্ত্তমানে লইয়া আসার ভার ইতিহাসের হাতে ; সুতরাং ইতিহাসের একটা বিশেষ দিক আছে। ইহা এই সকল উপাদানের সাহায্যে আমাদিগকে ভ্রমসঙ্কুল পথ হইতে সত্যের দিকে চালাইয়া আনে। উল্লিখিত বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অতীতের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, এবং এই অবস্থাই ভবিষ্যতের উন্নতির উপাদান প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। দ্বিতীয়তঃ

ইতিহাসের পথে মানবজীবনের উৎকর্ষ লাভের পক্ষে স্মৃতি, কল্পনা, ও বিচারশক্তির বিকাশ সাধন করিতে ইতিহাস বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, পরস্পর অসংবদ্ধ তথ্য,তারিখ, বা নামের সমষ্টি ইতিহাস আখ্যা পাইতে পারেনা। যে সকল ঘটনাবলী লইয়া মানুষ,নগর,বা একটা জাতির জীবন, ইতিহাস সেই সকল ঘটনাবলীকে জীবন্তভাবে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেয়। আবার ইতিহাস জটিল তথ্য-সমষ্টির বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের মূলভূত এক একটি সরল তথ্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করে। ইতিহাস পাঠ করিয়া কতগুলি তথ্য-সমষ্টি হইতে বালক অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যগুলি বাছিয়া লয়। সুতরাং সে পাঠকার্য্যে ইতিহাসমূলক তুলনা ও বিচারশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইতিহাস পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় সাধু ভাবে পূর্ণ হয়। সুতরাং ইতিহাস আমাদের ধ্যান-ধারণা মার্জ্জিত করিয়া তুলে। আমরা মার্জ্জিত ভাবে মার্জ্জিত বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া উঠি। কিন্তু এ স্থলে একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। কেবল অতীত কথা বা চিন্তা আয়ত্ত করিয়াই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা পরিমার্জিত হইতে পারে না, অতীত কার্য্যের সহিতও আমাদিগকে পরিচিত হইতে হইবে। জ্ঞান-গুণশালী হইতে হইলে কথা, চিন্তা এবং কার্য্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক, এবং শেষোক্ত বিষয়টির দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। ইতিহাস এই বিষয়েও আলোচনা করিয়া থাকে, কারণ আমরা দেখিতে পাই, অতীত যুগে দেশপ্রসিদ্ধ মহাত্মারা কি কি কার্য্য করিয়া অমর হইয়াছেন। ইতিহাস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে।

ইতিহাস পাঠ করিলে পাঠ-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, মানব-ভ্রাতার প্রতি সহানুভূতি প্রশস্ত হইয়া উঠে। আর সাময়িক বা ক্ষণিক আলাপে আমরা ব্যক্তিবিশেষের সহিত যতদূর পরিচিত হইতে বা তাহাকে যতদূর বুঝিতে আশা করি, তাহার ইতিহাস পাঠ করিলে তাহাকে আমরা তদপেক্ষা বেশী ভাল করিয়া বুঝিতে পারি এবং আমাদের সহানুভূতি প্রগাঢ়তর হইয়া উঠে।

ইতিহাসের আর একটা দিক আছে। এই দিকটা নীতি-শিক্ষা এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট মতে ভালমন্দ বিচার করিবার পক্ষে আমাদিগকে সাহায্য করে। ইতিহাস পড়িয়া আমরা বুঝিতে পারি,যে মানব-বিকাশ ক্রম-সংবদ্ধ এবং ক্রমবিস্তৃতভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইতিহাস দেখাইয়া দেয় যে, সভ্যতার পথে যাত্রা করার পর হইতে মানব ক্রমশঃ গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া পরবর্ত্তী জনগণও নূতন ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিহাস পাঠ করিয়া ধারণা হয় যে, সাধু প্রবৃত্তি উদ্দেশ্য বা কার্য্য, সকল সময় সাফল্য লাভ করে না; কিন্তু ইহাদের সাফল্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। অগণিত অতীত যুগের কার্য্যাবলী মনুষ্য-চেষ্টায় স্থায়ী হইতে হইতে পারে, কিংবা মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত নিস্ফল বা নষ্ট হইয়াও যাইতে পারে।

ইতিহাসের নানাদিক—অনেক দিক দিয়াই ইতিহাসের আলোচনা করা যায়। ইতিহাসের কয়টা দিক আছে, এসম্বন্ধে এ স্থলে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে ইতিহাসের কোন দিকটা বিদ্যালয়ের পক্ষে সমধিক উপযোগী এ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা যাইতে পারে। সকলেই এ বিষয় স্বীকার করিবেন যে, বালকেরা বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, যুদ্ধবিগ্রহ, ও রীতি নীতি বিষয়ের আলোচনাতেই আমোদ পায়। সুতরাং বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষার জন্য প্রথমতঃ বস্তুমূলক (Concrete) শিক্ষা হইতে ক্রমে বিষয়মূলক সাধারণ শিক্ষায় (Abstract) উপনীত হইতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তিগত কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে হইবে, এবং পরে, তাহারা জাতি বা ধর্ম্মের উন্নতি, পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ সাধনে যে ভাবে বা যে কারণে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিচারমূলক আলোচনা করিতে হইবে।

পাঠ্য-তালিকায় ইতিহাসের স্থান—জগৎ প্রসিদ্ধ রাগবির (Rugby) স্কুলের শিক্ষক

ডাঃ আরনল্ড্ (Arnold) বলিয়াছেন যে, সাহিত্য বা মানব-জীবন সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে উপযুক্ত রীতিতে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। যদি নিম্নশ্রেণীতে মাত্র এক আধটি বিষয়ে ছাত্রগণকে বিশেষজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে কেবল সেই সেই বিষয়েই বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোমুখী (all round) সাধারণ শিক্ষার (liberal education) উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সাধারণ শিক্ষা বলিলে আমরা কি বুঝি ? আমরা এই বুঝি যে, বালক ভবিষ্যতে জীবনের কোনও বিশিষ্ট ব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষার পরিবর্ত্তে এরূপ সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে যে, এই শিক্ষা-সঞ্জাত জ্ঞানের সাহায্যে সে সমাজের একজন ব্যক্তিরূপে, প্রয়োজনানুরূপ তাহার ভবিষ্যৎ সমস্ত আবেষ্টনের একটা সাধারণ ধারণা করিয়া লইতে পারে। এই হিসাবে, ইতিহাস দ্বারা পাঠ্যতালিকাকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়, এইরূপ ধারণা করা ভ্রমাত্মক। হস্ত বা চক্ষু যেমন অতিরিক্ত বলিয়া আমাদের শরীরের একটা অনাবশ্যক বোঝা বলিয়া গণ্য হয় না, ইতিহাসও ঠিক তাই। একত্ব স্থাপন করিতে যেমন হস্ত ও চক্ষু প্রভৃতি প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন, সেইরূপ প্রত্যেক লোকের জ্ঞানরূপ অঙ্গের একত্ব বিধান করিতে ইতিহাসের প্রয়োজন। মানবজগতের ক্রমোন্নতি বিধান করিতে যেমন পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের প্রয়োজন, সেইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভের পক্ষেও বিভিন্ন জ্ঞান-বিষয়ের (branches of knowledge) একটা পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ধারণা থাকার প্রয়োজন।

মানব জাতির অপরিণত শিশুকে বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা ও সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব আবশ্যক মানবীয় অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত করাই পাঠ্য-তালিকার উদ্দেশ্য। একটু বিবেচনা করিলেই এই কথাটি উপলব্ধি হইবে।

এই মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে সামাজিক অভিজ্ঞতার বিকাশ বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। এই অভিজ্ঞতার যেরূপ ভাবে বিকাশ হয় তাহার স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিলেই ভবিষ্যতের উন্নতি ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃতি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইহাতেই পাঠ্য-তালিকায় ইতিহাসের স্থানের একটা ধারণা হয়। আবার এই বিষয়টি ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে পাঠ্যতালিকার অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানলাভও অনেক সময় সুগম হইয়া থাকে। ইতিহাস না জানিলে অনেক বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান লাভ হয় না। ইতিহাস ভাল পড়া থাকিলে সাহিত্য, ভূগোল এবং প্রাণীজগতের অনেক বিষয়ের জ্ঞাতব্য প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ হয়।

একটু [illegible] দেখা যায় যে, আমাদের বালকগণ শৈশবেই ইতিহাসের অনেক উপাদানের সহিত পরিচিত হইয়া থাকে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত এক বিপুল ইতিহাস। এই দুই মহাকাব্যে কত জাতি, কত দেশ, কত রাজা, এবং কত লোকের কাহিনী রহিয়াছে। সুতরাং বালকদিগের ইতিহাস পাঠে আমোদের উন্মেষ করিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীতে পৃথিবীস্থ জাতিসমূহের ভৌগোলিক সংস্থানের বিবরণ ভালরূপ বুঝিতে হইলে এই সকল জাতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সাহিত্য বুঝিতে হইলেও জাতীয় ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন। আবার ইংলণ্ডের ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে উচ্চশ্রেণীর বালকের পক্ষে ইংরেজী সাহিত্য ও তাহার জ্ঞানলাভ দুষ্কর হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা স্পষ্ট। আমাদের জাতীয় সাহিত্যে ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রভাব এত বেশী যে, এই ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে অনেক সময় আমাদের সাহিত্যের অনেক স্থান দুর্ব্বোধ থাকিয়া যায়। সুতরাং ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। এমন কি, দৈনিক সংবাদপত্রে যে সকল কথার আলোচনা হইয়া থাকে, ইতিহাসের জ্ঞান না থাকিলে অনেক স্থলে সেই সকল কথারও কোন অর্থ বোধ হয় না। ইহা হইতে দৈনিক জীবনেও যে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

আর একদিক দিয়া ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বিচার করা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি অল্পলোকই দৈনিক জীবনে রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যার সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। পদার্থবিদ্যার জ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনে কি বিশেষ প্রয়োজন হইতে পারে? হয় ত আজ বৃষ্টি হইবে কি না, বাহিরে যাইতে ছাতা লইয়া যাইতে হইবে কি না ইত্যাদি দুই একটি বিষয়ে ব্যক্তি-বিশেষকে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়। কিন্তু মানবীয় জ্ঞান সম্বন্ধে কথাটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে বালককে হয়ত 'টেষ্ট টিউব' বা 'বৈজ্ঞানিক নিক্তির' সংস্পর্শে আদবেই আসিতে হয় না, কিন্তু মানুষের সংস্পর্শে না আসিয়া তাহার উপায় নাই। তাহাকে তাহার প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকের সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে বিচার করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে; লোকের কথা, দলিলপত্র ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে; এবং তাহার কৃতকার্য্যতা উল্লিখিত বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্তের উপর অনেকটা নির্ভর করিবে। সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হইলে সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। লোকের মনোভাব বা প্রকৃতি তাহাদের কথা ও কার্য্য হইতে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে নানা জটিল বিষয়ের মধ্যে এইরূপ মানসিক বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, এবং ইতিহাসই এই বিষয়ে মানুষকে অনেকটা শিক্ষা দিয়া থাকে। এখন যদি কোন ব্যক্তিকে সাংসারিক জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়ন শাস্ত্র হইতে সমাজ-বিজ্ঞান বা ইতিহাসই ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া বোধ হয়। জন-সমাজের কথা স্বতন্ত্র।

বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়-সমূহে ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা।—এক্ষণে উপরোক্ত আলোচনার সাহায্যে বঙ্গদেশে বিদ্যালয় সমূহের ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বিচার করা যাইবে।

শ্রেণীবিভাগের সরলতা সম্পাদন—বর্ত্তমান সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারে বড়ই গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০টি 'ষ্টেণ্ডার্ড' বা শ্রেণী। সর্ব্বনিম্ন ষ্টেণ্ডার্ডের (ক্লাস) ছাত্রগণের বয়স ৭ বৎসর। এবং সর্ব্বোচ্চ ষ্টেণ্ডার্ডের (ক্লাস X) ছাত্রগণের বয়স ১৬ বৎসর। পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রগণের শ্রেণী-বিভাগ স্বতন্ত্র। পশ্চিম বঙ্গে মোট ১৩টি শ্রেণী। সেখানে শ্রেণীকে ষ্টেণ্ডার্ড বলা হয় না। ৭ম শ্রেণীর দুইটী শাখা এবং ৮ম শ্রেণীর তিনটি শাখা। তাছাড়া পশ্চিম বঙ্গে আবার দুটি শিশুশ্রেণী আছে। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ছাত্রের বয়স ৪ বৎসর (৮ম শ্রেণীর গ শাখা), ও সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর (১ম শ্রেণী) ছাত্রের বয়স ১৬ বৎসর। আবার যদি মধ্য ইংরেজী, মধ্য বঙ্গ, ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে শ্রেণীবিভাগ আরও জটিল হইয়া পড়ে। ছাত্র নিম্ন বিদ্যালয় হইতে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির জন্য আসিলে তাহার উপযুক্ত শ্রেণী ঠিক করিতে গোলযোগ ঘটে। সুতরাং ষ্টেণ্ডার্ডের শ্রেণীবিভাগ এরূপ ভাবে করা উচিত যেন সকল জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যেই একটা সম্পর্ক থাকে, যেন কোন নিম্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রের বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পাঠ্য পুস্তক বা শ্রেণী নির্ব্বাচনে অযথা গোলযোগ বা অসুবিধা না ঘটে। এই উদ্দেশ্যেই এই সমস্যার সরলতা সম্পাদন বাঞ্ছনীয়। ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা বিচার করিতে গিয়া আমি এই কথাটি মনে রাখিয়া ইতিহাস সম্পর্কীয় পাঠ্য বিষয়ের বিচার করিয়াছি। নিম্নে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পাঠ্য বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া হইল।

যে সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছি তাহা এই। প্রত্যেক উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ্য-বিষয়ের ব্যবস্থা ও নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য তিনটি বিভাগ থাকিবে। তিনটি বিভাগ এই—

(১) প্রাথমিক বিভাগ, ৪টি ষ্টেণ্ডার্ড (বয়স ৫—৮)
(২) মধ্য বিভাগ, ঐ ঐ (বয়স ৯—১২)
(৩) উচ্চ বিভাগ, ঐ ঐ (বয়স ১৩—১৬)

সুতরাং যে উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩টি বিভাগ থাকিবে সেই উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্ব্বশুদ্ধ ১২টি শ্রেণী বা ষ্টেণ্ডার্ড থাকিবে। আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের ও মধ্য বিদ্যালয়গুলি উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিভাগের অনুরূপ হইবে। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪টি শ্রেণী থাকিবে, এবং এই সকল শ্রেণীর নির্ব্বাচিত পাঠ্য বিষয়গুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের অনুরূপ হইবে। মধ্যবিদ্যালয়ের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। সুতরাং সকল জাতীয় বিদ্যালয়ের শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ই পরপর ভাবে চলিতে থাকিবে, ইহাদের মধ্যে কোনও অসাদৃশ্য লক্ষিত হইবে না, এবং বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনেও ছাত্রদিগের কোনও অসুবিধা ঘটিবে না।

ইতিহাসের পাঠ্য-তালিকা

বিভাগ	ষ্টেণ্ডার্ড	বয়স	বিষয়	মন্তব্য
প্রাথমিক	নিম্নস্তর I. II	৫—৬	উপকথা	প্রাথমিক বিভাগে খাঁটি ইতিহাস আরম্ভ হইবে না।
	উচ্চস্তর III. IV	৭—৮	ঐ	ষ্টাণ্ডার্ড IV এ রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প আরম্ভ হইতে পারে।
মধ্য—	নিম্নস্তর V. VI.	(ক) (খ) ৯—১০	(ক) রামায়ণাদির গল্প (খ) ভারতের ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র (প্রবাদ ও ইতিহাসের মিশ্রণ) গল্পাকারে।	
	উচ্চস্তর VII. VIII.	(ক) (খ) ১১—১২	(ক) গল্পগুলির পূর্ব্বাপর্য্য ও সম্পর্ক দেখাইবার জন্য অধিক সংখ্যক জীবনী সন্নিবেশ। ম্যাপ, প্লান ইত্যাদি জীবনীর উপরই বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে কয়েকটি জীবনী। (খ) পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে আরও কয়েকটি জীবনী। দ্রষ্টব্য—আর্য্য ও দ্রাবিড়গণের উপনিবেশ, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাস। তুলনা-মূলক পাঠ ও আলোচনা।	
উচ্চ	নিম্নস্তর IX. X.	(ক) (খ) ১৩—১৪	(ক) পূর্ব্বোল্লিখিত ষ্টাণ্ডার্ড VII এর বিষয় ইংরেজীতে। তুলনা-মূলক পাঠ। (খ) পূর্ব্বোল্লিখিত ষ্টাণ্ডার্ড VIII এর বিষয় ইংরেজীতে। তুলনা মূলক পাঠ।	
	উচ্চস্তর XI. XII.	(ক) (খ) ১৫—১৬	(ক) ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। ইংলণ্ডের ইতিহাসের সাধারণ জ্ঞান (যুগানুসারে) ১৬০০ খৃঃ পর্য্যন্ত। (খ) ভারতীয় সভ্যতা। সামাজিক বিকাশের ইতিহাস। ইংলণ্ডের ইতিহাস (পুনরালোচনা) এবং ১৬০০—১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত।	

শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

হৃদি রাণী

সে বলে আমায়, চরণের তলে দাসী নহি আমি তার,
তার জীবনের কনক আসনে আছে মোর অধিকার।
চরণের তলে বসিলে সে বলে" বুক হতে অত দূরে
গেলে তুমি প্রিয়া বিরহ-অনলে দেহপ্রাণ যায় পুড়ে।"
সখি—সত্য করিয়া বল,
এত সুখভার সবে কি আমার—এত কি ভাগ্যফল ?

সে বলে আমায়—লাজে মরি—আমি আরাধিতা তার রাধা
মোর দুটি ক্ষীণ বাহু-বল্লীতে রবে চিরদিন বাঁধা;
দেহের যে ঠাঁয়ে রহি না ক আমি সে ঠাঁই দহে গো তার
রাধা রাধা ছাড়া বাঁশরী তাঁহার কহে না ক কিছু আর।
সখি—সত্য করিয়া বল,
কেমনে জীবন সহিবে আমার এত সুখ অবিরল ?

ভিখারিণী নাই, পুজারিণী নই, আমি তার হৃদিরাণী,
জীবণ মরণ করে গো সৃজন আমার মুখের বাণী;
আমি যে তুচ্ছা আভীর রমনী—সে যে আকাশের শশী,
কোন মন্ত্রের বলে আমি তার হৃদয় জুড়িয়া বসি ?
সখি—সত্য করিয়া বল,
এত যে সোহাগ, নহে ত স্বপন—নহে ত মায়ার ছল ?

শ্রীকালীদাস রায় বি-এ

বাঙ্গালা সাহিত্যে বৌদ্ধযুগের অবসান

ময়নামতির গান

বাঙ্গালার জলবায়ুর সরসতায় এই কাল হইতেই কবিতা ও সরস উপাখ্যান দেশে আবির্ভূত হইল। ময়নামতির গানে ইহার প্রকৃষ্ট এক দৃষ্টান্ত নেত্রগোচর হইবে। এ কালের এক রাজা ছিলেন মাণিকচন্দ্র বা মাণিকচাঁদ। তাঁহার মহিষী ময়নামতি নামে পরিচিতা ছিলেন। উভয়ের পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ। মাণিকচাঁদ রঙ্গপুরে না ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করিয়া যান, তাহা তর্কের বিষয়। সে বিচারে আমরা প্রবেশ করিব না। পুত্র গোপীচাঁদের রাজত্বের অবসানে যে সরস গাথা সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই আমাদের আলোচ্য। ঘটনা এই যুগে সংঘটিত হইয়াছিল—এই গাথার উৎপত্তিও এইকালে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের বা ময়নামতির গানের যে সকল বিভিন্নরূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহার ভাষা ক্রমে লোকমুখে পরিচালিত হইয়া, অনেকাংশে পরবর্ত্তী কালের রূপ ধারণ করিয়াছে। তথাপিও কাব্যের ঘটনারস ও কবিত্ব এই যুগেই উদ্ভূত বলিয়া কবিতাটীও এই অধ্যায়ে আলোচিত হওয়া দূষ্য নহে।

বিষয়টি সংক্ষেপে এই—

রাজা মাণিকচাঁদের মহিষী বালিকাকালে বৌদ্ধতান্ত্রিক গুরু গোরক্ষনাথের নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া ময়নামতি নামে পরিচিত হয়েন। মন্ত্রসিদ্ধির ফলে তিনি নিজেও সিদ্ধা ও যমজয়ী হইয়া উঠেন। তাঁহার পতি রাজা মাণিকচাঁদ স্ত্রীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ময়নামতির তার পরে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র গোপীচাঁদকে উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া অমরত্ব-প্রদানের বাসনা জন্মে। গোপীচাঁদ তখন সমৃদ্ধ রাজত্বের অধীশ্বর, চতুঃসংখ্যকা সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীর ভর্ত্তা। এই সকল সুখসমৃদ্ধি ছাড়িয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে গোপীচাঁদও নারাজ, তাঁহার পত্নীগণ ত একেবারেই বিমুখ। কিন্তু দৃঢ়সংকল্প ময়নামতি যমের ভয় ও নানাযুক্তি প্রদর্শন করিয়া অবশেষে রাজা গোপীচাঁদকে বাধ্য করিলেন। গোপীচাঁদ হাড়িপা সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। ইতিমধ্যে বধূগণ সকল উপদ্রবের হেতু শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে চিরকালের জন্য বিদূরিত করিবার চেষ্টায় শৈথিল্য করেন নাই; কিন্তু, সিদ্ধা বলিয়া বৃদ্ধার কোনই অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বরিশাল শাখার মাসিক অধিবেশনে পঠিত "বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি ও আদি প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ অংশ।

হাড়িপার সাহায্যে নানা দুর্ভোগ ভোগের পর গোপীচাঁদের বৈরাগীবেশে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনেই কাব্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

বিষয়টি কাব্যের উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন হইতেই বাঙ্গালী করুণরস বর্ণনে সিদ্ধহস্ত, এ তথ্যের বহু প্রমাণ আমরা এই গাথার বহুছত্রে ব্যক্ত দেখিতে পাইব। নৈসর্গিক শোভায় সুসজ্জিত বাংলাদেশে রম্য প্রকৃতির চিত্রণও এই সঙ্গে আরব্ধ হইল—এই গীতি-কবিতার বহু ছত্রে ইহাও প্রকাশ পাইবে।

জীবন, যৌবন অসার ইহা বুঝাইবার জন্য ময়নামতি পুত্রকে বলিতেছেন—

কচুপাতার জল যেন করে টলমল।
তেন মতে যাবে তোহ্মার যৌবন সফল॥
নল খাগ কাটীলে যে হেন পড়ে পানী।
তেন মত হইব বাপ তোহ্মার জোওানি॥

এখানে এইটুকু দ্রষ্টব্য—যে উপমাটি সংস্কৃত কাব্য হইতে অনুকৃত হয় নাই, খাঁটি বাংলাদেশের পাড়া গাঁ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কচুপাতা—নলখাগ এখানে উপমার বিষয়; সংস্কৃত কবির পদ্মপত্রের সহিত আমাদের দেশজ কবির কোনও পরিচয় নাই।

গ্রাম্য কবির রূপবর্ণনা শুনুন। গোপীচাঁদের চারিটি স্ত্রী তাঁহাকে বৈরাগ্য হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছেন। স্ত্রী-চারিজনের নাম—অদুনা, পদুনা রতনমালা ও কাঞ্চনমালা।

অদুনাএ পিন্দে কাপড় মেঘনাল শাড়ী।
সেই শাড়ীর মূল্য ছিল বাইশ লাখ কৌরী॥
পদুনায় পিন্দে কাপড় তলে বান্দি নেত।
মাঞ্জা করে ঝলমল বনের সুন্দি বেত॥
রতনমালায় পিন্দে কাপড় নামে যে তসর।
আন্দারিয়া ঘর জলে আপনে পাসর॥
কাঞ্চনমালায় পিন্দে কাপড় নামে খিরবলী।
রূপ দেখি তপভঙ্গ ভুলিএ যাএ অলি॥

রাম লক্ষন দুইমুট শঙ্খ হস্তে তুলি দিল।
পুর্ণিমাসের চন্দ্র যেন আকাশে উলিল।

ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী কবি এখনই সহজ, করুণ রসের কিরূপ তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছেন, তাহারও এক দৃষ্টান্ত দেখুন। গোপীচাঁদের বৈরাগ্য অবলম্বনের বার্ত্তায় তাঁহার পত্নীগণ যে প্রকার অস্থিরতা প্রকাশ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণও, বোধ হয় যেন, দ্রব হয়; অথচ গ্রাম্য কবির এ ভাষায় কৃত্রিমতা বা পরিচ্ছদের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না।

কান্দএ অদুনা নারী কান্দএ পদুনা।
কান্দএ রতনমালা আর কাঞ্চাসোনা॥
অদুনার কান্দনে গাবীর গাব ছারে।
পদুনার কান্দনে সমুদ্র উজান ধরে॥
রতনমালার কান্দনে প্রাণ নহে স্থির।
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যাএ চির॥
চারি নারী কান্দে রাজার চরণে ধরিয়া।
মৈনামতী বোলে তুমি যাইবা যুগী হৈয়া॥
যে দেশে যাইবা প্রিয়া সে দেশে যাইব।
ধরিয়া যুগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব॥
তুমি সে যগীয়া রাজা আমিত যগীণী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনি॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্দি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোমা শোন প্রাণনাথ॥
এক সৈন্দা রান্দি ভাত দুই সৈন্দা খাওাইমু
হাটীতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু॥
রাজা বোলে কি প্রকারে হাটীয়া যাইবা।
সে পন্তে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা॥
খাউক বনের বাঘে তাহে নাহি ডর।
তোহ্মা আগে মৈলে হৈব সাফল্য মোহর॥

আবার শুনুন,

আহে প্রভু গুণনিধি কি বলিলা বাণী।
শুনিতে বিদরে বুক না রহে পরাণী॥

রূপে থাকে হরিণী বনে ঘরবাড়ী।
প্রেমের কারণে কাকে কেহ না যাএ ছারি॥
সর্ব্বদিন চরা করে বনের ভিতর।
সৈন্ধাকালে চলি যাএ আপনা বাসর॥
হরিণা যাএ আগে আগে হরিণী যাএ পাছে।
সর্ব্বদুঃখ পাসরএ স্বামী থাকে কাছে॥

স্ত্রীলোকের কথায় কথাই বা বলি কেন, কবিবর রাজা গোপীচাঁদের মুখে যে করুণ বিলাপ প্রস্ফুট করিয়াছেন তাহা পর্য্যন্ত পাঠকের একান্ত মর্ম্মস্পর্শী।

রাজাএ বোলে শুন মাগ মৈনামতী আই।
পুনি নিবেদন করি তুমি মাএর ঠাঞি॥
আরের মাহে বেটা চাহে রাখিবারে ঘরে।
তুমি মাএ কহ মোরে যুগী হইবারে॥
আর মাএ পুত্র দেখি দুদ্‌ ভাত খাওাএ।
নাতি পতি লৈয়া ঘরে আনন্দে গোঁয়াএ॥
তুদ্ধি মাএর হিয়াখাণী পাত্যরে বান্দিয়া।
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যুগী হৈয়া॥

এই গাথার সময় লোকের অবস্থা কিরূপ স্বচ্ছল ছিল, ময়নামতি তাঁহার স্বামীর রাজত্বকাল বর্ণনায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

বড়পুস্তের লাগি দিল দীঘি আর জাঙ্গাল।
সোনারূপার গড়াগড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হিরা মন মানিক্য লোকে তলিতে শুকাইত।
কাহার পুষ্করণীর জল কেহ না খাইত॥
কাহার বাটীতে কে উদার না চাইত।
সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বালকে খেলাইত॥
হারাইলে ঢেপুয়া পুনি না চাইত আর।
এ মতে গোঙাইল লোকে হরিষ অপার॥
মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলিবাসের বেড়া।
গৃহস্তের পাঁয়দান সোনার পাছুরা॥
গরীবে চড়িয়া ফিরে খাসা তাজী ঘোড়া।
ফকিরের গাহে দিত খাসা কাপড় জোড়া॥
তোমার বাপের কালেয়া সব ছিল ধনী।
সোনার কলসে ভরি লোকে খাইত পাণী॥
রূপার কলসী করি বিধবাএ জল খাইত।
কেবা রাজা কেবা প্রজা চিনন না যাইত॥
মুজুরি করিতে যাএ আবন্ধি ছত্র মাথে।
বসিতে লইয়া যাএ সোনার পীড়িতে॥
তবে সেই জন জান মজুরিতে যাএ।
একদিন মজুরি করিলে ছএ তঙ্কা পাএ॥
দুই পহর মজুরি করে গৃহস্তের ঘরে।
এক প্রহর দৌড়ায় ঘোড়া ময়দান পাথ্যরে॥
যার সেই নিতিকর্ম্ম এড়ান না যাএ।
অশ্ব আরোহিয়া সেই মজুরর করি হএ॥
দেড়বুরি কৌড়ী ছিল কাণী ভুঞির কর।
চৌদ্দ বুরি কৌড়ি ছিল তঙ্কার মোকর॥

রাজ্যেশ্বরের সমৃদ্ধি তখন কি প্রকার ছিল তাহা গোপীচাঁদের বর্ণনায় প্রকটিত।

কার কাছে এড়ি যাউব হঙ্গসরাজ ঘোড়া।
কার টাঞি এড়ি যাইমু গাএর খাসা জোড়া॥
ধনুবান কথাতে এড়িমু লাকে লাক।
তির তাম্বু বান কাতে এড়িমু ঝাকে ঝাকে॥
গাঙ্গেত এড়িয়া যাইমু বত্যিস কাহন নাও।
পুরী মধ্যে এড়ি যাইমু তুমি হেন মাও॥
পিল ঘরে এড়ি যাইমু আশী হাজার হাতী।
বৈদেশে গমন কালে কে ধরিবে ছাতি॥
পাইঘরে এড়ি যাইমু নএ লাক ঘোড়া॥
ঘোর মন্দিরে এড়ি যাইমু সাহে মাণিক দোলা॥
পুরী মাঝে এড়ি যাইমু পঞ্চপাত্র বর।
পান যোগিণী এড়ি যাবে উনশত নফর॥
খেত বান্দা এড়ি যামু হারিয়া ছোঁহর।
অদুনা পদুনা এড়ি যাইমু কার ঘর॥

দাফারে এড়িয়া যাবে সত্তের কায়ন বেত।
গোঞালে এড়িয়া যাবে গাঁই বারশত॥

বৃদ্ধা ময়নামতি সিদ্ধা হইয়া সংসারের ফঁাকি বুঝিয়াছেন আবার বয়োবৃদ্ধা বলিয়া সংসারের রীতিনীতিও তাঁহার বুঝিতে বাঁকি নাই। পুত্রকে তিনি এ বিষয়ে যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে এখনও অনেক শিক্ষা লাভ হয়।

মৈনামতী বোলে বাছা কিছু নহে সার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সংসার আন্দার॥
ইষ্টমিত্র বাপ ভাই কেহ নহে কার।
পুত্রকৈন্যা সঙ্গে রাজা না যাইব তোহ্মার॥
কাএয়া মাঞা সব ছারি বলে ধরি নিব।
এমন সোন্দর তনু কাকেত মিশাইব॥
ধনজন দেখিআ আপনা বোল তারে।
এ তনু আপনা নহে লৈয়া ফির যারে॥
কোনকর্ম্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত।
কি বুলি জোয়াব দিবা স্বামীর সাক্ষাৎ॥
আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শৈন্য।
সঙ্গে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুন্য॥

আবার, সংসারের রীতি একটু শুনুন। মানুষ মরিলে
ভ্রাতৃভৈনে কান্দিব বেইলের আড়াই পহর।
পশ্চাতে চিন্তিব সে আপনা বাড়ীঘর॥
জননী কান্দিব জান পুরা ছএ মাস।
নারীএ কান্দিব জান লোকের আশ পাশ॥
শঙ্খ সোনা শাড়ী দিয়া বিভা করে নারী।
বড় দএয়ার বধূএ কান্দিব দিন চারি॥

ডাকের প্রবচন

বৌদ্ধযুগের অন্য রচনার মধ্যে ডাকের রচনাবলীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক স্থলে বৌদ্ধভাব প্রণোদিত বলিয়া এগুলি পরবর্ত্তীকালে বিশেষ প্রচলিত হইতে পারে নাই। গতিকেই এই নামের অধিকাংশ প্রবচনের ভাষাই দুর্ব্বোধ। কিন্তু কতকগুলি রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ ও আধুনিক ভাষায়ও প্রচলিত আছে; এগুলি সম্ভবতঃ সকল কালের উপযোগী বলিয়া লোকমুখে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

নিম্নে ডাকের দুই প্রকার রচনার দুই দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

(১) দুর্ব্বোধ

"ভাষা বোলে পাস্তে লেখি।
বাটাহুব বোল পড়ি শাখি॥
মধ্যস্থে চাবে সমাধে স্থায়।
বলে ডাক বড় সুখ পায়॥
মধ্যস্থে যাবে হেমাতি বুঝে।
বলে ডাক নরকে পচে॥"

(২) সহজ বোধ

"ঘরে আথা বাইরে রাঁধে।
অল্পকেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজার॥"

ডাক নামে বিশেষ কোনও লোক ছিল বলিয়া মনে হয় না। ডাকিনীর পুংলিঙ্গে ডাক। সেই তান্ত্রিকতার যুগে যখন যে সদুপদেশপূর্ণ প্রবচন রচনা হইয়াছে, তখনই তাহা ডাক মহাশয়ের নামে পরিচিত করা হইয়াছে, এ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় খনার বচনগুলিও এই যুগেই আরব্ধ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। খনার প্রবচনের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, দুর্ব্বোধ্য রচনা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না; ডাকের বচনাবলীর বহুস্থলে বৌদ্ধভাব ও ভাষা পরিদৃষ্ট হয়। খনার বচনগুলিতে তদ্রূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্য যুগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এই রচনার

দৃষ্টান্তে লৌকিক দেবতার গীতি লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাণা হরিদত্তের "মনসার গীত," বিজয় গুপ্তের "পদ্মপুরাণ", নারায়ণ দেবের "মনসামঙ্গল", দ্বিজ জনার্দ্দনের "মঙ্গলচণ্ডী" এবং রতিদেবের "মৃগলুব্ধ" আদি পুথি এই পরবর্ত্তী যুগের রচনা।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর "পরাগলী মহাভারত" বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয় ও নিত্যানন্দ ঘোষের "মহাভারত", এবং মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁর "শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয়" প্রভৃতি শাস্ত্রানুবাদ গ্রন্থও উল্লিখিত দৃষ্টান্তে এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। এখন যে হিন্দুভাব, গার্হস্থ্য ও কৃষি-জীবনের প্রবচন সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাও বৌদ্ধ তান্ত্রিক ডাক মহাশয়ের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া খনার নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করিল। উজ্জয়িনী রাজসভা অন্যতম রত্ন বরাহের পুত্রবধু সুদুর বাংলাদেশের ভাষায় প্রবচন রচনা করিতে গেলেন কেন, সে বিচার ঐতিহাসিক মহাশয়েরা করিবেন। খনার বচন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক দেবতার যুগে প্রারব্ধ এ বিষয়ে এইমাত্র আমাদের বক্তব্য।

বাঙ্গলার নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণের ভিন্ন পন্থীর দৃষ্টান্তে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হওয়া এই একই বার মাত্র ঘটিয়াছে এরূপ নহে। পরবর্ত্তী সাহিত্যের আলোচনা কালে দেখা যাইবে যে বাংলার চৈতন্য যুগে যখন বৈষ্ণব পদলহরী, চৈতন্য-চরিত গ্রন্থ ও বৈষ্ণব অনুবাদ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহারই অব্যবহিত পরে অনুমান খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে এই সাহিত্যের উত্তেজনায় হিন্দুগণ আবার লৌকিক দেবতাগণের ও পুরাণ-গ্রন্থের অনুবাদ লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। মাধবাচার্য্যের "গঙ্গামঙ্গল" ও চণ্ডীকাব্য," কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "চণ্ডী," কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণের "শিবায়ন", দ্বীজশঙ্করের বৈদ্যনাথ মঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বর্দ্ধমান দাসের "মনসার গীত" এবং কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গল" প্রভৃতি মৌলিক রচনা এবং ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস, দ্বিজ তুর্গারাম, অদ্ভুত আচার্য্য প্রকে নিত্যানন্দ শর্ম্মা ও কবিচন্দ্র বা শঙ্করের "রামায়ণ", ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস, রাজেন্দ্র দাস, কাশীরাম দাস ও বাণেশ্বর নন্দীর "মহাভারত",—ভবানীপ্রসাদ কর ও রূপনারায়ণ ঘোষের "চণ্ডী;"—এবং কবিচন্দ্র বা শঙ্কর, অভিরাম দাস ও সনাতন চক্রবর্ত্তীর "ভাগবত" এবং দ্বিজ ভুবানন্দের "হরিবংশ" প্রভৃতি বহু অনুবাদ-গ্রন্থ এই পরবর্ত্তী সাহিত্যযুগে রচিত হইল।

শ্রীভূপালকুমার দত্ত।

অনুপ্রাসে পরিহাস

ইন্দু-কিরণ বিন্দুপতনে সিন্ধু উছলি' উঠে,
মন্দপবনে সান্ধ্যমালতী গন্ধে ভরিয়া ফুটে।
তরুণ-অরুণ-কিরণ-পরশে সরসে সরোজ হাসে,
নীল-নবীন-নীরদ-নিনাদে ময়ূর ময়ূরী 'নাচে'।
শুদ্ধতা যথা শুদ্ধ, নিত্য হৃদ্যতা তথা বিদ্যমান,
এ নহে পদ্য-লেখক গদ্য লইয়া দ্বন্দ্ব হতজ্ঞান।
বঙ্গজননী 'বংগভাষার' 'অংগ দেখিয়া ভঙ্গ'
ব্যঙ্গপ্রিয় বঙ্গবাসীর ঘুচে না কেন গো রংগ।
শক্তি যেখানে যুক্তিযুক্ত ভক্তি সেখানে বদ্ধ
ভক্তি-বিহীন ভুক্তি সমীপে মুক্তি চিররুদ্ধ
যাহার সঙ্গে তাহার পারিতি, নহে ত পীরিতি কাহার*,
'কাঁদে আঁখিলোরে', মৌন হাহাকারে, অনুপ্রাসের বাহার।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ।

---

* যৎ শব্দের সঙ্গে তৎ শব্দেরই নিত্যসম্বন্ধ, কিম্ শব্দের নহে।

মধ্যযুগে বঙ্গদেশ *

স্বর্গ কি ? জানি না। কিন্তু স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি তাহা জানি—সে আমার জন্মভূমি। যে জননীর স্নেহ-সুধা-পানে আমরা জীবিত, যাঁহার বুকে আমরা মানুষ,—এমন মানুষ পৃথিবীতে নাই, থাকিলেও সে মানুষ নামের যোগ্য নয়, যে আপনার স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই জন্মভূমিকে ভক্তি না করে, ভাল না বাসে। আমার জননী ও জন্মভূমি বঙ্গদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আজ আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বিষয়টী গুরুতর, অল্প সময়ের মধ্যে ইতিহাসের পরস্পর-সংলগ্ন সকল বিষয় গুছাইয়া বলা সম্ভবপর নয়; তথাপি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সে সকল কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসানুশীলনের সুবিধার জন্য কয়েকটী বিশেষ ভাবে কালকে বিভাগ করিয়া থাকেন—যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগ, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ ইত্যাদি। পণ্ডিতগণ আলোচনার সুবিধার জন্য কালকে ইহা অপেক্ষাও অনেক ভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারেন। ইতিহাস আলোচনার গতি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে তথ্যাদির বিবরণ সংগৃহীত হইলেই লেখকগণ অনেক পরিমাণে নিজেদের সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন। এখন সে দিন নাই, এখন শিক্ষিত জনসঙ্ঘ উপযুক্তরূপ দলিল-দস্তাবেজের প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা অবিসংবাদিত সত্য রূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহেন। কাজেই, আমি যাহা কিছু বলিব, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা তাহার প্রমাণও দাবী করিবেন, দলিল-দস্তাবেজ কোথায় তাহারও তলব করিবেন—কাজেই, ঐতিহাসিক কোন বিষয়ের আলোচনা এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা সুসিদ্ধ হয় বলিয়া মনে করি না।

প্রথম কথা, এখন বঙ্গদেশ বলিতে যেরূপ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি বঙ্গের সমুদয় অংশই বুঝায়, পূর্ব্বে তাহা বুঝাইত না। তখন গৌড় শব্দ দ্বারাই সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইত। রাজারাও গৌড়াধিপ বলিয়াই পরিচিত হইতেন। বেশী দিনের কথা নয়, বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন "গৌড়জনের" জন্যই মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখনও আমরা গৌড়ীয় ছাপ একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই,—এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব, গৌড়ীয় ভাষা ইত্যাদি কথা সুপ্রচলিত। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি দেশগুলি এক সময়ে গৌড়ান্তর্গত ছিল। তৎকালে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইত। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে বঙ্গদেশ নাম পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। 'বাঙ্গালী' এই সাধারণ নাম আমরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব পূর্ব্ববঙ্গের লোকের এ বিষয়ে গৌরব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, এবং সে গৌরব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সম্রাট অশোক মহাশক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। এইরূপ সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষ ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অশোকের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও, বঙ্গদেশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল কি না, কিংবদন্তী-মূলক প্রবাদ ব্যতীত তাঁহার স্থাপিত কোনও শিলা-শাসন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় না। বাঙ্গালার ইতিহাসালোচনা করিতে গেলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণ অন্ধতমসাচ্ছন্ন। তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত সময় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে আদিযুগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমার বিবেচনায় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে মুসলমান শাসনের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত যে যুগ, তাহাকেই মধ্যযুগ নামে অভিহিত করা কর্ত্তব্য। এই সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাসই মধ্যযুগের ইতিহাস। এই যুগের প্রথম ভারতভূপতি সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজকুলের দৌহিত্র। এই যুগের অনেক কথা শিলালিপি, তাম্রপট্ট, মুদ্রা, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অতি নিপুণ ভাবে সঙ্কলিত হইতে

---

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংকলিত।

পারে। সে কালের নৃপতিরা যে সমুদয় প্রশস্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলির রচয়িতা কবিগণ নানা প্রকার রাজ-প্রশংসা দ্বারা সুকৌশলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য লিপি-বদ্ধ করিতেন। প্রয়াগের অশোক-স্তম্ভ-গাত্রে একটী প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। উহাতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিটি কবি হরিষেণ-বিরচিত। এই প্রশস্তিতে লিখিত আছে,

'সমতট–ডবাক্-কামরূপ–নেপাল-কর্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত-নৃপতিভিঃ সর্ব্ব-করদানাজ্ঞা-করণ-প্রণামাগমন-পরিতোষিত প্রচণ্ডশাসনস্য"।

কেহ কেহ ডবাক্ শব্দ দ্বারা ঢাকা বুঝিতে চাহেন। তাঁহাদের এইরূপ অনুমানের কারণ নাম-সাদৃশ্য। কেবল নাম-সাদৃশ্য দেখিয়া কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের বা ঐতিহাসিকের পক্ষে সমীচীন নহে। প্রত্যন্ত শব্দের অর্থ কি? কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে উহা Frontier province বা সীমান্ত প্রদেশ। আমি কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপির অর্থ উদ্ধারের সময় কেবল শব্দগুলির সাধারণ অর্থ অনুসরণ করিয়া কোনও অর্থোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হই না; তাৎকালীন সাহিত্য-কাব্য-অভিধান প্রভৃতি হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করি। "অমর-কোষে" প্রত্যন্ত শব্দের অর্থ "ম্লেচ্ছ দেশ" লিখিত আছে। কিন্তু ঢাকা ত ম্লেচ্ছ দেশ নহে। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। সে সকল বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। সমতট বলিতে ব-দ্বীপকে বুঝায়। তাহা প্রথমে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। নারায়ণ পালের প্রশস্তিতে আছে,—'সৎ-সমতট-জন্মনা'। ইহা দ্বারা সমতটের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় না, একাংশ তখনও ম্লেচ্ছদেশ ছিল, যে অংশ ম্লেচ্ছদেশ ছিল না, তাহাই "সৎসমতট।"

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন,—ইঁহারি সভায় বরেণ্য কবি কালিদাস নিত্য নব শ্লোকে নব নব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য নাই, কালিদাসও নাই; কিন্তু আপনারা কেহ কি কালিদাসের নাটকসমূহের কথা ভুলিতে পারিবেন? "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" কথা বিস্মৃত হইতে পারিবেন? বিরহ-বিধুর যক্ষের দৌত্যকার্য্যে নিরত "মেঘ দূতের" সুমধুর কাব্যকথা ভুলিতে পারিবেন?

সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর কুমারগুপ্ত দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন দর্শনের সৌভাগ্য প্রথমে আমারই ঘটিয়াছিল। এই তাম্র-শাসনখানা নাটোর মহকুমার অধীন ধানাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। আমার বন্ধু সদাশয় ভূম্যধিকারী মৌলভী ইরসাদ আলি খাঁ চৌধুরী উহা আমাকে প্রদান করেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার এক পাঠোদ্ধার করিয়া 'সাহিত্য-পরিষদ' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকাতেও উহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা ৪৩২ খ্রীঃ অঃ উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন। স্কন্দগুপ্ত যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন, তিনি এসিয়াবাসী হূনদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নিজ সাম্রাজ্যের রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিছুদিন হইল দিনাজপুরের কালেক্টার সাহেব উক্ত জেলার ফুলবাড়ী নামক স্থানের নিকটে আবিষ্কৃত পাঁচখানা প্রাচীন তাম্রশাসন পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই তাম্রফলকসমূহ হইতে জানা গিয়াছে যে, গুপ্ত যুগে বঙ্গদেশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কি ভাবে তৎকালে ভূমিবিক্রয় কার্য্য সম্পন্ন হইত, এই তাম্রশাসন-সমূহ হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নবাবিষ্কৃত তাম্রফলকগুলির প্রমাণ বলে জানিতে পারা যায় যে, ফরিদপুরে আবিষ্কৃত তাম্রফলক-চতুষ্টয়কে আর কূটশাসন বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতঃপূর্ব্বে ঐ তাম্রশাসন কয়খানা কূটশাসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—কিন্তু

এতদ্দ্বারা তাহার অলীকত্ব প্রমাণিত হইবে। ভূমিতে স্বত্ব কাহার ? এই প্রশ্নেরও সমাধান এই তাম্রশাসনগুলির প্রমাণ-বলেই হইতে পারিবে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রাচীন-লিপি-পাঠক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ মহাশয় এই তাম্রশাসনগুলির পাঠোদ্ধারে ব্রতী আছেন।

ফারগুসনের মতে, গুপ্ত নৃপতিদের অধিকার কালই আমাদের শিল্পোৎকর্ষের চরমকাল। এই সময়ে ভাস্কর-বিদ্যার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তেমন আর কখনও হয় নাই। এই সময়ের নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিগুলি সত্য সত্যই তক্ষণ-শিল্পের মনোহর নিদর্শন। এই যুগ ভারতীয় শিল্পের একটি উন্নত যুগ, এই যুগে আমাদের শিল্পিগণ যে সমুদয় তক্ষণ-শিল্পের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল নিদর্শনের অনিন্দ্য শিল্প-চাতুর্য্য ও ভাবমাধুর্য্য যিনি সেই যুগের কোন না কোন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। যিনি শিল্প বোঝেন না, জানেন না, তিনিও দর্শনমাত্র আমার উক্তির যথার্থতা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গের বাহিরে গুপ্তাধিকার-কালের শিল্প-নিদর্শন বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হইলেও, বঙ্গদেশও সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয় নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় তৎকালীন শিল্প-নিদর্শন (একটী দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি) রাজসাহী জেলার কোনও স্থান হইতে সযত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। বারেন্দ্র ভূমিতে এবং পূর্ব্ববঙ্গে এখনও হয় ত কত মূর্ত্তি লোক-চক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত আছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে ?

স্থানেশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের দ্বন্দ্ব ঘটে। হর্ষের বন্ধু কামরূপাধিপ ভাস্করবর্ম্মা যে কর্ণসুবর্ণেও কতকটা অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত তদীয় তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়। তাঁহার সম্বন্ধে বাণভট্ট বিরচিত "হর্ষ-চরিত", চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াংয়ের ভ্রমণ-কাহিনী ও দুই একটী খোদিত লিপি ব্যতীত অধিক কিছু জানা যায় নাই।

অতঃপর নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া, আমাদের দেশের অধিবাসিগণ "মাৎস্য-ন্যায়" দূর করিবার জন্য গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গোপালদেবই পাল নরপালবংশের প্রথম ভূপাল, ইনিই ইতিহাসে প্রথম গোপাল নামে পরিচিত। এই বিষয়টীকে জনশ্রুতিমূলক উপকথা মনে করিয়া অনেকে সত্যরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন; এবং উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী ইতিহাসানুশীলনকারী-দের পক্ষে যে ন্যায়সঙ্গত তাহাও ঠিক। ধর্ম্মপালদেবের যে তাম্রশাসন দ্বারা এই জনশ্রুতি এক্ষণে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ তাম্রফলকখানার কথা যখন প্রথম শ্রুত হই, তখন মালদহের অন্তর্গত খালিমপুরের যে কৃষক এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে সিন্দুর-বিলেপন দ্বারা উহার পূজা করিত, কাহাকেও দান বা বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইত না। পরলোকগত বন্ধুবর উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্ এ মহাশয় মালদহের কালেক্টার হইয়া আসিলে, তিনি সংবাদ পাইবামাত্র অশ্বারোহণে খালিমপুর যাইয়া, কৃষক-পত্নীর নিকট হইতে ঐ তাম্রফলকটী দশ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া আনেন। তিনি যদি তাম্রশাসনখানির সংগ্রহ-কার্য্যে এত ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর এই জাতীয় গৌরব কোন দিন ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক সত্যরূপে গৃহীত হইত কি না, তাহাই সন্দেহস্থল। আজ সেই পরলোক-গত বন্ধু স্বর্গে—আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া চক্ষে জল আসিতেছে—এই আবিষ্কারের জন্য—উমেশচন্দ্রের এই ক্লেশ-স্বীকারের জন্য,—সমগ্র বঙ্গবাসী শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহার নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করিবে। এই লিপি খালিমপুরের লিপি নামে পরিচিত। ইহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক 'মাৎস্যন্যায়' (অরাজকতা) দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া (রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া) দিয়াছিল, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই নৃপতি বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রজাশক্তির সাহায্যে সংস্থাপিত সাম্রাজ্য আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরপশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

গোপালের পরে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মপাল, দেবপাল বিগ্রহপাল,, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, মহীপাল, প্রভৃতি রাজত্ব করেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বাঙ্গাল বলেন। বাঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল বুঝিতে পারি না। সেকালে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'হরিকেলিয়া' বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। রামপালের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"আধারো হরিকেল-রাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলোপপমঃ॥

বাঙ্গাল শব্দ দ্বারা দিন দিন পূর্ব্ব ও পশ্চিমে একটা ব্যবধান রচিত হইতেছে, উহা দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হওয়া উচিত।

পালরাজবংশের দ্বিতীয় মহীপালদেবের অনীতিকারম্ভে বরেন্দ্রে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; জনসাধারণ কৈবর্ত্তপতি দিব্বোককে নেতৃত্বে বরণ করিয়া, এই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। ভোজবর্ম্মার বেলাবো তাম্রশাসনেও দিব্বোকের বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহাও বাঙ্গলার ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা। এই সমুদয় ঘটন সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত 'রাম-চরিতে' উল্লিখিত আছে। রামপাল অত্যন্ত খ্যাতিমান নরপতি ছিলেন। রামচরিতে, সমসাময়িক সাহিত্যে, এবং তাম্রশাসনে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত আছে। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া, রামপাল রামাবতী নামক এক সুন্দর নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া ধীরে ধীরে পাল-রাজবংশ ধ্বংস হইল, কেমন করিয়া সেনরাজবংশ বঙ্গদেশে প্রাধান্য লাভ করিল, সে সব কথা সবিস্তারে বলিবার স্থান বা সময় ইহা নয়।

এ প্রসঙ্গে আমাকে একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। এ কথাটি এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা বিক্রমপুরের কথা। চিরদিনের প্রাচীন বিক্রমপুর, চিরদিনের জ্ঞান-বিদ্যা-ভূষিত বিক্রমপুর যে কেমন করিয়া সহসা বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল, সে রহস্য বুঝিয়াই উঠিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেমন আমাদের দেশ জেলা, মহকুমা, পরগণা ইত্যাদিতে বিভক্ত, তদ্রূপ প্রাচীনকালে 'ভুক্তি' বলিতে প্রদেশকে (Province) বুঝাইত, যেমন 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, বর্দ্ধমান ভুক্তি ইত্যাদি। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সীতাহাটী গ্রামে বল্লালসেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রাঢ় বর্দ্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত থাকা জানিতে পারা গিয়াছে। বিক্রমপুর বরাবরই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত, উহা বর্দ্ধমানে চলিয়া গেল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে? আপনারা কৌশলে আমার নিকট হইতে এই কথাটি বাহির করিয়া লইলেন। যখন এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, তখন স্বযত্নে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আপনারা সে সতর্কতা দূর করিয়া দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের অতীতগৌরব অতুলবিভব-মণ্ডিত বিক্রমপুর কখনও বর্দ্ধমানে যাইতে পারে না—উহা পূর্ব্ববঙ্গেই অধিষ্ঠিত, এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাস নানা জটিলতায় সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রান্তে এক সময়ে খড়্গ রাজবংশ নামক এক রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় একখানি তাম্রশাসন বাহির হয়। উহা এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পত্তি। কিন্তু উহা হারাইয়া গিয়াছিল। স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্করের পিতা স্বর্গীয় হরিমোহন লস্কর মহাশয় উহা বিক্রয়ার্থ আমার নিকট লইয়া গেলে, উহা এসিয়াটীক্ সোসাইটীর সম্পত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আমি ক্রয় করি নাই, কেবল পাঠোদ্ধারের জন্য ছবি তুলিয়া লইয়াছিলাম। ঐ তাম্রশাসন গতকল্য ঢাকা মিউজিয়মে দেখিলাম। আমার গৃহীত ছবির সাহায্যে ঐ তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঢাকার গৌরব, পূর্ব্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল, বরেন্দ্র অনুসন্ধান

সমিতির লিপিপাঠক শ্রীমান রাধাগোবিন্দ বসাক বহু অধ্যবসায়ে উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাহা Epigraphia Indica তে প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ইতিহাসের আর একটি লুপ্ত অধ্যায়ও শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দের চেষ্টা ও যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে,--উহা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনখানি বিক্রমপুর পঞ্চসার গ্রামনিবাসী জনৈক বণিকের নিকট হইতে শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দ বসাক অনুসন্ধান সমিতির অর্থে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় বঙ্গের এক যুগের লুপ্ত ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বংশোদ্ভব শ্রীচন্দ্রদেব শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতী নান্যমণ্ডলস্থ জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরা বৌদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে শ্রীবিক্রমপুরে আগমন করিলেন, সে ইতিহাস বিশেষ আলোচনার যোগ্য। 'স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ' এইরূপ উল্লেখ দেখিয়া চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরা যে কিয়ৎকাল বিক্রমপুরে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

গুপ্ত, পাল, ও সেনবংশের সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়েই মধ্য যুগকে বঙ্গদেশের গৌরবযুগ বলা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আমরা তাম্রলিপি, সাহিত্য, শ্রীমূর্ত্তি, প্রভৃতি হইতে যে গৌরব-চিত্রের আভাস পাইয়াছি, তদ্দ্বারাই একদিন বাঙ্গালী জাতি যে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ছিল, তাহারা যে প্রতাপশালী ছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সাধারণ সংস্কার এই ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থাদি বা তাহার টীকা বাঙ্গালী কর্তৃক সম্পাদিত হয় নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি অনুসন্ধান দ্বারা সে সংস্কারের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভারবীর, মেঘদূতের বাঙ্গালীকৃত পুরাতন টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধীরে ধীরে সে সমুদয় গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে—একদিন বাঙ্গালীরাও সংস্কৃত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন।

হে যুবকগণ! তোমরা মনে রাখিও, যে জাতির অতীত এরূপ মহিমান্বিত ছিল, যাহার বর্ত্তমান বিদ্যাবুদ্ধির জন্য সমগ্র ভারতে গৌরব লাভ করিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ নব নব ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে সুশোভিত হইবেই। যুবকগণ! তোমরা দেখিতেছ যে পালরাজারা একদিন বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া, নানাভাবে নানা বিষয়ে আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমাদেরি মত বাঙ্গালী ছিলেন, বিদেশী ছিলেন না—তাঁহারা নবাগত নহেন, আমাদেরি এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা জননী জন্মভূমির অধিবাসী ছিলেন। যুবকগণ! তোমরা শুধু তুচ্ছ মোহে মোহিত থাকিও না,—তোমরা অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান কর, অধ্যয়ন কর, শিক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিতে পারিবে, তোমরা কি ছিলে। আশা করি, ভরসা করি, বিশ্বাস করি, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা আর মোহান্ধকারে ডুবিয়া রহিবেন না, দেশ-জননীর কমনীয় কণ্ঠে ইতিহাসের উজ্জ্বল গৌরবমাল্য পরাইয়া, প্রকৃত গৌরব অনুভব করিবেন।

অল্প সময়ে অনেক কথা বলিতে হইল। কাজেই তেমন করিয়া কোন কথা গুছাইয়া বলিতে পারি নাই,—সে শক্তিও আমার নাই। দীর্ঘকাল ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া যে সামান্য সত্যের সমুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছি, আজ তাহার সাহায্যেই মধ্যযুগের বঙ্গদেশের ইতিহাসের কয়েকটি কথা বলিতে সমর্থ হইলাম। আমার এ বক্তৃতা শুনিয়া যদি একজন যুবকও ইতিহাসানুরাগী হন, তাহা হইলেই আমি আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব। "ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ" আমাকে এই সুযোগ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার নেতৃগণকে, এবং আপনারা আমার বক্তৃতা যেরূপ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন সে জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

গ্রন্থ-সমালোচনা

"অরণ্যবাস"—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, বি, এল্ প্রণীত, মূল্য ১।০

বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে এ বইখানি সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। উপন্যাস আকারে লিখিত হইলেও ইহা বস্তুতঃ অধুনাতন বাঙ্গালী-জীবনে আহার্য্য-সমস্যার একটী উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লেখক কেবল কল্পনা লইয়া ক্রীড়া করেন নাই। তাঁহার লিখিত "উপন্যাসের" বিষয় কাল্পনিক অথবা অসম্ভব নহে।

বিপন্ন বাঙ্গালী কিরূপে কৃষিকার্য্য দ্বারা দরিদ্রতার কঠোর নিস্পেষণ হইতে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন; ছোট নাগপুর অঞ্চলে আরণ্য ভূমি চাষ আবাদ করাইয়া, বন্য জন্তুর কবল হইতে দেশ মুক্ত করিয়া; অরণ্যাণী কাটাইয়া, চির উর্ব্বর ভূমিকে প্রচুর শস্যশালিনী করিয়া, হাটবাজার বসাইয়া, জীবন-সংগ্রামে মৃতপ্রায় একজন বাঙ্গালী কিরূপে পুরুষোচিত আত্মনির্ভরগুণে ঘোরতর দারিদ্র হইতে পরমসম্পৎশালী হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহারই বিশদ চিত্র নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে।

ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই, লোমহর্ষণ হত্যা কিম্বা রসাল প্রেমের কাহিনী নাই। খোলামাঠে ছোট নদীর মত ধীর-মন্থর-গতিতে একটী বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের ইতিবৃত্ত অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে অগ্রসর হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস হইতেও তৃপ্তিপ্রদ আনন্দে পাঠককে অভিভূত করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া এ গ্রন্থে কবিত্বের অভাব নাই। ছোট নাগপুরের পর্ব্বতমালা, বনরাজি, গিরি-নদী, অপূর্ব্ব বনস্থলীর জীবন্ত বর্ণনায় লেখক সিদ্ধহস্ত।

মূল কথা, লেখক "অরণ্য-বাসকে" নানারূপে এমন লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছেন যে জীবন-সংগ্রামে হতাশ্বাস প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইহা পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে "অরণ্যবাস" লিখিয়াছেন তাহা সফল হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

"চিন্তা-লহরী"—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি, এল্ প্রণীত।

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ গভীর চিন্তাপূর্ণ পুস্তক বেশী প্রকাশিত হয় না। গ্রন্থখানি আগাগোড়া দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ, এবং আধুনিক দার্শনিক তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত। ব্যবহারাজীবীর নিত্য-কর্ম্মশীল জীবনেও লেখক এমন সুন্দর অথচ গভীর চিন্তার লহরী সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, ইহা কেবল আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু ভাবরাজ্যে তাঁহার অনায়াস আধিপত্যের সূচক। তাহার "স্মৃতি" তে অনেক অভিনব মনস্তত্ত্বের খবর আছে; 'প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে' প্রাচীন ভারতের একটী দুরূহ সমস্যার সমাধান আছে; 'ভূমৈব সুখম্' এই বাক্যটীর অনুসরণ করিয়া লেখক সুখের হেতুভূত সেই আনন্দ-ঘন পরমার্থের লাভই সুখের চরম সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই হিন্দু দর্শনের সুখ-চিন্তার পরাকাষ্ঠা। যে দুইটী প্রবন্ধে লেখক সৌন্দর্য্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা একদিকে যেমন তাঁহার দেশীয় ও বিদেশীয় দর্শনের সহিত প্রগাঢ় পরিচয়, অপর দিকে তেমন স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির সূচনা করিতেছে। লেখক তত্ত্বগুলির যে রূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা নিতান্তই প্রীত হইয়াছি। অসার সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ নভেল পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক কবে এমন গভীর বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে?

—কা।

অশোক অনুশাসন *

ধর্ম্মপদ নামক পালিগ্রন্থের সুযোগ্য অনুবাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সম্প্রতি 'অশোক অনুশাসন' নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অশোকের সমুদয় অনুশাসনগুলির মূল ও বঙ্গানুবাদ এবং কতকগুলির সংস্কৃত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপক্রমণিকায়, প্রাচীন যুগের অনুশাসন সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ তথ্য, মৌর্য্য যুগে বিশেষতঃ অশোক লিপিতে পারশীক প্রভাব, ভারতবর্ষীয় লিপির উৎপত্তি ও প্রকৃতি আলোচনা, মৌর্য্যযুগের সংখ্যা নির্দ্দেশ প্রণালী এবং অশোক অনুশাসনের ভাষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অশোক-লিপিতে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের টীকা, অশোক অনুশাসন-গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ও কালনিরূপণের বিচার, এবং যে সমুদয় স্থানে অশোকের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব বস্তু। প্রাচীন যুগের ইতিহাস-সন্ধানে এই অনুশাসনগুলি কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। বর্ত্তমান কালে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে, অশোক অনুশাসনগুলির আবিষ্কারই তাহার মূল কারণ। যে সমুদয় উপাদান-সাহায্যে এই রাজ্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিলালিপিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোক লিপির পাঠোদ্ধার না হইলে শিলালিপির সাহায্যে ইতিহাস রচিত হইতে পারিত না। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া যাইত।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাহা কিছু বিশ্বাস-যোগ্য তৎসমুদয়ই প্রায় বিগত একশত বৎসরের মধ্যে, আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার বহুল পরিমাণে প্রত্ন-লিপিতত্ত্ব (Paleography) দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। অশোক লিপির আবিষ্কারই ভারতবর্ষে এই প্রত্নলিপিতত্ত্বের আলোচনার প্রথম সোপান। সুতরাং প্রাচীন মিশর দেশের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য রসেটা লিপি যে গৌরবময় আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারতবর্ষেও অশোক লিপি সেই গৌরবময় আসন পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

আবার আর একদিক হইতে দেখিলে রসেটা লিপি বা পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন লিপি অপেক্ষা অশোক লিপির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে। অশোক লিপিতে প্রাচীন যুগের একজন রাজচক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মপ্রাণ জীবনের যেরূপ সুস্পষ্ট চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে অশোক লিপি যে স্থান অধিকার করে, পৃথিবীর অপর কোন লিপি তত্তুল্য বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করিতে পারে না। ভারতবাসীর প্রাচীনকালের কীর্ত্তিকথা সকলই বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি যুগযুগান্ত সাধনার ফলে যে প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিতেছিল, তাহা যে কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে, ইহা জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিবার জন্যই যেন মহারাজ অশোকের লিপি বক্ষে করিয়া এই প্রস্তর ও স্তম্ভগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া কত ঝড়ঝঞ্ঝাধ্বংসের হস্ত হইতে কোন মতে রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন এই লিপিগুলি কোন বিজয়দৃপ্ত নরপতির সমর-গৌরব অথবা সাম্রাজ্য-বৈভবের কীর্ত্তিকথা বিঘোষিত করে না, পরন্তু আসমুদ্রহিমাচলের অধীশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী রাজাধিরাজের দীনাতিদীন ধর্ম্মভাব প্রকটিত করিয়া, প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা কি, তাহা যেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে প্রদর্শন করে।

অশোক লিপির প্রকৃত মূল্য অবগত হইয়া ইউরোপীয় বহু মনীষিবৃন্দ ইহার পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাকার্য্যে স্বীয় শক্তি

---

* "অশোক অনুশাসন"—শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত, ও শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ১॥০ টাকা (কাপড়ে বাঁধান ২৲ টাকা)।

নিয়োজিত করিয়াছেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ অশোক লিপির পাঠোদ্ধার করেন। সেই অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই অশোক লিপি সম্বন্ধে যে সমুদয় আলোচনা হইয়াছে তাহা একত্রিত করিলে বৃহদাকার গ্রন্থ-সমূহে পরিণত হয়। বর্ত্তমান কালেও এই আলোচনার বিরাম হয় নাই। নাই। পুরাতন লিপির ব্যাখ্যা-সংশোধন এবং নূতন লিপি আবিষ্কার এখনও চলিতেছে। ১৩২২ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ চারুবাবু তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। এই অনধিক এক বৎসরের মধ্যেই অশোকের নূতন লিপি * আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং অশোক লিপি সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু ইউরোপীয় ভাষায় অশোক লিপির বহু আলোচনা হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ আলোচনা নিতান্ত বিরল। এমন কি, চারুবাবুর এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে সমগ্র অশোক লিপির মূল ও বঙ্গানুবাদ পর্য্যন্ত কখনও বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহা নিতান্ত অগৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। সুতরাং চারুবাবু তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যে বাঙ্গালা সাহিত্যের মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

চারুবাবুর এই গ্রন্থে মৌলিক গবেষণার কোন দাবী নাই। বিশেষজ্ঞগণ অশোক লিপির যেরূপ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, চারুবাবু তৎসাহায্যেই তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অশোক লিপি সম্বন্ধে যে সমুদয় দুরূহ সমস্যা বা কূট তর্কের অবতারণা করা যাইতে পারে, তিনি তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন নাই।

এই গ্রন্থ পণ্ডিতের জন্য লিখিত নহে। সাধারণ পাঠক যাহাতে অশোকের লিপি ও তাহার অর্থ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারে, ইহাই বোধ হয় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এইগুলি বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচিত না হইলেও সাধারণ পাঠক এই সমুদয় হইতে মৌর্য্যযুগ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। কিন্তু এই উপক্রমণিকায় চারুবাবু যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন আমি তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(ক) "প্রাচীন ভারতে মহারাজ অশোকই উৎকীর্ণ শিলালিপির সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন" (৶০)। এ কথা স্বীকার করা কঠিন।

(খ) "ভারতের প্রাচীনতম রাজানুশাসন অশোক অনুশাসনের ভাব ও রচনা প্রণালীর সহিত পারস্য সম্রাট দারয়বুসের অনুশাসনের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।" (।৶০) এই দুই অনুশাসনের মধ্যে 'রাজা কহিতেছেন' এইরূপ আরম্ভ ব্যতীত রচনা-প্রণালীর অপর কোন সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। আর ভাবের সাদৃশ্য থাকা তো দূরের কথা, বরং উভয় অনুশাসনের ভাবের পার্থক্য বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। একটিতে রাজ্যধনসম্পদ শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা, অপরটিতে যাহাতে লোকের মনে ধর্ম্ম-ভাবের বৃদ্ধি হয় তাহারই ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহ।

(গ) "ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার আকার ও গঠন-প্রণালী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে উহাও যে প্রাচীন বস্তুচিত্র (Hieroglyphics) হইতে উৎপন্ন তাহা

* ১৩২৩ সনের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রতিভা' দ্রষ্টব্য

দেশ বুঝিতে পারা যায়।" এতটা দৃঢ়তার সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপযুক্ত প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

(ঘ) "সিদ্ধপুর অনুশাসনেতে 'নড' নামক লেখক খরোষ্ঠী অক্ষরে নিজনাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এমন কি দ্রাবিড়দেশ মহীশূরেও এই লিপি বোধগম্য ছিল।" এইরূপ সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত নহে।

মূল গ্রন্থের প্রথমে অশোক লিপির মূলানুগত পাঠ, তৎপরে তাহার সংস্কৃত অনুবাদ, এবং সর্ব্বশেষে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ গিরিলিপি; চতুর্থ,পঞ্চম,ষষ্ঠ,সপ্তম স্তম্ভলিপি; এবং অন্যান্য কয়েকটি লিপির সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হয় নাই কেন তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। এই সংস্কৃত অনুবাদ সর্ব্বত্র সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাসেরাম শিলালিপির সংস্কৃত অনুবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চারু বাবু লিখিয়াছেন, " অহং এতেন অন্তরেণ জম্বুদ্বীপে (যে) অমৃষা দেবাঃ আসন্ তে মনুষ্যাঃ মৃষাঃ দেবাঃ কৃতাঃ" (৫০-পৃঃ), এই অনুবাদের অমৃষাঃ ও মৃষাঃ এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ যে যুক্তি-যুক্ত নহে, এবং তৎস্থলে যে "অমিশ্রা" ও 'মিশ্রা" শব্দ ব্যবহার সমীচীন, চারুবাবু ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং উক্ত লিপির বঙ্গানুবাদের সময়ও তিনি মূল লিপির 'মিসা' কে 'মিশ্রা'রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন (৮৫পৃঃ)। এমত স্থলে সংস্কৃত অনুবাদের "অমৃষাঃ ' ও "মৃষাঃ" শব্দদ্বয়কে অনবধানতার ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

পরিশিষ্টে চারুবাবু যে "টিপ্পনী' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, সম্প্রতি অশোকলিপি সম্বন্ধে যে সমুদয় আলোচনা হইয়াছে তাহার সকলগুলির সহিত চারুবাবু সম্যক্ পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ১৯১৩ সনের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকো-য়ারীতে অশোক লিপি সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার দিকে চারু বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অশোক অনুশাসন বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। সুতরাং যে সমুদয় ভুলত্রুটি গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান তাহা কতকাংশে অপরিহার্য্য। কিন্তু এই সমুদয় ভুলত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজী অনভিজ্ঞ যে সমুদয় পাঠক অশোক লিপির সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক-পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ও কয়েকখানি অশোক লিপির প্রতিকৃতি গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় গ্রন্থখানির উপ-যোগিতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সাধারণ পাঠক ইহার সাহায্যে ব্রাহ্মীলিপি আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য যে চারুবাবু এই গ্রন্থখানি লিখিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত করিয়াছেন। এ জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

কিশোরী উষা

এত ভোরে স্নান করে লো দুলালী মেয়ে
কোথা হতে আ'লি ?
কুহেলি-ওড়না গায়ে, করে হাতে রচি
আবিরের থালি !

গগনের নগ্ন অঙ্গ; করে দিলি রাঙ্গা
মুঠি মুঠি ফাগে,
কুঙ্কুম ছড়ায়ে দিলি নীল সিন্ধুনীরে—
নব অনুরাগে।

নীহারের হীরাহারে রঞ্জিল কে তোর
কনককুণ্ডল,
রক্তপদে কেবা দিল অরুণ-অঞ্জলি
জবা শতদল ?

কোন সুর-সুন্দরীর সীঁথির সিন্দুর
লেপিলি ললাটে,
শিশিরে কে উর্ব্বশী ধুইলা চরণ
পূর্ব্বাশার ঘাটে ?

সিন্ধুনীর সমীরের অমিয় পরশে
জাগালি জগৎ
গাছে গাছে একসাথে দিলি বাজাইয়া
খগনহবৎ !—

টিকাড়া পিটায়ে কাক রটে বনে বনে
তব আগমনী,
রামশিঙা ফুকারিয়া ঘোষে যামঘোষ
"যায় যে যামিনী"!

কোন্ যাদু মন্ত্রবলে সুপ্ত বসুধারে
দিলি জাগরণ,
লতায় লাবণি, মৌন মুকুলে পুলক,
শষ্পে শিহরণ !

কার সঙ্গে হোলি খেলে—কহ লো কিশোরী !
হ'লি লালে লাল,
মেঘকুঞ্জে ডাকে কি রে বাঁশরী বাজায়ে
নন্দের দুলাল ?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ | শ্রাবণ ১৩২৩ | ৪র্থ সংখ্যা

পাখীর বিবাহপদ্ধতি *

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এখনও পৃথিবীর নানাদেশে বিবাহের প্রণালীতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রাচীন কালে কন্যা কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করার প্রচলিত রীতির স্মৃতি এখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই; তাই আজিও তাহাদের বিবাহের সময় কৃত্রিম কলহের অভিনয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কন্যাবিক্রয় আজিও প্রচলিত; কোথাও আবার কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার পীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। য়ুরোপীয় সমাজে যুবক-যুবতীর মধ্যে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার না হইলে বিবাহ হয় না।

পক্ষি-জগতেও বিভিন্ন প্রকারের বিবাহ প্রচলিত। অবশ্য এমন অনেক পাখী আছে যাহাদের ভ্রাতা-ভগ্নীই সাধারণতঃ চিরকাল স্ত্রী-পুরুষভাবে জীবন কাটাইয়া দেয়। কাহারও মৃত্যু না হইলে ইহাদের বিবাহেরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক পাখীরই বিবাহ ব্যাপারটা বার্ষিক। বৎসরের সকল সময় ইহাদের পত্নীর প্রয়োজন হয় না, কেবল জনন-ঋতুতেই ইহারা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য মিলিত হয়। এই সময় পুরুষ-পক্ষীকেই নানা প্রকারে প্রণয়িনীর তুষ্টি সম্পাদন করিয়া পত্নী সংগ্রহ করিতে হয়। বসন্তে ঘরের ভিতর বসিয়া আমরা যখন উপন্যাস পাঠ করিতে থাকি, তখন আমাদের জানালার কাছে পাখীদের মধ্যেই যে কত উপন্যাসের অভিনয় হইতে থাকে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রতিযোগিতার প্রকারভেদ

পত্নী-সংগ্রহের নিমিত্ত পাখীরা বিভিন্ন প্রকারে প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। কেহ হয় ত সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া, প্রণয়িনীর কৃপাপ্রার্থী হয়। কেহ হয় ত নর্ত্তন-নৈপুণ্যে প্রিয়তমার মনোহরণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। কোন কোন পাখী আপনার রূপ-সম্পদ লইয়া পত্নী

* "পাখীর কথার" অন্তর্গত ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লাভের আশায় বিবাহ-বাজারে উপস্থিত হয়। আবার কোন পাখী প্রাচীন ক্ষত্রিয় নরপতিগণের ন্যায় শারীরিক বলের দ্বারাই পত্নী সংগ্রহ করে। মনে রাখিতে হইবে, পক্ষি-জগতের বিবাহ-পদ্ধতির সম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া গেল না; কারণ তাহা হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে।

বহু পাখী পত্নীলাভের জন্য সঙ্গীতে প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে, সুতরাং এই স্থলে পাখীদের সঙ্গীতশক্তির একটু আলোচনা করা যাউক। বলিয়া রাখা ভাল, পাখীর ডাকমাত্রই সঙ্গীত নহে; শ্যামা ও দয়েল গান করে। কোকিলের ডাককে গান বলা যায় কি না সন্দেহ; আমাদের দেশের বুলবুল ডাকে মাত্র, কখনই গান করে না। বিলাতী নাইটিঙ্গেল ও পারস্যের বুলবুল একজাতীয়, তাহারা উভয়েই সুগায়ক। বঙ্গদেশীয় বুলবুল কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় পাখী। ইহার ডাককে আমরা গান বলিতে প্রস্তুত নহি। সঙ্গিনীকে তাহার অবস্থিতি-স্থল জানাইবার জন্য বুলবুল ডাকিয়া থাকে। দয়েল প্রভৃতি গায়ক পাখীও কিন্তু সকল সময় গান করে না; কখনও কখনও ইহাদের কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হয়। তখন সুকণ্ঠ দয়েলের স্বাভাবিক মিষ্টস্বরের পরিবর্ত্তে এক প্রকার কর্কশ শব্দ বাহির হয়। আবার কখনও কখনও পাখীরা অসতর্ক সঙ্গীকে আসন্ন বিপদ জ্ঞাপন করিবার জন্য একপ্রকার শব্দ করে; এই বিপদসূচক শব্দ বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নহে।

পাখীর সঙ্গীত

বিহঙ্গ-কণ্ঠের সঙ্গীত কিন্তু মানুষের বাদ্য-যন্ত্রে অনুকরণ করা যায় না। আদিম মানবের উল্লাসের ধ্বনি বা উদ্দাম রণবাদ্যের সহিত আরণ্য বিহগের সকল নিয়ম-বর্জ্জনের অতীত সুরভঙ্গিমার হয় ত প্রকৃতিগত ঐক্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই সভ্যতার যুগে উন্নততর জ্ঞান লইয়াও বিংশ শতাব্দীর মানুষ আপনার সঙ্গীতে বিহগ-কণ্ঠের উদ্দাম গীতির অনুকরণ করিতে পারে নাই। তাই বলিয়া মানুষের সঙ্গীত-বিজ্ঞানের উপর বিহগ-গীতির যে কোনই প্রভাব নাই এমন কথা বলা যায় না। ভারতবর্ষে সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অবশ্য কোন উন্নতি হইতেছে না; এখানকার ওস্তাদেরা পুরাতনেরই চর্চ্চা করিতেছেন; নুতন উদ্ভাবনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। কিন্তু সজীব য়ুরোপে সকল শাস্ত্র সকল বিজ্ঞানই নব নব সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। ওয়ার্ড ফাউলার (Warde Fowler) বলেন যে, য়ুরোপের বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য বিটহোভেন (Becthhoven) তাঁহার উদ্ভাবিত একটি সুরে, (Smppony in C minor) ইয়েলো হেমার নামক পাখীর গানের অনুকরণ করিয়াছেন। ফাউলারের মতে বিটহোভেনের আরও একটি সুরে বিহগ-গায়কগণের প্রভাব লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিহগের সঙ্গীত-যন্ত্র ও মানুষের বংশীর মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

সঙ্গীত-বিজ্ঞানের উপর পাখীর গানের প্রভাব

একটি নলের ভিতর বায়ুচালনা করিয়া আমরা সুর বাহির করি; পাখীর সঙ্গীতযন্ত্রও একটি লম্বা নল ও একখানি অতি পাতলা পর্দ্দা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ফুসফুস হইতে বায়ু এই নলের ভিতর প্রবেশ করিলে এই পর্দ্দাখানির কম্পনেই পাখীর গলার বাঁশী বাজিয়া ওঠে। বিভিন্ন রন্ধ্রে আঙ্গুল চালাইয়া ও বাঁশীর মুখে জিহ্বা লাগাইয়া আমরা সুর উঠাই, নামাই, কাঁপাইয়া তুলি। পাখীর গলার বাঁশীতেও সুরের এই ক্রীড়া কতকগুলি মাংসপেশীর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। সুতরাং যে সকল পাখী সঙ্গীতের সাহায্যে প্রণয় জ্ঞাপন করে, কবির ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের গলার বাঁশীও—"রাধা রাধা রাধা বলে"। সাধারণের বিশ্বাস আছে যে পাখীরা তাহাদের ঠোঁট এবং জিহ্বা দ্বারা গান করে। এই বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্ত।

পাখীর সঙ্গীত-যন্ত্র ও বংশী

সাধারণতঃ গায়ক পাখীরা একাকীই গান করিয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন পাখী দলবদ্ধ হইয়া ঐকতান সঙ্গীত

আরম্ভ করে। আমাদের দেশের হাঁসজাতীয় সরাইল শীতকালে গগনপথে বিচরণ কালে দলবদ্ধ হইয়া চীৎকার করে, শালিকদেরও কখনও কখনও মিলিত ভাবে ডাকিতে দেখা যায়, কিন্তু ইহাদের কাহারও ডাকই সঙ্গীতের মর্য্যাদা রক্ষার যোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আমাদের কয়েকটি বিদেশী পাখীর নাম করিতে হইবে। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্রেষ্টেড স্ক্রিমার (Crested screamer) নামক এক প্রকার পাখী আছে। হাডসন্ (Hudson) সাহেব বলেন যে, একদিন ভ্রমণ কালে তিনি এই পাখীর লক্ষ লক্ষ সম্মিলিত স্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকার ক্রেষ্টেড স্ক্রিমার

পাখীরা ক্রোধ, ভীতি এবং প্রণয়সূচক মৃদুগুঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াও আবার গান করে কেন? ইহার উত্তরে নানা পণ্ডিত নানা প্রকারের অনুমান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, গায়ক পাখীদিগকে সঙ্গীতশক্তি প্রভাবেই পত্নী-সংগ্রহ করিতে হয়। সঙ্গীত-সময়ে যে গায়ক তাহার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই পক্ষিণীরা সাধারণতঃ পতিত্বে বরণ করে। সুতরাং পুরুষানুক্রমে এই সকল পাখীর গান গাহিবার ক্ষমতা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই মতের বিরোধিগণ বলেন যে, গায়ক পাখীরা জনন-ঋতু আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেই তাহাদের সঙ্গীত আরম্ভ করে। এবং জনন-ঋতু শেষ হইবার কিছুকাল পরেও তাহাদের সঙ্গীত থামে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের বাসা লুণ্ঠিত হইবামাত্রই ইহারা গান আরম্ভ করিয়া দেয়। আমাদের অমর কবি মধুসূদন তাঁহার শ্যামা শীর্ষক কবিতায় শেষোক্ত যুক্তির উত্তর দিয়াছেন। কে বলিতে পারে পাখীর গানের ভিতর দিয়া তাহাদের হৃদয়ের বেদনাও প্রকাশিত হয় কি না? অণ্ডরক্ষায় নিযুক্ত, নীড়ে উপবিষ্ট সঙ্গিনীর শান্তি-বিনোদনের নিমিত্তও হয়ত তাহারা গান করিয়া থাকে!

সঙ্গীতের কারণ

আর একদল পণ্ডিত বলেন, স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রাচুর্য্যই পাখীর গানের প্রকৃত কারণ। তাহারা বলেন যে, জীবন-রক্ষা ও দেহের পুষ্টিসাধন করিতে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত শক্তি পাখীরা দুই প্রকারে নিয়োগ করে। এই অতিরিক্ত শক্তির সাহায্যে হয় তাহারা দৈহিক সৌন্দর্য্যের সম্পদ বাড়াইয়া লয়, নতুবা এই শক্তিটুকু সঙ্গীত-শক্তির বিকাশে ব্যয়িত হয়। কিন্তু এই মত পূর্ব্বোল্লিখিত মতের বিরোধী নহে।

পণ্ডিতবর ডারউইনের মতে গায়ক পাখীর গান তাহাদের প্রণয়-জ্ঞাপনের উপায় মাত্র; কারণ দুইটি গায়ক পাখী একত্র গান করিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। অন্য পাখীর না হউক, কোকিলের এই অভ্যাসটুকু বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বালককালে কোকিলের সুরের মাত্রা চড়াইবার নিমিত্ত অনেকেই হয় ত তাহার অনুকরণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কোকিল কেবল সঙ্গীত-পটুতা দ্বারাই পত্নীসংগ্রহে সমর্থ হয় কি না সন্দেহ। দুই বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম দুইটি পুরুষ কোকিল গাছের ডালে লড়াই করিতেছে, আর অদূরে একটি স্ত্রী-কোকিল নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে তাহাদের কলহ দেখিতেছে। অবশ্য কোকিলের লড়াই মোরগ বা বুলবুলের লড়াইয়ের মত ভীষণ নহে। কবি লাঠি লইয়া দাঁড়াইলেও লাঠিয়ালের মত দাঙ্গা করিতে পারে কি না সন্দেহ। পূর্ব্বোল্লিখিত কোকিলের লড়াইটি ১½ ঘণ্টার অধিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহারা পরস্পরকে চারি পাঁচ বারের বেশী আঘাত করে নাই। কোকিল দুইটি পাখা মেলিয়া চারি পাঁচ হাত দূর হইতে পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছিল, ইহার মাঝে মাঝে তাহারা আপন আপন পাখা এবং পিঠ ঠোকরাইয়া লইতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ সময় একটি কোকিলও অসতর্ক শত্রুকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে নাই। প্রায় ২০।২৫ মিনিট কাল অন্তর তাহারা এক একবার উঠিয়া প্রসারিত পক্ষ দ্বারা পরস্পরকে

কোকিল

আঘাত করিয়া স্থল পরিবর্ত্তন করিয়া বসিতেছিল। আমি এই কলহের শেষ দেখি নাই, অথবা পক্ষি-জীবন সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞের গ্রন্থেও কোকিলের এবংবিধ কলহের বিষয় পাঠ করি নাই। সুতরাং কোকিলের প্রণয়-প্রতিযোগিতায় শারীরিক বলের কোন মূল্য আছে কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কারণ একটি মাত্র ঘটনার উপর কোন সাধারণ নিয়মের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। তবে কোকিল যে সঙ্গীতপটুতা দ্বারাই পত্নী-লাভের প্রয়াস পায় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ জনন-ঋতু ব্যতীত অন্য সময় আমাদের দেশীয় কোকিল ডাকে না, অথচ তাহারা বৎসরের সকল সময়ই বাঙ্গালা দেশে থাকে।

কোকিলের দাম্পত্য প্রণয়

এই স্থলে কোকিলের দাম্পত্য প্রণয়ের বিষয় কিছু বলা বোধ হয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সন্তানের প্রতি তাহার মমতা থাকুক বা না থাকুক, পিকজায়ার প্রতি পুরুষ কোকিলের প্রণয় কিন্তু অতি প্রগাঢ়। সে যেমন সুস্বরে প্রিয়ার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করে সেইরূপ সুখাদ্য দিয়াও তাহার রসনার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা পায়। তেলাকুচার সুপক্ক ফল কোকিলের একটি প্রিয় খাদ্য। অনেক দিন দেখিয়াছি কোকিল বহুদূর হইতে এই ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পত্নীকে খাওয়াইতেছে। কোকিল অনেক সময়ে পত্নীর বিশৃঙ্খল পক্ষ চঞ্চুর মৃদু আঘাতে সুবিন্যস্ত করিয়া দেয়। পত্নীকে সামান্য পরিশ্রম করিতে দিতেও কোকিলের মন সরে না। কয়েক মাস পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম করবীর শাখায় উপবিষ্ট সঙ্গিনীকে কোকিল একটি বড় ফল আনিয়া দিল। স্ত্রী কোকিলের ঠোঁট হইতে যে কয়েক বার ফলটি ভূপতিত হইয়াছে, সেই কয়েক বারই কোকিল মাটিতে নামিয়া তাহা তুলিয়া আনিয়া দিয়াছে। কলিকাতা যাদুঘরের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ভূতপূর্ব্ব ফ্রাঙ্ক ফিন (Frank Finn) সাহেব বলেন যে, দয়েলকেও প্রগাঢ় দাম্পত্য প্রণয়ের পরিচয় দিতে দেখা গিয়াছে। তিনি বলেন যে, তাঁহার বন্ধু গ্রোসার (F. Groser) সাহেব একটি আরণ্য পুরুষ-দয়েলের সহিত

দয়েল

শাবককাল হইতে প্রতিপালিত একটি স্ত্রী-দয়েল এক খাঁচায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। বন্দী অবস্থায়ই ইহাদের দুইটি সন্তান হইয়াছিল। স্ত্রী-দয়েলের মৃত্যুর পর গ্রোসার সাহেব আর যে কয়েকটি স্ত্রী-দয়েল খাঁচায় দিয়াছিলেন পত্নী-শোকাতুর ক্রুদ্ধ দয়েল তাহার প্রত্যেকটিকেই মারিয়া ফেলিয়াছে, কাহাকেও পত্নীত্বে গ্রহণ করে নাই।

পাখীর বাক্য

সঙ্গীত ব্যতীত পক্ষ ও চরণের দ্বারা শব্দ করিয়াও কোন কোন পাখী প্রণয়-জ্ঞাপন করে। আমরা এই প্রকার শব্দকে পাখীর বাক্য বলিব। আমাদের দেশে কোন বাক্যকর পাখী আছে কি না জানি না; কিন্তু বিলাতী স্নাইপ ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। ডারউইন বলেন, জনন-ঋতুতে এই পাখী প্রায় এক হাজার ফুট্ উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া কিছুকাল আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে; তারপর কম্পিত পক্ষে, প্রসারিত পুচ্ছে দ্রুতবেগে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করে।

বিলাতী স্নাইপ

কেবলমাত্র দ্রুত অবতরণ কালেই ইহাদের তথা-কথিত বাক্যধ্বনি হয়। এই শব্দকে বিভিন্ন লোকে গুঞ্জন, হ্রেষা, ও গর্জ্জন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতবর্গ এই শব্দের কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। অবশেষে জর্ম্মান পণ্ডিত হার মিভস্ (Heer Meeves) ইহার কারণ নির্ণয় করেন। তিনি দেখিলেন যে, বিলাতী স্নাইপের পুচ্ছের বাহিরের দিকের পালকগুলির গঠন অন্যান্য পাখীর পালকের গঠন হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। এই সকল পালকের মাঝের দণ্ডটি তরবারির ন্যায় ঈষৎ বক্র এবং তাহার দুই দিকের বার্ব্বগুলিও খুব লম্বা।* মিভস্ দেখিলেন, একখানি লম্বা

* বার্ব্ব ও বার্ব্বিউলের ব্যাখ্যা প্রথম প্রবন্ধে করা হইয়াছে।
—প্রতিভা—১৩২২-পৌষ সংখ্যা

লাঠিতে ইহার কয়েকটি পালখ বাঁধিয়া বাতাসে দ্রুতবেগে ঘুরাইলেই জীবিত পাখীর অনুরূপ শব্দ হয়। পালখের সংখ্যা ও আকারের তারতম্য অনুসারে শব্দেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ান

দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানও পাখার দ্বারা বিলাতী স্নাইপের পুচ্ছের শব্দের ন্যায় এক প্রকার শব্দ করে। সেলভিন (Salvin) সাহেব বলেন—"গুয়াটিমালায় পার্ব্বত্য প্রদেশে শিকারকালে আমি হঠাৎ এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি চলিতে লাগিলাম। তখন কিছুকাল পরে আবার ঐরূপ শব্দ হইল। তখন শব্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একটি পুরুষ পেনিলোপিনা নাইগ্রা (Penelopina গুয়ানের বৈজ্ঞানিক নাম) প্রসারিতপক্ষে উড়িতেছে। পাখীটি নিম্নাভিমুখী হইলেই তাহার পক্ষ হইতে এক প্রকার শব্দ হইতেছে। ঐ শব্দের সহিত ছিন্ন বৃক্ষের পতন শব্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।"

দক্ষিণ আমেরিকার মানাকিন

দক্ষিণ আমেরিকার মানাকিন (Manakin) নামক এক প্রকার পাখীও পাখার দ্বারা একরূপ বিচিত্র শব্দ করে। এই শব্দ শুনিতে অনেকটা কষাঘাতের শব্দের মত।

কালিজ ফীজাণ্ট

কালিজ ফীজাণ্ট (Krlij pheasent) নামক এক প্রকার পাখী পাখার সাহায্যে ঢাকের বাজনার ন্যায় এক প্রকার শব্দ করে। কাপ্তেন বলডুইন (Cpt. J. H. Baldwin) বলেন, "একদিন প্রায় আধঘণ্টাকাল নীরবে বসিয়া আছি, এমন সময় অতি নিকটে ঢাকের বাজনার মত একটি শব্দ শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলাম। শব্দটা আমাদের পিছন হইতে আসিতেছিল। আমার সঙ্গী ঈষৎ হাসিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বাদ্যকরকে দেখাইলেন। একটা গাছের গুঁড়ির উপর একটা মর্দ্দা কালিজ বসিয়াছিল। সেই পাখীই আপনার শরীরে পাখার আঘাত করিয়া এই অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি করিতেছিল।

নর্ত্তন, অঙ্গভঙ্গি ও অন্যান্য উপায়

এখন আমরা নর্ত্তন, অঙ্গভঙ্গি বা সৌন্দর্য্য প্রদর্শন দ্বারা যে সকল পক্ষী পত্নী-লাভের চেষ্টা করে তাহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সাতভাই বা ছাতারিয়া

আমাদের দেশের সাতভাই নিতান্ত পরিচিত পাখী। ইহাদের অনেকগুলি সর্ব্বদাই একত্র থাকে। ইহাদের মিলিত কণ্ঠের 'কিচিমিচি' শব্দ আদৌ শ্রুতিসুখকর নহে। কিন্তু এই সাতভাই যে অঙ্গভঙ্গির প্রতিযোগিতা করিয়া পত্নীলাভ করে তাহা হয় ত অনেকেই জানেন না। অনেকগুলি পুরুষ সাতভাই যখন মুখামুখি হইয়া, মাথা কাঁপাইয়া, লেজ নাচাইয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গি সহকারে কিচিমিচি করিতে থাকে, তখন হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। স্ত্রী সাতভাই কিন্তু এই প্রতিযোগিতার সময় গম্ভীরভাবে গাছের ডালে বসিয়া থাকে, তাহার স্বাভাবিক চপলতা তখন মোটেই প্রকাশ পায় না।

বুলবুল

বন্য কাল বুলবুলকেও আমি এইরূপ অঙ্গভঙ্গি করিতে দেখিয়াছি। উহারা স্বামী-স্ত্রীতে এক ডালে বসিয়াছিল। এমন সময় নীচের একটা গাছের ডালে একটি খয়েরী বুলবুল ডাকিয়া উঠিল। কাল বুলবুল তখনই প্রণয়িনীর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়া সাতভাইয়ের মত অঙ্গভঙ্গি সহকারে শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু খয়েরী বুলবুল তাহার অঙ্গভঙ্গির প্রতি মনোযোগ প্রকাশ না করাতে ব্যাপার আর বেশী দূর গড়ায় নাই। সাধারণতঃ কাল ও খয়েরী বুলবুলের বিবাহ হইতে দেখা যায় না। ইয়ুরোপে কিন্তু বিভিন্ন জাতীয়

কাকের মধ্যে অহরহঃ বিবাহ হইতেছে। যাঁহাদের সময় ও সুবিধা আছে, তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় বুলবুল ধরিয়া খাঁচায় রাখিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। খয়েরী বুলবুলকে কিন্তু অঙ্গভঙ্গির প্রতিযোগিতা করিতে একাধিক বার দেখিয়াছি। কিন্তু অঙ্গভঙ্গ তাহাদের ডাকের আনুষঙ্গিক কি না নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। মনে রাখিতে হইবে, পাখীর বহু কার্য্যের ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার জাকানা

দক্ষিণ আমেরিকার জাকানা (Jacana) অতি সুদক্ষ নর্ত্তক। ডাক্তার সার্প লিখিয়াছেন, মিঃ হাডসন্ বলেন 'তিনি আর্জ্জেন্টাইন প্রদেশে দেখিয়াছেন, জাকানা পাখীরা হঠাৎ ভোজন ত্যাগ করিয়া উত্তেজিতভাবে ডাকিতে ডাকিতে একত্র হয়; তারপর পাখা মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেহ তাড়াতাড়ি, কেহ ধীরে ধীরে নৃত্য করিতে থাকে। নৃত্য শেষ হইলে তাহারা শান্তভাবেই আবার চারিদিকে চলিয়া যায়।'

মানাকিন

দক্ষিণ আমেরিকার মানাকিন শ্রেণীর এক জাতীয় পাখীও নৃত্যকলায় সুনিপুণ। পরিব্রাজক মাটিং সাহেব (Mateing) এই পাখী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "নিকারাগুয়ার অধিবাসীরা এই পাখীকে নর্ত্তক বলে। ইহাদের নৃত্য দেখিবার পূর্ব্বে আমি ইহার কারণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। একদিন গভীর অরণ্যে শিকার করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ 'এল বেইলাডর' 'এল বেইলাডর' শব্দ শুনিতে পাইলাম। ধীরে ধীরে ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে আমি শব্দের উৎপত্তিস্থানে পৌছিয়া অতি আশ্চর্য্যকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম; এইরূপ দৃশ্য আমার জীবনে আর কখনও দেখি নাই। পথের উপর প্রায় চারি ফুট উপরে একটি বৃক্ষের পত্রহীন শাখা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই উপরে বসিয়া দুইটি পুরুষ বেইলাডর (নিকারাগুয়ার আদিম অধিবাসিগণের ভাষায় বেইলাডর শব্দের অর্থ নর্ত্তক) গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতেছিল। দুইটি পাখী পরস্পরের প্রায় ১½ ফুট ব্যবধানে ছিল; এক একবার লাফ দিয়া প্রায় দুই ফুট শূন্যে উঠিয়া তাহারা আবার তাহাদের পূর্ব্বস্থানেই আসিয়া পড়িতেছিল। এই নৃত্যগীত এক মিনিটের অধিক কাল চলিয়াছিল, তারপর পাখী দুইটি আমাকে দেখিতে পাইয়া পলাইয়া গেল।"

কবিবর কোলরিজ তাঁহার প্রাচীন নাবিকের(Coleridge) গাথায় এলবেট্রস পাখীকে অমর করিয়াছেন।

এলবেট্রস

অনারেবল ওয়ালটার রথস্‌চাইল্‌ড্ (Hon'ble Walter Rothschild) বলেন, এই মৎস্যাশী পাখীও মুখামুখি হইয়া নৃত্য করে। এতদ্ব্যতীত উত্তর আমেরিকার এলাস্কা প্রদেশের সারস ও কেইনির ল্যাপউইঙ্গ নামক পাখীও নৃত্যকলায় পারদর্শী। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা- ময়ূরের পেখম

প্রণয় ব্যাপারে সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশের ময়ূর। ময়ূরের পেখমের সৌন্দর্য্যের কথা কে না জানে! এই পেখম কিন্তু ময়ূরের পুচ্ছ নহে; পিঠের নীচের দিকের কতকগুলি পালখ্ ও লেজের উপরের কতকগুলি পালখ্ লইয়া ময়ূরের পেখম গঠিত। প্রকৃত পুচ্ছ প্রসারিত পেখমের নীচে থাকে, এবং অনেকটা ভিত্তির কাজ করে।

ময়ূর যখন ময়ূরীকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের দ্বারা মোহিত করিতে চাহে, তখন সে তাহার পেখম মেলিয়া একেবারে গিয়া প্রণয়িনীর সম্মুখে দাঁড়ায়। তারপর নীল সবুজ ও স্বর্ণ বর্ণের মিশ্র শোভার উজ্জ্বল পেখম লইয়া দ্রুতপদে কিছু দূর হাঁটিয়া যাইয়া, হঠাৎ একেবারে ঘুরিয়া আবার তাহার বিচিত্র পেখম একেবারে ময়ূরীর সম্মুখে ধরে। এইরূপ হঠাৎ ঘুরিবার সময় পেখম হইতে বৃষ্টিধারা পতনের ন্যায় একরূপ শব্দ হয়। বিচিত্র বর্ণ-ভঙ্গিমায় উজ্জ্বল পেখমের বিবিধ ক্রীড়ায় ময়ূর যখন বিভোর, ময়ূরী তখন কিন্তু একেবারে উদাসীন ভাব দেখায়

হয় ত এইরূপ কৃত্রিম উদাসীনতার অভিনয় করাই লজ্জাশীলা শিখিনীদের সমাজ-প্রচলিত রীতি।

ময়ূরের সুন্দর পেখমের কথা সকলেই জানেন, কিন্তু আমাদের নিত্য পরিচিত ক্ষুদ্র টুনটুনিও যে প্রতিবৎসর বিবাহের নিমিত্ত বর-সজ্জা পরিধান করিয়া থাকে তাহা হয় ত অনেকেই লক্ষ্য করেন নাই। প্রতি বৎসরই জনন-ঋতুর সমাগমে পুরুষ টুনটুনির পুচ্ছ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই সময় টুনটুনির ক্ষুদ্র দেহ অপেক্ষা তাহার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হইয়া থাকে। এই বর্দ্ধিত পুচ্ছটিকে টুনটুনি ইচ্ছা মত উঠাইতে, নামাইতে, প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিতে পারে। জনন-ঋতুর অন্তে পুরুষ টুনটুনির পুচ্ছ আবার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিলেই পুরুষ টুনটুনির এই বরসজ্জা দেখিতে পাইবেন।

টুনটুনি

টুনটুনির ন্যায় বাবুইও প্রতি বৎসর বিবাহ-বেশ ধারণ করে। কিন্তু টুনটুনির ন্যায় ইহার কোন পালখের আয়তন বাড়ে না। শীতকালে টুনটুনির মত বাবুইরও স্ত্রী পুরুষ চিনিয়া লওয়া কঠিন। তখন ইহাদিগকে অনেকটা মাদী চড়াইদের মত দেখায়। কিন্তু বসন্ত-সমাগমে পুরুষ বাবুইর মস্তক ও বক্ষ উজ্জ্বল পীতবর্ণে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই সময় ইহাদের কণ্ঠ ও চঞ্চুও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্ত দেহই পীতবর্ণের ঈষৎ আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিবাহ বাজারে এই বর্ণসম্পদই বাবুইর একমাত্র সম্বল। স্ত্রী বাবুইর চেহারায় জনন-ঋতুতেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

বাবুই

লাল পাখী বা লালমুনিয়ার বিবাহ বেশ অতি মনোহর। পুরুষ লালের বিবাহকালের বেশ সাদা দাগআলা অতি উজ্জ্বল লাল পালখ। বিবাহের ঋতু অন্তে বাবুইর মত লালকেও আবার পূর্ব্বের ন্যায় স্ত্রীবেশ ধারণ করিতে হয়। কোন কোন জাতীয় খঞ্জনও জনন-ঋতুতে বেশ পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ বেশ-পরিবর্ত্তনের বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার স্থান এখানে নাই। আবার পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কাও বর্ত্তমান। কয়েকটি বিদেশী পাখীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের চেষ্টা আলোচনা করিয়াই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

লালমুনিয়া ও খঞ্জন

ইংলণ্ডের বনে জঙ্গলে কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রেট বাষ্টার্ড (Great Bustard) নামক পাখী দেখা যাইত। শিকারীর উৎপাতে এখন এই পাখী সেখানে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার সার্প বলেন, "পক্ষিণীর চিত্ত আকর্ষণের অভিলাষী বাষ্টার্ড দুই এক পা করিয়া ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হয়। তারপর পুচ্ছটিকে উল্টাইয়া পিঠের উপর ফেলিয়া, কাঁধ ফুলাইয়া দীর্ঘ কুণ্ডল পালখ দিয়া চাপিয়া ধরে। ইহাতে পুচ্ছের নীচের শাদা পালখগুলি দেখা যায়। বাষ্টার্ড বোধ হয় এই শ্বেত পালখগুলিকেই তাহার সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে, কারণ তাহার শরীরের সমস্ত শ্বেত পালখ পক্ষিণীকে দেখাইবার জন্য উভয়পক্ষের পালখ উল্টাইয়া নীচের শাদা পালখগুলি বাহির করিবার চেষ্টা করে। ইহার পর কণ্ঠ-সংলগ্ন একটি থলিয়াকে যথাসাধ্য ফুলাইয়া সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিত বাষ্টার্ড গলার ভিতরে ঠোঁট লুকাইয়া দাঁড়ায়। শ্বেত পরিচ্ছদের শোভায় স্ত্রী-বাষ্টার্ডের মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু পক্ষিণী স্ত্রীসুলভ লজ্জার সহিত যথাসম্ভব উদাসীনতার ভান করিয়া থাকে।

বিলাতের গ্রেট্‌বাষ্টার্ড

একজাতীয় গ্রাউজ্ (Pinnated Grouse) গণ্ড-লগ্ন দুই খণ্ড পীত বর্ণের চর্ম্ম ফুলাইয়া প্রণয়িনীর চিত্ত আকর্ষণের প্রয়াস পায়। পণ্ডিতবর ডারউইন আর্গাস ফিজেণ্টের বিচিত্র বর্ণের পালখ পাখার আকারে প্রণয়িনীর নয়ন-সমক্ষে ধরিয়া রাখার কথা লিখিয়াছেন।

গ্রাউজ

আর্গাস ফিজেণ্ট

বার্ড অব প্যারাডাইজ

মালয় দ্বীপপুঞ্জের সুবিখ্যাত বার্ড অব প্যারাডাইজ বা নন্দনের পাখীরাও পালকের বিচিত্র শোভায় পক্ষীর মন ভুলাইতে চেষ্টা করে। বহু পক্ষী একত্র হইয়া একই বৃক্ষের উপরে বসিয়া যখন দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সুন্দর পক্ষ দুইটিকে পিঠের উপর একেবারে খাড়া করিয়া ধরে, তখন নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণের প্রভায় বনভূমি এক অভিনব শোভা ধারণ করে। ডাক্তার ওয়ালেস (Wallace) তাঁহার মালয় ভ্রমণ নামক গ্রন্থে ইহার একটি মনোহর বিবরণ লিখিয়াছেন। যাহারা নন্দন পাখী সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাহেন তাঁহারা ওয়ালেসের গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

যুদ্ধে জয়

এখন আমরা যুদ্ধজয়ের পুরস্কার স্বরূপ পত্নীলাভের আলোচনা করিয়া পাখীর বিবাহের কথা শেষ করিব। সাধারণতঃ যে সকল পাখীর মধ্যে বহুপত্নী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহারা সে কালের ক্ষত্রিয় রাজাদের মত বাহুবলেই পত্নীসংগ্রহ করে। ডারউইন বলেন যে, পাখীরা পত্নী-লাভের জন্য সকল সময় প্রকৃত যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। অনেক সময় কৃত্রিম সমরে বলবীর্য্য ও কৌশল প্রদর্শনের পর ভাগ্যবান বিহগ সম্মিলিত পক্ষিণী-বৃন্দের কোন সুন্দরী কর্ত্তৃক পতি নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু যে সকল পাখী প্রকৃত যুদ্ধে আপনাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারা পক্ষিণীর মতামতের আদৌ অপেক্ষা রাখে না। রণজয়ান্তে মনোনীতা পত্নীকে বলপূর্ব্বকই আপনার অনুবর্ত্তিনী করিয়া লয়। এইরূপ যুদ্ধে রক্তপাত ত সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, অনেক সময় বহু পক্ষীর প্রাণ-হানিও হইয়া থাকে।

চড়াই, রবিন, হামিং বার্ড

দেহের আয়তনের অনুপাত অনুসারে কিন্তু পাখীদের সমর-লিপ্সার পরিমাণ হয় না। আমাদের গৃহনিবাসী চড়াই নিতান্ত ছোট পাখী, কিন্তু পত্নী লইয়া ইহাদের মধ্যে প্রতি-নিয়তই মারামারি হইতেছে! বিলাতী রবিনের সমরানুরাগও নিতান্ত কম নহে। আমাদের দেশের পুরুষ শালিকও জনন-ঋতুতে খুব লড়াই করে। কিন্তু এবিষয়ে আমেরিকার ক্ষুদ্রকায় হামিং বার্ড পৃথিবীর আর সকল পাখীকেই হারাইয়া দিয়াছে। অথচ আয়তনে হামিং বার্ড বহু পতঙ্গ অপেক্ষাও ছোট। জনন-ঋতুতে ত কথাই নাই, বৎসরের অন্য সময়েও দুইটি পুরুষ হামিং বার্ড একত্র হইলেই লড়াই লাগিয়া যায়। দুই তিনটি হামিং বার্ড এক খাঁচায় রাখিলেও রক্ষা নাই। ঠোঁট এবং জিহ্বা না ভাঙ্গিয়া ও ছিঁড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ইহারা খাঁচার ভিতরেও লড়াই করে, শেষে ভাঙ্গা ঠোঁট ও আহত জিহ্বা দ্বারা খাইতে না পারিয়া মরিয়া যায়।

বুলবুল ও মোরগ

আমাদের দেশের বুলবুল ও মোরগের সৈনিক-খ্যাতি নিতান্ত কম নহে। আরণ্য মোরগ যুদ্ধ জয় করিয়া সে কালের আরব সেনানীদের মত শোণিত-লিপ্ত রণক্ষেত্রেই বিবাহ-উৎসবে মত্ত হয়। ফাঙ্ক ফিন্ তাঁহার পাখীর কথা (Talks about birds A. & C. Black) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আরণ্য কুক্কুটেরা অনেক সময় জঙ্গল-বেষ্টিত পরিষ্কার রণভূমিতে বলপরীক্ষার জন্য সমবেত হয়।" ভারতবর্ষের কোন জঙ্গলের কুক্কুট-রণভূমির প্রত্যক্ষদ্রষ্টার নিকট হইতে শুনিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট এই বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ সমরপ্রিয় পাখীদের পক্ষেও কঠিন নখর থাকে।

সর্ব্বশেষে প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষের মধ্যে যখন নর-নারী উভয়ের মধ্যেই প্রণয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা

পুরুষ পাখীরাই কেন বিবাহ ব্যাপারে প্রতিযোগী হয়?

দেখা যায়, তখন পক্ষি-সমাজে কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা দেখা যায় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ; পক্ষি-সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে এই কারণেই পুরুষ পাখীরা উজ্জ্বল বেশভূষা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের আত্মগোপন-শক্তির অন্তরায় স্বরূপ সৌন্দর্য্য দান করিয়াই প্রকৃতি দেবী তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এইরূপে পক্ষি-সমাজে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার তারতম্য কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইতেছে।*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

---

* গত জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতিভায় লিখিয়াছি—"উড়িতে অক্ষম পাখীরা সকলেই বিদেশী।" আমার একজন বন্ধু বলিলেন ভাওয়ালের গজারি বনে এক প্রকার উড্ডয়নে অক্ষম পাখী আছে। ইহারা দ্রুতবেগে লাফাইয়া চলে। তিনি ইহার নাম বলিতে পারেন নাই। হয় ত ইহার কোন নাম নাই। পণ্ডিত সমাজ এই পাখীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও অজ্ঞ। সুতরাং যদি কেহ এই পাখীর মৃতদেহ বা চর্ম্ম বোম্বাইর Natural History Societyতে পাঠাইয়া দেন, তবে ইহার প্রকৃতি-নির্ণয়ে বড়ই সুবিধা হইবে এবং জ্ঞানের প্রসারেও সহায়তা করা হইবে।

অবিমারক

প্রবেশক

ধাত্রীর প্রবেশ

ধাত্রী। বিধাতার কি অবিচার! প্রথমে মহারাজ সৌবীররাজ বিষ্ণুসেনের (অবিমারকের) সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে দেবেন স্থির করেছিলেন। এখন যাঁর সঙ্গে রাজকুমারীর মিলন হল তাঁর বংশ-পরিচয় জানা নেই, কিন্তু এমন রূপ বা গুণ কোনটাই মনুষ্যলোকে বড় দেখা যায় না! আবার কাশিরাজের ছেলে জয়বর্ম্মাকে (কাশিরাজের) রাণী সুদর্শনার সঙ্গে মন্ত্রী ভূতিক (রাজধানীতে) নিয়ে এসেছেন! তাঁরা রাজবাড়ীতে প্রবেশ করেছেন! যজ্ঞ কচ্ছেন বলে কাশিরাজ স্বয়ং আসতে পারেন নি। না জানি কি হবে!

বসুমিত্রার প্রবেশ

বসু। গণক বেটাদের কি অবিবেচনা! এ বেটারা কেবল (শুভ) নক্ষত্রের কথাই ভাবে, কাজের গুরুত্ব একেবারেই ভাবে না! রাজকুমার আজ এলেন, আর আজই বিয়ের দিন স্থির হ'ল? জয়দা, কি ভাবছিস্? তোকে অপ্রসন্ন ও উৎসুক দেখছি কেন? জয়দা, (কুন্তিভোজের) রাণী যেতে বলেছেন!

ধাত্রী। কেন যেতে বলেছেন জানিস্?

বসু। আর কেন? এই বিয়ের কি হবে তাই ঠিক কত্তে!

ধাত্রী। রাণীর ইচ্ছেটা কি?

বসু। নিজ বংশের ছেলে বিষ্ণুসেনের কি হ'ল না জেনে জয়বর্ম্মার সঙ্গে তিনি রাজকুমারীর বিয়ে দিতে চাচ্ছেন না! এদিকে সৌবীররাজপুত্রের কোনই সংবাদ না পেয়ে মহারাজের যে কত দুঃখ হয়েছে তা আর বলা যায় না!

নলিনিকার প্রবেশ

নলি। আজ যেন আমাদের সমস্ত সঙ্কট ইঙ্গিত পেয়ে এসে জড় হ'য়েছে! মা বসুমিত্রার সঙ্গে কি আলাপ কচ্ছেন? যাই তাঁর কাছে গিয়ে দুঃখের খবরটা শুনি;

বসু। নলিনিকা এদিকে এস ত। তুমি কঞ্চুকীর সঙ্গে থাক নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর সব খবর রাখ।

নলি। বড় আশ্চর্য্য খবর। তোমাকে বলতেই এসেছি।

বসু। বৎসে, বল ত?

নলি। সৌবীররাজের মন্ত্রী দূত পাঠিয়ে রাজা কুন্তিভোজকে বলেছেন, "মহারাজ, আমাদের রাজা আপনার রাজধানীতে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে ছদ্মবেশে বাস কচ্ছেন, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের চরের সাহায্যে এর খাটি খবরটা জানতে চেষ্টা করবেন।"

উভয়ে। কি! কি! ছদ্মবেশে আছেন! তার পর!

নলি। তার পর এ সকল কথা শুনে এবং চিঠির শেষ কয়টি কথা দেখে মন্ত্রী ভূতিকের সঙ্গে মহারাজ তাঁর খোঁজে বেরিয়েছেন!

ধাত্রী। ও মা! না জানি কি হয়?

বসু। নলিনিকা তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও।

নলি। আপনি যা বলেন! [প্রস্থান।

বসু। এস, আমরা দুজনে গিয়ে (কুন্তিভোজের) রাণীর সঙ্গে দেখা করি।

ধাত্রী। হাঁ, এস তাই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

সৌবীররাজ ও মন্ত্রী ভূতিকের সঙ্গে
কুন্তিভোজের প্রবেশ

কুন্তিভোজ। বয়স্য, তুমি ত এত কালই আমার মুখ দেখেছ তবু এখন আমার মুখের দিকে এমন করে তাকাচ্ছ কেন? বাল্যকালের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে আমাকে গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন কর। আজ আমার এত আনন্দ হয়েছে যে, তোমাকে অনিমিষ নেত্রে দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। আর স্নেহ-বশে আজ যেন বাল্য-বন্ধুতা আবার নূতন হয়ে উঠেছে!

সৌবীররাজ। তোমার যা অভিপ্রায়! (উভয়ের আলিঙ্গন)

কুন্তিভোজ। (সখে, তোমার) বুদ্ধি যেন চিন্তাকুল হয়েছে! আবার কথাগুলি বাষ্প গদ্‌গদ্, চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত, ও মুখ অপ্রসন্ন। আনন্দের সময় এই বিকারের কারণ কি সখা?

সৌবীররাজ। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি হৃষ্ট হয়েচি। কিন্তু পুত্র-স্নেহের প্রভাব বড় বেশী! পুত্রের (বিরহজনিত আমার) যে আন্তরিক শোক প্রকাশিত হচ্ছে সেই শোক আজ তোমাকে (সখাকে) পেয়ে অশ্রুরূপে নির্গত হচ্ছে! *

কুন্তিভোজ। পুত্রের (বিরহজনিত) কি শোকের কথা বলছ, সখা?

ভূতিক। মহারাজ, তবে আমাকে বলতে হল। এই এক বৎসর কুমারের সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ নেই!

সৌবীর। পুত্রস্নেহ বলবানই বটে। দেখুন— অনুপম বল-বিক্রম ও রূপসম্পন্ন পুত্র অবিমারকের কথা এখন আমি ভাবছি। যদি এখন আপনার চরণরেণু দ্বারা তার মাথার অগ্রকেশ ভূষিত হ'ত, তা'হলে আমার সৌভাগ্যের আর সীমা থাকত না!

ভূতিক। (আত্মগত) রাজকুমারের বিরহে ওঁর শোক বাস্তবিকই বর্দ্ধিত হচ্ছে! আমি এই শোক দূর করব। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, আপনি স্বেচ্ছায় এইরূপ কষ্ট ভোগ কচ্ছেন কেন? †

---

*কুমারসম্ভব কাব্যের রতি-বিলাপে এই অংশের ভাবচ্ছায়া লক্ষিত হইবে।

† ছদ্মবেশে বাস।

কুন্তিভোজ। এই সকল বাজে কথায় আমিও এই কথাটা জিজ্ঞাসা কত্তে ভুলে গিয়েছি।

সৌবীর। শুনুন। মন্ত্রী ভূতিক বোধ হয় জানেন। আমার মুখে সব কথা শুনতে চাচ্ছেন বুঝি ?

কুন্তিভোজ। বলুন, আমি একাগ্রচিত্ত হয়েছি।

সৌবীর। অত্যন্তরোষী ব্রহ্মর্ষি চণ্ডভার্গবকে ত আপনি জানেন ?

কুন্তিভোজ। হাঁ, সেই মহাত্মা তপোনিধির নাম শুনেছি।

সৌবীর। তিনি আমার রাজ্যে এসেছিলেন। বনে একটা বাঘ তাঁর শিষ্যকে একদিন মেরে ফেলে।

কুন্তিভোজ। তার পর।

সৌবীর। সে সময় শিকার কর্ত্তে কর্ত্তে দৈবক্রমে আমিও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলুম।

কুন্তিভোজ। তার পর।

সৌবীর। তিনি আমাকে দেখে আমার কথা শুনতে অনিচ্ছুক হ'য়ে ক্রোধে স্খলিতবচনে নানা ভাবে আমাকে নিন্দা কর্ত্তে লাগলেন। তখন তাঁর একটি হাত শিষ্যের গায়ে। ভ্রূকুটির আবরণে তাঁর মুখও ভীষণ ভাব ধারণ ক'রে ক্রোধ প্রকাশ কচ্ছে! জটাভার কম্পিত হচ্ছে। আর তিনি ক্রোধে যেন আমাকে দগ্ধ করে ফেলছেন !

কুন্তিভোজ। তারপর !

সৌবীর। আমিও ভবিতব্যের প্রাবল্যে ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে রেগে বল্লুম, ব্যাপার কি হয়েছে বলছেন না, অথচ অকারণ আমাকে নিন্দা কচ্ছেন !—

ব্যাপার বলছেন না, রাগ কচ্ছেন, আর অকারণে আমাকে নিন্দা কচ্ছেন। আপনি তপস্যার অপাত্র। আপনার এত ক্রোধ যে ব্রহ্মর্ষির বেশে আপনি চণ্ডাল !'

কুন্তিভোজ। আপনি অন্যায় কথাই বলে ফেল্লেন !

সৌবীর। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন জ্বলে উঠে, এ কথা শুনে তেমনি তাঁর চোখ জ্বলে উঠল! তিনি বার বার মাথা কাঁপিয়ে "কি বল্লি !" "কি বল্লি !" বলে আমাকে শাপ দিতে আরম্ভ কল্লেন—বল্লেন—

আমি ব্রহ্মর্ষিমুখ্য। তুই আমাকে চণ্ডাল বললি ! (এই পাপে) তুই দারাপুত্রের সঙ্গে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হবি।

কুন্তিভোজ। হায় ! সামান্য কারণে (অনেক সময়) মহাজনের বিপদ ঘ'টে থাকে।

ভূতিক। সৌবীর-রাজবংশের সৌভাগ্য বলতে হবে, কারণ ব্রহ্মর্ষি রুষ্ট হয়ে এই বংশকে মাত্র চণ্ডাল করেই নিবৃত্ত হলেন, ভস্ম কল্লেন না !

সৌবীর। শাপ শুনে আমি বড় ক্ষুব্ধ হলুম। অনেকক্ষণ অনুনয়ের পর ক্রমে ক্রমে তাঁর রাগ পড়লো। প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি পরে অনুগ্রহ দেখালেন—

প্রচ্ছন্ন রূপে তোমার এক বৎসর কাটাতে হবে। তার পর এক বৎসর পূর্ণ হলে তুমি শাপমুক্ত হবে। এই কথা বলে প্রসন্ন হ'য়ে "ওহে কাশ্যপ (আমার সঙ্গে) এস" বলে শিষ্যকে ডাকলেন। ব্যাঘ্রহত সেই ব্রাহ্মণ বালক তখনই তার অনুগমন কল্লে। আমি এক বৎসর চণ্ডাল ব্রত পালন করেছি। আজ শাপ থেকে মুক্ত হলুম।

কুন্তিভোজ। যাক্, বিপদ যেমন এসেছিল তেমনই গেল। আমি আপনার সৌভাগ্যে আহ্লাদ প্রকাশ কচ্ছি !

ভূতিক। প্রভুর মঙ্গল হউক।

কুন্তিভোজ। বিষ্ণুসেনের মাতা পরিজনের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন ত ?

ভূতিক। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অনেক দিনের স্নেহ জাগিয়ে তুলছেন !

কুন্তিভোজ। বিষ্ণুসেন অবিমারক হল কি ক'রে ?

ভূতিক। মহারাজ শুনুন। ধূমকেতু নামে এক অসুর আছে। সমস্ত পৃথিবী নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সে এক সময়ে সৌবীর দেশ উচ্ছন্ন কত্তে প্রবৃত্ত হল।

কুন্তিভোজ। আশ্চর্য্য কথা ত ! তার পর।

ভূতিক। তার পর প্রজাদের বিপদ দেখে এবং রাক্ষসটাকে দমন করার কোন উপায় না দেখে মহারাজ বিষণ্ণ হলেন।

কুন্তিভোজ। তারপর।

ভূতিক। এ সকল কথা শুনে কুমার বিষ্ণুসেন একদিন সমান বয়সের ছেলেদের সঙ্গে খেল্‌তে খেল্‌তে ধূলিমাখা গায়ে, পাহারা-আলাদের অসাবধানতায়, যেখানে সেই অসুরটা ছিল হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কুন্তিভোজ। অহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তারপর।

ভূতিক। তারপর, কুমারকে দেখে সেই রাক্ষস একটা বেশ ভাল আহার এসেছে মনে করে তাকে খাওয়ার উপক্রম কল্লে।

কুন্তিভোজ। হায়! হায়! কি নৃশংস রাক্ষস! তারপর।

ভূতিক। তারপর কুমার একটু হেসে

বজ্রপাতে যেমন প্রকাণ্ড পর্ব্বত ধ্বংস হয়, বনাগ্নিতে যেমন বনপ্রদেশ দগ্ধ হয়, সেইরূপ অস্ত্র ব্যতিরেকে হেলায় সেই নীচ অসুরকে বধ কল্লেন।

কুন্তিভোজ। হাতী ক্ষেপে যে দিন প্রথমে গোলমাল ঘাটয়েছিল সে দিনই আমি বলেছিলুম, ইনি সামান্য মানুষ নন, ইনি দেবকুল সম্ভূত। *

সৌবীর। আপনার চররূপ সহস্র নেত্র থাকতে আপনি অবিমারকের জন্য চিন্তিত হচ্ছেন কেন?

ভূতিক। মহারাজ,

যে সকল দেশে যাওয়া যায় সে সকল দেশ আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি! কুমারকে চরেরা কোথাও দেখ্‌তে পায় নি। তাঁকে পরীক্ষা করার শক্তি আমার আছে। আমার মনে হয়, কুমার মায়া অবলম্বন করে আছেন।

নারদের প্রবেশ

নারদ। আমি বেদ প'ড়ে পিতামহকে সন্তুষ্ট করে থাকি, (হরিগুণ) গান ক'রে ভগবান শ্রীহরির রোমহর্ষ উৎপাদন করে থাকি, বীণাতন্ত্রীতে অহরহ বিবিধ উপায়ে নানা স্বর এবং পৃথিবীতে নানা কলহ সৃষ্টি করে থাকি।

কুন্তিভোজের পিতা দুর্য্যোধন বহুদিন আমার আরাধনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে পর কুন্তিভোজও আমার দাসত্ব অবলম্বন করেছে। আজ অবিমারকের অনুপস্থিতিতে কুন্তিভোজ আর সৌবীররাজ দুজনেরই কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত। তাই অবিমারককে তাঁদের সামনে উপস্থিত করে তাঁদের উদ্বেগ দূর করব বলেই আমি ভূতলে নেমে এসেছি!

[কুন্তিভোজ ও সৌবীররাজের সম্মুখে অবস্থান।]

কুন্তিভোজ। ভগবান দেবর্ষি নারদ যে! ভগবন্, অভিবাদন কচ্ছি।

নারদ। আপনার মঙ্গল হ'ক।

কুন্তিভোজ। অনুগৃহীত হলুম।

সৌবীর। ভগবন্, অভিবাদন কচ্ছি।

নারদ। তোমার শান্তি লাভ হ'ক।

সৌবীর। অনুগৃহীত হলুম।

কুন্তিভোজ। (কানে কানে) ভূতিক, তাই কর।

ভূতিক। প্রভুর যে আজ্ঞা। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) এই যে পাদ্য ও অর্ঘ্য এনেছি।

কুন্তিভোজ। ভগবন্, দয়া করে গ্রহণ করুন।

নারদ। অবশ্য।

কুন্তিভোজ। (অর্চ্চনা করিয়া) ভগবন্, আপনার অবতরণে আমাদের গৃহ পবিত্র হল!

সৌবীর। দেবর্ষি-দর্শনে এখন শাপমুক্ত হয়েছি।

নারদ। আমি তোমাদিগকে দেখবার জন্য এখন এখানে আসি নি। অবিমারকের অদর্শনে তোমাদের যে কষ্ট হয়েছে তা দূর করবার জন্যই এখানে এসেছি।

---

* দৈবাদুৎপাদিতোঽয়ং=(১) দেবকুল সম্ভূত (২) ভাগ্যবশে আগত

উভয়ে। তা'হলে আমাদের দুঃখ দূর হ'ল।

নারদ। ভূতিক, সুদর্শনাকে নিয়ে এস।

ভূতিক। যে আজ্ঞা ভগবান।

[প্রস্থান ও সুদর্শনাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

সুদর্শনা। দেবর্ষি এসেছেন যে!

ভূতিক। হাঁ।

সুদর্শনা। তা হ'লে আমার ছেলের বিবাহ সুসম্পন্ন হল, মনে কত্তে হবে। ভগবন্, অভিবাদন কচ্ছি।

নারদ। মহাভাগে, সর্ব্বদা এরূপ ভাবে প্রীতি লাভ কর। আর রাজা কুন্তিভোজও সর্ব্বদাই প্রীতিপীড়িত হউন।

সুদর্শনা। অনুগৃহীত হলুম।

নারদ। এখন তোমাদের যা জিজ্ঞাস্য আছে, তা জিজ্ঞাসা কত্তে পার।

উভয়ে। আমরা অনুগৃহীত হলুম।

কুন্তিভোজ। ভগবন্, সৌবীররাজপুত্র কি জীবিত আছেন?

নারদ। নিশ্চয়।

সৌবীর। তবে তাঁকে দেখ্‌ছি না কেন?

নারদ। বিয়ের গোলযোগে!

সৌবীর। কুমার মঙ্গলে আছেন ত?

কুন্তিভোজ। কোথায় আছেন কুমার?

নারদ। বৈরন্ত্য নগরে।

কুন্তিভোজ। বৈরন্ত্য নামে একটা নগর আছে? কার মেয়েকে বিয়ে করেছেন তিনি?

নারদ। কুন্তিভোজের।

কুন্তিভোজ। তিনি কে?

নারদ। তিনি বৈরন্ত্য নগরের রাজা, কুরঙ্গীর পিতা, দুর্য্যোধনের পুত্র। আপনিই সেই কুন্তিভোজ!

কুন্তিভোজ। ভগবন্, আর আপনাকে বাজে কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই না। ভগবন্, আপনি না বল্লেন, কুরঙ্গীকে পেয়েই কুমার সুখী হয়েছেন!

নারদ। হাঁ, তাই।

কুন্তিভোজ। আমি বড় লজ্জিত হচ্ছি! কে তাঁর সঙ্গে কুরঙ্গীর বিয়ে দিলে? আর কেমন করেই বা তিনি কন্যাপুরে ঢুকলেন?

নারদ। গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে হয়েছে। যে দিন হাতী ক্ষেপেছিল, সে দিন কুমার কুরঙ্গীকে দেখেছে। একবার পৌরুষ আশ্রয় করে, আর একবার মায়া-বলে কুমার কন্যাপুরে প্রবেশ করেছে।

কুন্তিভোজ। বুঝলুম। ঋষিবাক্যের প্রতিবাদ নেই। ভগবন্, কুমার ও কুরঙ্গীর বিবাহ সম্পন্ন করার কি শুভ সময় উপস্থিত হয়েছে?

নারদ। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন মাত্র পরস্পর সম্মতি রূপ গান্ধর্ব্ব বিবাহ হবে!

কুন্তিভোজ। অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে দিতে ইচ্ছে কচ্ছি!

নারদ। অগ্নি যে সদাই তাঁর সাক্ষী (অবিমারক অগ্নিদেবের পুত্র)! তবু আত্মীয় স্বজনের প্রীতির জন্য অন্তঃপুরে পুরোহিত দ্বারা আচারাদি সম্পন্ন করে বধূর সঙ্গে কুমারকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস।

কুন্তিভোজ। ভগবন্, এই আমি যাচ্ছি।

নারদ। আপনি থাকুন। ভূতিক, আপনি যান।

ভূতি। যে আজ্ঞা, ভগবান! [প্রস্থান।

কুন্তিভোজ। ভগবন্, আমার একটা কথা বলবার আছে।

নারদ। এ দিকে আসুন। স্বচ্ছন্দে বলুন।

কুন্তি। ভগবন্, সুদর্শনার ছেলে জয়বর্ম্মার সঙ্গে কুরঙ্গীর বিয়ে দেব বলে (সুদর্শনাকে) এখানে আনিয়েছি। এ অবস্থায় কুরঙ্গীর সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি বলুন।

নারদ। এরূপই করা যাক। আপনি একান্তে অবস্থান করুন।

কুন্তিভোজ। তথাস্তু (তদ্রূপ করণ)

নারদ। সুদর্শনে, এ দিকে আসুন ত।

সুদর্শনা। ভগবন্, এই যে আমি!

নারদ। আমার কথা শুনেছেন?

সুদর্শনা। হাঁ, সৌবীররাজের ছেলের গুণকীর্ত্তন শুনেছি বটে।

নারদ। এমন কথা বলবেন না! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, অগ্নি হ'তে উৎপন্ন এ আপনারই বড় ছেলে।

সুদর্শনা। বটে! ভগবন, এ কথাও আপনি জানেন!

নারদ। তা হ'লে আমি যা বলছি তাই করুন।

সুদর্শনা। তাই করব। ভগবান আদেশ করুন।

নারদ। অগ্নিদেবতা হতে উৎপন্ন এ আপনারই ছেলে। আপনার ভগিনী সুচেতনার প্রসব কালেই তাঁর একটি ছেলে মারা যায়। আপনার এই ছেলেকে তখন আপনিই আপনার ভগিনীকে দিয়েছিলেন। সৌবীর-রাজও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তদনুরূপ সংস্কারাদি ক্রিয়া করে ছেলেটির নাম বিষ্ণুসেন রেখেছিলেন। পরে ছেলে বাড়তে লাগল—তার অমানুষ রূপ, বল, ও পরাক্রম হল, এবং শেষে যখন এই ছেলে অবিরূপ-ধারী * অসুরকে বধ কল্লে, তখন থেকে লোকে তাকে বিষ্ণুসেন নাম দিলে। তার পরে ব্রহ্মশাপে চণ্ডাল হয়ে, যে দিন হাতী ক্ষেপেছিল সে দিন তার সঙ্গে কুরঙ্গীর দেখা হয়। সে দিন থেকেই কুমার কুরঙ্গীকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন, এবং বিশেষ পরাক্রম দেখিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হন। পরে কন্যাপুররক্ষীরা তাকে ধরবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভগবান অগ্নি কুমারকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন বলে কুমার পালাতে পেরেছিলেন। কন্যাপুর থেকে পালিয়ে মনোদুঃখে কুমার অগ্নিতে পুড়ে মত্তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন কল্লেন—কুমারের শরীর দগ্ধ হল না। তার পরে আবার খুব উচু পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবেন বলে পাহাড়ে চড়েছিলেন।

সুদর্শনা। কি সর্ব্বনাশ!

নারদ। সেখানে তখন একজন বিদ্যাধর তাঁর রূপ দেখে প্রীত হয়ে তাঁকে একটি আংটি দিলে। এই আংটি পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়। ডান হাতের আঙ্গুলে পরলে কেউ দেখতে পায় না, আবার বাঁ হাতের আঙ্গুলে পরলে যেমন মানুষ তেমন হওয়া যায়!

সুদর্শনা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

নারদ। কুমার ডান হাতের আঙ্গুলে এই আংটি পরে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টের সঙ্গে নিজের বাড়ীর মত রাজা কুন্তিভোজের কন্যাপুরে স্বচ্ছন্দে ঢুকে কুরঙ্গীর সঙ্গে কন্যাপুরে পরম সুখে বিহার কচ্ছেন! এই হল খাঁটি কথা। এখন কি করবেন মনে কচ্ছেন?

সুদর্শনা। এর পর শুদ্ধশীলা ও প্রবঞ্চিতা কুরঙ্গীর জন্য আমার মন চঞ্চল হয়েছে! কিন্তু কৌতূহল আবার চিত্তের অনেকটা তুষ্টি বিধান কচ্ছে! ভগবন্, এতদিন কুরঙ্গীকে আমরা জয়বর্ম্মার পত্নী বলেই ডেকেছি। আজ থেকে কুরঙ্গী তার নমস্কারের পাত্রী হল!

নারদ। আপনি উচ্চ বংশের লোকের উপযুক্ত কথাটিই বলেছেন। এখন বড় ভাইর বউকে কি করে ছোট ভাইর সঙ্গে বিয়ে দেবেন! সুদর্শনে, এক কাজ করুন। কাশিরাজকে বলুন, কুরঙ্গী জয়বর্ম্মার চেয়ে বয়সে বড়। আচ্ছা কুরঙ্গীর ছোট একটি তার বোন আছে বোধ হয়? তার নাম সুমিত্রা। সুমিত্রার সঙ্গে জয়বর্ম্মার বিয়ে হবে।

সুদর্শনা। ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য।

নারদ। যান, আপনি কুন্তিভোজের পেছনে পেছনে যান।

সুদর্শনা। ভগবানের যে আদেশ।

বরবেশী অবিমারক, কুরঙ্গী, ও ভূতিকের প্রবেশ

অবি। এই কথা শুনে বড় লজ্জিত হয়েছি!

যে দিন হাতীটা ক্ষেপেছিল সে দিন (সে সময়ে) আমাকে দেখে যারা আমার বিক্রমের প্রশংসা করেছে, তারা (এখন) এই কাহিনী শুনে আমার

---

* মেষরূপধারী।

চরিত্র কলঙ্কিত বলে একটা ধারণা মনে পোষণ করবে না ত?

পরিক্রমণ ও দর্শন করিয়া

এ যে ভগবান নারদ!

তিনি শাপ দিতে যেমন, অনুগ্রহ দেখাতেও তেমন। দুই কাজেই উপযুক্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। আবার বেদগানে কণ্ঠ যেরূপ মধুর, সঙ্গীতেও তেমনি। ভগবান নারদ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে নিজেই পরে যত্ন করে সমস্ত গোল মিটিয়ে দেন!

কুন্তিভোজ। কুমার, এ দিকে, এ দিকে! কুলদেবতা দেবর্ষিকে অভিবাদন কর।

অবি। ভগবন্, অভিবাদন কচ্ছি।

নারদ। পত্নীর সঙ্গে সুখে ও মঙ্গলে থাক।

অবি। অনুগৃহীত হলুম। মাতুল, অভিবাদন কচ্ছি।

কুন্তিভোজ। বৎস, এস।

ক্ষমাগুণে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে জয় কর, দয়ায় আশ্রিতকে জয় কর, তত্ত্ববুদ্ধিবলে আত্মা জয় কর, আর তেজঃপ্রভাবে নরপতিগণকে জয় কর।

অবি। অনুগৃহীত হলুম।

কুন্তিভোজ। বৎস, এ দিকে এস। পিতাকে অভিবাদন কর।

অবি। তাত, অভিবাদন কচ্ছি।

সৌবীর। বৎস, এস।

বরবেশে সজ্জিত হয়ে তুমি সুন্দর হয়েছ, হাসিমুখে গুরুজনকে বন্দনা কচ্ছ। আশীর্ব্বাদ করি, পুত্র দর্শন করে আমার মত হর্ষবাষ্পনেত্র হও।

পুত্র, মাতুলকে অভিবাদন কর।

কুন্তিভোজ। বৎস, এস,

সর্ব্বদা শুভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে হরির মত হও, সত্যনিষ্ঠ হয়ে দশরথের মত হও, সর্ব্বদা দান করে পিতার মত হও, আর পরাক্রমে আত্মসদৃশ হও।

সৌবীর। পুত্র, সুদর্শনাকে অভিবাদন কর।

কুন্তিভোজ। সুচেতনাকে অভিবাদন না করে সুদর্শনাকে অভিবাদন করাটা ঠিক হবে না।

নারদ। তার কারণ আছে। সুদর্শনাকেই অভিবাদন কর।

উভয়ে। হাঁ, তাই কর।

অবি। দেবি, অভিবাদন কচ্ছি।

সুদর্শনা। পুত্র, এর সঙ্গে চিরজীবী হও। অনেক কাল পরে তোমাকে দেখছি (আলিঙ্গন করিয়া) আজ আমি পুত্রলাভের আনন্দ পাচ্ছি। (রোদন)

কুন্তিভোজ। (সুদর্শনার) পয়োধর-যুগল হতে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হচ্ছে, অক্ষিযুগল কুতূহল বশতঃ সজল হয়েছে। মাতা বলে ইনি পরিচিত না হলেও, এঁকে দেখায় এখন সুচেতনা ধাত্রীরূপে পরিণত হ'ল।

নারদ। এখন আর এত স্নেহ প্রকাশ করো না। সুচেতনাকে সুচেতনার মত এবং সুদর্শনাকে সুদর্শনার মত বর-বধূর সঙ্গে এখন কন্যাপুরে প্রবেশ কত্তে হবে।

কুন্তিভোজ। ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা।

সুদ। ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা।

নারদ। কুন্তিভোজ, সৌবীররাজকে শীগ্‌গির নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও। তুমিও আমার কাছে এস।

কুন্তিভোজ। অনুগৃহীত হলুম।

নারদ। কুন্তিভোজ, তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য সাধন করব?

কুন্তি। ভগবন্, যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে এর বেশী আর কি আকাঙ্ক্ষা করব?

সর্ব্বদা গোব্রাহ্মণের হিত হউক, পৃথিবীতে সকল লোক সুখে থাকুক।

নারদ। সৌবীররাজ, তোমার কি প্রিয় সাধন করব?

সৌবীর। ভগবন্, যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তা হ'লে এর বেশী আর কি আকাঙ্ক্ষা করব?

এই সমুদ্ররূপ নীলবস্ত্রপরিহিতা পৃথিবীকে

আমাদের নরেশ্বর শাসন করুন।

(ভরত বাক্য)

চতুর্দ্দিক বিমল হউক, * শত্রুমণ্ডলী প্রশমিত হউক, আমাদের রাজসিংহ এই সমগ্র মহীমণ্ডল শাসন করুন।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

অদ্বৈত-মঙ্গল পুথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল-নিরূপণ

(উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত)

বৈষ্ণব-শিরোমণি অদ্বৈতাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অদ্বৈত-জীবনী আলোচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শৈশব-চিত্র এবং তৎসমসাময়িক বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু এই আলোচনার বহু অন্তরায় আছে। প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায় না; কারণ অনেক প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অদ্বৈত-জীবনী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি চৈতন্যের জীবনীলেখকগণের মধ্যে অনেকেই নিত্যানন্দ-বংশের শিষ্য এবং এই বংশের শিষ্যানুশিষ্যই বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের সর্ব্বস্তরে সুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকে আবার অদ্বৈত আচার্য্যের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে দেখিতে পাই,

ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন অদ্বৈতের হইবে দুষ্ট পণ ।।†
অদ্বৈতেরে গাইবেক শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া ॥
যে বলিবে অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব
তাহারেই বেড়িয়া লংঘিবে পাপী সব
সে সবগণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে
এত বড় শক্তি নাহি এ দণ্ড দেখিতে
সকল সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি বিশ্বম্ভর
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি বৈষ্ণবেরে
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ
তার রক্ষা সামর্থ নাহিক কোন জন
বৈষ্ণব নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥

—দ্বাবিংশ অধ্যায়—মধ্যখণ্ড।

নিত্যানন্দ ভক্ত সবদিকে সাবধান
নিত্যানন্দ ভৃত্যের চৈতন্য ধনপ্রাণ ॥—

ফলে গৌর-নিতাই জীবনী জনসাধারণের যেরূপ সুপরিচিত ও হৃদয়াকর্ষক হইয়াছে, অদ্বৈত-জীবনী সেইরূপ হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈত-জীবনীর বিশেষত্বই তাঁহার জীবনী-লেখকগণের কার্য্য দুরূহ করিয়া থাকিবে। মহাপ্রভুকে প্রকট করাই ছিল অদ্বৈতের সাধনা। অদ্বৈত ভাবিতেন, মহাপ্রভুই প্রেমভক্তি বিতরণ পূর্ব্বক জীবের মুক্তি বিধান করিবেন; তাহার নিজ ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। সুতরাং চৈতন্যকে মহাপ্রভুরূপে প্রকট করিয়া, যাহাতে তাঁহার কার্য্যে কোনও অন্তরায় না হয়, এই জন্যই তিনি একরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবেই জীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় হইতেই যেন প্রভুর উন্নতি হউক পক্ষান্তরে আমার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হউক, এই মহান ভাবে অদ্বৈত আবিষ্ট হইলেন। এইরূপ নিরহঙ্কার আত্মত্যাগী মহাত্মার জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন।

---

* ভবত্বরজসো গাবঃ
† পাঠান্তর—জানেন সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ

উপরোক্ত প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহে অদ্বৈতজীবনী বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত না হওয়াতে এতদর্থে কয়েকখানা পুথি ইদানীং মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকেই উপকরণের অভাবে উদ্দাম কল্পনা বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার বিন্যাস দ্বারা স্ব স্ব গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। ঈশান নাগর কৃত 'অদ্বৈত-প্রকাশ' এই শ্রেণীর অন্যতম গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' লেখকও এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ কটাক্ষ করিয়াছেন। মূল পুথিখানা বাহির না করা পর্য্যন্ত মুদ্রিত গ্রন্থের কলেবর ও মতবাদের জন্য লেখক ও প্রকাশক মধ্যে কাহার কৃতিত্ব অধিক এ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে না। বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সকল জঞ্জালের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কয়েকটি উদাহরণই এ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাই—

"কলি ঘোর পাপময় দেখি পঞ্চানন।
কৈছে জীব নিস্তারিমু ভাবে মনে মন॥
* * * *
শুন মহাবিষ্ণু তুমি এহেন মূর্ত্তিতে।
অবতীর্ণ হও আগে লাভার গর্ভেতে॥
পাছে মুই অবতীর্ণ হইমু নদীয়ায়।
সচী জগন্নাথ ঘরে দেখিবা আমায়॥"

চৈতন্য মহাদেবের অবতার, ইহা নিতান্তই নূতন সংবাদ! তার পর অদ্বৈত মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে, যমরাজ ভয়ে একান্ত অধীর হইয়া পড়েন—"তোমা দরশনে পাপী পাইবে পরিত্রাণ;" কিন্তু অদ্বৈতের আশ্বাস-বাক্যে তাহার ভয় দূর হইল—"নিন্দুক পাষণ্ডীগণ না হৈবে উদ্ধার।" শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিশু অদ্বৈতও বহু লীলা বিস্তার করেন—মায়ের আবদারে বালক অদ্বৈত অদ্বিতীয় সাধন-বলে সমুদয় তীর্থকে বৎসরে একদিন "পণা তীর্থে" সমবেত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। এই গ্রন্থ অনুসারে অদ্বৈতপত্নী সীতা ঠাকুরাণী নৃসিংহ ভাদুড়ীর ঔরসজাত সন্তান নহেন—বিলে পদ্ম-চয়ন-কালে ভাদুড়ী অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ একটী কন্যা-রূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের পরামর্শে যবন হরিদাস ব্রাহ্মণ-ভোজনে যোগদান করায় বহু ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ ঘটে। অদ্বৈত শচী ও জগন্নাথ উভয়েরই মন্ত্রগুরু ছিলেন। কৃষ্ণমিশ্র শ্রীঠাকুরাণীর পুত্র নহেন—পালিত পুত্র। অদ্বৈতের বেদপঞ্চানন উপাধি ছিল। চৈতন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে দুই বৎসর তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নান্তে বেদপঞ্চানন অদ্বৈতের টোলে দুই বৎসর অধ্যয়নের পর বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। অদ্বৈত "জ্ঞানাৎপরতরং ন হি" এই মত প্রচার করায় চৈতন্য তাঁহাকে নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সংহার করিতে উদ্যত হন, এবং নিষ্ঠুর ভাবে ভীষণ প্রহার করেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অমুদ্রিত পুথির কথা।—অদ্বৈত-সম্বন্ধে মুদ্রিত গ্রন্থের দশা এই। তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে "বাল্যলীলা সূত্র," "অদ্বৈত-মঙ্গল" প্রভৃতি আরও কয়েকখানা পুথি আছে। দুঃখের বিষয়, এই সকল পুথি মুদ্রিত হয় নাই, এবং বহু অন্বেষণেও ইহাদের দুইতিন খণ্ডের অধিক প্রতিলিপি বঙ্গদেশে আছে বলিয়া কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এই উভয় গ্রন্থেরই সাক্ষাৎ পাইয়াছি। "বাল্যলীলাসূত্রে", বহু অবান্তর ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ রহিয়াছে, সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যলীলা আলোচনায়ও ইহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

"অদ্বৈত-মঙ্গল" রচয়িতার নাম হরিচরণ দাস, ইনি অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌড়গতপ্রাণ অচ্যুতানন্দের শিষ্য। কতকগুলি কারণবশতঃ অদ্বৈত-জীবনী আলোচনার পক্ষে অদ্বৈত-মঙ্গল গ্রন্থখানি বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। আমাদের সংগৃহীত অদ্বৈত-মঙ্গল পুথি ৭২ পাতায় এবং ২৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। *

পুথিখানা ঢাকা নিবাসী হরিধর শাখারীর জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ১২৫০ বাঙ্গালা সনে নকল করা হয়, এবং অতঃপর ১৬৮২ শকে লিখিত অপর একখানা পুথির সহিত পাঠ মিলাইয়া উহার সংশোধন এবং পাঠান্তর নির্দ্দেশ করা হয়।

* অধ্যায় (১) গুর্ব্বাদি বর্ণন (২) পঞ্চম অবস্থার সূত্র; বিজয় পুরীর আগমন।
(৩) বিজয়পুরী সংবাদ; ভাগবত আস্বাদন।
(৪) জন্ম; রাজপুত্রকে কৃপা।

হরিচরণ নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তিনি কাহার পুত্র কোথায় তাহার বাস এসকল কিছুই অদ্বৈতমঙ্গল হইতে উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থ হইতে এইটুক বুঝা যায় যে, আচার্য্য পরিবারের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল; যেন তিনি আচার্য্য পরিবারের সহিত এক হইয়া গিয়াছিলেন। অদ্বৈতমঙ্গলের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি অদ্বৈত প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন—

(১) বন্দো শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সীতার প্রাণনাথ
যে আনিল মহাপ্রভু গোলোকের নাথ
(২) শ্রীরাধিকার ভাব লৈয়া গৌরাঙ্গ প্রকট হৈয়া
ব্রজলীলা করিল সাক্ষাৎ।
(৩) কলির জীব উদ্ধারিলা দিয়া প্রেম ভক্তি।
(৪) চৈতন্যকে আর্য্য করি করে সর্ব্বকার্য্য।
(৫) যে করিল মহাপ্রভু জগতে বিখ্যাত।
(৬) যে আনিল মহাপ্রভু রসের প্রচুর।
(৭) পৃথিবীতে অবতরি হুঙ্কার গর্জ্জন করি
রাধা কৃষ্ণ করিলা প্রকট।
(৮) ভজরে ভজরে ভাই অদ্বৈত গোসাঞি
যাহা হইতে পাইলাম শ্রীচৈতন্য নিতাই।

এই সকল বর্ণনায় কবি অদ্বৈতাচার্য্যের সার্থকতা দেখাইতেছেন।

আবার অন্য বন্দনায়—

(১) বন্দনা করিব আগে শ্রীচৈতন্য গোসাঞি।
শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র বন্দো তার বড় ভাঞি॥
শ্রীঅদ্বৈত পাদপদ্ম বন্দিয়া যতনে।
অভেদ চৈতন্য হএ জানে সর্ব্বজনে॥
তিন প্রভু এক হএ সিদ্ধান্তের সার।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ আকার॥
(২) জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
আমার প্রভুর প্রভু * লোক কৈলা ধন্য॥

(৫) রাজদণ্ড।
(৬) শান্তিপুর গমন; শাস্ত্র অধ্যয়ন।
(৭) বৃন্দাবন গমন ও ভ্রমণ; পিতামাতার পরলোক; গয়াতে বৈদিক-ক্রিয়া।
(৮) মদনগোপাল প্রকটন; শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ও তপস্যা।
(৯) মাধবেন্দ্র সংবাদ; দীক্ষা।
(১০) দিগ্বিজয়ি-জয়।
(১১) কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর নিকট স্বরূপ বর্ণন।
(১২) দেবমোহ; ব্রহ্মার হরিদাস রূপে জন্ম।
(১৩) রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা বর্ণন; শ্যামদাসাদি শাখা-বর্ণন।
(১৪) শ্রীনাথ ও রূপসনাতন সংবাদ।
(১৫) বিবাহ; সীতার চতুর্ভুজা মূর্ত্তি।
(১৬) সীতার দীক্ষা।
(১৭) নিত্যানন্দের জন্ম, দৈত্যের প্রতি কৃপা; গঙ্গা-মাহাত্ম্য।
(১৮) মহাপ্রভুর জন্ম; শচীর দীক্ষা।
(১৯) জলবিহার; কামদেবসৌভাগ্য।
(২০) প্রভুর নন্দন প্রকটন।
(২১) অদ্বৈতের দণ্ড।
(২২) অদ্বৈত গৃহে ভোজন।
(২৩) শান্তিপুরে দানলীলা, জলবিহার; প্রতি সংখ্যার সারসঙ্কলন।
"পঞ্চম অবস্থা প্রভুর নৃত্য বর্ণন।
ত্রিংশ বিংশতি সংখ্যা সকলে লিখন।"

---

* সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরী।
অদ্বৈতের সেবা করে নহে প্রিয়কারী॥
* * * *
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বুদ্ধে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব জন্ম জন্ম কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
সবার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীতি বহুতর॥

চৈতন্য কহে মোর আর্য্য অদ্বৈত প্রধান।
অদ্বৈত কহে মোর আর্য্য চৈতন্য প্রধান ॥*
দোহার চরণ বন্দি মস্তকে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ প্রভু বন্দো ভূমে গ'ড়ি দিয়া ॥ ৫০পৃঃ

ইত্যাদি পাঠ করিয়া মনে হয়, কবি শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যকে ভেদ দৃষ্টিতে দেখেন নাই—তাহার কাছে সবই এক।

ইহার পর গ্রন্থপ্রণয়ন সম্বন্ধে দেখিতে পাই—

(১) সীতা ঠাকুরাণী বন্দো তাহার তনয়।
যাহার আজ্ঞাএ এই পুস্তক যে হয় ॥

(২) জয় জয় প্রভুর তনয় প্রেমময়।
যাহার আজ্ঞাএ লিখি করিয়া বিনয় ॥
হৃদয় প্রবেশ করি কর্ণে শুনাইয়া।
নেত্রে দেখাইয়া দেখাএ জতন করাইয়া ॥

(৩) জয় জয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব প্রধান।
তুমি মোরে কৃপা করি করাহ বর্ণন ॥

(৪) প্রভুর নন্দন আর শাখা সকলে।
আমারে আজ্ঞা দিল শ্রীচরণ বলে ॥
আমি প্রভুর ভৃত্য তাহার আজ্ঞা বলে।
সাহস করিয়া লিখি শ্রীচরণ বলে ॥
কবিতাহা নাহি জানি নাহি লিখি আন্।
সহজে লিখিএ কথা করিয়া যতন ॥ (৩ পৃঃ)

(৫) বন্দো শ্রীঅচ্যুদানন্দ প্রভুর তনয়।
বলরাম কৃষ্ণমিশ্র আর যত হয় ॥
তোমার আজ্ঞাএ লিখি যতন করিয়া।
বিজয়পুরী সংবাদ লিখি শুন মন দিয়া ॥ (৫ পৃঃ)

(৬) প্রভুর ভক্তবৃন্দ চরণে নমস্করি।
যাহার কৃপাএ লিখি লীলা যে বিস্তারি ॥ (৩৬পৃঃ)

(৭) সেই কৃষ্ণদাসের কড়চা দেখিয়া।
শ্রীনাথ আচার্য্য মুখে বিশেষ শুনিয়া ॥
সহজ লীলা প্রভুর অনন্ত অপার।
কে বুঝিতে পারে তাহা শকতি কাহার ॥
প্রভুর মুখে শুনিল যেই দেখিল প্রকট।
মনেতে রাখিয়া সেই লিখিল অকপট ॥ (৫৩পৃঃ)

(৮) জয় জয় সীতা গোস্বামী করুণা সাগর।
করুণা করহ মোরে দেখিয়া পামর ॥
জয় জয় শান্তিপুর প্রভুর নিত্যধাম।
চৈতন্য লীলানন্দ যাহাতে বিশ্রাম ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জন্মলীলা কিছু।
বর্ণিতে শক্তি দাও আমি অজ্ঞ শিশু ॥ (৪৮ পৃঃ)

(৯) শ্রীগুরুর চরণ পদ্ম মনেতে করিয়া শুদ্ধ
যে লেখাএ পূর্ব্বে শুনি লোক মুখে।
কৃষ্ণের জীবন প্রাণ প্রেমমূর্ত্তি যাহার নাম
আজ্ঞা মাগি তাহার শ্রীমুখে ॥
তাহার যে কৃপাবরে পূর্ব্বাপর দেখাএ মোরে
আজ্ঞা অনুসারে মাত্র লিখি।

উদ্ধৃত অংশ পাঠে আরও বুঝা যাইবে যে হরিচরণ অদ্বৈত-পরিবারে রক্ষিত কাগজপত্র এবং অদ্বৈত-পত্নী সীতা ঠাকুরাণী, অচ্যুতানন্দ, বলরাম প্রভৃতি আচার্য্যের পুত্রগণ, এবং বিজয়পুরী প্রভৃতি ভক্ত এবং শিষ্যগণের নিকট হইতে আচার্য্য সম্বন্ধে যেমন জানিয়াছেন, অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "তাঁহার আজ্ঞাএ বৃদ্ধ আমি লিখিল প্রমাণ" এই ছত্রটী হইতে বুঝা যায় যে গ্রন্থ রচনা কালে হরিচরণ বৃদ্ধ। 'কবিতাহা নাহি জানি নাহি লিখি আন," এই উক্তির সত্যতা উদ্ধৃত অংশ পাঠেই উপলব্ধি হইবে। বৃদ্ধ বয়সে কবিত্ব-শক্তির অভাব সত্ত্বেও তিনি আচার্য্যপত্নী সীতা ঠাকুরাণী এবং আচার্য্য পুত্র গুরু অচ্যুতানন্দের অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়াই শ্রদ্ধার সহিত ভক্তিভাবের প্রেরণায় লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইয়া-

---

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা ॥
চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

* মহবলী গৌরসিংহ অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত চরণ প্রভু ঘষে নিজ শিরে ॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
হের দেখ চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে ॥
চৈঃ ভাঃ, মধ্য খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়;

ছিলেন। অদ্বৈত-জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ইহা হইতে প্রামাণিক বিবরণ আশা করা যাইতে পারে না। সীতা ঠাকুরাণী, অচ্যুতানন্দ ও শিষ্যগণের সংগৃহীত, লিখিত ও মৌখিক বিবরণ সকলই তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইবে যে, যাঁহাদের আচার্য্য-জীবনী জানিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ ছিল, তাহাদের সকলের নিকট হইতেই কবি গ্রন্থরচনায় অশেষবিধ সাহায্য পাইয়াছিলেন। এমন সৌভাগ্য আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই।

চৈতন্য দেবের জীবনী-লেখকগণের মধ্যে অদ্বৈত আচার্য্যের সম্বন্ধে এতটা জানিবার সুযোগ কাহারও ঘটিয়া উঠে নাই। অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ। চৈতন্যদেবের নিকট প্রথম হইতেই তিনি'নাড়াবুড়া'। তিনি জগন্নাথ মিশ্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীরও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। সুতরাং তিনি চৈতন্য ও তাহার জীবনী-লেখকগণের প্রায় দুই পুরুষকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শান্তিপুর অদ্বৈতের লীলাক্ষেত্র*। তিনি তথাকার একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন।

"এথা না রহিব চল যাইব শান্তিপুর।
আমার স্বদেশ হএ স্নেহি গঙ্গাতীর"—

তিনি শান্তি-পুরকেই স্বদেশ বলিয়া জানিতেন। তিনি শান্তিপুরনাথ নামে সাধারণ্যে সুপরিচিত। অশীতিপর অদ্বৈত চৈতন্যকে মহাপ্রভু বলিয়া ঘোষণা করেন; সুতরাং ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া হরিনাম প্রচারে তিনি তাঁহার সহায় হইতে পারেন নাই। শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করাও তাঁহার পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভবপর হইত না।

সুতরাং নদীয়ারচান্দের জীবনী-লেখকগণের পক্ষে শান্তিপুরনাথের জীবনের বহু ঘটনাবলী জানিবার সুযোগ ঘটে নাই।

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২অঙ্ক ৪৫ শ্লোক—
"শ্রীবাস—দেব যদ্যপি শান্তিপুরবাস এবাদ্বৈতোপযোগী তথাপি নরানাং ভক্তিনাং দ্বীপ ইবেতি নবদ্বীপে চরণনির্ভাবাবধি অদ্বৈতে পক্ষপাতঃ।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঘটনাবলী হরিচরণ যথাশ্রুত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতপ্রচারিত ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও তিনি তাহাই করিয়াছেন। সকল সময়ে তিনি তত্ত্ব বিকাশেরচেষ্টা করেন নাই, সম্ভবতঃ এই সরলমতি বৃদ্ধের সে শক্তি ছিল না। অতএব তাহার দ্বারা কোনও তত্ত্বের বিকৃতি বা অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অদ্বৈতের ষড়ভুজ রূপে প্রকাশ, সীতাদেবীর চতুর্ভুজারূপে প্রকাশ, অদ্বৈতের তপস্যায় দেবগণের অপ্সরাপ্রেরণ, হরিদাসের মুখ হইতে অগ্নি-সংগ্রহ প্রভৃতি ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই সকল অলৌকিক ব্যাপার অপেক্ষা অদ্বৈতের দৈনন্দিন ঘটনাবলী বর্ণনেই হরিচরণ অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন।

এই সকল কারণে হরিচরণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ স্থাপনে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রভাব এবং এই সম্প্রদায়ের প্রথম যুগে মতবাদগুলি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে হরিচরণের অদ্বৈত-মঙ্গল অতীব মূল্যবান।

অদ্বৈতাচার্য্যের কালনিরূপণ—এ সম্বন্ধেও অদ্বৈত-মঙ্গল আমাদের প্রধান সহায়—

"সাত শত বৎসর মহাপ্রভুর আগে
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু প্রকট সব আগে॥" ৪পৃঃ

সুতরাং মহাপ্রভুর জন্মের (১৪৮৫ খৃঃ অব্দের) ১০৭ (৭+১০০) বৎসর পূর্ব্বে বা তাঁহার তিরোভাবের (১৫৩২ খৃঃ অব্দের) ১০৭ বৎসর পূর্ব্বে, অদ্বৈতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, তাহাই প্রতিপাদ্য। এই দুইটী সন হইতে ১০৭ বাদ দিলে যথাক্রমে ১৩৭৮ খৃঃ অব্দ ও ১৪২৫ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে চৈতন্যের তিরোভাবকালে অদ্বৈতের বয়ক্রম যথাক্রমে ১৫৪ বৎসর বা ১০৭ বৎসর ধরিতে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চৈতন্যের তিরোভাবের পরও অদ্বৈতচার্য্য জীবিত

ছিলেন। একণে ১৫৪ বৎসরের অধিক বয়ক্রম নির্দ্ধারণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণে হরিচরণের বর্ণনার অর্থ ইহাই ধরিতে হইবে যে, চৈতন্যের তিরোভাবের ১০৭ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৪২৫ খৃঃ অব্দে, অদ্বৈতাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লেখক "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থ অপ্রামাণিক এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই পুনরায় নিজ প্রয়োজনে উক্ত গ্রন্থের অসমর্থিত সন তারিখগুলি গ্রহণ করিয়া ১৪২৮ খৃঃ অব্দে অদ্বৈতের জন্ম হয়, এইরূপ মতবাদ কেন প্রচার করিয়াছেন তাহার অর্থ বুঝা যায় না। বলা বাহুল্য, "অদ্বৈত প্রকাশের" ন্যায় অপ্রামাণিক গ্রন্থের উক্তি অপর নির্ভরযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই গৃহীত হইতে পারে না।

একণে অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোভাব-কাল নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। হরিচরণ আচার্য্যের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে সামান্য আভাস প্রদান করিয়াছেন—

"শ্রীপ্রভুর শেষ কালে ভাগবত আনিয়া।
বলরাম কৃষ্ণমিশ্রে দোহাকে ডাকিয়া॥
শ্রীভাগবত সমর্পিল গোসাঞি বলরামে।
মদনগোপাল পট্ট দিল কৃষ্ণমিশ্র নামে॥"—
অঃ মঃ, ২০ অধ্যায়।

ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, হরিচরণ আচার্য্যের মৃত্যুর পর অদ্বৈত মঙ্গল রচনা করেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেও গ্রন্থ রচনার সময় সম্বন্ধে আভাষ পাওয়া যায়। অদ্বৈতমঙ্গলের শেষ অধ্যায়ে দানলীলা, জলবিহার বর্ণনা, এবং প্রথম অবধি বিভিন্ন অধ্যায়ের সার সঙ্কলন রহিয়াছে। এই অধ্যায় সকলের পরামর্শ ক্রমে লিখিত হয়, অথচ দানলীলা* ১৫০৯ একমাত্র খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এই অধ্যায় সকলের রচনা, ইহাতে হরিচরণের প্রতি নির্ভর করা হয় নাই। গ্রন্থমধ্যে অদ্বৈত জীবনীর পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি যেন বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যবশতঃ যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে।

মহাপ্রভুর নীলাচল অবস্থান কালে, এমন কি তাহার তিরোভাবের পরেও তাঁহার জীবিত থাকিবার কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া যায়—

(১) "রাজা (প্রতাপরুদ্র)-কথমসৌ কতিচিজ্জনৈঃ সহ পৃথগায়াতি।"

সার্ব্বভৌম—"সর্ব্বাদৃতত্বাৎ অন্যাং-সঙ্গং নেহতে।"
৮ম অঃ ৪৩।

(২) চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্যের তরজা প্রেরণ—

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিছে বাউল॥"—চৈঃ চঃ।

মহাপ্রভুর তিরোভাবকালে আচার্য্যের বয়স ১০৭ বৎসর ছিল। তৎপর যে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। অথচ নিত্যানন্দ বংশমালা অদ্বৈতপ্রকাশে দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভুর তিরোভাবের বহুপরে নিত্যানন্দের মৃত্যু ঘটে। এবং নিত্যানন্দের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র বীরভদ্রের জন্ম হয় এবং এই বীরভদ্রের ২০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেও আচার্য্য জীবিত ছিলেন। সুতরাং এইরূপ সময়-নির্দ্ধারণে আস্থা স্থাপন করা কঠিন।

অদ্বৈত-মঙ্গল অনুসারে আচার্য্যের প্রকটাবস্থায়

---

* দানলীলা বর্ণনায় দেখিতে পাই—

"ভক্তগণ প্রভুর বাক্য শুনি হইল বিমন।
অপ্রকট করিব বলি লয় সভার মন॥
এই যে কহিল প্রভুর শান্তিপুর লীলা।
মথুরা বিরহ হৈল অন্তর বিভ্রমা॥"

ঈশান শান্তিপুরেই বিবাহ করেন, কিন্তু অদ্বৈত-প্রকাশে দেখিতে পাই, তিনি আচার্য্যের মৃত্যুর পরে পূর্ব্বদেশে আসিয়া বিবাহ করেন। অপর একটি বিষয় এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতের তিরোভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কামদেব নাগর প্রভৃতি তাঁহার কতিপয় শিষ্য "অদ্বৈত গোবিন্দ" বিগ্রহ স্থাপন করেন; এবং এবং আচার্য্য পুত্র বলরাম এবং জগদীশ চৈতন্যাবতার অগ্রাহ্য করিয়া কৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ফলে গৌড়গতপ্রাণ অদ্বৈত নিদারুণ আঘাৎ পাইয়া অত্যল্প কাল মধ্যেই পরলোক গমন করেন। ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ফলে নিত্যানন্দের তিরোভাবেরও সুদীর্ঘকাল (২০ বৎসরের অধিক) পরে আচার্য্য জীবিত ছিলেন, এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে কিনা বিবেচ্য। এ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ

পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্‌লা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত)

মোগলশাসনে নির্জীব ও বিলাসপ্রিয় রাজসভার নির্দ্দেশে যখন বঙ্গভাষা পেশোয়াজ পরিধান করিয়া প্রাণহীন অথচ সুমিষ্ট রাগিণীতে তানলয়শুদ্ধ ঠুম্‌রির আলাপ করিতেছিল, তখন (উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে) সাগরের অপর পার হইতে রসশূন্য, সজাগ ইংরেজ বণিক ভারতে প্রবেশ করিয়া পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথম বীজ ধীরে ধীরে এ দেশে ছড়াইতে লাগিল। প্রাচ্য ভারত তখন কোথায়ও দর্শনের উচ্চতত্ত্বে ধ্যানস্থ, কুত্রাপি বা নিমীলিত-নেত্রে কাব্যরসাস্বাদে বিভোর, অন্যত্র ন্যায় ও স্মৃতির সূক্ষ্মবিচারে নিমজ্জিত। প্রতীচ্য জগতেও ন্যায়, দর্শন স্মৃতি ও কাব্য না আছে এমন নহে, কিন্তু, কার্য্যকারী বিজ্ঞানই উহার প্রধান সাধনার বিষয়।

এ দেশে প্রবেশ করিয়া ইহার সকল তত্ত্ব উদ্ধার ও আয়ত্ত করা ইংরেজের প্রথম লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইহাঁরা কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উহার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করাইতে লাগিলেন। ইংরেজজাতির মধ্যে শ্রীরামপুরের ধর্ম্মপ্রচারকেরা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হইলেন। পাশ্চাত্য জাতির স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ব্যতিরেকেও ধর্ম্মবিস্তার পাদরীমহাশয়দের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। শুধু গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবেই ইহাঁদের উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে ফলপ্রসূ হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া এই মনীষীগণ সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র দেশে প্রথম স্থাপন করিলেন। গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই বাঙ্গালাদেশে বর্ত্তমান শিক্ষাবিস্তারের মূলীভূত কারণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। এজন্য এতদুভয়ের প্রবর্ত্তক মহামতি হালহেড, উইলকিন্স, ফষ্টার, মার্শমান, ওয়ার্ড, কেরী প্রমুখ ইংরেজগণের নিকট সমগ্র বাঙ্গালীজাতির একান্ত কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের প্রণেতা রামরাম বসু। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর রচিত "প্রতাপাদিত্যচরিত্র" প্রথম মুদ্রিত হয়। তারপর তৎপ্রণীত "লিপিমালা", রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "রাজাবলী", ও "প্রবোধ চন্দ্রিকা",—চণ্ডীচরণ প্রণীত "তোতা-ইতিহাস", হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষপরীক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সঙ্গে কয়েকখানি সংস্কৃতের অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ রামকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের "হিতোপদেশ" ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের "বত্রিশ সিংহাসন" এই দুইখানি গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে।

মুদ্রিত বাঙ্গালা গদ্য-গ্রন্থের মধ্যে এই বহিগুলি প্রথম প্রচারিত হইলেও স্থায়ী বাঙ্গালা গদ্যের আদি রচয়িতার সম্মান বাঙ্গালীকুলের শিরোমণি মহাত্মা রাজা রামমোহণ রায়েরই প্রাপ্য। রামাই পণ্ডিত প্রণীত "শূন্যপুরাণ" প্রভৃতি আদিযুগের গ্রন্থেও বাঙ্গালা গদ্যের এক প্রকার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে রচনা স্থায়িত্বলাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট

হয় নাই, স্থায়িভাবে প্রচলিত হইতেও পারে নাই। কথিত গদ্যভাষায় লিখিত বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে পারে, সে ধারণা এতাবৎ লোকের মনে কখনও স্থান পায় নাই। রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতীচ্য জগতের সাহিত্য ও ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন; কিন্তু, ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহন ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্য বিষয়ে উদ্দেশ্য ও আস্থা অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে পারিলেন না। উল্লিখিত দূরদর্শী ইংরেজেরা সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। রামমোহন রায়ের বিচার-গ্রন্থ "একেশ্বরবাদ" বাঙ্গালার প্রথম গদ্যগ্রন্থ। তৎপ্রণীত অন্য এক বিচারগ্রন্থ "পৌত্তলিকদের ধর্ম্ম-প্রণালী", এতদ্ভিন্ন তিনি সর্ব্বপ্রথমে বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির ভাব অনেকাংশে সংস্কৃতশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার ভাষাও সংস্কৃতের অনুগামী অথচ সজীব ও সচল হইয়াছে। নিম্নে দৃষ্টান্ত দেখুন।

"যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল ইহাতে কি পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের গতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার কি প্রভাব পরিপূর্ণ রূপে স্ব স্ব স্থানে বর্ণন আছে আর অধ্যাত্ম বিদ্যার বিশেষ মতে পরিসীমা ইহাতে আছে। পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা এতৎকালীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যূনাধিকের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন আর যাহারা যুদ্ধবিগ্রহ হাস্যকৌতুক আচার-বিচার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্ম তত্ত্বের অভ্যাসে সুতরাং না হইতে পারে। হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগের আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি।"—কঠোপনিষদের ভূমিকা।

রাজা রামমোহনের পরবর্ত্তী রামরাম বসু প্রমুখ গদ্য লেখকগণের মধ্যে কাহারও এই নূতন রচনার প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না। ইংরেজী সাহিত্যে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত রামমোহনের ন্যায় ইহাদের কেহই পাশ্চাত্য প্রভাব অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; ইংরেজ কর্ত্তার আদেশেই মাত্র ইহারা গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং—ইহাদের লিখিত ভাষায়ও কোনও বিশেষরূপ উদ্দেশ্য বা শৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল রচয়িতার মধ্যে এক শ্রেণী তৎকালীক রীতি অনুসারে আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ; ইহাদের রচনা স্থানে স্থানে ওজস্বিনী কোথায়ও বা মাধুরী-পূর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু, সর্ব্বত্র একই শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। অধিকন্তু, এই রচনায় বহুস্থলে তৎকাল-প্রচলিত মুসলমানী ভাষার সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ জাতীয় রচনার দৃষ্টান্তস্বরূপ রামরাম বসুর গ্রন্থ হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"পাঁচ লক্ষ সামন্ত দিল্লী গেদ্দে ছিল সমস্ত আনয়ন করিয়া হুকুম হইল গৌড়ে চড়াই করিতে ও দাউদের শিরচ্ছেদন করিতে এই মতে সর্ব্ব সামন্ত হুকুমানুক্রমে মহাদম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া হুহুঙ্কার হুঙ্কার শব্দ করিয়া সর্জ্জ চারিদিকে নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল ধা ধা শব্দে সোর হইতে লাগিল ও তড়াতড়ে বন্দুক জয়ঢাক ইত্যাদি নানা বিধি বাদ্য বাজিতে লাগিল অতি ঘোর কল্লোল শব্দে কর্ণরোধ হওনের গোছ এইরূপে সামন্তেরা সর্জ্জমান হইয়া মহাদম্ভে গৌড়ে গতি করিল বাদসাহও আপনি শিকার খেলিবার মতে গৌড়মুখে রাহি হইলেন এথাতে দাউদের উকীল হেন্দোস্থান হইতে দেখিল আর নিরাকরণ হইতে পারে না বাদসাহ আপনে রোষাগ্নিতে পুর সরঞ্জামে গৌড়ে গতি করিলেন বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত বচন হুকুম হবেক।"—প্রতাপাদিত্য চরিত্র

ভাষার গঠন যে প্রকারই হউক বর্ণনা সজীব ও তেজোব্যঞ্জক তাহাতে সন্দেহ নাই।

যশোহর পুরীর মধ্যে যে হাটবাজার স্থাপিত হইল তাহার বিবরণ এই—

"কোন দিগে চালু ধান বহুবিধ ভুষি বস্ত্র বিকি কিনি হইতেছে ডালিছারার পট্টি একদিগে। কোন স্থানে নানা চিত্র বিচিত্র বস্ত্র। কোন ঠাঁই কাঁসারিহাটা। কোন এক-দিগে কামারহাটা সকলেই আপন আপন স্থানে বসিয়া নিজ ২ জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কোন দিগে জওহরিয়দের দোকান তাহাতে মুক্তা প্রবাল মণি চুণি রকমে ২ বহু মূল্য প্রস্তর। কোন স্থানেতে হালইকরেরা মিষ্টান্ন পর্কান্ন বেচিতেছে। গোপ-গণেরা কোন দিগে দধি দুগ্ধ যাচয়মান হইয়া বেচিতেছে মাক্ষণ ও লবণি খির ও সর ছানা দোকানে ২ প্রস্তুত। কোন দিগে গোয়ালিনীরা বলিতেছে আমার এ আচ্ছা দধি আসিয়া কিন ইহা। তৈল ঘৃত লবণ কোন ২ স্থানে। কোন দিগেতে দোকানে মৎস্য পরিপূর্ণ। কোন ২ পটিতে কেবল মুদিখানা দোকান। কোন স্থানে চিনি ও মিছ্রির কারখানা। কোন স্থানেতে নানা জাতি ফল বিক্রি হইতেছে। আর এক স্থানে চিনাদি বস্ত্রীয় দ্রব্য। কোন ভাগে শুঁড়িগণের দোকান কোন স্থানে তামাক গাঁজা ভাঙ্গ চরস বিক্রি হইতেছে। এক দিগে শাঁখারিগণ সঙ্খ তৈয়ার করিতেছে। কোন স্থানে সুতার লোক দোকান করিয়াছে কাষ্ঠের নানামত সামিগ্রি প্রস্তুত। কোন ভাগে পাথর কাটারদের দোকান। কোন স্থানে সুবর্ণ বনিকেরা দোকানে বসিয়াছে তাহারদের কেহ ২ টাকা মোহর বদলাই করে কেহ ২ কড়ি বেচে কেহ ২ কেবল সোণা রুপা। সোণা ও রুপার বাসন কোন স্থানে থরে থরে রাখিয়াছে। কোন স্থানে পশ্চিমীয় বজাজেরা দোকান দিয়াছে বহুবিধ জিনিস তাহাদের দোকানে সাল পামরি বনাত পটু ভোট কম্বল জমাট ইত্যাদি বস্ত্র রকমে ২। শাদা থান পাটনাইয়া ঢাকাই মালদহিয়া প্রথক প্রথক আড়ঙ্গের রেসমি বস্ত্র তরোবতরো। শত শত দোকান কোন স্থানেতে দুলিচা গালিচা সতরঞ্চি মখমল। কোন দিগেতে কারোয়ানেরা ঘোড়া হাতী ওট খর গরু মেষ অজা ইত্যাদি প চ। পালে লইয়া বসিয়া আছে। এইমত বৃহত শোভাকর সহর।—প্রতাপাদিত্য চরিত্র।"

মুসলমানী ভাষার দৃষ্টান্ত দেখুন—

তোড়লমল এই সমস্ত দেখিয়া নিরোপায় ক্রমে বিমর্শ হইয়া হজুর এৎলা কারণ বেওরা পুরস্যরে আরজদাস্ত করিলে বাদসাহ মহারোষান্বিত সেনাতে সাজনিঘোষণ ডঙ্কা দিতে হুকুম করিলেন।

আবার—"কএকদিন পরে বিস্তর ২ তহফা আদি দিয়া বাদসাহের হজুরে দরপেস হইলেন"। অন্যত্র, "থানাজাতে সৈন্য মুরবাবন্দি করিয়া মজবুতিতে আপন মলুকে কতৃত্ব করিব।"—প্রতাপাদিত্য চরিত্র

শব্দের বর্ণবিন্যাস দেখিয়া লেখকের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না, চলিত উচ্চারণ মতেই বর্ণ বিন্যাস হইয়াছে।

উল্লিখিত গদ্যরচয়িতাদের অন্য একশ্রেণী অধ্যাপক পণ্ডিত। পারশী আরবীর সংমিশ্রণ ইঁহাদের রচনায় অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু, স্থানে স্থানে বাঙ্গালা গদ্য পাঠ করা যাইতেছে, না সংস্কৃত পড়িতেছি, তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। গ্রন্থের বিভাগ ও রচনা সবই সংস্কৃত সাহিত্যেরই অনুগামী।

এই শ্রেণীর গ্রন্থেরও স্থানবিশেষে হাল্‌কা রচনা এবং গ্রাম্যভাষা যে একান্তই দুর্লভ এমত নহে; কিন্তু, তাহার সরসতা একালের রুচিবিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে। পাঠক যদি বিংশাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রসিক-চূড়ামণি বয়োবৃদ্ধ দাদাঠাকুরের রসালাপ তৃপ্তির সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবেই একালের পণ্ডিত মহাশয়ের সরস রচনা উপভোগ করিতে পারিবেন, নচেৎ নহে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গ্রন্থ হইতে এই উভয় জাতীয় রচনার কতক নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

পণ্ডিত মহাশয়ের গ্রন্থের বিভাগ স্তবকে, উপবিভাগ কুসুমে। বিষয়-সূচি কিরূপ বিশদভাবে বর্ণিত তাহা বুঝাইবার জন্য "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় কুসুম উদ্ধৃত করিতেছি।

"সহসা কোন কার্য্য কর্ত্তব্য নহে; করিলে ভদ্র হয় না, ইহার উদাহরণের পরিশেষ। আপন অপেক্ষা বড় ব্যক্তির সঙ্গে বিপক্ষতা কর্ত্তব্য নহে; ইহার উদাহরণ। তপস্বী

এক ব্যক্তি ও নারদ মুনির কথা। যাহা না পারা যায়, তদ্বিষয়ক চেষ্টা অকর্ত্তব্য; ইহার কথা। যে শাস্ত্র যে ব্যক্তি কিছু মাত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য; ইহার উদাহরণ। অসদ্বংশজাত ব্যক্তি যদি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন হয়, তবে তাহার কুবুদ্ধিই হয়, সুবুদ্ধি কদাচ হয় না; ইহার কথা।"—প্রবোধ-চন্দ্রিকা

এইক্ষণ নিম্নলিখিত রচনা বাঙ্গালা না সংস্কৃত ভাষায় তাহা পাঠকগণ সুস্থির করুন—

অতএব অস্মদাদির ভাষা চতুর্ব্যূহরূপে প্রবর্ত্তমান ভাষাত্ব-হেতুক পূর্ব্বোক্তক্রম হট্টস্থপুরুষভাষার ন্যায় ইত্যনুমানে সকল মানুষ ভাষার চতুর্ব্যূহরূপত্ব নিশ্চয় হয়। তবে যে অস্মদাদির ভাষার যুগপৎবৈখরীরূপতামাত্রপ্রতীতি সে উচ্চারণ ক্রিয়ার অতিশীঘ্রতাপ্রযুক্ত উপর্য্যধোভাবাবস্থিত-কোমলতর-বহুল-কমলদল-সূচীবেধন-ক্রিয়ার মত।"—প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

অন্যত্র—

"তাদৃশ রাজধর্ম্ম বিপরীতকারী শিশ্নোদরমাত্রপরায়ণ স্বভাণ্ডার-পরিপূরণার্থে ইচ্ছাচার-করগ্রাহী প্রমত্ত যে কিংরাজা, সে কৃতসুরাপানবৃশ্চিকদষ্ট-ভূতাবিষ্ট-বানর ন্যায় ব্যাকুল হয়।" —প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

পণ্ডিত মহাশয়ের উদারবাক্যের উদাহরণ—

"নীলোৎপলক্রীড়াসরোরুহ হেমাঙ্গদ পীনপয়োধরসুধাংশু-মুখী মদঘূর্ণিতলোচনা মদনমদালসবিলাসিনী স্তনভরনমিতাঙ্গী গুরুনিতম্বভারমন্থরা মলয়নন্দন-গন্ধবাহকোকিলকলকূজিত-বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃত দিঙ্মুখ।"—প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

পণ্ডিত মহাশয়ের গল্পলিখিত জনৈক পরমহংস ঠাকুর এক মূর্খ ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডুক উড়ম্বর মশক।"

আর একটি মাত্র এরূপ রচনার দৃষ্টান্ত দিয়াই পাঠককে নিষ্কৃতি দিব।

"তাঁহার পুত্র বীরকেশরি নামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বনভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণী-স্তন-সুন্দর ইন্দীবরকৈরবকোরক-সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্ল-রাজীববন্নির্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবসাবসান সময়ে বট-জটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজ ভৃত্যজন -সমাজা-গমন-প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন।"—প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ক্ষেত্র-বিশেষে রসাল গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগেও কিরূপ নিপুণ তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি।—

"অলক্ষণে ছেঁচড়া বেটা কমনে গেল? আমার যে এক শত ভার সদ্যঃস্নিগ্ধ নিরস্থি উপাদেয় আমমাংসপিণ্ড কর্জ্জ ধারে, তার কি তা মনে নাই? ঋণ কেমন বালাই, তা বুঝি জানে না।......দুঃশীল ব্যলীক বেটাকে প্রায় একমাস হইল, আমি প্রত্যহ খুঁজিতেছি, দেখাই পাওয়া যায় না। আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয় বসিয়া আছি, তাহার খোঁজ খবরই নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া, আমার দত্ত মাংস ভোজনে মাগুকে চিকনা করিয়া, পিণ্ডিশূর গেহেনর্দ্দী বেটা বসিয়া আছে। আন্ মাগী, আজি বেটার মাংস লইব, তবে উঠিব।"—প্রবোধ, চন্দ্রিকা।

"একদিন শৃগালের কথা হঠাৎ বাঘিনীর মনে পড়িলে, স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো অমুকের বাপ! শুনোত তোমার এ কি? তুমি নাকি একটা শিয়ালের ঠাঁই এক শত ভার মাংস কর্জ্জ লইয়াছ! তুমি শূর স্বয়ং-ঘাতিত-পশুমাংস ব্যতিরেকে অন্যমাংস খাও না, ওমা! এ কি ছোট লোকের স্থানে কর্জ্জ কর? সে শালার বেটা ...... গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, কতো বা গালাগালি দেয়, নানা প্রকার অপমান ও ভৎসনা করে, মুক্ করে, চক্ষু ঘুরায়, দন্ত করমড়ি করে, আরতো কত কুবাক্য কয়, তাহা কি কহিব? আমি মেয়ে মানুষ, সে নির্বংশিয়া অন্যায়ের বিকট মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ অমনি উড়িয়া যায়, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। এ পোড়াকপালির মরণ হয় না; এত সহিতে হইবে, মনে হয় গলায় দড়ি দিয়া মরি। ছালিয়াগুলি অক্রবান দুগ্ধপোষ্য, কেবল এই বাছারদের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকি।"—প্রবোধ-চন্দ্রিকা।

শ্রীভূপাল কুমার দত্ত

পুরাতন গান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

মিশ্র—ঠুংরি।

উমা কত মহিমা মা তোমার!
তব মায়া বুঝা ভার!

অনন্ত তোমার নাম অনন্ত রূপিণী,
স্থানে স্থানে বর্ণে বর্ণে বর্ণবিহারিণী।
সত্ত্ব রজ তম তারা ত্রিগুণ ধারিণী।
ধর্ম্মদা, কামদা, মোক্ষফল প্রদায়িণী।
কারে দিয়ে ইন্দ্রত্ব কত বাড়াও মাহাত্ম্য,
কারে অধোগামী ক'রে কর ত্রিতাপে তাপিত।
তব মায়াশ্রিত আছে ত্রিজগত,
হলেম ভ্রান্তিযুক্ত মা, বর্ণিতে তোমার গুণ
সাধ্য আছে কার।

কাশী তীর্থে অন্নপূর্ণা তুমি গো অন্নদা,
গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী, কামাখ্যায় কামদা,
দক্ষিণে কালিকা তুমি উৎকলে বিমলা,
অমঙ্গলনাশিনী দুর্গা সর্ব্বমঙ্গলা,
ওমা ধর্ম্মাধর্ম্ম, জন্ম, কর্ম্ম, সুখ, দুখ, পাপ পুণ্য
মান্য, গণ্য, ধন্য, মন্যু তোমারি কৃপায়,
বিনা পদাশ্রয়ে ভবভয়ে পরিত্রাণ নাই,
কুমতি, সুমতি, সকল তুমি পার্ব্বতী,
ওমা তবে কেন পাপ পুণ্যের
এত হয় বিচার।

জীবের জীবাত্মা, পরমাত্মা রূপিণী,
জন্ম মৃত্যুকালদ্বয়ে নির্ব্বাণ দায়িনী।
ভোগবতী, অলকানন্দা তুমি মন্দাকিনী,
ত্রিলোক তরিতে হলে গঙ্গা তরঙ্গিণী।
তব পাদপদ্ম দেবের দেবারাধ্য,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র না পায় করে' আরাধনা।
জ্ঞানাজ্ঞান বর্য্য দেবদুরাসদ,
হলেন উন্মত্ত শিব শ্মশান বাসী অনিবার।

(৮)

মূলতান—একতালা।

(তারা) কোন অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার গারদে থাকি বল?
প্রাতঃকালে উঠি কতই খাট্‌নি খাটি,
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল,
হয়ে অর্থ অভিলাষী ভ্রমি দিবানিশি,
সর্ব্বনাশী জানিস্ কতই ছল।
এনে ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে,
দিবানিশি জ্বলে দুখানল,
আমার বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,
ফণী ধরে খাই হলাহল।

(৯)

ঝিংঝিট—একতালা।

ব্রহ্মময়ী মহামায়া-(মা),
ব্রহ্মাণ্ড উদরী তুমি বিশ্বেশ্বরী,
শঙ্করী কিঙ্করে কর গো দয়া।
সংসার সাগর অকূল পাথার,
মীনরূপে আমি ভ্রমি নিরন্তর,
রবি-সুত তাহে হইয়ে ধীবর
জঞ্জাল জালে ঘিরে রেখেছে কায়া।
বাসা করে' থাকা দিনেক দুইদিন চারি,
মিছে আশার আশে ভেবে চিন্তে মরি,
ভূতেরি বেগাড়ী, বেগাড় খেটে মরি,
আমায় চরণ তরী দাও মা অভয়া।

(১০)

বিভাস—ঝাঁপতাল।

উঠ মা হর-বনিতে কেন প'ড়ে অবনীতে,

নবনী-তুল-কোমল অঙ্গ লুণ্ঠিত ধূলায়।
উঠ মা কৈলাসের তারা, কৈলাসনাথের নয়ন-তারা,
পলকে প্রলয়হরা-অস্তগত তারারি প্রায়।
মোরা কি নিয়ে কৈলাসে যাব,
কৈলাসনাথকে কি বলিব,
কারে মোরা মা বলিব ?
জগতের মা চলে যায় !

সংগ্রহ-কারক
শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

ভালমন্দের জন্মকথা

আঙ্গুলে গণিয়া ঠিক কত বছর হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু সে অনেক কালের কথা, মানুষের বিশ্বাসে একটা দ্বৈত ঢুকিয়াছে, যার জন্মকথা আলোচনা দার্শনিকের একটা দুষ্কর কর্ত্তব্য। মানুষ-অমানুষ, সভ্য-অসভ্য, হিন্দু-অহিন্দু, কিংবা ভাল-মন্দ, 'সু' ও 'কু'—প্রভৃতি যে বিভেদ আমরা করি, জন্মমাত্রই শিশুর মনে যে তাহা থাকে না, যে কোন পিতাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। শিশু বড় হইতে থাকে, আর পরিবার কিংবা সমাজের কাছে সে শিখে যে, সে বড় কিংবা ছোট, সে হিন্দু কিংবা অহিন্দু, সে বাঙ্গালী কিংবা সাহেব, এবং এই সঙ্গে সঙ্গেই সে আরও শিখে যে, একজন ভাল আর একজন মন্দ, কোনও এক কর্ম্ম সৎ আর কোনও কর্ম্ম অসৎ। শিশুর অনেক শিক্ষা হয় সমাজের কাছে। কিন্তু তথাপি সমস্ত ভেদজ্ঞানই শিশু সমাজের কাছে—পিতা কিংবা শিক্ষকের কাছে পায়, এ কথা বলা কঠিন। রাম যে শ্যাম নয়, গাছ যে লতা নয়, সূর্য্যের কিরণ যে চাঁদের আলো নয়, দেওয়া আর নেওয়া, কিংবা প্রহার করা আর কোলে নেওয়া যে এক কাজ নয়, ইহা বোধ হয় কেহ শিশুকে বলিয়া শিখায় না; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি শিশু এ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ভাষার অল্পতার জন্য একই শব্দ দ্বারা একাধিক বিপরীত বস্তুকে সে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারে; দিবার বেলায় এবং নিবার বেলায়—উভয়ত্রই সে 'নে' এই পদ প্রয়োগ করিতে পারে; তিগ্ম-রশ্মি এবং হিম-রশ্মি—উভয়কেই সে 'রোদ' বলিতে পারে; কিন্তু তথাপি সে সমাজের কাছে যাহা শিখে তাহা ভাষা, ভেদজ্ঞান নয়। এরূপ ভেদ-জ্ঞান পশু-শিশুরও রহিয়াছে; পশু-শিশুও তার মাকে চিনে, সেও তার সুহৃদ্ হইতে দুর্হৃদ্‌কে পৃথক্ করিতে পারে; আমাদের স্কুলে পড়িয়া তার এ জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু আর্য্য-অনার্য্য সভ্য-অসভ্য, ভাল-মন্দ প্রভৃতি যে আর এক শ্রেণীর ভেদজ্ঞান আছে, তাহা শিশু অত সহজেই লাভ করে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান লেখক বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ; আর্য্যশোণিতে তার দাবী যে একেবারে নামঞ্জুর হইতে পারে না, মনে হয় রজনী গুপ্তের ইতিহাস পড়িয়াই সে প্রথম তাহা শিখিয়াছে। ব্রাহ্মণেতর জাতি হইতে যে সে পৃথক্, ব্রাহ্মণশিশুকে তাহা বলিয়া শিখাইতে হয়; আর, কেহ হাসিবেন না, আমরা ভারতবাসীরা যে অসভ্য না হইলেও অর্দ্ধ-সভ্য, এ কথা ইউরোপের কেহ কেহ না বলিয়া দিলে আমরা জানিতাম কিনা সন্দেহ। সুতরাং জাতিবর্ণের বিচারে কিংবা ভালমন্দের বিচারে যে সমস্ত সূক্ষ্ম প্রভেদ আমরা করিয়া থাকি, শিশুর তাহা স্বয়ংলব্ধ জ্ঞান কি না, এ সন্দেহ করা চলে।

কেহ হয় ত বলিবেন, ভাষার অভাব হইতে শিশু যেমন চাঁদের কিরণকেও 'রোদ' বলে, তেমনই ঐ জাতীয় ভাষার একান্ত অভাব হইতেই ঐ সব সূক্ষ্ম ভেদ সে প্রকাশ করিতে পারে না; অন্যান্য ভেদের ন্যায়, এগুলিও শিশু অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই লাভ করিয়া থাকে। কেহ হয় ত ইহার চেয়েও বেশী অগ্রসর হইবেন এবং বলিবেন যে, শিশুর মনে অন্য প্রভেদ না হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ অন্ততঃ, আপনা হইতেই, সামাজিক জীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই উৎপন্ন হয়; ভাষার এবং অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বাড়ে মাত্র।

শিশুর কোনও এক জ্ঞান আছে কি না, শিশুই সে বিষয়ে একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু শিশুর ভাষা বুঝা কঠিন; তার অঙ্গভঙ্গি, তার অব্যক্ত ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা সে কতটুকু মনের

গভীরতা প্রকাশ করে, তাই নিয়াই মতভেদ। একে যেখানে শিশুর ভাষায়, তার আমোদে, তার ক্রীড়ায় দেবতার ঐশ্বর্য্য দেখেন, অন্যে সেইখানে তার কলহে, তার ভোগেচ্ছায়, তার অসহিষ্ণুতায়, মানুষের পূর্ব্বপুরুষ যে পশু ছিল তাহারই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শিশু যখন আমাদের নিকট আমাদের ভাষায় তার ভিতরের সকল কথা প্রকাশ করিতে পারে না, তখন তার মনের ধনদৌলতের পরিমাণ কত সে হিসাবে পরীক্ষকদের মতভেদ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং শিশু কতটুকু সমাজের নিকট শিখে আর কতটুকু নিজে নিজেই শিখিতে পারে, আর, যাহা সে সমাজের নিকট শিক্ষা করে না তাহা তার মনের মধ্যে আদি হইতেই রোপিত থাকে, না অভিজ্ঞতার সঙ্গে ২ সে তা লাভ করিয়া থাকে, ইত্যাদি প্রশ্নের যে এখনও এক উত্তর হয় নাই, তাহাতে নিরাশ হইবার কোন হেতু নাই। সত্য এক বই দুই নয়; এক এক জনের পরীক্ষার অবকাশ ও উপকরণ এক এক মত, তাই মতভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু দার্শনিক আশা করেন, বার বার বিভিন্ন রকমে পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহা হইতে একটা সাধারণ সত্য বাহির হইবে। তথাপি একটা কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; বড়-ছোট প্রভৃতি যে ভেদ আমরা করি, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতক অংশে অন্ততঃ শিশু সমাজের নিকট শিখিয়া থাকে। 'ছোট দারোগা' ও 'বড় দারোগার' মধ্যে যে কি তফাৎ, কিংবা 'ছোট সাহেব' যে 'বড় সাহেব' হইতে পৃথক্, শুধু চেহারা দেখিয়া শিশু কখনও তাহা জানিতে পারে না; এমন কি,তাহার গবেষণা শক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌছিলেও সে তাহা জানিতে পারিবে কিনা, সন্দেহ; আর, শুধু শিশুই বা কেন, শিশুর চেয়ে বয়সে বড় এমন অনেককেও ইহা লোকের মুখে শুনিয়া শিখিতে হয়। সুতরাং অন্ততঃ কতকগুলি ভেদের জ্ঞান শিশু লোক-ব্যবহার হইতে শিক্ষা করিয়া থাকে। কেহ ২ মনে করিয়াছেন, চারিত্রনীতির ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি ভেদও এই সমস্ত ভেদের অন্তর্গত। আদি হইতেই শিশুর মনে এ জ্ঞান থাকে না, কিংবা ক্রমে ক্রমেও শিশু নিজে,—অন্যের সাহায্য ছাড়া ইহা কখনও শিখিতে পারে না; কোনও একটা কাজ যে আর একটা কাজ হইতে হীন সুতরাং নিন্দনীয়, এবং সেই অনুসারে অন্য একটা কাজ যে ভাল, পিতা কিংবা শিক্ষক কিংবা সাধারণভাবে সমাজ শিশুকে তাহা না বলিয়া দিলে শিশুর তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। অবশ্যই ইহা এক পক্ষের মত; মতান্তর ও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রুসো বিশ্বাস করিতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন,প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের সবই ভাল; কারণ,তখন সবই তার অকৃত্রিম,—স্বভাবের প্রেরণামাত্র। সুতরাং সে অবস্থায় মানুষ যাহা কিছু করে তাহা সমস্তই সৎ; এবং অধর্ম্মকে দমন করিয়া ধর্ম্মের অনুসরণ করার যে ক্লেশ তাহা তখন মানুষকে অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু সমাজ-বন্ধন যতই দৃঢ় হয় এবং যতই মানুষ সমাজের সংস্রবে আসিতে থাকে, সমাজের কৃত্রিমতা ততই তার মধ্যে আবিলতা ঢুকাইয়া দেয়। মানুষ জন্মে অকপট, অনাবিল, মুক্ত, সুতরাং সব রকমেই ভাল; কিন্তু সমাজের বন্ধনই তাহাকে খর্ব্ব করিয়া দেয়;—মানুষের ভিতর যত কিছু মন্দ, সমাজই তার জন্য দায়ী। সমাজের সহিত সংসৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে মানুষ মন্দ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাল-র অনুসরণ করে না বটে, কিন্তু তার কারণ মন্দকে সে তখন চিনে না; প্রবৃত্তির প্রেরণায় সে সৎকার্য্যের দিকেই অগ্রসর হয়,—অসৎকে চিনিবার তার কোন আবশ্যক করে না। মন্দের সহিত পরিচয় থাকে না বলিয়াই ভাল-মন্দের প্রভেদও তার মনে উদিত হয় না। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক অবস্থায় ভাল-মন্দ বলিয়া কিছু নাই; ইহা সমাজের কৃত্রিম ভেদ। রুসোর এই মত সত্ত্বেও তিনি তাঁর 'এমিলি' নামক গ্রন্থে প্রকারান্তরে স্বীকার পাইয়াছেন যে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন মানবশিশুর মনেও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর উদয় হইতে পারে; এবং সমাজ যে সমস্ত কাজকে অন্যায় মনে করে, সমাজের কাছে না শিখিয়াও শিশু তাহা করিতে পারে। এবং সেই অনুসারে, কি উপায়ে এই সমস্ত প্রবৃত্তিকে দান্ত রাখিতে হইবে, সে উপদেশও তিনি দিয়াছেন। সুতরাং ক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ কুকর্ম্ম করে,

সমাজের সহিত সম্পর্কই যে সেই সমস্ত প্রবৃত্তির হেতু, এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। তার চেয়ে বরং ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্‌ যে বলিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ শিয়াল কুকুরের মত কাটাকাটি মারামারি করিত এবং সমাজই তাহাকে ভদ্র করিয়া তুলিয়াছে,—ইহাই বোধ হয় সত্যের অধিক নিকটে। সমাজের সহিত সম্পর্ক মানুষের মনে কুপ্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া দেয় না; কুপ্রবৃত্তি যে মন্দ এবং তা হইতে যে অকুশল হয়, এবং এই জন্যই, মঙ্গলদায়ক সুপ্রবৃত্তি হইতে যে তাহা পৃথক্‌, সমাজ শুধু তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। যাহা মন্দ মানুষের মধ্যে তাহা আপনা হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; সমাজের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া মানুষ তাহাকে মন্দ বলিয়া চিনিতে পারে মাত্র এবং ভাল হইতে তাহাকে পৃথক্‌ করিতে পারে মাত্র। ভাল-মন্দের ভেদ সমাজ শিখাইয়া দেয়, মন্দের জনক সমাজ নয়।

চারিত্র-নীতির ভাল-মন্দ সুতরাং সমাজ না থাকিলে মানুষ শিখিত কিনা সন্দেহ। এবং শিশুর বেলায় ইহা নির্ব্বিবাদে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, সে মন্দ কাজ করিতে পারে কিন্তু সমাজের সাহায্য ছাড়া তাহাকে মন্দ বলিয়া চিনিতে পারে না। শিশুর বিচার-শক্তির পূর্ণ উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতা কিংবা শিক্ষক কিংবা অন্য কেহ শাসনদণ্ডের ভীতির সহিত তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে 'এ কাজ ভাল' আর 'ও কাজ মন্দ'। এবং সমাজ হইতে লাভ করা হয় বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের কিংবা বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুর ভাল-মন্দের ধারণাও পৃথক্‌। একই সময়ে একই লগ্নে জন্মিলেও শ্রেণী-ভেদ-হেতু রাজপুত্র ও কোটালের পুত্রের লাভলোকসানের ন্যায় ভাল-মন্দের ধারণাও পৃথক্‌ হইয়া থাকে। দেশ এবং কালের নিমিত্ত সমাজে সমাজে কিংবা শ্রেণীতে শ্রেণীতে প্রভেদ যত বেশী হইবে, লোকের ভাল-মন্দের ধারণার মধ্যেও ততই বেশী পার্থক্যের উপলব্ধি হইবে। সুতরাং সমাজই যে একমাত্র না হইলেও প্রধানতঃ শিশুর নীতি-শিক্ষক তাহা অপ্রতিপন্ন রহিল না।

কিন্তু তথাপি আমাদের প্রশ্নের উত্তর হইল না। না হয় মতান্তর উপেক্ষা করিয়া, প্রতিপক্ষের মতে অসমীচীন এমন যুক্তিতে নির্ভর করিয়া, ধরিয়া নিলাম যে, শিশুর মনে প্রথম নীতিজ্ঞান সমাজের সম্পর্কেই উৎপন্ন হয়; তথাপি ভাল-মন্দের জন্ম-বৃত্তান্ত এই খানেই শেষ হইতে পারে না। শিশু না হয় সমাজের কাছেই শিখিল যে, কোনও একটা কাজ ভাল আর কোনও একটা কাজ মন্দ,—দান করা ভাল এবং চুরি করা মন্দ; কিন্তু সমাজ নিজে উহা পাইল কোথায়? আমরা জন্মাবধি দেখিতেছি সমাজে ভাল-মন্দের একটা ধারণা রহিয়াছে; সমাজ আমাদিগকে উহা শিখাইয়া দেয়; কিন্তু সমাজ নিজে উহা শিখিল কোথায়?

শিশুর বেলায় যেমন, সমাজের বেলায়ও তেমনই এ প্রশ্নের অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। শিশুর বেলায় যেমন অনেকে মনে করিয়াছেন যে শিশুর উহা সহজ জ্ঞান—আপনা হইতে মনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার উৎপত্তি, সমাজের বেলায়ও তেমনই অনেকে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন; এখনকার শিশুর মনে যেমন উহা আপনা হইতেই একটা বিশ্ব-নিয়ামক অন্তঃশক্তির প্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়া উঠে, আদিম শিশুর বেলায়—সমাজের বেলায় ঠিক তেমনই উহা আপনা আপনি প্রকাশ লাভ করিয়াছিল; প্রথম মানুষ যেমন কোন স্কুলে পড়িয়া দ্রব্য ও তাহার গুণের জ্ঞান লাভ করে নাই, প্রকৃতির পাঠাগারই তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থান এবং নিজের অভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র শিক্ষক ছিল, তেমনই নীতিজ্ঞান, ভাল-মন্দের জ্ঞানও সে ঐ একই উপায়ে লাভ করিয়াছে। একটা বিশাল শক্তি সর্ব্বদাই মানুষের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে,—মানুষ স্বয়ম্ভূ নয়, সে সৃষ্ট জীব; এবং স্রষ্টা তাহাকে সৃষ্টি করিবার সময়ই নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন; বাহিরের কোনও শক্তির নিকট কিংবা অচেতন প্রকৃতির নিয়ম হইতে সে উহা শিখে নাই। মানুষের মনুষ্যত্বই ঐখানে, সে যে মানুষেতর জন্তু হইতে পৃথক্‌ তাহাও ঐ জ্ঞানের নিমিত্তই; এই জ্ঞান নাই এমন মানুষ কল্পনা করা যায় না।

আবার, শিশুর বেলায় যেমন সমাজের বেলায়ও তেমনই

অনেকে বলেন যে সমাজ ঠেকিয়া, দায়ে পড়িয়া ভাল-মন্দের ভেদ করিতে শিখিয়াছে। পশুদের এই জ্ঞান নাই; অথচ, হাড়ে২ মিলাইয়া, পেশীতে২ তুলনা করিয়া, স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ইতর জন্তুর সহিত মানুষের পূর্ব্ব পুরুষের সহিত পর পুরুষের যেরূপ সম্বন্ধ সেইরূপ একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং পশুর যাহা নাই অথচ মানুষের যাহা রহিয়াছে, নিশ্চয়ই জীবনের অভিব্যক্তির কোনও একটা বিশিষ্ট স্তরে তাহার আবির্ভাব হইয়াছে। মানুষের এই জ্ঞান বিশেষের আবির্ভাবের কারণ, পশ্বাদির চেয়ে মানুষের কাজ করিবার ক্ষমতা এবং কাজ করিবার প্রবৃত্তি উভয়ই অনেক বেশী; সে আবশ্যক-অনাবশ্যক অনেক কাজ করিতে পারে; এবং কোন ২ কাজ হইতে তাহার কুশল এবং কোন ২ কাজ হইতে তাহার অকুশল উৎপন্ন হয়। ইতর-জন্তুর সে অসুবিধা নাই; তার যে কাজ আবশ্যক, যে কাজ হইতে তার ভাল হইবে, প্রকৃতির প্রেরণায় সে শুধু সেই কাজের দিকেই অগ্রসর হয়। অনাবশ্যক, অকুশলের হেতু, কাজ করিবারও ইচ্ছা যার হয়, সে ঐ কাজের ফল ভোগ করিয়া তবে শিখিবে যে উহা মন্দ। মানুষ তাই ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে কতকগুলি কাজ করিবার প্রবৃত্তি তার আছে যাহা দ্বারা অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হয় না। আগুনের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য শিশুকে আকর্ষণ করে; শিশু ধরিতে যাইয়াই শিখে যে আগুন ছুঁইলে সুখ হয় না। আদিম মানবও সমস্ত ভাল-মন্দই এইরূপে ঠেকিয়া শিখিয়াছে, কারণ তাহাকে বলিয়া দিবার কেহ ছিল না। জীবমাত্রেই একটা সুখদুঃখের অনুভূতি নিয়া সংসারে আসে;— মানুষও তাহার অধিকারী। কিন্তু কোন্ কাজ হইতে সুখ অর্থাৎ মঙ্গল হইবে, কাজটী না করিয়া মানুষ তাহা জানিতে পারে না। কাজ করিতেকরিতেই মানুষ কাজের ভালমন্দ পৃথক্ করিতে শিখিয়াছে। এবং একজন যাহা ঠেকিয়া শিখে, আর এক জন তাহাই দেখিয়া শিখে; প্রথম মানুষ কুফল ভোগ করিয়া যে সমস্ত কাজকে মন্দ বলিয়া জানিয়াছে, পরবর্ত্তীরা তাহার নিকট শুনিয়াই সে গুলিকে মন্দ বলিয়া শিখিয়াছে; অভিজ্ঞ প্রাচীনদের উপদেশ চিরকালই অর্ব্বাচীনকে শিক্ষা দিয়া থাকে। এইরূপে সমাজ যে ভাল মন্দের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছে, পরবর্ত্তীদের পক্ষে তাহাই নিয়ামক-বিধি—তাহাই নীতি। এই হইল চারিত্র নীতির জন্মকথা।

অসভ্যদের মধ্যে যে নীতিজ্ঞান কম, তাহা এই মতের পক্ষে একটী প্রবল যুক্তি, কারণ, 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।' কোথায় পড়িয়াছি ঠিক মনে নাই, বোধ হয় মাঙ্গো পার্কই দেখিয়াছিলেন যে আফ্রিকার এক কৃষক তাহার ক্রীত এক খণ্ড ভূমি চাষ করিতে করিতে মাটীর নীচে কিছু টাকা পায়; সে ভূমি ক্রয় করিয়াছে, ভূমির গর্ভে যে টাকা ছিল তাহা ক্রয় করে নাই, এই মনে করিয়া উহা পূর্ব্বতন ভূস্বামীকে ফিরাইয়া দিতে গেলে, সে ও উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়; কারণ, সে বলে, ভূমির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির উপরে কিংবা নীচে যাহা কিছু ছিল তাহার সমস্ত স্বত্বই সে বিক্রয় করিয়াছে। বে-ওয়ারিশ সম্পত্তির অধিকারী রাজা, সুতরাং উভয়ে মিলিয়া অতঃপর রাজার কাছে গেল; কিন্তু রাজাও উহাতে নিজের কোন স্বত্ব দেখিতে পাইলেন না। তবে তিনি একটা সুমীমাংসা করিয়া দিলেন;—ইহাদের একজনের ছেলের সঙ্গে আর এক জনের মেয়ের বিবাহ হইবে, এবং ঐ বিবাহে এই সম্পত্তি যৌতুক দিতে হইবে। মাঙ্গো পার্ক বোধ হয় দুঃখ করিয়াছিলেন, ঐ সম্পত্তি তাঁহার নিকট কেন নিয়া গেল না। আমাদের কাহারও নিকট আসিলেও আমরা নিতে নারাজ হইতাম কি না, জানি না। যাহা হউক এইরূপ ঘটনা হইতে অনেকে মনে করিয়াছেন পৃথিবীর সত্যযুগ চলিয়া গিয়াছে, এবং যতটুকু বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা শুধু যাহাদিগকে আমরা অসভ্য বলিয়া তুচ্ছ করি তাহাদেরই মধ্যে। পূর্ব্বতন ভ্রমণকারীরা হিন্দুদিগকে যেরূপ সত্যপ্রিয় দেখিয়া গিয়াছিলেন, মেকলে সেরূপ দেখেন নাই; ইহা হইতেও অনেকে মনে করেন সত্যযুগ অতীত হইয়া গিয়াছে,—এবং ক্রমেই মানুষ অধার্ম্মিক হইয়া উঠিতেছে। সভ্যতার বৃদ্ধি, মানুষের তথাকথিত উন্নতি হইতে মানুষের বাস্তবিক ধর্ম্ম জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে না; বরং পূর্ব্ব-পুরুষদের যাহা ছিল, অসভ্যদের যাহা আছে, সভ্য, উন্নত আমরা তাহাও হারাইতেছি।

কিন্তু অনেকের মত আবার ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা বলেন সত্যযুগ অতীতে নয়, ভবিষ্যতে। মানুষের পরিপূর্ণ নীতি-জ্ঞান পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে। পূর্ব্বের চেয়ে আমরা এখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি এবং ক্রমেই ভালর দিকে চলিতেছি। অসভ্যদের তথাকথিত ধর্ম্ম-জ্ঞানের প্রকর্ষের কথা যে শুনিতে পাই, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম-জ্ঞান নয়। বানর যে মুক্তার হার চুরি করে না, তার কারণ, সে উহার মূল্য জানে না এবং উহার প্রতি তাহার কোন স্পৃহা নাই। তাই বলিয়া কোচবিহারের মহারাণীর গয়না যে চুরি করিয়াছিল তার চেয়ে বানরের ধর্ম্ম-বুদ্ধি বেশী এরূপ মনে করা যায় না। মূল্য জানে না বলিয়াই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, দ্রব্য বিশেষের প্রতি অসভ্যদের কোন স্পৃহা হয় না বলিয়াই তাহারা উহার জন্য অসত্যের কিংবা অধর্ম্মের আশ্রয় নেয় না; তাদের ধর্ম্মজ্ঞানের উৎকর্ষ তাদের সাধুত্বের কারণ নয়। পরন্তু, দ্রব্যান্তরে তাহাদের অসংযত লোভ, তাহাদের জিঘাংসা, তাহাদের নির্দ্দয়তা,—এক কথায় তাহাদের অসভ্যতা এই সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ মাত্রেই যেমন পশু হইতে শ্রেষ্ঠ, তেমনই সভ্য মানুষ মাত্রেই অসভ্য হইতে শ্রেষ্ঠ।

শিশুদের যেমন, অসভ্যদেরও তেমনই, জ্ঞান ও অনুভূতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলে। অনুসন্ধানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যদি ইহার বিপরীত হয় তাহা হইলে,নীতিজ্ঞানের ক্রম বিকাশ হয়,--বিবর্ত্তন বাদীদের এই মতে একটা গুরুতর আঘাত লাগিবে, সন্দেহ নাই। তথাপি উপেক্ষা না করিয়া ধীরভাবে এই মতটী বিবেচনা করা উচিত যে, সমাজ দায়ে ঠেকিয়া আপনার চারিত্র-নীতি গড়িয়া লইয়াছে, এবং ক্রমেই এই নীতি জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে। ধর্ম্ম না হইলে সমাজ ধৃত হয় না, লোকস্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাই ধর্ম্মের আবির্ভাব। এবং সমাজের অবস্থা যতই পরিবর্ত্তিত হয়, ততই যুগে যুগে নূতন করিয়া এই ধর্ম্মের সংস্থাপন করিতে হয়। এই জন্যই এক যুগের ধর্ম্ম আর এক যুগের ধর্ম্ম নয়। ইতিহাসে এক সমাজের কিংবা এক সময়ের ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত অন্য সময়ের কিংবা অন্য সমাজের ধর্ম্মবুদ্ধির যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহাও এই মত অনুসারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

একটা ধর্ম্মবুদ্ধি যে আমাদের আছে, একথা কেহ উড়াইয়া দিতে পারে না। কোথায় আমরা ইহাকে পাইয়াছি—এই প্রশ্নের উত্তরে যাঁহারা কোন অলৌকিক উপায়ের, বাক্য মনের অগোচর কোন শক্তির, উল্লেখ না করিয়া, মানুষের নিজের বুদ্ধিশক্তিকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন তাঁহাদের মতটা একান্তই অশ্রদ্ধেয় নয়। সকলেই দেখিতে পান, সমাজের উপদেশ যেখানে কিছু না বলিয়া দেয়, ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া সেই খানে নিজের ভালমন্দ বাহির করিয়া নিতে পারে; এবং সাধারণতঃ যার বুদ্ধি ও জ্ঞান যত বেশী তার এই শক্তি ও তত বেশী। সকলেই কিছু আর বিলাতের প্রধান মন্ত্রী হয় না, এবং জর্ম্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধও কিছু ইংলণ্ড প্রতিদিনই করে না; সুতরাং এই সম্বন্ধে সমাজের কোন নির্দ্দেশ নাই। তথাপি যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন, ইহা আমরা জানি। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, সমাজও তেমনই সেই সেই অবস্থায় পড়িয়াই শিখিয়াছে যে কোনও একটা কাজ তাহার পক্ষে ভাল এবং অন্য একটা কাজ মন্দ। শুধু তাই নয়, ভালমন্দ বলিয়া যে একটা প্রভেদ আছে তাহাও সমাজ তাহার কর্ম্মচেষ্টার ভিতর দিয়াই জানিয়াছে। যদি এমন হইত যে সিনাই পর্ব্বতে কিংবা পর্ব্বতান্তরে মোসেস্ কিংবা অন্য কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভগবান্ ধর্ম্মের কানুনগুলি লোকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে সমাজ শিশুহত্যা, সতীদাহ, নরবলি প্রভৃতিকে এক সময়ে অনুমোদন করিয়া অন্য সময়ে ঘৃণা করিত না। ঘৃণা করিতে সমাজ তখনই শিখিয়াছে, যখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে এগুলি হইতে তার অমঙ্গলই হইতেছে। একটা প্রেরণা ব্যক্তির ন্যায় সমাজকেও কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া দেয়; ঐ কার্য্যের ফলভোগ না করা পর্য্যন্ত সমাজ বুঝিতে পারে না যে উহা অসৎ প্রবৃত্তি। সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পরে, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করার পরেই বিল্বমঙ্গল বুঝিতে পারিয়াছিল, সে এতকাল অসৎকর্ম্ম করিয়া আসিতেছিল; বার্দ্ধক্যেই মানুষের ধর্ম্ম বুদ্ধির সম্যক্ উন্মেষ হয়; 'শৃঙ্গারশতকের'

পরেই বোধ হয় ভর্তৃহরি 'বৈরাগ্য শতক' লিখিয়াছিলেন। ইহুদীদের একান্ত ব্যভিচারের পরই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল; বিলাস ভোগে জর্জ্জরিত হইয়াই রোম খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; এবং ইউরোপের বর্ত্তমান মহসমরের আগে নয়, পরই বোধ হয় পাশ্চাত্য জাতিরা শিখিবে যে দুর্ব্বল জাতির প্রতি অত্যাচার করা অন্যায় এবং পরের স্বত্বকেও মানিতে হয়।

আমরা অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাস করি না, আমরা মানবেতর শক্তিতে শ্রদ্ধাহীন নহি; কিন্তু এই অলৌকিক শক্তি লোকেতেই, মানুষের ভিতর দিয়াও কাজ করিয়া থাকে। অচেতন প্রকৃতির কার্য্যে এবং চেতন মানুষের কার্য্যেই তাহার লীলা—এর ভিতর দিয়াই তার প্রকাশ। সুতরাং ধর্ম্মকে মানুষ নিজে নিজেই ক্রমশঃ জানিয়াছে, এবং ক্রমে আরও জানিতেছে, এই বলিলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন ভিত্তি রহিল না, এরূপ ভীতির কোন কারণ নাই।

শিশু নিজের চেষ্টায় ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, অথচ সমাজ তাহাই করিয়াছে, এ কথায় আপাততঃ একটা বিরোধ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্যক্তির পরস্পর সহায়তায়ই সমাজের সৃষ্টি এবং তাহাতেই সমাজের শিক্ষা। ব্যক্তির একার চেষ্টায় কখনও এই নীতি-শাস্ত্রের উদ্ভব হইত না। শিশু সমাজের নিকট শিখে;—তার অর্থ, অন্যের সহিত সংস্রবে আসিয়া শিখে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সম্পর্ক সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং সমাজের শিক্ষা সমাজের বাহিরের কোন শক্তির নিকট হয় না। তা ছাড়া, বর্ত্তমানে জন্মমাত্রই শিশু একটা গঠিত এবং ধর্ম্মাধর্ম্মে ন্যূনাধিক শিক্ষিত সমাজ পায়; স্বাধীন ভাবে চেষ্টা করিবার শক্তি পাইবার পূর্ব্বেই সমাজ শিশুকে এ ভেদজ্ঞানে দীক্ষিত করিয়া দেয়। কিন্তু সমাজকে এইরূপে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ভেদজ্ঞান কেহ দেয় নাই। সমাজ সুতরাং নিজের শক্তিতেই উহা লাভ করিয়াছে। ব্যক্তির যে এই শক্তি একেবারেই নাই তাহা আমরা বলি নাই; কিন্তু ব্যক্তি এই শক্তির সম্যক্ উন্মেষ হইবার পূর্ব্বেই সমাজের সাহায্য পাইয়া থাকে; সমাজ এইরূপ সাহায্য কোথাও কখনও পায় না। ব্যক্তি ও সমাজের শিক্ষায় এই একটী প্রধান প্রভেদ।

সমাজ কার্য্যের ফলভোগ করিয়াই তাহার ভালমন্দ ঠিক করে। মানুষের ধর্ম্ম সুতরাং তাহার মঙ্গলের জন্য। শুধু ক্ষণিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ নয়, তার চেয়ে বড়, সমস্ত জীবনের পক্ষে হিতকর, চিরকালের জন্য মঙ্গলময় যাহা, যে কার্য্য দ্বারা তাহা লাভ করা যায় মানুষ তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছে। এ কথা যদি আমরা বিশ্বাস করিতাম যে চারিত্র-নীতি যে সব কর্ম্মের উপদেশ দেয় তাহা হইতে অশিবেরই উৎপত্তি হয়, এবং যাহাকে আমরা অধর্ম্ম বলি তাহাই বাস্তবিক হিতকর,—তাহা হইলে, ধর্ম্মের অনুসরণ করা এবং তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা মানুষের পক্ষে কখনও সম্ভব হইত না। কিন্তু তথাপি, বাস্তবিকই কি ধর্ম্ম হইতে মানুষের সর্ব্বদাই মঙ্গল হয়? আমাদের বিশ্বাস, ইহজীবনে না হয় অন্যত্র হইবেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ, জন্মান্তর কিংবা জীবনান্তর, অনেক দূরে; ইহলোকে যে ধর্ম্ম মঙ্গল দ্বারা সব সময় পুরস্কৃত হয় না, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? আইনের নিষেধ রহিয়াছে, সত্য হইলেও, জীবিত ব্যক্তির কিংবা যাহার কুটুম্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে এরূপ ব্যক্তির কুৎসা রটনা করা বিপজ্জনক। আর ইতিহাস, 'অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ, ওগো মিথ্যাময়ি!' ইন্দুর কিরণে তাহার কলঙ্ক চাপা পড়িয়া যায়! যে বড় হইয়াছে, ধনে এবং প্রভুত্বে যাহার জীবন সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইতিহাস তাহার দোষ ভুলিয়া যাইতে জানে; যে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি সমসাময়িক সমাজেও তাহা দেখিতে পারেন। আর, যাহার প্রভুত্বলাভ ঘটে নাই, যাহার ঐশ্বর্য্যলাভ হয় নাই, হাজার ধার্ম্মিক হইলেও সমাজ তাহাকে চিনে না, ইতিহাস তাহার সমাধিতে অশ্রুপাত করে না, অনুসন্ধিৎসু তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে না। সুতরাং অপুরস্কৃত, অনাদৃত ধর্ম্মজীবনের দৃষ্টান্ত ইতিহাস হইতে দেখান সব সময় সহজ নয়। তথাপি, যীশু কি দোষ করিয়াছিলেন যে ক্রুসে, সূচীবেধযন্ত্রণায়, পাষণ্ডের

উপযুক্ত মৃত্যু তাঁহার শেষ গতি হইয়াছিল? অবশ্যই আজ সমস্ত পৃথিবী পূজা করিয়া হয় ত যীশুর ধর্ম্মকে কতক পুরস্কৃত করিয়াছে; কিন্তু যীশু যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা ত মিথ্যা হইয়া যায় নাই। আর, উন্মত্ত ব্যবহারজীবীর কিংবা ততোধিক উন্মত্ত ধনাঢ্যের প্ররোচনায় অর্থের বিনিময়ে যে ব্যক্তি আপনার ন্যায়নিষ্ঠাকে বিক্রয় করিতে চাহে নাই, সে ব্যক্তি কি দোষ করিয়াছিল যে, সে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন, উদরান্নের কাঙ্গাল হইয়া পথের ভিখারীর মত জীবন যাপন করিবে, আর যাহারা তাহার সর্ব্বনাশের পথ খুলিয়া দিতে চাহিয়াছিল তাহারা তাহাদেরই উপায়ে ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের অধিকারী হইয়া ধার্ম্মিক ও সমাজ-পূজ্যরূপে ইতিহাসে কথিত থাকিবে? অথচ এরূপ ঘটনার কি অভাব রহিয়াছে? আর, সমাজরূপ হর্ম্মের আশ্রয়-স্তম্ভ কারা? হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্ জানেন, অনেক স্থলেই, মিথ্যার উপর ধর্ম্ম ও যশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যারা! সমাজে পূজ্য কারা? অনেক স্থলেই, অনৃত ও ছলনার আশ্রয়ে সর্ব্ব প্রভুত্বের উপায় ধন অর্জ্জন করিয়াছে যারা।

সুতরাং দূর, অতিদূর ভবিষ্যৎ জীবনান্তরের আশায় যে বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহার জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, ধর্ম্ম হইতে জয়, ধর্ম্ম হইতে মঙ্গল, সব সময় হয় কই?

আর, প্রকৃতি—মানুষ এবং মানবেতর সমস্ত প্রাণী যে প্রকৃতির ক্রোড়ে রহিয়াছে, সে প্রকৃতি কিরূপ? করালী, লোলজিহ্বা, রক্তাক্তদশনা, শোণিত-রঞ্জিত-নখরা—এই ত প্রকৃতির চিত্র! বিবর্ত্তনবাদ প্রাণিজগতের এবং উদ্ভিজ্জ-গতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া কি জানিয়াছে? অনাদি কাল হইতে এক বিশাল সমর—উদ্ভিদে উদ্ভিদে, জীবে জীবে, এবং উদ্ভিদে জীবে এক অবিশ্রান্ত আহব, এই ত জগতের ইতিহাস; শুধু মানুষের ইতিহাস নয়, সমস্ত জগতের ইতিহাসই ত ঐ। আর আজ জগতে যে সকল মানবজাতি, যে সকল জন্তু, যে সকল লতা-গুল্ম-সমন্বিত, বনস্পতি-সুশোভিত অরণ্যানী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তারা কারা? অতীত সমর-নিচয়ে জয়লাভ করিয়াছে যারা। এবং মানবের চারিত্রনীতি যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া নিয়াছে, এ সব লড়াইয়ে তাহার ক্রিয়া কোথায়? পরার্থে যে প্রাজ্ঞ আপনার সমস্ত উৎসর্গ করিয়া দেয়, তাহার ত উন্নতি হয় না, সে ত দিগ্বিজয়ী হয় না, তাহার সন্ততির ত ঋদ্ধি-বৃদ্ধি হয় না; যে যুযুৎসু নয়, যে শত্রুকেও ভালবাসিতে চায়, যে অনিষ্ট-কারীরও ইষ্ট করিতে চায়, যুযুধান শত্রুকুল সহজেই তাহাকে অভিভূত করিয়া নির্ম্মূল করিয়া দেয়! মানুষ যদি হিংসা না করিত, যদি সে লড়াই করিতে নারাজ হইত, পশুহত্যা ও উদ্ভিদ্-হত্যা যদি সে কখনও না করিত, তাহা হইলে সৃষ্ট-জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের আজ পৃথিবীতে স্থান হইত না! আত্মরক্ষা ও পর-হিংসার জন্য জীবমাত্রকেই স্রষ্টা নখ-দন্তাদি যে প্রহরণ দিয়াছেন, এবং মানুষের বেলায় সে নিজের বুদ্ধিতে যে সব আয়ুধের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিলে, নির্ম্মমভাবে শত্রুকে পরাভূত করিলে, তবে ত নিজের বৃদ্ধি, তবে ত নিজের ঋদ্ধি, এবং তবেই ত নিজের কুশল! দয়া, অহিংসা, শোণিত-পাতে ভীতি, যাহার গুণ সে ত জীবন-সমরে পরাভূত, উপেক্ষিত ও ঘৃণিত; তাহার জন্য ত এ পৃথিবী নয়!

সুতরাং দয়া, দাক্ষিণ্য, অহিংসা, পরপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণকে মানবের চারিত্রনীতি ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, সে সমস্ত যে সব সময় পুরস্কৃত হয় না, বর্ত্তমান মানব সমাজে জীবনের সাফল্য লাভ করার পক্ষে তারা যে সব সময় শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, শুধু তাহা নহে; জীব জগতের অতীত ইতিহাসে ও তাহারা সার্থক্য লাভের—উন্নত ও বিভবশালী হইবার—প্রধান পদ্ধতি ছিল না। বিবর্ত্তন-বাদীর এই আবিষ্কার আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারি, কিন্তু ইহাতে যে কিছু না কিছু সত্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ পৃথিবীতে যারা বড় হইয়াছে—যাহাদিগের প্রভুত্ব পৃথিবী স্বীকার করিতেছে, তাহারা লড়াই করিয়াই বড় হইয়াছে, দয়া করিয়া নয়, ক্ষমা করিয়া নয়, ডান গালে চড় দিলে বাম গাল ফিরাইয়া দিয়া নয়। বুদ্ধ কিংবা যীশু পৃথিবীর রাজা

নন। পাশ্চাত্য শক্তি-নিচয় বৌদ্ধনীতি দ্বারা চীনদেশে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন নাই। দধীচি মুনি কখনও নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হইতে পারেন নাই; শোনিতপাতে রোমাঞ্চিত হয় যে ব্যক্তি, সে কখনও সেকেন্দর সাহ হইতে পারে না। গোজাতির প্রতি দয়াপরবশ হইয়া মানুষ যদি নিজের দেহ-মাংস দানে শার্দ্দূলের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে গরু দেখিতে পাইতাম কিন্তু মানুষকে আর দেখিতাম না। ইউরোপের জাতিসমূহের লোভের প্রতি অনুকম্পা দেখাইয়া তুর্কী যদি নিজের দেশ ছাড়িয়া দিত তাহা হইলে তাহাকে কেহ দাতাকর্ণ বলিত কিনা জানি না, কিন্তু ইউরোপে—এবং খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীতেই—তাহাকে আর দেখিতাম না। প্রশ্ন করা সহজ, 'অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ'?—কিন্তু যে না করে, তাহার দগ্ধ উদরের আর পূর্ত্তি হয় না।

তাই যদি হইল, চারিত্রনীতি কথিত ধর্ম্মদ্বারা যদি মানুষের সম্যক্ মঙ্গল-সাধন না হইল,এবং যদি সে কার্য্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ না করিল, তবে সে উহাকে বড় মনে করিতে শিখিল কোথায়? যদি হিংসা না হইলে মানুষের না চলে, তবে সে দয়াকে পরম ধর্ম্ম মনে করিতে শিখিল কোথায়? যদি শত্রুর প্রতি ভালবাসা তাহার পক্ষে ক্ষেমঙ্কর না হয়, তবে যীশুর এই উপদেশকে পৃথিবী সম্মান করিল কেন? সুতরাং মানবজাতি নিজের অভিজ্ঞতায় মঙ্গলজনক বলিয়া জানিয়াছে এবং সেই জন্যই দয়া প্রভৃতি গুণকে ধর্ম্ম বলিয়া চারিত্রনীতিতে গ্রহণ করিয়াছে,—এই যে একটা মতের উল্লেখ আমরা করিয়াছি, নূতন করিয়া আবার তাহা পরীক্ষা করিতে হয়।

ফ্রিডরিক্ নীট্চে মনে করেন, বর্ত্তমান কালে মানুষ যে অনুকম্পা, পরার্থপরতা প্রভৃতি চারিত্রনীতি-কথিত গুণকে সদ্গুণ বলিয়া মনে করে, তাহার মূলে একটা গূঢ় রহস্য আছে। শ্রেষ্ঠ, উন্নত জাতি সকল লক্ষ্য করে নাই, অজ্ঞাতসারে তারা একটা রাজ্যহীন, দেশহীন, দাসীকৃত, পদদলিত জাতির নিকট কেমন করিয়া একটা ঘৃণিত, নীচজাতির উপযুক্ত,দুর্ব্বল দাস্য-বৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছে। তেজস্বী, সমর-নিপুণ বীরের অধঃপতন হইয়াছে, আর বিজিত, পদলেহনলোলুপ ক্রীতদাসের জয়লাভ হইয়াছে। বিজিতের চিত্তে যে প্রতিহিংসা-বহ্নি জ্বলিতেছিল, বিজেতার পুনঃ পরাজয়ে আজ সে সার্থক্য লাভ করিয়াছে,—বলহীন, বীর্য্যহীন ক্রীতদাসের ধিক্কৃত জীবন আজ সম্মানিত হইতেছে! সুদর্শনধারী আবার ব্যাধহস্তে পরাভূত, গাণ্ডীবী আবার বৃহন্নলার ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছে! যাহারা বীর, যাহারা প্রভু যাহারা শক্তিশালী এবং যাহারা অন্যের পরাভবকারী, তাহারাই ছিল আর্য্য, তাহারাই ছিল শিষ্ট, তাহারাই ছিল শ্রেষ্ঠ; এবং তাহাদের ধর্ম্মই ছিল সদ্ধর্ম্ম। তখন ভাল অর্থ ছিল 'আর্য্যসুলভ, সুন্দর, সুখদায়ক, দেবপ্রিয়';—বীর্য্য, বিভূতি, ঐশ্বর্য্য ছিল সজ্জনের সম্পত্তি। আর আজ? 'ধনহীন, বলহীন,শৌর্য্যহীন, হতভাগ্য যারা তারাই আজ সাধু'; 'আধিগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত যারা, যাদের অভাব কখনও শেষ হয় না, যাদের যাচ্ঞার কোথাও সীমা নাই, যাদের দৈন্য কখনও দূর হয় না—তারাই আজ ধার্ম্মিক ও শ্রেষ্ঠ, এবং মনে করা হয়, তাদেরই উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ পড়িয়াছে, কারণ তাদেরই জন্য মুক্তি'; আর ক্রীতদাসের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার, ক্রীতদাসের ন্যায় পরাক্রান্তের নিষ্ঠীবন-লেহন—ইহার নাম হইয়াছে বশংবদতা, এবং এই নিরীহতাই হইয়াছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

যে রোম সমস্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী যাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল, সমস্ত মানবজাতি যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল,—সেই রোমে, সমস্ত ইউরোপে, অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়িয়া, আজ কাহার চরণে মানুষ মাথা লুটাইতেছে? তিনজন য়ীহুদী ও একজন য়ীহুদী রমণী—ন্যাজারেতের যীশু, ধীবর পীটর্, তন্তুবায় পল্ এবং যীশু-জননী মেরী—ইহাদেরই চরণে আজ পূজার অর্ঘ্য পড়িতেছে! বিজিত য়ীহুদীজাতির প্রতিহিংসা পূর্ণ হইয়াছে; পরাক্রান্ত রোম, সমস্ত বীরের জাতি আজ তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতেছে। তাহাদের দীনতা, তাহাদের হীনতা, তাহাদের বশ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। দায়ে পড়িয়া,

পরাভূত হইয়া, বিজেতার অনুকম্পার ভিখারী হইয়া, যে অধীনতা ও তথাকথিত শক্রপ্রীতিদ্বারা য়ীহুদীরা আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাকেই তাহারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এবং ক্রমে 'তাহাদের শক্তিহীনতার নাম হইল সাধুতা, তাহাদের কাপুরুষোচিত নীচতার নাম হইল নম্রতা, বিদ্বেষিত শক্রর অধীনতা স্বীকারের নাম হইল বশংবদতা—ঈশ্বরাদিষ্ট বিনয়। দুর্ব্বলের নিরীহতা, তাহার ভীরুতা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অভাব হেতু বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য তাহার নিশ্চেষ্ট প্রতীক্ষা—ইহার নাম হইল ধৈর্য্য এবং ইহাও একটী সদ্‌গুণ।' এইরূপে যে য়ীহুদী জাতিকে রোম পরাজিত করিয়া রাখিয়াছিল, প্রকারান্তরে, বুঝিতে না পারিয়া নিজেই আবার তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে—তাহার দাস্যকে সদ্ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বিজেতা ও বিজিত, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট, উচ্চ ও নীচের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, আজ তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে,—বিজিতের জয় পূর্ণ হইয়াছে, অধম ধর্ম্মকেই আজ লোকে উত্তম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগের পরে প্রাচীন আদর্শের পুনরভ্যুত্থানের সময় তন্দ্রাতুর রোম একবার সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—জুডিয়ার অধীনতা পাশ ছেদনের একটু আভাস তখন দেখা গিয়াছিল; কিন্তু লুথার ও অন্যান্যের সংস্কারের নামে ইউরোপ আবার দৃঢ় করিয়া সেই বন্ধন দড়ি গলায় পড়িয়াছে। 'ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জুডিয়া শেষবার প্রাচীন আদর্শকে পরাভূত করিয়া দিয়াছে; উচ্চ শ্রেণীর উত্তম ধর্ম্মের স্থানে নীচজাতির দাস্যগুণকে মানুষ সদ্ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।' নীট্‌চের মতে, 'প্রেমের অবতার, মানব জাতির উদ্ধারকর্ত্তা যীশু, যে জগতে দরিদ্র, পাপী ও তাপীর নিকট মুক্তির বার্ত্তা আনিয়াছিল—সে কে? য়ীহুদীদের বিজেতা প্রভুত্বাভিমানী জাতি সকলকে প্রলোভিত করিবার উপায় মাত্র; আর, য়ীহুদীরাই যে তাহাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া তাহার প্রতি শক্রবৎ আচরণ করিয়াছিল—তাহাও কি প্রকারান্তরে পরাভবশালী শক্রদিগকে নিজের নীচ আদর্শ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা মাত্র নয়?' 'ইহা নিশ্চিত যে য়ীহুদীরাই ভালমন্দ নিরূপণের সমস্ত প্রাচীন প্রণালী উলট পালট করিয়া দিয়াছে এবং অন্য সকল আদর্শের উপরে আজ য়ীহুদী আদর্শের স্থান।' য়ীহুদীদের নিগূঢ় প্রতিহিংসা সুতরাং পূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ হইয়াছে।

অতএব নীট্‌চের মতে কোন অতিলৌকিক শক্তি হইতে ভালমন্দের উৎপত্তি হয় নাই। "উচ্চ প্রভবিষ্ণু জাতি যেখানে অধম নীচজাতির সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই খানেই ভালমন্দের জন্ম হইয়াছে"। যে বীর, তাহার শক্র থাকা আবশ্যক, কারণ শক্রর সহিত সংঘর্ষেই তাহার বীরত্বের বিকাশ। শক্রকে সে অবহেলা করে, কিন্তু তাহার মনে তুষানলের মত প্রতিহিংসা জ্বলে না। বিজিত শক্রকে সে দুঃস্থ মনে করে কিন্তু পাপী মনে করে না। তাহার ভাল সে নিজে; যাহা হইতে বীরের উপযুক্ত সুখ লাভ হয় তাহাই সৎ—তাহাই ধর্ম্ম। আর, পরাজিত দুর্ব্বল শক্রর অবস্থা মন্দ, কারণ তাহা হইতে দুঃখ ক্লেশের উৎপত্তি। কিন্তু বিজিত কাপুরুষ যে তাহার নিকট মন্দ কে? পরাক্রমশালী বিজেতা; আর এই মন্দ অর্থ কি? পাপী। বীর্য্যহীন বিজিত মনে করে সে-ই সকল ধর্ম্মের আধার—সে-ই পুণ্যাত্মা, কারণ সে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই ভাবে দুইটী পৃথক্ ভালমন্দের ধারণা পৃথিবীতে জন্ম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু জগতের এমনই দুরদৃষ্ট, নীচজাতির এই অধম ধারণাকেই সকলেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত গুণের উপকারিতা জানিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া নীচজনোচিত কতকগুলি গুণকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; যে শৌর্য্যবীর্য্য, যে বলবত্তা মানুষের বৃদ্ধি ও উন্নতির সহায়ক ছিল তাহা ছাড়িয়া দিয়া অধমজনোচিত প্রবৃত্তিকেই সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়াছে। দরিদ্র, হীনবীর্য্য নীচজনের প্রতি সহানুভূতি এই রূপেই উৎপন্ন হইয়াছে। বিজিত দুর্ব্বল জাতি আত্মরক্ষার জন্য যে পরানুগত্যের আবশ্যকতা বুঝিয়া ছিল, ঢক্কানিনাদে তাহাকেই সে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিত এবং এক দিন না এক দিন তাহার এই ধর্ম্মের পুরস্কার হইবে, এ বিশ্বাস সে না করিয়া পারে নাই। কিন্তু

,জগতের দুর্ভাগ্য, বিজিতের এই বিষাদ-দম্ভপূর্ণ ঘোষণার ইন্দ্রজালে মোহিত হইয়া বিজেতা ভুলিয়া গিয়াছে কি গুণের মাহাত্মে সে বিজয়ী হইয়াছে—কিসে তাহাকে বড় করিয়াছে। তাই সে বিজিতের নীচ ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে। সুতরাং এখনকার চারিত্রনীতি যে হীনভাবকে উচ্চ মনে করে, মানুষের সুস্থ জ্ঞান যখন ছিল, তখন উহা বড় ছিল না, এবং কখনও হইতে পারে না।

যাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া কথা বলেন, নিতান্তই মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা না থাকিলে তাঁহারা একেবারে অসত্য কথা বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। সুতরাং নীট্‌চে যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণই ভুল, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। ভাল-মন্দের ধারণার জন্য সভ্য জাতিরা য়ীহুদীদের নিকট যে ঋণী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; শারীরিক বলহ্রাস হইতে ভীরুর প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়াছে, ইহাও বোধ হয় অসত্য নয়। কিন্তু সকলেই চারিত্রনীতির সকল কানুন গুলিই য়ীহুদীদের নিকট শিখিয়াছে এরূপ নয়; এবং চারিত্রনীতির সমস্ত নিয়মই অনুপকারী সুতরাং ভ্রান্ত—এরূপও নহে। যীশু যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যীশুর পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শাক্যমুনিও তাহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শাক্যমুনি সূতপুত্র নন, রাজার ছেলে; কোন নিপীড়িত জাতিতে, হীন বংশে তাঁহার জন্ম হয় নাই; স্বাধীন ভারতে, শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবংশে তাঁহার উৎপত্তি। অধঃপাতিত জাতির গুপ্ত প্রতিহিংসা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। অথচ, তাহাতেও যে ঐ একই নীতির উপদেশ রহিয়াছে, নীট্‌চে তাহার কি ব্যাখ্যা করিবেন জানি না।

সুতরাং কোন অবজ্ঞেয় জাতি বা শ্রেণীর বশীকরণ-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, নিজের সতেজ বিচারশক্তি হারাইয়াই যে পৃথিবী নিজের অনুপকারী কতক গুলি কানুনকে চারিত্র-নীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এরূপ মনে করা কঠিন। দুঃখিতের প্রতি সমবেদনা, জীবের প্রতি অনুকম্পা, কার্য্যে বিনয় ও সৌজন্য—ইত্যাদি হইতে লোকের যদি কেবল হানিষ্ট হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদিগকে উপদিষ্ট পাইতাম না। সাধুতা, সত্যনিষ্ঠা হইতে যদি লোকের অহিত ছাড়া হিত না হইত, তাহা হইলে লোকে কখনও ইহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিত না। ফাঁকি দিয়া কেহ সমস্ত পৃথিবীকে একটা মিথ্যা ধর্ম্ম শিখাইয়া দিতে পারে না। গৃহীত ধর্ম্ম-বিধির সুতরাং উপকারিতা আছে—ইহা হইতে মানুষের মঙ্গল হয়। সাধুতা প্রভৃতি যে গুণ, তাহা না থাকিলে সমাজের অস্তিত্বই সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। যেখানে সকলেই চুরি করে, কিংবা সকলেই মিথ্যা কথা কয়, সেখানে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া মানবের একত্র অবস্থিতি অসম্ভব। আর, নীট্‌চে ও প্রকাশ্যতঃ এ গুলিকে তেমন আক্রমণ করেন নাই। তাঁহার শরনিক্ষেপের প্রধান লক্ষ্য দয়া, নম্রতা, সহিষ্ণুতা, অন্যের সুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিজের বিজয়-স্পৃহাকে খর্ব্ব করা—প্রভৃতি যে গুলিকে আমরা ধর্ম্মের অঙ্গ বলি সেই গুলি। তাঁহার ইচ্ছা পুরুষ আবার সিংহ, শার্দ্দূল ও পুঙ্গবের সহিত উপমিত হইবার যোগ্য হয়; 'মিউ-মিউ করা যত সব বাঙ্গালীর মেয়ে'র মত ফুলের গায়ে মূর্চ্ছা না যায়,—শোণিতের নামে কম্পিত হইয়া না উঠে,—লড়াইয়ের নামে অপস্মার রোগে আক্রান্ত না হয়! কিন্তু দয়া প্রভৃতির সম্বন্ধেও নীট্‌চের মত অখণ্ডনীয় নহে। বিজিতের ধর্ম্মকে বিজেতা বিনা কারণে গ্রহণ করিয়াছে, এমন মনে হয় না। অপব্যবহার সকল জিনিসেরই হইতে পারে, দয়ারও হইতে পারে; অস্থানে অনুকম্পা হইতে সমাজের অনিষ্টই হয়; কিন্তু তথাপি কোন উপকারিতা না থাকিলে মানুষ দয়াকেও ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিত না; যদিই বা আপনা হইতে মনে দয়ার উদ্রেক হইত, তথাপি যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অনুপকারিতার উপলব্ধি হইত, মানুষ সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ত্যাগ করিতে শিখিত। সুতরাং ভালমন্দের যে একটা প্রভেদ আমরা সমাজে দেখিতে পাই, নীট্‌চের কথিত প্রণালী অনুসারে তাহার জন্ম হয় নাই, দুই একটা বিজিত জাতির বুজরুকিতে সমস্ত পৃথিবী ভুলিয়া যায় নাই;

ফলে পরীক্ষা করিয়া মানুষ শিখিয়াছে এবং আরও শিখিতেছে যে ধর্ম্ম-বিধি তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল-জনক নহে। আগেকার শার্দ্দূলবিক্রমের স্থানে এখনকার নৈতিক আদর্শে অনেকটা মৃদুতা আসিয়া পরিয়াছে সত্য, কিন্তু মানুষ তাহার খবর রাখে, এবং জানিয়া শুনিয়াই সে ইহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে; কারণ, ইহা হইতে সে মানবজাতির অমঙ্গলের আশঙ্কা করে না, বরং অধিক মঙ্গলের আশা করিয়া থাকে। কি করিয়া ইহা হইতে অধিক মঙ্গলের উৎপত্তি হইবে, তাহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন; এখানে তাহার আলোচনার অবকাশ নাই। কিন্তু ইহা হইতে মঙ্গল না হইলে মানুষ ইহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইত না।

অসাধুর উন্নতি চারিত্রনীতির একটী কূট সমস্যা। নীট্‌চে হয় ত বলিবেন ঐ করিয়াই ত বড় হইতে হয়; ঐ উপায়কে মন্দ মনে করাই ত ভুল। যাহার খড়্গো ধার আছে এবং হৃদয় রমণীসুলভ কোমলতায় কলুষিত হয় নাই—যাহার ভোগ্য বস্তু অধিকার করিতে অদম্য ইচ্ছা আছে এবং সহস্র সঙ্কোচে যাহার মন কাঁপিয়া উঠে না, সমাজের নিন্দিত উপায় অবলম্বন করিলেও ইহ সংসারে সে সুখী হইতে পারে; এবং অনেক সময় কি উপায়ে ইহা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিতে সমাজ কুণ্ঠিত হয় না। সকল প্রভুত্বের আধার যে ধন,তাহার অর্জ্জনে কেহ অনীতি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সেই ধনীকে পায়ে ঠেলিতে সমাজ এখনও শিখে নাই। অথচ অত্যন্ত সসঙ্কোচে সৎপথে থাকিলে যে, প্রভুত্ব দিতে পারে এমন ধন অনেক সময় অর্জ্জন করা যায় না তাহাও ঠিক। সুপথের চেয়ে কুপথের এই সুবিধা, নীট্‌চের মতের পক্ষে একটি যুক্তি হইতে পারে। কিন্তু তথাপি অসাধু মাত্রেই সুখী হয় না এবং সাধু মাত্রেই অসুখী হয় না। সম্যক্ না হইলেও সমাজ অসাধুর শাস্তি দিতে চেষ্টা করে, তাহার উন্নতির পথ রোধ করিতে চেষ্টা করে,—অসাধু যে অকল্যাণ-জনক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, একথা সমাজ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তথাপি যে অসাধুর উন্নতি হয় ইহা সমাজের বাঞ্ছিত নহে; সমাজ কখনও ইচ্ছা করে না যে অনীতির জয় হউক। কিন্তু সমাজ এখনও সে অবস্থায় উপনীত হয় নাই যখন সকল রকম অধর্ম্মকে সে শাস্তি দিতে পারে, সব রকমে অসাধুর জয় ও উন্নতি রোধ করিতে পারে তথাপি ইতিহাসের ভিতরে যে এক বিশাল শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, সমাজের সে শক্তি আসিবে যাহাতে সে শিবেতরকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া শিবের একান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। ইহা দার্শনিকের স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু এ স্বপ্ন না থাকিলে সাধুর অঙ্গ অবশ হইয়া যায়—তাহার চিত্তে ভীতির সঞ্চার হয়, সয়তানের বিজয়-লম্ফে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। সমাজের এ শক্তি আসিবে তখন যখন সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে চারিত্র-নীতির প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইবে। এখনও অনেকের বিশ্বাস ভাসা ভাসা—মুখে যাহাকে মন্দ বলা হয় প্রাণের সহিত তাহাকে ঘৃণা করিতে অনেকে শিখে নাই। ইহার জন্য আবশ্যক শিক্ষা। এই শিক্ষার চেষ্টায় সমাজ কখনও ক্ষান্ত হয় নাই। আমরা আশায় আছি, সমাজের গঠন ও শাসনের পূর্ণ পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যখন সমাজের অনুমোদিত উপায় ছাড়া মানুষের উন্নতির ও সুখৈশ্বর্য্য লাভের কোন পন্থা থাকিবেনা; যখন সমাজের নিন্দিত প্রণালী অভ্রান্তরূপে জীবনে অহিতেরই উৎপাদন করিবে। পরলোকের ভরসা দেখাইয়া দুঃস্থ ধার্ম্মিককে সান্ত্বনা দেওয়া সমাজের পক্ষে দুর্ব্বলতা। সমাজের সনাতন চেষ্টা তাহার নিজের প্রশংসিত কর্ম্মের পুরস্কারের দিকে ধাবিত থাকুক, এবং তাহার এই চেষ্টা সফল হউক, এবং পৃথিবীতেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হউক, ধর্ম্মে বিশ্বাসী মাত্রেরই ইহা একমাত্র কামনা। *

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ধ্রুব রাখাল

তোমার লীলার মধু নিখিলের প্রেম বিনিময়ে
করিল অমিয়
তোমার লীলার মন্ত্র নিখিলের চিত্ত পরিণয়ে
করিল স্বর্গীয়।
তোমার লীলার গঙ্গা মানবের মনোমলিনতা
করিল পাবন,
তোমার লীলার বন্যা মানবের আঁখি মরুভূমে
আনিল প্লাবন।

তোমার ধূলার খেলা করে দিল সব সখাভাবে
ব্রজের মিতালি,
তোমার ধূলার স্পর্শ ভূপালেরো শাসন পালনে
করিল রাখালী;
তোমার ধূলার ভূষা দীনতারে করিল, গোপাল,
মাথার ভূষণ
তোমার ধূলার হর্ষ করে দিল প্রতি স্পন্দনেরে
আনন্দ কম্পন।

তোমার হাসির চুমে বার বার সুপ্তি জাগরণ
উদয়, বিলয়,
তোমার হাসির বৃষ্টি করে সৃষ্টি বিচিত্র বরণে
ইন্দ্রধনুময়।
তোমার হাসির ধুমে নিত্য এই নিখিল নিলয়ে
নবীন উৎসব।
তোমার হাসির দৃষ্টি আনে নিত্য অন্ধকার মাঝে
উষার বৈভব।

তোমার বাঁশীর স্বরে ঘর, বা'র, পথ, ঘাট, মাঠ,
করেছে পাগল,
তোমার বাঁশীর তানে নিখিলের চিত্ত কারাগারে
টুটাল আগল।
তোমার বাঁশীর ডাকে করে নিত্য আকুল উদাস
বিষয় ব্যসনে,
তোমার বাঁশীর বাণী করে দিল সত্য সনাতন
মায়ার স্বপনে।

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ,
কবিশেখর।

আলোচনা

"সমসাময়িক ভারতে"র সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন—

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় "সমসাময়িক ভারতের" যে সমালোচনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

"যখন তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতা সহকারে কতিপয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন" এবং "ত্রস্ত লিখিত গ্রন্থ"—এতদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে সমালোচক প্রবর এরূপ লিখিয়া আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় খণ্ড ও ঐ সময়ে, তৃতীয় খণ্ড ১৩২১র পৌষে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে আর দুই খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আমি প্রায় নয় বৎসর হইল "ভারতীতে" এই সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ লিখি। তৎপরে অনেকগুলি মাসিকে ঐ সম্বন্ধীয় আমার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। আমার বইয়ের সহস্র ত্রুটী আছে কিন্তু ইহা 'অসাধারণ ক্ষিপ্রতা' বা 'ত্রস্ত' এরূপ কথা লিখিয়া সমালোচক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। সমালোচকের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি এই সকল বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া মন্তব্য প্রকাশ কেন করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও কয়েকটী কথা বলিব। অষ্টম খণ্ডে (ফাহিয়ান) বর্ণিত বৃত্তান্ত প্রথমতঃ 'বীলে'র সংস্করণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয় এবং প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে 'সুপ্রভাতে' প্রকাশিত হয়। পরে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের পরামর্শে "লেগীর" সংস্করণানুযায়ী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তম পঞ্চম খণ্ড'ম্যাক্রিণ্ডলের'গ্রন্থানুসারে তিন বৎসর পূর্ব্বে অনুবাদিত হয়; কিন্তু ভূমিকা লেখক ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধানুযায়ী উক্ত খণ্ড "সঙ্কের"সংস্করণানুযায়ী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একবিংশ খণ্ড প্রথমে "কনষ্টেবলের" পুস্তক দৃষ্টে লিখিত হয়; গত বৎসর ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করাতে এই শেষোক্ত পুস্তক দৃষ্টে আমার পুস্তক সংস্কৃত হইতেছে।

(২) "মৌলিকতা বা অনুসন্ধিৎসার গৌরব তিনি দাবী করিতে পারেন না।" সমালোচক মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া প্রথম খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠা পড়িতেন তবে এরূপ অন্যায় কথা লিখিতেন না। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন "সমালোচনার খাতিরে তিনি গ্রন্থ পড়িয়াছেন।" মিথ্যাকথা। তিনি ছিদ্র অন্বেষণে ব্রতী হইয়া এরূপ করিয়াছেন। আমার "নিবেদন" পড়িয়া দেখিবেন। আমি কুত্রাপি মৌলিকতার দাবী করি নাই। তিনি যেরূপ আমার নিন্দা করিয়াছেন, যদি অন্য সমালোচক আমাকে প্রশংসাসূচক ক্ষেত্রে originality'র প্রশংসা করেন তবে তজ্জন্য কি আমি দায়ী হইব? আমি বলিতে বাধ্য যে তিনি একচক্ষু হরিণের ন্যায় আমার বই পড়িয়াছেন।

(৩) "ম্যাক্রিণ্ডলের সঙ্কলনেরই অনেকে আদর করিবেন।" একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু ম্যাক্রিণ্ডলের সংস্করণ বঙ্গদেশে কয় সেট আছে এবং তাহার বর্ত্তমান মূল্য কত একবার অনুসন্ধান আবশ্যক।

(৪) 'অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ'—ইহা মিথ্যা। অনুবাদেরই অনুবাদ। "অনুবাদের অনুবাদের আবশ্যকতা কি?"* "আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা ভাষীদিগের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চ্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা আকারে সাধারণের হাতে না দিতে পারিলে আমাদের কর্ত্তব্যে ক্রটী হইবে"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের এই উক্তিই যথেষ্ট। আমার গ্রন্থের সহস্র ক্রটী সত্ত্বেও যে সমালোচক অনুবাদের আবশ্যকতা অবগত নহেন, তিনি সমালোচক পদবাচ্য হইবার যোগ্য নহেন, একথা বলিতে আমি বাধ্য।

(৫) "রজনী বাবুর গ্রন্থ ভাষার গৌরবে,পাদটীকার সম্পদে, ছাপা কাগজ ও বাঁধাইয়ের উৎকর্ষে সর্ব্বাংশেই যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—ইহার সকলগুলি সত্য নহে। ভাষা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। কাগজ পরম শ্রদ্ধেয় রজনী বাবু যাহা দিয়াছেন তাহার মূল্য ৪৲ টাকা, আমার দ্বিতীয় খণ্ডের কাগজ ৬।।০, তাঁহার বাধাই শতকরা ১৫৲, আমার ২৫৲, ছাপার দর উভয়েরই এক এবং আমার বিশ্বাস উভয় গ্রন্থের ছাপার তারতম্য বিশেষ দৃষ্ট হইবে না।

পরিশেষে নিবেদন—আমার গ্রন্থের ক্রটী যথেষ্ট, কিন্তু গালাগালি দিতে হইবে বলিয়া সত্যের অপলাপ কর্ত্তব্য কি না তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। ঢাকার মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে এবং রমনার মনমোহন লাইব্রেরীতে আমার গ্রন্থ আছে। আমি প্রতিবাদ পত্রে যাহা লিখিলাম তাহার সত্যতা সম্বন্ধে পুস্তক দেখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার
অধ্যাপক, পাটনা কলেজ

---

* কোটেশন চিহ্নিত অংশ লেখকের নিজের রচনা ইহা সমালোচনায় নাই। সমালোচনায় কোথাও অনুবাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা হয় নাই। সমালোচক।

সমালোচকের কৈফিয়ৎ

প্রতিভার সমালোচনা বালকের জন্য লিখিত হয় নাই। সুতরাং প্রত্যেক কথার ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। আমার বিশ্বাস প্রতিভার পাঠকগণের জন্য এই কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক, তবে অধ্যাপক সমাদ্দার যখন আমার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন, তখন ন্যায়ের খাতিরে আমি তাহা দিতে বাধ্য।

১। ত্রস্ততা বা ক্ষিপ্রতার পরিমাণ কেবল সময়ের অনুপাতে হয় না, লেখকের শক্তির অনুপাতে হয়। ভল্‌টেয়ারের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০ খণ্ড। ফরাসী সাহিত্যিক ডুমা একাকী ও অন্যের সহযোগিতায় দুই সহস্রের অধিক সংখ্যক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সময়ের হিসাবে ক্ষিপ্রতার পরিমাণ ধরিলে তাহাদের রচনা নিশ্চয়ই ক্ষিপ্রতা-দুষ্ট বলিতে হইত; কিন্তু প্রতিভা বলে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ক্ষিপ্রতার বা ত্রস্ত রচনার চিহ্ন লক্ষিত হয় না। সমাদ্দার মহাশয়ের গ্রন্থের বহু স্থলেই ত্রস্ত রচনার প্রমাণ রহিয়াছে, যে কেহ গ্রন্থ পাঠ করিলেই দেখিতে পাইবেন। যদি সে সকল ত্রুটি তাহার ক্ষিপ্রতাসম্ভূত না হয়, তবে তিনি যে ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে অক্ষম তাহা আমরা বলিতে বাধ্য হইব। আমরা যে সকল গ্রন্থ সমলোচনা করি নাই সমাদ্দার মহাশয় আত্মসমর্থনের জন্য তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন প্রবন্ধ যে কয়েক বৎসর আগেই লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা অনবগত নহি। কিন্তু সেই সময়েই অধ্যাপক মহাশয়ের রচনা বাহুল্য দেখিয়া কোন মাসিক পত্রের সমালোচক মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "অধ্যাপক সমাদ্দার অক্টোপাসের ন্যায় ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছেন।" সমাদ্দার মহাশয় বোধ হয় সে কথা বিস্মৃত হন নাই।

২। সমাদ্দার মহাশয়ের নিবেদন আমরা ভাল করিয়াই পড়িয়াছি। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকারও সমালোচনা করা হইয়াছে। ভূমিকা লেখক যে সাধারণ সমালোচক মাত্র তাহা আমরা জানিতাম না। মৌলিকতার কথা তুলিবার আরও একটু কারণ আছে। মৌলিক গবেষণার গ্রন্থে ভাষার ত্রুটি থাকিলেও তাহা মার্জ্জনীয়। যদি শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা বা শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দের গৌড় রাজমালার ভাষা সুখপাঠ্য না হইত তথাপি ঐ দুইখানি গ্রন্থের গৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হইত না; সুখপাঠ্য হয় নাই বলিয়া রাখাল বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস ও বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণে অসমর্থ হয় নাই। কিন্তু অনুবাদ গ্রন্থে ভাষার ত্রুটি অনার্জ্জনীয়। সমাদ্দার মহাশয়ের গ্রন্থের ত্রুটি অনুসন্ধানের জন্য এক চক্ষু হরিণ হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহার গ্রন্থ সত্য সত্যই সহস্র ত্রুটিতে এমন কণ্টকিত যে দুই চক্ষু বুজিয়া চলিলেও প্রতিপদে আহত হইয়া চীৎকার করিতে হইবে।

৩। টাঙ্গাইল, হাজারিবাগ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের কথা আমরা জানি না তবে ঢাকার মত অনুন্নত স্থানেও ম্যাক্রিণ্ডলের গ্রন্থের একাধিক সেট্ আছে এবং এক ঢাকা কলেজের লাইব্রেরীতেই ম্যাক্রিণ্ডলের কোন কোন গ্রন্থের দুই দুই কপি রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের বাঙ্গালী পাঠক কয় জন?

৪। "অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ" এ কথা আমার নিজের নহে; যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থের ভূমিকালেখক প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের কথা। যোগীন্দ্রবাবু স্বীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন আমার কথা সত্য কিনা।

পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যই অনুবাদের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। এমন কি মার্টনো ও ভল্‌টেয়ারের মত সাহিত্য রথীগণও অনুবাদ কার্য্য অপমানজনক মনে করেন নাই। অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারে এমন মূর্খ বঙ্গদেশে আছে কি না জানি না। যোগীন্দ্রবাবুর অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিলে তাহার গ্রন্থ সমালোচনার ক্লেশ স্বীকার করিতাম না। কিন্তু যেখানে মূল গ্রন্থের অনুবাদ সম্ভব না বর্ত্তমান সেখানে অনুবাদের অনুবাদ

করিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কোথাও বলিয়াছেন কি? অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ আমরা সযত্নে পাঠ করিয়াছি। অনুবাদের অনুবাদে যে কি বিড়ম্বনা তাহা যোগীন্দ্র বাবুও দেখিতেছেন। তাই একবার বীলের সংস্করণ ও পরে লেগের সংস্করণের অনুসরণ করিতে হইতেছে। বঙ্গদেশে এখন গ্রীক, ল্যাটিন ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি দুর্লভ নহেন। তাই ঐ সকল ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থের অনুবাদ হওয়াই সঙ্গত। অবশ্য চীন পরিব্রাজকগণের গ্রন্থের অনুবাদের অনুবাদ ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও আরবী পারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ মূল হইতে অনুবাদিত হওয়া বিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে মোটেই অসম্ভব নহে। যোগীন্দ্র বাবু বিভিন্ন ভাষাবিদ্ সহযোগীর সন্ধান করিয়াছেন কি না জানিতে পারি কি?

৫। যোগীন্দ্র বাবু ও রজনী বাবুর কাগজ ও বাঁধাই প্রভৃতির দর আমরা বাজারে যাচাই করিতে যাই নাই, পুস্তক দেখিয়া যাহা মনে হইয়াছে তাহাই বলিয়াছি মাত্র। সমাদ্দার মহাশয়ের ভাষার নমুনা ইতি পূর্ব্বেই দিয়াছি সুতরাং সে বিষয়ে অধিক নমুনা নিষ্প্রয়োজন; অল্প-শিক্ষিতা মহিলাগণও তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

যোগীন্দ্র বাবু আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উদারতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি যদি প্রতিকূল সমালোচনায় এতই অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন, তবে "প্রতিভার" সমালোচনার জন্য পুস্তক পাঠাইয়াছিলেনই বা কেন, এবং সম্পাদক মহাশয়কে বারবার তাগিদ দিয়াছিলেন বলিয়াই বা শুনিয়াছি কেন? আমরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বা বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করি নাই। সমালোচককে গালি দিলে লেখকের গাত্রদাহের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থের ত্রুটি দূরীভূত হয় না। তবে অধ্যাপক মহাশয় 'মিথ্যাকথা' 'সত্যের অপলাপ' প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার করিয়া মস্তিষ্কের যে অবস্থার প্রমাণ দিয়াছেন, সে অবস্থায় তাঁহার সহিত আমরা বৈদ্য জাতি বাগ্‌বিতণ্ডা করা অবিধেয় মনে করি। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

অন্তর্যামী †

(সমালোচনা)

"মালঞ্চ" "সাগর সঙ্গীত" প্রভৃতির কীর্ত্তিমান্ কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, বার্, এট্ ল, মহাশয়ের রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ। আমরা যতদূর জানি, এই গ্রন্থের কতকাংশ সুপ্রসিদ্ধ 'নারায়ণ' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল কি না তাহ আমাদের স্মরণ নাই। যাহা হউক, অন্তর্যামী এক্ষণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ যখন 'নারায়ণে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল তখনই আমরা ইহার একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহার ভাষার প্রবাহ বড়ই সরল ও স্বচ্ছ। কুত্রাপি একটি কঠিন পদের প্রয়োগ বা অযথা বাগাড়ম্বরের প্রয়াস নাই। লেখায় সর্ব্বত্রই একটা সংযমের চিহ্ন পরিস্ফুট; অথচ রচনা মধুর ও শ্রুতিসুখকর। অন্তর্যামীর কবি ভাষা লইয়া খেলা করিতে চেষ্টা করেন নাই; একটা নূতন কিছু করিবার অনুরোধে আজকালকার লেখকগণ যেমন ভাষাকে

---

* এই সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ 'প্রতিভায়' প্রকাশিত হইবে না। প্রঃ সঃ।

† অন্তর্যামী, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। মূল্য, ৸০ আনা। প্রকাশক, শ্রীশিশিরকুমার দত্ত, ২৫নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোচড়াইয়া পাকাইয়া উহাকে একেবারে বিকৃত করিয়া তোলেন, এই কবি সেরূপ করেন নাই। তিনি সরল ভাষায় প্রাণের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন উহা তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এইজন্য এই কাব্য সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

কিন্তু এই গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটী পূর্ব্বে ধরিতে পারি নাই। সমগ্র গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহার মূলতত্ত্ব ধরা পড়ে।

কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয় কিছুই অস্পষ্ট নহে;-একজন বিরহী তাহার বঁধুর জন্য কাঁদিতেছে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া অধীর হইয়া দূরে একটী মন্দির দেখিতে পাইয়াছে, এবং কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া পথ বাহির করিয়া সেই মন্দিরের দিকে যাত্রা করিয়াছে। বর্ণিত বিষয় ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কবি ইহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

এই কাব্যকে একটা সাধনার ইতিহাস বা তাহার প্রথম পরিচ্ছেদ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। বিরহী এখানে সাধক বা জীবাত্মা। যিনি পরমাত্মা বা অন্তর্যামী, তিনি সাধকের বা জীবাত্মার নিকটেই আছেন, অথচ যেন তিনি অতিদূরে! জীব তাহাকে দেখে না, কিন্তু প্রতি কার্য্যে প্রতি চিন্তায় তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করে;—

সকল দরশ মাঝে
তুমি উঠ ভেসে!
সকল গগন মাঝে
তুমি উঠ হেসে!
সকল গানের মাঝে
তব গান শুমি!
সকল গণনা মাঝে
তোমারেই গুণি!
ওগো তুমি মালাকর
মন-মালিকার!
সাথী তুমি, সাক্ষী তুমি
সব সাধনার!

এইরূপে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াও জীব তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠে।

কোথা তুমি কোথা তুমি এ যে অন্ধকার সব?

কিন্তু তথাপি তিনি যে আছেন, এবং অতি নিকটেই আছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে—

* * * *

কে যেন কহিছে কথা হৃদয় মাঝারে!
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে!

* * * *

যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরিছি জীবন।
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু! বুঝিতে পারিনি।

তাঁহাকে না পাইয়া অস্থির হইয়া সাধক তখন বলে,—

দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক!—
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক?

এইরূপ ব্যাকুলতা লইয়া সাধক সাধনার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সহজ নহে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া সাধককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। কবি তাঁহার অপূর্ব্ব বর্ণ-তুলিকায় এই সব অবস্থা অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রথম প্রভাতে সেই বাহিরিনু যবে,

তোমার মোহন ওই বাঁশরীর রবে,
সেদিন হইতে বঁধু!—আলোকে আঁধারে
ফিরে ফিরে চাহিয়াছি পরাণের পারে।
তোমারে পেয়েছি কি গো? তা ত মনে নাই!

জীবাত্মার যখন প্রথম জন্ম হইল, তখন অবধিই সে পরমাত্মার দিকে ছুটিয়াছে। সকল কার্য্যে, সকল ভাবে, সে কেবল তাহাকেই চাহিয়াছে। শৈশবের খেলায়, যৌবনের প্রমোদে, সুখে দুঃখে, সর্ব্বদাই এবং সকলের মধ্যেই সে তাহার অন্তর্যামীকে খুঁজিয়াছে।

প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল সনে আপনা বিকাই!

* * * *

সুখের মাঝারে সুধু সুখ খুঁজি নাই!
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু;

এটী খাঁটী হিন্দুর ভাব। হিন্দুরা ধর্ম্মকে জীবনের অন্যান্য কাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। ইউরোপীয়েরা তাহা করিয়াছেন। তাঁহারা সাংসারিক কার্য্য ও ধর্ম্মের মধ্যে একটা অনাবশ্যক ও কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহা নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং তাহার এক বিভাগে ধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা সমগ্র জীবনের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্ম-সাধনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইতে শয়ন পর্য্যন্ত, যাহা কিছু করা হয়, তাহা সমস্তই ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে প্রাচীন হিন্দুগণ উপদেশ দিয়াছেন। ভোগেও ধর্ম্ম সাধন করা যায়; সুতরাং আমোদে প্রমোদে, সুখে দুঃখে, এক কথায়, সংসারের সমস্ত কার্য্যেই তাহাকে খোঁজা যায় ও পাওয়া যায়। এই তত্ত্বটী কবি এইখানে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। *

কিন্তু এই ভোগের একটু বিশেষত্ব আছে। ভোগের মধ্যেও তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং তাঁহাতেই আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। তাই কবি বলিয়াছেন—

বঁধু হে! বঁধু হে! আমি তোমাকেই চাই!
যে পথেই লয়ে যাও, সে পথেই যাই!

কিন্তু সাধনার পথ যে একেবারেই ক্লেশকর নহে এরূপ নহে। যাঁহাকে পাইতে চাই, তাঁহাকে যদি না পাই, তবেই ক্লেশ উপস্থিত হয়, এবং নৈরাশ্য আসে। এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় সাধকের মাঝে মাঝে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, এবং সাধক সময়ে সময়ে অভিমান করিয়া থাকে।—

তোমার প্রেমে এত জ্বালা, আগে নাহি জানি!
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি।
ছেড়ে দাও ত চলে যাই, তুমি থাক পিছে।
দরশ যদি নাহি দিলে, সোহাগ করা মিছে!

---

* শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার তদীয় "বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম-শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "মানবের চরম সিদ্ধি এবং আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশের উপায় আবিষ্কার করিয়া দেয় ধর্ম্ম। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্ম-রাশির মধ্যে ধর্ম্ম অসীমকে প্রতিষ্ঠিত করে। * * তাহার ফলে পার্থিব জীবনের সকল বিভাগই, সংসারের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই, ভোগের সকল অনুষ্ঠানই সেই বৃহত্তর সত্ত্বা সেই অতীন্দ্রিয় জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্ম্ম এই উপায়ে সসীমে অসীমের প্রতিষ্ঠা করে, ভোগে ত্যাগের প্রবর্ত্তন করে, জন্ম ও মরণে অমৃতেরপ্রভাব বিস্তার করে।'

কিন্তু প্রকৃত সাধকের এই অভিমান ক্ষণস্থায়ী হয়; পর-ক্ষণেই অনুতাপের উদয় হয়।

ক্ষম অভিমান বঁধু ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান!

এই অনুতাপ কবি এরূপ কাতরতা-পূর্ণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, যে পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। যে এ বেদনা অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বলিয়াই আমাদের মনে হয়:—

আমি কাঁদিব না আর, কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ে রব।
কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে,
পরাণ কেমন করে, পরাণি তা জানে,
রাগ করিও না বঁধু! আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে।

তারপর পুনরায় সেই নির্ভরশীলতা এবং সেই আত্ম-সমর্পণ; কিন্তু এবার উহা আরও মধুর এবং আরও গভীর:—

এই অশ্রু এই ব্যথা এই হাহাকার
(তুমি না লইবে যদি, কারে দিব আর?)
মরম আঁধারে বঁধু! প্রদীপ জ্বালাও!
আমার সকল তারে বাজাও বাজাও;
আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব!
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

শেষ ছত্র দুটী কেমন সরল অথচ কেমন গভীর ভাব-দ্যোতক!

এই কাতর আগ্রহ ও সরল আত্ম-সমর্পণের ফলে সাধক আরও কিছু অগ্রসর হইলেন; ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকর কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইল, সাধক দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলেন কিন্তু সে দৃষ্টি এখনও কতক তমসাচ্ছন্ন—

কো[illegible]য়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে,
এমন সোহাগ ভরে প্রদীপ জ্বালালে।
ওগো ছায়ারূপী! কোন ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি, হৃদি-তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে?

দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু এখনও স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছে না—

কোথা ওই ছায়ালোক কোথা প্রাণখানি!
এই প্রাণ প্রান্ত হ'তে কতদূর জানি!
কত দূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই!
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!

এই অস্পষ্ট আলোকে সাধকের নিকট তাহার সাধনার লক্ষ্য প্রথম পরিচিত হইল, এই ছায়ালোকে তিনি এক মন্দির দেখিতে পাইলেন। এই মন্দিরের বর্ণনাও মধুর ও ভাব-গম্ভীর। পার্থিব কোন জিনিষের সহিত উহার সাদৃশ্য নাই, কারণ ইহা অপার্থিব। পরস্পর-বিরোধী অনেক লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান। অথবা, ইহা কেবলমাত্র অনুভূতির জিনিষ, ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা কঠিন; ভাষায় ইহাকে সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; সে চেষ্টা করিলে ইহার অনেক লক্ষণ পরস্পর বিরোধী ও ধারণার অতীত বলিয়া মনে হইবে।

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!
অপূর্ব্ব আলোক ভরা অন্ধকারে ঢাকা
*　　*　　*　　*
নাহি বৃক্ষ তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া।—
*　　*　　*　　*
নাহি চন্দ্র! নাহি সূর্য্য! কি যে স্বপ্ন ভরে

উজলি রেখেছে তারে, সে কোন্ গগন !

* * * *

বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা আনন্দে গম্ভীর
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির !

এই লক্ষ্য দেখিয়া সাধক উন্মত্ত হইলেন। ইহাকেই সাধনার চরম লক্ষ্য ভাবিয়া সাধক ইহা পাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন। কোন পথে এই মন্দিরে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা বাহির করিবার জন্য সাধক আকুল হইলেন। চিত্তের ঐকান্তিক একাগ্রতা এবং দৃঢ়তা না থাকিলে এই পথ পাওয়া ভার ! সাধকের এই অবস্থা, —পথ পাইবার জন্য ব্যাকুলতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মনোহর ভাষায় কবি বর্ণনা করিয়াছেন

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর।
আমার অন্তর আত্মা, বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে !

* * * *

পথখানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,
যেমন করেই হোক, যাব আমি যাব !

তারপর—

এদিকে ওদিকে চাই চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই পথের সন্ধানে !

* * * *

নিশ্বাস ফেলিয়া বলি, কতদূর জানি,
এই প্রাণ প্রান্ত হ'তে সেই পথখানি

* * * *

মন মাঝে এক সুরে বাঁশী বাজে ওই !—
কোথা পথ কোথা পথ কই পথ কই

সাধক সব ভুলিয়া এক পথের জন্যই পাগল হইয়াছেন—

সব আশা ঘুচে গেছে ! একটা আশায়
ভূলুণ্ঠিত প্রাণলতা আকাশে দোলায় !
সব শক্তি সব ভঙ্গি যা কিছু আমার
এক সুরে প্রাণ মাঝে কাঁদে বার বার !

তার পর কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও মর্ম্মস্পর্শী—

সে পথের হইতাম ধূলিকণা যদি !
আঁকড়িয়া থাকিতাম তারে নিরবধি।

* * * *

সে পথের পথিকের পদতলে বাজি
মিশে মিশে হইতাম পদ-রজ-রাজি

* * * *

একদিন অকস্মাৎ কম্পিত পরাণে
তারি পায়ে উঠিতাম মন্দির সোপানে !

ইহা প্রকৃতই বৈষ্ণবীয় বিনয়। সাধুজনের চরণের ধূলা হইয়া দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করা, কত বড় বিনয় এবং কত বড় ভক্তির কথা ! বাস্তবিক এই কবি প্রাচীন বৈষ্ণব কবি-দিগেরই বংশধর। ইঁহার কবিতা অনেক স্থলেই চৈতন্যযুগের সেই ভক্ত কবিদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইরূপ ব্যাকুল দীনতা ও গভীর ভক্তি ব্যর্থ হইতে পারে না। সাধক অবিলম্বেই প্রার্থিত পথের সন্ধান পাইলেন—

একি ? একি ? ওই বুঝি সেই পথ ভূমি !
মনমাঝে ঢেকে ঢেকে রেখেছিলে তুমি !

পথের সন্ধান পাইয়া সাধকের কতই বা আনন্দ—

সব সুখ একেবারে ফুটিবারে চায় !
সব দুঃখ গীত হ'য়ে পরাণে মিলায় !

কিন্তু সাধনার পথ বড়ই বিপদ্‌সংকুল। পদে পদে পতনের

সম্ভাবনা। সাধক পথের সন্ধান পাইয়া বিজয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছেন—

বাজা রে বাজা রে তবে! বাজা জয়ডঙ্কা
নাহি লাজ নাহি ভয়, নাহি কোন শঙ্কা!

এই উল্লাসের আতিশয্য স্বল্পাক্ষরে অথচ অতি সুন্দরভাবে কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

সুখের মত দুঃখ আজ, দুঃখের মত সুখ!
কোন গানের গরবে ওগো ভরিয়াছে বুক?

এই বিজয়োল্লাসে অহঙ্কার না আসিয়া পারে না—

পায়ের তলে বাজে পথ! প্রাণ আজিকে রাজা!
বাজা রে বাজা রে তবে, জয়ডঙ্কা বাজা!

এই গর্ব্বই সর্ব্বনাশের মূল। ইহাতে চিত্ত বিভ্রান্ত না হইয়া পারে না। সাধকেরও তাহাই হইল। সাধক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—

হাল হারাণ তরীর মত ভাস্‌ছি অবিরত!

তারপর পুনরায় সেই করুণ ক্রন্দন, সেই ব্যাকুল প্রার্থনা—

তোমার আছে অনেক গান, একটী গান গাও!
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও!

সাধক পরিশেষে সেই সাধনমন্ত্র পুনরায় লাভ করিয়া মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাধনার পথ যে কণ্টকময়, এবং প্রথম প্রথম সাধক যে তপঃক্লেশে পীড়িত হইয়া পড়ে, কবি তাহা এই স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই জ্বালা প্রকৃত সাধকের ভক্তির তীব্রতা বাড়াইয়া দেয়। কবির এই বর্ণনাও বড়ই হৃদয়গ্রাহী—

তোমার পথে এত কাঁটা! আগে নাহি জানি!
আপন হাতে যাহা দেও, তায় ভাগ্য মানি!
একটুখানি সোহাগ দিও, দিও জ্বালাতন!
একটুখানি পরশ দিও, হোক না কাঁটাবন!

কিন্তু সাধনার পথ যে কেবল ক্লেশময় তাহা নহে, উহা বিঘ্নময়ও বটে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, সাধক যখন সিদ্ধিলাভের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখে। ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি আসিয়া তাহাকে ভয়-প্রদর্শন করে এবং সাধনার পথ হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করে।

কবি দেখাইয়াছেন যে, ইহা শুধু গল্প নয়। মানুষকে তাহার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্ম-ফলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই, অথচ তাহার নাশ না হইলে সিদ্ধিলাভও অসম্ভব। সেই জন্য সিদ্ধিলাভের প্রাক্‌কালে এইগুলি সাধকের পীড়া জন্মায়—

সেদিনের গানগুলি মনে করেছিনু
গাওয়া হলে সব বুঝি শেষ হয়ে যাবে।
হৃদয় উজাড় করি সকলি ঢালিনু!
কে জানিত তারা পুনঃ হৃদয়ে লুকাবে!
ওই ওই ওই সেই ব্যর্থ ভালবাসা!
দীর্ণ হৃদয়ের সেই, প্রমত্ত পিপাসা!
ওই ওই ওই আসে মোর পানে চেয়ে
ভীষণ ভৈরব দল ওই আসে ধেয়ে।

এই ভয়ে বিচলিত হইলে সাধকের বিপদ্‌। তখন সেই ভক্ত-ভয়-হারীর শরণ ভিন্ন গতি নাই।

এস আমার আঁধার ঘেরা! এস ভয়হারী!
এস এস হৃদ্‌-মাঝারে, হৃদয়-বিহারী।

এই শেষ প্রার্থনাটিও বড় হৃদয়-স্পর্শী। ইহার পরই কবি গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। সাধক মন্দিরে পৌঁছিতে পারিল কি না এবং মন্দিরে পৌঁছিয়া শান্তিলাভ করিতে সমর্থ

হইল কি না, কবি তাহা এই কাব্যে বর্ণনা করেন নাই। এই জন্যই আমরা এই কাব্যকে সাধনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। এইরূপ কাব্য আমরা অল্পই পাঠ করিয়াছি। আজকালকার কাব্যে কেবল ভাষার বাহাদুরী। এমন ভাষায় কাব্য লিখা হয়, এবং এমন ছন্দে তাহা রচিত হয় যে, কাব্য বোঝা ত দূরের কথা, পাঠ করাই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। আবার কোন কোন কবিতায় কেবল তত্ত্বেরই ছড়াছড়ি দেখা যায়। কবিত্বের সঙ্গে সম্পর্ক নাই; কবি যেন একজন প্রচারক। একটা তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য একটা প্রবন্ধ না লিখিয়া অনেকে একটা কবিতা লিখাই সঙ্গত মনে করেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে উপলব্ধি বা অনুভূতি ভিন্ন কাব্য হয় না। যাহা ব্যক্ত করিতে চাই, তাহা প্রাণে অনুভব করা চাই;—তবেই কাব্য-রচনা সার্থক হইতে পারে। কিন্তু প্রাণে কিছু অনুভব না করিয়া কেবল বুদ্ধি খাটাইয়া একটা কবিতা খাড়া করিলে তাহা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। উহা একরূপ মানসিক ব্যায়াম মাত্র। এই জন্য আধুনিক কবিতা পাঠ করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয় যে এই কাব্য সেই জাতীয় নহে। ইহার প্রত্যেক কথা কবিহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ কাব্য পাঠে হৃদয় সরস ও স্নিগ্ধ হয়। ভাষা-জননীর কণ্ঠ এক অপূর্ব্ব মাল্য দামে ভূষিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা এই কবিকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করিতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

সমালোচনা

পশু-চিকিৎসা। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস প্রণীত। পুস্তক খানি ১১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ক্ষুদ্র হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা এক অভিনব গ্রন্থ। এই স্বল্প পরিসরে গ্রন্থকার যে পরিমাণ জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়। পশ্বাদির রক্ষণাবেক্ষণ, তাহাদের খাদ্য বিচার, বয়স নির্ণয়ের উপায়, তাহাদের পীড়ার লক্ষণ, ভেদ ও প্রতীকার প্রভৃতি অতি সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গো, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সম্বন্ধে নানাতথ্যপূর্ণ এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বিরল, এবং প্রত্যেক গৃহস্থেরই গ্রন্থাগারে ইহার একখানি সাদরে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার স্বীয় অভিজ্ঞতার উপর এই পুস্তকের ভিত্তি স্থাপন করায় ইহা আরো মূল্যবান হইয়াছে। পুস্তকের রচনা-প্রণালীতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

মার্কিন যাত্রা। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার বি, এ, এম্, এস্‌সি, (কর্ণেল, নিউইয়র্ক) প্রণীত। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, "সবুজপত্রের" সম্পাদক, ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রন্থকার ছাত্র-বেশে ইয়ুরোপ, আমেরিকা দর্শন করিয়াছেন, এবং নানা দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া, নানা চরিত্রের লোকের সহিত স্বয়ং মিশিয়া যে চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাতে নিপুণ তুলিকার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার কারুকার্য্যের প্রযত্ন নাই, অথচ লিখিত বিবরণগুলি উপন্যাস হইতেও হৃদয়-গ্রাহী। গ্রন্থকার সবিনয়ে লিখিয়াছেন, 'বহিখানি পড়িয়া দুই একজন পাঠকও তৃপ্তিবোধ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব"। আমরা মনে করি, গ্রন্থকার বাঙ্গালীকে যে উপহার প্রদান করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী পাঠক সাদরে গ্রহণ করিবে। গ্রন্থকারের মার্কিনের লোক-চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি, বীক্ষণপরতার উত্তম নিদর্শন।

'তপোবন'। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত কবিতা পুস্তক।

জীবেন্দ্র বাবু বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার সরস কোমল গীতির ঝঙ্কার বঙ্গবাসী অনেক দিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছেন। গিরিনদী-সঙ্কুল, সাগর-চুম্বিত চট্টল-ভূমি কবি-জননী। কবি প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির অধীশ্বরকে নিরন্তর অনুভব করেন, তাই তাঁহার কাব্যে দেব-মন্দিরে ধূপ-গন্ধের মত এক অনুপম পবিত্র সুরভি

নিয়তই বিরাজ করে। বর্ত্তমান পুস্তকে "মাতৃভূমির প্রতি" ও "পল্লীমাতা" কবিতা দুইটী দেশ-ভক্তির ললিত মধুর উচ্ছ্বাস। "স্বয়ম্বর" কবিতাটী আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন এমন মধুর ভাবে বুঝি আর কোনও কবি বর্ণনা করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় কবির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা অপেক্ষা, "কিসা গোতমী", "রুরু ও প্রমদ্বরা" প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীগুলি "আলো ও ছায়া" প্রণেত্রীর দীর্ঘ কবিতাগুলির ন্যায় মনোহর। ভাষা প্রাঞ্জল অথচ ললিত।

'মাধবী'। ৺ হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত।

এই মহিলা কবি আর ইহ-জগতে নাই। 'মাধবী' মাধবের চরণে তাঁহার শেষ পুষ্পাঞ্জলি। এ কবিতাগুলি আদ্যোপান্ত ভগবৎ-ভক্তি-প্রণোদিত। ইহার বর্ণিত বিরহ পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা। ইহার মিলন-গীতি স্রষ্টা ও সৃষ্টের আত্মিক মিলন-কাহিনী। ভাষা যেন কবির সেবাসঙ্গিনী অথবা নর্ম্ম-সখী। যে ভাব যখনই হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, ভাষা তখনই সে ভাব বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা দুই একটী উদাহরণ দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"ওই বুঝি শোনা যায়
প্রাণমনহারী শ্যামের বাঁশরী।
"রাধা, রাধা' বলে গায়।
ভকতের পূত অশ্রু-হিমনীরে
অবগাহি ঊষা রাণী,
আসিছেন যেন উড়ায়ে সুধীরে
কনক আঁচলখানি।
গাহে মাঙ্গলিক পিক কুল-বধূ
দেয় 'হুলু' নির্ঝরিণী,
কুলু কুলু তালে বাজায় বাজনা
তালে তালে তরঙ্গিণী॥"

অথবা,

"আজি বেধেঁছি ভগন প্রাণ!
কানু নাই বলে, নয়নের জলে
না গাব করুণ গান!
রহে কুমুদিনী সরসী-সলিলে
সুদূরে চাঁদিমা বিশাল সুনীলে
তা'ব'লে কি কভু ছাড়াছাড়ি দোঁহে'
নাহি কি প্রেমের টান?"

এ অহেতুকী ভক্তি বাঙ্গালী কবির নিজস্ব, এবং এই মহিলা কবির রচনায় দিব্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু হায়! অকালে বঙ্গ-সাহিত্য-কাননের এই অম্লান কুসুমটী শুকাইয়া গিয়াছে!

"প্রণয়-প্রলাপ"। শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত।

সরস প্রেম-গীতি-বহুল বাঙ্গালা সাহিত্যে এ নিরর্থক কবিতাগুলির কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া তো মনে হয় না। আগা গোড়াই খালি প্রলাপ বকা। সে অর্থে "প্রণয় প্রলাপ" সার্থক-নামা গ্রন্থ। এক অজ্ঞাত বেহালা-বাদকের কতকগুলি প্রলাপ মনস্তত্ত্ব-বিদের নিকট বৈজ্ঞানিক হিসাবে আদরণীয় হইতে পারে; কিন্তু ললিত-কলা হিসাবে উহা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। লেখক কেবল অনুবাদক নহেন, ভাষ্যকারও বটেন। নানা দেশীয় প্রেম-তত্ত্বে তিনি বিশেষজ্ঞ বলিয়াই নমুনা দেখিয়া বোধ হইল। কিন্তু সভাষ্য সটীক এই প্রেম দর্শন কেহ হৃদয়ঙ্গম করিবে বলিয়া আমাদের মোটেই ভরসা হয় না। বৈষ্ণব প্রেম-গাথা-মুখরিত বঙ্গভূমিতে বেহালা বাদকের এই উন্মত্ত প্রলাপ সভাষ্য সটীক হইলেও নিতান্তই হাস্যাস্পদ। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এমন একটী লাইন দেখিলাম না যাহাতে এই অনুবাদের পণ্ডশ্রম সমর্থিত হইতে পারে।

শ্রীকা

জড় ও চৈতন্য *

বক্তব্য বিষয়—আমার অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় চৈতন্য বা চিৎ এবং জড় বা অচিৎ; বিকারশীল রূপ এবং নির্ব্বিকার অরূপ। আমরা জড় ও চৈতন্য, চিৎ এবং অচিৎ, উভয়ই; আমাদের অন্তরাত্মা চিৎশক্তির বিকাশ এবং আমাদের জড় আধার,—দেহ এবং অন্তঃকরণ (mind),—পরিচ্ছিন্ন মায়া শক্তির বিকাশ।

বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা

অদ্য আমি আপনাদের সমক্ষে অন্যান্য অনেক বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারিতাম; কিন্তু তথাপি যে আজ এই বিষয়টি নির্ব্বাচিত করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম্মের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য এই দুইটী বিষয় চাবী স্বরূপ। যদি এই দুইটী ভাবের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে,—কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যতদূর সম্ভব,—সমস্ত তত্ত্বই ততদুর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। এই দুটী তথ্য বুঝিতে না পারিলে কিছুই উপযুক্ত রূপে বুঝা হইল না। যাঁহারা ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে লেখনী-চালনার স্পর্দ্ধা করেন তাঁহারা সকলেই যে উহা বুঝিয়াছেন এরূপ বলা যাইতে পারে না। একজন ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের বেদান্ত দর্শন সম্পর্কিত একখানা গ্রন্থের সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এক খণ্ড লোষ্ট্র বা অন্য কোন জড় পথার্থের অবস্থাকেই 'চিৎ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদপেক্ষা হাস্যজনক ভ্রম সহজে কল্পনা করা যায় না। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের ক খ পর্য্যন্ত শিক্ষা করেন নাই। শাস্ত্রে যোগীর অবস্থা 'কাষ্ঠবৎ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নয় যে তাঁহার চৈতন্য একখণ্ড কাষ্ঠের মত। ইহার অর্থ এই যে কাষ্ঠ যেমন বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে না, (সমাধিপ্রাপ্ত) যোগীও সেরূপ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুভব করেন না। তাহার কারণ এই যে যোগীর সমাধি চৈতন্য উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি জ্যোতিঃ স্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন।

আলোচনা প্রণালী

আজ আমি এক গভীর তত্ত্বের মাত্র বহির্ভাগের আলোচনা করিতে সমর্থ হইব। এ বিষয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যার জন্য ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রয়োজন এবং ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বহুবর্ষব্যাপী চিন্তার আবশ্যক।

প্রথমতঃ, আমি এই বিষয় বিজ্ঞানের দিক দিয়া আলোচনা করিব। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই তত্ত্বের স্বরূপ কি তাহা ব্যাখ্যা করিব। তৃতীয়তঃ, সাংখ্য দর্শনে, এবং বেদান্ত মতের দুই অঙ্গ,—মায়াবাদ ও শক্তিবাদে, ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বুঝাইব।

তন্ত্রশাস্ত্র ও তাহার অভ্যুদয়ের কারণ

আমি আজ যে শক্তিবাদের আলোচনা করিব তাহা তন্ত্র হইতে গৃহীত। কিন্তু তন্ত্র কথাটী কেবল শাক্ত তন্ত্রে নিবদ্ধ নহে। আমি এই জন্য আগম শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয়স্কর মনে করি; কারণ তাহা হইলে এই ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তন্ত্রই আগম এবং আগমই তন্ত্র। এই রূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে ঔপনিষদিক যুগের অবসানে আগম শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছিল। আগম উপাসনা কাণ্ডের শাস্ত্র; সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাই এই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ইহাও অনুমান করা হইয়া থাকে যে, বৈদিক আচারের পতন এবং তৎসহ বিরোধই আগম শাস্ত্রের অভ্যুদয়ের এক কারণ; এবং হিন্দুসমাজে বৈদিক আচারের অনধিকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাহাদের জন্য কোন না কোন প্রকারের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করার আবশ্যকতাবোধই উহার অন্যতম

* ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে (১৩২৩) ঢাকা সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে মাননীয় জষ্টিস সার জন্ উড্রফ মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশের অনুবাদ। তিনি স্বয়ংই সার সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন।—প্র, স।

কারণ। এই শাস্ত্রের এক সাধারণ লক্ষণ এই যে ইহার শিক্ষা সকল জাতির পুরুষ এবং রমণীর জন্যই উদ্দিষ্ট। এই শাস্ত্রে এই উদার মত প্রচারিত হইয়াছে যে মনুষ্যে মনুষ্যে সামাজিক পার্থক্য যাহাই থাকুক না কেন, ধর্ম্মের পথ সকলের নিকট সমান উন্মুক্ত; এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুসারেই ধর্ম্মরাজ্যে মনুষ্যের স্থান নির্দ্দেশ করা সঙ্গত; জাতিনির্দ্দেশক বাহ্য চিহ্ন দ্বারা তাহা করা সঙ্গত নহে।

তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

আগম শাস্ত্রে ঈশ্বর তিন আকারে পূজিত হইয়া থাকেন—বিষ্ণু, শিব, এবং শক্তি। কাজেই আগম বা তন্ত্র তিন শ্রেণীর—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। যথা, পঞ্চরাত্র আগম প্রথম শ্রেণীর; অষ্টবিংশতি তন্ত্র সম্বলিত শৈব সিদ্ধান্ত, নকুলীশপাশুপতম্ ও কাশ্মীরের ত্রিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর; এবং কৌল, মিশ্র ও সময় নামক ত্রিধা বিভক্ত তন্ত্রসমূহ তৃতীয় শ্রেণীর। আমি এই শেষোক্ত ত্রিধা বিভাগ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না। আগম শব্দ দ্বারা আমি কি বুঝি, তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই ইহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু আমি যে শক্তিবাদ আজ মায়াবাদের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিব তাহা শাক্ত আগম হইতে গৃহীত। মায়াবাদ বলিতে শঙ্করকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে।

হিন্দু দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য

এই ক্ষণ আমি এই বিষয় বিজ্ঞানের দিক দিয়া আলোচনা করিব। আমি দেখাইব যে তিনটি প্রধান বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের মত সমর্থন করে। বস্তুতঃ মিষ্টার লুএস ডিকিন্‌সন্ (Lewes Dickinson) অল্প দিন হয় চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের চিন্তা-জগতের যে এক মর্ম্মগ্রাহী সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম্মের সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহজে সামঞ্জস্য হয়। ইহাতে এরূপ প্রমাণিত হয় না, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যে সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম্মের মিল আছে, সেগুলি সত্য। ঐ গুলিও প্রমাণসাপেক্ষ সন্দেহ নাই কিন্তু যাহারা মনে করেন যে, প্রাচ্য দর্শন কোনরূপ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহাদের মত খণ্ডনের জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাচ্য দর্শনে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সে সমস্ত সিদ্ধান্তের আমি উল্লেখ করিতেছি তাহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, এরূপ উভয় শ্রেণীর লোকের নিকটই উপরি উক্ত বিষয়টী সমান প্রয়োজনীয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জড়বাদ ও
বেদান্তের মায়াবাদ

প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের জড়পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া জড় পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। তাঁহারা পরমাণু এবং তদ্দ্বারা গঠিত সমগ্র বিশ্বের জড়ত্ব নিরাকৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বে জড়, ঈথার এবং বিদ্যুৎ, এই বৈজ্ঞানিক ত্রিমূর্ত্তির সাহায্যেই জড় জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু এখন তিন কমিয়া এক হইয়াছে। তাহার নাম স্পন্দনশীল ঈথার। ঈথার কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে জড় পদার্থ নহে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই জগৎপ্রপঞ্চ ভূত-সমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ভূতসমূহ আদিতে আকাশ হইতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ঈথরই আকাশ, আমি এরূপ বলি না। কারণ আকাশ পদার্থ ভিন্ন জাতীয় চিন্তা-প্রণালীর অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন, স্থূল আকাশ সূক্ষ্ম আকাশতন্মাত্র হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং আকাশকেও মূল পদার্থ বলা যায় না। কিন্তু এই সামঞ্জস্যটী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশেই স্থূল জড়জগৎ একটি মাত্র পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, এবং সেই পদার্থটীও জড় পদার্থ নহে। ফলতঃ, জড় পদার্থের জড়ত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, এবং ভারতীয় মায়াবাদের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এমন একটি সীমা আছে যাহার পরে অন্তঃকরণের ক্রিয়া আর বহির্ম্মুখী হইতে পারে না। কাজেই তন্মাত্রের অন্তঃকরণ অন্তর্ম্মুখী হয়, এবং যে অহঙ্কার (Egoism) ভোগ জগতের সংস্পর্শে আসিয়া, মন, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়ীভূত পদার্থ-সমূহের সৃষ্টি করে, সেই অহঙ্কারেই

তন্মাত্রের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করে। অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় যে জড়-পদার্থাত্মক তাহা কোন কোন পাশ্চাত্য দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে; যথা, হার্ব্বাট স্পেনসার (Herbert Spencer)। তাঁহার অভিমত এই যে ভৌতিক ও মানসিক এই উভয় ধর্ম্ম বিশিষ্ট বিশ্ব কেবল শক্তির (Force) ক্রিয়ার ফলমাত্র এবং শক্তির যে জাতীয় ক্রিয়ার ফল জড়ত্ব তাহাই আমাদের নিকট পদার্থ রূপে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, অন্তঃকরণ প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্ক ও বহিরিন্দ্রিয়াদির ন্যায় জড়-পদার্থাত্মক ইন্দ্রিয়। তবে বিশেষ এই যে মস্তিষ্কাদি, শক্তির এক জাতীয় ক্রিয়ার ফল এবং অন্তঃকরণ উহার আর এক জাতীয় ক্রিয়ার ফল। স্পেনসারের মত এই যে বৈজ্ঞানিক জড় পদার্থ বিশ্বশক্তির ক্রিয়াফলের প্রতিভাস মাত্র এবং অন্তঃকরণও সেই শক্তি-ক্রিয়ার ফল। সাংখ্য ও বেদান্তের মতও ঠিক তাহাই। এখানেও মায়াবাদের পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু স্পেনসার এবং অজ্ঞেয়বাদীদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত সত্তা মানবের অজ্ঞেয়; কিন্তু বেদান্তের মত এই যে উহা জ্ঞেয় এবং উহাই চৈতন্য। ইহাই সেই আত্মা যাহা অপেক্ষা আর কিছুই ঘনিষ্ঠতর ভাবে জানিতে পারা যায় না। শক্তি অন্ধ। কিন্তু এই বিশ্বে আমরা চৈতন্যের সন্ধান পাই। আদি কারণ যদি, হয় জড়, না হয় চৈতন্যময় হয়, পরন্তু জড় ও চৈতন্য উভয়ের লক্ষণাক্রান্ত না হয়, তবে এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে উহা জড় নহে, পরন্তু চৈতন্যময়। জড় চৈতন্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে; কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান নিতান্তই অসঙ্গত। ভারতীয় দর্শনে যে পরমাত্মা বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ চৈতন্য। ইহাই নিষ্কল শিব; এবং স্রষ্টৃরূপে তাহাই মহাশক্তি বা মহাদেবী। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ, ভারতীয়েরা যে অর্থে শুদ্ধ চৈতন্য শব্দের ব্যবহার করেন, সে অর্থে শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের বৈষয়িক চক্ষে চৈতন্য সর্ব্বদাই পরিচ্ছিন্ন এবং পরিচ্ছিন্ন আকার ও প্রকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু মায়ার জন্যই চৈতন্য এই বিশেষত্বের অধীন হয়। চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ এবং চৈতন্যের বিবিধ প্রকার বা বিধা, এই দু'য়ের পার্থক্যটুকু বুঝিতে হইবে। অনুভূতি, হর্ষদুঃখাদি ভাব, সহজ সংস্কার, ইচ্ছা বা বিচার-শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের চৈতন্যের অন্তরালে এক অখণ্ড চৈতন্য বর্ত্তমান। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যের অস্তিত্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্রই, সর্ব্ববিধ উচ্চ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই প্রদান করে, যে বিভিন্ন আকার ও পরিমাণের মধ্যে একত্বেরই অনুভূতি হইয়া থাকে। এমন কি স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় এবং অস্বাভাবিক রুগ্ন অবস্থায় সময়ে সময়ে আমাদেরও নির্ব্বিশেষ অখণ্ড চৈতন্যের অনুভূতি হয়।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ও হিন্দু দর্শন

দ্বিতীয়তঃ, আজকাল মনোবিজ্ঞানে যে 'মগ্নচৈতন্যের' (Subliminal consciousness) আবিষ্কার হইয়াছে তাহা দ্বারাও এই শাস্ত্রীয় মতবাদ সমর্থিত হয়, যে আমাদের স্ফুট চৈতন্য বা জ্ঞানের অন্তরালে এক দুর্জ্ঞেয় রাজ্য আছে যথায় উহার কার্য্য আরব্ধ হইয়া থাকে। এইখানেই বুদ্ধির অভিব্যক্তি হয়। সম্মুখস্থিত বা দূরস্থ লোকের মনোভাব জানিবার ক্ষমতা এবং বশীকরণ (Hypnotism) প্রভৃতি নানাপ্রকার অতিলৌকিক ক্ষমতা (Occult Powers) আজকাল একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। যে মতবাদের (hypothesis) দ্বারা সেগুলির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে তাহার সহিত ভারতীয় দর্শনের যেরূপ সাদৃশ্য আছে পাশ্চাত্য কোন দার্শনিক মতবাদের সহিতই তাহার তদ্রূপ সাদৃশ্য নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক সাড়া ও হিন্দুদর্শনের সত্ত্বগুণ

তৃতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এক্ষণ স্বীকৃত হইয়াছে যে এক আদি উপাদান কারণ হইতে রূপপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বিশ্বের তাবৎ পদার্থেরই জীবন আছে। প্রকৃতির বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের

মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বর্ত্তমান নাই। সকলের মধ্যেই সেই জড় ও চৈতন্য বর্ত্তমান। প্রাণ শক্তি এক। মৃত পদার্থ বলিয়া জগতে কিছুই নাই। নিৰ্জ্জীব পদার্থও নাড়া পাইলে সাড়া দেয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসুর পরীক্ষাগুলি ইহা প্রমাণিত করিয়াছে। বেদান্তে এবং সাংখ্যে সজীব নিৰ্জ্জীব উভয় জাতীয় পদার্থেই সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে; বিজ্ঞানের ঐ সাড়া সেই সত্ত্বগুণের অস্তিত্বেরই ইঙ্গিত করে না কি? এই সাড়া সত্ত্বগুণের মধ্যে চিৎ বা চৈতন্যেরই ক্রিয়া মাত্র; এই সত্ত্বগুণ তমোগুণের দ্বারা এইরূপ ভাবে আবৃত হইয়া থাকে যে তাহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যতীত প্রকট হয় না। ইহাই তথাকথিত যন্ত্রজনিত (Mechanical) সাড়া বলিয়া প্রতিভাত হয়। চৈতন্য এইস্থানে তমোগুণের দ্বারা আবৃত এবং আবদ্ধ হইয়া থাকে। নিৰ্জ্জীব পদার্থে এই সত্ত্বগুণ অস্পষ্ট অনুভূতি রূপে প্রকাশিত হয়। এবং ইহাই নিতান্ত নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে সুখদুঃখের প্রাথমিক বিকাশ রূপে পরিণতি লাভ করে এবং পরিশেষে ইহাই মনুষ্যের মধ্যে পরিপুষ্ট আত্মজ্ঞানমূলক অনুভূতি রূপে বিকশিত হয়। সর্ব্বত্রই সেই এক চৈতন্য। কেবল মাত্র বাহ্য আবরণেরই পরিবর্ত্তন হয়। এই রূপে দেখা যায় যে স্থূল জড়পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ ও নিম্নশ্রেণীর জন্তুর মধ্য দিয়া চৈতন্যের ক্রমোন্নতি হইতে হইতে অবশেষে মনুষ্যের মধ্যে তাহার পূর্ণতর বিকাশ হয়। ছয় লক্ষ (?) জন্মে এই পরিণাম সংঘটিত হয়, ভারতীয় ধর্ম্মে এই তত্ত্বই বুঝান হইয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্রানুসারে উদ্ভিদেরও একপ্রকার সুপ্ত চৈতন্য আছে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে উদ্ভিদেরও দৃষ্টি শক্তি আছে এবং তৎসাহায্যে উহারা আলোকের দিকে অগ্রসর হয়। উদ্ভিদের দৃষ্টিশক্তি আছে এ কথা বলিলে কয়েক দিন পূর্ব্বেও লোকে উপহাস করিত; কিন্তু অল্পকাল হয় সুবিখ্যাত উদ্ভিদশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক হেবারল্যাণ্ড (Haberlandt) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্ভিদেরও দর্শনেন্দ্রিয় আছে; পত্রের উপরিভাগে মুক্তপৃষ্ঠ কাচের পরকলার ন্যায় উহা অবস্থিত। নিম্নশ্রেণীর জন্তুর চৈতন্য উচ্চতর জাতীয়, কিন্তু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। মনুষ্যের চৈতন্য চিন্তাশক্তি রূপে বিকশিত হয়। কিন্তু এই চিন্তাশক্তি চৈতন্যের পরিণতি, পরন্তু উহার ভিত্তি নহে। আমরা জাগ্রত এবং স্বপ্নাবস্থায় যে বিবিধ প্রকারের চৈতন্যের সন্ধান পাই, তাহা এই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য-ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

জড় ও চৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ

তাহা হইলেই এই প্রশ্ন উঠে যে, এই সরূপ (বিশেষ) এবং অরূপ (নির্ব্বিশেষ), এই সসীম চৈতন্য এবং অসীম চৈতন্য, এই দু'য়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে টমিষ্টিক (Thomistic) দর্শনেও বলা হইয়াছে যে জড় নির্ব্বিশেষকে বিশেষত্ব প্রদান করে, এবং অসীমকে সসীম করে। কিন্তু ইহাদের সংজ্ঞানুসারে ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত। এই দুই এক হইতে পারে কিরূপে?

সাংখ্য ও বেদান্তমত

সাংখ্যে এই দুইটীর একত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহারা পরস্পর বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু বেদান্ত ইহা স্বীকার করে না; কারণ, বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে কেবল একটি মাত্র সদ্বস্তু আছে, যদিও আমাদের দ্বৈত বুদ্ধিতে দু'য়ের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন মত গ্রহণীয়? দ্বৈত মত, বহুত্ব মত, না অদ্বৈত মত? হিন্দুর পক্ষে উত্তর এই যে শেষোক্ত মতই গ্রহণীয়; কারণ তাহাই শ্রুতির উত্তর। কিন্তু ইহা ছাড়া এই প্রশ্ন উঠে যে, শ্রুতিতে কি প্রকৃত (আধ্যাত্মিক) অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে? আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় আমরা দ্বৈতের সন্ধান পাই, না অদ্বৈতের? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায়, বিভিন্ন রূপ এবং পরিমাণের মধ্যে অদ্বৈতেরই অনুভূতি হইয়া থাকে।

কেবল তর্কের দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না; আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সহিত যে মতের মিল হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি

রাখিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তদ্দ্বারাই ইহার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যের একত্ব বা অখণ্ডত্বের সহিত ব্যবহারিক জগতের অচেতন রূপবাহুল্যের কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? যদিও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন অপর কিছুর দ্বারাই এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না, তথাপি বেদান্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ইহার নানা প্রকার উত্তর দিয়াছেন।

বেদান্তের মায়াবাদ

শঙ্কর বলেন, একমাত্র সদ্বস্তু বর্ত্তমান আছে, তিনিই ব্রহ্ম। তত্ত্বতঃ কেবল মাত্র 'তাহাই' আছে; আর কিছুই সঙ্ঘটিত হইতেছে না। সর্ব্বোচ্চ (আধ্যাত্মিক) অভিজ্ঞতায় (পরমাত্মায়) ঈশ্বরও নাই, সৃষ্টিও নাই, জগৎও নাই, জীবও নাই, বদ্ধাবস্থাও নাই, মুক্তিও নাই। কিন্তু শঙ্কর স্বীকার করিতে বাধ্য, এবং তিনি স্বীকারও করিয়াছেন, যে ব্যবহারিক ভাবে জগৎ বা মায়ার অস্তিত্ব আছে। এই মায়াই বীজরূপে জগৎ-সৃষ্টি-বিধায়ক সংস্কার, এবং তাহাই সেই সমস্ত ধারণা-সমূহের কারণ যাহাদের অস্তিত্ব সর্ব্বোচ্চ অপরোক্ষ অনুভূতিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সৎ কি অসৎ? শঙ্কর বলেন, ইহা সৎও নয়, অসৎও নয়। ইহা সৎ হইলে দুইটী সৎ বস্তু অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা অসৎও নহে, কারণ জগতের ব্যবহারিক সত্ত অভিজ্ঞতার বিষয়; এবং জগৎ ঈশ্বরের শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না, এবং যেমন সায়ন বলিয়াছেন, ইহা চিৎ অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যজনক।

কিন্তু জগৎ যদি সৎও না হয়, অসৎও না হয়, তবে মায়ারূপে উহা ব্রহ্মও হইতে পারে না; কারণ ব্রহ্ম ত সৎবস্তু। তবে ইহা কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকে? এবং যদি থাকে, তবে কিরূপে এবং কোথায় থাকে? শুদ্ধ চৈতন্যে অচৈতন্য কিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে? শঙ্করের মতে ইহা নিত্য, এবং তিনি বলেন যে প্রলয়ে মায়াসত্তাই ব্রহ্মসত্তা। সেই সময়ে সৃষ্টিসঙ্কল্পাত্মক চৈতন্যের শক্তি রূপিণী মায়া এবং উহার সঙ্কল্পফল রূপ জগৎ বর্ত্তমান থাকে না। কেবল ব্রহ্মই থাকেন। প্রলয় যদি অঙ্গীকৃত হয়, এবং ইহাও অঙ্গীকৃত হয় যে, ভবিষ্যৎ সৃষ্টির বীজরূপে মায়া ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকে না, তবে পুনরায় সৃষ্টি হয় কিরূপে? সংস্কার রূপে মায়ার বীজ যদি অব্যক্তও থাকে (অর্থাৎ চৈতন্যের অবিষয়ীভূত থাকে) তথাপি ইহার সংজ্ঞা মতেই ইহা চৈতন্য হইতে বিভিন্ন। এই জাতীয় সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিবেন যে উহারা নিজেই মায়ার ফল স্বরূপ। ইহা ঠিক; কিন্তু এ বিষয়টি অন্য প্রকারেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সে ব্যাখ্যা মায়াবাদ হইতে সহজ; অথচ মায়াবাদের বিরুদ্ধে যত আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে, উহার বিরুদ্ধে তত পারা যায় না।

বেদান্তের মায়াবাদের সমালোচনা

আমার বোধ হয় যে শঙ্কর সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে গিয়া কতক পরিমাণে সাংখ্য মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার মায়াবাদের ফল এই যে, তাঁহার মত শুদ্ধ অদ্বৈত মত নহে, এই অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে অনায়াসে আনা যাইতে পারে। তাঁহার মায়াতে, সাংখ্যমতের ন্যায় একটু স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন পাওয়া যায়, যদিও তিনি এই স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যে পুরুষাধিষ্ঠিত মায়াই প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্রী। শঙ্করেও এই মতের আভাস পাওয়া যায়। তিনি চিৎকে অয়স্কান্ত মণির সহিত তুলনা করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম, যিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার অথচ সকল বিকারের কারণ, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানক্রিয়া কেবল ঈশ্বরেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরও মায়ার ফল মাত্র। এই যে মতপার্থক্য তাহা কতকটা কেবল কথার পার্থক্য মাত্র। এই সম্বন্ধে আগমের মত কতক পরিমাণে শঙ্করের মত হইতেও গভীর; (কারণ) শঙ্কর তার্কিক (Intellectualist) ছিলেন।

তন্ত্রের শক্তিবাদ

আমি এই ক্ষণে এক মতের উল্লেখ করিব যাহাতে ঐশ্বরিক চৈতন্যে পরম পূর্ণতা আরোপিত করা হইয়াছে। সেই মতে ঐশ্বরিক চৈতন্যে জ্ঞান (ক্রিয়া) অস্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু দ্বৈত জ্ঞান অস্বীকৃত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অপরোক্ষ অনুভূতিকে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, যে মিলনে দ্বৈত অদ্বৈতরূপে অবস্থান করে; এবং যাহাতে ভিতর বলিতেও কিছু থাকে না, বাহির বলিতেও কিছু

থাকে না। এই মিলনই শক্তির লীলা, অথচ শক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার শিবের সহিত অবিভিন্ন, এক। আমার নিকট শাক্ত মত সরল ও পরিষ্কার বলিয়া বোধ হয়। আমি ইহার মোটা মোটা বিবরণ দিতে পারিব; কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিবার সময় নাই।

প্রথমতঃ, ইহা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। কিন্তু এই মত কি? 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি মূলসূত্র রূপে গ্রহণ করিয়া এই মত অগ্রসর হইয়াছে। 'সর্ব্বং' অর্থ জগৎ; 'ব্রহ্ম' অর্থ চৈতন্য বা সচ্চিদানন্দ। সুতরাং এই জগৎ স্বরূপতঃ চৈতন্য।

কিন্তু আমরা জানি যে আমরা কেবল চৈতন্যময় নই। আমাদের মধ্যে দৃশ্যতঃ জড়ত্ব আছে। ইহার মীমাংসা কি? সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ব্রহ্মই নির্গুণ শিব—আনন্দময় অদ্বৈত চৈতন্য। ইহাই শিবের স্থির অবস্থা বা বিভাব (Static aspect)। এই অব্যক্ত হইতে শক্তি ব্যক্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মের গতিরূপ বিভাব (Kinetic aspect)। শক্তি এবং শক্তিমান এক; সুতরাং অব্যক্ত শিব হইতে শিবশক্তি ব্যক্ত হয়, এই শিবশক্তি এক। কাজেই শক্তিও চৈতন্যরূপিণী। কিন্তু শক্তির দুই মূর্ত্তি; যথা, বিদ্যাশক্তি বা চিৎশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি বা মায়াশক্তি। উভয়ই যখন শক্তি এবং শক্তি ও শক্তিমান যখন এক, তখন উভয়ই চৈতন্যময়। কিন্তু পার্থক্য এই যে, চিৎশক্তি জ্ঞানরূপী চৈতন্য, মায়াশক্তি চৈতন্যকে আপনাতে আপনি আবৃত করে এবং ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাবলে অচৈতন্য রূপে প্রতিভাত হয়। এই মায়াশক্তি ত্রিগুণাশক্তি অর্থাৎ তিন গুণের সমবায়। ইহাই কামকলা; ইহাই ত্রিগুণাত্মিকা বিভূতি। সুতরাং এই গুণত্রয় মূলতঃ চিৎ বই আর কিছুই নহে। কাজেই মায়াবাদীর উল্লিখিত চিদাভাস অঙ্গীকার করার প্রয়োজন নাই। জড় অসতের উপর চৈতন্যময় সতের প্রতিবিম্বকেই মায়াবাদীরা চিদাভাস বলিয়া থাকে। সমস্তই সৎ, তবে কতক পদার্থের ক্ষয় হয় না, এই অর্থে সেগুলি প্রকৃত সৎ; বাকী সকলই বিকারশীল, সুতরাং সেই অর্থে অসৎ। সমস্তই ব্রহ্ম। মনুষ্যের অন্তরাত্মা বিকারহীন চিৎশক্তি। তাহার দৃশ্যতঃ জড় আধার—দেহ ও অন্তঃকরণ—মায়াশক্তিরূপে ব্রহ্ম অর্থাৎ মায়াশক্তির দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতাবলে জড় রূপে প্রতিভাত চৈতন্য। সুতরাং ঈশ্বর ও চিৎশক্তি ও মায়া শক্তিরূপী ব্রহ্মেরই নাম। জগতের মাতা ও ধাত্রীস্বরূপা মহাদেবী ঈশ্বরেরই রমণীরূপ বিভাব (Aspect)। জীব সেই শক্তিরই অংশ; কেবল প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর মায়াবী, জীব মায়ার অধীন। সৃষ্টিকালেও চিন্তাময়ের অদ্বৈত চৈতন্যের ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু তাঁহার চিন্তা, অর্থাৎ তাঁহার চিন্তা ক্রিয়ার ফল যে রূপ, তাহা মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়; অর্থাৎ, যে পর্য্যন্ত অন্তর্নিহিত বিদ্যাশক্তি বলে মোক্ষলাভ না করে, সে পর্য্যন্ত উহা (ঐ চিন্তা বা জীব) রূপের (দেহের) সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে। সমস্তই নিত্য সত্য বা ব্রহ্ম। সৃষ্টিকালে শিব স্বীয় শক্তি সম্প্রসারিত ও প্রলয়কালে তাহা সঙ্কুচিত করেন। সৃষ্টির পরে মায়া স্বরূপতঃ চৈতন্যময় কিন্তু জড়রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান থাকে।

উপসংহার

জগতের ব্যাখ্যা কল্পে এই মত গ্রহণ করিলে কার্য্যক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় ফল লাভ করা যায়। জগৎ তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, এবং ঈশ্বরকে আর ব্রহ্মের মায়িক ভাণ বলা চলে না। জগৎ সত্য; উহা এই অর্থে মিথ্যা যে উহা পরিবর্ত্তনশীল; পক্ষান্তরে আত্মা প্রকৃত সৎ ও নিত্য বস্তু। বন্ধও সত্য; কারণ বন্ধই অবিদ্যাশক্তি, উহাই চৈতন্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মোক্ষও সত্য; কারণ ইহা বিদ্যাশক্তির অনুগ্রহের ফল। আমরা সকলেই শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ। সাফল্য লাভ করিতে হইলে এ কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আরও বুঝিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে দেবতাই চিন্তা করিতেছেন ও কাজ করিতেছেন এবং আমরাই দেবতা; আমাদের যে সুখভোগ তাহাও তাঁহারই; এবং মোক্ষ তাঁহারই শান্তিময় প্রকৃতি। আগম সকল এই শক্তি বৃদ্ধির কথা নিয়াই ব্যাপৃত। এই শক্তি বাহির হইতে আগত বলিয়া মনে করিতে হইবে না; ইহা আমাদের অন্তরেই আছে। বিবিধ প্রকার শাক্ত সাধনা দ্বারা আমরা ইহ আয়ত্ত করিতে পারি। সংসারে আছি বলিয়া এবং সংসারের মধ্য দিয়াই কাজ করিতে হয় বলিয়া,—কুলার্ণব তন্ত্রে যেমন উক্ত হইয়াছে—এই সংসারই আমাদের মুক্তির ক্ষেত্র। যিনি বীর তিনি সংসারের ভয়ে ভীত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন না। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে ইহা ধারণ করেন, এবং বলপূর্ব্বক ইহার গুহ্য তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেন। তিনি অবশেষে বুঝিতে পারেন যে সমস্তই চৈতন্য স্বরূপ। তখন জড় জগতে আর তাহার স্পৃহা থাকে না। আত্মজ্ঞানহীন সাংসারিক জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া যে সমস্ত কাজকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তিনি তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া জ্ঞানী হন, স্বাধীন হন; এবং নিজের ইচ্ছানুসারে, হয় শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন, না হয়, মোক্ষের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। *

---

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম এ, বি এল কর্ত্তৃক ইংরাজি হইতে ভাষান্তরিত।



প্রতিভা।

৬ষ্ঠ বর্ষ ভাদ্র ১৩২৩ ৫ম সংখ্যা

আসামরাজের বাঙ্গালী গুরু *

আমরা এতদিন বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর খবর বড় রাখিতাম না—ভিতরের খবরই বা কয় জন রাখিতেন? যাহা হউক, সম্প্রতি বাঙ্গালীর ঘরের কথার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত একটা প্রবল বাসনা জাগিয়াছে। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসঙ্গে একটু দুঃখের কথাও যে না আছে,এমন নহে; বাঙ্গালী ক্রমশঃ ঘরমুখো হইয়া পড়িতেছে, এমন কি সন্নিকটস্থ আসাম ও বিহার হইতেও তাহারা শনৈঃ শনৈঃ অপসারিত হইতেছে। তাই এখন বাঙ্গালী ভারতময় যে সকল গৌরবের কাজ করিয়াছে, তাহার প্রচার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আজ আসামের একটি কাহিনী বর্ণিত হইতেছে।

প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার থাকে, সেইরূপ বঙ্গের অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট আসামের বিবরণ বাঙ্গালীর নিকট এতদিন কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন ছিল; বড়ই সুখের বিষয়, এখন ক্রমশঃ সেই অজ্ঞতা-তমিস্র দূরীভূত হইতেছে। গোহাটীতে সংস্থাপিত বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় (যাহা এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গোহাটি শাখা বলিয়া পরিচিত) আলোচ্য নানা প্রবন্ধাদি হইতে বঙ্গসাহিত্যে আসামের খাঁটি কথা অনেক প্রচারিত হইতেছে এবং অচির-প্রতিষ্ঠিত কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যফলেও আশা করা যায় যে, আসামের বহু অপরিজ্ঞাত বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের গোচরীভূত হইবে।

উপরি-লিখিত সভাসমিতির আলোচনার ফলে যে সকল বিষয় সম্প্রতি বাঙ্গালা প্রদেশে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তন্মধ্যে আহোম-রাজবধূ জয়মতীর করুণ কাহিনী সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রচারিত। এতদবলম্বনে বঙ্গদেশে অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে,—কলিকাতায় গীতাভিনয় পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সতী-শিরোমণি আহোম-রাজকুলললামভূতা জয়মতীর পবিত্র

* যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে ঐতিহাসিক শাখায় পঠিত।

গর্ভসম্ভূত মহারাজ রুদ্রসিংহ, * এবং তত্তত্তরাধিকারী মহারাজ শিবসিংহই এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত আসামরাজ।

আহোম রাজগণের পূর্ব্বপরিচয় সম্বন্ধে এখানে বিশেষভাবে বলা অনাবশ্যক; তথাপি প্রস্তাবের বোধসৌকর্য্যার্থে কিছু উল্লেখ করিতেই হইবে।

আহোমদের জাতীয় ইতিহাস বুরঞ্জির মতে আহোম রাজগণ স্বর্গদেব ইন্দ্রের সন্তান। ইন্দ্রদেব মনে ভাবিলেন, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি নানা দেবতার বংশধরগণ মর্ত্ত্যে রাজত্ব করিতেছে, তাঁহার কোনও সন্ততি ধরাধামে রাজ্যপালন করে না, এটা বড় অসহনীয় বিষয়। তাই তিনি নিজের পুত্রকে ডাকিয়া পৃথিবীতে যাইতে আদেশ দিলেন; কিন্তু পুত্র স্বয়ং না গিয়া তাঁহার দুইটি ছেলেকে পিতামহের আজ্ঞাসম্পাদনে নিযুক্ত করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে 'সোমদেও' নামক একটি (তান্ত্রিক) যন্ত্র এবং 'হেংদাং' নামক একখানি অসি উপহার প্রদান করিলেন। তাঁহারাই আহোমরাজগণের আদিপুরুষ; এবং ঐ 'সোমদেও' এবং 'হেংদাং' (শিবাজীর 'ভবানীর' ন্যায়) আহোম রাজগণের জাতীয় অর্চ্চনার বস্তু হইয়া পড়িল। †

ইঁহাদের আহার মদ্যমাংস-ভূয়িষ্ঠ এবং অর্চ্চনীয় দেবতাও যন্ত্রাকার বস্তু ও একখানি তরবারি। আপাতদৃষ্টিতেই ইহাদিগকে হিন্দুর শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারিত। এবং আহোমরাজগণ শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তেমন অনুগ্রহপরায়ণ ছিলেন না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা শঙ্করদেব ইঁহাদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া স্বীয় জন্মভূমি (আহোম রাজ্যান্তবর্ত্তী নৌগাঁ জেলার বড়দোয়ার) পরিত্যাগপূর্ব্বক কোচরাজগণের অধিকারে কামরূপ জেলার বড়পেটাতে উপনিবিষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, পশ্চাৎ আহোমগণের অনেকে বৈষ্ণব গোস্বামীগণ হইতেও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জয়মতীর স্বামী মহারাজ গদাধর সিংহ বহু বৈষ্ণব অধিকারীর উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে। গদাধর রাজসিংহাসনাধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যখন তৎকালীন আহোম রাজা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি একবার বিপদগ্রস্ত হইয়া "মা আমায় রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করেন—তখন নাকি হঠাৎ একটা শিলা ফাটিয়া যায়—তিনি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। আর একবার যখন প্রায় ধরা পড়েন এই অবস্থা হয়, তখন এক শ্যামাঙ্গী নারীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বৃক্ষে উঠাইয়া বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রক্ষা করেন। এই অবস্থায় গদাধর সিংহ শক্তি উপাসনার পক্ষপাতী হইবেন আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ, মহাশক্তির অংশভূতা পরমসতী জয়মতীর তিনি স্বামী—পতিব্রতার স্মৃতিও তাঁহাকে শিবশক্তিতে ভক্তিমান্ করিয়া তুলিবারই কথা। তিনি ৺কামাখ্যামহাপীঠের ভৈরব উমানন্দের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রতেজা রুদ্রসিংহ যে শক্তি উপাসনার পক্ষপাতী হইবেন, ইহাতেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। তথাপি, তিনি পিতার ন্যায় বৈষ্ণবদিগের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার করেন নাই—এমন কি, মহারাজ রুদ্রসিংহই ব্রহ্মপুত্রমধ্যস্থ মাজুলী নামক একটি প্রকাণ্ড দ্বীপে আসামের প্রধান প্রধান সত্রাধিকারীদিগকে সম্মানপূর্ব্বক স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তন্মধ্যে প্রধান সত্রাধিকারী অউনিআটি গোস্বামীর কাছ হইতে না কি তিনি মন্ত্র গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটা প্রত্যয়যোগ্য নহে, তাহার কারণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইতেছে।

---

* রুদ্রসিংহ "প্রতিভার" পাঠকের নিকটে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ("আহোম আকবর রুদ্রসিংহ" ৪র্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা "প্রতিভা" দ্রষ্টব্য)।

† যোগিনী তন্ত্রে যেমন কোচবিহারাধিপতিদিগকে শিববংশ বলিয়া প্রচারিত করা হইয়াছে—তেমনই সৌমার (অর্থাৎ উত্তর আসাম) দেশাধিপতি আহোম রাজগণের ইন্দ্রবংশ-জাতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা যোগিনীতন্ত্র, পূর্ব্বার্দ্ধ, চতুর্দ্দশ পটল পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু তন্ত্রোক্ত কাহিনী বুরঞ্জীর বিবরণীর সম্পূর্ণ বিসদৃশ।

রুদ্রসিংহের ন্যায় তেজস্বী ও পরাক্রান্ত রাজা আহোম বংশে আর দ্বিতীয় কেহ হন নাই—প্রকৃতই তিনি আহোম-আকবর সংজ্ঞার উপযুক্ত। তাঁহার জীবনের শেষভাগে ইচ্ছা হইল, দীক্ষা গ্রহণ করেন—কিন্তু আপন প্রজার মধ্য হইতে কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতে তিনি রাজি ছিলেন না। বিশেষতঃ, তখন আসামে সম্ভবতঃ শক্তিমন্ত্রে সাধকও তেমন কেহ ছিলেন না। তাই শাক্ত গুরু খুঁজিয়া আনিবার জন্য বঙ্গদেশে লোক প্রেরিত হইল। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী শিমলা মালিপোতা নামে একটি গ্রাম আছে। সেই সময়ে ঐ গ্রামে কৃষ্ণরাম নামক ন্যায়বাগীশ উপাধিক জনৈক পণ্ডিত ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী পাঁচড়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি; কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবার বাসনায় শান্তিপুর মালিপোতায় আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর কাশ্যপগোত্রজ সুপ্রসিদ্ধ শোভাকরের বংশধর ছিলেন। শুনা যায়, এই শোভাকরই না কি দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন; কিন্তু শোভাকরকে নৈকষ্যকুলীন পর্য্যায়ভুক্ত না করাতে তিনি কুপিত হইয়া দেবীবরকে নির্ব্বংশ হও বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন।* যাহা হউক, এই বংশের ব্রাহ্মণগণের তপঃপ্রভাবের উদাহরণস্বরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, শ্রীকণ্ঠ নামক এই বংশজ ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক সম্পাদন করিবার জন্য জলাশয়ে অবতরণ করিলে, একটা টেংরা মাছ পায়ে কাঁটা ফুটাইয়া দেয়—ইহাতে ব্রাহ্মণের যে মন্যু হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত পুকুরের সমস্ত টেংরামাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠে—এবং তদবধি ঐ পুষ্করিণীতে আর সেই জাতীয় মাছ জন্মিত না। সেই ঘটনার পর হইতে ইঁহারা টেংরামারা ভট্টাচার্য্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

কৃষ্ণরামের নিকট রুদ্রসিংহের দূত উপস্থিত হইলে, তিনি আহোম রাজবংশের আচার ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া আসামে যাইতে অস্বীকৃত হন। পশ্চাৎ বহু অনুরোধের পরে—বিশেষতঃ জগন্মাতা ৺ কামাখ্যাদেবীর স্থান ঐ রাজ্যমধ্যে অবস্থিত, এই কথা জ্ঞাত হইয়া—আসামে যাইতে অঙ্গীকার করেন। তখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুপতি রায় নবদ্বীপাধিপতি ছিলেন; তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে কৃষ্ণরাম আসামরাজদূতের সঙ্গী হন; কিন্তু এইরূপ সর্ত্ত হয় যে, কৃষ্ণরাম নীলাচলে ৺কামাখ্যা ধামে অবস্থান করিবেন, মহারাজ স্বয়ং ঐ স্থানে আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

রুদ্রসিংহ ভট্টাচার্য্যের বংশগৌরব ও পাণ্ডিত্যপ্রতিভা অবগত হইয়া, বিশেষতঃ তাঁহার বাড়ী ভাগীরথীতীরবর্ত্তী জানিয়া, কৃষ্ণরাম যে একজন দেবতুল্য ব্যক্তি তাহাই কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ইনি অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায়ই আচার অনুষ্ঠান করেন, বাহ্যতঃ বিশেষত্ব কিছুই দেখা যায় না, তখন নিয়তিবশে ভট্টাচার্য্যের প্রতি আহোমরাজের শ্রদ্ধার হ্রাস ঘটিল; এবং তিনি দীক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। কৃষ্ণরাম ক্ষুণ্ণ মনে বাটিকাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

এদিকে আসাম রাজ্যে নানারূপ দৈব উৎপাত ঘটিতে আরম্ভ হইল। তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হইতে লাগিল; দেবমন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল—নদীর জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; প্রাণিকুল প্রলয়কাল নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া অস্থির হইল। তখন রাজমন্ত্রিগণ রুদ্রসিংহকে বলিলেন, "মহারাজ, ঐ ব্রাহ্মণ সামান্য ব্যক্তি নহেন—সাক্ষাৎ দেবীর সন্তান। তাঁহাকে অবমাননা করাতেই এই বিপদ ঘটিয়াছে—দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। শীঘ্র ইহার প্রতীকার করুন, নচেৎ সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে।" রুদ্রসিংহ দূত পাঠাইয়া ভট্টাচার্য্যকে পুনশ্চ অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন—আর অমনি সমস্ত উপদ্রব থামিয়া গেল।

এতক্ষণে রুদ্রসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণরাম যে সে ব্যক্তি নহেন; কিন্তু তথাপি একটু রাজনীতিক চাল দিতে ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "হাঁ, ইনি একজন মহাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আগে ব্রাহ্মণাদি রাজ্যে যত ভদ্র, বিশিষ্ট, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আছেন, ইঁহার কাছে দীক্ষা

* এই বিষয়ে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—
'ডাক দিয়া কয় শোভাকর।
নির্ব্বংশ হ' দেবীবর॥'

গ্রহণ করুন, তার পরে আমি নীলাচলে গিয়া, অথবা যদি পারি, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিব"। উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, তিনি রাজা, তিনি যাহার কাছে মস্তক অবনত করিবেন—রাজ্যের তাবৎ লোক যেন তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইতে দ্বিধা বোধ না করে।

রাজার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। আসামের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ দলে দলে আসিয়া কৃষ্ণরামের নিকটে দীক্ষা-লাভ করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ রুদ্রসিংহ তখন বাঙ্গালা মুলুকের আভ্যন্তরীণ অবস্থার খবর নিতেছিলেন। তিনি কাছাড়, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া নিজের শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি বঙ্গদেশ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করিতে বাসনা করিয়াছিলেন—তাই বোধ হয় ঐ স্থানে গিয়া দীক্ষা নিবেন, এ কথা বলিয়াছিলেন।

কিন্তু নিয়তির বিধান অন্যরূপ ছিল। যখন তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার আয়োজনব্যপদেশে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া গৌহাটীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এবং সেই রোগহেতু গৌহাটীতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে আপনার অপত্যদিগকে কৃষ্ণরান হইতে দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন; তদনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ শিবসিংহ, (যাঁহার নামে শিবসাগর দীর্ঘিকা এবং তন্নামে শহর ও জেলা হইয়াছে) সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তদবধি আহোমরাজগণ—তথা আসামের প্রায় বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ—কৃষ্ণরাম ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণের নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন।

মহারাজ শিবসিংহ অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। পিতা যেমন দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ ছিলেন, পুত্র তেমনই পারমার্থিক বিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। দিবসের তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পূজাহ্নিকে ব্যাপৃত করিতেন—দেবত্র ব্রহ্মত্র মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন—ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যেও শিবসাগর ও তত্তীরবর্ত্তী বিশাল মন্দির দ্বারা নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রবাদ যে, তিনি ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাতেও গুরুমাহাত্ম্যই প্রকটিত হইয়াছে।

রাজগুরু কৃষ্ণরাম ৺কামাখ্যাধিষ্ঠিত নীলাচলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; এবং ৺কামাখ্যাদেবীর সেবাপূজার তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহারই উপর অর্পিত হইল। কামাখ্যার পাণ্ডাগণ তাঁহারই শিষ্য হইল; এবং তিনি যে সকল বিধি বিধান করিয়া গিয়াছেন, আজিও তদনুসারে মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী জগন্মাতার পূজার্চ্চনা চলিতেছে। পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত হওয়াতে কৃষ্ণরাম এবং তদীয় বংশধরগণ এই অঞ্চলে 'পর্ব্বতীয়া গোসাই' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আসামে দুর্গোৎসব প্রভৃতি শাক্তানুষ্ঠান যাহা আজিও প্রচলিত আছে—তাহার প্রবর্ত্তক এই কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য। এতদ্ব্যতীত আহোমরাজগণ গুরুদেবকে কামরূপ জেলার উৎকৃষ্টতম ভূভাগ (অধুনা প্রায় ২৫।৩০ হাজার টাকা আয়ের) জমিদারী অর্পণ করিয়া গিয়াছেন; তাহা এখনও কৃষ্ণরামের উত্তরাধিকারিগণ ভাগশঃ ভোগদখল করিতেছেন। আহোমরাজগণ এবং তাঁহাদের রাজ্য এখন নামশেষ হইলেও, কৃষ্ণরামের গুরুত্ব ও প্রভুত্বের নিদর্শন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কেবল জমিজমা নহে, শিষ্যসম্পদ্‌ও তদীয় বংশধরগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। যদিও কালমাহাত্ম্যে এবং বংশবৃদ্ধি হেতুতে সম্প্রতি ইহাদের তেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না, তথাপি ইঁহাদের মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি আসাম অঞ্চলে এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকোৎসব উপলক্ষে আসাম হইতে রায় জগন্নাথ বরুয়া বাহাদুর বিলাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলে, সমাজে চল হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ঘটে; কিন্তু গুরু পর্ব্বতীয়া গোসাঁই মথুরানাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় গঙ্গাতীরে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলে, রায় বাহাদুর তাহার অনুষ্ঠান করাতে অনায়াসে স্বীয় সমাজে প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

কৃষ্ণরাম যেমন সাধক ছিলেন, তেমনই পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি গ্রন্থরচনাও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের নাম অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই। তবে একখানি পুঁথির মুখবন্ধ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতে কৃষ্ণরামের বংশপরিচয়ের সহিত কবিত্বের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে। পুঁথিখানি কি ছিল, পদ্যে না গদ্যে, তাহার কিছুই এই ভূমিকা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় না। সর্ব্বাদৌ নমস্কার, সে তো গদ্য, পদ্য,কাব্য, নাটক, সমস্ত বিষয়েই থাকে। "কবের্ব্বংশাদি কীর্ত্তনম্" আখ্যায়িকার লক্ষণে পাওয়া যায়; এই বংশকীর্ত্তন কোনও আখ্যায়িকার সূচনা করিতেছে কি না, জগদম্বাই জানেন। *

লেখা বড়ই অস্পষ্ট ও অশুদ্ধিবহুল ছিল, যথাশক্তি ইহার পাঠোদ্ধার করা হইল। শ্লোকগুলি তেমন কঠিন নয়, তাই বিস্তারিত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না, সংক্ষেপতঃ মর্ম্মমাত্র প্রদান করিলাম।

ওঁ নমো মহিষমর্দ্দিন্যৈ

যৈকা বর্ণময়ী ত্রয়ী মণিময়ী মালেব কণ্ঠে সতাং
কার্য্যাকার্য্য-নিদেশিকেব জননী বেদাধ্বনিষ্ঠাবতাম্।
মোহধ্বান্ত-নিশান্ত-দীপ-কলিকা বিদ্বন্মনো-বর্ত্তিকা
সা বাণী তনুতাং মদীয়-রসনা মধ্যাস্থলাস্যোৎসবম্ ॥১॥
বন্দেঽস্মৎকুলমৌলিকশ্যপমুনিং বন্দ্যঞ্চ বৃন্দারকৈ
র্যস্মাদাবিরভূৎ সুরাসুরকুলং ক্ষৌণী চ যস্যাত্মজা।
যস্যৈবোগ্রতপঃ-প্রভাববিভবাদদ্যাপি ভূমণ্ডলে
পূজ্যান্তে হ্যতিতরাং ধরামরবরৈ রপ্যগ্রতঃ কাশ্যপাঃ ॥২॥

উৎপন্নোঽত্র কুলে হলায়ুধ ইতি খ্যাতঃ স চ স্বাখ্যয়া
বিদ্যোৎকর্ষবশানুলোপ দিবিষদ্‌গোষ্ঠ্যা গুরো গৌরবং
যদ্‌গ্রন্থার্থনিগূঢ়মর্ম্মকলনাদদ্যাপি বিদ্বদ্গণা
মোদন্তেঽহতিতরাং নিরস্য চিরজং দুঃখাবহং সংশয়ম্ ॥৩॥
তপস্তেজঃ স্ফূর্ত্ত্যা দিনকর ইব প্রাদুরভবৎ
কুলে স্বস্মিন্ শোভাকর ইতি চ যঃ খ্যাতিমগমৎ।
কুলীনাঃ শালীনাঃ কিল ভুবি বিলীনা যদভিতঃ
কুলীনেতি স্বাখ্যাং দধতি হতমানাঃ কথমপি ॥৪॥
অভূদ্বাগীশোঽস্মিন্নথ সুরগুরোরপ্যনবর
স্তপোবিদ্যাতীর্থাটনসুবিনয়াচারচতুরঃ।
চতুর্ব্বেদব্যাখ্যাপটিমসমুদিতামলযশঃ
শরৎসোম জ্যোতিবিশদিতদশাশাপরিসরঃ ॥৫॥
এতস্মিন্ বিমলে কুলে সমজনি শ্রীজানিবন্ধামনো
যস্যৈব ত্রিপদাক্রমোদিতযশো লোকত্রয়ী মন্বগাৎ।
যোঽসৌ সংসদি সংগতঃ স্বমহিতং কং সংববাধে ন বা
গোত্রস্যোদ্ধরণং চকার বিদধৎ কর্ম্মাদ্ভুতং ভূতলে ॥৬॥
কুলাদস্মাৎ সিন্ধো রজনিনায়কনিভঃ
স নাম্না শ্রীকণ্ঠঃ শিবইব গুণৈরপ্যয়মভূৎ।
স্ফুরদ্‌ব্রাহ্মং তেজঃ পরিণতমহো মূর্ত্তমভবদ্
যমালোক্যৈবেত্থং বুধকুলমনস্তর্কয়তি চ ॥৭॥
স্নাত্বা যেন তপস্যতা হ্রদবরে বিদ্ধেন মীনৈঃ পদে
কিঞ্চিৎ খেদবিবেদনাৎ পরপদধ্যানার্চ্চনাচ্চেতসা।
শপ্তাঃ কণ্টকিনো ঝষাস্ত শতশঃ সদ্যঃ সবংশা মৃতাঃ
নাদ্যাপি প্রভবন্তি তত্র কিল তে খ্যাতিশ্চ না জানতে ॥৮॥
রত্নাকরাবরবংশবরাদমুষ্মাজ্
জাতঃ সুধীঃ সমবধীরিতধীরবর্গঃ ॥
যঃ সত্রপং বরুণ মপ্যকরোৎ স্বসত্রৈঃ
খ্যাতিং গতঃ ক্ষিতিতলে খলু বাজপেয়ী ॥৯॥
গেহং সংপ্রবিশন্নসৌ স্বশিরসি দ্বার্দারুসংঘট্টনা
দুঃস্থংখেদভরোত্তরোত্থিতরুষা তদ্দারু যস্যেক্ষত।
তর্হি প্রাদুরভূদমুষ্য নয়নাদক্ষ্ণো যথা শূলিনো
বহ্নির্যেন কৃতং ক্ষণেন দহনং তদ্দারুণো দারুণঃ ॥১০॥

* যশোহর সাহিত্য সম্মিলনে এই প্রবন্ধটী পঠিত হইবার পরে জানা গিয়াছে যে, এই সকল শ্লোক কৃষ্ণরামসঙ্কলিত দুর্গোৎসব বিধির মুখবন্ধ; শিরোভাগে 'ওঁ নমো মহিষমর্দ্দিন্যৈ' এই বাক্যটিতেও ইহাই সূচিত হইতেছে। এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে পর্ব্বতীয় গোস্বামীবংশের কনিষ্ঠ শাখাসম্ভূত শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় শিষ্য জেলা দরঙ্গের অন্তর্গত বিশ্বনাথক্ষেত্রের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বড়ঠাকুর মহাশয় হইতে এইগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

এতদ্বংশাবতংসবৎ সমভবৎ স ন্যায়বাচস্পতি
র্যদ্বাণী কিল দুর্গশাস্ত্রসরণীধ্বান্তায় চিন্তামণিঃ।
শিষ্যা যস্য সহস্রশো বিদধিরে গ্রন্থান্ সদর্থান্ পরাং
স্তদ্বিদ্যাগরিমা কিমাদস্পদমিয়ত্তায়া স্তুলায়াশ্চ বা ॥১১॥
জাতশ্চাতমনঃ সুতঃ কিল ততো যস্তর্কবাচস্পতি
স্তর্কেণাস্য পুরঃসরেণ নিতরাং বাচস্পতেশ্চাধিকঃ।
যদ্বাণী হ্যচলার্থগৌরববতী গ্রন্থাব্ধি নির্মন্থনে
মন্থাদ্রিপ্রতিমা মৃধাৎ পরপদামর্দ্দান্ন ছন্নায়তে ॥১২॥
জাতস্তস্য সুতোঽস্তুতঃ কিল গুণৈঃ স ন্যায়পঞ্চাননো
নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণো গ্রন্থান্ বহূনাতনোৎ।
যস্মিন্ সংসদি শংসতি স্ময়ভরৈ রালেখ্যবন্নিশ্চলো
জীবো জীবতয়া বভৌ নিজশিরঃ কম্পং মুহুঃ কম্পয়ন্ ॥১৩॥
এতস্মাদাবিরাসীন্মণিরিব খনিতো রামচন্দ্রেতিনামা
বিদ্যাবাচস্পতি র্যঃ ক্ষিতিতলবিদিতঃ সেবিতঃ সৎসমূহৈঃ।
অজ্ঞানধ্বান্তকুড্যং কিলবুধকবিনা যেন নির্ভিদ্য নূনং
তেনাচ্ছন্নং রহস্যং নিখিল নিগমগং বোধয়ামাস শিষ্যান্ ॥১৪
বন্দে তং রঘুনাথবৎ সুবচসা সম্যক্ প্রবন্ধেন যঃ
শাস্ত্রাব্ধেস্তরণায় সেতুমকরোৎ কীর্ত্তিস্পরাঞ্চাতনোৎ।
গীর্ব্বাণেন খরেণ দূষণসমাধানঞ্চ যঃ সংব্যধাৎ
শ্রদ্ধাবান্ গুরুবাচি দুর্গগহনে সম্যক্ সভার্য্যোঽচরৎ ॥১৫॥
তৎপুত্রাঃ সুধিয়স্ত্রয়ঃ সমভবং স্তেষ্বাদিমঃ কীর্ত্ত্যতে
কীর্ত্ত্যোল্লাসিতদিক্ ততঃ স ধরণৌ যস্তর্কবাগীশকঃ।
দাতা কর্ণসমো গুণৈ রঘুপমঃ পঞ্চাননো মধ্যমঃ।
গ্রন্থং সন্তনুতে গিরা নরপতেঃ শ্রীকৃষ্ণরামোঽনুজঃ ॥১৬॥

প্রারম্ভে বাণীস্তোত্রের এবং গোত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি কশ্যপের বন্দনার পরে বংশের ইদানীন্তন আদিপুরুষ হলায়ুধের উল্লেখ হইয়াছে। তদ্বংশে শোভাকর নামে তেজস্বী পুরুষ উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশে 'বাগীশ' উপাধিক (?) ব্যক্তি জাত হন; বামন নামে তাঁহার কুলে অদ্ভুতকর্ম্মা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তদ্বংশে শ্রীকণ্ঠ নামা ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পণ্ডিত আবির্ভূত হন; ইঁহারই মন্ত্রতে পুষ্করিণীর তাবৎ টেংরা মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠে।†

ইঁহার বংশ হইতে 'বাজপেয়ী খ্যাতিযুক্ত জনৈক সুধী জন্মিয়াছিলেন। তিনি একদা ঘরে ঢুকিতে গিয়া মাথায় আঘাত পাইয়া কাঠের প্রতি নিরীক্ষণ করা মাত্রেই তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। 'ন্যায়বাচস্পতি' উপাধিক পণ্ডিত তাঁহার বংশে জাত হইয়াছিলেন; তৎপুত্র বৃহস্পতিতুল্য তর্কবাচস্পতি ছিলেন; তাঁহার পুত্র ন্যায়-পঞ্চানন, ইনি নানাশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি, ইনিও অশেষশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার তিন পুত্র, প্রথম তর্কবাগীশ, * মধ্যম পঞ্চানন, এবং কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ।

অবশেষে কৃষ্ণরামের বংশ লতিকা প্রদত্ত হইল। তাঁহার তিন পৌত্র হইতে তিনটি বংশধারা চলিয়াছে; আসামীয় সমাজে বড়, মধ্যম, ছোট, এই তিনি উপাধিতে পর্ব্বতীয় গোসাঁইর বংশধরগণ পরিচিত হইতেছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

† আমার ধারণা ছিল যে, স্বয়ং কৃষ্ণরামই টেংরামারা ভট্টাচার্য্য ছিলেন। "প্রতিভা"—চতুর্থ বর্ষ, নবমসংখ্যা, "আহোম আকবর রুদ্রসিংহ"-শীর্ষক প্রবন্ধে এবং প্রবন্ধাষ্টকে প্রকাশিত "পূর্ণানন্দ গিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ" নামক প্রবন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে 'টেংরা, মাছের স্থলে শিঙ্গী মাছের উল্লেখ আছে; প্রকাশ্যমান শ্লোকা-বলীর ৮ম শ্লোকে "মৎস্যাঃ কণ্টকিনঃ" আছে;—ইহাতে যদিও উভয়ই বুঝাইতে পারে, তথাপি প্রবাদ টেংরাবিষয়কই বটে। আসামে টেংরা" মাছের নাম শিঙ্গিরা;—আমি তাহাতে শিঙ্গি মাছ বুঝিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিলাম।

* এই তর্কবাগীশই কি মহারাজ শিবসিংহের অনুরোধে রাঢ়ের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন? কিন্তু হায়, গৌরীপুরে উত্তর বঙ্গ সম্মিলনে এই পুঁথি প্রদর্শনার্থ নীত হইয়াছিল। তথায় ইহা হারাইয়া গিয়াছে।

বারাণসী

১৩১৮ সালের ২২শে আশ্বিন অপরাহ্নে গয়া হইতে পেসেঞ্জার ট্রেনে বারাণসী অভিমুখে রওনা হইলাম। গয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটি বড় ষ্টেশন। পূর্ব্বে গয়া আসিতে হইলে বাঁকিপুর হইয়া পাটনা-গয়া রেলওয়ে নামক শাখা রেলপথে আসিতে হইত। এবং গয়া হইতে কাশী যাইতে হইলে, বাঁকীপুর হইয়া কর্ড লাইনে যাইতে হইত। গ্র্যাণ্ড কর্ডলাইন নির্ম্মিত হওয়ার পর হাবড়া হইতে সোজা পথে গয়া আসা যায়। এবং গয়া হইতে সোজা পথে মোগলসরাই জংসনে যাওয়া যায়। আমরা যে সময় গয়া হইতে রওনা হইয়াছিলাম, তখন সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার ক্ষীণ অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিল। কতক্ষণ পর চন্দ্রোদয়ে পৃথিবী কৌমুদী-স্নাত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিল। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় গাড়ী শোণ-নদের পূর্ব্বপারে উপস্থিত হইল। শোণ বিন্ধ্য পর্ব্বতের অন্তর্গত অমরকণ্টক নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া পাটনার অনতিদূরে ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। শোণনদ হিন্দুর নিকট পবিত্র। মহাভারত এবং পুরাণাদিতে শোণ নদের উল্লেখ আছে।

অমরকণ্টক নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান। এই স্থানের সন্নিকটে মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম ছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন যে স্থানে শোণনদ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেই স্থানে শোণনদ বিশেষ প্রশস্ত। এই স্থানে শোণ নদের পুলের দৈর্ঘ্য প্রায় ২। সোয়া দুই মাইল হইবে। স্কটলণ্ডের অন্তর্গত Tay নামক নদীর উপরে যে বৃহৎ সেতু আছে, তাহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ। গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনস্থিত শোণ নদের পুল দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় বলিয়া কথিত হয়। শোণনদের উভয় তীরে ষ্টেশন আছে। গাড়ী শোণনদের পূর্ব্বপারস্থ ষ্টেশনে আসার পর, আমরা শোণনদ ও শোণনদের পুল দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। গাড়ী যখন শোণ নদের পুলের উপর উপস্থিত হইল, তখন যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিলাম, বৃহৎকায় শোণনদ বিপুল বারিরাশি বক্ষে লইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে বালুকাময় বৃহৎ পুলিন; শরতের চন্দ্র কুয়াসার ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে একটি স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করিতেছে। কতক্ষণ পর গাড়ী "সাশারাম" ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সাশারাম সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত একটি সবডিভিসন; এই স্থানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাট সেরসাহের কবর আছে। রাত্রি ১১৷৷০ টার পর আমরা মোগলসরাই জংসনে পৌছিলাম। এখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমরা আউদ রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিলাম। অনেকক্ষণ পর গাড়ী ছাড়িল। রাত্রি দুই ঘটিকার পর আমরা কাশী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন কাশী ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছি, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই রাত্রি ষ্টেশনেই অতিবাহিত করিলাম। পর দিবস প্রত্যুষে উঠিয়া গাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাতঃকালেও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সুতরাং সুবিধামত গাড়ী পাইলাম না, বিশেষতঃ, কাশীর বাঙ্গালীটোলায় ভিতর গাড়ী যায় না। রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ। গাড়ী বড় রাস্তার উপর থাকে, তথা হইতে হাঁটিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে হয়। আমি গাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় একটি নৌকার মাঝি আসিয়া আমরা নৌকায় যাইব কি না, জিজ্ঞাসা করিল। কাশী ষ্টেশন হইতে গঙ্গাঘাট অতি নিকট। গঙ্গার উপর (Dufferin Bridge) ডফরিণ ব্রীজ নামক যে বৃহৎ রেল-সেতু আছে, তাহারই নীচে নৌকা পাওয়া যায়। আমি নৌকায় যাওয়া সুবিধাজনক মনে করিয়া, বিশেষতঃ, নৌকা হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসীর পবিত্র ও মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইব ভাবিয়া, নৌকা ভাড়া করিলাম,

এবং নৌকা আরোহণে চলিতে লাগিলাম। প্রসন্ন পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীবক্ষে নৌকা চলিতে লাগিল। আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। নৌকা হইতে সৌধাবলী-বিমণ্ডিত বারাণসী চিত্রের মত দেখা যাইতে লাগিল। গঙ্গার উচ্চ তট হইতে জল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অসংখ্যসোপানশোভিত সুবৃহৎ ঘাটগুলি একটির পর আর একটি নয়নগোচর হইতে লাগিল। দেখিলাম, ঘাটে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতেছেন। ঘাটগুলি নরনারী দ্বারা পরিপূর্ণ। কেহ স্নানান্তে তর্পণ করিতেছেন, কেহ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, কেহ বা স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। ধর্ম্মের একটি জীবন্ত ভাব সকলের হৃদয়ে ওতপ্রোত রহিয়াছে। গঙ্গাতীর অসংখ্য ঘাটে পরিপূর্ণ। ঘাট ছাড়াইয়া অট্টালিকাশ্রেণীর পর অট্টালিকা শ্রেণী, যত দূর দৃষ্টি যায়, দণ্ডায়মান আছে। অট্টালিকা প্রস্তর-নির্ম্মিত; কোন কোন অট্টালিকা দ্বিতল, কোনটি ত্রিতল এবং কোনটি বা চারি তলবিশিষ্ট। গঙ্গা উচ্ছলিত বারিরাশি ও অনন্ত বীচিমালা বক্ষে লইয়া উত্তরবাহিনী হইয়া চলিয়াছেন। গঙ্গার খরস্রোত ভেদ করিয়া নৌকা দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিল। আমরা মুগ্ধনেত্রে ভুবনমোহিনী বারাণসীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষুর তৃপ্তি হয় না। কত যুগযুগান্তরের পুণ্য স্মৃতি বক্ষে লইয়া কাশী কালের গর্ব্ব উপেক্ষা করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছ! কত যুগযুগান্ত চলিয়া গিয়াছে, কত রাজ্যের উত্থান পতন হইয়াছে, অধ্যাত্ম জগৎ ও চিন্তার রাজ্যে কত পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, কত ধর্ম্মমতের অভ্যুত্থান ও বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে, পুণ্য-ভূমি বারাণসী তৎসমস্ত স্মৃতি বক্ষে লইয়া মানবের মনে জগতের অনিত্যতা জাগরূক করিয়া দিতেছে। কাশী দর্শন করিয়া হৃদয় কৃতার্থ হইল। আমরা বহুসংখ্যক ঘাট, অনন্ত হর্ম্ম্যাবলী ও জনসঙ্ঘ দেখিতে দেখিতে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট উপস্থিত হইলাম। আমরা পথে যে সকল ঘাট অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম, তন্মধ্যে পঞ্চগঙ্গা ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, ও দশাশ্বমেধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটটি অতি সুন্দর।

বাসায় জিনিস পত্র রাখিয়া এবং কতকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিলাম। তীরে উঠিয়া তটস্থ মন্দিরে যাইয়া চৌষট্টি যোগিনী দর্শন করিলাম। মায়ের মন্দিরে কেমন জীবন্ত ভাব! চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে দুর্গোৎসবের সময় মহাধুমধামের সহিত পূজা হয় এবং বহু ভক্তের সমাগম হয়। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির হইতে অনতিদূরে ৺ পাতালেশ্বর ও ৺ পুষ্পদন্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমরা তথায় যাইয়া শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। ৺পুষ্পদন্তেশ্বর মহাদেব পুষ্পদন্ত নামক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ৺ পুষ্পদন্তেশ্বর শিব দর্শন করিলে শিবপূজার নির্ম্মাল্য পদস্পৃষ্ট হওয়ার পাপ দূর হয়। পুষ্পদন্তই মহিম্নস্তোত্র নামক সুপ্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রের রচয়িতা। পুষ্পদন্তেশ্বর সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে। তাহা এই :—

পুষ্পদন্ত পরম শিবভক্ত ছিলেন; তিনি শিবপূজার জন্য প্রত্যহ রাত্রিশেষে শূন্যপথে অবতরণ করিয়া কাশীনগরীস্থ একটী উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিতেন। প্রভাতে উদ্যান পুষ্পশূন্য দেখিয়া প্রহরীগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইত। তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও পুষ্পাপহরণকারীকে ধৃত করিতে না পারিয়া, অবশেষে উদ্যানস্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় আলাপন করিল। উদ্যানস্বামী চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, শূন্যে বিচরণকারী কোন ভক্ত বিদ্যাধর কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ পূজার্থ পুষ্প অপহৃত হইয়া থাকে। মনে

মনে এই রূপ স্থির করিয়া তিনি উদ্যান-রক্ষিদিগকে উদ্যানের স্থানে স্থানে শিবপূজার নির্ম্মাল্য রাখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। এদিকে পুষ্পদন্ত রাত্রিশেষে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয় অন্ধকারে অজ্ঞাতসারে নির্ম্মাল্যের উপর পদক্ষেপ করিলেন। এই কারণে তাঁহার শূন্যে উড়িবার শক্তি বিলুপ্ত হইল; তখন তিনি বিপন্ন হইয়া কাতর প্রাণে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার বদন হইতে যে মনোহর স্তোত্র নির্গত হইয়াছিল তাহাই "মহিম্ন স্তোত্র" নামে প্রসিদ্ধ। পুষ্পদন্তের স্তবে মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন যে তিনি যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবেন সেই শিবলিঙ্গ যাঁহারা দর্শন করিবেন, শিবপূজার নির্ম্মাল্য পদদ্বারা স্পর্শ করার অপরাধ যেন তাহাদের না হয়। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। মহাদেবের কৃপায় তিনি আকাশে বিচরণ করার শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

আমরা ৺পাতালেশ্বর ও ৺ পুষ্পদন্তেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রী৺ বিশ্বেশ্বর দর্শনার্থ গমন করিলাম। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতে হইলে এই স্থান হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতে হয়। পথে দশাশ্বমেধ ঘাট দর্শন করিলাম। দশাশ্বমেধ ঘাট অতি পবিত্র। দশাশ্বমেধ ঘাটের তীরে শীতলা মন্দির। তথা হইতে কতকদূর পশ্চিমে আসিলে শ্রীশ্রী৺ দক্ষিণাকালীর মন্দির দৃষ্ট হয়। তথা হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইতে একটি গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। গলির উভয় পার্শ্বে সারি সারি বিটপিশ্রেণী। গলির পার্শ্বে একস্থানে শিবাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রস্তরময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। গলির ভিতর দিয়া কতকদূর অগ্রসর হইলে বিশ্বেশ্বরের পুরী দৃষ্টিগোচর হয়। পুরীতে প্রবেশ করিলে দ্বারের একপার্শ্বে ৺ ঢুণ্ঢীরাজ গণেশের মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বিশ্বেশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে ৺ ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ দর্শন করিতে হয়। আমরা ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ দর্শন করিয়া শ্রীশ্রী৺ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হইলাম।

বিশ্বেশ্বর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একতম। যথা—

"সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ
শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনং।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং
ওঙ্কারং সমরেশ্বরে।
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে
ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাস্তু বিশ্বেশং
ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
চিতাভূমৌ বৈদ্যনাথং
নাগেশং দ্বারকাবনে।
সেতুবন্ধে তু রামেশং
ঘুস্মেশং শিবালয়ে।
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং ধ্রুবং তস্য বিনশ্যতি॥"

বারাণসীক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গেরই বিশেষ মাহাত্ম্য। বিশ্বেশ্বর মন্দিরের নিকটে বিশ্বেশ্বরের প্রাচীর-বেষ্টিত পুরীর মধ্যে অসংখ্য শিবলিঙ্গ আছে। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়া সুবর্ণমণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও নাটমন্দির আয়তনে বৃহৎ নহে। মন্দিরটীও আধুনিক। বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছাড়াইয়া একটু উত্তরদিকে গেলে "জ্ঞানবাপী"; জ্ঞানবাপী একটী বৃহৎ কূপ। জ্ঞানবাপী হইতে একটু পূর্ব্বদিকে মহাবীরজির মূর্ত্তি। জ্ঞানবাপীর পশ্চিমে একটী শিলাতলে শিবলিঙ্গ অবস্থিত। জ্ঞানবাপীর উত্তর দিকে একটী অনুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ; এই পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির অবস্থিত ছিল। সম্রাট আরঙ্গজেব বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করিয়া ঐ স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ এইস্থানে নমাজ পড়িয়া থাকে।

অতঃপর আমরা অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইয়া অন্নপূর্ণা দর্শন করিলাম। অন্নপূর্ণার মন্দির বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে আয়তনে বৃহৎ এবং অপেক্ষাকৃত জমকাল। অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ও অতি সুন্দর। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়

আমরা বিমল আনন্দ লাভ করিলাম।

অপরাহ্নে বৃষ্টি হইতেছিল সুতরাং আমরা বাসা হইতে বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময় প্রাণে কি এক অননুভূত ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। সেই সময় অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য প্রাণ কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি তখনই গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্নপূর্ণার মন্দির মুখে চলিলাম। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, মায়ের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটী ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বাদ্যযন্ত্রের তালের সঙ্গে সঙ্গে অতি সুন্দর ভাবে আরতি করিতেছেন। অর্দ্ধঘণ্টার অধিক কাল আরতি হইল। আমি আরতি দর্শন করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম আমি অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরের আরতি শেষ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শন ঘটিয়া উঠিল না। শুনিয়াছি বিশ্বেশ্বরের আরতি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের যে আরতি হইয়া থাকে, তাহাই সাধারণতঃ যাত্রীগণ দর্শন করিয়া থাকেন মধ্য রাত্রে বিশ্বেশ্বরের আরতি ও ভোগ বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মধ্যরাত্রে প্রত্যহ একমণ দুগ্ধ দ্বারা বিশ্বেশ্বরের স্নান করান হইয়া থাকে; অতঃপর একশত ঘড়া গঙ্গাজল শিবলিঙ্গের উপর ঢালা হয়। পরে চন্দন ও পুষ্পমালা দ্বারা শিবলিঙ্গ সজ্জিত করা হয়। অতঃপর ভোগ ও আরতি হয়। মধ্যরাত্রের ভোগ ও আরতি কাশী-নরেশের ব্যয়ে তাঁহারই কল্যাণার্থ সম্পাদিত হয়।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ৺ কেদারনাথ দর্শনে গমন করিলাম। কেদারঘাট অতি বিস্তৃত। সোপানশ্রেণী অতি সুন্দর ও জমকাল। কেদারঘাটের দৃশ্য অতি মনোরম। এখান হইতে গঙ্গা অতি সুন্দর দেখায়। কেদারঘাটে স্নান করিয়া কেদারনাথ লিঙ্গ দর্শন করিলাম। এই স্থানে আরও দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন এই স্থানেই আদি মণিকর্ণিকা ও অন্নপূর্ণার মন্দির ছিল। কেদারনাথের মন্দির কাশীর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত।

কেদার ঘাটের কিয়দ্দূরে রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান। হিন্দুস্থানীগণ এইস্থানে মৃতদাহ করিয়া থাকেন। কেদারনাথ দর্শন করিয়া আমরা মণিকর্ণিকা ঘাটে উপস্থিত হইলাম। মণিকর্ণিকা অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে উত্তরদিকে অবস্থিত। মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকটে চক্রতীর্থ। মণিকর্ণিকা ও চক্রতীর্থে অবগাহন বিশেষ পুণ্যপ্রদ। কাশীতে মণিকর্ণিকা স্নানের মাহাত্ম্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমরা মণিকর্ণিকা ও চক্রতীর্থে স্নান করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। যাঁহারা প্রথম বার মণিকর্ণিকা ও চক্রতীর্থে স্নান করিতে আসেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে পাণ্ডাগণ জন প্রতি ১৲ টাকার কিছু বেশী করিয়া আদায় করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বেও কাশী দর্শন করিয়াছিলাম সুতরাং আমাদিগের নিকট পয়সার জন্য কেহ পীড়াপীড়ি করিল না। আমরা যদৃচ্ছা ক্রমে যাহা দিলাম তাহাতেই উপস্থিত ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইলেন। মণিকর্ণিকার নিকট মহা শ্মশান। এই শ্মশানে দিবারাত্র চিতা জ্বলিতেছে।

কাশীতে দর্শনীয় অনেক দেবালয় আছে, আমরা প্রধান প্রধান দেবালয়গুলি মাত্র দর্শন করিলাম। দক্ষিণ প্রান্তে দুর্গাবাড়ী অবস্থিত। এইটী কাশীধামের মধ্যে একটী বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান, এইস্থানে সুবর্ণময়ী দুর্গা প্রতিমা আছে। দুর্গাবাড়ীতে ৺ ভদ্রকালীর মূর্ত্তি আছে। দুর্গাবাড়ীর উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দুর্গাবাড়ীতে অনেক বানর দৃষ্ট হয়।

৺ তিলভাণ্ডেশ্বর ও ৺ বীরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিলভাণ্ডেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গনে ৺ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী অবস্থান করিতেন। সেইস্থানে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে। স্ত্রীলোকগণ পুত্রকামনায় ৺ বীরেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন। কাশীতে কয়েকটী পবিত্র কুণ্ড বা জলাশয় আছে, যথা অমৃতকুণ্ড, নাগকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড, পিশাচমোচন কুণ্ড প্রভৃতি। দুর্গাকুণ্ড ও জ্ঞানবাপীর কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নাগকুণ্ডের নিকট

প্রতিবৎসর বৃহৎ মেলা হয়।

কাশীতে বেণীমাধবের ধ্বজা দর্শনীয়। এইস্থানে পূর্ব্বে হিন্দু মন্দির ছিল। আরঙ্গজেব হিন্দু মন্দির ভঙ্গ করিয়া এইস্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। একটী গিরিশৃঙ্গের উপর মন্দির অবস্থিত ছিল।

কাশীর বর্ত্তমান হিন্দু মন্দির গুলির মধ্যে প্রায় সমস্তই আধুনিক। আরঙ্গজেবের সময়ে প্রাচীন মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দুই একটী মন্দির ব্যতীত বর্ত্তমান মন্দির গুলির অধিকাংশ ক্ষুদ্র। অন্নপূর্ণা মন্দিরটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এই মন্দিরটী পুনার রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গাবাড়ীর মন্দির প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

কাশীর মানমন্দির দর্শনীয় স্থান। অম্বরের রাজা জয়সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা জয়সিংহ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই মানমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং জ্যোতির্গণনা ও গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্ণয়ের যন্ত্রাদি স্থাপন করেন। মান মন্দির ও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া যাইতেছে।

কাশী ষ্টেশনের নিকট একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রাচীনকালে জনৈক হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে এইস্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

কাশীর কুইন্‌স্ কলেজ (Queen's College) এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এই কলেজের অট্টালিকা অতি সুন্দর ও গভীর ভাবব্যঞ্জক। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী 'গথিক' ধরণের। এই কলেজে অতি সুন্দর লাইব্রেরী আছে এবং এই লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। কলেজের উদ্যানে একটী প্রস্তর-স্তম্ভ আছে। ইহা গাজিপুর হইতে আনীত হইয়াছে। এই স্তম্ভের গাত্রে বৌদ্ধ শিলালিপি আছে।

কাশী অতি প্রাচীন নগরী। কাশী চিরকাল হিন্দু ধর্ম্মের কেন্দ্র। বৌদ্ধ যুগে কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। গৌতমবুদ্ধ কাশীর সন্নিহিত সারনাথ নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন। বুদ্ধদেবের সময় হইতে খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত অনুমান ৮০০ বৎসর কাল কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্‌থ্‌ সিয়াং ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি বারাণসী ধামে হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য অবলোকন করিয়াছিলেন। হিউয়েন্‌থ্‌ সিয়াং বলিয়াছেন বারাণসী সেই সময় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। বারাণসীর অধিবাসীগণ অতি কোমলহৃদয় ছিল। এবং বিদ্যাচর্চ্চায় তাহাদের একান্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা ছিল। বারাণসী রাজ্যে তৎকালে অনুমান ৩০টী সঙ্ঘারাম ও প্রায় ১০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল।

ভারতবর্ষে থিয়সফিকেল সোসাইটির (Theosophical society) দুইটি প্রধান কেন্দ্র আছে। সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র মান্দ্রাজের সন্নিহিত আডিয়ার (Adyar) নামক স্থানে। দ্বিতীয় কেন্দ্র বারাণসী ধামে। এই সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বারাণসীস্থ সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ দর্শনীয় জিনিস।

বারাণসী নগরীতে রামকৃষ্ণ আশ্রম নামে যে সেবাশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা দেশময় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সেবাশ্রম বাঙ্গালীর গৌরবের জিনিস।

কাশীতে খাদ্য দ্রব্য অতি সুলভ। কাশীর জলবায়ু উৎকৃষ্ট। আমি ১২৯৯ সনে যখন কাশীধাম দর্শন করি তখন কাশী ধামের বাঙ্গালীটোলা বড় অপরিষ্কার ছিল। এখন পূর্ব্বের তুলনায় অনেক স্বাস্থ্যকর হইয়াছে।

কাশীতে পূর্ব্বে গুণ্ডাদের বড় উপদ্রব ছিল। বিশ্বেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার যে গলি আছে তাহার মধ্য হইতে গুণ্ডাগণ স্ত্রীলোকদের গায়ের গহনা বলপূর্ব্বক লইয়া পলায়ন করিত। এখন গুণ্ডার উপদ্রব অনেক কমিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কাশীর চক বড় সুন্দর। কাশীর রেশমী বস্ত্র ও সাড়ি প্রসিদ্ধ।

বারাণসী আনন্দ কানন। বারাণসী গেলে মনে কেমন আনন্দ

[illegible] হয়। দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া বারাণসী বাস না করিলে বারাণসীর দেবালয় ও দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা সম্পূর্ণ সম্ভব-পর নহে। বারাণসীর বিস্তৃত পৌরাণিক বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড পাঠ করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন

আঁধারে

(শ্যাম)

হে অনন্ত! প্রশান্ত! উদার!
ঢালো ঢালো আরো ঢালো—
নিবিড় নিকষ কালো
তপ্ত বুকে সুপ্ত বসুধার
হে সুন্দর সুধার আধার!

হে অনন্ত! হে একীকরণ!
ঢেকে ফেল বসুন্ধরা
দিয়ে তব ছন্দ ভরা
স্নিগ্ধ শুচি কৃষ্ণ আস্তরণ।
ত্রিভুবনে দেহ শ্রীচরণ!

কৃষ্ণকান্ত রাধিকারমণ!
অনন্ত মরণ দিয়ে
ধরণীকে রাখ জীয়ে
তমমালী! কালীয়-দমন!
হে অমৃত! সুহৃৎ! শমন!

নবঘন! নভআভরণ!
হে অনঘ! ভববন্ধু!
মহাকাল! কালসিন্ধু!
নিরঞ্জন!—অঞ্জনবরণ!

হে বান্ধব! হে আর্তশরণ!
নাহি চাহি পীত শাদা
আলোকে—গোলক ধাঁধা!
লহ অঙ্কে কলঙ্ক-হরণ
ওহে শ্যাম! মঙ্গল মরণ

(শ্যামা)

ছাঁদন বাঁধন হারা
স্রবিছে শ্রাবণ ধারা
ডুবে গেছে শশি তারা
ক্ষণিকের আলো

আলু থালু কাল কেশ
একি দিগম্বরী বেশ!
নাহি আদি—নাহি শেষ
শুধু কালো—কালো!
টুপ্ টুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্
ঢালো আরো ঢালো!

দুরন্ত পাগলি, মেয়ে!
কোন গাঙে আলি নেয়ে
কালিন্দীর কালী দিয়ে
করে দিলি কালো!
মেঘের কাজল কি গো
এত লাগে ভালো?

কাঁদে গৃহহারা—
এমন বাদ্‌লা নিশি—
(জল ভরা কাল শিশি)
মিশে গেছে দশ দিশি
নাহি সোর সাড়া—
কার তরে হেঁকে হেঁকে
ঘনু ঘন দেয়া ডেকে
হাতে নিয়ে খাড়া
দিস্ মা পাহারা?
জ্বেলে বিদ্যুতের শিখা

ভালে দে মা রাজটীকা
আঁধারে মা দেহ দীক্ষা
অগ্নি শিব-দারা।
তুমি যে আমার শ্যামা
এলোকেশী তারা।

শ্রীকুলচন্দ্র দে

পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত গ্রন্থকারদের রচনা হইতেই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য দেশে প্রচলিত হইল ;—কিন্তু ইঁহাদের লেখনী গদ্যযুগের অঙ্কুর মাত্র প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইল, পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের সম্যক্ গঠিত লিপি-কুশলতা ইঁহাদের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না।

ক্রমে দেশে ইংরেজী সাহিত্যের প্রচলনে ও পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার পাওয়ায় তৎপরবর্ত্তী কালের অনেক মনীষী ব্যক্তি সুষ্ঠু ও সতেজ বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য গঠনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। বিগত যুগভাগে রাজা রামমোহন রায় অগ্রদূত স্বরূপ বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যের প্রতি যে আস্থা প্রদর্শন করেন—তাহাই এই যুগভাগের কতিপয় মহাপুরুষের সাধনার বিষয় হইয়া উঠিল। এই ক্ষেত্রে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ বাণীর বরপুত্রগণের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানরাশির প্রচার ও নানা ভাষা হইতে রত্ন আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি করা ইহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল। ইঁহাদের সকলেই মহাশক্তিশালী লেখক অথচ ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায়ই বিশেষত্ব আছে।

ইঁহারা কেহ কাহারও অনুকরণ না করিয়া নিজমতে সকলেই বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। এই সকল লেখকের বিভিন্নরূপ রচনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কাহারও কাহারও রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইবে। কিন্তু যাঁহার ভাষায় এই যুগভাগ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে—যাঁহাকে এই যুগভাগের প্রতিনিধি গণ্য করা যাইতে পারে—তিনি মহামতি বিদ্যাসাগর। সে কালেও অন্য তন্ত্রে শিক্ষিত সমাজের বাহিরে অবস্থিত পণ্ডিত সমাজ ছিল। এই সমাজে বিদ্যাসাগরী ভাষা বিশেষ প্রতিপত্তি পায় নাই। কিন্তু, তাৎকালিক শিক্ষিত সমাজ ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের ভাষা গদ্যে ভাব প্রকাশের সর্ব্বোপযোগী রচনা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ সম্পর্কে সেকালের প্রসিদ্ধ সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন কি বলিয়াছেন তাহা শুনুন।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" হইতে উদ্ধৃত—

১। "আমরা অনেকক্ষণ হইল ইদানীন্তনকালে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু যাঁহাকে লইয়া ইদানীন্তন কালের এত গৌরব তাঁহার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। তিনি—সুগৃহীতনামা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়"।

আবার—

২। "এক্ষণে যে সুশ্রাব্য সংস্কৃত শব্দসংশ্লিষ্ট বাঙ্গালা গদ্য রচনার বিশুদ্ধ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'ই তাহার মূল কারণ। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র পূর্ব্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালা রচনা ছিল না। বিদ্যাসাগরই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও প্রথম বলিয়া বোধ হয়, সবিশেষ প্রযত্নে বিরচিত হইয়াছে। এই জন্যই উহার রচনা যেরূপ কোমল, মনোহর ও মধু-বর্ষিণী হইয়াছে, বিদ্যাসাগরেরও অন্য কোন পুস্তকের রচনা সেরূপ হয় নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে ঐ পুস্তক যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে বিদ্যাসাগরও ভাবিয়াছিলেন যে দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-সমন্বিত রচনা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালার উপযোগিনী হইবে। এই জন্য প্রথম বারে প্রকাশিত পুস্তকের একস্থানে—"উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল উৎফুল্ল-ফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর-তিমি-মকর-নক্র-চক্র-ভীষণ স্রোতস্বতীপতি-প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য

ভর উভূত হইল" এইরূপ রচনা ছিল। কিন্তু ওরূপ রচনা বাঙ্গালার মধ্যে থাকা উচিত নহে, এই কথা বোধ হয় তাহার নিজেরই মনে পরে উদিত হওয়ায় এক্ষণকার সংস্করণে ওরূপ ভাগ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

আবার—

৩। "বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সুমাদর পূর্ব্বক গ্রহ করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই সেই পুস্তককে আদশণ স্বরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছে।"

এই যুগভাগের অপর শ্রেষ্ঠ দুই লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর ও কালী প্রসন্ন সিংহ। ইঁহাদের রচিত প্রসিদ্ধ দুইখানি গ্রন্থ "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতোম প্যাচার নক্‌সা"। এই গ্রন্থ দুই খানিতে দেশে এক অভিনব প্রলয় উপস্থিত করে। বই দুইখানি সহজ, চলিত ভাষায় লিখিত এবং লঘুজ্ঞানে দেশের কোনও খুটিনাটি বৃত্তান্তই ইহা হইতে বাদ পড়ে নাই। এই প্রকার রচনা পরবর্ত্তী যুগভাগের অগ্র দূতের ন্যায় হইলেও তখনকার সহিত্যরথিগণ উহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া কাণ ঢাকিয়া বসিলেন। এই অভিনব রচনা তাঁহারা কি ভাবে গ্রহণ করিলেন তাহা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত সমালোচনা পাঠে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষা অপেক্ষা ইহার ভাষা কিছু স্বতন্ত্ররূপ;—সাধারণ লোকে পরস্পর যেরূপ ভাষায় কথোপকথন করে, এই পুস্তকের অধিক ভাগই সেইরূপ গ্রাম্য ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অগ্রে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—যথা

"শালের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই" টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও 'শালার গরু চলতে পারে না, বলে লেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছক্‌ড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছক্‌ড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুমদার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স্ টংয়স্ ডংয়স্ করিয়া চলিতেছে—পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোন ক্রমেই চাল্ বেগড়ায় না।' ইত্যাদি।

"এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা অবলম্বন করা ভাল? কি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমারাদি প্রবর্ত্তিত ভাষা গ্রহণ করা ভাল?—এ প্রশ্নের মীমাংসা করা কিছু কঠিন। কারণ লোকের রুচিই এ বিষয়ের প্রমাণ—সকল লোকের যাহা ভাল লাগিবে, তাহাকে অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ ভাষার রচনাই এক্ষণে অনেক লোকের অধিক প্রীতিপ্রদ হইতেছে, এবং সেইজন্যই এইরূপ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং দিন দিন তাদৃশ পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ এবম্বিধ ভাষাতেই 'হুতোম্ পেঁচার নক্‌সা' প্রণয়ন করিয়া সমাজে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। আজি কালি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে সকল উপাখ্যান পুস্তক লোকে আদরপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, সে সকলেরও ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে প্রায় এইরূপ। অতএব এই ভাষা সাধারণ লোকের কতক মনোরঞ্জন করিয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থ রচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। 'হুতোম পেঁচা' বল, 'মৃণালিনী' বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ওসকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি? বোধহয় পারিবেন না। কেন পারিবেন না;—ইহার উত্তরে অবশ্য

এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালীভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠক দিগের আবশ্যক। ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; একবিধ রচনা পাঠে সর্ব্ববিধ পাঠক দিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে—অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় হাস্য পরিহাসাদি লঘুবিষয়ের বর্ণনায় আলালীভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।"

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "লজ্জাবোধ" আমাদের কালে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, কালের পরিবর্ত্তনে এইরূপ মতপরিবর্ত্তন স্বাভাবিক মাত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিজ লেখনী হইতে এ বিষয়ে প্রয়োজ্য একটি গল্প তুলিয়া দিতেছি।

"সংস্কৃতশাস্ত্রে পরমপ্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভটাচার্য্য মহাশয়গণ" সম্পর্কে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।—

"অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে কঠিন জটিল ও দুর্ব্বোধ রচনাতেই পণ্ডিত্য প্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজ বাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—"এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে!—এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।"

সেকালের লেখকেরা যাহাই বলুন আমাদের মতে এই দুইখানি গ্রন্থই দেশে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের এক নূতন যুগভাগ আনয়ন করিয়াছে। আমরা মনে করি বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রের উজ্জ্বলতম রত্ন পরবর্ত্তী যুগভাগের নিয়ন্তা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষয় ও রচনার এই দুইখানি গ্রন্থই অনেকাংশে পথপ্রবর্ত্তক। জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট্ যেমন যীশুখৃষ্টের পূর্ব্বাভাস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে তেম্‌নি এই দুইখানি বহি বঙ্কিমের সরস উপন্যাসগুলির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। একারণ এই দুইজন দূরদর্শী গ্রন্থকার আমাদের সুবিশেষ শ্রদ্ধার এবং ইঁহাদের রচনা আমাদের বিশেষ আলোচনার যোগ্য

শ্রীভূপালকুমার দত্ত।

ছিন্ন-তন্ত্রী।

তোমারি কোমল করে হৃদি-বীণা মম
মধুরে বাজিত দেবী, নিত্য নিরুপম
আকুল আবেগ ভরে! সুরের লহর
মাতায়ে মোহিয়ে বুঝি বিশ্ব-চরাচর
আনন্দে সাজাত অর্ঘ্য ও চরণ 'পর
আপনা উৎসর্গ করি! তব স্নেহাদর
অমৃত উৎসের হেন উৎসারি' নিয়ত

রেখেছিল ঘেরি তারে, করিয়া জাগ্রত
এ বিশাল বসুধায়! আজ তুমি নাই;
শূন্য শুষ্ক মরু-সম মোর চারি ঠাঁই
অনল উগারে শুধু! তব প্রিয় বীণ
পড়ে আছে এক কোণে যতন-বিহীন
তন্ত্রী ছিন্ন ধূলিলিপ্ত; কে বাজাবে আর
চিরতরে ভুলে গেছে ললিত ঝঙ্কার!

শ্রীজীতেন্দ্রকুমার দত্ত।

শাল্য বিজ্ঞান ও অপনয়ন।

শল অথবা শ্বল ধাতুর অর্থ গমন করা; শল্য-শব্দ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। শল্য দুই প্রকার শারীরিক ও আগন্তুক। সকল শল্যই পীড়া দায়ক। রোম নখ, সপ্তধাতু মল, এবং বায়ু পিত্ত কফ শরীর মধ্যে দুষিত হইলে তাহাদিগকে শারীরিক শল্য কহে। ইহা ব্যতীত অপর যাহা কিছু শরীরের পীড়াদায়ক হয় তাহাকে আগন্তুক শল্য কহে। আগন্তুক শল্য বৃক্ষময়, তৃণময়, বেণুময়, ধাতুময়, শৃঙ্গময় বা অস্থিময় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ধাতুময় শল্যই বিশেষ পীড়াদায়ক, কেননা উহা প্রায়ই সূক্ষ্মমুখ এবং দুর হইতে যোজিত হয় বলিয়া প্রাণ বিয়োগকারী। ধাতুময় শল্য নিক্ষিপ্ত হইলে, ঊর্দ্ধ, অধঃ পশ্চাৎ বক্র ও সরল এই পাঁচ প্রকার গতি হইয়া থাকে এবং এই গতি প্রতিহত হওয়া প্রযুক্ত শরীর মধ্যে ত্বক, মাংস শিরা স্নায়ু অস্থি প্রভৃতি ব্রণ বস্তুতে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শর অথবা বন্দুকের গুলিই বিশেষ ভয়াবহ। নিক্ষিপ্ত গুলি অথবা শর যদি গতিবেগে শরীর ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া যায়, তবে তাহার গতি সরল হয় এবং ফুস্ ফুস্ রক্তাশয় অন্ত্র, পাকাশয় ও আমাশয় ভেদ হইলে প্রায়ই মৃত্যু ঘটে। নচেৎ ব্রণবন্ধন অনুযায়ী নিয়মাদি প্রতি পালন করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি উক্ত—নিক্ষিপ্ত শল্য অস্থি মাংসাদি দ্বারা প্রতিহতগতি হয় তবে বক্র গতিতে শরীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া থকে। বাঁশের কন্চি অথবা খর্জ্জুর বৃক্ষের কাঁটা অথবা উক্ত প্রকার মসৃণ পৃষ্ঠ কোন পদার্থ যদি বিদ্ধ হওয়ায় এক দিবস মধ্যে বাহির না করা হয় তবে তাহা বিদ্ধ স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। (এমত ও দেখা গিয়াছে পায়ে বিদ্ধ কাঁটা স্কন্ধদেশ দ্বারা কিছুদিন পরে বহির্গত হইয়াছে)। এবং শারীরিক গতিতে শরীরের অন্য প্রদেশে গমন করিয়া ব্রণ উৎপাদন করে। অস্থিময় শল্য শরীব মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিলে কাল ক্রমে ক্রমশঃ ভগ্ন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া শীর্ণ হইতে থাকে। লৌহময় শল্য শরীরে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে। বৃক্ষময় বেণুময় তৃণময় শৃঙ্গ, দন্ত, কেশ, উপলখণ্ড-ময় শল্য দেহ হইতে নির্গত না হইলে রক্ত মাংস পাক করিতে থাকে। কনক, রজত তাম্র, পিত্তল, রাঙ্গ অথবা সীস শরীরে প্রবিষ্ট হইলে পিত্ত তেজের প্রতাপে কিছুদিন পরে শরীরে বিলীন হইয়া যায়। যে সকল দ্রব্য মৃদু বা শীতল তাহা শরীর মধ্যে থাকিলে ক্রমশঃ ধাতুব সহিত মিলিয়া যায়।

অতঃপর শরীর মধ্যে শল্য লুপ্ত থাকিলে যে সব লক্ষণ হয় তাহা এবং লুপ্ত শল্য নির্ণয়ের উপায় কহিতেছি। এই লক্ষণ দুই প্রকার সামান্য ও বিশেষ। ব্রণের স্থান অজ মাংস বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ দাহ ও ফুলা ও বেদনা বিশিষ্ট এবং

কঠিন হইয়া থাকে। মাংস মধ্যে বদ্ধ হইলে শল্যটী মাংস দ্বারা আবৃত থাকে। চোষ ও অসহনীয় যাতনা হয় এবং ব্রণ পাকিয়া উঠে। মাংসপেশী মধ্যে বদ্ধ হইলে, শল্য মাংসগত হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সমস্ত লক্ষণ হয়; কিন্তু চোষ ও শোথ হয় না। শিরা মধ্যে রুদ্ধ হইলে, শিরা স্ফীত হয় ও তাহাতে বেদনা ও শোফ হইয়া থাকে। স্নায়ু মধ্যে থাকিলে, সেই স্থানের সকল স্নায়ু উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতে সংরম্ভ ও উগ্র বেদনা হয়। স্রোত মধ্যে অর্থাৎ রসরক্তবাহিনী শিরা বা শরীরের দ্বারের মধ্যে শল্য রুদ্ধ হইলে, স্রোতঃপথের কার্য্যের হানি হয়। ধমনী মধ্যে থাকিলে, ফেনাযুক্ত রক্তস্রাব হয়, শব্দ সহকারে বায়ু বহির্গত হয়, এবং শরীরে কামড়ানি, পিপাসা, ও বমি হয়। অস্থিগত হইলে, ফুলিয়া উঠে ও বিবিধ প্রকার বেদনার প্রাদুর্ভাব হয়। অস্থির ছিদ্র মধ্যে বদ্ধ হইলে, অস্থির পূর্ণতা ও বেদনা হইয়া বায়ু বলবান্ হইয়া উঠে। সন্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অস্থিস্থানের ন্যায় সমস্ত লক্ষণ ও সন্ধিস্থান ক্রিয়ারহিত হয়। কোষ্ঠ স্থানে থাকিলে, অটোপ ও অনাহ হয়, এবং ব্রণমুখ হইতে মূত্র, পুরীষ, ও ভুক্ত দ্রব্য দৃষ্ট হয়। শল্যের সূক্ষ্ম গতিতে এই সব লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। বিশুদ্ধ দেহে সূক্ষ্ম বা স্থূল শল্য অনুলোমভাবে প্রবেশ করিলে, ভিতরে শল্য বদ্ধ থাকিয়া ব্রণমুখ পুরিয়া উঠে। বিশেষতঃ, কণ্ঠ, স্রোত, শিরা, ত্বক, অস্থিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রণমুখ পুরিয়া, দোষের প্রকোপে, ব্যায়ামে, অথবা শরীরে কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থান হইতে প্রচলিত হইয়া পুনর্ব্বার ক্লেশকর হইয়া উঠে।

শল্য নির্দ্দিষ্ট করার প্রণালী।—যদি ত্বকের নিম্নে শল্য নিরুদ্দেশ হয়, তবে ঘৃত, চন্দন অথবা মৃত্তিকার প্রলেপ দিলে, শল্যস্থিত স্থানের উষ্ণতা দ্বারা প্রলেপ শুষ্ক অথবা ঘৃত দ্রব হইয়া যাইবে।

মাংসের নিম্নে শল্য অবস্থান করিলে, পূর্ব্বে অবিরুদ্ধ ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা রোগীকে কৃশ করিবে, তৎপর টিপিয়া দেখিলে যে স্থানে সংরম্ভ ও বেদনা হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জানিবে।

কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধিবিবরে শল্য অনুদ্দিষ্ট থাকিলে, অথবা শিরা, ধমনী, স্নায়ু, স্রোতমধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, রোগীকে ভগ্নচক্রযুক্ত যানে আরোহণ করাইয়া বিষম পথে গমন করাইলে, অনুদ্দিষ্ট শল্য স্থানে সংরম্ভ ও বেদনা অনুভূত হইবে।

অস্থি মধ্যে শল্য থাকিলে, অস্থি-স্থানে বন্ধন ও পীড়ন করিলে সংরম্ভ ও বেদনা হইবে। সন্ধিস্থানে শল্য থাকিলে, সেই স্থানে স্নেহ ছেদপূর্ব্বক সন্ধি আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলে, সন্ধিস্থানে বেদনা ও সংরম্ভ হইবে। মর্ম্মস্থানে থাকিলে, তজ্জন্য ভিন্ন পরীক্ষার আবশ্যক করে না; কেন না, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি মধ্যেই মর্ম্ম অবস্থান করে। এতদ্ব্যতীত, হস্তী বা অশ্বের পৃষ্ঠে গমন, বৃক্ষে আরোহণ, উল্লম্ফন, সন্তরণ, ব্যায়াম, এবং পথগমনকালে, অথবা জৃম্ভা, উদ্গার, কাশ, ক্ষবথু, হসন, প্রাণায়াম, অথবা মূত্র, পুরীষ ও শুক্র ত্যাগ কালে অনুদ্দিষ্ট শল্য স্থলে বেদনা বা সংরম্ভ হইবে। শরীরের যে স্থান চিক্কণতাহীন বা বেদনা ও ভারবোধ হয়, অথবা রগরাইলে রসরক্তস্রাব হয়, বা রোগী যে স্থান সর্ব্বদা রক্ষা করে বা মর্দ্দন করে, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া নিরূপণ করিবে। অল্প পীড়া থাকিলে, অথবা ফুলা ও বেদনা রহিত হইলে, বা ব্রণের স্থান উন্নত না থাকিলে, এষনি দ্বারা ব্রণ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এবং পীড়িত অঙ্গ অবাধে কার্য্যক্ষম হইলে, শল্য নাই বলিয়া জানিবে। ব্রণমধ্যগত দুই প্রকার শল্য ও তাহার পাঁচ প্রকার গতি যিনি জানেন, তিনিই বৈদ্য।

শল্য অপনয়ন।

শল্য উদ্ধারের উপায় পঞ্চদশ প্রকার; যথা—স্বাভাবিক ক্রিয়া, পাচন, ভেদন, দারণ, পীড়ন, প্রমার্জন, বমন, বিরেচন, প্রক্ষালন, প্রতিহর্ষণ, প্রবাহন, আচূষণ, আয়স্কান্ত এবং হর্ষ। তন্মধ্যে অশ্রু, ক্ষবথু, কাশ, বমন, উদ্গার, মূত্র, পুরীষ এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারাও অনেক শল্য বাহির হইয়া থাকে। শল্য দৃঢ়রূপে শরীরে বদ্ধ হইলে, সেইস্থান দগ্ধ করিবে। পরে পাকিয়া উঠিলে পূয ও শোণিত বেগে আপনিও বাহির

হইতে পারে। যদি না হয়, তবে সেই স্থান ভেদ করিয়া যন্ত্র বা অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিয়া শল্য বাহির করিবে। চক্ষে ক্ষুদ্র শল্য থাকিলে, জলসেচন, কেশ বা হস্তমার্জ্জনা করিবে। ভুক্ত দ্রব্য গলনালীতে বদ্ধ হইলে, কাশি, বমন, বা অঙ্গুলী দ্বারা বাহির করিবে; পাকাশয়ে আবদ্ধ হইলে, বিরেচন দ্বারা নির্গত করিবে মূত্র,পুরীষ স্থানে কিম্বা গর্ভাশয়ে থাকিলে, বেগপ্রদানে বাহির; করিবে। শোণিত বা স্তন্য বিষযুক্ত হইলে, মুখ দ্বারা বা শৃঙ্গ দ্বারা চুষিয়া বহির্গত করিবে। যে শল্য অল্পবিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা অয়স্কান্ত মণি দ্বারা বাহির করিবে। হৃদয়ে শোকরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে, হর্ষ উৎপাদন দ্বারা অপনয়ন করিবে। শিরা বা স্নায়ুতে শল্য বিদ্ধ হইলে, পূর্ব্বে শলাকা দ্বারা পৃথক করিয়া পরে বাহির করিবে। হৃদয়ের কোন স্থানে বিদ্ধ হইলে অগ্রে রোগীকে শীতল জলাদি দ্বারা ব্যাকুলিত করিয়া সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক যত সহজে সম্ভব শল্য অপনয়ন করিবে। অস্থি বা অন্য কোন দ্রব্য তির্য্যক্‌ভাবে গলনালীতে আবদ্ধ হইলে, একটী চুলের লুটী প্রস্তুতপূর্ব্বক লুটীর এক প্রান্তে সূত্র বন্ধনপূর্ব্বক দ্রব দ্রব্য পানের সহিত উদরস্থ করাইবে, এবং উক্ত পানীয় কণ্ঠ পর্য্যন্ত পান হইলে পর বমন করাইবে, এবং যখন এমন বোধ করিবে যে, চুলের লুটী শল্যে আবদ্ধ হইয়াছে,তখন হঠাৎ টান দিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে, অথবা জল পান করাইয়া অধোমুখে রাখিয়া রোগীকে শব্দ ও বমন করাইবে, অথবা গলা পর্য্যন্ত ভস্ম মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। তাহাতে যদি কণ্ঠনালী ক্ষত হয়, তবে ঘৃত, মধু, শর্করা সহিত ত্রিফলাচূর্ণ পান করিতে দিবে। ভুক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণকালে যদি কণ্ঠদেশে কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হয়, তবে পীড়িত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠদেশে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে। অস্থিতে বিদ্ধ হইলে, যন্ত্র দ্বারা বলপ্রয়োগে বাহির করিবে। শল্য যদি এই প্রকার বিদ্ধ হয় যে তাহাকে সহজে টানিয়া বাহির করা যায় না, তবে তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিবে। ইহাতে যদি বায়ু কুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া শরীরের সকল দ্বার রোধ করাইয়া দেয়, এবং মুখ হইতে লালা ও ফেনা নিঃসৃত হইতে থাকে, ও রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, তবে তৈলাদি মর্দ্দন ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ করাইবে; মুহুর্মুহুঃ শীতল জলদ্বারা আশ্বাসিত করিবে এবং রোগীকে বিরেচনার্থ তীক্ষ্ণবীর্য্য রস ও বায়ুশান্তি জন্য অন্যবিধ বিধান সকল অবলম্বন করিবে। শল্য নির্গত হইলে ঘৃত, অগ্নির স্বেদ দিবে। অনন্তর ব্রণ-বন্ধনোপযোগী নিয়মাদি পালন করিতে উপদেশ প্রদান করিবে।

শ্রীমোহিনীমোহন দাস।

সংস্কৃত নাটকে নানান্ ভাষা *

কবি গাহিয়াছেন' "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ॥" ভাষার ভিতর দিয়া মায়া-মমতার, প্রীতি-বিশ্রম্ভের স্রোত বহিয়া যায় বলিয়াই সমাজবদ্ধ মানবজাতির মধ্যে স্বভাষার প্রতি হৃদয়ের এত অকৃত্রিম অনুরাগ। তাই বৈদিকযুগের প্রবীণ প্রাতিশাখ্যকার হইতে বর্ত্তমান যুগের নবীন ভাষাতত্ত্বিদ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বভাষা, স্বকীয় dialect, সূক্ষ্ম স্থূল, সকলরূপ বিশেষত্বটুকু লইয়া এত আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। কাজেই স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, নানান দেশের নানান্ ভাষা লইয়া, নানান্ সাহিত্যিক রীতির বিচিত্রসূত্রসমবায়কে নানান্ ভাবে ধোলাই করিয়া যে সাহিত্যশিল্পী সুদূর অতীতে তাহাদের সাহায্যে এক অভূতপূর্ব্ব সাহিত্য-সতরঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি কি প্রকৃতির রীতির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছিলেন, অথবা ভাবজগতে উচ্চ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে মিলে; এবং সে উত্তর আপাততঃ বিচিত্র বলিয়া মনে হইলেও, এক বই দুই নহে সঙ্গত বই অসঙ্গত নহে। দক্ষ শিল্পী তাঁহার পরিণত কারুকলা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, প্রকৃতির মূলতত্ত্ব তাঁহার সূক্ষ্ম শিল্পে অনুস্যূত ছিল, তাই নানান্ দেশের নানা

* উত্তর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে পঠিত

ভাষা দিয়া, নানান্ জনপদের নানান্ উপাদান দিয়া সাহিত্যে এক সুবৃহৎ মর্ম্মরপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আমরা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কথাই বলিতেছি। নাটকে নানান্ ভাষার প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন করার, বহুকে একের অঙ্গীভূত ও অনুগামী করার, জনপদপ্রীতিকে সার্ব্বভৌম ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ভার সংস্কৃত সাহিত্যের সাহিত্যিকের উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল। সে ভার সুসম্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এ বিশেষত্ব অনন্য ও অননুকরণীয় হইয়াছে। অবশ্যই নাট্যসাহিত্য বলিয়াই এতদৃশ নূতনত্বপ্রবর্ত্তন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।* নাটকে ঘটনাপরম্পরার, কর্ম্মশক্তির একটা অবাধ, অপ্রতিহত গতির প্রয়োজন; গীতিকাব্যে ভাবের দানা জমাট হইয়া বাঁধিতে পারে, বাঁধিয়া থাকে; মহাকাব্যের চরিত্র-সম্পদে আদর্শ জগতের একটা বিশ্বাতিগ, অবাস্তব ব্যাপ্তিময়ত্বের সন্ধান মিলে, এক নাট্য সাহিত্যেই ঘটনাজালের ও পাত্রবর্গের ভিতর দিয়া দ্রুতপ্লাবিনী কর্ম্মধারার এক তরল স্বাদু বাস্তব খরস্রোত অবিরত প্রবাহিত। বৈচিত্র্য লইয়াই জীবনীশক্তির সত্তা ও স্থিতি—আর রূপকে জীবনের তত্ত্বের রূপণ। তাই সংস্কৃত নাটকে নানান্ ভাষার বিচিত্র সমন্বয়, ভাবের পটে উজ্জ্বলে-মধুরের অপূর্ব্ব রেখাপাত, পাত্রবৃন্দের বিশ্বব্যাপী ঘনিষ্ঠ সমাবেশ। নাটক প্রকৃতির এমন নিখুঁত নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া সংস্কৃত নাট্যকার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার কঠিন-কঠোর মিলনে অঘটন ঘটন-পটু হইয়াছেন—আর এ অঘটন-ঘটন-পটুত্ব মায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

এ কথাও বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত নাটককার এমন নূতন কিছু করেন নাই। মানবজাতির সারা নাট্য-সাহিত্যেই নাটক প্রকৃতর অনুকূল ও মূলীভূত ভাষার তারতম্য, ইতর বিশেষ বজায় রহিয়াছে। প্রতীচীর নাট্যসম্রাট্ শেক্স্পিয়ারের নাটকাবলীর ভাষার বিশ্লেষ কর, দেখিবে 'ভাষার' এ তারতম্য সেখানেও বর্ত্তমান। বিশেষতঃ, যেখানে বাস্তব জীবনের ঘটনার নিত্য নব ঘাত-প্রতিঘাত, সেখানে পাশ্চাত্য কবির ভাষা এক হইলেও বহু-বহুতর (১)। অগম্ব-মস্তিষ্ক, চপল-সরল 'টম্‌বটমের' ভাষা আদরিণী, সোহাগিনী, গরবিণী, পরি-রাণী টাইট্যানিয়ার ভাষা হইতে মূলতঃ বিভিন্ন। নৈরাশ্যখিন্না, আত্মাভিমানিনী রাজবধূ Constance কর্ম্মকুশল, স্বভাবচপল Falconbridge এর ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন নাই; ধীরোদাত্ত, সহৃদয় ডেনমার্ক-রাজকুমারের চিত্তভাব লঘু করিতে কবিকে যে ভাষার ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, সমাধি-স্থানে সমবেত, চপলপ্রকৃতি ছোটবিটু সে ভাষায় বাস্তবরাজ্যে কথা কহিবার সুযোগ পায় না। অথবা অত দূরের কথা কেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করা যাউক, সেখানেও ঐ একই তত্ত্বের সন্ধান মিলিবে। প্রগলভ্ রাজকবি রায়গুণাকরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি চণ্ডীনাটকের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই যাউক, 'নাটুকে নারায়ণ' (২) হইতে নবীন নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেরই নাটকে ভাষার বৈচিত্র্য, বহুরূপিত্ব রকমফের মিলে। এটীর অভাবে ভাষা পঙ্গু ও অসাড় হইয়া পড়ে, ভাব ক্লিষ্ট ও জড়তার অবসাদে মুহ্যমান হয়, চরিত্র-গত বিকাশের হানি ঘটে।

কাঙ্গালের রাজবসন শোভা পায় না; সংস্কৃত আলঙ্কারিকের তথাকথিত সমতাও নাট্যগ্রন্থে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে বিষম সমস্যার সৃষ্টি করে। সংস্কৃত নাটক-কারের পক্ষে এইটুকু বক্তব্য এবং এইটুকু বলিলেই তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় মিলিবে যে, অন্য সাহিত্যের নাট্যকার যেমন একই ভাষা বহু করিয়া একের বহুত্ব ও বহুর একত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তিনি বহু প্রাকৃতের প্রকৃতির সহিত এক সংস্কৃতের প্রকৃত তত্ত্বের মিলন সাধন করিয়া বহুকে একের অঙ্গীভূত

* নাট্যসাহিত্যের অবাধ স্বীয় প্রকৃতির কথা "সংস্কৃত নাটকের জন্মকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের কতক কতক স্থানের প্রমাণ-প্রয়োগবিহীন উক্তিও উল্লিখিত প্রবন্ধের সহিত মিলাইয়া দেখিলে সবল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

(১) Shakespear এর Midsummer Night's Dream, King John, ও Hamlet.

(২) রামনারায়ণের কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব ও নবনাটক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

করিয়া মানবপ্রকৃতির মিলনের মতন এক অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় পালন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাসামগ্রীর মধ্যে পরিমাণগত (quantity) বৈসাদৃশ্যই শুধু নাই, তাহাতে স্বরূপ (quality). গত বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান; অথচ সে উপাদানের একীকরণে মিলামিল বা 'তেলে জলে' মিলের নমুনা লক্ষিত হয় না (৩)।

এইবার আমরা নাটকে প্রাকৃতভাষা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি প্রামাণ্য সূত্রের উদ্ধার ও আলোচনা করিব। এইগুলি হইতেই নানাবস্থান্তরাত্মক ও ভাষাসমূহের প্রয়োগের কৃতিত্ব ও যুক্তি প্রতীয়মান হইবে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি বলিতেছেন :—

ভাষা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ।
সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব যত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে ॥
অতিভাষার্য্যো ভাষা চ জাতিভাষা তথৈবচ।
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্ত্তিতা ॥
অতিভাষা তু দেবানামার্য্যভাষা তু ভূভুজাং।
সংস্কারপাঠ্যসংযুক্তা সম্যগ্‌গ্রামপ্রতিষ্ঠিতা ॥
বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতং ॥
অথ জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশূদ্ভবা।
নানা বিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্ম্মীপ্রয়োগজা ॥

* * * * * *

ঐশ্বর্য্যেন প্রমত্তস্য ঐশ্বর্য্যেন প্লুতস্য চ।
দারিদ্র্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যেণ প্লুতস্য চ ॥
উত্তমস্যাপি ব্রুবতঃ প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ।
ব্যাজলিঙ্গপ্রতিষ্ঠানাং শ্রমণানাং তপস্বিনাং।
ভিক্ষু চক্রধরাণানাং প্রাকৃতং সম্প্রযোজয়েৎ ॥
বালে গদোপসৃষ্টে চ স্ত্রীণাঞ্চ প্রকৃতো তথা।
নীচে মত্তে সলিঙ্গে চ প্রাকৃতং পাঠ্যমিষ্যতে।
পরিব্রাণ মুনিশাক্যেষু বাক্যেষু (?) শ্রোত্রিয়েষু চ ॥
দ্বিজা যে চৈব লিঙ্গস্থা সংস্কৃতং তেষু যোজয়েৎ।
রাজ্ঞশ্চ গণিকায়াশ্চ শিল্পকার্য্যাস্তথৈব চ।

* * * * * *

নৃপপত্ন্যা ভবেৎ পাঠ্যং সংস্কৃতং দ্বিজসত্তমাঃ।
ক্রীড়ার্থং সর্ব্বলোকস্য প্রয়োগস্য সুখাশ্রয়ং ॥
কলাভ্যাসাশ্রয়ং চৈব পাঠ্যং বেশ্যাসু সংস্কৃতং।
কলোপচারজ্ঞানার্থং ক্রীড়ার্থং পার্থিবস্য তু ॥
নির্দিষ্টং শিল্পকার্য্যাস্তু নাটকে সংস্কৃতং বচঃ।
আম্নায়সিদ্ধং সর্ব্বাসাং শুভমপ্সরসাং ভবঃ (বচঃ ?)।
সংসর্গাদ্দেবতানাং বৈ তদ্ধি লোকোঽনুবর্ত্ততে।
ছন্দতঃ প্রাকৃতং পাঠ্যং স্মৃতমপ্সরসাং ভুবি ॥ ইত্যাদি
(নাট্য শাস্ত্র, ১৭ অধ্যায়)

অন্যত্র (সরস্বতীকণ্ঠাভরণে) পাইয়া থাকি :—

ন ম্লেচ্ছিতব্যং যজ্ঞাদৌ স্ত্রীষু নাপ্রাকৃতং বদেৎ।
সংকীর্ণং নাভিজাতেষু না প্রবুদ্ধেষু সংস্কৃতং ॥

উল্লিখিত সন্দর্ভদ্বয় হইতে নাট্যকার নাটককে কেন নানাদেশসমুখ ছায়ায় অলঙ্কৃত করেন, তাহার মূলতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য নটসূত্রকারের অনুসরণে নাট্যশাস্ত্রকার এক যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। দেবতা, ভূদেবতা, নরদেবতা, অভিজাত, প্রাকৃত, অপ্রবুদ্ধ মানুষ,—বিভিন্ন ব্যবসায়রত মানুষের স্ত্রীলোক—ইঁহাদের কথোপকথনের প্রণালীতে মূলতঃ পার্থক্য আছেই; আর, এই বিভিন্ন শ্রেণীর জীব লইয়াই নাটকের শরীর ও মন। তাহার উপর সম্প্রদায়গত দেবপ্রীতি, কলাকৌশলগত ভেদ ইত্যাদি নানা কারণে সংস্কৃত নাটকের আপাত-সরল ভাষাবিভাগতত্ত্বকে কিছু জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এই শ্লোক-সংগ্রহ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এরূপ ভাষা, অতিভাষা, বিভাষার পরিভাষা ও সংজ্ঞাকল্পনা একেবারে কবির যদিচ্ছা কল্পিত নহে।

ভাষাবিভাগ-তত্ত্বের স্বাভাবিকত্বে আংশিক প্রসঙ্গের

(৩) এস্থলে যাহা বলা হইল তাহা চরম যুগের অর্ব্বাচীন নাট্যকারের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে। অশ্বঘোষ, ভাস প্রভৃতি হইতে বহুভাষাবিদ কবি রাজশেখর পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে।

সমর্থন নাই। Monier Williams তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Indian Wisdomএ ব'লয়াছেন, There is a suitableness in women speaking Prakrit. Harsh consonants are often softened off and compound ones simplified.. এই প্রসঙ্গে কোন কোন পণ্ডিত এক উল্‌টা অভিযোগ আনিয়া সংস্কৃত নাট্যকারের তারিফটার মাটি করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এরূপ ভাষা-বিভাষার প্রয়োগ ও বিধিকল্পিত সংমিশ্রণে কবির কৃতিত্ব জাহির হইলেও, পাত্রবর্গ বিভিন্ন ভাষা ভাষী হওয়ায়, একে অন্যের বাক্যের সম্পূর্ণরূপে অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, বলিয়া, কাব্যাংশের দিক দিয়া এ মৌলিকতায় এক অনাসৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের এ অভিযোগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না আজপর্য্যন্তও ভারতের গৃহে, জনপদে সর্ব্বত্রই বিভিন্ন ভাষাভাষীগণের পরস্পর কথোপকথনের দ্বারা ভাবের আদানপ্রদানের দৃষ্টান্ত সচরাচর লক্ষিত হইয়া থাকে।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে এই সকল ভাষা ও বিভাষা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে, এবং সেই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক নাট্যশাস্ত্র-সমালোচকগণ (ধনঞ্জয়, বিশ্বনাথ প্রভৃতি) তাঁহাদের গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনার দ্বারা বিধি-ব্যবস্থার সৃজন করিয়াছেন। ভাষার নামকরণ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার (differentiation in use) লইয়া নাট্যশাস্ত্রকার বলেন :—

"মাগধ্যবন্তিজা প্রাচ্যা শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী। বাহ্লীকা দাক্ষিণাত্যাচ সপ্তভাষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। শবরাভীরচাণ্ডাল-সচরদ্রবিড়োড্রজাঃ। হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ (বিভাষা নাটকে স্মৃতা)। মাগধীতু নরেন্দ্রাণামন্তঃপুরনিবাসিনাং। চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী। প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানামপ্যবন্তিজা। নায়িকানাং সখীনাঞ্চ শূরসেনাবরোধিনী। যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাথ দীব্যতাং। বাহ্লীক ভাষোদীচ্যানাং (দীব্যানাং ইতি সাহিত্যদর্পণ) খশানাঞ্চ স্বদেশজা। শবরাণাং শকাদীনাং তৎস্বভাবশ্চ যোগ নঃ। সকারভাষা যোক্তব্যা চণ্ডালী পুক্কসাদিষু। অঙ্গারকারব্যাধানং কাষ্ঠযন্ত্রোপজীবিনাং। যোগ্যা শবরভাষা তু কিঞ্চিৎ বানৌকসী তথা। গবাশ্বাজাবিকোষ্ট্রাদি ঘোষস্থাননিবাসিনাং। আভীরোক্তিঃ শাবরী বা দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু। সুরঙ্গাখনকাদীনাং। শৌণ্ডিকানাঞ্চ রক্ষিণাং। ব্যসনে নায়কানাং স্যাদাত্মরক্ষাসু মাগধী ইত্যাদি—(নাট্যশাস্ত্র, ১৭ অধ্যায়)।

এই সন্দর্ভ হইতে নাটকীয় বিভিন্ন ভাষার সহিত রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক বিভিন্ন বিভাগের কতকটা সম্বন্ধ সহজেই পরিলক্ষিত হয়। একই ভাষা (প্রকৃতি) নানা নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণে বিভিন্ন প্রদেশে ও জনপদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল, এবং কালক্রমে সংস্কৃত নাটকের অভ্যুদয়ের যুগে এই বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন পাত্রের মুখ দিয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়া গেল। অবশ্য ডাঃ হুইট্‌নী প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, এ কথা স্বীকার্য্য *। পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণ কতক কতক স্থানে ভৌগোলিক মূলকে লোপসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট হইবে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'বাহ্লীক ভাষোদীচ্যানাং', এই মত মিলে। বিশ্বনাথ বলেন--'বাহ্লীক ভাষা দীব্যানাং'। বস্তুতঃ, ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতেও যদি কোন প্রাচীনতর গ্রন্থ মিলিত, তাহা হইলে নাটকীয় সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার সহিত তাৎকালিক জনপদের ও প্রদেশসমূহের প্রকৃতির সম্বন্ধ বিশেষ স্পষ্টভাবে ধরা যাইত।

---

* The mixture of dialects represents the historical state of speech at the time when the drama came into being—Dr. Whitney's view referred to by Dr. Keith (J.R.A.S. 1909).

'নাট্যশাস্ত্রে'* এই প্রসঙ্গে 'জাতি' ভাষা ও 'অন্যান্তরী' ভাষার উচ্চারণে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্বের নির্দ্ধারণ আছে। ইহা হইতেই প্রাকৃত প্রয়োগ-প্রণালী (Idiom) ও ব্যাকরণের স্থিরতা অসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয়। বরং নাট্যশাস্ত্রকারই 'সংস্কারপাঠ্যসংযুক্তা' প্রাকৃত ভাষারই অবলম্বনীয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণসাহিত্যের প্রাচীনতা এবং বহুল বিস্তারও এই বিষয়েরই সমর্থন করে। মূল সূত্রকার মহর্ষি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া শাকল্য, ভরত, কোহল, বররুচি, ভামহ, বসন্তরাজ, ত্রিবিক্রম, সিংহরাজ, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের শব্দশাস্ত্রবিদ্ প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন। কালের গতির সহিত প্রাকৃত ভাষা, বিভাষা, উপভাষার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে; 'প্রাকৃত-প্রকাশে' আলোচিত ভাষা-সমূহের স্বল্পসংখ্যকতার সহিত সিদ্ধ হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃত গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট ভাষা-সমূহের বাহুল্যের তুলনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

তবে অবশ্য সকল বিভাষা, উপভাষা নাটকে সমভাবে আদর লাভ করে নাই; অনেক নাটকীয় ভাষাই ভাষা-বিভাগ-তত্ত্বের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াই নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বস্তুতঃ, অধিকাংশ নাট্যকারই দুই তিনের অধিক প্রাকৃতভাষার প্রয়োগ করেন নাই।† এক সংস্কৃত রূপক সাহিত্যের চিরনবীন সৃষ্টি মৃচ্ছকটিকে বহু প্রাকৃত ভাষা ও বিভাষার ছায়া ও কায়ার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। নাট্যশাস্ত্রে শৌরসেনী প্রাকৃতকেই মূল প্রাকৃত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বররুচি প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাকরণকার এবং আচার্য্য দণ্ডী মহারাষ্ট্রীকে মূল প্রাকৃত বা প্রকৃষ্ট প্রাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য নাটকীয় প্রাকৃত ভাষা এই ভাষা হইতে বিভিন্ন শব্দ, উচ্চারণ প্রভৃতির স্থূল তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সকলের বিশেষত্ব ও বিবর্ত্তের ধারা প্রকাশ সম্ভবে না, সুতরাং এ বিষয়টীর উল্লেখ করিয়াই আমাদিগকে বিষয়ান্তরের আলোচনায় নিযুক্ত হইতে হইতেছে। অধ্যাপক লেভি, পিসেল, ডাঃ ষ্টেন কোনো* প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এই মতের প্রতিকূল নহে।

মৃচ্ছকটিকের প্রসিদ্ধ টীকাকার পৃথ্বীধর বলেন,—"নাটকাদৌ বহুপ্রকারঃ প্রাকৃত প্রপঞ্চেষু চতস্র এব ভাষাঃ প্রযুজ্যন্তে— শৌরসেন্যবন্তীকা প্রাচ্যামাগধ্যঃ। অন্যন্তু, মহারাষ্ট্রাদয় কাব্য এব প্রযুজ্যন্তে।" অবশ্য অভিজাত স্ত্রী-চরিত্রের উক্তি প্রত্যুক্তিতে মহারাষ্ট্রী গাথার কোন কোন স্থানে প্রয়োগ মিলে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ। অপভ্রংশ প্রপঞ্চেষু চতস্রঃ এব ভাষাঃ প্রযুজ্যন্তে। শাকারী চাণ্ডালী শাবরী ঢক্কদেশীয়াঃ"। মৃচ্ছকটিকে শবর-পাত্রাভাবাৎ শাবরী নাস্তি। ঢক্কা তু বনেচরাণাং ভাষা'।

নাটকের প্রকৃতি কথিত ভাষা কি না, এ বিষয়ে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সুধিবর্গের মতের সহিত প্রাচীন প্রাচ্য শাস্ত্রকারের মতের প্রকৃতপক্ষে কোন অসামঞ্জস্য নাই, উভয় পক্ষই নাটকীয় প্রাকৃত ভাষাকে Literary Language —সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; সাহিত্যের ভাষা যে কথিত ভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইবে, এ বিষয়ে তখনকার দিনে কোন প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না; তাহার উপর যখন দেখা যায় যে, নাট্যকারগণ গতানুগতিক হইয়া প্রাচীন লুপ্তপ্রায় ভাষাকেও চালাইয়া গিয়াছেন, তখন বাদপ্রতিবাদের প্রশ্নই উঠে না। মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাকৃত ভাষাসমূহেরও

* নাট্যশাস্ত্র ১৭।৫৮—৬২।

† The Sanskrit dramas, in general, contain little but the ordinary Prakrit in its two closely related forms, the Sauraseni (the dialect used in Prose) and the Maharasthri (that used in poetry). The same rules apply to both &c.—Cowell's Prakrit Prokasha-Introduction.

* Levi's Theatre de Indie—Pischely Grammahlle der Prakrit Spracher.

S. Konow in Lanman's Karpura-Majari (Harvard Or. (Scers

বহুলপ্রচার সাহিত্য ছিল, তাহাদের কতক গ্রন্থ এখনও আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সমভাবে, কখন কখনও বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, আলোচিত ও পরিপুষ্ট হইয়া উভয় সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়াছে, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনের আশা, আশ্বাস, সান্ত্বনা, ও অনুপ্রেরণার উদ্বোধন করিয়াছে। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত ভাষার মিশ্রনের ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য সুধী এমন মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাকৃত নাট্যসাহিত্য ('দেশী' নাট্য সাহিত্য) হইতেই সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। *

যাক সে কথা। নীচ ও মধ্যম পাত্রবর্গের দ্বারা ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা ও বিভাষাগণের সহিত তত্তৎ প্রাকৃত ভাষার আদি-ভূমির কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এরূপ অনুমান একেবারে বিচিত্র বা কল্পনা-প্রসূত না হইতে পারে, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা অনেক আপাত-কঠিন বৈসাদৃশ্যকে মুছাইয়া ফেলে। স্থান-মাহাত্ম্য; বিশেষতঃ, মহানগরীর মাহাত্ম্য, অধিবাসিগণের চরিত্রে দৃঢ়াঙ্কিত না হইয়া থাকিতে পারে না; স্থানের উন্নতি-অবনতির ধারার অপেক্ষা না করিয়া লোক-সমাজে—এবং তাহা হইতে সাহিত্যে—তথাকার দোষগুণ তাহার স্মৃতির সহিত জড়িত হইয়া যায়, এবং লোকপরম্পরায় শ্রেণীগত চরিত্রের সহিত দেশগত বা জনপদগত বিশেষত্বের কাকতালীয় ন্যায়ে সংযোগ ঘটিয়া থাকে। হিন্দু রাজত্বের মধ্য ও শেষ ভাগে অবন্তী নগরী এক অতুলনীয়া মহানগরীই ছিল—মহানগরীতে শোভন উপায়ে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ম এখনকার ন্যায় তথনকার দিনেও অধিকাংশ অধিবাসীকেই ধূর্ত্ততাজীবী (shrewd) হইতে হইত, নহিলে লোকের আত্মমর্য্যাদার (prestige) হানি ঘটিত। কালক্রমে বিচিত্র বিধাতৃনির্ব্বন্ধে অবন্তীপুরীর 'সহরে' ভাষার সহিত ধূর্ত্ততার এক সমবায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল। নাট্য সাহিত্যে অবন্তীর ভাষা ধূর্ত্তের ভাষা বলিয়া আখ্যা লাভ করিল। এইরূপে অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাষাতত্ত্বনিরূপণপ্রস্তাবে সূত্র হইল—"ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা"। বিদর্ভরাজ্যের * বিলাসবিভব, সমৃদ্ধিশক্তির দিনে, বিদর্ভরাজধানীস্থ অধিবাসীর চরিত্রগত দোষ-সমূহের মধ্যে অক্ষক্রীড়া সম্ভবতঃ কালক্রমে তাহাদের 'গুণরাশিনাশী দোষ' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

আলঙ্কারিকের কারিকায় "দাক্ষিণাত্যা হি দীব্যতাং" এই আধার-আধেয়ের দোষগুণ, সঙ্কল্প-বিকল্পের অল্প আভাষ দিতেছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অঞ্চলের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় অকর্ম্মণ্য, শাস্ত্রালোচনার অভাবে অপরিণতবুদ্ধি, 'স্বকর্ম্মজ্ঞ', বেশ-ভাষা, হাবভাবের দ্বারা হাস্যোদ্দীপক চাটুকারে পরিণত হইয়া থাকিতে পারেন, 'প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং' হয় ত সেই লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত করিতেছে। পুরাবৃত্ত, কাব্যকলা, ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মনিবন্ধ এইরূপ ধারণাকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়া আমরা ইহার নির্দ্দেশ করিলাম। দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণার ফলে এ বিষয়ের মূল কথা উদ্ঘাটিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির ইদানীন্তন পারিবারিক জীবন হইতে এ বিষয়ের এক সৌসাদৃশ্য (analogy) মিলে, এবং তাহাও আমাদের কল্পিত সিদ্ধান্তের সহায়তা করে। বাঙ্গালার সমাজনাট্যসাহিত্যে অতিমাত্রায় কল্পিত ভারতীয় জাতি-

* Prof. Schroder holds with Levi that the Sanskrit drama descends from a Prakrit drama and that thus alone can the mixture of dialects be explained. This view is curiously pardoned and contrary to all probability.

Dr. Keith. J. R. A. S. 1909. (p.p. 208-09.)

* বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে (India Office Library copy) পাওয়া যায়,—

অবন্তয়োঽঙ্গমগধাঃ সুরাষ্ট্র দক্ষিণপথাঃ।
উপাবৃৎসিন্ধুসৌবীরা এতে সঙ্কীর্ণয়ো নয়ঃ॥

তবে এ শ্লোকস্থ তথ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান আছে।

বিশেষের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধের কথা তুলাই থাকুক, সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীর ঘরে 'ঠাকুর' ও মালীর সহিত উড়িয়া ভাষার সংযোগ এবং দারবান্ ও মহারাজের ভাষার সহিত পশ্চিমে ভাষার সম্বন্ধ তুলনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। নাট্য শাস্ত্রকারের 'জাতি ভাষা' ও 'জাত্যন্তরী' ভাষার আলোচনা প্রণালী, অলঙ্কারবিজ্ঞ ধনঞ্জয় ও কবিরাজ বিশ্বনাথের উক্তি— 'যদ্দেশং নীচপাত্রং স্যাৎ তদ্দেশং তস্য ভাষিতং' এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাট্য-সাহিত্যের ধারাজ্ঞান আমাদিগকে উল্লিখিত মতের প্রতি আস্থাযুক্ত করিয়া তুলে। অন্যদিকে ইহাও স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয় যে, কেবল মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপক-সমূহের সাহায্যে এমন সামান্য নিয়মে (generalisation) উপনীত হইতে গেলে বিশেষ লাঞ্ছনা ও ভ্রমাকুলত্বের সম্ভাবনা।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপক-সমূহের প্রাকৃত ভাষার সহিত অশ্বঘোষ, কালিদাস, শূদ্রকের প্রাকৃত ভাষার তুলনাই চলে না। যেখানে সরসতা, সুকুমারতা, সহৃদয়হৃদয়হারিতা ছিল, সেইখানে কৃত্রিমতা, কষ্টকল্পনা, হৃদয়হীনতা স্থান লাভ করিয়াছে;—এটি হইয়াছে কেবল কালের প্রভাবে। বিভিন্ন প্রাকৃত সাহিত্যও বহুপূর্ব্বে সাহিত্যের ও ব্যাকরণের ধরাবাঁধা আইন-কানুনের দ্বারা অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল *। তবে দক্ষ সাহিত্যিকের রচনা-রীতি অসাড়, নির্জীব ভাষায়ও প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করে; অর্ব্বাচীন কবি রাজশেখরের প্রাকৃত রচনা এই কথার যাথার্থ্য সংসূচিত করে; আলঙ্কারিক বৈয়াকরণ কোষকার পরবর্ত্তী সিদ্ধ হেমচন্দ্র প্রাকৃত ভাষার প্রশংসাকল্পে যাহা বলিয়াছিলেন,—

পবমত্থদংসণং সংনিবেসসিসিরাও বন্ধরিদ্ধীও। অবিরল মিণমো (অবিরলমেতৎ) আভুবণবন্ধমিহণবর পয়রাস (প্রাকৃত) তাহা তাৎকালিক এবং তাঁহার দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যকারগণের প্রাকৃত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা বিভিন্ন যুগের প্রতিনিধি বিখ্যাত নাট্যকারগণের প্রাকৃত ভাষার সন্দর্ভ এক একটী করিয়া উদ্ধৃত করিব। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, কেমন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রাকৃত ভাষাসমূহের কোমল সুকুমার প্রকৃতির তিরোভাব ঘটিতেছিল, কেমন করিয়া Idiomatic প্রাকৃতের তিরোভাবে প্রাকৃত সাহিত্যের উচ্ছেদের পথ প্রশস্ত হইতেছিল।

অশ্বঘোষের নাটকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাকৃত সম্বন্ধে অধ্যাপক লুডার্স ও ব্রাটুক আপন আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাসের রচনা হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাউক।

প্রতীহারী। এবং বিহস্‌স সুহিজ্জনেন পরিগিহীদাস্‌স বচ্ছবা অস্‌স অঅং বুওন্তো।.........যো কখু দানি সঙ্কটেসু বাণ বিসীদাদি বিসঙ্কগদো বাণ পচ্চবচিঠ্ঠদি, বক্কিদো বাণ নিবেবেদং গচ্ছদি, পড়িমাদেসু বা পাণা ন সমুজ্ঝতি সো খখু বুদ্ধিমন্তো পুচ্ছিঈদি পঅচুমং এববমে বস্‌স বয়স্‌সো। (প্রতিজ্ঞা নাটক, প্রথমাঙ্ক)।

ইহার সহিত পরবর্ত্তী যুগের কালিদাসের নিম্নোদ্ধৃত প্রাকৃত রচনা পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়, বিদগ্ধ কবি তাহার ভাষাকে সুন্দরভাবে সংস্কার করিয়া কেমন সরলতা, গম্ভীরতা ও সুকুমারতার শক্তি আনিয়াছেন;—

প্রিয়ং দাব এনং লজ্জা বণদ মুহিং পরিস্‌সজ্জিঅ সঅং তাদক-স্‌সবেণ এববং অহিণন্দিদং দিট্টিআ ধুমা উলিদোদিট্টিণো বিজ্জঅ মাণস্স পাঅএ এবক আহুঈ পড়িদা। বচ্ছে সুসিস্‌স পরিদিন্না বিঅ বিজ্জা অসো অণিজ্জাসি সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইমি পরিরকি খদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমিত্তি।

অগ—অহ কেণ সূইদো তাদকস্‌সবস্‌স অঅং বুত্তন্তোপ্রিয়ং। অগ্‌গিসরণং পবিট্ঠস্‌স শরীরং বিনা ছন্দোমইএ বাণিআএ (অভিজ্ঞান শকুন্তল—৪র্থাঙ্ক।

ভবভূতির প্রাকৃতে কোমলতার স্থানে পরুষতা ও বিকট-বন্ধত্ব প্রবেশলাভ করিয়াছে—সেখানে কবির নিপুণতাও এ-বিষয়ে কবিকে সাবধান করিতে পারে নাই। নিম্নোদ্ধৃত তাঁহার সরলতম, সুন্দরতম অংশে কৃত্রিমতা, সমাসবাহুল্য ও বিকটবন্ধত্বের সন্ধান স্থানে স্থানে মিলে;—

* পুরিসা (পরুষাঃ) সক্ক অজপ্পা পাউ অগুম্মো বিহোই সুউমারো'—কালবশে নাট্যকারগণের আড়ম্বরপূর্ণ বিকট প্রাকৃত প্রয়োগের ফলে এই উক্তির উপর শ্রদ্ধা লোকে হারাইতে বসিয়াছিল।

সীতা। সহি বাসন্দি। কিং তুএ কিদং অজ্জউত্তস্‌স মম অএদং দংসঅন্তীএ। হৃদী হদ্ধী সোএব্ব অজ্জউত্তো, তং এব্ব পঞ্চবটীবণং, সা এব্ব বাসন্দী, তেএব্ব বিবিহ-বিলস্‌ত্তলাক্‌খিলো গোদাবরীকাণণুদ্দেসা, তেএব্ব জাদনি-ব্বিসেসা মিঅপক্‌খি-পাদবা, সাএব্ব চাহং মম উণ মন্দ-ভাইণীএ দীসন্তংপি সব্বং এব্ব এদং ণত্তি, ইদিসো জীঅলো-অস্‌সপরিবত্তো। (উত্তর রাম চরিত—৩য়াঙ্ক)।

ভবভূতির রচনায় মধ্যে মধ্যেই স্ত্রীচরিত্রের প্রাকৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া 'সংস্কৃতমাশ্রিত্য' কথোপকথন, প্রাকৃতপ্রয়োগের স্বল্প প্রসার, প্রাকৃত সাহিত্যের 'বাজার মন্দা' সংসূচিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকগণ এই দুর্য্যোগের দিনে কবিদের শরণে আসিয়া বিধান দিয়াছেন—'বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতঞ্চান্তরান্তরা'। ভাষাবিদ্ স্বনামধন্য রাজশেখর কবি কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহার Execution অংশে তাঁহার আয়াসের যথেষ্ট পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার প্রাকৃত রচনা-রীতিতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। নিম্নে তাঁহার বিখ্যাত সট্টক কর্পূরমঞ্জরী হইতে একটী সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইল;—

বিদূ। আ দাসীএ ধীএ! ঈরিসোহং মুখ্‌খো জোতুএধি উঅহসিজ্জামি। অন্নং চহে…। অহবা হথকঙ্কণং কিং দপ্‌পণে পেক্‌খীঅদি।

বিচক্ষণা। এব্বং ণেদং। তরংগস্‌স সিখ্‌খত্তনে কিং সাক্‌খিণো পুচ্ছীঅন্তি। তাবন্নঅ বসংতঅং।

বিদূ। তুমং উণ পংজরগদা সারি অব্ব কুর-কুরায়ন্তী চিঠ্‌ঠসি। ণ কিং বিজানেসি। তা পিয় বয়াস্‌সস্‌স দেবীএ পুরদো পঠিস্‌সং। জদোণ কথরিআ কুগ্‌গামে বণে বা কিক্কিণীঅদি, ণ সুবণ্ণং কসবট্টঅং বিণা সিলাপট্টএ কসীঅদি।

রাজা। পিয়বয়স্‌স! তাপঢ় (স্বগীঅহ)

(কর্পূরমঞ্জরী—১ম জবনিকান্তর ১৮ ও ১৯ শ্লোকের মধ্যে)

এই সমস্তসিদ্ধ মনোহর ভাষার নিদর্শনের সহিত নিম্নোদ্ধৃত মৃচ্ছকটিককারের অযত্নলভ্য সরল সুন্দর প্রাকৃত সন্দর্ভের তুলনা করিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির স্বাভাবিকতা ও পরবর্ত্তী কবির অভ্যাসপটুত্ব আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়ে;—

মদ। অজ্জঅ! কিং ষীনকুসুমং সহআরপাদবং মহুঅরীও উন সেবন্তি।

বসন্ত। অদোজ্জব তাও মহু অরীও বুচ্চন্তি।

মদ। অজ্জুএ। জই সো মনীসিদো, তা কীসদাণিং সহসাণ অহিসারীঅদি

(মৃচ্ছকটিক—২য়াঙ্ক)।

এইরূপে নাটকীয় প্রাকৃত ভাষাসমূহের পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মূলে অন্য এক মুখ্য কারণের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। অখণ্ড রাজশক্তির প্রভাবে যখন উত্তর ভারতবর্ষে শান্তি, সমৃদ্ধি বিরাজ করিতেছিল, তখনই বৃহৎসংহিতার রাষ্ট্রবিভাগের কল্পনার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছিল; তখনই কালিদাসের নাটকাবলীতে উজ্জ্বলেমধুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণে রূপক সাহিত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ সাধিত হইয়াছিল; তখনই "নানা দেশসমুত্থং হি কাব্যং ভবতি নাটকে", এ বিধানের সামঞ্জস্য ও প্রকৃত অর্থবোধ ঘটিয়াছিল। পরে যখন রাষ্ট্র-শক্তির অবসান ও গ্লানির দিন আসিল, তখন কবির কাব্যোন্মাদনা ম্লান ও হতপ্রভ হইয়া পড়িল, নাটককারের প্রাকৃত ভাষাসমূহের বিচ্ছিন্নতা ও বিকেন্দ্রীভূততার লক্ষণ প্রকাশ পাইল, নাটকীয় চরিত্রগণের সুধাস্যাদিনী প্রাকৃত-সূক্তি স্তব্ধ হইয়া পড়িল।

ভাষা 'শিক্ষার বাহন'—প্রাকৃত ভাষাসমূহের ভিতর দিয়া গৌরবময় আমাদের এদেশ কত উপদেশ, কত গভীর তত্ত্ব,কত রীতিনীতি প্রচার করিয়াছে; কত রসের ধারা, কত আমোদের প্রস্রবণ,কত অন্তরসঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা প্রাকৃত ভাষার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাকৃত সাহিত্য, প্রধানতঃ পালি সাহিত্য ও জৈন মহারাষ্ট্রী সাহিত্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য খণ্ডে বহু মনীষির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে সংস্কৃত রূপক সাহিত্যের প্রাকৃত ভাষা ও তাহার স্থিতিতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গের

তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। সংস্কৃত নাটকীয় সাহিত্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান ভাবাতত্ত্ব ও ভাষা-প্রয়োগের সূক্ষ্ম আলোচনার উপর নির্ভর করিতেছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থূল, সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য। চাই কেবল স্থির ধীর চিত্তে তত্ত্বের নির্দ্ধারণ, সঙ্কলন ও প্রতিষ্ঠা, আর চাই তত্ত্ববিষয়ক প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের একনিষ্ঠতার সহিত তাঁহাদের প্রদর্শিত রীতিতে অধ্যয়ন ও আলোচনা।

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন

(আলোচনা)

গৌড়লেখমালার গ্রন্থকার, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পরিচালক, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। মূলপ্রবন্ধ মুদ্রিত না হওয়ায়, আমরা দেখিতে পাই নাই; তাই এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়াই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি; আশা করি, অক্ষয়বাবু আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন।

(১) তিনি বলিয়াছেন—"পালসাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাসলেখকের পক্ষে প্রধান অবলম্বন তাম্রশাসন ও রামচরিত গ্রন্থ।"* সমসাময়িক গ্রন্থ বলিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ঐতিহাসিকগণের নিকট 'রামচরিত' বিশেষ আদরের জিনিস হইয়াছে। আমরা জানি, এই প্রণালীর ঐতিহাসিক-গণের নিকট তাম্রশাসন ও শিলালিপি সর্ব্বপ্রথম আদরণীয়, সমসাময়িক গ্রন্থ তার পরে। কিন্তু রামচরিতের বেলায় দেখিতেছি, ইতিহাস লেখার মধ্যেও বর্জ্জিত বিধি আছে; তাই মদনপালের এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের সহিত মূল বিষয়ে বিশেষ অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও 'রামচরিত' ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু অক্ষয়বাবু 'রামচরিতে'র উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইতিহাসের আলোচনা করিতে বসিয়া তিনি ততটা নির্ভর করিতে পারেন না। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইব।

রামচরিত গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে, "রাজা মদনপাল দীর্ঘ-জীবন লাভ করুন"। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, এই গ্রন্থ মদনপালের রাজত্বকালে লিখিত, সুতরাং ইহা যে সমসাময়িক গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) "সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দী পালরাজার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।" তিনি যে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু কাহার? রামচরিতে তাহার একটু আভাসও পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে এবং হইতেছে। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামচরিতে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রজাপতি নন্দী পাল-রাজার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।" অক্ষয়বাবু প্রভৃতি সম্ভবতঃ বিচার না করিয়াই এই মত মানিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু এইরূপ অনুমান করিবার কোন উপকরণ 'রামচরিতে' নাই। মদনপালের তাম্রশাসনের সহিত মূল বিষয়ে যেরূপ অনৈক্য দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সন্ধ্যাকর নন্দী পালবংশের সকল সংবাদ রাখিতেন না। লোকমুখে শুনিয়া এবং প্রকৃত কি না, তাহা বিচার করিয়া না দেখিয়াই, লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, অক্ষয়বাবু তাঁহার বক্তৃতায় মদন পালের তাম্রশাসন অবিশ্বাস করিয়া 'রামচরিতে'র উপর যতটা নির্ভর করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধারে অনেক বাধা পড়িয়াছে। প্রজাপতি পালরাজার সান্ধিবিগ্রহিক থাকিলে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী পিতার পদ পান নাই কেন, আর সন্ধ্যাকর নন্দীই বা তাঁহার কাব্যে তাহার উল্লেখ করিলেন না কেন, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? প্রজাপতি নন্দী কাহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, তাহা না

* মর্ম্মবাণী ১। ১। ৮সংখ্যা ১৮৭ পৃষ্ঠা।

লেখায়, এবং পালরাজগণের, শত্রুপক্ষেরও প্রশংসা করিয়াছেন দেখিয়া, বরং অনুমান করা যাইতে পারে, তিনি বিদ্রোহী রাজা ভীম প্রভৃতির সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। 'ভীমের জাঙ্গাল' ইত্যাদি দেখিয়া অনুমান হয়, বগুড়া জেলাতেই ভীমের রাজধানী ছিল। মহাস্থানের নিকটে (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রতিবদ্ধ) দক্ষিণ দিকে নন্দী গ্রাম (পুলিস ষ্টেশন) নন্দীবংশের কুলস্থান অনুমান করা যাইতে পারে। পালরাজাগণের রাজধানী নন্দীগ্রাম হইতে দূরে থাকায়, সন্ধ্যাকর নন্দী পালবংশের সকল বৃত্তান্ত স্বয়ং অবগত ছিলেন না। শুনিয়া যতটা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ রামচরিতে পাওয়া যায়। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইব।

(৩) "পালরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন"।* পালরাজার আদিপুরুষ দয়িতবিষ্ণু বা বপ্যট বাঙ্গালী ছিলেন, গোপাল, দেবপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল প্রভৃতি বাঙ্গালী ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন উপকরণ রামচরিতে নাই। বরেন্দ্র বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল না, পৌণ্ড্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এখন সমস্তই বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া বঙ্গদেশ নাম হইয়াছে, তখন পৌণ্ড্র ও বঙ্গ পৃথক্ ছিল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এবং রামচরিতে বরেন্দ্রকে 'জনকভূ' বলিতে দেখিয়া অক্ষয়বাবু বরেন্দ্র পালরাজগণের জনকভূমি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু বরেন্দ্র যে গোপালের জন্মভূমি, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। তারানাথ লিখিয়াছেন; "গোপাল প্রথমে বঙ্গের, তৎপরে মগধের রাজা হইয়াছিলেন"। যদি এই কথাই ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বরেন্দ্রবাসীগণ গোপালকে নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসীগণ কেন নির্ব্বাচন করিবেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। বরেন্দ্রের বৃত্তান্ত যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে গোপালের মত পরাক্রান্ত রাজার স্থান ঐ সময়ে বরেন্দ্রে পাওয়া যায় না। তারানাথের মতে গোপালের পৌত্র দেবপাল বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন। সুতরাং একথা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, গোপালের 'জনকভূ' বরেন্দ্র নহে।

* মর্ম্মবাণী ১।১।৮ সংখ্যা ১৮৭ পৃষ্ঠা।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে এবং রামচরিতে 'জনকভূ' লিখিবার কারণ কি? কারণটী অতি সহজেই বুঝা যায়। গোপাল ও ধর্ম্মপালের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র নগরে, দেবপালের ও নারায়ণপালের রাজধানী ছিল মুঙ্গেরে। মহীপালের রাজধানী প্রথমে বিলাসপুরে, পরে বরেন্দ্রে দেবকোটে ছিল। এই হইতেই পালরাজগণের বরেন্দ্রে বাস আরম্ভ। সুতরাং মহীপালের পরবর্ত্তী সমস্ত পালরাজগণের জন্মভূমি বরেন্দ্রই বটে। গোপালের বাস বরেন্দ্রে ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কোথায় তাঁহার প্রকৃত বাস ছিল, তাহা অনুমান করিবার কোন উপকরণও কোথাও পাওয়া যায় নাই। তবে "সিন্ধুকুলোদ্ভূত" ধরিলে, সিন্ধুনদীর তীরে গুর্জ্জরাদি কোন স্থানে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু প্রমাণ নাই। রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ও সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রকে অনায়াসেই রামপালের 'জনকভূ' বলিতে পারেন।

(৪) "পালরাজগণ কোন বংশীয় ছিলেন?" অক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন, রামচরিতে পালরাজগণ সমুদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামপাল-পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই দুই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"বৈদ্যদেব পালরাজগণের পূর্ব্বপরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন না। সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পুত্র; সুতরাং পালরাজবংশের প্রকৃত পরিচয় তাঁহারই জানা সম্ভব। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণের সূর্য্যবংশে উৎপত্তি-বিবরণ নিঃসন্দেহ বৈদ্যদেবের প্রশস্তিরচয়িতা মনোরথের অজ্ঞতার ফল।" সন্ধ্যাকর নন্দী যে পালরাজগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পুত্র, সমস্ত রামচরিতে কোথাও তাহার প্রমাণ নাই, অথচ সে ব্যক্তি প্রকৃত পরিচয় জানিল, আর যে বৈদ্যদেব পুরস্কারস্বরূপ কামরূপরাজ্য পাইলেন, তিনি যে বিনা বেতনে মন্ত্রিত্ব করিতেন, সুতরাং প্রকৃত পরিচয়ে

অজ্ঞ ছিলেন, এবং মনোরথের অজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াছেন, এ মীমাংসা আমি স্বীকার করিতে পারি না। অক্ষয়বাবু সূর্য্যবংশে উৎপত্তি ইহার অর্থ এই যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন",* এইরূপ ধরিয়া কুল সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না করিয়া ক্ষত্রিয় জাতি ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। জাতি ও কুল পৃথক্ কথা। সুতরাং পৃথক্‌ভাবে ইহার স্পষ্ট মীমাংসা আবশ্যক। রামচরিতের টীকাকার প্রত্যেক শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার এক অর্থ সূর্য্যপক্ষে, দ্বিতীয় অর্থ সমুদ্রপক্ষে। দ্বিতীয় অর্থ বাদ দিয়া প্রথম অর্থ ধরিলেই, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের সহিত ঠিক মিলিয়া যায়। অতএব কাব্য হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে, তাম্রশাসনকে মিথ্যা বা অজ্ঞতার ফল না বলিয়া, "শ্লিষ্ট পদের" যে অর্থ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে হয়। অতএব বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন এবং রামচরিত, উভয় মতেই পালরাজগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব। রাখালবাবু এইটুকু ধরিয়া লইলে তাঁহাকে বৈদ্যদেব এবং মনোরথকে অজ্ঞ বলিতে হইত না।

(৫) "সন্ধ্যাকর নন্দীর মতানুসারে পালরাজগণ ধর্ম্মপালেরই বংশোদ্ভূত।"† দেবপালের তাম্রশাসন পাইবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছিলেন, বিগ্রহপাল ১ম, ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র, সুতরাং প্রথম তিন জন ব্যতীত সমস্ত পালরাজগণই বাক্‌পালের বংশোদ্ভূত। রাখালবাবু এখনও এই মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, আমিও "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় গৌড়রাজমালার সমালোচনাকালে এই মতই গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু রামচরিত ও তাম্রশাসন এক করিয়া দেখিতেছি, ঐ মত ভুল। রামচরিতের সহিত ঐক্য রাখিয়া নারায়ণপালের তাম্রশাসনের ৫।৬।৭ম শ্লোকের অর্থ করিলে দেখা যায় ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল ও জয়পাল এবং জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহ পাল। সুতরাং ধর্ম্মপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ তাঁহার বংশই বটেন, কিন্তু দেবপালের বংশ নহেন, জয়পালের বংশ। অক্ষয়বাবু লেখমালার নারায়ণপালের তাম্রশাসন ব্যাখ্যাকালে দেবপালের পুত্র রাজ্যপালকে ১ম বিগ্রহ পাল করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। ১ম বিগ্রহ পাল জয়পালের পুত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেবপালের পরেও যে জয়পালের বংশ রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৬) অক্ষয়বাবু রামচরিতের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন—"গোপালের অধস্তন দশম পুরুষ রাজা বিগ্রহপাল (৩য়), মহীপাল (২য়), শূরপাল (২য়) ও রামপাল নামক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে মহীপাল, শূরপাল ও রামপালকে কারাবদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ করিবার অনতিকাল পরেই অনীতিক আচরণ আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বরেন্দ্রভূমির প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে। এই বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্বোক, তাহার ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম যথাক্রমে বরেন্দ্র ভূমির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূরপাল ও রামপাল কিরূপে কারাগার হইতে পলায়ন করেন, সন্ধ্যাকর নন্দী সে বিষয় কিছু বলেন নাই।"*

মদনপালের তাম্রশাসনে মহীপাল ২য় সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি পিতা বর্ত্তমানেই পরলোক গমন (শিবত্বপ্রাপ্ত) করিয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

তন্নন্দনশ্চন্দনবারি-হারি
কীর্ত্তিপ্রভানন্দিতবিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব॥১৩

অক্ষয় বাবুর অর্থ—"সেই বিগ্রহপাল দেবের চন্দনবারি-মনোহর, কীর্ত্তিপ্রভাপুলকিত, বিশ্বনিবাসিকীর্ত্তিত শ্রীমান্ মহীপালনাম নন্দন মহাদেবের ন্যায় 'দ্বিতীয় দ্বিজেশ-মৌলি' হইয়াছিলেন"।†

* মর্ম্মবাণী ১।১।১০ সংখ্যা, ২১৭ পৃষ্ঠা।

† মর্ম্মবাণী ১।১।১০ সংখ্যা, ২১৮ পৃষ্ঠা।

* মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৮ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

† গৌড়লেখমালা,—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত, ১৫৬ পৃষ্ঠা।

এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, মহীপাল রাজা হইয়াছিলেন না। তিনি পিতা বর্ত্তমানেই শিবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে রাজা বলা হয় নাই, নন্দন বলা হইয়াছে। এই মহীপাল চন্দনবাস্নিমনোহর, কীর্ত্তিপ্রভা-পুলকিত, বিশ্বানবাসি-কীর্ত্তিত ছিলেন। এমন লোক যে সহোদর ভ্রাতাদ্বয়কে কারাবদ্ধ করতঃ রাজা হইয়া অনীতিক আচরণ করিবেন, রামচরিতের এই কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। সুতরাং তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র মদনপালের তাম্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে, মহীপাল (২য়) পিতা বর্ত্তমানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজা হন নাই, ভ্রাতাদ্বয়কে কারাবদ্ধও করেন নাই। এই জন্যই শূরপাল ও রামপাল কিরূপে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্ধ্যাকর নন্দী কিছু বলেন নাই।

দিব্যোক মহীপালকে (২য়) নিহত করিয়া বরেন্দ্র অধিকার করেন নাই। মদনপালের তাম্রশাসনমতে তৃতীয় বিগ্রহপালের পরে তৎপুত্র দ্বিতীয় শূরপাল রাজা হইয়াছিল, তাই তিনি নরপাল নামে কথিত হইয়াছেন—

তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রমহিমা
ক (স্ক) ন্দঃ প্রতাপ শ্রিয়ামেকঃ সাহস
সারথিগু্ণনয়ঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ।
যঃ স্বচ্ছন্দ-নিসর্গবিভ্রমভরা (ন্)
বিভ্রৎ (স্থ) সর্ব্বায়ুধপ্রাগল্‌ভ্যেন
মনঃসু বিস্ময়ভয়ং সন্তস্তান দ্বিষাং ॥১৪

অক্ষয়বাবুর অর্থ—"মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত, স্কন্দতুল্য প্রতাপশ্রীসমন্বিত, সাহসসারথী, নীতিগুণসম্পন্ন শ্রীশূরপালনামক নরপাল তাঁহার (মহীপালের) এক অনুজ ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাগল্‌ভ্যে শত্রুবর্গের স্বচ্ছন্দস্বাভাবিক বিভ্রমাতিশয্যধারী মনে শীঘ্রই বিস্ময় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন।" *

"নৃপ" শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, শূরপাল রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রশস্ত্রের প্রাগল্‌ভ্যে শত্রুবর্গের মনে ভয় হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার সময়ে বরেন্দ্র বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইয়াছিল না। তবে তাঁহাকে "মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত" বলায় তিনি মহেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রের ন্যায় শত্রু (অসুর) সহ যুদ্ধে স্কন্দতুল্য পরাক্রমশালী বিধায় রাজ্যভ্রষ্ট হন নাই, অথবা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আবার উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার পরে রামপাল রাজা হইয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

এতস্যাপি সহোদরো নরপতি দিব্যপ্রজানির্ভর-
ক্ষোভাহত বিধৃতবাসবধৃতিঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ।
শাসত্যেব চিরং জগন্তি জনকে যঃ শৈশবে বিস্ফুরৎ
তেজোভিঃ পরচক্র-চেতসি চমৎকারং চকার স্থিরং ॥১৫

অক্ষয়বাবুর অর্থ—" [দিব্যপ্রজার] দেবলোকনিবাসিগণের (অসুরাক্রমণসঞ্জাত) অতিশয় চিত্তচাঞ্চল্যে আহূত হইয়া, আন্দোলিত-চিত্ত দেবরাজ (বাসব) যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই নরপতির সহোদর শ্রীরামপাল নামক নরপতিও সেইরূপ (দিব্যপ্রজার) দিব্য নামক কৈবর্ত্তপতির পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহূত এবং আন্দোলিত-চিত্ত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার (চিরং) সুদীর্ঘ শাসন সময়েই তিনি শৈশবে তেজঃপুঞ্জের বিস্ফুরণে শত্রুমণ্ডলের চিত্তক্ষেত্র চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।" *

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, দেবরাজ ইন্দ্র অসুর আক্রমণে আন্দোলিত-চিত্ত অর্থাৎ হৃতরাজ্য হইয়া যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পুনঃ রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, রাজা শূরপালের সহোদর ভ্রাতা রাজা রামপালও তেমনি দিব্যনামক কৈবর্ত্তপতি কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত এবং আন্দোলিত-চিত্ত অর্থাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পুনরায় রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, দিব্যোক রাজা রামপালের

* গৌড়লেখমালা—১৫৬ পৃষ্ঠা।

* গৌড়লেখমালা, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

হস্ত হইতেই বরেন্দ্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এবং রামপালই আবার তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে চতুর্থ শ্লোকেও এই কথাই লিখিত হইয়াছে—

তস্যোর্জ্জ্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্রঃ পাল-কুলাব্ধি শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনক-ভূ-লাভাদ্ যথাবদ্যশঃ
ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণবধা-দ্যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ ॥৪

অক্ষয়বাবুর অর্থ—সেই প্রবল পরাক্রমশালী নরপালের রামপাল নামক (এক) পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পালকুলসমুদ্রোত্থিত (শীতকিরণ) চন্দ্র (রূপে প্রতিভাত) এবং সাম্রাজ্য (লাভে)-খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণবধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপাল দেবও (যথাবৎ) সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি (বরেন্দ্রী) লাভে, ত্রিজগতে (শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়) আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন।" *

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রামচন্দ্রের নিকট হইতে সীতা হৃত হইলে তিনি যেমন রাবণকে বধ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, রামপালের নিকট হইতে তাঁহার জনকভূ হৃত হইলে তিনিও তদ্রূপ ভীম-রাবণকে বধ করিয়া জনকভূমি উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব রামপালের নিকট হইতেই যে দিব্যোক বরেন্দ্রী কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায়।

সুতরাং মহীপালের রাজা হওয়া, ভ্রাতাদ্বয়কে কারাবদ্ধ করা এবং চন্দনবারিমনোহর, কীর্ত্তিপ্রভাপুলকিত, বিশ্বনিবাসি-কীর্ত্তিত হইয়াও অনীতিকাচরণ করা, দিব্যসহ যুদ্ধে হত হওয়া ইত্যাদি রামচরিতের কাহিনীতে কবিত্বের পরিচয় থাকিলেও, ইতিহাস বলিয়া তাহা গৃহীত হইতে পারে না। রাখালবাবু মনোরথকে অজ্ঞ বলিয়া রামচরিতকে বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু এক মনোরথকে অজ্ঞ বলিলে হয় কৈ? বৈদ্যদেব (মন্ত্রী), রামপালের পুত্র মদন পাল, মদনপালের সান্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব প্রভৃতিকেও অজ্ঞ বলিয়া একমাত্র পালবংশসহ সংস্রবশূন্য কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে প্রাজ্ঞ বলিতে হয়। আমরা এই মত সমর্থন করিতে পারিলাম না। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে সমসাময়িক নিঃসম্পর্কীয় কবির কাব্য অপেক্ষা পুত্র ও মন্ত্রীপ্রদত্ত তাম্রশাসনই বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

(৭) অক্ষয়বাবু বলিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত রাখালবাবু অনুমান করিয়াছেন যে, বিজয়সেন মিথিলা জয় করিবার পূর্ব্বেই বরেন্দ্রভূমি করতলগত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবপাড়া প্রশস্তির শ্লোক হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, মিথিলা জয়ের পরে (পূর্ব্বে নহে) বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়াছিলেন।"

বিজয়সেন প্রথমে বরেন্দ্রেরই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই তো আমরা জানি। মিথিলা জয় করিয়া গৌড় কিরূপে কোন্ রাস্তায় আসিয়া অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া দিলে বুঝিবার উপায় নাই। তিনি মিথিলা জয় করিয়া পরে বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

আশা করি, অক্ষয়বাবু উপরি উক্ত বিষয়গুলি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি *

ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষার আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন। এই বিভিন্ন আদর্শের মূলে দেশের ও সমাজের অবস্থা, পুরুষ-পরম্পরাগত সংস্কার এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি। সাধারণতঃ, ইউরোপের শিক্ষার আদর্শ জীবন-সংগ্রামে জয়-লাভ, ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। অবশ্য, কোন কোন মনস্বী

---

* গৌড়লেখমালা, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পরকালের সুখের কথা যাহাতে লোকে ভুলিয়া না যায়, তজ্জন্য জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সাধারণতঃ, ইহকালই ইউরোপের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ঋষিগণ ভারতবাসীকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—আমাদের এই পৃথিবী জীবের চিরবাসভবন নহে, শুধু পথিকের বিশ্রামাগার মাত্র। দুই দেশের প্রধানতঃ এই দুই আদর্শ। শুধু বর্ত্তমান লইয়াই মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। এই হিসাবে ভারতীয় আদর্শ অবহেলার যোগ্য নহে।

প্রাচীন ভারতের অবস্থা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতবাসীকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কঠোর জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইত না। ভারতের জলবায়ু, ভারতের মাটি ভারতকে সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিত, লোক শক্তি ও স্বাস্থ্যযুক্ত থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত। ভারতবাসীর উদর সহজ বনজাত শাকসব্জী দ্বারা পরিপূর্ণ হইত, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত না; সুতরাং এই দগ্ধোদরের জন্য লোককে ভাবিতে হইত না। আড়ম্বরহীন সামান্য কুটীরে লোক সুখে বাস করিত; আর, তখন ভারতের সমাজসভ্য বিপুল লণ্ডন কিংবা পারিস নগরীর বিরাট ভাবও ধারণ করে নাই। লোক গ্রামে সমাজবদ্ধ হইয়াই বাস করিতে ভালবাসিত; গ্রামের মুক্ত বায়ু, খোলা মাঠ, সরল ব্যবহার, সাদাসিদা পোষাক পরিচ্ছদই লোকের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সমাজের জটিলতা, সভ্যতার আড়ম্বর, বিলাসের লীলা প্রভৃতি তখনও এই দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এই সকল অবস্থার অনুযায়ী ছিল। অতীত ও বর্ত্তমানে অনেক প্রভেদ, সুতরাং বর্ত্তমান লইয়া অতীতের সমালোচনা কিংবা অতীত লইয়া বর্ত্তমানের সমালোচনা করা সমীচিন নহে। তখন ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আত্ম-তত্ত্ব লাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, এবং তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে মুক্তি বা পরব্রহ্মে লীন হওয়া। এক কথায় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—ধর্ম্মজ্ঞান। ধর্ম্মজ্ঞান বলিলে শুধু পূজা বা যজ্ঞ বুঝাইত না। ভারতের সমস্ত জিনিষেরই প্রাণ ধর্ম্ম। দর্শনের মূলে ধর্ম্ম, চারিত্র নীতিতে ধর্ম্ম, শাসন ও সমাজবিধিতে ধর্ম্ম। যে বিষয় ধর্ম্মভাববিহীন, ভারতবাসীর সে বিষয় অগ্রাহ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে ভারতীয়েরা কেবল চক্ষু বুঁজিয়া ঈশ্বর-আরাধনাই করিতেন, আর কিছু করিতেন না, এমন নহে। তাঁহারা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের চর্চ্চাও করিতেন—তাঁহাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল ধর্ম্মজ্ঞান, দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল পার্থিব সম্পদ্। ভট্ট মোক্ষমুলর বলিয়া গিয়াছেন, "আত্মোন্নতি করিতে হইলে, প্রাচীন ঋষিগণের অমানুষিক জ্ঞানের পরিচয় পাইতে হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে, এবং পৃথিবীর ইতিহাস জানিতে হইলে, বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আজকাল আমরা যাহাকে 'লিবারেল্ এডুকেশন' বলিয়া থাকি, এই "লিবারেল এডুকেশন' পাইতে হইলে, বেদ আমাদিগকে যতদূর সাহায্য করে, বাবিলন কিংবা পারস্যের ইতিহাস, এমন কি য়িহুদি এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ইতিহাসও তাদৃশ সাহায্য করে না।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসী ধর্ম্মের জন্য ঐহিক উন্নতি অগ্রাহ্য করিত না। মনু বলিয়াছেন—

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥
মনু,২য়, ৩৭॥

যে বৈশ্য ঐহিক উন্নতি করিতে চায়, ৮ম বর্ষে তাহাকে দীক্ষিত হইতে হইবে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥

যথাশাস্ত্র সর্ব্ব বর্ণের জীবনোপায় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্ব বর্ণকে ঐ উপায় সকল উপদেশ দিবেন। মনু, ১০, ২॥

আর একটি কথা আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি। কথাটি এই। ভারতীয় আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানগণ সকলেই গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া বেদ আয়ত্ত করিত। (মনু ১ম অধ্যায়, ৮৮—৯১ শ্লোক)। যাহারা বেদ পাঠ করিত না, তাহারা সমাজে পতিত হইত—

এতয়ার্চাবিসংযুক্তঃ কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিড়্‌যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু॥
মনু, ২য় অধ্যায়, ৮০ শ্লোক।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রগণকে জ্ঞান লাভের অবসর দিত না। কিন্তু মনুর ৩য় অধ্যায়ের ১৫৬ ও ১৭২ শ্লোক পাঠ করিলে এই কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। শূদ্রেরা অধ্যাপনা করিত, মনুতে এরূপ আভাসও দেখা যায়। অবশ্য, তাহারা বেদ পাঠ করিতে পারিত না, তাহাদের বেদ পাঠের অধিকার ছিল না, এরূপ বোধ হয়। কিন্তু ভট্ট মোক্ষমূলর এই বিষয়েরও সমর্থন করেন না। তিনি বলেন—প্রথমতঃ শূদ্রগণ যজ্ঞ করার অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী কালে আমরা ইহারও ব্যভিচার দেখিতে পাই।*

প্রাচীনকালে রমণীগণ অতিশয় সম্মানিত হইতেন,—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদাপূজ্যাঃ ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষুচ॥
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥

মনু, ৩য় অধ্যায়, ৫৫—৬০ শ্লোক।

মনু বলিয়াছেন,—কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

যাঁহারা বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্না মৈত্রেয়ীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া চমকিত হইয়াছেন। এই দুই অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে।

প্রাচীনকালে শিক্ষার জন্যই লোকে শিক্ষালাভ করিত; শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানলাভ, ঐহিক সুখ লাভ নহে। প্রাচীন স্পার্টা এবং গ্রীস দেশে ঐহিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকে শিক্ষালাভ করিত। কিন্তু ভগবান্ গীতায় বলিয়া গিয়াছেন, স্বার্থ-প্রণোদিত শিক্ষা, কিংবা যে শিক্ষা পরকালের কোনও পুরস্কার লাভের জন্য হইয়া থাকে, সে শিক্ষা নিষ্ফল ও ক্ষতিকারক।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যাণীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥

* * * *

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তে হর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগং সাত্ত্বিকো মতঃ॥

গীতা, ১৮শ অধ্যায়, ৯ম শ্লোক।

আবার, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ এই ঐহিক জীবনকে যন্ত্রণার আধার বলিয়া মনে করিতেন না। তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করিয়া তাঁহারা এই পৃথিবীতেই অনন্ত জীবন লাভ করিতেন, এবং পুনর্জ্জন্ম বা মৃত্যু তাহাদিগকে অনন্ত জ্ঞানাধার আত্মা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। ভট্ট মোক্ষমুলর তদীয় Lectures on the Origin of Religion গ্রন্থের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। মনু বলিতেছেন—জীব মরিতে ইচ্ছা করিবে না, বাঁচিতেও ইচ্ছা করিবে না। ভৃত্য তাহার বেতন লাভের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, জীবও তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥

মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৫শ শ্লোক।

ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রগণকে ঘৃণা করিতেন না, নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় শাস্ত্র বচন হইতে ইহার আভাস পাওয়া যাইবে।

শূদ্রকে কেহই অবমাননা করিবে না।
"নাবমন্যেত কঞ্চন"।—মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক॥

* Lectures on the Origin of Religion, p 356.

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ। ইত্যাদি।

(২) সকলের সহিতই বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবে।

হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্।
রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ ॥

(মনু, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)।

(৩) নীচজাতীয়কে অসম্মান করিবে না।

(মনু, চতুর্থ অধ্যায়, ১৪১ শ্লোক)।

(৪) বর্ষীয়ান শূদ্র সম্মানের যোগ্য।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩২ অধ্যায়, ১৮ শ্লোক)।

(৫) পণ্ডিতেরা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলকেই সমভাবে সম্মান করিয়া থাকেন।

(গীতা, ৫ম অধ্যায়, ১৮শ শ্লোক)।

এমন কি, খৃঃ পূঃ ১৭৫ অব্দেও হিন্দুগণ যে অহিন্দুগণকে তাঁহাদের সমাজভুক্ত করিয়া লইতেন, গোয়ালিয়র রাজ্যে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিই (Basenagar Inscription) ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই শিলালিপিটি পাঠ করিয়া জানা যায় যে, হেলিওডরস নামে জনৈক ভারতাগত গ্রীক পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং তিনি একটি গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়া ইহা বিষ্ণুকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।*

অনেকে বলিয়া থাকেন, প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ববিকাশের অবসর ছিল না। সকলেই চিরপ্রচলিত প্রথা অকুণ্ঠিত ও অবিচারিত চিত্তে অনুসরণ করিয়া যাইত। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, পরিবারে যে ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতেই ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইত। শুধু ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা নহে, যাহাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা হইত। দেখা যায়, একই পরিবারে, সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান ব্যক্তি বৈদিক যজ্ঞাদির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, বেদকীর্ত্তিত দেবগণের নামে যিনি সকল নামের অতীত, তিনি তাঁহারই অভিব্যক্তি দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহার একপুরুষ পরবর্ত্তী ব্যক্তি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানই বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করেন। আবার, তাঁহার পরবর্ত্তী বালক বৈদিক সূক্ত কণ্ঠস্থ মাত্র করিয়াই তাহার ধর্ম্মাচরণ সম্পন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু পরম জ্ঞানী পিতামহ পুত্রের যাগযজ্ঞের প্রতি অশ্রদ্ধাবান নহেন। এইরূপ ভাবে ভারতবাসিগণ নিজ নিজ অধিকার ও কর্ত্তব্য পালন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কালে ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার যোগ্য হইয়া উঠিত। এইরূপ ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ববিকাশের অনুকূল, প্রতিকূল নহে। এইরূপেই ভারতীয়েরা আত্মজ্ঞান লাভ করিত—বুঝিত, এই বিশ্বের পশ্চাতে অনন্ত বিরাটপুরুষ—তাঁহাকে জানা—তাঁহাকে উপলব্ধি করাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জাতিবিভাগ ও জাতিগত ব্যবসায়ের অনুসরণও আত্মবিকাশের অনুকূল বলিয়া বোধ হইবে। স্ব স্ব অধিকার (capacity) অনুসারে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব অধিকারের সম্পূর্ণ যোগ্যতা সপ্রমাণ করিত। আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পক্ষে এইরূপ জাতিবিভাগ তৎসময়ের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। ব্রাহ্মণেরা হিংসা কিংবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া জাতিবিভাগ করিয়া সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। গ্রীস দেশের দার্শনিক প্লেটোও এইরূপ জাতিবিভাগ সমর্থন ও শিক্ষাকার্য্যে ইহার সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিকাশের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৮৪ শ্লোকে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, আত্মজ্ঞানকে অগ্রাহ্য বা হেয় মনে করিও না।

ভট্ট মোক্ষমূলর প্রাচীন ভারতের শিক্ষার উৎকর্ষের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা ভারতের নিজস্ব, এবং এই ভাষা আলোচনা করিলে, মানবজাতির বাক্যকথনের উৎপত্তি, প্রসার ও পরিণতির যেরূপ ক্রম

* Notes on Archaeological Exploration in India. J. H. Marshall. J.R.A.S.B. 1909, p. 1054.

লাভ করা যায়, সেরূপ ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা যায়।*

পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, বেদ এবং তৎপরবর্ত্তী ভারতীয় গ্রন্থাদিতে এই আভাস পাওয়া যায় যে, ছন্দ প্রথমতঃ সঙ্গীত ও নৃত্য-বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। ঋগ্বেদে ঔষধের উল্লেখ আছে, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি 'আইন' গ্রন্থ। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে পাণিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের জন্মদান করেন। প্রাচীন সূত্রগ্রন্থে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও জ্যামিতিক জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচয় আছে। মনে হয়, শুল্ব-সূত্রেই বৃত্তের বর্গফল লাভের অনুশীলন প্রথম হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল নীতি-গল্প (legends) সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। শব্দবিজ্ঞানের জন্ম ভারতবর্ষে। তখনও লিখনকৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতীয় দর্শন যে অতি প্রাচীন,তৎবিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না। পরাশর খৃষ্টের অন্যূন ১৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীস দেশে মাত্র ৬৪০ খৃঃ পূর্ব্বে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা আরব্ধ হয়।

যাঁহারা স্মিথ সাহেবের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়া গিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আমরা যেরূপ শাসনপদ্ধতির প্রচলন দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় সভ্যতা বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। ক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা (Irrigation), বিচার, শাসন ও সৈনিক বিভাগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা প্রভৃতি আধুনিক শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিল না।†

তার পর, অশোকের রাজ্যশাসনের ইতিহাস পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভারত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভাস্করবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, পর্ব্বতে গুহা-খনন, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যে সকল অতি প্রকাণ্ড অখণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভ ভারতের নানা স্থানে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সকল যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। মসৃণতায়, কারুকৌশলে, এবং ইহাদের স্থাপন কার্য্যে যে অসীম কলা-কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রহিয়াছে, সভ্য জগতে আর কোথাও সেইরূপ নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না।

এ পর্য্যন্ত আমি ভারতের প্রাচীন শিক্ষার একটা অসম্পূর্ণ চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন কি পদ্ধতিতে এই শিক্ষা লাভ হইত, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

বেদবিদ্যাই ভারতের প্রাচীন বিদ্যা। বেদের ক্রম-বিকাশ বা পরিণতির তিনটি স্তর লক্ষিত হয়। বেদের শেষ পরিণতি সূত্র গ্রন্থ। ভগবান বুদ্ধের সময় সূত্রের বিকাশের পরিসমাপ্তি। সূত্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের পরিণতি আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে মন্ত্র বা সূক্ত। মন্ত্রযুগেই সূক্তের সংগ্রহ হইয়াছিল এবং এই যুগেই ইহাদের শ্রেণীবিভাগ হয়। যজ্ঞসম্পাদনের জন্যই এই সকল সূক্তের ব্যবহার বা পাঠ হইত। কিন্তু এই যুগেই আর এক জাতীয় সূক্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। সেই সকল সূক্ত যজ্ঞকার্য্যে পঠিত হইত না। এই সকল সূক্ত জাতীয় কবিতার পবিত্র সারস্বত মন্দির। এই সকল সূক্তকেই ভট্ট মোক্ষমূলর ঋক্‌বেদ আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন। সুতরাং বলিতে পারা যায়, এই মন্ত্রযুগের পূর্ব্বেই সূক্তের জন্ম, এবং সেই যুগকে ছন্দ-যুগ বলা যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা বৈদিক যুগের প্রাচীনতার পরিমাণ করিয়া থাকেন। এ সকল বিষয়ের আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। একটি মাত্র কথা আমি বলিয়া রাখিব যে, সকলেই বিনা-পত্তিতে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সমগ্র আর্য্যজগতে ঋগ্বেদের সূক্ত অপেক্ষা প্রাচীনতর আর কিছুই নাই।

নানা কারণে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, ছন্দযুগের কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৮০০—১০০০ বর্ষের মধ্যবর্ত্তী। মন্ত্রযুগের কাল খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০০০—৮০০ বর্ষের মধ্যবর্ত্তী, এবং

* Lectures on the Origin of Religion.

† Vincent Smith's Early History of India, 3rd Edition, p. 135.

ব্রাহ্মণ যুগের কাল খৃষ্টপূর্ব ৮০০—৬০০ বর্ষের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং আমরা মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি যে ঋগ্বেদের সূক্তগুলি খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০০—২০০০ বর্ষের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিল।

এখন আমি শিক্ষাপদ্ধতির আলোচনা করিব। খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে আর্য্যগণ কিরূপে দৈনিক জীবন যাপন করিতেন, শুধু ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তেই ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। সেই সময়ে পরিবারের কর্ত্তা ধর্ম্মগুরু ও নেতার স্থলবর্ত্তী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে হোম করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সূক্ত পাঠ করিতেন। ভগবৎ-প্রেরণার ফলে ঋষিগণ এই সকল সূক্ত রচনা করিতেন। আর্য্যগণ তখন ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন, সুতরাং নরনারীর সমবেত চেষ্টায় তাঁহারা দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন। সুতরাং জীবনযাত্রানির্ব্বাহের প্রয়োজনই শিক্ষকরূপে তাঁহাদিগকে অনেক বিদ্যা শিখাইয়া দিত। এইরূপে তাঁহারা নৌকানির্ম্মাণ, মৃন্ময় ভাণ্ডনির্ম্মাণ, সূত্রনির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন, সূত্রধরের কার্য্য, পশুচর্ম্ম ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া প্রভৃতি শিক্ষা করিত। তখন জাতিভেদ ছিল না। মাত্র গৌরকান্তি আর্য্য ও কৃষ্ণকায় অনার্য্য, এই দুই বর্ণের লোক ছিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদের সংস্পর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতেন।

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র যুগে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০০০—৫০০ বর্ষের মধ্যবর্ত্তী কালে জাতির সৃষ্টি হয়। তখন ধর্ম্মকার্য্য সামান্য যজ্ঞাহুতি হইতে জটিল প্রক্রিয়াযুক্ত হোমাদিতে পরিণত হইয়া উঠে। এই যুগেই আশ্রমধর্ম্মের সূচনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ৪, ৩, ২, ও ১টি আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিত।* আর্য্যসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই কতিপয় সংস্কার সম্পন্ন করিতে হইত। শূদ্রেরাও এই সকল সংস্কারের অধিকারী ছিল; কিন্তু তাহাদের সংস্কারকালে বেদমন্ত্র পঠিত হইত না, এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কার হইত না।

আর্য্যসন্তানের শিক্ষার প্রথম অবস্থা ৭ হইতে ১১ বৎসরের মধ্যে আরম্ভ হইত।† তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বালক এক বা একাধিক বেদ কণ্ঠস্থ করিত। বেদকে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বলা হইত, সুতরাং বেদাধ্যয়নকারীকে ব্রহ্মচারী বলা হইত। বেদ ব্রাহ্মণের নিজস্ব ছিল না। ব্রাহ্মণের মাত্র একটা বিশেষ অধিকার ছিল—বেদ শিক্ষা দেওয়া। আর উপনিষদও ব্রাহ্মণেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতেন না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগের শিক্ষাপদ্ধতি একই প্রকার। ইহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পাঠ্য বিষয়,—ব্রাহ্মণ রচিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃঃপূঃ ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত একমাত্র পাঠ্য বিষয় ছিল বেদ। বিভিন্ন বেদ আর্য্যসন্তানগণ কণ্ঠস্থ করিত। তৎপর ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদান্ত পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল। আবার, পরবর্ত্তী কালে যখন সূত্রগ্রন্থ রচিত হইল, তখন ষড়ঙ্গও পাঠ্য হইল।

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।

মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥

দশলক্ষণকং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।

বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সন্ন্যসেদনৃণে দ্বিজঃ।

মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯৪ শ্লোক।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।

সকল্পং সরহস্যঞ্চ তথাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।

যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥

মনু, ২য় অধ্যায়, ১৪০-১৪১ শ্লোক।

অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।

শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়া পংক্তিপাবনাঃ॥

ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ॥

ব্রাহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠ সামগ এব চ॥ ইত্যাদি

মনু, ৩য় অধ্যায়, ১৮৪-১৮৬ শ্লোক।

বর্ত্তমান সময়ে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে বয়সে বিদ্যা লাভ করে, তখনও আর্য্যসন্তানগণ সেই সময়ে বেদপাঠ

* আর্য্যবিদ্যাসুধানিধি, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

† আপস্তম্বসূত্র ১, ১, ১৮।

করিত। তাহারা কিন্তু কোনও পুস্তক হইতে অধ্যয়নীয় বিষয় অধ্যয়ন করিত না, গুরুর মুখে শুনিয়া সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিত। মোটামুটি বলা যায় যে, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখন-কৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং অধীত বিদ্যা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ছিল স্মৃতি। সুতরাং যাহাতে কিছুই স্মৃতিচ্যুত হইতে না পারে, তজ্জন্য ঋষিগণ নানা প্রকার স্মৃতি-সহায়ক নিয়মাবলীর সৃষ্টি করিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আজকালও ভারতের কোন কোন প্রদেশে কোন কোন পরিবারের আর্য্যসন্তানগণ গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া বেদসূক্ত কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তক্ষশিলায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তথায় অধ্যাপকগণ ষোড়শটি শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। এই তক্ষশিলায়ই ভাস্কর-বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ এবং আরও অনেক শিল্পকলা শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য তক্ষশিলা প্রসিদ্ধ ছিল।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পাঠ্য বিষয় সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইত; যথা (১) পুস্তক-মূলক বা theoretical, ও ব্যবহারিক কার্য্যমূলক বা practical. কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যা বিদ্যার্থীর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও অধিকার না থাকিলে, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত না। কিন্তু আর্য্যসন্তানমাত্রই বেদপাঠ করিত, এবং প্রত্যেকে তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য শিক্ষা করিত। মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের ৩১১ ও ৩২৭-৩৩৮ শ্লোকে জাতিগত কর্ত্তব্যের বর্ণনা আছে। আর, আর্য্যসন্তান যে জাতীয়ই হউক না কেন, প্রতিদিন তাহাকে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইত, এবং প্রত্যেক আর্য্যসন্তানই অতি শৈশবে এই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনে দীক্ষিত হইত। অনার্য্যগণও আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত। আর্য্যেরা ইহাতে কোনই বাধা প্রদান করিত না। দীক্ষিত হইয়া আর্য্যসন্তানগণ জাতি অনুযায়ী কর্ত্তব্য কার্য্য করিত।

মনু, ৩য় অধ্যায়, ৭০—৭৪ শ্লোক।

কিন্তু এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আর্য্যসন্তান-গণের পক্ষে বেদ ও তদঙ্গীয় অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন অবশ্য-কর্ত্তব্য হইলেও অধিকার ও সুবিধা অনুসারে ইহাদের পরিমাণের তারতম্য হইত।

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥ ইত্যাদি
মনু, ২য় অধ্যায়, ৭০ এবং ১০৫

আবার, তখন সমগ্র বেদ বলিলে অঙ্গ, রহস্য ও উপনিষদ বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হইত।

দুর্ভিক্ষের সময় ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির নিকটেও বেদ-পাঠের বিধি ছিল। (মনু, ২য় অধ্যায়, ২৪১)

আইন বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র এবং বিবিধ কলাবিদ্যা জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিক্ষা দিতে পারিত। যাহার ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, এরূপ ছাত্র নীচ জাতীয় লোকের নিকটও উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। (মনু, ২য় অধ্যায়, ২৩৮ শ্লোক)।

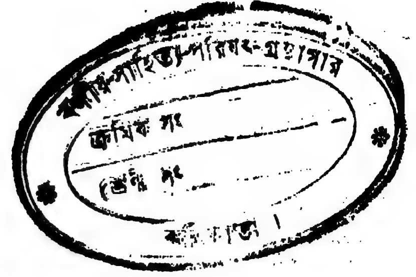
তৎকালে যে সকল কলা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত, তন্মধ্যে কারুকার্য্য, বস্ত্রবয়ন, সঙ্গীত, নৃত্যবিদ্যা, কাব্য-রচনা প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

আর্য্যসন্তানগণ বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হইতেন। শুধু বেদবিদ্যা শিক্ষা করিলেই অধ্যয়ন সমাপ্ত হইত না। আপস্তম্ব সূত্রে উল্লেখ আছে (১১, ১১, ৩৯) যে স্ত্রীলোক ও শূদ্রেরা যে বিদ্যা আয়ত্ত করে, সেই বিদ্যা আয়ত্ত না করিলে অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, শূদ্রগণকে সকল বিদ্যা হইতেই বঞ্চিত করিয়া রাখা হইত না। বশিষ্ঠে (৩, ৩) বিভিন্ন ব্যবসায়, অভিনেতার কার্য্য, চিকিৎসা ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। রাজগণ বেদ, নীতিশাস্ত্র, শাসন-বিধি, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পশুচিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিবেন বলিয়া মনু ও গৌতম সূত্রে উল্লিখিত আছে। তা ছাড়া, সন্ধি, বিগ্রহ, সৈন্যচালন, সৈন্যসমাবেশ প্রভৃতি বিদ্যাও রাজা অবশ্য আয়ত্ত করিবেন। পার্থিব জ্ঞান বলিলে তৎকালে কবিতা, অলঙ্কার, ছন্দ প্রভৃতির জ্ঞানকেও বুঝাইত (বিষ্ণুপুরাণ, ৩০, ৪৩)। রাজারা পুরাণ, ইতিহাস এবং বেদাঙ্গ পাঠ করিতেন (বিষ্ণু ৩০, ৩৪)। নীতিকথা প্রভৃতিও রাজার পঠনীয় ছিল। (মনু, ২য় অধ্যায়, ২৩২ শ্লোক)।

যাহাতে সংসারে উন্নতি হয়, সুখ লাভ হয়, ধনবৃদ্ধি হয়, গৃহস্থগণ সেই সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন। সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে ইতিহাস, পুরাণ, ন্যায়, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র অবশ্য পঠনীয় ছিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।



প্রতিভা।

৬ষ্ঠ বর্ষ | আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৩ | ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

একাম্র পীঠ *

মন্ত্রচূড়ামণিতে উক্ত ৫১ পীঠ

যে একাম্রটি তীর্থস্থান এখন একাম্রপীঠ নামে পরিচিত, "মন্ত্রচূড়ামণি" নামক তন্ত্রের পীঠনির্ণয়-প্রকরণে তাহাদের তালিকা নিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই তন্ত্রখানি হইতে পীঠমালা সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—

যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতীদেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিল গদাধর।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেই স্থান পূজিত বিধির॥
করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
একমত না হয় পুরাণমত যত।
আমি কহি মন্ত্রচূড়ামণি তন্ত্রমত॥

* * * *

(৩) উজানীতে কফোণি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥

* * * *

(৪) দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়॥

* * * *

(৫) কালীঘাটে চারিটী অঙ্গুলী ডানি পায়।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তায়॥

বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলে, যেখানে "শ্রীহট্ট" আছে, হস্তলিখিত মন্ত্রচূড়ামণ্যুক্ত পীঠনির্ণয়ে এবং শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত তন্ত্রচূড়ামণির বচনে সেইখানে "শ্রীশৈল" দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত তন্ত্রচূড়ামণি এবং মন্ত্রচূড়ামণি খুব সম্ভব অভিন্ন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আর একটি বাঙ্গলার পীঠ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

(৬) "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

তন্ত্রসারোক্ত একাম্র পীঠ

কৃষ্ণানন্দ-সঙ্কলিত "তন্ত্রসারের" পীঠন্যাস-প্রকরণে একান্ন পীঠের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অকারাদি ক্রমে এই সকল নাম প্রদত্ত হইল—

"অন্নদামঙ্গলে" বাঙ্গালা দেশের এই কয়টি পীঠের নাম আছে। যথা—

(১) করতোয়াতটে পরে বাম কর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার॥

* * * *

* উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের রঙ্গপুর-অধিবেশনে পঠিত।

(২) চট্টগ্রামে ভানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥

অট্টহাস পীঠ।	নেপাল পীঠ।
অর্বুদ পীঠ।	পুরস্থির পীঠ।
আম্রাতকেশ্বর পীঠ।	পূর্ণ শৈল পীঠ।
উজ্জয়িনী পীঠ।	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পীঠ।
উড্ডীয়ান পীঠ।	প্রয়াগ পীঠ।
উড্ডীশ পীঠ	বাণেশ্বর পীঠ।
একাম্র পীঠ।	বারাণসী পীঠ।
এলাপুর পীঠ	বামন পীঠ।
ওঙ্কার পীঠ।	বিরজ পীঠ।
কান্যকুব্জ পীঠ।	ভদ্র পীঠ।
কামকোট্ট পীঠ।	ভৃগুনগর পীঠ।
কামরূপ পীঠ।	মঙ্গলকোট্ট পীঠ।
কেদার পীঠ।	মলয় পীঠ।
কোষগিরি পীঠ। —	মহাপথ পীঠ।
ক্ষীরিকা পীঠ।	মহামেরু পীঠ।
গিরি পীঠ।	মহালক্ষ্মীপুর পীঠ।
গোকর্ণ পীঠ।	মহেন্দ্র পীঠ।
চন্দ্রপুর পীঠ।	মায়াপুরী পীঠ।
চরিত্র পীঠ।	মারুতেশ্বর পীঠ
ছায়াচ্ছত্র পীঠ।	মালব পীঠ।
জয়ন্তী পীঠ।	রাজগৃহ পীঠ।
জলেশ্বর পীঠ।	শ্রীপীঠ।
জালন্ধর পীঠ।	শ্রীশৈল পীঠ।
ত্রিস্রোত পীঠ।	ষষ্ঠীশপুর পীঠ।
দেবীকোট্ট পীঠ।	হস্তিনাপুর পীঠ।

হিরণ্যপুর পীঠ।

একাম্রপীঠের এই তালিকায় বাঙ্গলাদেশের অন্তর্গত দেবী-কোট্ট বা দেবীকোট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, এবং মঙ্গলকোট, এই তিনটি পীঠের নাম আছে; কিন্তু চট্টগ্রাম, কালীঘাট, যশোর, ত্রিপুরা এবং করতোয়াতটের নাম নাই। পক্ষান্তরে, "মন্ত্রচূড়ামণি" তন্ত্রে দেবীকোটের এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম নাই। এই নিমিত্ত অনুমান হয়, যখন অন্নসারোদ্ধৃত একাম্রপীঠের তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন কালীঘাট, যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পীঠ-স্থান বলিয়া গণ্য হইত না; এবং যখন মন্ত্রচূড়ামণির তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন দেবীকোট্টের এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মহিমা লুপ্ত হইয়াছিল।

দেবী-ভাগবতোক্ত ১০৮ পীঠ

দেবী-ভাগবতে (শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত) আবার একাম্র স্থলে একশত আটটি পীঠের উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে, মহাদেব দক্ষের যজ্ঞস্থলে যাইয়া—

অপশ্যত্তাং সতীং বহ্নৌ দহ্যমানাঞ্চ চিৎকলাম্।
স্কন্ধেৎপ্যারোপয়ামাস হা! সতীতি বদন্ মুহুঃ॥
বভ্রাম ভ্রান্তচিত্তঃ সন্নানাদেশেষু শঙ্করঃ।
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চিন্তামাপুরনুত্তমাম্॥
বিষ্ণুস্ত ত্বরয়া তত্র ধনুরুদ্যম্য মার্গণৈঃ।
চিচ্ছেদাবয়বান্ সত্যা স্তত্তৎস্থানেষু তেঽপতন্॥

অর্থাৎ সতীদেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া মহাদেব তাহা স্কন্ধে স্থাপন করতঃ 'হা! সতী', 'হা! সতী' বলিতে বলিতে ভ্রান্ত চিত্তে নানাদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু সত্বর বাণ দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন, এবং এই সকল খণ্ড নানাস্থানে পতিত হইল। এই সকল স্থান দেবীপীঠ নামে খ্যাতি লাভ করিল। একশত আটটি দেবীপীঠের এবং তৎস্থ দেবীর একশত আট মূর্ত্তির নামোল্লেখ করিয়া দেবীভাগবৎকার লিখিতেছেন—

ইমান্যষ্টশতানি স্যুঃ পীঠানি জনমেজয়।
তৎসংখ্যাকাস্তদীশান্যো দেব্যশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
সতীদেব্যঙ্গভূতানি পীঠানি কথিতানি চ।
অন্যান্যপি প্রসঙ্গেন যানি মুখ্যানি ভূতলে॥
যঃ স্মরেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি নামাষ্ট শতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীলোকং পরং ব্রজেৎ॥"

দেবীভাগবতোক্ত একশত আটটি পীঠের মধ্যে বাঙ্গলার একটি মাত্র পীঠের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা, 'পাড়লা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে', অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ভগবতী পাড়লারূপে বিদ্যমান আছেন।

কালিকা-পুরাণ

কালিকাপুরাণে পীঠোৎপত্তির আখ্যায়িকা একটু স্বতন্ত্র আকারে প্রদত্ত হইয়াছে। মহাদেব সতীশব স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় প্রাচ্য দেশে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শনৈশ্চর যোগমায়া আশ্রয় করিয়া অদৃশ্যভাবে সেই শবে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে স্থানে স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞ-প্রসঙ্গে দেবীকূট (দেবীকোট), উড্ডিয়ান, কামরূপ, জালন্ধর এবং পূর্ণগিরি এই কয়টি পীঠের নাম উল্লিখিত হইয়াছে; এবং কথিত হইয়াছে, প্রাচ্যভাগে সতীশব স্কন্ধে করিয়া মহাদেব যে

পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত যাজ্ঞিকদেশ।*

পীঠোৎপত্তি সম্বন্ধে এ যাবৎ যে সকল গ্রন্থ হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহাদের মধ্যে একটি বিষয়ে ঐক্য আছে। সকল গ্রন্থেই কথিত বা সূচিত হইয়াছে, দক্ষালয়ে যজ্ঞস্থলে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব সতীশব স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই শবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতে এবং অনেক মহাপুরাণে যে দক্ষযজ্ঞবৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই সতীশবছেদন-সম্বন্ধে আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে (২৮৪ অধ্যায়) কথিত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে দক্ষ হরিদ্বারে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞস্থলে সকল দেবতাই উপস্থিত ছিলেন, কেবল উপস্থিত ছিলেন না মহাদেব। মহাত্মা দধীচি এই জন্য দক্ষের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিলেন। এদিকে কৈলাসপর্ব্বতে দেবী পার্ব্বতী পিতার যজ্ঞে পতির নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া খেদ করিতেছিলেন। মহাদেব দেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন, "আমিই সমুদয় যজ্ঞের ঈশ্বর।......ঋষিগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ প্রদান করিয়া থাকেন।" উত্তরে দেবী কহিলেন, "নাথ! অতি সামান্য লোকও স্ত্রীজনসমক্ষে আপনার প্রশংসা ও গর্ব্ব করিতে পারে।" মহাদেব তখন দেবীর প্রীতিসাধনের জন্য দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থ বীরভদ্রের সৃষ্টি করিলেন। দেবীর ক্রোধসম্ভূতা ভীষণমূর্ত্তিধারিণী মহাকালী বীরভদ্রের অনুগামিনী হইলেন। বীরভদ্র যাইয়া ভূতগণের সাহায্যে সর্ব্বদেব-সুরক্ষিত যজ্ঞস্থল দগ্ধ করিলেন। হতভাগ্য দক্ষ নিরুপায় হইয়া বীরভদ্রের শরণাগত হইলেন। বীরভদ্র বলিলেন, "আমি রুদ্র বা দেবী পার্ব্বতী নহি।......আমার নাম বীরভদ্র। আমি রুদ্র বা দেবের ক্রোধানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আর, দেবী পার্ব্বতীর ক্রোধানল হইতে এই বীরনারী সঞ্জাত হইয়াছে। ইঁহার নাম ভদ্রকালী।...এক্ষণে তুমি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হও।" দক্ষ মহাদেবের স্তব করিলেন। মহাদেব অগ্নিকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। তৎপর দক্ষ মহাদেবের অষ্টোত্তরশত নাম কীর্ত্তন করিলেন (২৮৫ অধ্যায়)। মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে পাশুপত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়া দেবী পার্ব্বতী ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্দ্ধান করিলেন।"

এই মহাভারতীয় দক্ষযজ্ঞোপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগের কথাও নাই, এবং সতীশব স্কন্ধে করিয়া মহাদেবের ভ্রমণের কথাও নাই।

বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে, দক্ষ-প্রজাপতির আট কন্যা ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সতী রুদ্রের পত্নী। সতীপতি

---

* অথ শোকবিমূঢ়াত্মা বিলপন্ বৃষভধ্বজঃ॥
জগাম প্রাচ্যদেশাংস্তু স্কন্ধে কৃত্বা সতীশবম্।
উন্মত্তবৎ গচ্ছতোঽস্য দৃষ্ট্বা ভাবন্দিবৌকসঃ॥
ব্রহ্মাদ্যাশ্চিন্তয়ামাসুঃ শবভ্রংশনকর্ম্মণি।
হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নায়ং বিশীর্ণতাম্॥
গমিষ্যতি কথঞ্চিত্তস্মাদস্য ভ্রংশোভবিষ্যতি।
ইতিসঞ্চিন্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মাবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ॥
সতীশবাস্কর্বিবিশু রদৃশ্যো যোগমায়া।
প্রবিশ্যাথ শবন্দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতীশবম্॥
ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ।
দেবীকূটে পাদযুগ্মন্ত্রপ্রথমন্ন্যপতৎ ক্ষিতৌ॥
উড্ডিয়ানে চোরুযুগ্মং দ্বিতীয় জগতান্ততঃ।
কামরূপে কামগিরৌ ন্যপতৎ যোনিমণ্ডলম্॥
তত্রৈবন্যপতদ্ভূমৌ পূর্ব্বতো নাভিমণ্ডলম্।
জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম্॥
অংশগ্রীবম্পূর্ণগিরৌ কামরূপাত্ততঃ শিবঃ।
যাবদ্ভূবজতোভর্গঃ সমাদায় সতীশবম্॥
প্রাচ্যেষু যাজ্ঞিকোদেশ স্তাবদেব প্রকীর্ত্তিতঃ।

কালিকাপুরাণ ১৮।৩৬—৪৫॥

রুদ্র শ্বশুরকে প্রণাম করিতেন না। এইজন্য শ্বশুর জামাতার উপর বড় বিরক্ত ছিলেন। তিনি এক সময় আর সাত কন্যাকে নিজের বাড়ীতে আনাইলেন, কিন্তু সতীকে আনাইলেন না। সতী অনাহূত ভাবেই পিতৃগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পিতা অন্যান্য কন্যার ন্যায় তাহাকে আদর করিলেন না। সতী রাগান্বিত হইয়া দক্ষকে এই অবজ্ঞার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দক্ষ শিবের নিন্দা করিলেন। তখন সতী—

বায়ুপুরাণে সতীদেহ-ত্যাগের কথা।

"তত্রৈবাথ সমাসীনা যুক্ত্বাত্মানং সমাদধে।
ধারয়ামাস চাগ্নেয়ীং ধারণাং মনসাত্মনঃ॥
তত আগ্নেয়ীসমুত্থেন বায়ুনা সমুদীরিতঃ।
সর্ব্বাঙ্গেভ্যো বিনিঃসৃত্য বহ্নি র্ভস্ম চকার তাম্।
(৩০।৫৪—৫৫)

"সেইখানে উপবেশন করিয়া (সতী) যোগযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইলেন, এবং মনে মনে অগ্নির ধ্যান করিলেন। তখন অগ্নিসম্ভূত বায়ু সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি সঞ্চালিত করিয়া তাঁহাকে ভস্মীভূত করিল।"

বায়ুপুরাণের এই ত্রিংশ অধ্যায়ে যে দক্ষযজ্ঞের আখ্যান আছে, তাহা মহাভারতীয় আখ্যানের অনুরূপ। তাহাতে সতীর দেহত্যাগের কথা নাই।

মৎস্যপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে দক্ষযজ্ঞের আখ্যান আছে, তাহাতে যজ্ঞস্থলেই সতীর দেহত্যাগের কথা আছে, এবং পীঠোৎপত্তির আখ্যানেরও অঙ্কুর আছে। যথা—

মৎস্যপুরাণে দক্ষযজ্ঞ

"দক্ষস্য যজ্ঞে বিততে প্রভূত-বরদক্ষিণে।
সমাহূতেষু দেবেষু প্রোবাচ পিতরং সতী॥
কিমর্থং তাত ভর্ত্তা মে যজ্ঞেঽস্মিন্নাভিমন্ত্রিতঃ।
অযোগ্য ইতি তামাহ দক্ষো যজ্ঞেষু শূলভৃৎ॥
উপসংহারকৃদ্রুদ্র স্তেনামঙ্গলভাগয়ম্।
ক্রুকোপাথ সতী দেহং ত্যক্ষ্যামীতি ত্বদুদ্ভবম্॥
দশানাং ত্বং চ ভবিতা পিতৄণামেকপুত্রকঃ।
ক্ষত্রিয়ত্বে ঽশ্বমেধে চ রুদ্রাত্ত্বং নাশমেষ্যসি॥
ইত্যুক্ত্বা যোগমাস্থায় স্বদেহোদ্ভবতেজসা।
নির্দহন্তী তদাত্মানং সদেবাসুরকিন্নরৈঃ॥"
(১৩।১২—১৬)

অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে সতী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যজ্ঞে তাঁহার পতির নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন। দক্ষ উত্তর করিলেন, সংহারকারী রুদ্র যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য নহে। তখন সতী ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে অভিসম্পাত করিলেন, এবং যোগস্থা হইয়া নিজের দেহ হইতে উৎপন্ন তেজের দ্বারা দেব, অসুর, এবং কিন্নরগণ সহ আপনাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সন্তপ্ত দক্ষ তখন দেবীর স্তব করিলেন। দেবী কতকটা প্রসন্না হইলেন। দক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে অনঘে। কোন্ কোন্ তীর্থে তোমাকে দেখা যাইবে এবং কি কি নাম করিয়া তোমাকে স্তব করিতে হইবে।" উত্তরে দেবী আপনার ১০৮ নাম এবং ১০৮টি তীর্থের নাম করিলেন। এই ১০৮ নামে দেবী এই ১০৮টি তীর্থে যথাক্রমে পূজিতা হয়েন। এই সকল তীর্থে স্নানের, দেবীপূজার, এবং ১০৮ নামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দেবী আপনার তেজে আপনাকে ভস্মীভূত করিলেন। যথা—

মৎস্যপুরাণে ১০৮ তীর্থ।

"এবমুক্তোঽব্রবীদ্দক্ষঃ কেষু কেষু ময়াঽনঘে।
তীর্থেষু চ ত্বং দ্রষ্টব্যা স্তোত্রব্যাকৈশ্চ নামভিঃ॥২৩॥

দেব্যুবাচ—

সর্ব্বদা সর্ব্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বতো ভুবি।
সর্ব্বলোকেষু যৎকিঞ্চিদ্রহিতং ন ময়া বিনা॥
তথাঽপি যেষু স্থানেষু দ্রষ্টব্যা সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
স্মর্তব্যা ভূতিকামৈর্ব্বা তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী নৈমিষে লিঙ্গধারিণী।
প্রয়াগে ললিতা দেবী কামাক্ষী গন্ধমাদনে॥
মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাঽম্বরে॥
গোমন্তে গোমতী নাম মন্দরে কামচারিণী।

মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে॥
কান্যকুব্জে তথা গৌরী রম্ভা মলয়পর্ব্বতে।
একাম্রকে কীর্ত্তিমতী বিশ্বাং বিশ্বেশ্বরে বিদুঃ॥
পুষ্করে পুরুহূতেতি কেদারে মার্গদায়িনী।
নন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥৩০।
স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বলে বিল্বপত্রিকা।
শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা॥
জয়া বরাহশৈলে তু কামলা কমলালয়ে।
রুদ্রকোটে চ রুদ্রাণী কালী কালঞ্জরে গিরৌ॥
মহালিঙ্গে তু কপিলা মর্কোটে মুকুটেশ্বরী।
শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া॥
মায়াপুর্য্যাং কুমারী তু সংতানে ললিতা তথা।
উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে কমলাক্ষে মহোৎপলা॥
গঙ্গায়াং মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্ধনে ॥৩৫।
নারায়ণী সুপার্শ্বে তু বিকুটে ভদ্রসুন্দরী।
বিপুলে বিপুলা নাম কল্যাণী মলয়াচলে॥
কোটবী কোটিতীর্থে তু সুগন্ধা মাধবে বনে।
গোদাশ্রমে ত্রিসংধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া॥
শিবকুণ্ডে শিবানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে॥
দেবকী মথুরায়াং তু পাতালে পরমেশ্বরী।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী॥
সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা।
রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী॥ ৪০।
করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
অরোগা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥
অভয়েত্যুষ্ণতীর্থেষু চামৃতা বিন্ধ্যকন্দরে।
মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরে পুরে॥
ছাগলাণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকা মকরন্দকে।
সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী॥
দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারতটে মতা।
মহালয়ে মহাভাগা পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী॥
সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকেয়ে যশস্করী।
উৎপলাবর্ত্তকে লোলা সুভদ্রা শোণসঙ্গমে॥ ৪৫।
মাতা সিদ্ধপুরে লক্ষ্মীরঙ্গনা ভরতাশ্রমে।
জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ-পর্ব্বতে॥
দেবদারুবনে পুষ্টির্মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে।
ভীমা দেবী হিমাদ্রৌ তু পুষ্টির্বিশ্বেশ্বরে তথা॥
কপালমোচনে শুদ্ধির্মাতা কায়াবরোহণে।
শঙ্খোদ্ধারে ধ্বনির্নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা॥
কালা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শিবকারিণী।
বেণায়ামমৃতা নাম বদর্য্যামুর্বশী তথা॥
ওষধী চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা।
মন্মথা হেমকূটে তু মুকুটে সত্যবাদিনী॥ ৫০।
অশ্বত্থে বন্দনীয়া তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে।
গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিবসংনিধৌ॥
দেবলোকে তথেন্দ্রাণী ব্রহ্মাস্যেষু সরস্বতী।
সূর্য্যবিম্বে প্রভা নাম মাতৃণাং বৈষ্ণবী মতা॥
অরুন্ধতী সতীনাং তু রামাসু চ তিলোত্তমা।
চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্বশরীরিণাম্॥
এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
অষ্টোত্তরঃ চ তীর্থানাং শতমেতদুদাহৃতম্॥
যঃ স্মরেচ্ছৃণুয়াদ্বাঽপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এষু তীর্থেষু যঃ কৃত্বা স্নানং পশ্যতি মাং নরঃ॥ ৫৫।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ কল্পং শিবপুরে বসেৎ।
যস্তু মৎপরমং কালং করোত্যেতেষু মানবঃ॥
স ভিত্ত্বা ব্রহ্মসদনং পদমভ্যেতি শাঙ্করম্।
নাম্নামষ্টশতং যস্তু শ্রাবয়েচ্ছিবসংনিধৌ॥
তৃতীয়ায়ামথাষ্টম্যাং বহুপুত্রো ভবেন্নরঃ।
গোদানে শ্রাদ্ধদানে বা অহন্যহনি বা বুধঃ॥
দেবার্চ্চনাবিধৌ বিদ্বান্ পঠন্ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
এবং বদন্তী সা তত্র দদাহাত্মানমাত্মনা ॥৫৭।"

দেবীভাগবতোক্ত ১০৮ টি দেবী-পীঠের এবং মৎস্য-

পুরাণীয় ১০৮ টি তীর্থের এবং দেবীর নামের যে সামান্ত প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহা লিপিকরপ্রমাদজনিত পাঠান্তর বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। যেমন,* মৎস্য-পুরাণে যেখানে 'একাম্রকে' আছে, দেবীভাগবতে সেখানে 'একাম্র পীঠে' আছে; দেবী ভাগবতে যেখানে 'পাড়লা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে' আছে, মৎস্যপুরাণে সেখানে "পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে' আছে। সুতরাং মৎস্যপুরাণীয় অষ্টোত্তরশত দেবীর নাম এবং তীর্থের নাম দেবীভাগবতে অষ্টোত্তরশত দেবীপীঠের নামরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, অথবা একই মূল উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দেবীভাগবতে বেশীর ভাগ আছে সতীশব স্কন্ধে করিয়া মহাদেবের ভ্রমণ, বিষ্ণু কর্ত্তৃক সতীশব ছেদন, এবং সতীশবের ছিন্নাংশপতনস্থানে দেবী-পীঠোৎপত্তি। মহাভারতে দক্ষযজ্ঞেরপযে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে সতীর দেহত্যাগের কথা নাই, বায়ুপুরাণে দক্ষ কর্ত্তৃক অবমানিতা সতীর যোগাগ্নি দ্বারা দেহ ভস্মীভূত করার কথা আছে, মৎস্যপুরাণে দক্ষযজ্ঞস্থলে স্বীয় তেজের দ্বারা সতীর দেহভস্মের এবং সঙ্গে দেবীর ১০৮ নাম এবং ১০৮ তীর্থের নাম আছে। দেবীভাগবতে, কালিকাপুরাণে, অন্নদামঙ্গলে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ এবং সতীশব স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ এবং পীঠোৎপত্তির প্রসঙ্গ আছে।

আখ্যায়িকা

এই সকল গ্রন্থনিবদ্ধ বিভিন্ন প্রকারের দক্ষযজ্ঞের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, আখ্যায়িকাটি ক্রমশঃই সম্প্রসারিত হইয়াছে, এবং শক্তিপূজার প্রধান কেন্দ্রগুলির মহিমা-বৃদ্ধির জন্য পরিশেষে এ সকল স্থানে সতীশবের ছিন্নাংশ পতনের কথা কল্পিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি সতীশবছেদনের কথা অপেক্ষা-কৃত পরবর্ত্তী কালের কল্পনা হয়, তবে এই সকল দেবীপীঠের অভ্যুদয় হইল কেমন করিয়া?

আমরা যে কয়টি পীঠের তালিকা আলোচনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে বারাণসী, প্রয়াগ, একাম্র বা ভুবনেশ্বর, এবং পুরুষোত্তম বা পুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থের

পীঠ-রহস্য

নাম, এবং কান্যকুব্জ, রাজগৃহ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরের নাম আছে। দেবীপীঠ বলিয়া এই সকল স্থান আদৌ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, এবং আজিও এ সকল স্থান দেবীর মহিমায় মহিমান্বিত নহে। এই সকল প্রসিদ্ধ স্থানে যে দেবীর মন্দির ছিল, তাহাই বরং স্থানমাহাত্ম্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া শাক্তের হিসাবে স্থানকে পীঠস্থানে পরিণত করিয়াছে। স্থানবিশেষে জাগ্রত দেবীমূর্ত্তির মহিমা যে স্থানকে মহিমান্বিত এবং পীঠে পরিণত করে নাই, এমন নহে। কিন্তু প্রসিদ্ধ পীঠস্থানসমূহের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, দেবীর কৃপাই সেই প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণ নহে, স্থানের মহিমাও দেবীর মহিমা বাড়াইয়া দিয়াছে। রাজধানীর রাজলক্ষ্মীর অনুগ্রহব্যতীত কালীঘাটের কালীমাতা এত ভক্তের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কৃষ্ণানন্দের সময় কালীঘাট যে একান্ন পীঠের মধ্যে গণ্য হইত না, এ কথা আগেই বলিয়াছি। এখন বাঙ্গলার প্রাচীন পীঠ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের এবং দেবীকোটের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিব।

বায়ুপুরাণে (১০৪ অধ্যায়) কথিত হইয়াছে, এক

বায়ুপুরাণে পীঠপ্রসঙ্গ

সময়ে সত্যবতী-তনয় ব্যাস বেদার্থ-সম্বন্ধে সংশয়ারূঢ় হইয়া, মেরুকন্দরে যাইয়া চতুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া পরম তপ আচরণ করিয়াছিলেন। এই তপস্যার তিন শত বৎসর অতীত হইলে চতুর্ব্বেদ ব্যাসের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন—

"অপশ্যৎ পুরামেষাং হৃদয়াম্ভোজকল্পিতাম্॥
হরের্ভগবতঃ সাক্ষাদাবির্ভাবস্থলী হি সা।
কাশীমপশ্যদ্ভ্রূমধ্যে মায়ামাধারসংস্থিতাম্॥
লিঙ্গদেশে ততঃ কাঞ্চীমবন্তীং নাভিমণ্ডলে।
কণ্ঠস্থাং দ্বারকামেষাং প্রয়াগং প্রাণগং তথা॥
সব্যাপসব্যয়োস্তেষাং গঙ্গাপি যমুনানদী।
মধ্যে সরস্বতী সাক্ষাদ্গয়াক্ষেত্রং তথাননে॥
হনুগ্রীবামধ্যগতং প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্।
বদর্য্যাশ্রমমেতেষাং ব্রহ্মরন্ধ্রে দদর্শ হ॥
পৌণ্ড্রবর্দ্ধননেপালপীঠং নয়নয়োর্যুগে।
পীঠং পূর্ণগিরিং নাম ললাটে সমদৃশ্যত॥

অন্যে চ মথুরাপীঠং কাঞ্চীপীঠং কটিস্থিতম্।
জালন্ধরং তথা পীঠং স্তনদেশেষদৃশ্যত ॥
ভৃগুপীঠং কর্ণদেশে অযোধ্যাং নাসিকাপুটে।"

৭৫—৮১

পুণ্ড্রবর্দ্ধন

ব্যাস দেহধারী চতুর্ব্বেদের দেহের বিভিন্ন অংশে কাশী, প্রয়াগ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপীঠ, নেপাল-পীঠ, পূর্ণগিরিপীঠ, মথুরাপীঠ, কাঞ্চী-পীঠ, জালন্ধরপীঠ, ভৃগুপীঠ এবং অযোধ্যা দেখিতে পাইলেন। ইহার অর্থ, এই সকল পবিত্র স্থানের মহিমা বেদমূলক। এই সকল স্থান বেদচর্চ্চার কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইত, পুরাণের বচনের এইরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে। এই বায়ুপুরাণীয় বৈদিক পীঠতালিকায় বাঙ্গলাদেশের একমাত্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই নাম দৃষ্ট হয়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বাঙ্গলার প্রাচীনতম তীর্থক্ষেত্র, এবং বাঙ্গলা সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্র। দিব্যাবদানের অন্তর্গত প্রথম(কোটিকর্ণ) অবদানে পুণ্ডবর্দ্ধন নগরকে বৌদ্ধগণের অভিপূজিত দেশের পূর্ব্ব সীমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা, ——"পূর্বেণোপালী পুণ্ডবর্দ্ধনং নাম নগরং তস্য পূর্বেণ পুণ্ডকক্ষো নাম পর্বতঃ, ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ।"

দিব্যাবদানের অন্তর্গত বিতাশোকাবদানে কথিত হইয়াছে, অনাথপিণ্ডদদুহিতা সুমাগধা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পাঁচশত অর্হৎ সহ, ভগবান শাক্যমুনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পদার্পণ করিয়াছিলেন (৪০২ পৃঃ)। এই অবদানে কথিত হইয়াছে, পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নিগ্রন্থোপাসকেরা নিগ্রন্থের পদতলে পতিত বুদ্ধমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। এই অপরাধে অশোকের আদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী ১৮০০০ আজীবিক নিহত হইয়াছিল (৪২৭ পৃঃ)। এই সকল আখ্যায়িকা যে ঐতিহাসিক ঘটনা-মূলক, তাহা মনে হয় না। কিন্তু এই সকল আখ্যায়িকা সাক্ষ্যদান করে যে, দিব্যাবদানরচনার সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বৌদ্ধ, জৈন, এবং আজীবিক-গণের প্রাচীন কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইত। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াং পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে ২০টি বৌদ্ধ মঠ এবং ৩০০০ বৌদ্ধ শ্রমণ, ১০০ দেবমন্দির, এবং বহুসংখ্যক দিগম্বর জৈন (নিগ্রন্থ) দেখিতে পাইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী রাম-চরিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পাল, চন্দ্র, বর্ম্মণ এবং সেন বংশীয় নরপালগণের তাম্রশাসননিচয়ে দেখা যায়, তখন বারেন্দ্র এবং বঙ্গ পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং পুণ্ড্রবর্দ্ধনে অধিষ্ঠিতা পাটলা দেবী যে পীঠাধিষ্ঠাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহা আর খুব আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

দেবীকোট

বাঙ্গলার—বরেন্দ্রের দ্বিতীয় মহাপীঠ দেবীকোট। হেমচন্দ্রের "অভিধান-চিন্তামণিতে" দেবীকোটের এই পর্য্যায় প্রদত্ত হইয়াছে—

"দেবীকোট উমাবনম্।
কোটীবর্ষং বাণপুরং স্যাচ্ছোণিতপুরং চ তৎ ॥" (৯৭৭)

পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষেও এই পর্য্যায়টি দৃষ্ট হয়। বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে, শিবের পঞ্চবিংশতম অবতার দণ্ডীমুণ্ডীশ্বর কোটিবর্ষ নগরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যথা—

"তদাপ্যহং ভবিষ্যামি দণ্ডীমুণ্ডীশ্বরঃ প্রভুঃ।
কোটিবর্ষং সমাসাদ্য নগরং দেবপূজিতম্" ॥

(২৩।২০৯)

বৌদ্ধগণ দেবীকোটকে বোধিসত্ত্ব-পীঠ বলিয়া গণ্য করি-তেন। হেবজ্রতন্ত্র-নামক একখানি বৌদ্ধ তন্ত্রে বোধিসত্ত্ব-পীঠনিচয়ের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই তন্ত্রখানি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। অধ্যাপক সিল্‌ভেন্ লেভি এই তালিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—

পীঠং জালন্ধরং খ্যাতমোড্ডিয়ানং তথৈব চ।
পীঠং পূর্ণগিরিং চৈব কামরূপং তথৈব চ ॥
উপপীঠং মালবং প্রোক্তং সিন্ধুনগরমেব চ।
ক্ষেত্রং মুম্মুনী খ্যাতং ক্ষেত্রং কারুণ্যপাটকম্ ॥
দেবীকোটং তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রং কর্ম্মারপাটকম্।
উপক্ষেত্রং কুলতা প্রোক্তং অর্বুদং চ তথৈব চ ॥
গোদাবরী হিমাদ্রিশ্চ উপক্ষেত্রং হি সংক্ষেপতঃ।

ছন্দোহং হরিকেলং চ লবণসাগরমধ্যজম্ ॥
লম্পাকং কাঞ্চীং চৈব সৌরাষ্ট্রং চ তথৈব চ।
কলিঙ্গং উপচ্ছন্দোহং দ্বীপং চামীকরান্বিতম্ ॥
কোঙ্কণং চোপচ্ছন্দোহং সমাসেনাভিধীয়তে।
পীলবং গ্রামান্তস্থং পীলবং নগরস্ত চ ॥
চরিত্রং কোশলং চৈব বিন্ধ্যা কৌমার-গৌরিকা।
উপপীলবং তৎ সন্নিবেশং বজ্রগর্ভ মহাকৃপ ॥
শ্মশানং প্রেতসংহাতং শ্মশানং চোদধ্যন্তটম্।
উদ্যানং বাপিকাতীরং উপশ্মশানং নিগদ্যতে ॥" *

উপসংহার

যে যে স্থান কোনও বোধিসত্ত্বের পাদস্পর্শে পবিত্র হওয়ার প্রবাদ ছিল, সেই সেই স্থান বোধিসত্ত্ব-পীঠ বলিয়া গণ্য হইত। হেবজ্রতন্ত্রোক্ত বোধিসত্ত্ব-পীঠের তালিকায় উড্ডিয়ান, কামরূপ, জালন্ধর প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ দেবীপীঠও স্থান লাভ করিয়াছে। বঙ্গের কোন্ পবিত্র অংশ যে হরিকেল-পীঠ নামে পূজিত হইত, তাহা আমরা জানি না। দেবীকোটের বিশাল ভগ্নস্তূপ দীনাজপুর সহরের ষোল মাইল দক্ষিণে পুনর্ভবা নদীতীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। কানিংহামের মতে, বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থানগড় পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের ভগ্নাবশেষ। এ কথা সকলে স্বীকার করেন না। সেই ভগ্নস্তূপের খনন না করিলে, এই সংশয়ের অপনোদন অসম্ভব। শুধু সংশয় অপনোদনের বা সমস্তাসমাধানের জন্যই যে মহাস্থানের মত স্থান খনন করা আবশ্যক, তাহা নয়। বাঙ্গালী কি ছিল, যদি তাহা জানিতে হয়, বাঙ্গালী কি হইতে পারে, যদি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, তবে বাঙ্গলার এই পরিত্যক্ত এবং বিস্মৃত মহাপীঠসমূহের বিশাল ভগ্নস্তূপগুলি যথাবিধি খনন করিয়া দেখিতেই হইবে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

* Indian Antiquary, XXXV. pp. 19-20).

ভাদরে

নাহি চাহি আমি শারদ-যামিনী,
চাহি না বসন্ত সরসা;
চাহি শুধু—ধাঁ ধাঁ—আঁধারে দামিনী
বজ্র-নাদিনী বরষা!

আজি,

গুরু গুরু গুম্ বাজে আগমনী
সুনীল মেঘের মাদলে;
দীনের কুটীরে এস গো জননী
ভাদরের ভরা বাদলে!

শীতল সরস আর্দ্র পরশ
লহ কোলে তুলে বরুণা!
বাদলের বেশে ঢাল দেশে দেশে
মঙ্গলামৃত করুণা!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

বার্ণার্ড শ' *

আমার বন্ধুকে আমি চিনি এবং তাহার চরিত্র আমি জানি, এ কথা বলিলে কেহই আমাকে ভ্রান্ত কহিবে না। অথচ তাই বলিয়া অন্য সব লোকের সঙ্গে তিনি যে সব কথা বার্ত্তা বলেন কিংবা পত্র ব্যবহার করেন, কিংবা তাহার যে চিন্তা ও অনুভূতি অপ্রকাশিত থাকে, অথবা জীবন ভরিয়া তিনি যে সব কাজ করেন, তাহার সমস্তই আমাকে জানিতে হইবে এমন নহে। নাটকে নাট্যকার যে সব চরিত্র চিত্রন করেন তাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনাই কখনও বিবৃত হয় না। দুষ্যন্ত বা শকুন্তলা, ওথেলো বা ডেস্‌ডিমোনা প্রভৃতির মুখে কবি যে সব কথা দিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনের যে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—যে কোন বাস্তব জীবনে তার চেয়ে বেশী কথা কথিত হয় এবং বেশী ঘটনা ঘটিয়া থাকে; তথাপি ইহাদের চরিত্র কেমন ধরণের ছিল—কবির কল্পনায় ইঁহারা কি প্রকারের মানুষ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে হইলে সে কখন কি বলে এবং কি করে, তাহাই আমাদের লক্ষ্য করিতে হয় বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার জীবনের শেষ কথাটী পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য কিংবা শেষ ঘটনাটী দেখিবার জন্য আমরা অপেক্ষা করি না; ইহার পূর্ব্বেই যে তাহার চরিত্র আমরা বুঝিতে পারি একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কাহারও সব কথা না শুনিয়াও, তাহার মত কি, তাহার চরিত্র কিরূপ তাহা জানা যাইতে পারে।

তেমনই কোনও গায়কের সব গান না শুনিয়াও সে কিরূপ গায়ক তাহা আমরা জানিতে পারি; কোনও কবির সব কবিতা না পড়িয়াও তাহার কবিত্বের পরিচয় আমরা লাভ করিয়া থাকি; এবং কোনও এক গ্রন্থকারের সব কয়খানি গ্রন্থ না পড়িলে তাহার সহিত পরিচিত হওয়া যায় না, এ কথা সত্য নহে। সুতরাং আমি বলিতে কিছু মাত্র লজ্জিত নই যে বার্ণার্ড শ'র সব কয়খানি বই আমার এখনও পড়া হয় নাই; তিনি এখনও জীবিত,—ভবিষ্যতে তিনি যাহা লিখিবেন, শুধু তাই যে আমি পড়ি নাই, তাহা নহে; এ পর্য্যন্ত তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহারও সব আমার পঠিত নহে। তথাপি, কেহ ধৃষ্টতা মনে করিবেন কি না জানি না—বার্ণার্ড শ' আমার পরিচিত, এ কথা বলিতে আমি সাহস করি।

বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ সাহিত্যের অধ্যাপনা যে ভাবে চলে তাহাতে কোনও কবির সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে মত গঠন করিবার সুবিধা ছাত্রকে বড় দেওয়া হয় না। চাকুরীর উমেদারের সহিত পরিচিত হইয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা মত গঠন করিবার অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই, মনীবকে বাহির হইতে তৃতীয় এক জন যেমন বলিয়া দেয় যে, এই উমেদারটী এইরূপ, গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তেমনই কোনও এক ভক্ত সমালোচকের মত শুনিয়া ছাত্রকে জানিতে হয়, এই লেখক এই ধরণের; পরে, স্বাধীন ভাবে নিজের একটা মত হইবার পূর্ব্বেই পরীক্ষাগারের অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহাকে বলিয়া আসিতে হয়, 'এই কবিকে আমি এইরূপ মনে করি'; এবং যাহার সাহিত্য-চর্চ্চা এই খানেই শেষ হয়, কোনও এক লেখকের সম্বন্ধে তাহার নিজের অনুভূতি যে কি তাহা সে কখনও জানিতে পারে না। আমার পরিচিত কাহারও সম্বন্ধে অন্যে কি মনে করে, তাহা না জানিয়াও আমি নিজে একটা স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতে পারি, এবং সে মতের যে কোনও মূল্য নাই, এরূপও নহে; বরং আমার কাছে সে মতই অধিক সত্য; কারণ, ইহা পরের মুখে আস্বাদন করা নয়।

স্বয়ং পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই কোনও এক লেখকের সম্বন্ধে অন্যের একটা মত যে আমরা গলাধঃকরণ করি, তাহা বোধ হয় ভুল; এবং বিদেশী গ্রন্থকারদের বিদেশী সমালোচনা সর্ব্বাগ্রে কণ্ঠস্থ করিয়া নেওয়া আরও ভুল; কারণ, জীবন এবং জীবনের এক অভিব্যক্তি সাহিত্য—এ উভয়কে দেখিবার প্রণালী এক এক দেশে এক এক রূপ। সেক্সপীয়র মিল্‌টনের চূড়ান্ত সমালোচনা ইংলণ্ডে হইয়া গিয়াছে; এদেশে তাহার

* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কিছু বলিতে কেহ সাহস পান না। কিন্তু নাম না বলিয়া এবং গৃহীত সমালোচকদের মত গোপন রাখিয়া যদি ইহাদেরই কোন কল্পনাকে এদেশের বলিয়া কেহ চালাইতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে,যাহারা বিলাতী সমালোচনা না পড়িয়াছে তাহারা যে ঠিক ঐরূপ সমালোচনাই করিত, এরূপ বলিতে ভরসা হয় না। সুতরাং কোনও এক সাহিত্যিকের লেখার সহিত পরিচিত হইতে হইলে অন্যের কৃত সমালোচনা সর্ব্বাগ্রে জানিয়া লইতে হইবে, এমন নহে; বরং পূর্ব্ব হইতে একটা মত ধার করিয়া লওয়া স্বাধীন বিচারের অন্তরায়।

বিশেষতঃ, বার্ণার্ড শ' এখনও ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীয়র মিল্টনের মত একটা অবিসংবাদিত স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি যশস্বী সন্দেহ নাই;—পৃথিবীতে যাহারা সাহিত্য আলোচনা করে তাহারাই তাঁহাকে চিনে; কিন্তু তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে সমালোচকেরা এখনও একমত হইতে পারেন নাই; শুধু তাই নয়, তিনি যে সাহিত্যে চিরকালের জন্য একটা আসন পাওয়ার যোগ্য এ কথাও এখন পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে, এমন কি অধিকাংশের মতেও, স্বীকৃত হয় নাই। শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার গ্রন্থের অধ্যাপনা হয় না; এমন কি,তাঁহার গ্রন্থের অধ্যয়নও অনেকে নিষিদ্ধ মনে করেন, এবং অনেক বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে তাঁহার প্রবেশ-নিষেধ রহিয়াছে। হাজার প্রসিদ্ধ হইলেও এমন গ্রন্থকারের কোন নিরপেক্ষ সমালোচনা পাওয়া যায় না। সুতরাং বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে অন্যের মত সংগ্রহ করিয়া পরে নিজের মত গঠন করিব এরূপ চেষ্টা আমরা করিতে পারি না। বার্ণার্ড শ' নাট্যকার,; লণ্ডনের একাধিক রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটকের অভিনয় হয়, এবং বহু সহস্র লোকে তাহা দর্শন করে; কিন্তু তথাপি সাহিত্য হিসাবে, সেক্সপীয়র মিল্টনের মত,তাঁহার লেখার পঠন, পাঠন, ও সমালোচন এখনও আরম্ভ হয় নাই।

আর একটা কথা। নাট্যকারের সমালোচনায় সাধারণতঃ চরিত্র চিত্রণে ও ঘটনাবলী সন্নিবেশে তাঁহার কৌশলের দিকেই দৃষ্টি রাখা হয় বেশী। কারণ, সাধারণতঃ এই সব কৌশল দ্বারা দর্শকের চিত্তবিনোদন করা ছাড়া নাট্যকারের—কিংবা আরও সাধারণ ভাবে, কবির, অন্য কোন স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না। "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে। সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তা-সম্মিততয়োপদেশযুজে।"—ইত্যাদি কাব্যের বহু গুণ অলঙ্কার-শাস্ত্রে কথিত থাকিলেও ইহাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়াইবে যে কাব্য পাঠে আনন্দ ও লোক-ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে; এবং কাব্যের আদর হইলে কাব্যলেখকের অর্থলাভও হইয়া থাকে। তা' ছাড়া,—ময়ুর-নামক কবির সূর্য্যশতক লেখার ফলে কুষ্ঠনাশ ছাড়া, অন্য কোন 'শিবেতর-ক্ষতি' কাব্য-পাঠে কখনও হইয়াছে কি না ভগবান্ জানেন। কালিদাস ভবভূতি কিংবা সেক্সপীয়র্ মিল্টন্ যে মোক্ষোপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য কাব্য লেখেন নাই, ইহা ঠিক। ধর্ম্ম, সমাজ, বা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনও একটা বিশিষ্ট মত প্রকাশের জন্যও তাঁহারা কাব্যের আশ্রয় নেন নাই। অবশ্যই ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে ইঁহাদের একটা মত ছিল; তাঁহাদের লেখায় তার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ মত প্রচার করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সাধারণ জীবনের কোন কাহিনীকে দৃশ্য বা শ্রব্য কাব্যের আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধারণের চিত্তবিনোদনই ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহাঁদের 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং';—'কালপ্রিয়নাথের যাত্রা প্রসঙ্গে' ই হউক কিংবা বসন্তোৎসবেই হউক কিংবা অন্য কোন স্থলেই হউক,পরিষদের বিনোদনই,—শুধু দৃশ্য কাব্যের নয়, শ্রব্য কাব্যেরও মূল উদ্দেশ্য, এবং কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাহিরেও-ইহা সত্য। সেক্সপীয়রের একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ডাউডেন (Dowden) বলেন, সেক্‌স্‌পীয়র কোনও মত কিংবা তাহার ব্যাখ্যা কিংবা ভগবানের স্বপ্রকাশের কোনও বৃত্তান্ত জগতে প্রচার করেন নাই। কিন্তু ইব্‌সেন বা বার্ণার্ড্ শ প্রভৃতি সেই ধরণের নাট্যকার নহেন। শুধু শিল্প-কৌশল দেখানই ইঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য নহে, এবং শুধু কাব্যসৃষ্টিই ইঁহাদের

প্রসিদ্ধির একমাত্র কারণ নহে। সমাজে ও রাষ্ট্রে, ধর্ম্ম ও নীতির গৃহীত পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ ইঁহাদের লেখার আত্মা; এবং লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা ইঁহাদের লেখায় শক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছে। রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় নাটক ইঁহাদের এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়মাত্র। ধর্ম্ম বা নীতি সম্বন্ধে যাহাদের কিছু প্রচার করিবার থাকে, তাঁহারা নানা উপায়ে তাহা করিতে পারেন; সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ, বাগ্মীর মঞ্চ, কিংবা প্রচারকের বেদী, কিংবা গ্রন্থ-প্রকাশ—এ সমস্ত উপায়েই লোকে নিজের প্রচার্য্য মত জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু অধুনা রঙ্গমঞ্চও তার মধ্যে একটী প্রধান উপায়।

ইউরোপের বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্য প্রাচীন নাট্যসাহিত্য হইতে কিসে পৃথক্, ম্যাটারলিঙ্ক্ একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে দৃশ্য, ঘটনাবলীর চমক আধুনিক নাটকে আস্তে আস্তে অত্যন্ত কমিয়া আসিয়াছে; এবং, মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিবার, এবং সর্ব্বাগ্রে নৈতিক সমস্যার স্থান দিবার ইচ্ছা আধুনিক নাট্য-সাহিত্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু তাই নয়; মানুষ আগে সাহিত্যে যাহা সুন্দর মনে করিত তাহা পরিত্যাগ করিয়া একটা নূতন সৌন্দর্য্য – একটা অধিকতর বাস্তব সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান পড়িয়া গিয়াছে। "ইহা নিশ্চিত যে, রঙ্গমঞ্চে এখন আর আগের মত অদ্ভুত বীর-রসাত্মক কর্ম্মের অভিনয় তত হয় না"। রঙ্গমঞ্চে রক্তারক্তি এখন অনেক কম হয়; শারীরিক শৌর্য্য এখন অনেকটা মৃদু হইয়াছে; এবং যদিও যেমন বাহিরে তেমনই রঙ্গমঞ্চেও এখনও লোক মরে, তথাপি মৃত্যুকে এখন আর দৃশ্য কাব্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গ মনে করা হয় না। কারণ, দুই চারটা আত্মহত্যার কথা বাদ দিলে, মৃত্যুকে এখন আর লোকে জীবনের সকল বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র পন্থা মনে করে না; এবং মানব-মনের এই পরিবর্ত্তন শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, রঙ্গমঞ্চও স্বীকার না করিয়া পারে না।

ইটালী, স্কাণ্ডিনেভিয়া কিংবা স্পেন দেশের প্রাচীন কাহিনী, অথবা পরীর গল্পের মত প্রাচীন কল্পনার কাহিনী, শুধু সেক্সপীয়রের যুগের নয়, পরবর্ত্তী ফরাসী ও জার্ম্মেণ কল্পনা-প্রধান সাহিত্যের (Romanticism) অন্তর্ভুক্ত নাট্যাবলীর ঘটনা যোগাইত; কিন্তু এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আধুনিক নাট্যের মূল ঘটনা এ সব হইতে আর তেমন গ্রহণ করা হয় না। "আমাদের সময়ের কোন যুবক যদি প্রেমে পড়ে, এবং রোমিওর প্রেম যেমন তাহার সমসাময়িক অবস্থার অনুযায়ী সহস্র বিঘ্ন দ্বারা প্রতিহত হইয়াছিল, ইহার প্রেমও যদি তেমনই বর্ত্তমান সমাজে যাহা হইতে পারে এমন সহস্র বাধায় আক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও ইহা নিশ্চয় যে রোমিও জুলিয়েটের প্রেমকাহিনী যে সব অদ্ভুত ঘটনা—যে সব কবিকল্পনায় অলঙ্কৃত হইয়াছে, আধুনিক রঙ্গমঞ্চে তাহার দর্শন পাইব না"। "সুদৃশ্য রাজপথে সেই কলহ, সেই রক্তপাত, সেই অস্ত্রের হলাহল, সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, প্রিয়চিকীর্ষু সমাধিস্থান— এ সকলকে আমরা আর ফিরাইয়া পাইব না"। যাঁহারা এখনও প্রাচীন নাটকের অনুকরণ করেন—যাঁহারা এখনও প্রাচীনের বন্ধন ছেদন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যে সকল নাটক "তাহার ঘটনা-স্থল আধুনিক গৃহ, এবং পাত্রপাত্রী আধুনিক নরনারী"। আজ নাটকে "একটী ক্ষুদ্র গৃহে, টেবিলটীর চারিদিকে আগুনটীর নিকটে মানবের সুখদুঃখের নিষ্পত্তি হইয়া যায়।"

অবশ্যই ইহা ঠিক যে, এখনও নাটকে প্রেম, ঘৃণা, দুরাশা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা প্রভৃতির ক্রিয়া দেখা যায়; এবং ইহাও ঠিক যে, নাটকে চিরকালই বিবিধ ক্রিয়া ও বিচিত্র ঘটনার প্রাধান্য থাকিবে। কিন্তু এই ঘটনার, এই ক্রিয়ার উৎপত্তি কোথা হইতে? লালসার সঙ্গে নীতির, বাসনার সঙ্গে কর্ত্তব্যের যেখানে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেই খানেই মানুষের চিত্তে এই সকল বিচিত্র ঘটনার বীজ উৎপন্ন হয়। ম্যাটারলিঙ্ক্ মনে করেন, "এই জন্যই আধুনিক নাট্যকারদিগের চিত্ত অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সমসাময়িক নৈতিক সমস্যার দিকে ধাবিত; এমন কি, তাঁহারা কেবল এই সমস্ত সমস্যারই আলোচনা করেন, ইহা

বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না"।

আলেকজান্দার ডুমা-র নাট্যাবলীই এই নূতন পথের প্রবর্ত্তক। তিনি এমন সব নৈতিক সমস্যা রঙ্গমঞ্চে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যাহা দর্শকের মনে কদাচিৎ উঠে; কারণ, ইহাদের সমাধান মোটেই কঠিন নহে। 'ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমম্';—মানিনীর পক্ষে কি ইহা উচিত? কিম্বা পত্নী যদি তেমনই দোষে দুষ্ট হয়, পতির কি তাহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে? জারজ সন্তানের কি কোন অধিকার আছে? প্রেমের জন্য বিবাহ ভাল, না টাকার জন্য বিবাহ ভাল? ম্যাটারলিঙ্কের মতে, "ফরাসী দেশের আধুনিক সমগ্র নাট্য সাহিত্য এবং ফরাসী দেশের বাহিরে ফরাসী সাহিত্যেরই প্রতিধ্বনি যে সব সাহিত্য—তাহাদের একমাত্র উপাদান এই সব প্রশ্ন, এবং ইহাদের অনাবশ্যক উত্তর"।

ইহাই ম্যাটারলিঙ্কের মত হইলেও তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, ব্যুয়র্ণসন্, ইব্‌সেন্ প্রভৃতির নাট্যে ইহার চেয়ে গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। যে সব নাট্যকার এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে বার্ণার্ড শ' তাঁহাদের অন্যতম। ইঙ্গিতে এ সকল প্রশ্নের যে উত্তর তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা কখনও পৃথিবীতে গৃহীত হইবে কিনা জানি না; কিন্তু যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এ দেশে পর্য্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই; সুতরাং তাহার সহিত পরিচয় আমাদের অসঙ্গত নহে।

সুতরাং বার্ণার্ড শ'র সমালোচনায় আমরা তাঁহার নাট্য-কৌশলের প্রতি দৃষ্টি করিব না; তিনি যে সব অভিনব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন,—যে সব অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন, সেগুলির সহিত পরিচিত হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। এইখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বার্ণার্ড শ' শুধু নাট্যকার নহেন, প্রবন্ধ ও সমালোচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত; এমন কি তাঁহার নিজের গ্রন্থের সমালোচনাও তিনি নিজে করিয়াছেন, এবং প্রায়ই গ্রন্থের প্রথম মুখবন্ধে প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটা বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তথাপি, নাট্যকার হিসাবেই তাঁহার প্রসিদ্ধি বেশী; এবং নাটকে প্রচারিত অভিনব মতই তাঁহার সুনাম-দুর্নামের কারণ। আর, ইহাও আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যদিও ছাপায় আমরা তাঁহার সব নাটকই পাই, তথাপি সব নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে পারে নাই। কারণ বিলাতে একজন রাজকর্ম্মচারী অনুমতি না দিলে কোনও নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে পারে না। পাছে ধর্ম্ম বা সমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা প্রচারিত হয়, এই জন্যই এই নিয়ম। বার্ণার্ড শ'র সব নাটক যে এই অনুমতি পায় নাই, ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি এমন সব মত প্রচার করিতে চান, এমন সব দৃশ্য অভিনীত দেখিতে চান, যাহা বিলাতী সমাজও সহ্য করিতে পারে না। অবশ্যই, যাহারা এই অনুমতি দেয় না, বার্ণার্ড শ' তাহাদিগকে জড়বুদ্ধি, অন্ধ প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত না করিয়া ছাড়েন নাই; এবং তাঁহার মত উন্নত বলিয়াই যে ইহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য, অত্যন্ত দম্ভ-সহকারে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি অনেক জায়গায়ই নিজের ও নিজের মতের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিলাতে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনীত হইবার অনুমতি যিনি দেন, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গত ১৯০৯ সনে পার্লেমেণ্টের এক কমিটী বসে। ঐ কমিটীতে সাক্ষ্য দিবার সময় বার্ণার্ড শ' বলিয়াছিলেন;—"আমার পেশা রঙ্গালয়ের জন্য নাটক লেখা। আমি ১৮৯২ সন হইতে এই কায করিয়া আসিতেছি। গ্রন্থকার-পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির আমি একজন সভ্য এবং ঐ পরিষদেরই নাট্য-বিভাগেও আমার নাম আছে। আমি উনিশখানা নাটক লিখিয়াছি; এবং ইহাদের কয়েকখানি তুরস্ক, গ্রীস ও পর্ত্তুগাল ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশেই অনুদিত ও অভিনীত হইয়াছে। আমেরিকায় ইহাদের অত্যন্ত আদর। ইহাদের তিনখানা এ দেশে (বিলাতে) অভিনীত হইবার অনুমতি পায় নাই; একখানা পরে পাইয়াছিল, কিন্তু বাকী দুইখানা এখনও অনুমতি পায় নাই। ইংলণ্ডের বাহিরে এক অষ্ট্রীয়াতে আমার একখানা নাটক অভিনয়ের অনুমতি পায় নাই; অন্য কোথাও এরূপ বাধা

দেওয়া হয় নাই। আমেরিকাতেও একখানা নাটক প্রথম অভিনয়ের অনুমতি পায় নাই, কিন্তু পরে পাইয়াছিল।"

"আমি নাট্যকারদের সাধারণ ব্যবসায়ে নিযুক্ত একজন সামান্য নাট্যকার মাত্র নহি। I am a specialist in immoral and heretical plays'—গৃহীত নীতি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নাটক লেখাই আমার বিশেষত্ব। সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের গৃহীত চারিত্রনীতির কথা ভাবিতে বাধ্য করি বলিয়াই আমার নাম। বিশেষ করিয়া কহিতে হইলে বলিব যে, আর্থিক ও যৌন সম্বন্ধ বিষয়ে সাধারণের অনেক মতকেই আমি ভ্রান্ত মনে করি; এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে গৃহীত খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের কেবল কোন মতকে আমি ঘৃণা করি। লোকে এই সমস্ত বিষয়ে আমার মত গ্রহণ করুক, এই স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমি নাটক লিখি।"

অন্যত্র তিনি কহিতেছেন,"I had no taste for what is called popular art, no respect for popular morality, no belief in popular religion, no admiration for popular heroics".—সর্ব্বসাধারণে যাহাকে কলা-শিল্প কহে তাহাতে আমার রুচি ছিল না, সাধারণে গৃহীত নীতিকে আমি শ্রদ্ধা করি নাই, সাধারণের ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস ছিল না, সাধারণে যাহাকে বীর রস কহে তাহাকে আমি প্রশংসা করি নাই।"

"করুণা-প্রবণ চিত্ত বলিয়া, যুদ্ধেই হউক, ক্রীড়ায়ই হউক, আর কসাইখানায়ই হউক, বল-প্রয়োগ ও হত্যাকে আমি ঘৃণা করি। আমি সাম্যবাদী (socialist); আমাদের সমাজে অর্থের জন্য যে অসংযত, গৃধ্রবৎ কাড়াকাড়ি দেখিতে পাই তাহাকে আমি ঘৃণা করি, এবং সর্ব্ববিধ সাম্যকেই আমি সমাজ-বন্ধন, শিক্ষা, সদাচার প্রভৃতির একমাত্র স্থায়ী ভিত্তি মনে করি।...সাধারণ মানুষে জীবনকে যে ভাবে দেখে আমি তাহা হইতে পৃথক্ ভাবে দেখি...।"

প্রথম বয়সে ('in my nonage') বার্ণার্ড শ' উপন্যাস লিখিতে চেষ্টা করেন এবং পাঁচখানা উপন্যাস লিখিয়াও ছিলেন। কিন্তু যদিও উপন্যাসগুলি পরে ছাপা হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে তাঁহার তেমন নাম হয় নাই। তিনি মনে করেন, তাঁহার এই অকৃতকার্য্যতার কারণ, তাঁহার দৃষ্টি সাধারণের দৃষ্টি হইতে পৃথক্। তিনি বলেন, 'আমি যদি কর্ম্মপটু সাধারণ অর্থলিপ্সু ইংরেজের মত হইতাম, তাহা হইলে বিষয়টা সহজ হইত; শতকরা নব্বই জন ভবিষ্যৎ পুস্তক-ক্রেতা যে দৃষ্টিতে দেখে, আমার স্বাভাবিক দৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া একটা মানস চশমার ভিতর দিয়া আমিও সেই দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিতাম। কিন্তু আমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে এতই অভিমানী ছিলাম, নিজের এই অস্বাভাবিক রকমের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে এতই প্রশংসা করিতাম যে এই ভণ্ডামি গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি আমার হয় নাই।"

"It was as Punch then that I emerged from obscurity".—তিক্ত-রসিক সমালোচক হিসাবেই অতঃপর আমি জনসমাজে পরিচিত হইতে আরম্ভ করি একটা প্রসিদ্ধ পত্রিকার প্রধান স্থানটাই আমার জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইতে লাগিল; এবং প্রতি সপ্তাহে তাহাতে আমি পৃথিবীর রাজধানী লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চ, তাহার কন্সার্ট, ও অপেরার সমালোচনা করিতে লাগিলাম। আর "উচ্চশ্রেণীর লোকেরা আদরের সহিত আমার প্রবন্ধ পড়িত; সাধারণ লোকে ধীরভাবে আমার বক্তৃতা শুনিত"।

কিন্তু প্রথম যেখানে প্রতি সপ্তাহেই নূতন কথা থাকিত, ক্রমে সেখানে পুরাতন কথারই পুনরুক্তি চলিতে লাগিল। প্রথম যাহা হাস্যপরিহাস মাত্র ছিল, ক্রমে তাহাই গম্ভীর ভাব ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বার্ণার্ড শ'র প্রসিদ্ধি লাভ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি কোন প্রকাশক আগে প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই, 'but now I listened to the voice of the publisher for the first time'.—"কিন্তু এতদিনে প্রকাশকের আহ্বান আমি শুনিতে পাইলাম।" কিন্তু কি প্রকাশিত হইবে? সংবাদ-পত্রের সেই পুরাতন প্রবন্ধগুলি? না, নাটক।

অতঃপর তিনি কিরূপে নাট্যকারে পরিণত হন, বার্ণার্ড শ'র নিজের মুখেই আমরা তাহার বৃত্তান্ত পাই। উচ্চ আর্ট ও কলা-শিল্পের মর্য্যাদা বুঝে এমন লোকের উপযুক্ত একটী রঙ্গালয় লণ্ডনে ছিল না। বার্ণার্ড শ' নিজে যে নাটক ভালবাসেন এ কথা বলা অনাবশ্যক; তিনি অভিনয়ও করিতে পারেন। সুতরাং রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই সময়ে একটী নূতন ধরণের রঙ্গালয় স্থাপনের প্রস্তাব

চাহিতেছিল। কিন্তু এই নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্ত খুব উচ্চ ধরণের দুই একখানি নাটকের প্রয়োজন ছিল; এবং ইব্‌সেনের নাটক না হইলে এই 'নূতন রঙ্গালয়ের' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না।

১৮৮৯ সনে সর্ব্বপ্রথম ইব্‌সেনের 'পুতুলের ঘর' নামক নাটক লণ্ডনে অভিনীত হয়, এবং ঠিক এই সময়েই অন্ত একটী রঙ্গালয়ে ইব্‌সেনের 'প্রেতাত্মা' (Ghosts) নামক নাটকও অভিনীত হয়। কিন্তু তথাপি কোনও ইংরেজ গ্রন্থকার এই নূতন ধরণের কোনও নাটক তখন পর্য্যন্ত লিখেন নাই। বার্ণার্ড শ'র কথায়, 'In this humiliating national emergency I proposed to Mr. Grein that he should boldly announce a play by me—"এই লজ্জাজনক জাতীয় দুর্দ্দশার সময় আমি মিঃ গ্রীনকে (অনৈক রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ) বলিয়ে তিনি সাহস করিয়া আমার কৃত একখানি নাটকের কথা ঘোষণা করিতে পারেন"। এবং ১৮৮৫ সনে আর একজনের সঙ্গে একযোগে তিনি যে একটা নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যাহার দুইটী মাত্র অঙ্ক লেখা হইয়াছিল এবং উভয়ের মতের অনৈক্য হওয়ায় যাহা সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহাই তৃতীয় অঙ্কে সম্পূর্ণ করিয়া তিনি ১৮৯২ সনে অভিনয়ের জন্ত প্রদান করেন। এইরূপে বার্ণার্ড শ' সাধারণের সম্মুখে নাট্যকার হিসাবে উপস্থিত হন।

"বিপত্নীকের বাড়ীগুলি"—(Widower's Houses) নামক তাঁহার এই প্রথম নাটক লিখিতে কেন তিনি তাঁহার সহযোগীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এবং প্রথম অভিনয়ের পর ইহা কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, জানিলে তাঁহার কৃত পরবর্ত্তী নাটকগুলির ধারা বুঝা যাইবে। তাঁহার সহযোগীর (Mr. Archer) ইচ্ছা ছিল, তখনকার দিনে প্রচলিত পদ্ধতিতে মানবের সুখদুঃখের প্রতি সহানুভূতিতে পূর্ণ কোনও একটি কাল্পনিক বিষয় নিয়া একখানি সুন্দর নাটক লিখেন, কিন্তু বার্ণার্ড শ' অত্যন্ত রোখের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার আগা-গোড়া বদল করিয়া ফেলেন; এবং কুলিমজুরদের জন্ত নীচ জায়গাতে বাড়ী রাখেন, তাঁদের এবং মিউনিসিপালিটীর কুকাণ্ডের অদ্ভুত অথচ অবিকল কাহিনী নিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিতে চান; আর স্বাধীন আয় আছে বলিয়া যে সব হৃষ্টচিত্ত লোক মনে করেন যে এ সব জঘন্ত বিষয় তাঁহাদের জীবন স্পর্শ করে না, তাঁহাদের ও ইহাদের সহিত যে আর্থিক ও বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটে তাহা নির্দ্দয়ভাবে লোকে প্রকাশ করিয়া দিতে চান"।* এই নাটকখানি সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ' অন্যত্র বলিয়াছেন, 'বিপত্নীকের বাড়ীগুলি'তে আমি দেখাইয়াছি, মক্ষিকা যেমন আবর্জ্জনা হইতে পুষ্টিলাভ করে সেইরূপ মধ্যশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা এবং বড় লোকদের কনিষ্ঠ পুত্রের শাখাসম্ভূত ভদ্র-শ্রেণী (middle class respectability and younger son gentility) কুলি-মজুরদের দারিদ্র্যে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে"।

নাটকখানির ঘটনা সংক্ষেপে এই। নিজে লর্ড উপাধির অধিকারী নন, অথচ লর্ড-বংশ-সম্ভূত একজন যুবক প্রেমে পড়িয়া একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে বিবাহ করিতে চান। কিন্তু ভদ্রলোকটীর পরিচয় জানার পূর্ব্বেই অন্ধ প্রেমের উৎপত্তি হয়। ভদ্রলোকটী কন্যাদান করিতে সম্মত হন এবং ভবিষ্যৎ জামাতাকে তাহার বন্ধুবর্গের, বিশেষতঃ তাহার অন্যতম আত্মীয়া লেডী রক্‌সমেলের সম্মতি লইতে আদেশ করেন। প্রেমের সঙ্গে টাকার লোভও যে জড়িত ছিল না, এমন নহে। কিন্তু পরে জামাতা যখন জানিতে পারিলেন যে, শ্বশুরের সম্পত্তি আর কিছু নয়, মজুরদের জন্ত কতগুলি জঘন্ত বাড়ী; এবং এই সমস্ত বাড়ীর ভাড়া তিনি কসাইর মত নির্ম্মম ভাবে আদায় করেন, তখন তিনি বিবাহ করিতে সম্মত থাকিলেও শ্বশুরের প্রদত্ত কোন টাকা নিতে কিম্বা স্ত্রীকেও উহা নিতে দিতে অসম্মত হন। তাঁহার ভবিষ্যৎ স্ত্রী শুধু তাঁহার অল্প আয়ে সন্তুষ্ট

* "Perversely distorted it into a grotesquely realistic exposure of slum-landlordism, municipal jobbery, and the pecuniary and matrimonial ties between them and the pleasant people of independent incomes who imagine that such sordid matters do not touch their own lives."

থাকিতে নারাজ; সুতরাং এইখানেই আপাততঃ বিবাহ ভাঙ্গিতে বসিল। কিন্তু পরে শ্বশুর আসিয়া জামাতাকে বুঝাইলেন যে, তিনি যে বাড়ী ভাড়া দিয়া টাকা পান,ঐ বাড়ীগুলি রেহাণ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়াই তিনি ঐ বাড়ীগুলি কিনিয়াছেন; এই রেহাণদার আর কেহ নহে, জামাতা স্বয়ং; সুতরাং মজুরদের দারিদ্র্য যদি কাহারও পুষ্টির কারণ হইয়া থাকে,তবে সে শ্বশুর জামাতা উভয়েরই। জামাতা এবার সম্মত হইলেন, কিন্তু পাত্রী এখন নারাজ; তিনি এমন একটা বেকুবকে বিবাহ করিবেন না। সুতরাং বিবাহ আর হয় না। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। ভাড়া আদায় করিবার জন্য শ্বশুরের একটা গোমস্তা ছিল। সে মনীবের বিনা অনুমতিতে কোনও একটা বাড়ীর সিঁড়িতে ধরিয়া উঠিবার জন্য যে রেল থাকে তাহাই একটু মেরামত করিয়া দিয়াছিল, কারণ সেটার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে কখন কে পড়িয়া মারা যায়। এই অন্যায় খরচের জন্য তাহার কর্ম্মচ্যুতি ঘটে। এর পরে সে একটা অজাত কোম্পানীর অংশী হয়।

এদিকে মিউনিসিপ্যালিটী কোন কোন জায়গায় ঐ সব জঘন্য বাড়ীর স্বত্বাধিকারীদিগকে জরিমানা করিয়া বাড়ীগুলি মানুষের বাসের উপযুক্ত করিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন, আর কোন কোন স্থানে ঐ সব বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাস্তা বড় করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় এই সকল কোম্পানী বাড়ী-ওয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ঐ সব বাড়ীতে কোম্পানীর গুদাম করিতে লাগিল এবং বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য মিউনিসিপালিটী যে ক্ষতিপূরণ দিত তাহাতে ভাগ বসাইতে লাগিল। ইহাতে কোম্পানী ও বাড়ী-ওয়ালা উভয়েরই লাভ। বাড়ী-ওয়ালার ভাড়া বজায় থাকিত; অথচ কোম্পানীর গুদাম ভাঙ্গার দরুণ মিউনিসিপালিটীকে ক্ষতিপূরণ বেশী দিতে হইত; কোম্পানী এই ক্ষতিপূরণের যে অংশ পাইত,তাহা হইতে বাড়ীর ভাড়া দিয়াও লাভ করিতে পারিত।

কর্ম্মচ্যুত গোমস্তা অতঃপর এইরূপ এক প্রস্তাব নিয়া তাহার পুরাতন মনীবের নিকট উপস্থিত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানী কতকগুলি বাড়ী ভাড়া নিবে, আর বাকী গুলি স্বত্বাধিকারী এমনভাবে মেরামত করিবেন,যেন মিউনিসিপালিটী আর কিছু বলিতে না পারে। ইহাতে বাড়ীগুলির মূল্য বাড়িবে এবং ক্ষতিপূরণও বেশী পাওয়া যাইবে। কিন্তু আপাততঃ হাত হইতে টাকা দিতে হইবে। শ্বশুর একেলা সেই টাকাটা দিতে সাহসী না হইয়া যাঁর জামাতা হইবার কথা ছিল তাঁকে আবার স্মরণ করিলেন। জামাতার হৃদয়ে পূর্ব্বের সুপ্ত অনুরাগ আবার জাগিয়া উঠিল। শ্বশুরের কন্যা আপাততঃ এরূপ একটা ভাগাভাগিতে নিজেকে দানসামগ্রী মনে করিতে না চাহিলেও যখন দেখা গেল যে, এ বন্দোবস্তে উভয় পক্ষেরই অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে, এবং তিনি বিবাহে সম্মতি দিলে উভয় পক্ষই এক হইয়া যায়, তখন আবার প্রেমে পড়িতে কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না।

এই নাটকে প্রসঙ্গক্রমে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, যদিও মিউনিসিপালিটী মধ্যে মধ্যে ঐ সব বাড়ীগুলিকে মানুষের বাসের উপযুক্ত করিতে চায়, তথাপি যাহাদের উপর এ কাজের ভার পড়ে, তাহাদেরই অনেকে ঐ সমস্ত বাড়ীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া ফলে বিশেষ কোন উন্নতি হয় না।

কোথায় সেক্সপীয়রের রোমিও-জুলিয়েট, ওথেলো, বা গ্রীষ্ম রাত্রের স্বপ্ন; আর কোথায় এই নাটক। ইহারই নাম নবীন বস্তু-তন্ত্র, ইহারই নাম 'নূতন নাটক'। বাস্তব,অতিবাস্তব ঘটনায় ইহার ভিত্তি।

এই নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে যবনিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বার্ণার্ড শ' এক বক্তৃতা করিলেন। অভিনয় দর্শন করিয়া সাম্যবাদীরা (Socialist) উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করিতে লাগিল; সাধারণ দর্শকেরা উন্মত্তের মত গালি দিতে লাগিল; পুস্তকাদি সংবাদপত্রে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল।

বার্ণার্ড শ' যে খুব একটা জয়লাভ করিয়াছিলেন, তা নয়; কিন্তু চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, এবং সেটা তার এত ভাল লাগিল যে, আবার ও রকম চেষ্টা করিতে ইচ্ছা হইল। ('and the sensation was so agreeable that I resolved to try again'). তার ফলে ১৮৯৩ সনে "The

Philanderer—"ভুজঙ্গ বা কামুক"—নামক নাটক লিখিত হয়। এই নাটকের নায়ক মিঃ চার্টারিস্ (Mr. Charteris) সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মত 'অষ্টাদশভাষা বারবিলা সনী-ভুজঙ্গ' নহেন, কিন্তু বিলাসিনী-ভুজঙ্গ। 'স খলু সুভগঃ যন্নলনাঃ কাময়ন্তে'—এই লক্ষণ অনুসারে তিনি 'সুভগ'। 'ত্বম্ জীবিতম্ ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বম্ কৌমুদী নয়নয়োর মৃতং ত্বমঙ্গে, ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং, তামেব' প্রথম নায়িকাকে পরিত্যাগ করিয়া এক বিধবার প্রতি তিনি অনুরক্ত হন। ইহাতে যা হইবার তাই হইল। অভিমান, ঈর্ষা, ক্রোধ—ইহাদের পৃথক্ ও যুগপৎ অভিব্যক্তি হইতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই যখন কোন ফল হইল না, তখন প্রথম নায়িকা দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন যে চার্টারিস্ না হইলেও তাঁর চলে। নিতান্ত বিবেকীর মত তিনি এক বৃদ্ধ ডাক্তারের পত্নী হইতে সম্মত হইলেন।

বার্ণার্ড শ নিজেই বলেন, তিনি এই নাটকে দেখাইয়াছেন, "বিবাহের আইন অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কি একটা অদ্ভুত যৌন বন্ধন সৃষ্ট হয়, যাহা কাহারও কাহারও নিকট রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, কাহারও মতে ভগবানের নির্দেশ, কাহারও নিকট একটা কাল্পনিক আদর্শ, কাহারও মতে স্ত্রীলোকদের একটা গার্হস্থ্য ব্যবসায়, আবার কাহারও মতে একটা ভ্রান্ত অযথা নিয়ম—যাহা সমাজের বর্তমান অবস্থায় উপযোগী নহে, অথচ যাহা সমাজ পরিবর্তিত ও উন্নত করে নাই,এবং এই জন্যই যাহা হইতে উন্নতচেতা ব্যক্তিরা বাধ্য হইয়া সরিয়া পড়েন।" এই নাটকের প্রথম দৃশ্যটি একটু অনুধাবনের যোগ্য। যবনিকা উঠিলেই আমরা দেখিতে পাই, একজন ভদ্রলোক ও মহিলা পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে 'দেশচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমক্ষ্রীড়াকরগ্রহং, শয়নাধরপানাদি—' রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন নিষিদ্ধ। এই নিয়মের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কিন্তু প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক। বার্ণার্ড শ'র মুখেই শুনিতে পাই, যে, যদিও পাছে অশ্লীল কিছু অভিনীত হয়, সে জন্য অনুমতি না লইয়া কোন নাটক অভিনীত হইতে পারে না, তথাপি স্ত্রী-পুরুষের ব্যভিচারের কথা লোকে এতই উৎসাহের সহিত শুনে যে, এ না হইলে কোন নাটককে নাটকই বলা হয় না। তাঁহার মতে, যে দৃশ্যে এই নাটকের আরম্ভ, যে ভাবে ইহার পরিণতি, এবং যে বিবাহে ইহার পরিসমাপ্তি, আধুনিক সমাজে জ্ঞান ও কলাশিল্পের মর্য্যাদা বুঝেন যাঁরা (intellectually and artistically conscious classes) তাঁদের জীবনও ঠিক এইরূপ।

ইউরোপীয় সমাজ-দেহের গলিত কুষ্ঠে বার্ণার্ড শ' এইরূপ নির্মম ভাবে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এইখানে তার সূচনামাত্র পাইতেছি। 'ওয়ারেন্-পত্নীর ব্যবসা'—('Mrs. Warren's Profession') নামক নাটকে তাহা আরও অগ্রসর হইয়াছে। ইংলণ্ডের দোকানে, হোটেলে, কারখানায় স্ত্রীলোক নিযুক্ত থাকে; কিন্তু অনেক সময় ইহাদের বেতন এত কম থাকে যে, অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন না করিলে চলে না। এই নাটকে বার্ণার্ড শ' দেখাইতে চান যে, "কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করার একমাত্র পন্থা, তাহার এমন কোন পুরুষের প্রিয় হওয়া যে তাহার প্রিয় করিতে সমর্থ"।—('to be good to some man that can afford to be good her')—'প্রিয় হওয়া' এই উক্তির মধ্যে যে একটা ধ্বনি আছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ওয়ারেন্-পত্নী ওয়ারেন্ নামক কোন ব্যক্তির সহিত কিংবা অন্য কাহারও সহিত কখনও কোন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই। কিন্তু তাঁহার একটী কন্যা আছে। এখন ইনি খুবই ধনী। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এক হোটেলে পরিচারিকা ছিলেন। তখন তাঁহার রূপ ও যৌবন হইতে অন্যের অর্থাৎ হোটেলের অধিকারীর অর্থলাভ হইত। তাঁহার এক ভগ্নীর পরামর্শে পরে তিনি নিজের রূপযৌবন দ্বারা অন্যের অর্থবৃদ্ধি না করিয়া নিজেরই আয় করিতে লাগিলেন। এখন তিনি স্যর জর্জ ক্রফ্ট্‌স্ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত একযোগে ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য বার্লিন, ভিয়েনা, বুডাপেস্ত, ব্রসেল্‌স্ প্রভৃতি সহরে কতকগুলি বাড়ী রাখিয়াছেন। বাড়ী অর্থে শুধু ইট সুরকির সমষ্টিমাত্র নয়। এই সকল বাড়ী হইতে তাঁহার প্রচুর আয় হয়।

ইহার নাম গণিকা-বৃত্তি হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে সমাজে সম্মানের হানি হয় না; এবং ইহাতে,—ওয়ারেন্-পত্নীর নিজের কথায়,—'ইউরোপের সমস্ত বাছা বাছা ভদ্রলোকদিগকে পায়ের কাছে পাওয়া যায়।' ওয়ারেন্ পত্নী বলিতে চান, শিক্ষিত ভদ্র-ঘরের মেয়েরা কি করে? তারাও ত একজন পুরুষের হৃদয় দখল করিয়াই সুখে সম্মানে থাকে। কেবল বিবাহ নামক একটা ঘটার ভিতর দিয়া গেলেই কাজটার মূল্যের এমন কি তারতম্য হইতে পারে?

বার্ণার্ড শ' যে সমাজের এ অবস্থা চান, তা নয়। কিন্তু তিনি বলেন, গণিকা-বৃত্তি ত সমাজে কত রকমেরই আছে; সে-গুলির তুলনায় এ কিছুই নহে। অথচ এটাকেই লোকে এত নিন্দা করিবে কেন? নাট্যকার, সংবাদ-পত্রের লেখক, উকীল, ডাক্তার, পাদ্রী, সাধারণ বাহবা-ভিখারী রাজনৈতিক বক্তা—ইহারা সকলেই ত পণ্য,—পুরুষ-বেশ্যার দল। পয়সার জন্য ইহারাও ত আত্ম-বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। ইহাদের তুলনায় যে স্ত্রীলোক কয়েক ঘণ্টার জন্য নিজের দেহটা বিক্রয় করে, তাহার পাপ ত কিছুই নহে। বার্ণার্ড শ' ভুলেন নাই যে তিনি নিজেও ইহাদের একজন। তাঁহার মতে, সামাজিক নিয়মের ভিতর থাকিয়াই হউক, কিংবা তাহা ভঙ্গ করিয়াই হউক, কোনও স্ত্রীলোক যে নিজের জীবন-যৌবন অন্যের অধীন করিয়া না দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার কোন পথ পায় না, ইহাই সমাজে বেশ্যা-সৃষ্টির অন্যতম কারণ। "সমাজ যদি ব্যক্তির উচ্চ সচ্চরিত্রতায় নিজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তবে প্রত্যেক ব্যক্তি—প্রত্যেক স্ত্রী কিংবা পুরুষ, যাহাতে নিজের বিশ্বাস, রুচি, ও প্রেম বিক্রয় না করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের পরিশ্রম দ্বারা যথাযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

এই কয়েকটা দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে, বার্ণার্ড শ'র, এবং তিনি যাহাদের অন্যতম, সেই সমস্ত নাট্যকারদের নাট্যসাহিত্যের ধারা কিরূপ। সমাজের অন্তঃসার-শূন্য আচারের মূল্যহীনতা নির্দ্দয় ভাবে দেখাইয়া দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। বসন্তের প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের আশায় জীবিত জন্তুর উপর নির্দ্দয় অস্ত্র-প্রয়োগ, ডাক্তারদের ভণ্ডামি, অস্ত্রচিকিৎসার নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তিনি (The Doctor's Dilemma) "চিকিৎসকের উভয় সঙ্কট" নামক নাটকে ও তাহার মুখবন্ধে অনেক কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বার্ণার্ড শ'র একটা বিশেষত্ব এই যে তাঁর বইয়ের চেয়ে তার মুখবন্ধ অনেক সময় বড় হইয়া যায়। কারণ, মূল নাটকে যাহা কথোপকথন-চ্ছলে বলা হয়, ভূমিকায় কঠোর গদ্যে বক্তৃতা-চ্ছলে তাহারই ব্যাখ্যা ও পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক দেওয়া হয়। "The Shewing up of Blanco Posnet'—বা "ব্ল্যাঙ্কো পস্‌নেটের গুমর ফাঁক" নামক নাটক ছাপায় ৩৩ পৃষ্ঠা মাত্র স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু তাহার ভূমিকা ৭৬ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। এই সব ভূমিকায় অনেক অবান্তর কথা থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার একটা সুবিধা এই যে, বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে যাঁহার যা জানিবার ইচ্ছা তাহা তিনি তাঁর নিজের কথায়ই এগুলিতে পাইবেন।

তদীয় সমাজের যে সব প্রথার বিরুদ্ধে বার্ণার্ড শ' লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহার কতক পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু যে প্রশ্ন ইউরোপীয় নবীন সাহিত্যের বিশেষ সমস্যা, যে প্রশ্ন বার্ণার্ড শ' একাধিক নাটকে নানাভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা স্ত্রীপুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে। ইবসেন্ তাঁহার 'পুতুলের ঘর' নামক নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সাধারণতঃ যাহাকে গৃহ বলা হয় তাহা বাস্তবিক এমন নহে যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের পরিণতির কোন সুবিধা থাকে; ইহা একটা পুতুলের ঘর মাত্র এবং স্ত্রী স্বামীর একটী স্নেহ-পুত্তলিকা মাত্র। যাহাকে সাধারণতঃ স্বামীর ভালবাসা বলা হয়, তাহা ফলে স্ত্রীকে এতই খর্ব্ব করিয়া দেয় যে, ব্যক্তি হিসাবে, সমাজের একটা পৃথক্ অংশ হিসাবে, তাহার আত্মার পূর্ণ বিকাশ কখনও হইতে পারে না। এমন কি, তিনি যে একটা স্বতন্ত্র আত্মা তাঁহারও যে ধর্ম্মে ও নীতিতে একটা কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, বিবাহিত স্ত্রীর এ কথা শিখিবার সুযোগও ঘটে না। ইবসেনের নাটকটীর স্থান বর্ত্তমান গৃহ এবং কাল বর্ত্তমান

সময়। কিন্তু তথাপি তিনি উহাকে কল্পনার সৌন্দর্য্যে, কবিত্বের পরিচ্ছদে এমনই ভাবে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ঘটনাবলী এমনই ভাবে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং বিষয়টী এমনই কমনীয় ভাবে উত্থাপিত করিয়াছেন যে, তাহাতে তৎক্ষণাৎ কাহারও মনে হয় না যে, এ প্রত্যেক গৃহেরই কথা; এবং সেই জন্ত সমাজের প্রতি সম্মানেচ্ছা আহত হইয়া আপাততঃ ইহার প্রতিবাদ করিতে চায় না। ইব্‌সেনের এই প্রিয়ংবদতা প্রশংসনীয়।

কিন্তু সত্য অসত্য উভয়কেই অপ্রিয় করিয়াও বলা যায়। আবরণহীন সত্যকে তাহার সমস্ত বিভীষিকা, তাহার সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত অত্যাচারে রঞ্জিত করিয়া করাল-মূর্ত্তিতে উপস্থিত করিলে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মানব-হৃদয় সহজেই তাহার এ মূর্ত্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়। এবং অসত্যকে যখন এরূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে উপস্থিত করা হয়, তখন তাহা আরও অপ্রিয় হইয়া উঠে। বিবাহিত নারীর চেয়ে পুরুষের অধিকার বেশী, ইহা সমাজের একটী অবিচার, ইউরোপের নবীন সাহিত্যে আজ নানা ভাবে এ কথা উঠিয়াছে। শুধু ইউরোপের নয়, আমাদের সাহিত্যেও তাহার স্ফুট প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" নামক নূতন উপন্যাসে পাই,—"তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডারা পূজার জন্ম কাড়াকাড়ি করে, কেন না তারা পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের এক শেষ"।—অন্যত্র, "সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোট করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলচে,—দান পড়ার উপরই ওদের সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?" সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কথাটা আজ পৃথিবীর সাহিত্যে উঠিয়াছে। কিন্তু অনেকেই ইহাকে যথা-সম্ভব মার্জ্জিত ও প্রিয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করেন। বার্ণার্ড শ' বোধ হয় এ শিষ্টাচারকে তথাপি মনে করেন, কিংবা হয় ত মনে করেন যে ঘোলায়েম করিয়া বলিলে এ দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না। তাই 'Getting Married" বা 'বিবাহ করা' নামক নাটকে, বিশেষতঃ তার ভূমিকায় এই কথাটী এমনই নির্দ্দয় ভাবে তুলিয়াছেন যে, অনেকেরই প্রাণে লাগিতে পারে। অবশ্যই এই নাটকে হাস্যরসই প্রধান, কিন্তু যে হাসি ইহাতে রহিয়াছে, মনে হয় তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হাসি। আর ভূমিকাটিতে তিনি মোটেই হাসাইতে চেষ্টা করেন নাই, তিনি অতি গম্ভীর ভাবেই তাঁহার মত বিবৃত করিয়াছেন; যদি কেহ হাসে, তবে সে তাঁহার মতের অদ্ভুতত্ব দেখিয়া।—

ভূমিকার প্রথমই তিনি বলিতেছেন, "অনেক যুবতী আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা যে পুরুষের সঙ্গে একত্র বাস করিতে যান, তাঁকে বিবাহ করা আমার মতে সঙ্গত কি না; এবং আমি যখন বলি যে, প্রকৃত বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনরূপে জড়িত হওয়া উচিত নয়, তখন তাঁরা বিস্মিত হন; কারণ,—ভগবান্ জানেন কেন, লোকে মনে করে, এই বিষয়ে আমার মত সব চেয়ে অগ্রসর। আর তাঁরা জর্জ্জ ইলিয়টের দৃষ্টান্ত দেখান; জর্জ্জ ইলিয়ট্ বিবাহ না করিয়াও লিউয়েসের সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছিলেন।" "পরে ইঁহারা যখন ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিবাহের সংস্কার করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন, এবং রেজিষ্টরী করিয়াই হউক কিংবা গির্জ্জায় গিয়াই হউক, বিবাহ করিতে সম্মত হন, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে এরূপ একটা স্পষ্ট জানাজানি থাকে যে উভয়ই ইচ্ছামত প্রতি ফুল্লকুসুমের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা আবার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।"* বার্ণার্ড শ'র সমাজের অবস্থা সত্য সত্যই এরূপ কি না জানি না; কিন্তু তিনি ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন মূল নাটকে লেস্‌বিয়ার মুখেও তাহার অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। লেস্‌বিয়া কহিতেছেন,—"আমার সন্তান থাকা উচিত। আমি সন্তানের খুব ভাল মা হইতে

* 'Both parties are to be perfectly free to sip every flower and to change every hour, as their fancy may dictate'.

পারিতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সন্তান হইলে দেশের উপকারই হইত, এবং যাহাতে আমি সন্তানের মা হই, সে জন্য দেশ আমাকে কিছু দিলেও পারিত। কিন্তু সমাজ বলে, আমি আমার গৃহে একজন বয়স্থ পুরুষের স্থান না দিয়া সন্তান পাইতে পারি না; সুতরাং আমিও সমাজকে বলি যে, আমার সন্তানের আশা যেন সে পরিত্যাগ করে। মা হইতে চাই বলিয়াই যে এক জন আসিয়া আমাকে আবার পত্নী বলিয়াও দাবী করিবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না"। ইনিই আবার অন্যত্র কহিতেছেন, "আমি সন্তান চাই; এবং, তাহার জনকের নয়, সন্তানের সেবায় নিজেকে সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত দেখিতে চাই। কিন্তু আইন আমাকে তাহা করিতে দেয় না; সুতরাং আমি স্থির করিয়াছি, স্বামী এবং সন্তান উভয় ছাড়াই আমার চলিবে।"

বার্ণার্ড শ' বলেন, 'স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও উক্ত প্রকার বিবাহ নামক যে একটা সন্ধি-স্থাপন হয় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, পরস্পরের সম্মতি নিয়া উভয়েই এ বন্ধনের দায় এড়াইতে পারে, লোকের তাহা বিশ্বাস।'

কিন্তু বিবাহ না করিয়া স্ত্রী বা পুরুষের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার অসুবিধা এত বেশী যে, লোকে বরং বিবাহ-বন্ধনের ছায়ায় থাকিয়া তাহারই বিরুদ্ধ আচরণ করে; তথাপি বিবাহ না করিয়া কোন স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ সহজে ঘটাইতে চায় না। টল্‌ষ্টয়ের য়্যানা কারেনিন্ তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রনস্কীর (Vronsky) প্রেমে মুগ্ধ হইয়া য়্যানা স্বামী ও সন্তানকে ত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছিলেন; ভ্রনস্কীও প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার স্বামীর সহিত বিবাহ আইন অনুসারে ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি ভ্রন্‌স্কীকে বিবাহ করিতে পারেন নাই, এবং উপপতি-উপপত্নী রূপে থাকার অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা তাঁহাকে এতই অধীর করিয়াছিল যে, অন্তিমে আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার এই কষ্টের সমাপ্তি করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই, বার্ণার্ড শ' বলেন, 'যেখানে সম্পত্তি ও সন্তানাদি নিয়া স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসবাস করিতে ইচ্ছা হয়, সেখানে বিবাহ অনিবার্য্য।'

কিন্তু বিবাহ কি? আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ, গির্জ্জায় ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ, রোমান্ ক্যাথলিকদের অচ্ছেদ্য বিবাহ, কুলীনদের অসংখ্য বিবাহ, মুসলমানদের বহু বিবাহ,—বার্ণার্ড শ' জিজ্ঞাসা করেন, এক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই ত কত রকম বিবাহ আছে, বিবাহ অর্থে আমরা কোন্‌টাকে বুঝিব? যে যেটার অনুসরণ করে, সে ত সেটাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল মনে করে। তবে সব বিবাহ-মতেই মোটামোটী একটা কথা বোধ হয় স্বীকৃত যে, শুধু স্বামী নয়, পতি পত্নী উভয়েই একে অন্যের দেহটাকে সম্পূর্ণ নিজের সামগ্রী মনে করে, যাহা অন্য কাহারও ব্যবহারে আসিতে পারে না। স্ত্রী বা পুরুষের বহু বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় একজন মহিলা নাকি বার্ণার্ড শ'কে বলিয়াছিলেন যে তিনি অন্য স্ত্রীলোককে তাঁর স্বামী ধার দেওয়ার চেয়ে বরং তাঁর দাঁতের বুরুসটা আর এক জনকে ধার দিবেন। যেন স্ত্রী এবং স্বামী উভয়েই উভয়ের দাঁতের বুরুসের মত খাস ব্যবহারের একটা সামগ্রীমাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপের ব্যক্তি-প্রাধান্যবাদীরা (Individualists) মনে করিতেন, বিবাহ নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমাজের ইহাতে কোন হাত থাকা উচিত নয়; এবং পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছামত যখন খুসী ইহা ভাঙ্গিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু বিবাহ হইতে পরিবারের প্রতিষ্ঠা হয়—সন্তানের উৎপত্তি হয়, সুতরাং সমাজের স্বার্থ ইহাতে জড়িত। সেই জন্য বিবাহে রাষ্ট্র ও সমাজের হাত চিরকালই থাকিবে। তথাপি, বার্ণার্ড শ' মনে করেন, পৃথিবী অচ্ছেদ্য বিবাহের যুগ ছাড়াইয়া আসিয়াছে; বর্ত্তমানে সমস্যা এই, কি কি অবস্থায় ইহার ভঙ্গ হইতে দিলে ইহার সম্যক্ সংস্কার হয়। তিনি কুলীনদের বহু বিবাহের খবর রাখেন, কিন্তু এখানে ভুলিয়া যাইতেছেন যে পৃথিবীতে এখনও, কুলীনেরা যে সমাজের লোক অন্ততঃ সে সমাজে, বিবাহ অচ্ছেদ্য—পুরুষের পক্ষে সর্ব্বদা না হইলেও স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বদাই অচ্ছেদ্য। অবশ্যই তাঁহার এ ত্রুটী অমার্জ্জনীয় নহে। কারণ, তিনি তাঁহার

সমাজের কথাই প্রধানতঃ ভাবিতেছেন। সেখানে বিবাহকে যে লোকে শুধু ভঙ্গুর মনে করে, তা নয় ; সেখানে, শ' বলেন, "তাঁহার স্মরণ-কালের মধ্যেই বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এত দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, যদিও এখনও অনেকের ধারণা যে অধিকাংশ লোকই বিবাহকে সুন্দর ও পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তথাপি, যাহারা কখনও কোনও বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে না এরূপ সাধারণ লোকদের ভিতর ছাড়া, এ প্রকার বিশ্বাসী বাস্তবিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

বিবাহের উপর এই আক্রমণের কারণ কি ? বার্ণার্ড শ বলেন, কারণ সকলেই জানে, কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে চায় না। কারণ আর কিছুই নহে,—বিবাহ হইতেই জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস পাইতেছে, এবং বিবাহিত জীবনে যেমন অসংযম দেখা যায়, সমাজ যাহাদিগকে অসংযত-চরিত্র মনে করে তাহাদের জীবনেও তত নাই।* 'আমি যদি এরূপ জীবন যাপন করিতাম তাহা হইলে এক পক্ষের মধ্যেই আমার লেখায় বিস্ময়কর অবনতি দেখা দিত'। 'বিবাহ হইতে যদি আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানবের উৎপত্তি না হয় তাহা হইলে হয় বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে, অথবা জাতির লোপ অনিবার্য্য'। বিবাহিত জীবনের এবং গৃহের যে একটা কবি-কল্পনা পাওয়া যায় তাহা মিথ্যা। 'ইংরেজের গৃহ আজ আর সম্মান ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যের স্থান নহে, ইহা আর সুন্দর ও পবিত্র নহে'। Home life as we understand it is no more natural to us than a cage is natural to a cockatoo.'—'কাকাতুয়ার পক্ষে পিঞ্জর যেমন স্বাভাবিক আমাদের পক্ষে আমাদের গার্হস্থ্য জীবন, যে অর্থে আমরা ইহাকে গ্রহণ করি সে অর্থে, তার চেয়ে বেশী স্বাভাবিক নহে। এই কয়েদ, এই অস্বাভাবিকতার ফলে, শ' মনে করেন, ইংলণ্ডের নরনারীর মনে গৃহ এবং তাহার নিয়মের বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে ; এবং সাহিত্যেও তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। টম্ জোন্স্ প্রভৃতিকে বীর মনে করা এখন দস্তুর হইয়া গিয়াছে ; নগ্ন-ছত্রী নারীকে বিবাহ করিবার জন্য লোক পাগল হইয়া যায়।

সমাজের এবং গৃহের এই যে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা রোধ করিবার জন্য, বার্ণার্ড শ'র মতে (Wanted an Immoral Statesman) প্রচলিত রীতির বিরোধী রাষ্ট্র-নায়কের আবশ্যক। বার্ণার্ড শ'র মতে, গৃহীত রীতির বিরুদ্ধ যাহা তাহাই অনীতি। সুতরাং দেশের উদ্ধারের জন্য এমন নায়কের প্রয়োজন যে তথা-কথিত অনীতিকে ভয় করে না। দেশের নেতারা যে সাধারণতঃ বিবাহের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, তার কারণ, তাঁরা সাধারণের প্রতিবাদকে ভয় করেন। কিন্তু শ' বলেন, এক দিন না একদিন ইহা করিতেই হইবে।

বিবাহ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ব্যক্তি-বিশেষের ভোগের কথা না ভাবিয়া সর্ব্বাগ্রে ভাবিতে হইবে, সন্ততির কথা, দেশের লোক-সংখ্যার কথা, উত্তর-বংশীয়দের কথা। এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে দেশে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পন্ন লোক জন্মে,—অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু, রোগ, অঙ্গহীনতা প্রভৃতি যাহাতে দূর হয়, বিবাহ সংস্কারে সর্ব্বাগ্রে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে, লেস্‌বিয়ার মুখ দিয়া বার্ণার্ড শ যাহা বলাইয়াছেন, তাহাও মনে রাখিতে হইবে ; কারণ তিনি নাকি আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, মাতৃত্বের অভিলাষিণী হইলেই যে স্ত্রীলোককে একজন পুরুষের দাসী হইতে হয়, সমস্ত স্ত্রীলোকই প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে গোপনে ইহার বিরোধী।

স্ত্রী বা পুরুষের বহু-বিবাহের কথাও প্রসঙ্গক্রমে এখানে উঠিবে। বহু-বিবাহের পক্ষে যে কোন যুক্তি আছে, বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে এ কথা নূতন। বার্ণার্ড শ' বলেন, এক নারীর বহু পতি কিংবা এক পুরুষের বহু পত্নী গ্রহণ করার মধ্যে নীতির কোন তর্ক নাই ; ইহা কোনও

* 'Marriage is now depopulating the country with such alarming rapidity that we are forced to throw aside our modesty &c.

এক সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। "কোনও এক যুদ্ধের ফলে যদি এ দেশের তিন-চতুর্থাংশ পুরুষ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে মুসলমানদের মত চারি পত্নী গ্রহণ মঞ্জুর করা লোক-সংখ্যা-পূরণের জন্য অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে"। তিনি আরও মনে করেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে যে যুদ্ধে যাইয়া হত হইতে দেওয়া হয় না, তার আসল কারণ,—স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিয়া গেলে লোক-সংখ্যা-পূরণ আরও কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীলোকের পতি হইয়া এক সঙ্গে বহু পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক বহু পতি গ্রহণ করিলে তাহার সন্তান আরও কম হয়। সমাজে সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সমান বলিয়াই এক-পতি এক-পত্নী বিবাহ সম্ভব হইয়াছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনেক জায়গায় বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা বহু বিবাহের বিরোধী নয়; আমেরিকাতেও মরমন্-পন্থীদের বহু বিবাহে স্ত্রীলোকেরা নাকি অসন্তুষ্ট নয়। তার কারণ, একজন সাধারণ লোকের একমাত্র পত্নী হওয়ার চেয়ে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের দশম পত্নী হওয়াও নাকি স্ত্রীলোকেরা শ্রেয়ঃ মনে করে। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকের বহু-বিবাহের বিরোধী; কারণ তাহাতে শ্রেষ্ঠ রমণীরা অধিক পতি পাইবে, এবং ফলে, অনেক রমণীর ভাগ্যে পতি না জুটিবার সম্ভাবনা আছে। তেমনই, ঠিক সেই কারণেই পুরুষেরাই পুরুষের বহু-বিবাহের বিরোধী; এবং উভয়ত্রই শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা বা শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোকেরা বড় আপত্তি করে না; আপত্তি হয় অতি সাধারণ ব্যক্তিদের, যাদের অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা এরূপ যে প্রত্যেক পুরুষ দুইটী বিবাহ করিতে পারে না; অথচ প্রত্যেকে একটী করিয়া (অবশ্যই বিধবাদের বিবাহও ধরিয়া নেওয়া হইতেছে) বিবাহ করিলে, কতক স্ত্রীলোকের পতি জুটে না, অথচ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-মাতৃত্বের বীজ হয়ত অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সন্তানের লালন-পালনে যে শক্তি নিয়োজিত হইতে পারিত, হাসপাতালে কি গ্রাম্য পাঠশালায়, কিংবা পশু-পক্ষীর পালনে তাহার অপব্যয় হইয়া যাইতেছে। পতিগ্রহণ না করিয়া সন্তানের মা হইতে পারিবে না, এদের সম্বন্ধে সমাজের এ কঠোর নিয়ম কেন? অথচ, যারা মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়, বিবাহ করিতে পায় বলিয়াই তাদের উপর মাতৃত্বের বোঝা আপনা হইতেই চাপিয়া বসে। সস্তা জিনিসের উপযোগিতা কম। যারা সহজেই মা হইতে চায়, তারা কখনও ভাল সন্তানের মা হইতে পারে না। আর, যে কোন সর্ত্তে এক জন পুরুষের অধীন হইয়া যে সন্তানের মা হইতে চায় না, সে-ই শ্রেষ্ঠ মা; তাহার সন্তানেরই সব রকমে সুস্থ ও সবল হওয়ার সম্ভাবনা। এই জন্য বার্ণার্ড শ' লেস্‌বিয়ার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

লেস্‌বিয়া যে মাতৃত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাহারও পত্নী হইতে নারাজ,—তাহার কারণ, পতির রুচির সহিত তাহার রুচি না মিলিতে পারে; অথচ সব বিষয়েই পতির রুচি অনুসারেই যে তাঁহার রুচি গড়িয়া নিতে হইবে এরূপ কোন যুক্তি নাই। আমাদের রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশের মুখ দিয়াও ঠিক এই ভাবেরই অবতারণা করিয়াছেন। লেস্‌বিয়াকে যিনি বিবাহ করিতে চান, তিনি অত্যন্ত তামাক-প্রিয়; অথচ লেস্‌বিয়া তামাকুর গন্ধ একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না। বিবাহ করিলে এইরূপে কত শত বিষয়ে তাঁহাকে অন্যের রুচির অধীন হইতে হইবে, বিবাহ না করার পক্ষে, ইহাই তাঁহার যুক্তি। বিবাহ-সংস্কারের পক্ষে ইহা বার্ণার্ড শ'রও যুক্তি।

বিবাহ যে একটা স্বর্গীয় সম্বন্ধ নয়, তাহাতেও যে কলহ, অভিমান, অত্যাচার, ব্যভিচার থাকিতে পারে, ইহা সত্য; এবং বিবাহ ছাড়াও যে প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে, ইহাও সত্য; এবং ইউরোপীয় সমাজে যুবক-যুবতীর মধ্যে বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই যে অনেক সময় যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়, এবং পরে সামাজিক নিন্দার ভয়ে কিংবা আইনের পীড়নে বিবাহ হয়, ইহাও ঠিক। বার্ণার্ড শ' বলিতে চান, এই প্রকার আইনের পীড়নে বিবাহের সংখ্যা কম নহে, এবং ইহা হইতে নানা অনর্থের উৎপত্তি হয়। বিবাহ

ছাড়া স্ত্রীপুরুষের মিলনকে যদি সমাজ পাপ মনে না করিত, তাহা হইলে, এরূপ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার যে কুফল তাহা ভোগ করিতে হইত না। এরূপ জবরদস্তি বিবাহে প্রকৃত প্রণয় ও স্থায়ী সুখ হয় না, এবং বিবাহিত ব্যক্তিদের ও উত্তর-বংশীয়দের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে।

বার্ণার্ড শ' বলেন পুরুষ যে বিবাহ-প্রথার সমর্থন করে, তাহার কারণ উহা তাহার ভোগের পন্থা; নারী বিবাহ-প্রথা সমর্থন করে, কারণ উহা ছাড়া ভদ্রভাবে নিন্দিত না হইয়া জীবিকা উপার্জনের তাহার অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহারই জন্য বিবাহনামক বন্ধনে নারী পুরুষের অধীন হয়; এবং এই হিসাবে বিবাহিতা নারী ও বেশ্যার মধ্যে এইমাত্র পার্থক্য যে, একজনের পন্থা সমাজে নিন্দিত নহে, আর এক জনেরটী নিন্দিত।

ইব্‌সেন্ শুধু পত্নীর অধিকারের অল্পতা এবং বিবাহের ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধার কথাই প্রথম সমস্যা মনে করিয়াছেন। কিন্তু বার্ণার্ড শ' বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহের কুপ্রথা যে শুধু পত্নীর নয়—পতিপত্নী উভয়েরই, এবং ফলে পুত্র ও সমাজের, প্রভূত অনিষ্ট করে, এ কথাই নানা ভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজে ব্যভিচার, বেশ্যা-বৃত্তি, এবং ইহার ফলে বিবিধ প্রকার রোগ—'নেত্রহীনতা, অনুর্ব্বরতা, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, অঙ্গ-হীনতা, উন্মাদ ও অকাল মৃত্যু' প্রভৃতি যত সব অনীপ্সিত জঞ্জাল সঞ্চিত হইতেছে,—তাহার এক মাত্র কারণ, এক দিকে বিবাহ-বন্ধনের দুশ্ছেদ্যতা অপর দিকে অর্থের জন্য স্ত্রীলোকদের পুরুষাধীনতা। দুশ্ছেদ্য বিবাহে রোগাক্রান্ত পতি বা পত্নী একে অন্যের ব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে; রোগ আবিষ্কৃত হইলেও যে সমাজ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেয় না, তাহাতে উত্তর-বংশীয়দের প্রভূত অনিষ্ট হয়। কারণ, এই বিবাহ হইতে জাত সন্তানও রুগ্ন হইবে; এবং বিবাহের ভঙ্গ না হইলে এইরূপ সন্তানের সংখ্যাও বেশী হইবে। ইউরোপে আজ যে সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের (Science of Eugenics) উৎপত্তি হইয়াছে, বার্ণার্ড শ'র এই যুক্তিতে তাহারই আভাস পাই।

বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের সমাজে বহু পুরুষ ও বহু স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পায় না, এবং অনেকে আবার দুশ্ছেদ্য বিবাহের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দায়িত্বের ভয়ে করিতে চায়ও না; অথচ অবিবাহিত স্ত্রীলোকের অন্য প্রকার স্বাধীন জীবিকার পথ একরূপ রুদ্ধ। সুতরাং দুর্দ্দম প্রবৃত্তি কিংবা জিজীবিষা ব্যভিচার ও বেশ্যা-বৃত্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। "যখন প্রত্যেক যুবকই বিবাহ করিতে সমর্থ হইবে, এবং বিবাহ-সংস্কারের ফলে মনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইলে, কিংবা কোনও কারণে স্বামী বা স্ত্রীর অবস্থা অপরের অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইলে, যখন সহজেই সে বিবাহ ভঙ্গ করা যাইবে, তখন বেশ্যাবৃত্তি ও অবিবাহিতত্ব আপন হইতেই মরিয়া যাইবে।"

কয়লার খনিতে, কিংবা জাহাজ তৈয়ারীর স্থানে, কিংবা অন্যত্র, যে কাজ করিতে চায় এবং করিতে সমর্থ, তাহার কাজ খুঁজিয়া দেওয়া সমাজের একটী কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত। পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব গ্রহণও তেমনই সমাজের উপকারার্থ একটী কাজ; এবং যে তাহা করিতে প্রস্তুত, সমাজের উচিত তাহার কাজ বাহির করিয়া দেওয়া। সুতরাং বার্ণার্ড শ' সমাজকে উপদেশ দেন;—সকলকেই বিবাহ করিবার সুবিধা করিয়া দেও; কিন্তু অর্থের জন্য স্ত্রী বা পুরুষ কেহই যেন অন্যের অধীন না হয়—সুতরাং অর্থের জন্য যেন বিবাহ না করিতে হয়; এবং যাহাতে সহজেই বিবাহ ভাঙ্গা যায় তাহা কর; কেহ বিবাহ ভাঙ্গিতে চাহিলে তাহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিও না, 'কেন'।

বিবাহ সহজে ভাঙ্গিতে না দিলে যে কি ব্যভিচার ও ভণ্ডামির সৃষ্টি হইতে পারে, লিও ও রেজিনাল্ডের ব্যাপারে বার্ণার্ড শ' তাহা দেখাইতে চান। রেজিনাল্ড লিওর স্বামী; কিন্তু লিও স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট এক যুবকের প্রেমে পড়িয়াছেন। রেজিনাল্ড পত্নীকে যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নন; এবং আছে যে বিবাহ তাহা ভাঙ্গিবার জন্য বাগানের মালীর সম্মুখে প্রকারান্তরে তাহাকে সাক্ষী করিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে কপট প্রহার করিলেন, এবং একটী ভাড়া করা স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচারের ভাণ করিয়া

আদালতকে বুঝাইলেন যে তাঁহার বিবাহ ভঙ্গ হওয়া উচিত। যদি স্ত্রী চাহিবামাত্রই কিংবা স্বামী অনুমতি দিবা মাত্রই বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারিত, তাহা হইলে এই কপটতার প্রয়োজন হইত না।

এই লিওর চরিত্রে বার্ণার্ড শ আর একটী কথা বলিতে চাহিয়াছেন; সেটী বহু-বিবাহের পক্ষের কথা। লিঁওর বিবাহ-ভঙ্গ মঞ্জুর হইল। কিন্তু তিনি যে তার স্বামীকে ভালবাসেন না, এমন নহে। এখনও তিনি তার স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা করেন; তাঁর জিনিষপত্র গোছাইয়া রাখা হয় কি না, তিনি সময় মত ঔষধ ব্যবহার করেন কি না ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে এখনও ভুলেন না। বরং তিনি বলেন, 'আমি দুজনকেই কেন বিবাহ করিতে পারি না, আমি দুজনকেই ভালবাসি। আমার ইচ্ছা হয় বহু পুরুষকে বিবাহ করি। রে'জনাল্ডকে আমি সর্ব্বদার জন্য চাই, সিঞ্জনকে কন্‌সার্টে ও থিয়েটারে যাবার সময় এবং সন্ধ্যাবেলা বেড়াবার সময় চাই। এবং বছরে এক আধ বার এক জন কঠোর ঋষি-প্রকৃতির স্বামী পাইতে ইচ্ছা হয়; এবং দুষ্টামি করিবার জন্য একটা দুষ্ট, বোকা ছোকরা স্বামী পাইলে মন্দ হয় না। দুষ্টামি আমার বেশী করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু যখন হয়, তখন একজন উপযুক্ত স্বামীর অভাবে ইহা ঘটে না, এই যা দুঃখ।"

একজন আটপৌরে, একজন পোষাকী, একজন রবিবারের জন্য, একজন অন্য কয় দিনের জন্য—ইত্যাদি রং-বেরঙের স্বামী না হইলে লিওর আর চলে না।

বয়সের সঙ্গে, স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হয়। যখন যেমন রুচি সেরূপ স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ করিবার সুবিধা লোককে দেওয়া উচিত নহে, বার্ণার্ড শ' তাহা কখনও বলেন না। আর এই সুবিধা দিলেই লোকে প্রতিদিন পোষাকের মত স্বামী বা স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিবে, এ আশঙ্কাও তিনি করেন না। বরং এ সুবিধা থাকিলেই স্বামী গাঢ় প্রীতির জন্ম সম্ভব, ইহাই তাঁহার মত।

পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা—সন্তানের উৎপত্তিই সমাজের দ্রষ্টব্য। বিবাহ তাহার উপায় মাত্র। কিন্তু শ' মনে করেন, সমাজ উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া গিয়া একমাত্র উপায়ের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। যে বিবাহ হইতে সুসন্তানের উৎপত্তি হয় না, শ' বলিতে চান, নিঃসঙ্কোচে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়াই সমাজের পক্ষে হিতকর। এবং কয়লার খনি বা অন্যত্র যেমন মজুরেরা সমাজের উপকারার্থ কাজ করে, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ দ্বারাও তেমনই সমাজের উপকার হওয়ার কথা। অনিচ্ছায় যারা কাজ করে তাদের নিকট হইতে যেমন ভাল কাজ পাওয়া যায় না, অসন্তুষ্ট-চিত্ত দম্পতীও তেমনই সমাজকে যথোচিত কাজ দেয় না। সমাজের দেখা উচিত, যাহাতে প্রত্যেক দম্পতী সুখী থাকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও কোনও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখাও যা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে কাজ আদায় করার চেষ্টাও তাই। এইজন্য বিবাহের সৃষ্টি ও ভঙ্গ সহজ-সাধ্য করিয়া দেওয়া উচিত।

সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে আমরা বিবাহ এবং পতি-পত্নীর অধিকার-অনধিকার সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র মত ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। একজন বিশপের কন্যার বিবাহের দিনে, বিশপের গৃহে 'বিবাহ করা' নামক নাটকটীর ঘটনা ঘটিতেছে; সেইখানে বিবাহ সম্বন্ধে তর্ক হইতেছে, বিশপ স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতেছেন, এবং বার্ণার্ড শ'রই মত ব্যক্ত হইবার সুবিধা দিতেছেন—যে কোন সমাজে ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার। বিশপ স্বয়ং একজন অজ্ঞাত-নামা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে প্রেম-পত্র পান, এবং দান্তের (Dante) বিয়েত্রিসের মত তাহাকে ভাল বাসিতেও প্রস্তুত—এ সব কথা বলিতে তিনি কুণ্ঠিত নন; যাহার বিবাহ হইবে বিশপের সেই কন্যা বিবাহ-ভঙ্গ কঠিন জানিয়া বিবাহ করিতে হঠাৎ নারাজ হন; এবং বিশপ স্বয়ং এইরূপ কঠোর দুশ্ছেদ্য বিবাহ-প্রথার বিরোধী;—বার্ণার্ড শ'র এই সব নাট্য-পদ্ধতি যে ইংলণ্ডের শিষ্ট সমাজ ক্ষমা করিতে চায় না, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অবশ্যই নাটকটীকে হাস্য-রস-প্রধান করিয়া অপরাধের মাত্রা তিনি অনেক কমাইয়াছেন। কিন্তু নাটকে ব্যঙ্গচ্ছলে যাহা বলিয়াছেন, ভূমিকায় তাহাই স্থির

বলে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বার্ণার্ড শ' যে নিতান্ত অকথ্য কথা বলিয়াছেন, তা নয়; নিতান্ত অসমীচীন প্রশ্ন তোলাই যে তাঁর অপরাধ, তা নয়। আর তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ নূতন, ইউরোপের অতীত ও বর্ত্তমান চিন্তার সহিত একেবারেই সম্বন্ধ-বিহীন, এরূপ নহে। প্লেটোর দার্শনিক চিন্তারও বিবাহ সম্বন্ধে অনুরূপ মতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ইবসেন, নীট্‌চে প্রভৃতি ইংলণ্ডের বাহিরের সাহিত্যিক ও দার্শনিকের প্রভাব তাঁহার উপর স্পষ্ট। তিনি যে সব সমস্যা তুলিয়াছেন, তাহা ইউরোপের সমগ্র নবীন সাহিত্যের—সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের বিষয়। তথাপি তিনি অনেকের অপ্রিয়। তাহার কারণ, তিনি গায়ে পড়িয়া নিজেকে নীতি-বিরোধী, ধর্ম্ম-বিরোধী, সমাজ-বিদ্রোহী বলিয়া প্রচার করিতে চান। "চিকিৎসকের উভয়-সঙ্কট"নামক নাট্যকের নায়ক চিত্রকর লুই'র মুখ দিয়া তিনি বলাইতেছেন, 'আমি তোমাদের চরিত্র-নীতিতে বিশ্বাস করি না; আমি বার্ণার্ড শ'র শিষ্য।" তিনি যদি এ ভাবে গায়ে পড়িয়া, জোর করিয়া, লোকের চিত্তে আঘাত করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে তিনি এত অপ্রিয় হইতেন কিনা সন্দেহ।

তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ স্বাধীন, সজীব সতেজ হইয়া উঠুক; নীরোগ, সবল, সুস্থ, সুখী লোকে দেশ পূর্ণ হইয়া যাউক; রোগ, শোক, দারিদ্র্য, ব্যভিচার, অধর্ম, অনীতি দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউক; ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, নীতির নামে অনীতি, বিচারের নামে অবিচার—প্রভৃতি ভণ্ডামি যে সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা দূর হউক;—এমন কে আছে যে ইহা না চায়? বার্ণার্ড শ' নানা ভাবে এই আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন; কৃতকার্য্য হন নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। তিনি যতই অপ্রিয় হউন না কেন, ইংলণ্ডের এবং কথঞ্চিৎ সমস্ত ইউরোপের সমাজে সত্য সত্যই যে সমস্ত প্রচ্ছন্ন পাপ রহিয়াছে, অতি নির্দ্দয় ভাবে সেগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তিনি জগতের হিতের চেষ্টাই করিয়াছেন।

অবশ্যই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রণালীই এই আদর্শ-সিদ্ধির ঠিক উপায় কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন চলে। বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, কিংবা ইতর জন্তুর সমাজে প্রচলিত অস্থায়ী যৌন সম্বন্ধের মত বিবাহ প্রচলিত করিয়া দেওয়াই যে সমাজের উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা, সহজে আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিব না। কিন্তু যে সমস্যা তিনি তুলিয়াছেন, ইউরোপকে আজ তাহা ভাবিতে হইতেছে, ইংলণ্ডও না ভাবিয়া পারিবে না। এই হিসাবে শ' আমাদেরও স্মরণের যোগ্য। এ সমস্যা আমাদেরও সমস্যা কি না সন্দেহ; কিন্তু তাহার ছায়া এ দেশের সাহিত্যেও পড়িয়াছে; সুতরাং বার্ণার্ড শ'কে আমরা একেবারে বাদ দিয়া পারি না।

অতঃপর অভ্যাগতের মত বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল না। তিনি সাহিত্যিক—তাঁহার নাট্য-কৌশল, তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি আমরা বাদ দিয়াছি; তাঁহার সামাজিক গবেষণার বিষয়ও অনেক অকথিত রহিল; তাঁহার অভিনব মতের সম্যক্ সমালোচনাও আমরা করিতে পারি নাই। তাঁহার মানস রাজ্যে কি সব কল্পনা-জীব বিচরণ করে, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র আভাস আমরা পাই চেষ্টা করিয়াছি। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সায়ণমাধব

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য সুধী-সমাজে সুপরিচিত হইয়াও কতিপয় কারণে স্বপ্রণীত বিবিধগ্রন্থের কর্ত্তৃত্বনির্দ্ধারণবিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়েও সন্দেহের বীজ নিহিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, আপাততঃ অনেকের মনে এতদুভয়ের অভিন্নত্বই প্রতিভাত হয়।

তাঁহাদের রচিত গ্রন্থনিচয়ের উপক্রম ও উপসংহার পাঠ না করিলে তাঁহাদের অভিন্নত্ব-ভ্রান্তি প্রায় বিদূরিত হয় না। সায়ণ-কৃত বিবিধগ্রন্থে "সায়ণাচার্য্যকৃতে মাধবীয়ে" এইরূপ বিশেষণ নিহিত হওয়ায়, গ্রন্থের কর্ত্তা সায়ণ মাধব কি দুই ব্যক্তি, অথবা সায়ণমাধব একই ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

মাধব ও সায়ণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব গ্রন্থে অল্পাধিক পরিমাণে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদবলম্বনে এবং প্রমাণান্তরের সাহায্যে পাশ্চাত্য মনীষিগণ ইহাদের তথ্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে পরিশ্রমপূর্ব্বক স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়া আলোচনার পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অবধারিত সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-বাসী কৃতিগণও এতদ্বিষয়ে আলোচনার ত্রুটি করেন নাই। আমরাও আজ এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের সহিত যে যে স্থলে আমাদের মতভেদ হইবে, তৎপ্রদর্শনপূর্ব্বক স্বমত প্রকাশ করিব, এবং গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, সেগুলিও সাধারণের গোচরীভূত করিব।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিভিন্ন প্রস্থান-শাস্ত্র-নিবন্ধের প্রতি কিরূপ আস্থাবান্ ছিলেন, তৎপ্রদর্শনই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মাধবাচার্য্য পরাশরভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে সে কালের রীতি অনুসারে যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ভারতীতীর্থের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন (১)। তিনি, সত্যব্রত-পালক, প্রখর-বুদ্ধি, ত্রিবর্গাভিলাষী, বিবিধবিদ্যাবিৎ, নীতি-বিশারদ স্মার্ত্ত-ক্রিয়া-ধুরন্ধর বীরবুক্ক নৃপতির কুল-ক্রমাগত মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (২)

তাঁহার মাতার নাম শ্রীমতী, পিতার নাম মায়ণ, মনের ও বুদ্ধির তুল্য দুই সহোদরের নাম, সায়ণ ও ভোগনাথ। (৩)

তিনি ভরদ্বাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শাখা যাজুষী, বৌধায়নসূত্রানুসারে তাঁহার ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। (৪)

মাধবীয় ধাতু-বৃত্তির উপক্রমে সায়ণাচার্য্য যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি সঙ্গম রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। (৫) তিনি "মাধবীয়" নামে

(১) সোঽহং প্রাপ্য বিবেকতীর্থপদবী মাম্নায়তীর্থে পরং
মজ্জন্ সজ্জনতীর্থ-সঙ্গ-নিপুণঃ সদ্বৃত্ততীর্থং শ্রয়ন্
লব্ধা মাকলয়ন্ প্রভাব-লহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থ মুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠ মব্যাহতম্।

(২) সত্যৈক-ব্রত-পালকো দ্বিগুণধী স্ত্র্যর্থী চতুর্ব্বেদিতা
পঞ্চস্কন্ধ-কৃতী ষড়ন্বয়দৃঢ়ঃ সপ্তাঙ্গ-সর্ব্বংসহঃ
অষ্টব্যক্তি-কলাধরো নবনিধিঃ পুষ্যদ্দশপ্রত্যয়ঃ
স্মার্ত্তোচ্ছ্রায়-ধুরন্ধরো বিজয়তে শ্রীবুক্কণ-ক্ষ্মাপতিঃ
ইন্দ্রস্যাঙ্গিরসো নলস্য সুমতিঃ শৈব্যস্য মেধাতিথি-
র্ধৌম্যো ধর্ম্ম-সুতস্য বৈণ্যনৃপতেঃ স্বৌজা নিমের্গৌতমিঃ
প্রত্যগ্‌দৃষ্টি ররুন্ধতী-সহচরো রামস্য পুণ্যাত্মনো
যদ্বত্তস্য বিভো রভূৎ কুলগুরু র্মন্ত্রী তথা মাধবঃ।

(৩) শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তি র্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনো-বুদ্ধি-সহোদরৌ॥

(৪) যস্য বৌধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী।
ভারদ্বাজং কুলং যস্য সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥

(৫) অস্তি শ্রীসঙ্গমঃ ক্ষ্মাপঃ পৃথ্বীতল-পুরন্দরঃ।
যৎকীর্ত্তি-মৌক্তিকাদর্শে ত্রিলোক্যা প্রতিবিম্ব্যতে
তস্য মন্ত্রিশিখারত্ন মস্তি মায়ণসায়ণঃ।
যঃ খ্যাতিং রত্নগর্ভেতি যথার্থয়তি পার্থিবীম্॥

সমাখ্যাত ধাতুবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম "মায়ণ"। (৬)

তিনি উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তিতে আত্মপরিচয়দানপ্রসঙ্গে সহোদর মাধবের নাম এবং সঙ্গম রাজার পিতার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৭) এই বর্ণনানুসারে জানা যায়, সঙ্গম-রাজার পিতার নামই কম্পরাজ। কাব্যমালা-প্রকাশিত ৪৪ সংখ্যক লেখ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কম্প-রাজই বুক্কণ রাজার পিতা। (৮) ইনি চন্দ্রবংশান্তর্গত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (৯)

এই সমস্ত প্রমাণের বলে বুঝা যায় যে, কম্পরাজই সুপ্রসিদ্ধ বীরবুক্কণ নরপতির পিতামহ ছিলেন।

সঙ্গম রাজার রাজত্ব-সময়েই সায়ণ কর্ত্তৃক মাধবীয় ধাতুবৃত্তি রচিত হইয়াছে।

জ্যেষ্ঠ সহোদর সুগৃহীত-নাম মাধবাচার্য্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থই সম্ভবতঃ উক্ত গ্রন্থকে তিনি 'মাধবীয়' নামে সমাখ্যাত করিয়াছেন।

হয় ত তাঁহারা উভয়ে সর্ব্বশাস্ত্রেরই আলোচনা করিবেন, এ মত সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ ধাতুনিরূপণের আবশ্যকতা বোধে সর্ব্বপ্রথম ধাতুবৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অতএব অগ্রজের নামই গ্রন্থের পরিচায়করূপে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যু স্তং নমামি গজাননম্॥

এই শ্লোকটি মাধবীয় বৃত্তির উপক্রমে, এবং ঋগ্বেদভাষ্য, সামবেদভাষ্য, যজুর্ব্বেদভাষ্য, অথর্ব্ববেদভাষ্য প্রভৃতি সায়ণকৃত সমস্ত ভাষ্যের উপক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মাধবাচার্য্যকৃত পরাশর-মাধব, কাল-মাধব, ন্যায়-মালা-বিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থেও এই শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে।

ইহা হইতে উভয় ভ্রাতার শাস্ত্র-প্রণয়নে সহায়কারিতাই যেন প্রতিভাত হয়।

ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ সায়ণ নামে প্রসিদ্ধ কোনও ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই ইহাঁদের বংশ "সায়ণ" নামে পরিচিত হইয়াছিল বলিয়া মনীষিগণ নির্ব্বিবাদে অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে আত্ম-পরিচয় দানপ্রসঙ্গে নিজেকে সায়ণ-বংশরূপ দুগ্ধ-সমুদ্রের কৌস্তুভ-মণি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং "সায়ণমাধব" এইরূপও উল্লেখ করিয়াছেন। (১০)

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে বুক্কণ নৃপতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্যের অথর্ব্ববেদ-ভাষ্যোপদ্ঘাতে বুক্কণ-পুত্র হরিহর নৃপতির বর্ণনা দেখা যায়, এবং ধাতু-বৃত্তির উপক্রমে বুক্কণ-পিতা সঙ্গমের মন্ত্রী বলিয়াই তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদাদির ভাষ্যে বুক্কণ রাজার মন্ত্রিত্ব

---

(৬) তেন মায়ণপুত্রেণ সায়ণেন মনীষিণা
আখ্যয়া মাধবীয়েয়ং ধাতুবৃত্তি র্বিরচ্যতে। ১৩

(৭) ইতি পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-সমুদ্রাধীশ্বর-কম্পরাজসুত-সঙ্গম-মহারাজ-মহামন্ত্রিণা মায়ণসুতেন, মাধব-সহোদরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতায়াং মাধবীয়ায়াং ধাতুবৃত্তৌ চুরাদয়ঃ সম্পূর্ণাঃ।

(৮) সর্ব্বরত্ননিধেস্তস্য সম্রাড়াসী ত্তনূভবাম্
মধ্যে বুক্ক-মহীপালো মণীনামিব কৌস্তুভঃ॥

(৯) সদামোদনিধেস্তস্য সন্তানে যদুসংজ্ঞিতে।
অভূ দাশ্চর্য্যমাধুর্য্যং বসুধায়াস্তপঃ ফলম্॥
সঙ্গমোনাম রাজাভূৎ সারভূতে তদন্বয়ে।
রেজে যস্য যশঃ সিন্ধৌ সরণীব সুরাপগা॥

(১০) শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন মহৌজসা।
ক্রিয়তে মাধবার্য্যেণ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ॥
পূর্ব্বেষা মতিদুস্তরাণি সুতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ।
শ্রীমৎ-সায়ণ-মাধবঃ প্রভু রুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে।
দূরোৎসারিতমৎসরেণ মনসা শৃণ্বন্তু তৎ সজ্জনাঃ।
মাল্যং কস্য বিচিত্র-পুষ্পরচিতং প্রীত্যৈ ন সঞ্জায়তে॥

করিতেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সায়ণাচার্য্য সঙ্গম নৃপতি হইতে হরিহর পর্য্যন্ত তিন পুরুষেরই মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য কাল-মাধবের উপক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি পরাশর-কথিত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কালের নির্ণয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

"ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্যোধর্ম্মান্ পারাশরানথ।
তদনুষ্ঠান-কালস্য নির্ণয়ং বক্তুমুদ্যতঃ" ॥ ৪

তিনি 'ন্যায়মালা-বিস্তরের' উপক্রমে বলিয়াছেন যে,

"শ্রুতি-স্মৃতি সদাচারঃ পালকো মাধবো বুধঃ।
স্মার্ত্তং ব্যাখ্যায় সর্ব্বার্থং দ্বিজার্থং শ্রৌত উদ্যতঃ॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যানে নিজেই বলিয়াছেন যে,পুরাণ-সার, পরাশরস্মৃতি ব্যাখ্যানাদির দ্বারা সর্ব্ববর্ণাশ্রমের অনুগ্রহার্থ স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া, অধুনা তিনি দ্বিজাতির প্রতি বিশেষানুগ্রহপ্রদর্শনাভিপ্রায়ে শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। (১১)

তাঁহার এই উক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি প্রথমে পুরাণসারসমুচ্চয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অনন্তর পরাশর-ভাষ্য এবং কাল-মাধব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎপর শ্রৌত গ্রন্থ ব্যাখ্যার উপযোগি মীমাংসা-গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের রচয়িতা যে তিনিই, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় না। কিন্তু উত্তর-মীমাংসার সংগ্রাহক শ্লোকগুলি তাঁহার গুরু কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া পরিচিত। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি নিজে শ্লোক রচনা করিয়া, ভক্তিবশতঃ সেইগুলি তাঁহার গুরুর নামে প্রকাশিত করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতার এবং ঋগ্বেদসংহিতার (১২) ভাষ্যোপদ্ঘাতপাঠেও জানা যায়, মাধবাচার্য্য পূর্ব্বমীমাংসার এবং উত্তরমীমাংসার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া বেদার্থ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন।

বুক্কণরাজা মাধবাচার্য্যকেই বেদার্থ প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন; অনন্তর মাধবাচার্য্য রাজাকে বলিয়ছিলেন যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই সায়ণাচার্য্য বেদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে; অতএব ইহাকে ব্যাখ্যাতৃরূপে আপনি নিযুক্ত করুন। অনন্তর মাধব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজা সায়ণাচার্য্যকে বেদার্থ প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

"বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যু স্তং নমামি গজাননম্।
যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥
তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্বুক্ক-মহীপতিঃ
আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥
যে পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ
কৃপালু মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥
স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ
সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥
ইত্যুক্তো মাধবার্য্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ
অন্বসাৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে।

এই সমস্ত প্রমাণানুসারেও স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, কেবল মাধবাচার্য্যই পূর্ব্বোত্তরমীমাংসার সংক্ষেপকর্ত্তা। কিন্তু অথর্ব্ববেদের ভাষ্যোপদ্ঘাতে সায়ণাচার্য্য যে শ্লোকাবলি নিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায়, বুক্কনৃপতির পুত্র হরিহর রাজার আদেশানুসারে তিনি পূর্ব্বোত্তরমীমাংসার সংক্ষেপ করিয়া বেদার্থকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সামাদি বেদত্রয় কেবল পারলৌকিক ফলপ্রদ, সেই ত্রিবেদের ব্যাখ্যা করিয়া ঐহিক ফলপ্রদ এবং পারলৌকিক ফলপ্রদ চতুর্থবেদ (অথর্ব্ব)

(১১) সর্ব্ববর্ণাশ্রমানুগ্রহায় পুরাণ-সার-পরাশর-স্মৃতি ব্যাখ্যা-মাদিনা স্মার্ত্তোধর্ম্মঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ। ইদানীং দ্বিজাতীনাং বিশেষানুগ্রহায় শ্রৌতধর্ম্ম-ব্যাখ্যানায় প্রবৃত্তঃ॥

(১২) মুদ্রিত ঋগ্বেদোপদ্ঘাতে "স প্রাহ নৃপতিং" ইত্যাদি শ্লোক দেখা যায় না।

ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। (১৩)

তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের উপোদ্‌ঘাতেও "যে পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসে" ইত্যাদি শ্লোকে মাধবাচার্য্যই বেদার্থকথনে উদ্যত হইয়াছেন, এমত লেখা আছে; এবং পঞ্চম শ্লোকের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ সংহিতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখন উদ্‌গাতার বুদ্ধি-বৈশদ্যসম্পাদনার্থ ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। (১৪) এই বর্ণনানুসারে দেখা যায়, মাধবাচার্য্যই বেদের ব্যাখ্যাকর্ত্তা। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভাষ্যের শেষে লেখা আছে, "ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক শ্রীবীরবুক-ভূপাল সাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে সাম-বেদার্থপ্রকাশে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্য অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণশ্চ গ্রন্থঃ।"

এই সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে বলিতে হয়, মাধবাচার্য্য 'করোমি' বলিয়া নিজের উপর যে বেদার্থপ্রকাশের কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে অন্তর্ভূতণ্যর্থ আছে, 'করাইতেছি' এই অর্থেই 'করিতেছি' প্রয়োগ করিয়াছেন। অথবা সায়ণের উপর কেবল ভার দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি স্বয়ংও বেদার্থপ্রকাশে রচনা করিয়াছেন, সায়ণাচার্য্য অধিকতর পরিশ্রম করিয়া থাকিবেন বলিয়া তিনিই রচয়িতৃরূপে কথিত হইয়াছেন।

অথর্ব্ববেদ ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে সায়ণাচার্য্যই পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা রচনানন্তর বেদার্থপ্রকাশের কথা লিখিয়াছেন। তদনুসারে বোধ হয়, ভ্রাতার গ্রন্থে তিনি নিজেও কতক সাহায্য করিয়াছিলেন। *

অথবা এই স্থালে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ের এককর্ত্তৃকত্ব অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই, কেবল আনন্তর্য্যই বিবক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোত্তরমীমাংসা ব্যাখ্যানের পর তিনি বেদার্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই মাত্র বুঝা যাইতেছে; মীমাংসা ব্যাখ্যানের কর্ত্তা তিনিই, এমত বুঝায় নাই। এইরূপ প্রয়োগ বিরল হইলেও, একেবারে অসম্ভব নহে।

সে কালের গ্রন্থকারদিগের আর এক রীতির পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ব্যক্তির গ্রন্থকেও নিজের কৃত বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কৌণ্ডভট্ট স্বপ্রণীত "বৈয়াকরণভূষণসার" গ্রন্থে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যানেই ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত শব্দ-কৌস্তুভ গ্রন্থকে নিজের কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিটি এইরূপ—

ফণিভাষিত-ভাষ্যাব্ধেঃ শব্দ-কৌস্তুভ উদ্ধৃতঃ
তত্র নির্ণীত এবার্থঃ সংক্ষেপেণেহ কথ্যতে।

উদ্ধৃত ইত্যত্র অস্মাভিরিতি শেষঃ॥

পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্যরূপ সমুদ্র হইতে শব্দকৌস্তুভ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই এইস্থানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে। শব্দকৌস্তুভের উদ্ধারকর্ত্তা 'আমরাই' এইরূপ অধ্যাহার বুঝিতে হইবে।

আর এক প্রকার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে যাঁহার আদেশে পুস্তক রচিত হইত, তাঁহাকেও সেই গ্রন্থের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। সূর্য্যসেন নৃপতির আদেশে

---

(১৩) বাগীশাদ্যা ইত্যাদি। যস্য নিঃশ্বসিত মিত্যাদি।
অবিদ্যা-ভানুসন্তপ্তো বিদ্যারণ্যমহং ভজে।
যদর্ক-করতপ্তানা-মরণ্যং প্রীতিকারণম্ ॥৩
তৎকটাক্ষেণ তদ্রূপং দধতো বুক্কভূপতেঃ।
অভূদ্ধরিহরো রাজা ক্ষীরাব্ধে রিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪
বিজয়ী হরিহরভূপঃ সমুদ্বহন্ সকলভূভারম্।
ষোড়শ মহান্তি দানান্যনিশং সর্ব্বস্য তুষ্টয়ে কুর্ব্বন্ ।৭
তস্মাল্লব্ধ মালোচ্য বেদ-মাথর্ব্বণাভিধম্।
আদিশৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে। ৮
যে পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
কৃপালুঃ সায়ণাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ। ৯
ব্যাখ্যায় বেদত্রিতয় মামুষ্মিক-ফলপ্রদম্।
ঐহিকামুষ্মিক-ফলং চতুর্থং ব্যাচিকীর্ষতি ॥

(১৪) "ব্যাখ্যাতাবৃগ্‌যজুর্ব্বেদৌ সাম বেদেঽপি সংহিতা।
ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণব্যাখ্যাং করোম্যোদ্‌গাতৃবুদ্ধয়ে" ॥

বল্লাট নামক পণ্ডিত নির্ণয়ামৃত নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রকরণশেষে সূর্য্যসেনই গ্রন্থকাররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। (১৫)

আর এক প্রকার রীতি ছিল,—তাহাতে গ্রন্থের রচয়িতা এবং অনুমন্তা উভয়েই কর্ত্তা বলিয়া কথিত হইতেন। সেতু-বন্ধ নামক প্রসিদ্ধ প্রাকৃত-কাব্যে এই রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদশেষে লিখিত আছে "ইঅ-সিরি পবরসেন বিরইএ কালিদাস কএ দশমুহবহে মহাকব্বে"-ইতি শ্রীপ্রবরসেন-বিরচিতে কালিদাসকৃতে দশমুখবধে মহাকাব্যে। (১৬)

প্রদর্শিত রীত্যনুসারে সায়ণাচার্য্যের গ্রন্থে 'মাধবীয়' নাম-সন্নিবেশ সমঞ্জস হইতে পারে।

মাধবাচার্য্য সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহে "সায়ণমাধব" নাম প্রযুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার কুলক্রমাগত নাম 'সায়ণ' এই সিদ্ধান্ত অবধারিত হইয়াছে, এ বিষয়ে প্রায় মত-ভেদ দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার নির্ম্মিত পদ্যাবলি যেমন গূঢ়-সংক্ষিপ্তার্থ,তাহাতে এমত সন্দেহও উপস্থিত হয় যে,তিনি 'সায়ণ-সহিতো মাধবঃ' অর্থাৎ সায়ণের সহিত মাধব এইরূপ অর্থেও সায়ণ-মাধব শব্দ প্রযুক্ত করিয়া উক্ত গ্রন্থে সায়ণেরও কর্তৃত্ব ঘোষণা করিতে পারেন। তবে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, "সায়ণমাধব" শব্দের প্রদর্শিত অর্থ ধরিয়া লইলে,

"শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন মহৌজসা
ক্রিয়তে মাধবার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।"

এই শ্লোকের কি উপপত্তি হইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বিশেষণ পরপদের সহিত কর্ম্মধারয় সমাসে নিষ্পন্ন "শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন" এই পদের সহিত "মহৌজসা" এবং "মাধবার্য্যেণ' এই উভয় পদ ভেদে অন্বিত হইলে, সহার্থে বিহিত তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা উপপত্তি হইতে পারে। তবেই ইহার অর্থ দাঁড়ায়, দুগ্ধ-সমুদ্রের কৌস্তুভরূপ সায়ণাচার্য্যের সহিত মাধবাচার্য্য কর্তৃক সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ নির্ম্মিত হইতেছে। এইরূপ বিশেষণের দ্বারা নিজের বংশের এবং অনুজ ভ্রাতার গৌরব-কীর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহগ্রন্থের সম্পাদক রামশাস্ত্রিমহাশয় মাধবাচার্য্যের বংশগত নাম "সায়ণ" এই মত সমর্থনের জন্য মাধবীয় ধাতুবৃত্তি হইতে একটি পদ্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, এই প্রমাণের দ্বারা ইহাঁর পিতা মায়ণেরও সায়ণত্ব কথিত হওয়ায়, ইহাঁদের বংশগত নামই সায়ণ। তাঁহার বাক্যটি এইরূপ—

"মাধবীয় ধাতুবৃত্তৌ বাদিমশ্লোকেষু

"অস্তিশ্রীসঙ্গমঃ ক্ষ্মাপঃ পৃথ্বীতলপুরন্দরঃ
তস্য মন্ত্রিশিখারত্নং মন্ত্রিমায়ণ-সায়ণঃ॥

ইতি পিতুর্মায়ণস্যাপি সায়ণত্বেনোল্লেখাদবগম্যতে।"

কিন্তু ধাতুবৃত্তির উপক্রমলিখিত সমস্ত পদ্যাবলি পাঠ করিলে মনে হয়, প্রদর্শিত পদ্যটি মায়ণের সায়ণবংশপ্রভবত্ব প্রতি-পাদন করে নাই, প্রত্যুত সায়ণেরই মায়ণপুত্রত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। "মায়ণসায়ণ" এই পদ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন হইলে, মায়ন সম্বন্ধী সায়ণ এই অর্থ বুঝাইতে পারে।

পাঠকের অবগতির জন্য এস্থলে গ্রন্থকারের পরিচায়ক ধাতুবৃত্তিস্থ পদ্যাবলি প্রদর্শিত হইল।

(১৫). শ্রীসূর্য্যসেন নৃপতে রাদেশাৎ সিদ্ধ-লক্ষণতত্ত্বজ্ঞঃ
বল্লাটনাথসূরিঃ সংগ্রহ মিহ কালনির্ণয়ে কৃতবান্।
ইতি শ্রীসূর্য্যসেন-মহীমহেন্দ্রবিরচিতে নির্ণয়ামৃতে
আশৌচপ্রকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্।

(১৬) প্রবরসেনের সেতু-বন্ধ কাব্য অতি প্রাচীন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক দণ্ডী কাব্যাদর্শে সেতু-বন্ধ কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥

বাণভট্টের হর্ষ-চরিতে প্রবরসেনের কীর্ত্তিস্বরূপ সেতু-কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কীর্ত্তিঃ প্রবর-সেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥

"বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যু স্তংনমামি গজাননম্ ॥১
জীয়া দ্বস্তিমুখো যস্য লীলয়োর্দ্ধাণ্ডণ্ডনে।
কন্দাঙ্কুরবদাভাতি দন্তাগ্রং তদ্বহির্গতম্ ॥২
চিদানন্দকলাং বাণীং বন্দে চন্দ্রকলাধরাম্।
নৈর্ম্মল্যতারতম্যেন বিম্বিতাং চিত্তভিত্তিষু॥৩
অস্তি শ্রীসঙ্গমঃ ক্ষ্মাপঃ পৃথ্বীতলপুরন্দরঃ
যৎকীর্ত্তিমৌক্তিকাদর্শে ত্রিলোক্যা প্রতিবিম্ব্যতে ॥৪
যশঃ ক্ষীরাহুতীকৃত্য যৎপ্রতাপ-হুতাশনে।
পরে যান্তি পদংদিব্যং রাজানো রণদীক্ষিতাঃ ॥৫
তূর্ণং কর্ণাস্তিকং প্রাপ্তে যৎপ্রতাপ ধনঞ্জয়ে।
পুরোনিধায় গাঙ্গেয়ং স্বাত্মা সংরক্ষ্যতে পরৈঃ ॥৬
কুর্ব্বন্ শত্রুযশাংসি ধূমপটলীং কূলঙ্কষা-জ্যাস্পদঃ।
কাষ্ঠাসঙ্গ-বিবর্দ্ধিতঃ প্রকটয়ন্ ভূতিং নবাং ভূয়সীম্।
আতন্বন্ রিতর-প্রতাপদহনং স্ফুর্জ্জৎস্ফুলিঙ্গাকৃতিম্।
প্রায়ো যচ্ছতি যৎপ্রতাপদহনঃ কশ্মৈনবিস্মেরতাম্ ॥৭
তস্য মন্ত্রিশিখারত্ন মস্তি মায়ণসায়ণঃ
যঃ খ্যাতিং রত্নগর্ভেতি কৃতার্থয়তি পার্থিবীম্॥৮
নিত্যোন্মীলিত-দানবারি রধিকং নির্দ্ধূতপঙ্কোদয়ো
দূরাপাস্ত-হরীশ-লঙ্ঘন-বিধি র্ভঙ্গ-প্রসঙ্গোজ্ঝিতঃ
ক্ষ্মাভৃৎক্ষোভকৃতিক্ষমঃ ক্ষণিকয়ন্ দোষাকরাৎ পোষণাম্
আনন্দায় চকাস্তি য স্ত্রিজগতা মাশ্চর্য্য-রত্নাকরঃ ॥৯
যৎকীর্ত্তৌ জাহ্নবীস্ফূর্ত্তৌ কীর্ত্ত্যা বিম্বিবতা মপি
কলিন্দনন্দিনীকান্তিঃ স্পর্দ্ধয়েব প্রপদ্যতে ॥১০
যেন নির্ম্মীয়তে নিত্যং ধনৈ রাযোধনৈ রপি
শ্রেয়সে যশসে দানং বিভুনাং বিদ্বিষা মপি ॥১১
ন ধ্যানং ন ব্রতং নার্চ্চা ন সমাধি র্ন বা জপঃ
মন্ত্রসিদ্ধা বলং যস্য মতিরেব গরীয়সী ॥ ১২
তেন মায়ণপুত্রেণ সায়ণেন মনীষিণা
আখ্যায়া মাধবীয়েয়ং ধাতুবৃত্তি র্বিরচ্যতে ॥ ১৩

এই পদ্যাবলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি শ্লোকের দ্বারা গণেশের ও সরস্বতীর প্রণাম, চতুর্থ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোকের দ্বারা সঙ্গম-রাজার প্রভাববর্ণনা, এবং অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা সঙ্গম রাজার মন্ত্রীরই প্রভাব বর্ণনা হইয়াছে। অষ্টম শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ হইতে বুঝা যায়, পূর্ব্ববর্ণিত সঙ্গম-রাজার মন্ত্রিশিরোমণি "মায়ণসায়ণ" নামক ব্যক্তি আছেন। তৎপর দ্বাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকেই যৎ শব্দের প্রয়োগ আছে; এই যৎ শব্দের দ্বারা মন্ত্রিমুখ্য "মায়ণসায়ণে"রই গ্রহণ হইয়াছে। ত্রয়োদশ শ্লোকে পুনরায় সেই "মায়ণপুত্র সায়ণ" কর্ত্তৃক মাধবীয় ধাতুবৃত্তি রচিত হইতেছে, এই কথা বলা হইয়াছে ; সুতরাং অষ্টম শ্লোকোক্ত "মায়ণসায়ণ" এবং ত্রয়োদশ শ্লোককথিত "মায়ণপুত্র সায়ণ" একই ব্যক্তি হইতে হইবে ; কারণ পূর্ব্বে মায়ণের গ্রহণ হইলে, "তেন মায়ণ-পুত্রেণ" এই তৃতীয়ান্ত পদদ্বয়ের সহিত তাহার (মায়ণের) অভেদে অন্বয় একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ, গ্রন্থ-শেষে নিবদ্ধ "সঙ্গমমহারাজ-মহামন্ত্রিণা মায়ণসুতেন মাধব-সহোদরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতায়াং" এই বাক্যানুসারে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সায়ণাচার্য্যই সঙ্গমমহারাজের মহামাত্য ছিলেন, মায়ণের তাৎকালিক মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই। সুতরাং প্রদর্শিত পদ্য সায়ণাচার্য্যের বংশানুগত সায়ণ-নামত্বের হেতুরূপে কিছুতেই উপন্যস্ত হইবার যোগ্য নহে।

মাধবীয় ধাতুবৃত্তির সম্পাদক দামোদর শাস্ত্রিমহাশয়, আর একটি অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই গ্রন্থকার "সায়ণ" রূপ কুলনামেই প্রসিদ্ধ, ইঁহার ব্যবহারিক নাম "যজ্ঞনারায়ণ" (১৭) এই মত সমর্থনের জন্য তিনি গ্রন্থ হইতে কয়টী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"১৭৬ পৃ ক্রমধাতু প্রক্রিয়ায় লিখিত আছে,

"যজ্ঞনারায়ণার্য্যেণ প্রক্রিয়েয়ং প্রপঞ্চিতা
তস্মা নিঃশেষতঃ সন্ত বোদ্ধারো ভাষ্যপারগাঃ ॥

(১৭) এতস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সায়ণেতি কুলনাম্নৈব প্রসিদ্ধি রিতি মাধবীয় ধাতুবৃত্তীতিবৃত্তনিরূপণে বিস্তরেণ ব্যবস্থাপিতম্। ব্যাবহারিকস্তু নাম (ক্রম ধাতৌ ১৭৬ পৃ) (মধ্য ধাতৌ ১৮৫ পৃ) ইতি মাধবীয়-ধাতুবৃত্তিস্থ-শ্লোকাভ্যাং যজ্ঞনারায়ণেতি নির্দ্ধার্য্যতে।

ইহার অর্থ, যজ্ঞনারায়ণাচার্য্য এই প্রক্রিয়া বিবৃত করিয়াছেন। তাঁষ্যপারদর্শী পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণরূপে ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন।

১৮৫ পৃঃ মধ্যধাতুপ্রক্রিয়ায় লিখিত আছে, "অত্রাপি শিষ্য-বোধায় প্রক্রিয়েয়ং প্রপঞ্চিতা যজ্ঞনারায়ণার্য্যেণ বুধ্যতাং ভাষ্যপারগৈঃ" ইহার তাৎপর্য্যও পূর্ব্ব শ্লোকেরই অনুরূপ।

(১৮৯ পৃ) বদ্ ধাতুর প্রক্রিয়ায় উদাহরণ আছে, "বদতে ব্যাকরণে যজ্ঞনারায়ণঃ। ভাসমান সূত্র সূত্রার্থং বক্তীত্যর্থঃ" তদ্বিষয়ে প্রতিভাবান্ যজ্ঞনারায়ণ সূত্রার্থ বলিয়াছেন।

"বদতে যজ্ঞনারায়ণাচার্য্যঃ। জানাতি বদিতুমিত্যর্থঃ।" যজ্ঞনারায়ণাচার্য্য বলিতে জানেন। প্রদর্শিত পদ্যদ্বয় এবং উদাহরণদ্বয় সায়ণাচার্য্যের যজ্ঞনারায়ণত্ব প্রতিপাদক হইল কি প্রকারে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। পদ্যদ্বয়ের দ্বারা বরং এই মাত্র বুঝা যায় যে, যজ্ঞনারায়ণ নামক সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক কোনও বৈয়াকরণ প্রদর্শিত ধাতুদ্বয়ের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। উদাহরণদ্বয়েও যজ্ঞনারায়ণের বৈয়াকরণত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র, ইহা হইতে সায়ণই যজ্ঞনারায়ণ এমত বুঝিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। গ্রন্থকার রচিতগ্রন্থের আদ্যন্তে সায়ণ নামে পরিচিত হইয়া মধ্যে হঠাৎ নিজকে যজ্ঞনারায়ণ নামে পরিচিত করিবেন কেন? এই শ্রেণীর গ্রন্থ ইহাই প্রথম নহে; গ্রন্থকার স্বয়ংই বলিয়াছেন—

অস্যাঃ পূর্ব্বনিবন্ধেভ্যো গুণবত্তা ন কথ্যতে
সর্ব্ব এব স্ববাক্যেষু যদাহু র্গুণগৌরবম্॥ ১৪

পূর্ব্ববর্ত্তিনিবন্ধাপেক্ষা এই গ্রন্থের (ধাতুবৃত্তির) গুণবত্তা বলা যায় না। কারণ, সকলেই নিজের কথাতে গুণগৌরব গাহিয়া থাকে।

সায়ণাচার্য্য-কৃত ধাতুবৃত্তির প্রদর্শিত ধাতুদ্বয়ের বিবরণ যজ্ঞনারায়ণ কর্ত্তৃক লিখিত, অথবা যজ্ঞনারায়ণের গ্রন্থ হইতেই এই অংশটুক সায়ণাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, এমত সমাধানই যেন সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

শারদী

নিদ্রানীরব নিবিড় রাতে
একেলা বসে খোলা ছাতে
করুণ সুরে নিপুণ হাতে
বীণা বাজায় কোন্ গুণী?

ধানের শীষ্ দুল্‌ছে বিলে—
কোলাকুলি সবুজ-নীলে;
কেগো কাশের বনে মেলিয়ে দিলে
চাঁদিরূপার জাল বুনি?

মগ্ন গগন গোপন রসে,
মন রহে না আপন বশে,
সিক্ত-আঁখি শিউলি খসে,
ঝিঁঝিঁ বাজায় ঝুনঝুনি!

অপরাজিতা লাজুক্ মেয়ে
নীহার-নীরে উঠ্‌লো নেয়ে,
দিকে দিকে ছুট্‌ছে গেয়ে
হিয়া-পাখী—টুনটুনি!

নির্ঝরিণী প্রেমের ছলে
ভিজে গলায় কি যে বলে,
দোপাটির অই চরণতলে
কে ছড়াল লাল চুণি?

ভাস্‌ছে মেঘ—ভাঙা ভাঙা,
সান্ধ্য আকাশ রক্ত-রাঙা—
যুদ্ধশেষে—এলো কি সে
বাণবিদ্ধ ফাল্‌গুনী?

শুভ শঙ্খ উঠ্‌ছে বাজি,
ভরে নে তোর প্রাণের সাজি,
সজলতপঃ সফল আজি
নিবিয়ে ফেল হোম-ধুনি।
কমলবনে করুণ স্বনে
বীণা বাজায় কোন্ গুণী?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

জিম্‌ন্যাষ্টিক্

আদিম যুগে মানুষকে যখন সর্ব্বদাই দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত, বন্যপশুহনন ব্যতীত যখন তাহার দগ্ধোদর পুরণের উপায়ান্তর মাত্রও ছিল না, এবং হিংস্রপশু ও ততোধিক হিংস্রতর প্রতিবাসী মনুষ্যসমাজের অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যখন তাহাকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত, শারীরিক শক্তিনিচয়ের সম্যক্ অনুশীলন ও বিকাশ ব্যতীত জীবন-সংগ্রামে তখন তাহার এক দণ্ডও তিষ্ঠিয়া থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্য বাধ্য হইয়াই সেকালকার লোককে নানারূপ ব্যায়ামাভ্যাস করিতে হইত। কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে শারীরিক শক্তির এই অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এখন কোনও প্রকার শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে লিপ্ত না হইয়াও, অনেকে বেশ সুখস্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া যাইতে পারেন। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান সভ্যতা-সৌধ অনেক পরিমাণে মানসিক শক্তিরূপ ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহার ফলে শুধু মনোবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ ও পরিণতি সাধনের দিকেই আজকালকার লোক অত্যন্ত বেশীভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে মানুষের শরীর ও মন, এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, মনের পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে শরীরেরও পরিণতি সাধন অবশ্যকর্ত্তব্য। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আজকাল দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য সর্ব্বপ্রকার শারীরিক শক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ইউরোপীয় মনীষিগণ এইরূপ জীবনযাপনপ্রণালীর অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া, যাহাতে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্যক্ অনুশীলন ও বিকাশ হইতে পারে, তজ্জন্য অনেক রকম নূতন নূতন ব্যায়ামপদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সকল ব্যায়াম-পদ্ধতি ইংরাজীতে সাধারণতঃ "জিম্‌ন্যাষ্টিক" (Gymnastics) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শুধু শারীরিক শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সাধন ব্যতীত ইহাদের আর কোন মুখ্য উদ্দেশ্য নাই। আমাদের স্কুলকলেজসমূহেও এই সমস্ত ইউরোপীয় "জিম্‌ন্যাষ্টিকের" ক্রমশঃ প্রচলন হইতেছে। সুতরাং এই বিভিন্ন প্রকার জিম্‌ন্যাষ্টিকের মূল প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং উহাদের দোষগুণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান-লাভ আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ইউরোপে অনেক রকমের "জিম্‌ন্যাষ্টিক্" প্রচলিত আছে। মোটামুটী ভাবে ইহাদিগকে চারটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীকে সাধারণতঃ এক কথায় "কলকারখানার যুগ" বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যাহা মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজ হাতে করিতে হইত, আজকাল তাহা কলের সাহায্যে অতি সহজে, বিনা আয়াসে ও অত্যল্প সময়ের মধ্যে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদিগকে সহজ ও কঠিন, অনেক রকম কাজই করিতে হয়। এই সমস্ত কাজ যদি ঠিক কলের মত সহজে ও সুচারুরূপে করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খুব সুবিধার হইবারই কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা করিতে হইলেই, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশাজ্ঞাপন্ন করিতে হইবে, যেন যখন যেমন ইচ্ছা, তখন ঠিক সেইরূপ ভাবেই উহাদিগকে খাটাইয়া লইতে পারা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা প্রত্যহ সাধারণতঃ যে সকল কাজ-কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের দেহের সমস্ত মাংস-পেশীর প্রয়োজনানুরূপ অনুশীলন হয় না,—কোন কোনটীর তো একেবারেই ব্যবহার হয় না। ইহার ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, এই সমস্ত পেশী, প্রয়োজনানুরূপ চর্চ্চার অভাবে, দিন দিনই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং কালে অনেকগুলির এককালীন বিলোপপ্রাপ্তির আশঙ্কাও উপস্থিত হইয়াছে। প্রয়োজনই এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র কারণ, যাহার প্রয়োজন নাই, বা যাহা আপনাকে কাহারও প্রয়োজনোপযোগী করিয়া লইতে না পারে, আজই হৌক বা দু'দিন বাদেই হৌক, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানুষ যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদি লইয়া এই

পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে, প্রয়োজন বা অনুশীলনের অভাবে তাহাদের অনেকগুলিই যদি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা সুদূরপরাহত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ কেহ হয় তো বলিবেন যে, যে সমস্ত পেশী বা ইন্দ্রিয় আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, সেগুলি বিনষ্ট হইয়া গেলে, আমাদের কোনও লাভ-লোকসান নাই। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই এই উক্তির সারহীনতা প্রতীয়মান হইবে। আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন যে সমস্ত কাজের দরকার, তাহার কতগুলি আমরা নিজে করিতে পারি? বস্তুতঃ, হিসাব করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, আমাদের অত্যাবশ্যক দৈনন্দিন কার্য্যসমূহের মধ্যে যেগুলি আমরা নিজে করিতে পারি, তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষা, যেগুলি আমরা করিতে পারি না, তাহাদের সংখ্যাই অনেক বেশী। অথচ, এই সমস্ত কাজ ব্যতিরেকে আমাদের এক দণ্ডও চলে না। সর্ব্ব বিষয়ে আত্মনির্ভরতাই যদি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে এই আদর্শ হইতে অনেক নীচে পড়িয়া আছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের মাংসপেশীপ্রভৃতির যাহাতে সম্যকরূপে অনুশীলন ও বিকাশ হইতে পারে, তজ্জন্য প্রয়োজনানুরূপ জিমন্যাষ্টিক বা ব্যায়ামচর্চ্চা একান্ত আবশ্যক।

একটী কথা আছে যে, মানুষ অভ্যাসের দাস। ইহার মূলে যে গভীর সত্য নিহিত আছে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। দীর্ঘকাল যাবৎ যদি একটী কাজ করিতে অভ্যাস করা যায়, উহা আমাদের দ্বিতীয় স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে। স্বভাবানুসারে কাজ করিতে যেমন কাহাকেও কোনও বেগ পাইতে হয় না, চিরাভ্যস্ত কাজেও সেইরূপ বেগ পাইতে হয় না; উহা আপনা আপনিই সম্পন্ন হয় বা হইবার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, জাতিগত বা বংশগত জীবনেও ঠিক সেইরূপ। পুরুষানুক্রমে আমরা যে সকল কাজ করিয়া থাকি, তাহা শিখিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু মানুষের সমাজ ও সভ্যতা চিরপরিবর্ত্তনশীল। সহস্র চেষ্টা বা ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা উহার গতিরোধ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদিগকেও এই অপ্রতিবিধেয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমতা ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাতেই মানুষের বিশেষত্ব—এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। প্রাণ-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকেই যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest)-নীতি বলে। যে প্রাণী এই পরিবর্ত্তনের সহিত আপনাকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে না পারে, এই চিরন্তন নীতি অনুসারে তাহাকে যোগ্যতরের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। এই পরিবর্ত্তনের সহিত সমতা রাখিতে হইলে, সব সময়ে আমাদের বংশানুক্রম-প্রভাবে কুলাইয়া উঠে না,—নিত্য নূতন শক্তির দরকার হয়। সুতরাং যাহাতে এইরূপ অঘটন না ঘটিতে পারে, যাহাতে আমরা যে অবস্থাতেই আসিয়া দাঁড়াই না কেন, সেখানেই আত্মরক্ষাকার্য্যে সম্পূর্ণ সফলপ্রযত্ন হইতে পারি, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়ের সম্যক্ উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি সাধন ও উহাদের সমবায়ে প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন শক্তি-সৃষ্টির চেষ্টা করিতে হইবে। কিরূপে মাংসপেশীসমূহের শক্তি-বিকাশ ও বিকশিত শক্তির অবস্থোপযোগী সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে, প্রকৃষ্টরূপে তাহার নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সমগ্র মানবদেহ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, প্রত্যেক মাংসপেশীর সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া উহার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে—প্রত্যেক ইচ্ছানুগ (Voluntary) পেশীর সম্যক পরিপুষ্টির জন্য কি পরিমাণ ও কি প্রকারের ব্যায়ামের দরকার, তাহাও ঠিক করিতে হইবে।

উপরোক্ত আদর্শ কয়েকটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই জার্ম্মাণ পণ্ডিত জেন্ (Jahn) তদীয় জিমন্যাষ্টিক্ বা ব্যায়ামপদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তাঁহার পরে স্পাইস-প্রমুখ তদীয় শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক এক্ষণে এই প্রথার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের কাজগুলি যাহাতে আমরা ঠিক

কলের মত করিয়া যাইতে পারি, আমাদের শরীরকে ঠিক তদুপযোগী করিয়া গঠন করাই জেন্-প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রথায় শিক্ষার্থীগণকে এমন অনেক উঠক-বৈঠক ও অঙ্গসঞ্চালনাদি শিখিতে হয়, যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সাক্ষাৎভাবে কোনও কাজে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত শিক্ষা দিবার জন্য অনেক নূতন ও অদ্ভুত রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামেরও উদ্ভাবন করা হইয়াছে।

এইরূপ ব্যায়ামপদ্ধতির যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জার্ম্মাণিতে এই প্রথার প্রবর্ত্তনের পর এক পুরুষ যাইতে না যাইতেই, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কোপ্রশীয় সমরে জার্ম্মাণগণ আপনাদিগকে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতিরূপে পরিচিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বস্তুতঃ, আমাদের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তিরাজির বিকাশ বা উহাদের সমবায়ে নবশক্তির সৃষ্টি করিতে গেলেই, হৃদয়ে এক প্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব উন্মাদনার আবির্ভাব হয়, এবং এই উন্মাদনাই—এই ভগবৎ-প্রেরিত প্রেরণাই সর্ব্বপ্রকার স্বদেশপ্রেমিকতার মূল প্রস্রবণ।

কিন্তু জেন্-প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামপদ্ধতিকে কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। উহার অনেকগুলি অতি গুরুতর ত্রুটীও আছে। (ক) প্রথমতঃ, এই প্রথাতে আমাদের প্রত্যেক পেশীর উপযোগী ব্যায়ামের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ, এ পর্য্যন্ত এই পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণের বিশেষ কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না। শুধু আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়াই এ পর্য্যন্ত কাজ চালাইয়া আসা হইতেছে। বলাই বাহুল্য, ইহাতে কাহারও কাহারও ভালও হইতে পারে, আবার কাহারও বা তাহা না হইতেও পারে। (খ) বংশানুক্রম-প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। মনুষ্য-জীবনে ইহার প্রভাব বড় নিতান্ত কম নহে। যে রকম ব্যায়ামই হউক না কেন, বংশানুক্রমপ্রভাবের অনুকূল না হইলে, তদ্দ্বারা পূর্ণ ফললাভের আশা করা কঠিন। কিন্তু জেন্-প্রবর্ত্তিত প্রথাতে বংশানুক্রম-প্রভাবকে আদৌ গণ্য করাই হয় না। ইহা এই পদ্ধতির একটী সাংঘাতিক দোষ। (গ) শুধু বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, ব্যক্তিগত বিশেষত্বও উপেক্ষণীয় নহে। জেন্ মানুষকে "কলের মত" করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তাই তিনি ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ শুধু কল নহে বা হইতেও পারিবে না, ইহাও খাঁটী সত্য কথা। এই তিনটীই জেন্-প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামপদ্ধতির অতি মারাত্মক দোষ।

(২) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানুষ অভ্যাসের দাস। দীর্ঘ কালের, অথবা পুরুষপরম্পরাক্রমে অধিগত অভ্যাসের প্রভাব এড়ান বড় শক্ত কথা। আবার, প্রাত্যহিক জীবনে আমাদিগকে সাধারণতঃ যে সকল কাজকর্ম্ম করিতে হয়, হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উহাদের মধ্যে আমাদের স্বাধীন বা সজ্ঞান ইচ্ছাপ্রসূত কার্য্যের সংখ্যা অতি সামান্য,—অধিকাংশই আমাদের প্রতিবেশপ্রভাবের প্রতিক্রিয়া মাত্র—উহাদের উপরে আমাদের ইচ্ছাশক্তির বিশেষ কোন হাত নাই বলিলেও হয়। মানুষ যদি বাস্তবিক স্বাধীনতা-সুখের রসাস্বাদগ্রহণে অভিলাষী হয়, তবে তাহাকে এই অভ্যাসরূপ দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইবে—প্রতিবেশপ্রভাবের হাত হইতে যতদূর সম্ভব আপনাকে মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই, আমাদের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে হইবে,—দেহের উপর মনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে।

সুইডেনের "কম্যাণ্ডো" (Commando) বা 'হুকুম-তামিল' ব্যায়াম-পদ্ধতির আদর্শও ঠিক এই প্রকারই। এই প্রথায় শরীরকে এরূপ ভাবে মনের অধীন করিতে চেষ্টা করা হয় যে, মনের হুকুম ব্যতীত শরীরের যেন এতটুকুও কাজ করিবার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা না থাকে। মনই সকলের রাজা,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশী প্রভৃতি সমস্তই উহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।

এই প্রথাতে শিক্ষক কোনও হুকুম করিবামাত্র শিক্ষার্থিগণকে নিমেষের মধ্যে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, অথবা শিক্ষকের অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকেও অবিলম্বে উহার যথাযথ অনুকরণ করিতে হয়। গান-বাজনার তালে তালে এইরূপ করা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইহাতে ইচ্ছা-শক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। এইজন্য "কম্যাণ্ডো" ব্যায়াম-পদ্ধতি হইতে গানবাজনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে,কোনও প্রত্যঙ্গবিশেষের দ্বারা কোনও কাজ করাইতে চেষ্টা করিলে, শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গও, উহার প্রতি যেন বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াই, কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকিলেও, উহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। এক চক্ষু মুদিত করিলে, অপর চক্ষুটীও যেন আপনা হইতেই অনেকটা বুঁজিয়া আসে; হাঁটিবার জন্য এক পদ উত্তোলন করিবামাত্র অপর পদও যেন উহার অনুগমন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। হস্তের একটী অঙ্গুলী কুঞ্চিত করিলে, অপরাপর অঙ্গুলীগুলিও স্বভাবতঃই বক্র হইয়া পড়ে। এইরূপ অনাবশ্যক আকুঞ্চন, সম্প্রসারণ প্রভৃতিতে আমাদের অনেক শক্তি ও সময়ের বৃথা অপব্যবহার হইয়া থাকে। এই সমস্ত আকুঞ্চন-প্রসারণ মানুষের ইচ্ছাকৃত নহে—অনেকটা সহজাত ও বংশানুক্রম-প্রভাবের ফল মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের বংশানুক্রমিক প্রভাব বা সহজাত সংস্কারের বিনাশসাধন করা এই প্রথার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাহা করিতে হইলেই, ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়-গ্রাহিণী শক্তি প্রখর হওয়া আবশ্যক। অভিনিবেশ দ্বারা এই শক্তি লাভ হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট বা অসুবিধা হইতে পারে, হয় তো অনেক পেশীকেই মনের অধীনে নাও আনা যাইতে পারে,—কিন্তু ক্রমেই ইহা অধিকতর সোজা হইয়া আসে। এইরূপে দীর্ঘকালাভ্যস্ত ও স্থায়ী কার্য্যশক্তি-সমূহের বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদের মূল উপাদানগুলি পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং প্রয়োজনমত ঐ সমস্ত উপাদানের সমবায়ে নূতন নূতন কর্ম্মশক্তির সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে, এইরূপ বিশ্লেষণ ও পুনঃ সংশ্লেষণের দরকার। মাংসপেশী প্রভৃতির অনাবশ্যক ও অনিচ্ছাপ্রসূত সঙ্কোচন-প্রসারণে আমাদের অনেক শক্তির অপব্যবহার হইয়া থাকে। এই অপব্যবহারের প্রতিরোধ করিতে হইলে, প্রত্যেক স্বতঃপ্রাপ্ত অঙ্গগতিকে (Automatism) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে—যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, প্রত্যেক মাংসপেশীকে মনের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিতে হইবে।

স্যাণ্ডো-প্রবর্ত্তিত "পেশীর নৃত্য" (Muscle dance) এই প্রথার একটী উৎকৃষ্ট ও কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত। এই প্রথায় শিক্ষিত ব্যক্তি দুই হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা একই সময়ে বিভিন্নরূপ কাজ করিতে পারে। এক হাতে পিয়ানো বাজান ও অন্য হাতে কবিতা লেখা,অথবা দুই হস্ত দ্বারা একই সময়ে বিভিন্ন সুরের গৎ বাজানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যায়াম-পদ্ধতির পক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে। সর্ব্বদা সজাগ ও সচেতন ভাবে কাজ করিতে অভ্যাস করিলে, আমাদের সহজাত শারীরিক ও মানসিক দোষ ও ত্রুটীগুলির অনায়াসেই সংশোধন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। নূতন শিক্ষার্থিগণের মনে ইহাতে একপ্রকার অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলিয়াছেন যে, যে সকল ধর্ম্ম মানুষকে নিজ চেষ্টা করিয়া অধিগত করিতে হয় না, অর্থাৎ যাহা আমাদের সহজাত সংস্কার মাত্র, হাজার উৎকৃষ্টই হউক না কেন, তাহাদিগকে কখনই প্রকৃত চরিত্র-গুণ বলা যাইতে পারে না; – মানুষের কর্ম্মজীবনে উহাদের মূল্য অতি সামান্য। উহাদিগকে চরিত্রের গুণপদবীতে উন্নীত করিতে হইলে, যুক্তি ও সচেতন ইচ্ছাশক্তির আগুনে পোড়াইয়া খাঁটী করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু জিম্‌ন্যাষ্টিকের এই প্রথা একেবারে নির্দ্দোষও নহে। যে প্রণালীতে এক্ষণে এই পদ্ধতির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা খুব কম। কিন্তু ব্যক্তিত্বকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। তথাপি ইহার

ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হয়। যাঁহারা এক্ষণে এই প্রণালীর ভক্ত, তাঁহারা যদি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) আমাদের দেহের ভঙ্গী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সঞ্চালনের দোষে অনেক সময় ও শক্তির অপব্যয় হইয়া থাকে। যাহাতে এইরূপ অপব্যবহার আর না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই এই তৃতীয় প্রকার ব্যায়ামপদ্ধতির উদ্দেশ্য। ইহার উদ্ভাবকের নাম লিং (Ling)।

লিং ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী বলেন যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মাংসপেশী পর্য্যন্ত মানুষের সমস্তই কিছু না কিছু বিকৃতভাবাপন্ন। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে, এইগুলির পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে। ভ্রূণাবস্থায় মানবশিশু নিতান্ত জড়সড় হইয়া থাকে, এবং বড় হইলেও, তাহার এই অভ্যাস সহসা যায় না। শরীর নিতান্ত ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়িলে, অথবা উপবিষ্ট অবস্থায়, আমরা এই ভ্রূণাবস্থারই যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া থাকি। লিং ও তাহার শিষ্যগণ বলেন যে, এই জড়সড় ভাব আমাদের মানসিক ও দৈহিক অভিব্যক্তির নিতান্ত পরিপন্থী। সুতরাং যেরূপেই হৌক, এই সহজাত অভ্যাসটীকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে। এইজন্ত ইঁহারা সংকোচক পেশীসমূহের সম্প্রসারণ ও প্রসারক পেশীগুলির বলাধান করিয়া সমস্ত দেহটাকে যতদূর সাধ্য টান্ টান্ বা ঠিক সোজাভাবে অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থার ঠিক বিপরীত ভাবে রাখিতে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া থাকেন। মাথাটী শিরদাঁড়ার উপরে ঠিক খাড়া ভাবে রাখিতে হইবে—যেন কোনও এক দিকে হেলিয়া না পড়ে, বা স্কন্ধের পেশীর উপর কিছুমাত্র চাপ না দেয়। অযথা চাপজনিত তলপেটে যন্ত্রাদির কার্য্যে কোনও রূপ ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে, তজ্জন্য সমগ্র দেহটিকে মেরুদণ্ডের উপর ঠিক সোজাভাবে রাখা একান্ত আবশ্যক। জানুদেশের সন্ধিস্থানগুলি প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে। হৃদয়ভাব এমন ভাবে রাখিতে হইবে, যেন তালুদেশ সর্ব্বদাই উপরের দিকেই থাকে। এইরূপে সমস্ত দেহটাকে ঠিক খাড়া ভাব প্রদান করিতে হইবে।* এইরূপ অভ্যাস করিতে পারিলে অনেক সুবিধা হইবার কথা। ইহাতে হস্তপদাদির সঞ্চালনে শ্রম ও সময়ের অনেক সংক্ষেপ হয়, এবং কার্য্যশক্তিও অনেক বাড়ে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সর্ব্বদা জড়সড় হইয়া থাকিলে, আপনা হইতেই মানসিক অবসাদ আসিয়া জুটে—এতদুভয়ের নিত্য সম্বন্ধ। পক্ষান্তরে, শরীরের প্রসারিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও সম্প্রসারণ হইয়া থাকে—সাহস, উৎফুল্লতা, কার্য্যক্ষমতা, আত্মসম্মানজ্ঞান প্রভৃতি উহার অনুচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহারা সর্ব্বদা জড়সড় বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে ভালবাসে, কোনও কাজ করিতে হইলেই, তাহারা যেন একটা বিশেষ আয়াস বোধ করে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আয়াস-সহকারে কোনও কাজ করিতে গেলেই, ঐ আয়াসের ধাক্কা দেহের সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর প্রসৃত হয়; এমন কি, যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা পেশীর সহিত ঐ কাজের কিছু মাত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তৎসমুদয়েও ঐ আয়াসজনিত একটা অবসাদ বিস্তৃত হইয়া উহাদিগকেও আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে শক্তির অনেকটা অযথা ব্যয় হইয়া থাকে। যথাসম্ভব কম শক্তি ব্যয়ে এবং যথাসম্ভব বেশী স্বচ্ছন্দতার সহিত যাহাতে যাবতীয় কাজকর্ম্ম করা যায়, সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। ইহা করিতে হইলেই, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অপ্রধান পেশীসমূহেরও সম্যক্ অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগকে প্রত্যহ যে সমস্ত সাধারণ কাজকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাতে কতকগুলি পেশীর যথেষ্ট অনুশীলন হয়। লিং বলেন যে, এইগুলির অনুশীলনার্থ আর পৃথক জিম্ন্যাষ্টিক্ না করিয়া, যে সমস্ত পেশীর আদৌ অনুশীলন হয় না, বা খুব কম হয়, সেইগুলিরই পরিণতি সাধনের জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ এই তৃতীয় পন্থার পথিকগণ জিমন্যাষ্টিক্‌কে দৈনিক কার্য্যের পরিপূরক রূপেই ব্যবহার করিতে চান।

মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এইরূপ ব্যায়াম-পদ্ধতির যে বিশেষ দরকার আছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার

করিবেন না। বিদ্যালয়ের ছাত্র, আফিস, আদালত বা দোকান প্রভৃতির কর্ম্মচারীগণকে প্রায় সর্ব্বদাই ঠিক একভাবে বসিয়াই সারা দিন কাজ করিতে হয়। ইহাতে যে তাহাদের স্বাস্থ্য-হানির গুরুতর আশঙ্কা আছে, এবং অনেক স্থলেই স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, তাহাতে কোনও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং ইহারা এই প্রণালীতে ব্যায়াম অভ্যাস করিলে যে অনেক ফললাভ করিতে পারিবে, তাহা নিশ্চিত।

মানবশরীরের জীববস্তু ও জঙ্ঘার শোণিতবাহী শিরা-সমূহের পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, এগুলির গঠন প্রভৃতি এখনও এরূপ ভাবেই আছে যে, তাহাতে মানুষ ঠিক খাড়া হইয়া চলিতে পারে না। কিন্তু সোজাভাবে চলিবার যে কি গুণ, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে জানু, জঙ্ঘা, মেরুদণ্ড, স্কন্ধ প্রভৃতি স্থানের পেশীসমূহের সম্যক প্রসারণ ঘটিতে পারে, এবং স্কুল, আদালত বা দোকানে নিয়ত উপবেশনজনিত পেশীবৃন্দের সঙ্কুচিতাবস্থার বিষময় ফল না ফলে, তজ্জন্য এই ব্যায়ামপদ্ধতি খুব ভাল বলিতে হইবে। প্রকৃতির কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতিও মানবশরীরের এই প্রসারণাবস্থাই চায়। দীর্ঘ কাল এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে আমরা হাই তুলি, বা গা মোচড়াই, অথবা টান হইয়া শুইয়া পড়ি বা উঠিয়া দাঁড়াই। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, পেশীসমূহের প্রসারিতাবস্থাই প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং যাহা প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহাই উন্নতিলাভের উপায়।

কিন্তু এই প্রথার এই সমস্ত বিশেষ গুণ থাকিলেও ইহার একটী মস্ত দোষও আছে। যে ভাবে আজকাল ইহার শিক্ষা দান হইয়া থাকে, তাহাতে শিক্ষার্থীগণের ব্যক্তিগত বিভিন্নতা বা বিশেষত্বের প্রতি আদৌ কোনও দৃষ্টি রাখা হয় না। সকলকে ঠিক একই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ত্রুটিটুকু সংশোধিত করিয়া লইতে পারিলে, লিং-প্রবর্ত্তিত ব্যায়ামপদ্ধতির দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

(৪) মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য, ও সৌষ্ঠব সম্পাদনই চতুর্থ প্রকার ব্যায়ামপদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, বহু সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মাপ লইয়া একটী আদর্শ চার্ট (chart) বা নকশা তৈয়ারী করা হয়। পরে শিক্ষার্থীগণকে এই আদর্শ নকসার সহিত নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি মিলাইয়া অসম্পূর্ণতা প্রভৃতির নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তৎপরে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদির সাহায্যে এই সমস্ত দোষ-ত্রুটীর সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। কেহ কেহ ১০।১২/ মণ জিনিষের ভারও সহ্য করিতে পারে, আবার কেহ বা এক মণ তুলিতেই চক্ষে সরিষার ফুল দেখে; কেহ একাদিক্রমে দশ ক্রোশ হাঁটিয়াও ক্লান্ত হয় না, কেহ হয়ত দুই রশি হাঁটিয়াই একেবারে এলাইয়া পড়ে। ইহা শারীরিক যন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অসম্পূর্ণতা ও অনুশীলনের একান্ত অভাবই সূচিত করিয়া থাকে। এই এই সকল দোষত্রুটির সংশোধন করাই চতুর্থ প্রকার ব্যায়াম-পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের শরীরের কোন্ স্থানে কি ত্রুটী বা অসম্পূর্ণতা আছে, এবং কিরূপেই বা উহার সংশোধন করা যাইতে পারে, তাহা জানিতে পারিলে, শিক্ষার্থীগণের মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আগ্রহের সঞ্চার হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত আমাকে অনেক অসাধ্য সাধনেও উত্তেজিত করিয়া থাকে। পারিব না, বা ইহা মানুষের পক্ষে অসাধ্য, ইহা বলিয়া আমরা অনেক সময়েই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকি বটে। কিন্তু তখন যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, অন্য কোন ব্যক্তি ইহা বা তদপেক্ষা কঠিন কাজও অনায়াসে করিয়াছে, তখন সে কিরূপে উহা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য এবং তাহাকে ঐ বিষয়ে পরাস্ত করিবার জন্য স্বভাবতঃই আমাদের মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার উদ্রেক হইয়া থাকে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা হইতে যে যথেষ্ট ফললাভের আশা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। শুধু তাহাই নহে। এই প্রকারে শারীরিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে একাগ্র সাধনা ও অভিনিবেশ প্রভৃতির দরকার হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে, চেষ্টা করিলে, তদ্দ্বারা মনোবৃত্তিনিচয়েরও উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এই ব্যায়ামপদ্ধতির যে একটা নৈতিক ফল আছে, তাহা অবশ্য

[illegible]কার্য্য। কিন্তু পদে পদে বিপদের আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে। শুধু শরীরের দিকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে, শরীর ছাড়াও মানুষের মনোযোগ দিবার যে আরও অনেক বিষয় আছে, শিক্ষার্থিগণের সে কথা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পশুর মত শারীরিক বলই মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠি নহে। শরীরের যথোপযুক্ত বলবিধান করিতে হইবে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। ইহা ছাড়া, এই প্রথার আরও একটি গুরুতর দোষের আশঙ্কা আছে।

আমরা যাহা করি বা করিতে চেষ্টা করি, তাহা যদি আমাদের প্রকৃতির অনুকূল হয়, তবে তাহা অতি সহজেই করিতে পারা যায়, এবং তদ্দ্বারা যথেষ্ট ফললাভেরও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু প্রতিকূল হইলে, উহাতে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা বেশী। ডাক্তারীতে যথেষ্ট রোজগারের সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া, যাহার চিকিৎসা-শাস্ত্রে কিছু মাত্র অনুরাগ নাই, তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেডিক্যাল্ কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলে, অনেক সময়েই অর্থনাশ ও মনস্তাপমাত্র লাভ হইয়া থাকে। মনের সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য, শরীরের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আদর্শ নকসা দেখিয়া সকলকেই একই ছাঁচে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিলে, অনেক সময়েই যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। বরং কাহার কোন্ দিকে ঝোঁক বেশী, তাহাই ঠিক করিয়া, সেই দিকে তাহাকে বিশেষ কৃতিত্ব লাভের সুযোগ ও অবসর দিলে যথেষ্ট ফললাভ হইতে পারে।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিক্ষাপদ্ধতি ও ছাত্রজীবন—এ পর্য্যন্ত আমি ১০০০—৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ের পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে এই সময়ের শিক্ষাপদ্ধতি ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

এই বিষয়ের বিবরণ বড়ই সামান্য। কিন্তু যে বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সে সময়ে, বিশেষতঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিক্ষার ব্যবস্থা একটা সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল। তখনও সমস্ত শাস্ত্র মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং সমস্ত শাস্ত্র স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকিত, এবং মুখেমুখেই পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিত।

গুরুগৃহ-বাসই ভারতীয় আর্য্যগণের শিক্ষালাভের প্রাচীনতম বিধি। এই বিধি বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় (বিষ্ণু ২৮, ১, আপস্তম্ব ১, ১, ২)। এই বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ ৮ম বর্ষে উপনয়নসংস্কারের পর, ক্ষত্রিয় ১১শ বর্ষে উপনয়নসংস্কারের পর এবং বৈশ্য ১২শ বর্ষ বয়সে উপনয়নসংস্কারের পর গুরুকুল আশ্রয় করিত। তাহারা গুরুকুলে গুরুর পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিত। গুরুকুলে থাকিয়া প্রথম শিষ্যকে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিতে হইত। গুরু ছাত্রকে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিবার উপায়গুলি প্রথমে শিক্ষা দিতেন, এবং পরে শাস্ত্রাধ্যয়ন আরব্ধ হইত। (মনু, ২য় অধ্যায়, ৬৯ শ্লোক)।

অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

মনু, ২য় অধ্যায়, ৭০ শ্লোক।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥

মনু, ২য় অধ্যায়, ৯৯ শ্লোক।

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বেদপাঠ, যাগযজ্ঞ, তপশ্চর্য্যা প্রভৃতি কামী জনের পক্ষে একান্ত নিস্ফল।

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥

মনু, ২য় অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক।

যে ব্রাহ্মণ মাত্র সাবিত্রী জানিয়া আত্মসংযম করিতে পারেন, তিনি অসংযমী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

সাবিত্রীমাত্রসারোঽপি বরং বিপ্র সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয় ॥

মনু, ৭ম অধ্যায়, ১১৮ শ্লোক।

ত্যাগ এবং উপদেশ দ্বারা আত্মসংযম লাভ হয়।

মনুতে নিম্নলিখিত শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ আছে—

ছাত্র অধ্যয়নার্থী হইয়া গুরু সমীপে উপবিষ্ট হইলে গুরু তাহাকে আবৃত্তি করিতে অনুমতি করিবেন। ছাত্র আবৃত্তি করিতে থাকিবে। যখন গুরু তাহাকে থামিতে বলিবেন, তখন ছাত্র আবৃত্তি হইতে বিরত হইবে। ছাত্র আবৃত্তির প্রথমে ও অন্তে ওঁ উচ্চারণ করিবে। গুরু এরূপ এক একটি সূত্র রচনা করিতেন, যাহাতে অধিতব্য গ্রন্থের অনেক অংশ এই সূত্রের অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইত। ছাত্র এই সকল সূত্র প্রথমে কণ্ঠস্থ করিত,—গুরু পরিশেষে ইহাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন।

প্রতিসাখ্যে লিখিত আছে, গুরু শিক্ষাদান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্বয়ং সমস্ত শাস্ত্র ও বক্তা আয়ত্ত করিয়া উপযুক্ত স্থানে টোল স্থাপন করিতেন। প্রতিসাখ্যে খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর শিক্ষাপদ্ধতির বর্ণনা আছে। যদি একটি ছাত্র গুরুর নিকট অধ্যয়নার্থী হইয়া বাস করিত, তাহা হইলে পাঠের সময় সে গুরুর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট হইত। যদি একাধিক ছাত্র থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সুবিধামত বসিয়া যাইত। প্রত্যেক পাঠের প্রথমে শিষ্যগণ গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিত, "মহাশয়, পাঠ করুন।" গুরু 'ওঁ' বলিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। গুরু প্রথমে দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু সমাসবদ্ধ বা যৌগিক শব্দ হইলে, একটি মাত্র উচ্চারণ করিতেন। শিষ্য একটি শব্দ উচ্চারণ করিত, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে, শিষ্য "ভোঃ" বলিয়া থামিত। গুরু উত্তর প্রদান করিয়া "ওঁ, ভোঃ" বলিয়া থামিতেন। এইরূপে একটি প্রশ্ন সম্পন্ন হইত। একটি প্রশ্ন শেষ হইবে, শিষ্য এই সমগ্র প্রশ্ন আবৃত্তি করিয়া ইহা কণ্ঠস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইত। প্রত্যেক বর্ণ বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিত। সাধারণতঃ, এক একটি পাঠে ৬০ টি প্রশ্ন থাকিত। সকলের শেষের প্রশ্নের শেষ অংশে গুরু "ভোঃ" বলিয়া শিষ্যকে থামাইতেন, শিষ্য সমগ্র শ্লোকটি আবৃত্তি করিত, কিন্তু আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বে বলিত, "ওঁ ভোঃ"। পাঠ সমাপ্ত হইলে গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া শিষ্যগণ চলিয়া যাইত।

ভারতীয় আর্য্যগণের শিক্ষাব্যাপারে চারিটি আশ্রম একটি বিশেষত্ব। এক এক আশ্রম তৎপরবর্তী আশ্রমের প্রবেশদ্বারস্বরূপ। পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমধর্ম্ম পালন না করিলে, পরবর্ত্তী আশ্রমে প্রবেশ ভারতীয় আর্য্যের পক্ষে দুরূহ হইত। এই রূপে তিনটি আশ্রম অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণ চতুর্থ আশ্রমে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারিত। এই আশ্রমধর্ম্ম ব্যক্তিত্বলাভেরই অনুকূল।

ব্রহ্মচর্য্য—তার পর ছাত্রজীবনের অনুশাসনগুলির উল্লেখ করিব। দীক্ষিত না হইলে, আর্য্যসন্তানের কার্য্যের উপর কোনও বিধি চলিত না। বৌধায়ন ও গৌতম সূত্রে ইহার প্রমাণ আছে (বৌধায়ন ১, ২, ৩; গৌতম ২, ১, ১)। অদীক্ষিত বালক তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিত, কিন্তু বিদ্যার্থীকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইত—

প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া শুচি হইয়া ব্রহ্মচারী দেবতা ও মনুদিগকে জলদান করিবে, নারায়ণ বা অন্যান্য দেবসেবা করিবে এবং যজ্ঞাগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করিবে। ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, মসলা, রমণী পরিত্যাগ করিবে। যে সকল দ্রব্য টক্ হইয়া গিয়াছে, তাহা ভক্ষণ করিবে না। প্রাণি-হিংসা করিবে না, তৈলমর্দ্দন করিবে না, চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিবে না। চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না। ইন্দ্রিয়সুখ, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, সঙ্গীত,

বাদ্যযন্ত্র, জুয়াখেলা, নিষ্ফল তর্ক, পরনিন্দা ও মিথ্যা কথা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবে না, কাহাকেও আঘাত করিবে না। ব্রহ্মচারী একাকী শয়ন করিবে, কদাপি শুক্রক্ষয় করিবে না। পবিত্র দেহে প্রতিবেশীর গৃহ কিংবা পল্লী হইতে ভিক্ষা করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবে ব্রহ্মচারী সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কিংবা সূর্য্যোদয়ের পরে কদাপি নিদ্রিত থাকিবে না। (মনু, ২য় অধ্যায়, ১৭৬,৮০ ; বৌধায়ন ১, ২, ৩ ; বিষ্ণু ২৮ ; আপস্তম্ব ১, ১, ৪)।

ইন্দ্রিয়সংযম বিষয়ে এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, শিষ্য শাস্ত্রাধ্যয়নের অধিকারী হইত। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী দিনে একবার মাত্র আহার করিত, এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তিনবার অবগাহন করিত। (বিষ্ণু, ২৯, ১ ৫০)।

ব্রহ্মচারী দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পারিত না (আপস্তম্ব ১, ১, ২)। ব্রহ্মচারীকে বিনয়ী, উৎসাহশীল ও কার্য্যতৎপর হইতে হইত। (আপস্তম্ব ১, ১, ৩)।

গুরুর সম্মুখে ব্রহ্মচারী কণ্ঠ আবৃত রাখিত না, আড়াআড়ি ভাবে পদদ্বয় রক্ষা করিত না, দেয়াল ঠেস দিয়া বসিত না, পা ছড়াইয়া দিত না, থুথু ফেলিত না, হাই তুলিত না, বা হাসিত না, আঙ্গুল ফুটাইত না। গুরু কোনও প্রশ্ন করিলে, শিষ্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিত। গুরু দণ্ডায়মান থাকিলে, শিষ্য বসিয়া থাকিত না ; গুরু নিম্নদেশে উপবিষ্ট থাকিলে, শিষ্যও নিম্নদেশে উপবেশন করিত। প্রতিবায়ু বা অনুবায়ুক্রমে শিষ্য কখনও গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না। (গৌতমসূত্র, ২য় অধ্যায়)।

শিক্ষকের প্রতি কর্ত্তব্য—

তৎকালে দুই শ্রেণীর গুরু ছিলেন। এক শ্রেণীর গুরুর নাম আচার্য্য, আর এক শ্রেণীর গুরুর নাম উপাধ্যায়। শিষ্য নিয়মিতরূপে বেদপাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কতিপয় ব্রতের অনুষ্ঠান করিত। ইহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যিনি শিষ্যকে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে এই সকল ব্রতপালনবিষয়ে উপদেশ দিতেন, এবং অঙ্গগুলির সহিত একটি বেদ শিক্ষা দিতেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা হইত; কিন্তু যিনি অন্য কর্ত্তৃক দীক্ষিত শিষ্যকে সমগ্র বেদ কিংবা বেদের অংশবিশেষ দক্ষিণাগ্রহণপূর্ব্বক কিংবা বিনা দক্ষিণায় শিক্ষা দিতেন, তাঁহার নাম হইত উপাধ্যায়। (বিষ্ণু, ২৯, ২)।

গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট হন, শিষ্য তাহাই কর্ত্তব্য মনে করিত, এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে গুরুর প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। যিনি সমগ্র জীবন গুরুর সেবা করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। শিষ্য সমাবর্ত্তন করিয়া গুরুকে সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণা প্রদান করিত। (মনু ২য় অধ্যায় ২২৮, ২৪৪ ও ২৪৫ শ্লোক।) মনুতে গুরু ও গুরুর পরিজনের প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। (মনু ২য় অধ্যায় ১৯৪—২০৩ শ্লোক।) বশিষ্ঠ এবং বৌধায়ন সূত্রেও শিষ্যের কর্ত্তব্যের উল্লেখ আছে।

শিষ্য কখনও অনবধানভাবে উপবেশন করিবে না। পায়ে কিংবা জানুতে কাপড় বাঁধিয়া উপবেশন অকর্ত্তব্য। শিক্ষকের নামোচ্চারণ করিতে হইলে, সেই নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' কিংবা সম্ভ্রমার্থক অন্য কোন শব্দের ব্যবহার করিতে হইবে। শিষ্য কদাপি গুরুর গমনভঙ্গির অনুকরণ করিবে না। তাঁহার বাক্যকথনেরও অনুকরণ করিবে না। যে স্থানে গুরুর নিন্দা হইতেছে, শিষ্য সেস্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। যদি কোন শিষ্য, কারণ থাকা সত্ত্বেও গুরুর নিন্দা করে, তাহা হইলে পর জন্মে সেই শিষ্য গাধা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। (মনু ২য় অধ্যায় ২০১ শ্লোক।)

বশিষ্ঠ সূত্রে লিখিত আছে, গুরু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শিষ্য পাঠ আরম্ভ করিবে, এবং পাঠ আরম্ভ করিবার জন্য গুরুকে কদাপি আদেশ বা অনুরোধ করিবে না।

(মনু ২য় অধ্যায়, ২০১)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে গুরুর সম্মুখে স্থাপন করিবে ; ব্রহ্মচারী গুরুর জন্যই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবে, নিজের জন্য কদাপি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবে না। আহারের পর শিষ্য ভোজনপাত্র স্বয়ং পরিমার্জ্জন এবং ধৌত করিবে। গুরুর জন্য কলসী ভরিয়া প্রতিদিন প্রাতে জল আনয়ন করিবে, এবং সমধ

সংগ্রহ করিবে। (আপস্তম্ব সূত্র ১, ১, ৩ ও ৪)।

অধ্যয়ন কাল—প্রাচীন কালে ব্রহ্মচারী ৪৮ বৎসর কিংবা ২৪ বৎসর গুরুকুলে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করিত। অন্ততঃ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত একটি বেদ অথবা ১ বৎসর করিয়া একটি কাণ্ড অধ্যয়ন করিত। কেহ কেহ যতদিন সমগ্র বেদ অধীত না হইত, ততদিন গুরুকুল পরিত্যাগ করিত না। কিন্তু বেদের অনুশাসন অনুসারে শিষ্যকে শুক্লকেশ না হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইত। যাহাতে শিষ্য গৃহস্থ-ধর্ম্মের অবহেলা না করে, তজ্জন্যই বোধ হয় বেদে এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে সকল শিষ্য রজনীর শেষার্দ্ধে বেদপাঠ আরম্ভ করিত, তাহারা পুনরায় নিদ্রা যাইত না। (বিষ্ণু, ৩০, ২৭)।

সাধারণতঃ, বর্ষাকালে অধ্যয়ন-বর্ষ আরম্ভ হইত, এবং প্রায় ৬ মাস কাল গুরু অধ্যাপনা করিতেন। বর্ষের প্রথমে যখন অধ্যয়ন আরম্ভ হইত, তখন উপক্রম নামে একটী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। শ্রাবন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপক্রম অনুষ্ঠিত হইত। আর, অধ্যয়ন-বর্ষের শেষে উৎসর্গন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। এই ক্রিয়া পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হইয়া অধ্যয়ন-বর্ষের পরিসমাপ্তি সূচনা করিত। শিষ্য বৎসরে মাত্র সাড়ে চারি মাস অধ্যয়ন করিবে, কোন কোন ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপ অনুশাসন দৃষ্ট হয়। (আপস্তম্ব ১, ৩, ৯)।

বৎসরের বহুদিনই অনধ্যায়রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। গৃহ্য এবং ধর্ম্মসূত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তা ছাড়া, শিষ্যগণ কার্ত্তিক মাসের ১৪ ও ১৮ তারিখে একদিন ও এক রাত্রি অধ্যয়ন করিত না। (বিষ্ণু, ৩০৪)।

শাসন—তৎকালে শারীরিক দণ্ডবিধানও বড় করা হইত না। কিন্তু মনুর ৮ম অধ্যায়ের ২৯৮—৩০০ শ্লোকে শারীরিক দণ্ডের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য অন্যায় কার্য্য করিলে, দড়ি কিংবা বংশ দ্বারা শরীরের পশ্চাৎ ভাগে প্রহার করিবে, কিন্তু অন্য অংশে প্রহার করিবে না। (মনু, ৮ম অধ্যায় ২৯৯—৩০০)।

গৌতম-সূত্রে নির্দ্দেশ আছে যে, শিষ্য অন্য কোন উপায় দ্বারা সংশোধিত না হইলে, মাত্র শারীরিক দণ্ড লাভ করিবে। যদি শারীরিক দণ্ড প্রদান অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে সরু দড়ি কিংবা সরু বেত্রখণ্ড দ্বারা শিষ্যকে প্রহার করিবে। গুরু যদি শিষ্যকে অন্য কোন উপায়ে শারীরিক দণ্ড প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন। (গৌতম ২, ৪২, ৪৩, ৪৪)।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতের শিক্ষাবিষয়ক চিত্র আপনারা কতকটা প্রাপ্ত হইলেন। এখন আমি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের শিক্ষার চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে শিক্ষার চিত্র

—এই যুগেও পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ব্বোক্ত যুগের প্রায় অনুরূপই ছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর শিক্ষার চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময়ে লিখন-কলার আবিষ্কার হইয়াছে। অধিকাংশ ভারতবাসীই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ভারতে ও ভারতের বাহিরে শিক্ষা বিস্তার করিত। বৌদ্ধ বিস্তারে তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা হইয়াছিল। তখন উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি মহাদেশ হইতে বিদ্যার্থী সমাগত হইত প্রায় প্রতি গৃহেই বহুসংখ্যক হস্তলিখিত নানাবিষয়ক পাঠ্য গ্রন্থ রক্ষিত হইত। তখন শিল্প-বিদ্যার বিশেষ আদর ছিল। সকলেই বার্ত্তা বা technology র আদর করিত। অনেক ছাত্র technology অধ্যয়ন করিত। রমণীগণ জ্ঞান-চর্চ্চায় উন্নত ছিলেন। বাৎসায়নের কাম-সূত্রে ৬৪টি কলা-বিদ্যার উল্লেখ আছে। যুবতী রমণীগণ এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা করিত। তখন যে চিত্রবিদ্যা ও স্থপতি-বিদ্যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার আভাস প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই প্রদত্ত হইয়াছে। বিবিধ বর্ণের বিন্যাস, অলঙ্কারের কারুকার্য্য, সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কলা-কৌশলে ভারতবাসী তখন বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

ললিত-বিস্তর পাঠ করিলে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর শিক্ষার একটা চিত্র পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরেই প্রথমে আমরা স্কুল বা পাঠশালার উল্লেখ পাই। বোধি সত্ত্ব বিশ্বামিত্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া ছিলেন। বিশ্বামিত্র উরগসার চন্দনফলকে মণিখচিত স্বর্ণ-লেখনী দ্বারা গৌতমকে লেখাইতেন। গৌতম বিশ্বামিত্রের নিকট সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। * তা ছাড়া, গৌতম বিবিধ ক্রীড়ায়ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য,—উল্লম্ফন, ধাবন, কুস্তি, ধনুর্ব্বেদ, দ্রুতগমন, সন্তরণ, অশ্বচালন, ও যুদ্ধবিদ্যা। কলা-বিদ্যায়ও গৌতম পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি বীণা বাজাইতে জানিতেন, সঙ্গীত করিতে পারিতেন, নাচিতে পরিতেন, কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিতেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, বুদ্ধদেবের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা ভারতে বিশেষরূপেই হইত। বাৎসায়নের কামসূত্রে যে সকল কলার উল্লেখ আছে, ভাগবত-পুরাণের শ্রীধরস্বামীর টীকায়ও তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের সময় পরিব্রাজক নামে এক সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁহারা বৎসরে প্রায় ৯ মাস কাল ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং নানা স্থানে চারিত্রনীতি, দর্শন, ও রহস্যানুভূতি অবলম্বন করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতগণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে শিক্ষার বিস্তার হইত।

ইহার পর আমি প্রাক্-মধ্যযুগের কথা বলিব। মধ্যযুগ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমি স্মিথ সাহেবের মতানুসরণ করিয়া ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগ আরম্ভ হয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, এবং ৩৩১ খৃষ্টাব্দ ও ৬৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালকে আমি প্রাক্-মধ্যযুগ বলিব।

* লেখন, অঙ্কন, গণিত, ব্যাকরণ, কবিতা, লিপিকরণ, বৈদিক শব্দের জ্ঞান, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, অভিধান, শব্দশাস্ত্র, অলঙ্কার, ছন্দ, জ্যোতিষ, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চারিত্র নীতি, শারীরবিজ্ঞান, ন্যায়, ও জন্তুপায়ী পশুপক্ষীর ভাষা।

এই যুগে আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে কয়েকটি নূতন বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা, পুরাণ, ইতিবৃত্ত বা ইতিহাস, আখ্যায়িকা এবং উদাহরণ বা গল্প, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র। রাজগণ প্রতিদিন অপরাহ্নে এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের অব্যবহিত পরেও সমগ্র শাস্ত্র লোকে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত। সপ্তপর্ণি গুহায় ৭মাস ধরিয়া বুদ্ধের উপদেশ-মালা তাঁহার শিষ্যবর্গ তানসংযোগে কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। বিনয়-পিটকের একটি খণ্ডের নাম পরিবার-খণ্ড। এই খণ্ডে তাৎকালিক শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুঙ্গরাজগণের সময়ে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত বিষয়ের অধ্যাপনা হইত। এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্রগণ শিক্ষণীয় বিষয় কণ্ঠস্থ করিত। ব্যাকরণ শাস্ত্র হিন্দুগণের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ হইতে আমরা তাৎকালিক শিক্ষার কতিপয় প্রমাণ প্রাপ্ত হই। ফা-হিয়ান বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহার বিবরণে অনেকটা একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু প্রতিষ্ঠান বা হিন্দু সভ্যতামূলক বিশেষ কোনও বিবরণ তাঁহার ইতিবৃত্তে স্থান লাভ করে নাই। তাঁহার ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, তৎকালে উত্তর ভারতে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল। এই সকল বিহারে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত অবস্থান করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতি বক্তৃতামূলক ছিল। তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, সেরূপ পার্থিব বিষয়েও বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতার জন্য পুস্তক ব্যবহৃত হইত না। পণ্ডিতেরা স্মৃতির সাহায্যে বক্তৃতা করিতেন। তখন সঙ্গীতের চর্চ্চাও হইত। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখিত পুস্তকের বড়ই অভাব ছিল, কিন্তু বল্কল ও তালপত্রে লিখিত তৎকালীন পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার বিবরণীতে তাৎকালিক শিক্ষাপদ্ধতির চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষ-চরিতেও তাৎকালিক শিক্ষার চিত্র কিঞ্চিৎ অঙ্কিত আছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্ষবর্দ্ধনের পিতার মৃত্যু হয়। বাণভট্ট হর্ষের পিতৃ-শোক বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে দক্ষ ছিলেন, সন্ন্যাসীরা আত্মতত্ত্বে উন্নত ছিলেন, বৈদান্তিকেরা পৃথিবীর অসারতা উপলব্ধি করিতেন এবং কি উপায়ে লোকের শোক দূর করা যায়, তাহা পৌরাণিকেরা জানিতেন।

হুয়েন-সাঙ-লিখিত নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ছাত্রগণ বক্তৃতা শুনিত এবং ধর্ম্মবিষয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইত। তখন পাঠ্য বিষয় পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশের নাম ছিল ত্রয়ী-বিদ্যা। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্কবিজ্ঞান এই ত্রয়ী-বিদ্যার অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় অংশের নাম চতুর্ব্বিদ্যা। গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও সঙ্গীত চতুর্ব্বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া, আরও তিনটি বিদ্যা অধীত হইত—আয়ুর্ব্বেদ, যাদুবিদ্যা ও সাংখ্য। সংস্কৃত ও পালি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যও পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নালন্দায় বক্তৃতা হইত। ছাত্রেরা সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিত। প্রতিদিন পণ্ডিতেরা শতসংখ্যক মঞ্চ হইতে বক্তৃতা প্রদান করিত। নালন্দায় শিল্প,বিজ্ঞান, ও জ্যোতির্বিদ্যার (astrology চর্চ্চা হইত না।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতেও বৈদিক শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং ৭ম শতাব্দীতে ভারতে আসেন। তাঁহার বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, ৬ বৎসরের সময় আর্য্যসন্তানগণ শিক্ষা আরম্ভ করিত। এই বয়সেই তাহারা ৪৯ বর্ণমালা এবং ১০,০০০ যুক্তাক্ষর শিক্ষা করিত। ৮ বৎসর বয়সে তাহারা পাণিনি ব্যাকরণের পাঠ পরিসমাপ্তি করিত। তৎপর খিল অধীত হইত। ১৫ বৎসর বয়সে তাহারা ব্যাকরণের টীকা প্রভৃতি আরম্ভ করিত। মুখে মুখে বেদ শিক্ষা হইত—বেদ কাগজে লিখিয়া রাখা হইত না। কোন কোন ব্রাহ্মণ ১০০০০০ সূক্ত অবাধে আবৃত্তি করিতে পারিত।

যাহারা বেদ পড়িবে বলিয়া স্থির করিত, তাহারা গুরুকুলে ২০ বৎসরের পর আরও ৮ বৎসর বাস করিত। বেদার্থী ছাত্র ঋক্ বেদের দশ খণ্ড, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রগ্রন্থাদি অর্থাৎ ব্যাকরণ, ব্যুৎপত্তিবাদ, শব্দখণ্ড, অলঙ্কার, ছন্দ ও যজ্ঞক্রিয়াদি আয়ত্ত করিত। আট বৎসরে প্রত্যেক বিদ্যার্থী অনধ্যায়ের দিনগুলি বাদ দিয়া ৩৮৪ দিন পড়িতে পাইত; এই সময়ে প্রত্যেক বিদ্যার্থীই ৩০,০০০ স্তোত্র আয়ত্ত করিত।

ইহার পরে আমি মধ্যযুগের শিক্ষাপদ্ধতির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্মিথ সাহেবের মতে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে ১৭৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত মধ্যযুগ। আমি এস্থলে স্মিথ সাহেবের মতেরই অনুসরণ করিব।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যার্থীরা বিখ্যাত অধ্যাপকগণের অধীনে থাকিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ভবভূতি-কৃত মালতীমাধব নাটকে সে সময়ে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা হইত, তাহার উল্লেখ আছে। নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞান-দীপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। পঞ্জাব ও ভারতের পশ্চিমাংশে ক্ষত্রিয়গণের সহিত স্থানীয় রাজন্যবর্গের সংঘর্ষে প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চ্চা অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার স্থানীয় রাজন্যবর্গ সংস্কৃতের আদর করিতেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লিখিত দুইখানি

অজ্ঞাতনামা নাটকের অংশ আজমীরে কৃষ্ণপ্রস্তরফলকে খোদিত হইয়াছিল॥ ইঁহাদের একখানি আজমীরের বিশালদেবের সম্মানার্থ লিখিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পাল-রাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। গোপাল হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য ওদন্তপুরীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল বিক্রমশিলায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বোধ হয়, এই বিদ্যালয়টি ভাগলপুরস্থ পাথর ঘাটায় ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০৮ জন পণ্ডিত শিক্ষা দিতেন। বিক্রমশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিদ্যার্থীদের একটি সত্র সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সত্রে বিদ্যার্থীগণ বিনাব্যয়ে আহার পাইত। ১৩শ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্ত্তমান ছিল।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে হিন্দু-শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। গরুড়স্তম্ভ লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখনও চতুর্ব্বেদ পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (গৌড়লেখমালা ৮১ পৃষ্ঠা)। এই গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে আগম, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ন্যায়, কাব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও ইতিহাসেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। (গৌড়লেখমালা ৮৩ ও ৮৪ পৃষ্ঠা)। বীরদেব-প্রশস্তিতে দেবপালের সময় বৌদ্ধশাস্ত্র-চর্চ্চার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই সকল শিলালিপি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। বীর-দেবপ্রশস্তি-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বীরদেব সমগ্র বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পেশাবরের নিকটবর্ত্তী কণিষ্ক-মহাবিহারে গমন করিয়াছিলেন। (গৌড়লেখমালা ৫১ পৃষ্ঠা)। গয়ার কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও প্রাচীন কালের ন্যায় সমগ্র বেদ বিশুদ্ধ ভাবে কণ্ঠস্থ করা হইত। বৈদ্যদেবের তাম্রফলকেও দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদপাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন উপনিষদও অধীত হইত। (গৌড়লেখমালা ১৪৫ পৃষ্ঠা)।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি জ্যোতিষ, তন্ত্র, স্মৃতি, গণিত, বেদ, আগম,আয়ুর্ব্বেদ ও শারীর বিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ভবদেব ভট্ট দশম শতাব্দীর লোক। তিনি বঙ্গের হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গের শেষ সেনরাজ সংস্কৃত শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভবতঃ জয়দেব তাঁহারই সভাকবি ছিলেন।

এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীতেও নবদ্বীপ সংস্কৃতচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান ছিল। মিথিলাও নবদ্বীপের সমকক্ষ ছিল। এই দুই স্থানেই ন্যায়ের চর্চ্চা হইত। শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপে ন্যায়, স্মৃতি এবং জ্যোতিষেরও চর্চ্চা হইত। সম্রাট আকবরের সময় বারাণসী হিন্দুশাস্ত্রচর্চ্চার কেন্দ্রস্থান ছিল বলিয়া আইন-ই-আকবরীর ৫৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

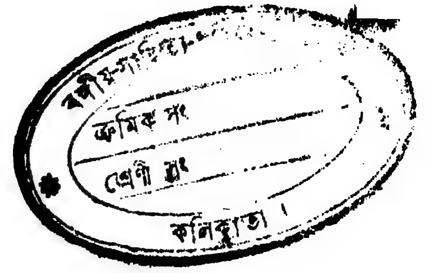
বোধ হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গুরুগৃহবাস-পদ্ধতি টোলশিক্ষা-পদ্ধতির আকার ধারণ করে ৮এই টোল-শিক্ষা-পদ্ধতি বর্ত্তমান সময়েও চলিতেছে এবং সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের টোলগুলিতে জাতীয় শাস্ত্রশিক্ষার উন্নতির জন্য অর্থদান করিয়া হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

জ্ঞান ও ভক্তি

জ্ঞানীরূপে তোমা যবে চাহিনু জানিতে,
চক্রবাল সম গেলে দূরে—অতি দূরে;
ভক্তরূপে আজি হেরি মনের মন্দিরে
রয়েছ নিকটতম মোর অন্তঃপুরে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ।



প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রসায়ন চর্চ্চা *

বর্ত্তমান যুগকে অনেকে 'বৈজ্ঞানিক যুগ' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে, জীবন-সংগ্রামে, শিল্প-বাণিজ্যে, কৃষি-পরিচালনে, স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, প্রত্যেক বিষয়েই বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়ন বিজ্ঞান অন্যতম। আধুনিক রসায়ন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য জিনিষ। ইহার উন্নতি-কল্পে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্য করে নাই। পাশ্চাত্য খণ্ডে রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতি-কল্পে যে কঠোর চেষ্টা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, আমরা তাহার বিশেষ কোন খবর পর্য্যন্ত রাখি না। এতদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? গত বৎসরে বৈজ্ঞানিক জগতে কি পরিমাণ রসায়ন চর্চ্চা হইয়াছে, তাহার একটা অতি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

* ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের [illegible] অধিবেশনে পঠিত।

পাশ্চাত্য খণ্ডে রসায়ন-চর্চ্চা-নিরত ব্যক্তিগণের গবেষণা-রাশির ফলাফল জগতে প্রচার করার জন্য বহু পত্রিকা রহিয়াছে। জগতের কোথায় কি গবেষণা হইতেছে, এবং এ পর্য্যন্ত কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণ গবেষণা হইয়াছে, ঐ সকল পত্রিকা পাঠে তাহা জানা যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ পত্রিকার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সম্প্রতি এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে, এবং কোন কোন পত্রিকার কলেবরও এরূপ বিশাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকের পক্ষেই উহাদের সকলগুলি পাঠের সময় বা সুবিধা হইয়া উঠে না। কাজেই কোন কোন বৈজ্ঞানিক পরিষৎ বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রতি বৎসর যে সকল গবেষণা হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকাকারে একত্র প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই সকল বিবরণী পাঠে বিজ্ঞানের কোন্ নির্দ্দিষ্ট শাখায় সমগ্র জগতে কি পরিমাণ গবেষণা হইয়াছে, তাহার একটা মোটামোটি হিসাব পাওয়া যায়। লণ্ডন রাসায়নিক পরিষৎ (Chemical So-

ciety of London) কর্ত্তৃক প্রকাশিত রসায়ন বিজ্ঞানের [illegible] বাৎসরিক বিবরণী অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

আলোচনার সুবিধার জন্য রসায়ন-বিজ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধেও তাহা করা সঙ্গত বোধ করিয়াছি।

(১) প্রাকৃতিক রসায়ন
(Physical Chemistry.)

রসায়ন বিজ্ঞানের যে অংশ প্রাকৃতিক রহস্য-সমূহ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত, তাহাকে "প্রাকৃতিক রসায়ন" বলা যায়। গত বৎসর এই বিভাগে যে সকল উল্লেখযোগ্য গবেষণা হইয়াছে নিম্নে বিষয়ানুসারে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পরমাণবিক গঠন ও রৈখিক বর্ণচ্ছত্র
(Atomic Structure and Line Spectrum)

রেডিয়ম-তত্ত্ব-বিশারদ অধ্যাপক রাথারফোর্ড (Rutherford) কিছুদিন হইল পরমাণু-সমূহের গঠন সম্বন্ধে এক নূতন মত প্রকাশিত করিয়াছেন। রাথারফোর্ডের মতে প্রত্যেকটি পরমাণু কৈন্দ্রিক ও পারিপার্শ্বিক, এই দুই অংশে বিভক্ত। কৈন্দ্রিক অংশ একটি ধনাত্মকসংহতি (Positively charged nucleus), এবং উহার ব্যাস সম্পূর্ণ পরমাণুর ব্যাসের শতভাগের একভাগেরও কম। কৈন্দ্রিক ধনাত্মক সংহতিটি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি বেষ্টিত পৃথিবীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাঞ্চল্যময় ঘূর্ণামান ঋণাত্মক তাড়িতাণু (negative electrons) দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা আয়তনে অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও পরমাণুস্থিত বস্তুমানের (Mass) প্রায় সবটুকু, ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ধনতাড়িতাণুর অতিরিক্ত ধনশক্তি (Positive Energy) এই অংশেই সীমাবদ্ধ। ঋণ-তাড়িতাণুর তুলনায় কৈন্দ্রিক অংশস্থিত ধন-তাড়িতাণুর আধিক্যবাচক সংখ্যা কাহারও কাহারও মতে আবর্ত্তন-প্রবণ-নির্ঘণ্টে (Periodic table) মৌলিক-পদার্থ সমূহের (Elements) সংখ্যার ঠিক সমান বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সংখ্যাটি পরমাণবিক-সংখ্যা (Atomic number) নামে পরিচিত। মৌলিক পদার্থ-নিচয়ের রাসায়নিক প্রকৃতি, এবং এমন কি ব্যস্তবর্ণের প্রকৃতি (nature of Spectrum) পরমাণবিক সংখ্যার সহিত সম্বন্ধবদ্ধ।

এ স্থলে প্লেঙ্কের পরিমাণ-সিদ্ধান্ত (Plank's Quantum Hypothesis) সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্লেঙ্ক তাপ-গণিত বিজ্ঞানের(Thermo-dynamics)সাহায্যে গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বস্তুকণা-সমূহ ধারাবাহিক ভাবে বা ধীরভাবে কখনও শক্তি ক্ষরণ বা গ্রাস করিতে পারে না; পক্ষান্তরে পূর্ব্বোক্ত রূপ ক্রিয়া হঠাৎ ও নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ প্লেঙ্কের সিদ্ধান্ত অনুসারে পদার্থ-নিচয়ের সর্ব্বপ্রকার শক্তি-পরিবর্ত্তন (Energy change) রাসায়নিক-পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার (Chemical change) অনুরূপ।

রাথারফোর্ড ও প্লেঙ্কের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তদ্বয়ের মূলতত্ত্ব প্রয়োগে বহর (Bohr) হাইড্রোজেন (Hydrygen) ও হিলিয়মের (Helium) বর্ণচ্ছত্র-রেখা সমূহের (Spectrum lines) অতি সুচারু ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে বহর যে সূত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা দ্বারা কোন্ মৌলিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে কতটি রেখা থাকিবে তাহা এবং উহাদের অবস্থান প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচে গণনা করিয়া বলা যায়। এইরূপে বহু অব্যাখ্যাত বিষয়ের কিনারা হইয়াছে।

ষ্টার্ক (Stark) হাইড্রোজেন বর্ণচ্ছত্রের উপর তাড়িত ক্ষেত্রের (Electric field) ক্রিয়া, মৌলিক পদার্থ-সমূহের দ্রুত-কম্পমান বর্ণচ্ছত্রের (High frequency spectra) পরস্পর সম্বন্ধ, বর্ণচ্ছত্র-রেখা উৎপাদন করিতে প্রয়োজনীয় তাড়িতশক্তির ন্যূনমাত্রা (Minimum Voltage) প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা-মূলক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বহরের সূত্রানুসারে তাহার প্রত্যেকটির অতি সুন্দর ব্যাখ্যা

করা যায়। এই সকল কারণে হাইড্রোজেন্ ও হিলিয়মের বর্ণচ্ছত্রের প্রতি বৈজ্ঞানিকগণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত বহু মনোহর ও চিত্তাকর্ষক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গটী হৃদয়গ্রাহী হইলেও অত্যন্ত জটিল, এবং অনেকাংশে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বহির্ভূত ও পদার্থবিজ্ঞানান্তর্গত বলিয়া এস্থলে ইহার বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হওয়া গেল।

হিলিয়মের বাস্তবর্ণে কতকগুলি নূতন রেখা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহারা বহ্‌রের সিদ্ধান্তের প্রত্যয়জনক চূড়ান্ত প্রমাণ। তিন বৎসর পূর্ব্বে ফাউলার (Fowler) হাইড্রোজেন্ ও হিলিয়ম মিশ্রণ বর্ণচ্ছত্রে এই রেখাসমূহ সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। তৎকালে উহারা হাইড্রোজেন্-সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। বহ্‌রের সূত্রানুসারে যে হিলিয়ম পরমাণু হইতে দুইটীর মধ্যে একটি তাড়িতাণু (Electron) হৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রেখাসমূহ প্রদর্শিত হইতে পারে। ফাউলার স্বতন্ত্ররূপে ও স্বাধীনভাবে সংগৃহীত অকাট্য প্রমাণের বলে বহ্‌রের অনুমানই সত্য বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। অধিকন্তু ষ্টার্ক অতি বিশুদ্ধ হিলিয়মের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-স্ফুরণ (Electric discharge) কালে উক্ত শ্রেণীর রেখা লক্ষ্য করিয়াছেন।

পূর্ব্বে নিকল্‌সন্ (Nicholson) নক্ষত্র-সমূহের বর্ণচ্ছত্রে যে সকল অনির্ব্বাচিত রেখা লক্ষ্য করিয়াছেন, বহ্‌রের গণনার পর তাহারা হিলিয়ম্ ও লিথিয়ম্ (Lithium)-সঞ্জাত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই একটি মাত্র উদাহরণ হইতেই রাথারফোর্ডের পরমাণুবাদ ও বহ্‌রের সূত্রের সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বহ্‌রের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক হইলেও, হাইড্রোজেন্ পরমাণুর বর্ণচ্ছত্র-সম্পর্কিত ২।১ টি বিশেষত্ব এখনও অপ্রক্রিপন্ন রহিয়াছে।

দার্শনিকশ্রেষ্ঠ কণাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু তত্ত্বদর্শী মনিষী এ পর্য্যন্ত পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের উৎপত্তি, পরিণতি ও অন্তিম বা মূল অবস্থা সম্বন্ধে স্ব স্ব চিন্তার ফল স্বকপোল-কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তাকারে জগতের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এবং উহাদের প্রত্যেকটির অনুকূলেই নানারূপ যুক্তির অবতারণা হইয়াছে। অবশ্য, উহাদের প্রত্যেকটিই কল্পনামূলক অর্থাৎ উহাদের চাক্ষুষ প্রমাণাভাব, এবং অনেক স্থলে একটির সহিত অন্যটির কোনও সৌসাদৃশ্য নাই। কাজেই কঠিন-পরীক্ষা-প্রিয় প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনার কমবিচিত্র-কারুকার্য্যে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করিয়া কোনটিকেই অভ্রান্ত বা চূড়ান্ত বলিয়া এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। বস্তুনিচয়ের চরম অবস্থা নির্ণয় ও প্রকৃতির বাস্তব-রাজ্যের নিগূঢ়তম তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা একই কথা। রাথারফোর্ডের মত গৃহীত হোক বা না হোক, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, এই পরমাণুতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া ষ্টার্ক, বহ্‌র, মোস্‌লে (Moseley), কার্টিস্ (Curtis)-প্রমুখ মহাপণ্ডিতগণ সম্প্রতি যে সকল মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই অতুল আনন্দ পাইবেন।

ধাতব বাষ্পের বর্ণচ্ছত্র

(Spectra of Metallic Vapours)

বহ্‌রের পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রদ্বারা যদিও হাইড্রোজেন্, হিলিয়ম্ প্রভৃতি লঘুপরমাণুভার-বিশিষ্ট অনিল (gas) পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ বটে, কিন্তু ঐ সূত্রের সাহায্যে গুরু-পরমাণুভারবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ও অনৈক্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। ধাতব বাষ্পের বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে, এবং নানা উপায়ে সংগৃহীত প্রমাণাদি হইতে দেখা যায় যে,ব্যস্তবর্ণ-মধ্যস্থ বিভিন্নরেখা-সমষ্টি বিভিন্ন কেন্দ্রসমুদ্ভূত। কোন কোন স্থলে এই সকল কেন্দ্রের প্রকৃতি এবং যে সকল অবস্থায় উহারা নানারূপ বিশেষত্ব-দ্যোতক আলোক বিকিরণ করে তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এতৎ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি বিশেষ গূঢ়ার্থপ্রকাশক তথ্যের উল্লেখ করা গেল :—

(১) অবস্থাভেদে পারদ,দস্তা (Zinc)প্রভৃতি কোন কোন ধাতুর বাষ্প হইতে একটিমাত্র রেখাযুক্ত বর্ণচ্ছত্র (Single

line Spectra) প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অধুনা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যখন ঐ সকল ধাতব বাষ্প নির্দ্দিষ্ট সীমা-মধ্যস্থ-শক্তিযুক্ত তাড়িতাণুদ্বারা অতিক্রমিত হয়, কেবল তখনই একটি রেখাযুক্ত বর্ণচ্ছত্র দৃষ্ট হয়। তড়িৎ-শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া একটি নির্দ্দিষ্টসীমা অতিক্রম করিলে একরৈখিক বর্ণ-চ্ছত্রের (Single line Spectra) পরিবর্ত্তে বহুরৈখিক বর্ণচ্ছত্র (Multiple line spectra) দৃষ্ট হয়। যে সীমা মধ্যে তাড়িতাণুর শক্তি আবদ্ধ থাকিলে পারদের একরৈখিক বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহা সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হইয়াছে—এবং প্লেঙ্কের পুরিমাণ-সিদ্ধান্ত সাহায্যে নিরূপিত সংখ্যার সঙ্গে উহার ঐক্য আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পারদ কি পরিমাণ তাড়িত-শক্তির প্রভাবে একরৈখিক বা বহুরৈখিক বর্ণচ্ছত্র প্রদর্শন করে, তাহা বহ্‌র প্রবর্ত্তিত সূত্র সাহায্যে গণনা করিয়া নিরূপণ করা যায়। অবশ্য এই সূত্রের সার্ব্বত্রিক প্রয়োগের সময় এখনও হয় নাই। এই গবেষণা আরও বৃহত্তর গবেষণার অন্ত-র্ভুক্ত ও উহার প্রথম সোপান মাত্র। কেড্‌মিয়াম (Cad-mium) ও জসদ্ সম্বন্ধে অনুরূপ সত্য এখনও পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় সিদ্ধহস্ত কর্ম্মী যেরূপ পূর্ণোদ্যমে গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে প্রাকৃতিক-রসায়নের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কুহেলীময় কঠোরসমস্যা বিশদ ভাবে নিরাকৃত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(২) পরিস্রবণোন্মুখ (In the course of distillation) ধাতব-বাষ্পের ভিতর দিয়া বিদ্যুল্লাট-ত্রাণ (Electric arc discharge)-জনিত উদ্দীপ্ত আলোকাভাস (glow)তড়িন্মূলক প্রদেশ (Electric field) অতিক্রম করার পরও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অনুভবযোগ্য ভাবে অবস্থান করে। সম্প্রতি মাননীয় ষ্ট্রাট (Hon. Strutt) দশ প্রকার ধাতব বাষ্পকে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে আলোকিত বাষ্প-ধারাকে কোনও ঋণ-তড়িদ্ব্যূহের (Negatively electri-fied net) ভিতর দিয়া চালনা করিলে ঐ আলোক সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে আলো-কিত কেন্দ্রসঙ্ঘে ধনতাড়িতকণা বিদ্যমান।

(৩) একই মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃ-তির বর্ণচ্ছত্র প্রদান করে। যে সকল নির্গমন-কেন্দ্র এরূপ হওয়ার জন্য দায়ী তাহাদের প্রকৃতি বা সত্ত্বা নিরূপণ-কল্পে সশিষ্য ষ্টার্ক বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন। পরীক্ষার ফল সহজে বা সংক্ষেপে বিবৃত করা অসম্ভব বিধায় একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল। এক সময়ে রুঞ্জে (Rounge) পেস্কেন (Pas-chen) প্রমুখ কাহারও কাহারও মতে হিলিয়ম দুইটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ-জনিত বলিয়া গণ্য ছিল। হিলিয়মের বর্ণচ্ছত্রে দুইটি সুস্পষ্ট, স্বতন্ত্র শ্রেণীর রেখা-সমষ্টি দৃষ্ট হওয়াই এরূপ মত পরিপোষণের শ্রেষ্ঠতম হেতু। কিন্তু ষ্টার্ক দেখাইয়াছেন যে, এক শ্রেণীর রেখা-সমষ্টি একক-সংখ্যক ধনাত্মক শক্তিকণাবিশিষ্ট পরমাণুসম্ভূত। অন্য শ্রেণীর রেখাসমূহ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এই উভয়বিধ শক্তিকণাযুক্ত পরমাণু হইতে উৎপন্ন। ষ্টার্ক আরও দেখাইয়াছেন যে, মৌলিক পদার্থে বিদ্যুল্লাট (Electric arc) এবং বিদ্যুৎস্ফুরণ (Eletric spark) দ্বারা প্রাপ্ত রেখাসমূহের যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা রেখা রাশির উৎপাদন প্রণালীর সহিত সম্বন্ধবদ্ধ।

(৪) কেথোড-রশ্মি (Cathode rays) দ্বারা কোন বিরলীকৃত (Rarefied) বায়বীয় পদার্থকে প্রতিঘাত করিলে যে আলোক উদ্ভূত হয় তাহার বর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সিলিজার (Sceliger) দেখান যে, আক্রমণ-কারী কেথোড-রশ্মির বেগ হ্রাস করিলে আলোকের বর্ণ নীল হইতে ক্রমে লোহিতের দিকে অধোগামী হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই প্রণালীতে পরীক্ষা দ্বারা, বিভিন্ন বায়বীয়-পদার্থে যে যে অবস্থায় বন্ধনীযুক্ত-বর্ণচ্ছত্র (Band spectra) উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে সিলিজার ধাতব-বাষ্পের মধ্য দিয়া দীপ্তি-ত্রাণ (Glow dis-charge) পরীক্ষা করার সরল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, এবং একদিকে ঋণ-দীপ্তির (Negative glow) সহিত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ-সঞ্জাত বর্ণচ্ছত্রের, অপর দিকে ধনদীপ্তির

(Positive glow) সহিত বিদ্যুৎবিকাশজাত বর্ণচ্ছত্রের সৌসাদৃশ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

অন্তর্হিত বর্ণচ্ছত্র
(Absorption Spectra)

কয়েক বৎসর যাবৎ অন্তর্হিত-বর্ণচ্ছত্র সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা চলিতেছে এবং আলোচ্য বর্ষেও তাহার কোনক্রটি হয় নাই। অধিকাংশ স্থলেই জৈব-পদার্থ বিশেষের আভ্যন্তরীণ অঙ্গবিন্যাস (Internal Structure) নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য জড়-পদার্থের পরীক্ষাও একেবারে বাদ পড়ে নাই।

এক সময়ে রসায়নবিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে বসায়িক কিটোন্ (Aliphatic ketone) শ্রেণীর প্রত্যেকটী দ্বারা একই নির্দ্দিষ্ট রশ্মি অন্তর্হিত হইয়া থাকে, এবং ভিন্ন ভিন্ন কিটোনের এই অন্তর্হিত-রশ্মিবন্ধনীর (Absorption Band) অবিচলিতত্ব (Persistency) ভিন্নমাত্রিক, ও এই স্বধর্ম্মসূচক বন্ধনীর অটলতার সহিত কিটোনের রাসায়নিক কর্ম্ম-ক্ষমতার সম্বন্ধ আছে। কিন্তু সম্প্রতি বিশুদ্ধতর বস্তু লইয়াও উন্নততর প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, এবং কিটোনের রাসায়নিক-গঠনের প্রকৃতি অনুসারে অন্তর্হিত-বন্ধনীর স্থান (Position) পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই বিভাগের একনিষ্ঠ কর্ম্মী বেলি (Baly) ২৩টী Mono-substituted benzene পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহাদের কর্ম্মক্ষমতা অন্তর্হিত বর্ণচ্ছত্রে প্রতিফলিত হয়।

এ পর্য্যন্ত মৌলিক-পদার্থ সমূহের অন্তর্হিত-বর্ণচ্ছত্রের সহিত উহাদের উপাদানভূত মৌলিক-পদার্থ নিচয়ের বর্ণচ্ছত্রে দৃষ্ট রেখারাশির কোনও সংখ্যাবাচক সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেলি ও তাঁহার সহযোগীগণের গবেষণার পর মনে হয় যেন ইহার ভিতরও কোনও একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম রহিয়াছে। বেলি বলিতেছেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের অন্তর্হিত-বন্ধনী-কেন্দ্র সমূহ (Centres of the absorption bands) অপ্রশস্ত-তরঙ্গ অদৃশ্য-লোহিত আলোক (Short-wave ultra-red) স্থিত নির্দ্দিষ্ট প্রাথমিক বা মূল কম্পন সংখ্যার (Fundamental frequency) পূর্ণরাশি গুণীতক (Integral multiple); অর্থাৎ যদি প্রাথমিক কম্পন সংখ্যাকে এক ধরা হয় তাহা হইলে $১\times২=২$, $১\times৩=৩$, $১\times৪=৪$ প্রভৃতি কম্পনসংখ্যাবাচক রশ্মি-সমূহকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন অন্তর্হিত-বন্ধনী আবির্ভূত হইবে।

বেলীর সিদ্ধান্ত যদিও সুকল্পিত,তথাপি আলোক অন্তর্ধান ব্যাপারের প্রত্যেকটী বিশেষত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে একাধিক প্রাথমিক কম্পন-সংখ্যার অস্তিত্ব কল্পনা করার প্রয়োজন। এইরূপ কল্পনার সুবিধা এই যে ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্হিত বন্ধনীর বিভিন্ন মাত্রিক প্রাখর্য্যের (Intensity) সুন্দর ব্যাখ্যা করা যায়। একটি উদাহরণ দ্বারা কথাটা সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা গেল। যদি কোন পদার্থের নির্দ্দিষ্ট প্রাথমিক কম্পন-সংখ্যা সমূহ যথাক্রমে ২, ৩, ৪ হয়, তাহা হইলে ১২ দ্বারা সূচিত কম্পন-সংখ্যা-রশ্মিকে কেন্দ্র করিয়া যে অন্তর্হিত বন্ধনী উৎপন্ন হইবে তাহা অত্যন্ত প্রখর হইবে, কারণ এই স্থানে প্রত্যেকটী প্রাথমিক কেন্দ্র-সংখ্যা-জাত বন্ধনী পাওয়া যাইবে। কিন্তু ৯ দ্বারা সূচিত কম্পন-সংখ্যা-রশ্মিকে কেন্দ্র করিয়া যে বন্ধনী উৎপন্ন হইবে, তাহা একমাত্র ৩এর গুণনীয়ক, পক্ষান্তরে ২ ও ৪ এর গুণনীয়ক নহে বলিয়া এই স্থলে উৎপন্ন বন্ধনী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইবে।

নিরপেক্ষ সমালোচনা করিলে বেলীর পূর্ব্বোক্ত মতের একটি দোষ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। দৃষ্ট বর্ণচ্ছত্রের (Visible spectra) পরপারস্থিত অদৃশ্য লোহিত-রশ্মিকে প্রাথমিক কম্পন-সংখ্যা কল্পনা করিলে বর্ণচ্ছত্রের অপর পারস্থিত অদৃশ্য-পিঙ্গল-রশ্মি (Ultra-Violet rays) মধ্যে উহার গুণনীয়কের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, যে কোনও রশ্মিই অন্তর্হিত হউক না কেন বেলীর সিদ্ধান্ত সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করা যায়।

অধিকাংশ পদার্থেরই দ্রবাবস্থায় আলোক-অন্তর্হরণ পরীক্ষা করা হয়; কাজেই অন্তর্হিত-রশ্মি পরিচায়ক বন্ধনী সমূহের কেন্দ্রের সম্বন্ধনির্ণয় সহজ নহে, কারণ উহাদের অবস্থান

অনেকটা দ্রাবকের প্রকৃতি ও দ্রবের নিবিড়তার (Density) উপর নির্ভর করে। যে অবস্থায় পরীক্ষাধীন পদার্থের অণুসমূহ অন্য কোন পদার্থের সংস্পর্শে বা আক্রমণ-সীমায় না আসে (যথা বাষ্পীয় অবস্থা), একমাত্র সেই স্থলেই বেলী-প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্তরূপ সম্বন্ধ গ্রাহ্য।

পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, কোন দ্রাবকে (Solvent) দ্রবীভূত পদার্থের অন্তর্হিত-বন্ধনীর অবস্থান আধান-পদার্থের (Medium) তির্য্যগ্‌বর্ত্তন-মাত্রা (Refractive index) অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তাহার পর আর এরূপ সংস্কার পোষণ করা চলে না। বেলীর মতে অন্তর্হিত বন্ধনীসমূহের স্থানপরিবর্ত্তন দ্রবনীর ও দ্রাবকের আপেক্ষিক আকর্ষণ (Specific attraction) ভেদে প্রাথমিক কম্পন সংখ্যার (Fundamental frequency) পরিবর্ত্তন অনুসারে সাধিত হয়। এতৎ সম্পর্কিত পরীক্ষার ফলরাশি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন পদার্থে ক্রমে বর্দ্ধমান-পরিমাণ দ্রাবক যোগ করিতে থাকিলে, প্রথমতঃ, অন্তর্হিত বন্ধনীসমূহ বর্ণচ্ছত্রের লোহিতাংশের দিকে ক্রমে সরিয়া নির্দ্দিষ্ট কম্পনসংখ্যা বাচক স্থান পর্য্যন্ত গমন করে। কিন্তু তাহার পর দ্রবকে যতই তরলতর করা যা'ক না কেন, অন্তর্হিত বন্ধনীর কেন্দ্রসমূহ পুনরায় ক্রমে অধিকতর কম্পনসংখ্যামূলক প্রদেশের দিকে সরিতে আরম্ভ করে। দ্রাবকের পরিমাণ যখন খুব বেশী হয়, তখন উহা এক ঊর্দ্ধসংখ্যক কম্পন-সংখ্যাবাচক স্থানে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে। কোন পদার্থের বাষ্পীয় অবস্থায় বিশেষত্বদ্যোতক অন্তর্হিত কম্পনসংখ্যায় ও শেষোক্ত কম্পন-সংখ্যায় কোনও প্রভেদ নাই।

মেকলেণ্ড (Mecland) জৈব পদার্থের অন্তর্হিত বন্ধনীর কেন্দ্র নির্দ্দেশ করার সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের আর এক প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই স্থলে কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, অণুমধ্যস্থ কৈন্দ্রিক সংহতির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকার কক্ষে (Circular orbit) ঘূর্ণ্যমান তাড়িতাণু সমূহই আলোক অন্তর্হরণ করিয়া থাকে। অণুস্থিত পরমাণু সমূহের সংযোগপ্রণালীর উপর পূর্ব্বোক্তরূপ কক্ষের পরিধি নির্ভর করে। তাড়িতাণুসকলের পরস্পর মিলিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ; কাজেই উহাদের সংযোগ-ক্রিয়ার প্রকৃতি ঠিক করিলেই অন্তর্হিত বন্ধনীর কেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই নিয়ম-প্রয়োগে বিভিন্ন জাতীয় বহু জৈব পদার্থের অন্তর্হিত বন্ধনীর কেন্দ্র আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইয়াছে।

মৌলিক পদার্থের দেহান্তর

(Transmutation of elements)

বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম উপায়ে নিকৃষ্টতর ধাতুকে রূপান্তরিত করিয়া স্বর্ণ প্রস্তুতের আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন কাল হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। মধ্যযুগে আরব দেশেই ইহার চরম নিষ্ফল চেষ্টা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এক মৌলিক পদার্থকে যে রূপান্তরিত করিয়া অন্য মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যায়, এইরূপ বিশ্বাসকে অজ্ঞতার পরিচায়ক ও হাস্যাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু রেডিয়াম্ আবিষ্কারের পর রেডিয়াম্-নিঃসৃত রশ্মি সমূহ পরীক্ষা করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিকের মনে ধারণা জন্মে যে, আমরা যে এতগুলি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তাহা ভুল এবং প্রকৃতপক্ষে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা মাত্র একটি। অবস্থাভেদে ঐ মূল পদার্থের বিভিন্নসংখ্যক পরমাণু একত্র দেহবদ্ধ হইয়া, আমরা যাহাকে মৌলিক পদার্থ বলি, এরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি করিয়াছে, এবং যে অবস্থায় ও যে শক্তির প্রভাবে প্রাথমিক পদার্থের বিভিন্নসংখ্যক পরমাণু একত্র দেহবদ্ধ হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলেই, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল পদার্থ মৌলিক বলিয়া পরিচিত, তাহাদের যে কোনটাই ইচ্ছামত কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যাইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ চেষ্টার ধারাবাহিক ইতিহাস ও এই প্রকার ধারণার অনুকূলে ও প্রতিকূলে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা যায়, তাহাদের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে একখানা বৃহদাকার পুথি হইয়া পড়ে। কাজেই এই স্থলে সেই দিকে কিছু না বলিয়া, বিগত বৎসরে এ সম্বন্ধে কি কি চেষ্টা হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ

করা গেল। এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থসমূহের তালিকায় হাইড্রোজেন (Hydrogen) সর্ব্বাপেক্ষা লঘু বলিয়া উহার পরমাণুভার ১ ধরা হয়, এবং হাইড্রোজেনের সহিত তুলনা করিয়া অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু-ভার সূচিত হইয়া থাকে। হিলিয়ম্ নামক অপেক্ষাকৃত নবাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের পরমাণুভার ৪; এমতাবস্থায় পূর্ব্বে যে যুক্তির অবতারণ করা হইয়াছে, তদনুসারে ৪টি হাইড্রোজেন্ পরমাণু একত্র দেহবদ্ধ হইয়া একটী হিলিয়ম্-পরমাণু উৎপন্ন করিতে পারে। এক্ষণে প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে হাইড্রোজেন হইতে প্রত্যক্ষভাবে হিলিয়ম্ উৎপন্ন করা। কয়েক বৎসর যাবৎ বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এতৎকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন। সার্ উইলিয়াম্ রেমজে (Sir William Ramsay) প্রমুখ দুই এক জন কর্ম্মী অনেক চেষ্টার পরও আশানুরূপ সাফল্যের কোন চিহ্ন না দেখিয়া বিষয়টিকে অসম্পাদ্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৩।১৪ সনে একদিকে কলি (Collie), পেটার্সন (Patterson) ও মেসন্ (Masson), অপর দিকে স্যার্ জে, জে, টমসন (Sir J. J. Thomson) বিরলীকৃত বিশুদ্ধ হাইড্রোজেনপূর্ণ কাচনল মধ্যদিয়া তড়িৎস্ফুরণ করিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিমাণ হিলিয়ম্ ও নিয়ন্ (Nion) উৎপন্ন করা যায় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ষ্ট্রাট (Strutt) ও মারটন (Merton), কলি ও পেটার্সনের পরীক্ষাপ্রণালী অতি সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিয়াও হিলিয়ম্ বা নিয়নের কোন চিহ্নের সন্ধান পান নাই। শেষোক্ত পরীক্ষক দ্বয়ের মতে কলি ও পেটার্সন যে কাচনল মধ্যে হাইড্রোজেন আবদ্ধ রাখিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, উহার ভিতর কোনপ্রকার ছিদ্র দ্বারা বায়ুকণা প্রবেশ করিয়াছিল; অর্থাৎ কলি ও পেটার্সন যে নিয়ন্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন নয়, পক্ষান্তরে পরীক্ষাধীন কাচনল মধ্যে কোনও প্রকারে বায়ুপ্রবেশ হেতুই উক্তরূপ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছে। সামান্য পরিমাণ বায়ুতেও নিয়নের অস্তিত্ব সহজে প্রমাণ করা যায়। বেলি সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া কলি ও পেটার্সনের মতেরই পোষকতা করেন। বেলি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে এইস্থলে দুইটীর মাত্র উল্লেখ করা গেল। প্রথমতঃ বায়ুতে আরগন (Argon) নামক মৌলিক অনিল পদার্থের পরিমাণ নিয়নের পরিমাণের প্রায় ৭০০ গুণ। কাজেই যদি কাচনল মধ্যে অজ্ঞাত ভাবে বায়ুপ্রবেশ হেতুই নিয়নের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তৎসঙ্গে বায়ুস্থিত আরগনও বর্ত্তমান থাকিবে; কিন্তু আরগনের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বায়ুতে নিয়নের পরিমাণ হিলি-য়মের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী; কাজেই ষ্ট্রাট্ ও মার্টনের কল্পনা মানিতে হইলে পরীক্ষার পর কাচনল্ মধ্যে হিলিয়ম্ অপেক্ষা নিয়ন্ অধিক পরিমাণে অবস্থান করিবে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহার ঠিক বিপরীত ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ পরীক্ষার পর কাচনল মধ্যে নিয়ন্ অপেক্ষা হিলিয়ম্ অধিক পরিমাণে সূচিত হয়। অধিকন্তু কলি, পেটার্সন ও মেসন বায়ু সংস্পর্শ শূন্য করার জন্য যত রকম সতর্কতা সম্ভব তাহা গ্রহণ করিয়াও কাচনল মধ্যে হিলিয়ম ও নিয়নের অস্তিত্ব দেখাইতে সক্ষম হন। অবশ্য দুই এক স্থলে অকৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ষ্ট্রাট্এর মতের বিরুদ্ধে আরও একটী পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখান হয় যে, দুইটী একই প্রকারের কাচনল মধ্যে বিরলীকৃত হাইড্রোজেন আবদ্ধ করিয়া উহাদের একটির মধ্যদিয়া তড়িৎস্ফুরণ করিলে কেবল ঐটিতেই হিলিয়ম্ ও নিয়ন্ পাওয়া যায়। যদি প্রকৃতপক্ষে ষ্ট্রাট্-এর কথামত কোনরূপ ছিদ্রদ্বারা বায়ু প্রবেশ হেতুই, অথবা হাইড্রোজেনের অবিশুদ্ধতার জন্যই হিলিয়ম্ নিয়নের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কাচনলের মধ্যদিয়া তড়িৎ-স্ফুরণ করা হয় নাই তাহাতেও এই বায়ুদ্বয় পাওয়া উচিত। কলি দেখাইয়াছেন যে প্রবর্ত্তন-বেষ্টিকার (Induction coil) আকার, যে কাচনল মধ্যে হাইড্রোজেন আবদ্ধ করিয়া পরীক্ষা করা হয় উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, তড়িৎ স্ফুরণের প্রকৃতি ইত্যা-দির উপর পরীক্ষার সফলতা নির্ভর করে। বেলীর মতে এই রূপ কোনও একটি ত্রুটী নিবন্ধনই ষ্ট্রাট্ হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ম্ ও নিয়ন্ উৎপন্ন করিতে পারেন নাই, এবং কলি ও

পেটার্সনের পরীক্ষার পর মৌলিক-পদার্থের দেহান্তর যে অন্ততঃ আংশিক রূপে সাধিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বহুদর্শী প্রবীণ রাসায়নিক স্যার জে, জে, টম্‌সন্ যদিও অনেকটা কলির অনুসৃত প্রণালী অবলম্বনে হিলিয়ম্, নিয়ন্ এবং ৩ পরমাণু ভার-বিশিষ্ট আরও একটি মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন করিতে সক্ষম হন, তথাপি তিনি প্রথমাবধিই উক্ত পদার্থত্রয় যে হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলেন, এবং মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণরূপ কল্পনাতীত ও বিস্ময়াবহ ব্যাপার যে এত সহজেই সাধিত হইয়াছে কখনও এইরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করাও সমীচীন মনে করেন নাই।

কেলি যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের বলে হিলিয়ম্ ও নিয়নের সংশ্লেষণ সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, সডি (Soddy) ঠিক সেই সকল যুক্তি ও প্রমাণের ভিন্নরূপ আলোচনা করিয়া উহাদিগকে মৌলিক পদার্থের রূপান্তরের অসম্ভবপরতার বিরুদ্ধে উৎকৃষ্টতম নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সম্প্রতি আবার বিচক্ষণ কর্ম্মী ইগার্টন(Egerton)এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ষ্ট্রাট্‌এর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই এইরূপ মতবিরোধের মধ্যে প্রকৃত সত্য ঠিক করার চেষ্টা বৃথা। উভয় পক্ষের যুক্তি সমূহই এত সূক্ষ্ম পরীক্ষা-মূলক যে, যখন যে পক্ষের কথা শুনা যায় তখন উহাই অভ্রান্ত ও একমাত্র গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সংগৃহীত প্রমাণাবলী হইতে হাইড্রোজেন্‌এর রূপান্তরের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করাটা যেন কিছু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রথমতঃ কলি প্রমুখ রাসায়নিকগণ যে পরিমাণ হিলিয়ম্ ও নিয়ন্ উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বলিতে চান, তাহা এত অল্প যে উহাকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একই প্রকার যন্ত্রদ্বারা ঠিক একই অবস্থাধীনে পরীক্ষা করিলেও প্রত্যেকবারে একই প্রকার ফল পাওয়া যায় না কেন তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন কর্ত্তব্য। যতদিন তাহা না হইবে এবং কি কি সর্ত্ত পালন করিলে হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ম্ ও নিয়ন্ উৎপন্ন করা যায় তাহা নিশ্চিতভাবে অবধারিত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত মৌলিক পদার্থের রূপান্তর সুসাধিত হইয়াছে বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিতে চাহিবেন না।

এই স্থলে আরও একটি কথা উল্লেখ করা উচিত। হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ম্ ও নিয়নের উৎপত্তি মানিয়া লইতে হইলে দুই প্রকারে উহার কল্পনা সম্ভব।—(১) তড়িৎ স্ফুরণ প্রভাবে দ্রুত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ৪টী হাইড্রোজেন পরমাণু একত্র দেহবদ্ধ হওয়ায় একটি হিলিয়ম্ পরমাণুর সৃষ্টি।(২)—সংঘর্ষণ-উন্মুখ দুইটী হাইড্রোজেন অণু বিয়োগাত্মক তাড়িতাণুর (Cathode particles) ক্রিয়ায় একত্রবদ্ধ হওয়ায় একটি হিলিয়ম্ পরমাণুর উৎপত্তি। কিন্তু তর্কস্থলে ইগার্টন গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ৪টী হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতি সেকেণ্ডে ৭.৭×১০^{৮} বার হিসাবে ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইলে প্রথমোক্ত উপায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিমাণ হিলিয়ম্ উৎপন্ন হইতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রণালীতে $১০^{১১}$ বৎসরে মাত্র একটী হিলিয়ম্ পরমাণু উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। নিয়ন্ হিলিয়ম্ অপেক্ষা ৫ গুণ গুরুভার; কাজেই হাইড্রোজেন হইতে এক পরমাণু নিয়ন্ উৎপন্ন হইতে কত যুগ যুগান্তর সময় লাগিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এতাবস্থায় কলি অল্প সময় মধ্যে অত সহজে কি প্রকারে হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ম্ উৎপাদন করিতে পারেন তাহার কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

উষ্ণতার সহিত রস কর্ম্মের গতির সম্বন্ধ।

(Temperative Co-efficient of chemical change)

রসায়নবিদ্ মাত্রই অবগত আছেন যে তাপ-প্রয়োগে রসকর্ম্মের গতি দ্রুততর হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে তাপ বৃদ্ধি সহকারে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধির কারণ কি? আভ্যন্তরীণ শক্তি প্রভাবে অণু সমূহ গতিশীল, অর্থাৎ উহারা সর্ব্বদাই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং উহাদের এই ছুটাছুটির গতি যতই দ্রুত, অন্য অণুর সহিত সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনাও তত অধিক। তাপ প্রয়োগে অণুসমূহের গতি বৃদ্ধি পায়। কাজেই পরস্পরের সংঘর্ষণও অধিক, অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতিও দ্রুততর

হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে পদার্থ-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে তাপবৃদ্ধি-সহকারে অণুসমূহের গতিশীলতা যে হারে বর্দ্ধিত হয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি তদপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হারে বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বনে এরূপ অসামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সমস্যা নিরাকরণ-কল্পে নানারূপ কল্পনামূলক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে।—(১) অণুসমূহ দুই প্রকার,—যথা —কর্ম্মক্ষম ও নিস্ক্রিয়; এবং সাধারণ অবস্থায় দুই প্রকার অণুই একত্র সাম্যাবস্থায় (Equilibrium) থাকে। তাপ প্রয়োগে কর্ম্মক্ষম অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত বিশেষ আদৃত হয় নাই।

(২) সম্প্রতি মারসেলিন্ (Marcelin) পূর্ব্বোক্ত কল্পনাটাকে একটু মার্জ্জিত ও রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় বৈজ্ঞানিকদিগের বিচারার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। মারসেলিন্ বলিতে চান যে, যে সকল অণুর আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত একমাত্র তাহারাই কর্ম্মক্ষম। এই নির্দ্দিষ্ট সীমা-মাত্রিক শক্তিকে তিনি অবস্থান্তর-সূচক-শক্তি (Critical Energy) নাম দিয়াছেন। যে সকল অণু সাধারণ অবস্থায় নিস্ক্রিয়, তাপ প্রয়োগে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং এই শক্তি পূর্ব্বোক্ত সীমায় পৌঁছিবামাত্র অণু সমূহ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যোগদান করে।

(৩) সাটন্ (Sutton) ঠিক প্রত্যক্ষভাবে নিস্ক্রিয় ও সক্রিয় দুই প্রকার অণুর কল্পনা না করিয়া এক কাল্পনিক সূত্র সাহায্যে সমস্যাটির নিরাকরণের প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাটনের কল্পনা ও অনেকটা মারসেলিনের কল্পনার অনুরূপ।

রাসায়নিক ঘটকালি

(Catalysis)

অনেক সময় দেখা যায় যে দুইটী পদার্থ পরস্পরের প্রতি নিস্ক্রিয় অবস্থায় পাশাপাশি থাকিতে পারে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় পদার্থের সান্নিধ্যে উহারা সহজেই পরস্পরের প্রতি ক্রিয়া করে, এবং যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি অতি মৃদু, অনেক সময় তৃতীয় পদার্থের সান্নিধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে এই তৃতীয় পদার্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; উহা সংস্পর্শে থাকিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তা করে মাত্র। ইংরেজী Catalysis শব্দের যথার্থ অর্থবাচক কোন পারিভাষিক সহজ বাংলা শব্দ খুঁজিয়া না পাওয়ায় এই শ্রেণীর প্রক্রিয়াকে উপহাসচ্ছলে "রাসায়নিক ঘটকালি" বলা হইল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, সহায়ক পদার্থনিচয় (Catalysts) কি ভাবে রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে? অম্ল সমূহ উৎকৃষ্ট সহায়ক পদার্থ। আম্লিক-ঘটকালি (Acid Catalysis) ক্রিয়া প্রণালীর এ পর্য্যন্ত নানারূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। আর্‌হেনিয়স্ (Arhenious) এর মতে দ্রবাবস্থায় অম্ল-বিশ্লেষিত (Dissociated) হাইড্রোজেন কণাই (Ion) ঘটকালির মূলাধার, অর্থাৎ মুক্ত হাইড্রোজেন কণার সংখ্যা যত অধিক হইবে অম্লের সহায়তায় রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিও তত বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষের মতে অম্লবিশ্লেষিত মুক্ত হাইড্রোজেন কণা ও অবিশ্লেষিত অম্ল এই দুইটীর পরিমাণের উপরই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি নির্ভর করে, অর্থাৎ উভয়বিধ পদার্থই ঘটকালি করিতে পারে। আলোচ্য বর্ষে কুমারী র‍্যাম্‌স্টেড্ (Ramstedt) প্রমুখ কতিপয় রাসায়নিক নানাবিধ পরীক্ষামূলক প্রমাণদ্বারা শেষোক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন। আর্‌হেনিয়সের মত মানিতে হইলে কোন লবণ সংযোগ করিয়া বিশ্লেষিত-অম্লস্থিত মুক্ত হাইড্রোজেন কণার সংখ্যা ক্রমে হ্রাস করিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতিও ক্রমে মৃদু হইয়া যখন আর মুক্ত হাইড্রোজেন কণা থাকিবে না তখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় পক্ষের মতানুসারে পূর্ব্বানুরূপ স্থলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি ক্রমে মৃদু হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌঁছিবে, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হইবে না; কারণ, কতকটা অবিশ্লেষিত অম্ল সর্ব্বদাই থাকিয়া যাইবে। সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত রূপ স্থলে মুক্ত হাইড্রোজেন কণার সংখ্যা হ্রাস করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি কখনও একেবারে বন্ধ

করা যায় না। এই যুক্তির বলে শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মতই অধিকতর গ্রাহ্য বলিয়া মনে হয়।

প্রসঙ্গান্তরে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কাহারও কাহারও মতে অণু সমূহের শক্তির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট সীমাতিরিক্ত হইলেই উহারা কর্ম্মক্ষম হয়। সম্প্রতি লেম্বেল (Lamble) অতি দক্ষতা সহকারে এই সিদ্ধান্তটাকে রাসায়নিক-ঘটকালি ব্যাপারের ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে তাপপ্রয়োগ এবং সহায়ক পদার্থযোগ, এই উভয় প্রকারেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করা যায়, কাজেই এ সকল স্থলে তাপ ও সহায়ক পদার্থের কার্য্য প্রণালী যে অনেকটা একই রূপ তাহা অনুমান করা স্বাভাবিক। লেম্বেলের মতানুসারে রাসায়নিক ঘটকালি মূলতঃ 'বিকিরণ-ব্যাপার' (Radiation Phenomena)। যতটুকু শক্তি থাকিলে কর্ম্মক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে বিবেচনাধীন অণু সমূহে তদপেক্ষা কম শক্তি থাকায় উহারা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পাশাপাশি অবস্থান করে, অর্থাৎ রসকর্ম্ম সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু যখন কোন সহায়ক-পদার্থ যোগ করা হয় তখন উহা অদৃশ্য-লোহিত-রশ্মি (Infra-red Rays) বিকিরণ করিতে থাকে, এবং পরীক্ষাধীন পদার্থের একটির অণুসমূহ ঐ রশ্মি শোষণ বা গ্রাস করে। এইরূপ বাহ্য-শক্তি শোষণ হেতু অন্ততঃ কতকগুলা অণুর মোট শক্তির মাত্রা অবস্থান্তর-সূচক-শক্তি (Critical Energy) ছাড়াইয়া উঠে; এবং তখন ঐ সকল অণু কর্ম্মক্ষম হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এই মতানুসারে অণুসমূহের নিষ্ক্রিয় হইতে কর্ম্মক্ষম অবস্থায় পরিবর্ত্তনের গতি অনেকটা সহায়ক-পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। কারণ এই পরিমাণ যত বেশী, বিকিরিত শক্তির পরিমাণও তত অধিক হইবে। এই নূতন সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিকগণের পাষাণ-কঠোর পরীক্ষায় টিঁকিবে কি না সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই।

আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়াবলী।

(Photo-chemical Reactions)

কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ আলোক সংস্পর্শে স্বতঃ পরিবর্ত্তিত হয়। এই শ্রেণীর ক্রিয়ার উপরই আলোক-চিত্র-বিজ্ঞানের (Photography) ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যে কত পরীক্ষা হইয়াছে তাহার অবধি করা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষকই একটা সাধনযোগ্য উদ্দেশ্য লইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে অগ্রসর হন নাই। এমতাবস্থায় আলোচ্য বর্ষে বল্ (Boll) অদৃশ্য-পিঙ্গল-রশ্মির ক্রিয়ায় জল সংযোগে Chlor-platinic Acid সমূহের বিয়োজন (Decomposition) সম্বন্ধে বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে যে সুচারু পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা আদর্শ প্রণালীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ স্থলে বল্ দেখাইয়াছেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যা (Frequency) বাচক রশ্মি ধরিয়া যে পরিমাণ রশ্মি অর্থাৎ শক্তি শোষিত হইয়াছে রাসায়নিক-ক্রিয়ার গতি তাহার আনুপাতিক। নিক্ষিপ্ত আলোক রশ্মির কম্পন-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি সহকারে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতি ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

অল্প দিন হইল বডেন্‌ষ্টিন (Bodenstein) আলোক-রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের একটা স্থূল সিদ্ধান্ত করেন। বডেন্‌ষ্টিনের কল্পনানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ শক্তি-শোষণের প্রথম পরিণাম হইতেছে মুক্ত তাড়িতাণু (Free electrons) ও ধনাত্মক অবশিষ্টাংশ (Positively charged Residues) উৎপন্ন করা। তৎপর হয় ধনাত্মক কণা ও অপরিবর্ত্তিত অণু সমূহের প্রতিক্রিয়ায় (মুখ্য আলোক-প্রক্রিয়া) নতুবা মুক্ত তাড়িতাণু ও নিরপেক্ষ অণু সমূহের সংযোগ দ্বারা রাসায়নিক কর্ম্মক্ষম অণুর উৎপত্তি হইয়া (গৌণ আলোক-প্রক্রিয়া) আলোক-রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। সম্প্রতি বল্ (Boll) দেখাইয়াছেন যে অন্ততঃ Chloroplatinic অম্ল সমূহের বেলা এই সিদ্ধান্ত খাটে না।

বিবিধ।

প্রবন্ধের কলেবর বাড়িয়া চলিতেছে। গত বর্ষে প্রাকৃতিক রসায়ন বিভাগে সমধিক সারবান্ গবেষণা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর যে সকল গবেষণা হইয়াছে তাহাদের সকলগুলির আলোচনা দূরের কথা এমন কি নাম করাও সম্ভবপর নয় মনে করিয়া নিম্নে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের প্রথমাংশের উপসংহার করা গেল।

পুস্কিন (Puschin) ও কুমারী গ্লেগোলেভা (Glagoleva) দেখাইয়াছেন যে, শৈত্যাবস্থায় Ethyl Alcohol ও জল একত্র মিশ্রিত হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে বলিয়া যে ধারণা আছে উক্ত মিশ্রণের জমনাঙ্ক (Solidifying point) নির্দ্ধারণ করিলে তাহা সমর্থিত হয় না।

কুমারী রোনা (Rona) আণবিক গতি-বিজ্ঞান (Molecular kinetics) বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

একই পাত্রস্থিত কোন দ্রবের দুই অংশের উষ্ণতা বিভিন্ন হইলে কতকটা দ্রবীভূত পদার্থ ক্রমে উষ্ণতর অংশ হইতে শীততর অংশ অভিমুখে গমন করে। এই সত্য আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে সরেট্-তত্ত্ব (Sorett's Phenomena) নামে পরিচিত। কি পরিমাণ পদার্থ এই ভাবে গমন করিবে তাহা যদিও গণনা করিয়া বলা যায়, পরীক্ষা দ্বারা তাহা বাস্তব রূপে নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আর্হেনিয়স্ একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা-মূলক ও গণনা-মূলক ফলে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। সম্প্রতি ভারাইড (Wereide) নূতন উদ্যমে আর একবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভারাইডের পরীক্ষার ফলজাত সিদ্ধান্ত সমূহ কোন নিয়মাধীনে আনা যায় না এবং পরস্পর অনৈক্যশীল, অর্থাৎ বিষয়টীকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

স্ফটিক তরল দ্রব (Crystalline Liquid Solutions) সমূহের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতটুকু তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে তাহারই সাহায্যে স্ভেড্বার্গ (Svedberg) বিভিন্ন অণুর বাহ্যাকৃতি নিরূপণ ও পরস্পর তুলনা করার চেষ্টায় আছেন।

রেমি (Remy), ফিলিপ (Phillip), লেপওয়ার্থ (Lapworth) প্রমুখ বহু রাসায়নিক বিশ্লেষিত কণার ভ্রমণক্ষমতা (Transport Numbers) সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিতেছেন। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

(২) জড় রসায়ন
(Inorganic Chemistry.)

আলোচ্য বর্ষে জড়-রসায়ন বিভাগে বহু সারবান্ ও হৃদয়-গ্রাহী তত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকিলেও অসাধারণ রকমের কোন বৃহৎ আবিষ্কার সাধিত হয় নাই,এবং জড়-রসায়ন চর্চ্চায় নিরত ব্যক্তিদিগের তালিকায় প্রখ্যাতনামা কতিপয় কৃতী কর্ম্মীর নাম দৃষ্ট হয় না। বিষয়ানুসারে নিম্নে সমধিক সারবান্ গবেষণা-সমূহের সার সঙ্কলনের চেষ্টা করা গেল।

পরমাণুভার
(Atomic weight)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বহু রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ নিচয়ের পরমাণুভার নির্দ্ধারণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং তাহার ফলে পরমাণুভার-নির্দ্ধারক আন্তর্জাতিক সভা (International comittee for the determination of Atomic weight) কর্ত্তৃক হিলিয়ম্ (Helium) লেড্(Lead) রেডিয়ম্ (Radium) সল্ফর্ (Sulphur) টিন্ (Tin) ও ইউরেনিয়ম্ (Uranium) ধাতুর পরমাণুভার বাচক সংখ্যা পূর্ব্ব গৃহীত সংখ্যা-সমূহ হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপে গৃহীত হইয়াছে।

আণবিক গুরুত্ব
(Molecular weight)

বিভিন্ন উষ্ণতায় আণবিক-সংযোজন (Molecular association) ও আণবিক-বিশ্লেষণ (Molecular dissociation) সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলে ওডো (Oddo) দেখাইয়াছেন যে জল-বাষ্পের গৃহীত সূত্র H_2O কেবল মাত্র ৩২ ডিঃ উষ্ণতাতেই সঙ্গত। উষ্ণতা-বৃদ্ধি সহকারে ক্রমে বাষ্পাণু-

সমূহের দুইটী একত্র সংযোজিত হইয়া দ্বিগুণ আণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট এক প্রকার অভিনব অণু গঠিত করিতে আরম্ভ করে; এবং কাজেই বাষ্পের আণবিক-গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ২৭০ ডিঃ উষ্ণতায় শতকরা ৪১'৪১ ভাগ জল-বাষ্পাণু পূর্ব্বোক্ত রূপ মিলিতাবস্থায় অবস্থান করে। পক্ষান্তরে ৩২ ডিগ্রির নিম্ন শৈত্যে বাষ্পাণু সমূহের আংশিক বিশ্লেষণ হেতু ক্রমে উহাদের আণবিক-গুরুত্ব হ্রাস হইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাষ্পীয় পদার্থের আয়তন বিষয়ক এভোগেড্রোর সিদ্ধান্ত (Avogadro's Law) জলবাষ্প সম্বন্ধে একমাত্র ৩২ ডিঃ উষ্ণতাতেই প্রযুজ্য।

আপেক্ষিক তাপ
(Specific Heat)

১৯১৩ সনে প্রথিতযশা অধ্যাপক ডিউআর (Dewer) কতিপয় মৌলিক পদার্থের অত্যধিক শৈত্যে আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করেন। আলোচ্যবর্ষে ঐ অবস্থায় তাম্র ও জসদের আপেক্ষিক পরমাণবিক তাপ (Atomic heat) নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মৌলিক পদার্থের বহুরূপতা
(Allotropy)

কোন কোন মৌলিক পদার্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণ বিশিষ্ট একাধিক রূপে অবস্থান করিতে পারে। এইরূপ ধর্ম্মকে 'বহুরূপতা' বলা হয়। অন্তর্নিহিত শক্তির তারতম্য অনুসারেই এই শ্রেণীর বহুরূপতার সৃষ্টি হয়। কয়েক বৎসর যাবত মৌলিক-পদার্থ নিচয়ের বহুরূপতার প্রতি রাসায়নিকগণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং এতৎসম্বন্ধে পরীক্ষা তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিতগণের অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নূতন ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ১৯১৩ সনে কপার্ (Copper), ক্যাড্মিয়ম্ (Cadmium) ও জিঙ্কের (Zinc) বহুরূপতা প্রদর্শিত হয়। আশামুগ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের কঠোর ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আলোচ্যবর্ষে লেড্ (Lead), এণ্টিমনি (Antimony) ও পটাসিয়ম্ (Potassium) ধাতুর বহুরূপতা প্রতিপাদিত, এবং সল্ফর্ (Sulphur), বিসমথ্ (Bismuth) ও সিল্ভারের (Silver) বহুরূপতা সম্বন্ধে বহু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ চৌধুরী নূতন স্ফটিকাকার (Crystalline) রৌপ্যের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রের কর্ম্মীদের মধ্যে কোহেন্ (Cohen) সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী। ইনি বিগত এক বৎসরে নানাবিধ অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যে পরিপূর্ণ অন্ততঃ দশখানা মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্যুৎ-ক্ষারণ
(Electric discharge)

মৌলিকপদার্থ নিচয়ের মধ্যে রাসায়নিক কর্ম্মক্ষমতা হিসাবে নাইট্রোজেন সর্ব্বপেক্ষা হীন। কাচনলে আবদ্ধ বিরলীকৃত (Rarefied) নাইট্রোজেন বায়ুর ভিতর দিয়া বিদ্যুৎক্ষারণ করিয়া ১৯১১ সনে ষ্ট্রাট্ (Strutt) অসাধারণ রাসায়নিক-কর্ম্মক্ষমতাপন্ন অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত (Active) নাইট্রোজেন্ উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে একপক্ষে অধ্যাপক ষ্ট্রাট্ ও অপর পক্ষে টিডি (Tiede) ও ডম্কির (Domke) মধ্যে ঘোরতর বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। ষ্ট্রাট্ বলিতেছেন স্বতঃস্ফূর্ত্ত নাইট্রোজেন্ উৎপন্ন করিতে অক্সিজেনের কোন প্রয়োজন নাই। শেষোক্ত পরীক্ষকদ্বয়ের মতে অক্সিজেনের সংস্পর্শব্যতিরেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত নাইট্রোজেন মোটেই গঠিত হয় না। এতদ্বিষয়ে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণকল্পে আলোচ্যবর্ষেও যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে। উভয়পক্ষের সংগৃহীত প্রমাণাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে বেলি (Baly) দেখাইয়াছেন যে, কোন পক্ষের সিদ্ধান্তই সমীচীন নহে। কারণ প্রথমতঃ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন্ প্রস্তুত করা এক প্রকার অসম্ভব; দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অক্সিজেন ব্যতীত আরও নানাবিধ বায়ু সহায়ক-রূপে (Catalytic agent) কণামাত্র বিদ্যমান থাকিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত নাইট্রোজেন্ উৎপন্ন করিতে পারে।

সংযোগ-শক্তি
(Valency)

কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থের এক পরমাণু উর্দ্ধ সংখ্যায় যে কয় পরমাণু হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হইতে পারে উহাকে ঐ পদার্থের মিলন-সংখ্যা বা সংযোগ-শক্তি (Valeney) বলা হয়। এস্থলে হাইড্রোজেনের মিলন সংখ্যা এক ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। অনেক পদার্থের আবার মুখ্য ও গৌণ এই দুই প্রকার সংযোগ-শক্তি (Primary and secondary valency) লক্ষিত হয়। কিছুদিন যাবৎ এপ্রেম্ (Epraim) দ্বি-মিলন-সংখ্যা বাচক (Bi-valent) ধাতুঘটিত Aminc শ্রেণীর পদার্থ লইয়া পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন। এই সকল পদার্থস্থিত ধাতু-সমূহের গৌণ সংযোগ-শক্তির পরস্পর তুলনা করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সম্প্রতি তিনি জটিল ঋণাত্মক সংহতি (Complex anion) স্থিত কৈন্দ্রিক পরামাণু-সমূহের গৌণসংযোগ-শক্তি, জটিল-ঋণসংহতি ও ধন-সংহতি সমূহের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব, ও দ্বি-মিলন সংখ্যা বাচক ধাতু সমূহের গৌণ সংযোগ-শক্তির সহিত পরমাণবিক আয়তনের (Atomic volume) প্রকৃত সম্বন্ধ এক প্রকার চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বিবিধ

বৈজ্ঞানিকগণ মৌলিক পদার্থ সমূহকে তাহাদের ধর্ম্মানুসারে ৭টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন এবং সংক্ষেপে উহাদের সম্পর্কান্বিত কোন আলোচনা করিতে হইলে সাধারণতঃ এক এক শ্রেণীস্থিত পদার্থ সমূহের আলোচনা একত্র করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য অংশের অবশিষ্ট ভাগেও এই পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ (Group I)

গতবর্ষে সিজিয়ম্ (Ceasium) অপেক্ষা অধিক পরমাণুভার-বিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের যথেষ্ট নিষ্ফল চেষ্টা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এরূপ নিষ্ফল চেষ্টারও একটা মূল্য আছে; কারণ ইহা হইতে এই বিশেষক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদিগের অনুসন্ধানের পথ অনেকটা সুগম হইয়া রহিল। ১৯১২ সনে ল্যাঙমুইর (Langmuir) রাসায়নিক কর্ম্মক্ষম অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাইড্রোজেন (Active Hydrogen) আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেনের এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক পরীক্ষার ফলে সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে যে, রাসায়নিক কর্ম্মক্ষম হাইড্রোজেন—(১)—পরমাণবিক অবস্থায় অবস্থান করে; (২) সাধারণ উষ্ণতাতেও অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইতে পারে; (৩)—অতি অল্প চাপ ও উচ্চ উষ্ণতায় টাংষ্টেন্ (Tungsten), প্লেটিনাম্ (Platinum) ও পেলাডিয়ম্ (Palladium) কর্ত্তৃক শোষিত হইয়া থাকে।

অক্সিজেন ঘটিত অম্লের Cuprous লবণের সংখ্যা অতি অল্প এবং কাহারও কাহারও মতে এ সকল লবণ এত অস্থায়ী যে অনেক স্থলে উহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সম্ভবপর নহে। কিন্তু গত বর্ষে এই শ্রেণীর দুইটী নূতন লবণ (Cuprous oxalate ও Carbonate) প্রস্তুত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিভাগ (Group II)

পারদ ন্যূনপক্ষে কত উষ্ণতায় বাষ্পে পরিণত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে বেন্ডার (Bendor) দেখাইয়াছেন যে ১৫০০ ডিঃ উষ্ণতা পর্য্যন্ত পারদ বাষ্পে পরিণত না হইয়া তরল অবস্থাতেই থাকে, কিন্তু ১৬৫০ ডিগ্রির কম উষ্ণতাতেই বাষ্পীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাইজেন্ফেল্ড (Reisenfeld) ও নটবম্ (Notebohm) ক্ষারীয় মৃদাত্মক-ধাতু নিচয় (Alkaline earth-metals) ও জিঙ্কের Peroxide সমূহের প্রস্তুত প্রণালী, ধর্ম্ম ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতির বিস্তৃত পরীক্ষা করিয়াছেন।

তৃতীয় বিভাগ (Group III)

বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে ষ্টক্ (Stock) বোরন্(Boron) ও হাইড্রোজেন ঘটিত কয়েকটী নূতন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত ও সনাক্ত করিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, হাইড্রোজেনের প্রতি বোরন্এর মিলন সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের মীমাংসা করে গতবর্ষে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে বোরন্এর ঋণাত্মক মিলন সংখ্যা

(Negative Valency) ঊর্দ্ধপক্ষে চারি এবং সর্ব্বোচ্চ ধনাত্মক মিলনসংখ্যা (Positive valency) তিন ; অর্থাৎ বোরন 'Abegg ও Bodlander'এর নিয়ম পালন করিতেছে না। এই নিয়মানুসারে দুই প্রকার মিলনসংখ্যার যোগফল আট হওয়া উচিত। একটি মাত্র বোরন্ পরমাণু বিশিষ্ট হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগিক প্রস্তুতের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

চতুর্থ ভাগ (Group IV.)

কোন কোন যুক্ত লবণ নির্দ্দিষ্ট মাত্রিক জল অণু সংযোগ ব্যতিরেকে স্ফটিকাকার ধারণ করিতে অক্ষম। এই জল স্ফটিকীকরণ জল (Water of crystalliisation) নামে পরিচিত। ১৯১২ সনে রাইজেন্‌ফেল্ড ও মাউ (Mau) স্ফটিকীকরণ হাইড্রোজেন পেরোক্‌সাইড্ (H_2O_2 of crystallisation) যুক্ত কার্ব্বণেট্ লবণের উল্লেখ করেন। ১৯১৫ সনে ক্যাজনেকি (Cazanecke) এই শ্রেণীর পদার্থ সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের মধ্যে Peroxide এর সকল ধর্ম্মই বিদ্যমান এবং ইহারা স্বাভাবিক উষ্ণতাতেই বিয়োজিত হয়।

অসম্পৃক্ত (Unsaturated) হাইড্রোকার্ব্বন্ এর পরিমাণ Bromine যোগ করিয়া সাধারতঃ স্থির করা হয় ; কিন্তু অনেক সময় Carbonyl Bromide গঠিত হয় বলিয়া এই প্রণালী অবলম্বনে সন্তোষ-জনক ফল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে কি কি অবস্থায় Carbonyl Bromide গঠিত হইতে পারে সম্প্রতি তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পঞ্চম বিভাগ (Group V.)

আলোচ্য বর্ষে হাইড্রেজিন (Hydrazine) এর বিষয় বহু গবেষণা হইয়াছে। শ্লেঙ্ক ও ভাইসেল্‌ফেল্‌ডার (Weichsel-felder) সোডিয়ম্ ও হাইড্রেজিনের সংমিশ্রণে দুইটি যৌগিক প্রস্তুত করিয়াছেন। উভয় পদার্থ ই অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক। ওয়েল্‌শ্ (Welsch) নির্জ্জল হাইড্রেজিনে কতিপয় ক্ষার লবণ ও মৌলিক পদার্থের দ্রবণ-শীলতা (Solubility) নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মৌলিক ধাতু নিচয়ের মধ্যে একমাত্র ক্ষার-ধাতুগুলিই হাইড্রেজিনে দ্রবণীল এবং পরমাণুভা'র অনুসারে উহাদের এই ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

রোজেন্‌হেম্ (Rosenheim) ও ট্রায়েণ্টাফাইলিডেস্ (Triantaphyllides) জটিল ধাতব Pyrophosphoric অম্ল নিচয়ের কতিপয় লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহারা Ferri-phosphoric অম্লের লবণ সমূহের অনুধর্ম্মা।

ষষ্ঠ বিভাগ (Group VI.)

অল্পকালমধ্যেই আলোক-তাড়িত-কোষ (Photo-electric cell) এর মূল উপাদানরূপে Selenium এর ব্যবহার আশ্চর্য্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কাজেই সম্প্রতি এন্‌জেল্ (Angel) অসাধারণ-কর্ম্মক্ষম অবস্থার সেলিনিয়ম্ প্রাপ্তির যে পন্থা নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিকজগতে কিরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

সপ্তম বিভাগ (Group VII.)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সশিষ্য ব্যাক্‌ষ্টার (Baxter) ৫০ ডিঃ উষ্ণতা মধ্যে আইয়োডিনের (Iodine) বাষ্পীয় চাপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ; সম্প্রতি ৫০ হইতে ৯৫ ডিঃ উষ্ণতা মধ্যে আইওডিনের বাষ্পীয় চাপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ফিক্‌টার (Fichter) Iodine iodate প্রমুখ ধনাত্মক-আইওডিন-পরমাণু-যুক্ত পদার্থ প্রস্তুতচেষ্টায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

Manganese Sulphide বহুরূপী যৌগিক পদার্থের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাকে তিন প্রকার বিভিন্নরূপে প্রাপ্তির যে সকল প্রণালী গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় উহারা একদিকে যেরূপ পরস্পর-বিরোধী অপরদিকে সেইরূপ উহাদের কোনটিই নির্ভুল অথবা সহজে অনুধাবন যোগ্য নহে। আলোচ্য বর্ষে ফিসার (V. M Fischer) উক্ত তিনরূপ Manganese-

Sulphide প্রস্তুতেরই নির্দোষ প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

ক্ষুদ্রের সার্থকতা।

তারকা কাঁদিয়া কহে "ওহে বিশ্বপতি,
চাঁদেরে দিয়েছ শক্তি বিশ্বতমোনাশ ;
মোর হৃদে জ্বলে ক্ষুধা বিশ্ব আলোকিতে
ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া মোরে করেছ হতাশ।"

দেবতা কহিল হাসি "ওরে রে অবুঝ,
ক্ষুদ্র নয়, ব্যর্থ নয়, তোর প্রাণখানি ;
নিঃশেষে পরাণপণে দিলে ক্ষুদ্র আলো
চন্দ্র হ'তে হীন তোরে কভু নাহি মানি"।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ।

ভাগবত-কথা।

নৈমিষারণ্য পৌরাণিক মুনিগণের অতি প্রিয় তীর্থ। এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণনায় পৌরাণিক ঋষিগণ কখনও তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বায়ুপুরাণে দেখা যায় * এইস্থানে দেবগণ সহস্র বৎসর ব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; বিশ্বস্রষ্টৃগণ (প্রজাপতিগণ) জগৎ সৃষ্টি কামনায় সহস্র বৎসর ধরিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; আবার ভাগবতে † লিখিত আছে শৌনকাদি ঋষিগণও এই ক্ষেত্রে সহস্র বৎসর ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, এবং মুনিগণ পবিত্র দেশ প্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এক 'সুনাভ, সত্যাঙ্গ, শুভ্রবিক্রম, অনৌপম্য, মনোময়, ধর্ম্মচক্র' প্রবর্ত্তিত করিয়া বলিয়া দেন আপনারা এই ভ্রমণশীল চক্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন ; যে স্থানে এই চক্রের নেমি বিশীর্ণ হইবে তাহাই পুণ্যতম ক্ষেত্র জানিবেন। এই চক্র নৈমিষ ক্ষেত্রে বিশীর্ণ হয় সেই জন্য এক মতে * ইহার নাম নৈমিশ। ধর্ম্ম চক্রের কথায় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিরত্নের এক রত্নের কথা মনে হয় ; নেমি বিশীর্ণ হওয়া'র ফলে চক্র অচল হয়। সুতরাং মনে হয় বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র এই ক্ষেত্রে আসিয়া অচল হইয়াছিল এইরূপ রূপক হয় ত উক্ত ব্যুৎপত্তির মূলে প্রচ্ছন্ন আছে। বরাহপুরাণে নৈমিষারণ্যের ব্যুৎপত্তি অন্যরূপ দেওয়া আছে। ভগবান্ বিষ্ণুর চক্রে দুর্জ্জয় অসুর সৈন্য এক নিমিষ মধ্যে ছিন্নভিন্ন ও ভস্মবৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম নৈমিষ হইয়াছে। এইস্থানে রোহিণীর গর্ভে বুধের জন্ম, বৈবস্বত মনু কন্যা ইলার সহিত বুধের পরিণয়, আবার বুধ তনয় পুরূরবা লোভপরবশ হইয়া মুনিগণের হিরন্ময় যজ্ঞ ঘট বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া মুনিগণ তাহাকে কুশবজ্র দ্বারা নিহত করেন। তৎপরে মুনিগণ পুরূরবারপুত্র নহুষকে রাজা করেন। হিরন্ময় যজ্ঞবাটের বৃত্তান্তও অদ্ভুত। গঙ্গাদেবী অগ্নি হইতে গর্ভধারণ পূর্ব্বক এক প্রদীপ্ততেজ উল্ব প্রসব করেন। উল্ব শব্দের অর্থ জরায়ু। সম্ভবতঃ এখানে এই শব্দে জরায়ুর আকার বিশিষ্ট ভ্রূণ বা পিণ্ড বুঝিতে হইবে। সে যাহা হউক ঐ উল্ব পর্ব্বতে ন্যস্ত হইয়া স্বর্ণ পিণ্ডে পরিণত হয়। ঐ স্বর্ণদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করেন। ঋষিগণের বহু বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞে এত পশু নিহত হইত যে মহাতেজা মহাবুদ্ধি যম স্বয়ং নিহত পশুগণের মাংস রক্ষার্থ চুলিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই নৈমিষারণ্যেই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ কলহ হয়। † এই রূপ বহু বৃত্তান্ত নৈমিষারণ্যের স্মৃতি পৌরাণিক ঋষিগণের নিকট চির জাগরূক ও চির মধুর করিয়া রাখিয়াছে। এই পুণ্য ক্ষেত্রেই মহাভারত কথিত হয়। "সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণ যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিত ভগবান্ শম্ভুর এই উত্তম ক্ষেত্রে"‡ বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম ভাগবত পুরাণও কথিত হইয়াছিল ; সুতরাং শৈব ও বৈষ্ণব উভয়

* বায়ু পুরাণ ২।৫ ; ২।৭ ; † ভাগবত ১।১।৪

* বায়ু পুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণ।

† বায়ু পুরাণ। ‡ কূর্ম্ম পুরাণ। ভাগবতে আছে "ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্"।

সম্প্রদায়েরই এই তীর্থ পরমপূজ্য। এই পুণ্য তীর্থে সহস্রবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ উপলক্ষে ঋষিগণ লোমহর্ষণপুত্র সূতকে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই সময়ে জগতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঋষিগণের আর কোনও দুশ্চিন্তা বা ভয় থাকুক আর নাই থাকুক তাঁহারা কলিযুগকে বড়ই ভয় করিতেন। বায়ু পুরাণে কথিত আছে হিংসা,অসূয়া,মিথ্যা,ছলনা তপস্বিজনের হত্যা এই কয়টি কলিযুগের স্বভাব। কলিতে ধর্ম্ম ক্ষীণ হয়। এমন কি জীবিকা নির্ব্বাহও কঠিন হয়। কলিতে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, দেশবিপর্য্যয়, ও স্মৃতির প্রামাণ্যের অভাব হয়।* দেখা যাইতেছে লোকে পুরাণে বিশ্বাস করিবে না বলিয়া পৌরাণিকগণ অধিক আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ঋষিগণ আরও বলিয়াছেন, কলিযুগে প্রজাগণ অধার্ম্মিক, অনাচার, রুষ্ট, ক্রোধী, অল্পতেজাঃ, সতত মিথ্যাবাদী। শূদ্র ব্রাহ্মণাচার, ব্রাহ্মণ শূদ্রাচার, চোর রাজকর্ম্মে ও রাজা চৌর্য্যে রত হয়। কলিকালে রমণীগণ দুঃশীলা, ব্রতহীনা, মদ্যমাংসপ্রিয়া, মায়াবিনী। এক বায়ু পুরাণে নহে প্রত্যেক পুরাণেই এই প্রকার ভাবের কথা আছে। কল্কিপুরাণে কলির উৎপত্তি প্রায় এইরূপ বর্ণিত আছে। প্রলয়ান্তে জগৎস্রষ্টা লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজ পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘোর মলিন সপাতক এক জীব সৃষ্টি করিলেন। তাহার নাম অধর্ম্ম। অধর্ম্মের পত্নী হইতেছেন মিথ্যা—ইনি মার্জ্জারলোচনা। ইহাদের পুত্রের নাম দম্ভ কন্যার নাম মায়া। ভগিনী মায়ায় দম্ভ এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম দান করেন। ঐ পুত্রের নাম লোভ, কন্যার নাম নিকৃতি। লোভ ও নিকৃতির পুত্র ক্রোধ, কন্যা হিংসা। ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ প্রথা যে এই নিন্দনীয় কুলে প্রচলিত হইবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ক্রোধ ভগিনী হিংসাতে এক পুত্রের জন্ম দেন; ইনিই কলি। ইহার আকার প্রকার ভয়ানক ও অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক বলিয়া পুরাণকার বর্ণনা করিয়াছেন। কলির ভগিনী দুরুক্তি। বলা বাহুল্য উভয়ের বিবাহ হয়; তাহার ফল ভয় নামক পুত্র, মৃত্যু নাম্নী কন্যা। ইহাদের বিবাহের ফলে নিরয় নামক পুত্র ও যাতনা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়।

এইরূপ নানাবিধ রূপক ও নানাবিধ বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা পৌরাণিক ঋষিগণ কলিকালের লোকসমূহের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনার মূলে পাপী অপেক্ষা পাপের প্রতি ঘৃণাই অধিক। কেননা কলিকলুষহত মানুষদিগের উদ্ধারার্থই পুরাণ সমূহের প্রবৃত্তি। ঘৃণা করিয়া কে কবে কাহার উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিয়াছে? এক এক পুরাণ এক এক ভাবে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুগণের রুচি,প্রবৃত্তি, অধিকার অনুসারে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল লোকের অধিকার সমান হয় না। সকলের রুচি ও প্রবৃত্তি একবিধ নহে। সুতরাং একবিধ ধর্ম্মমত সকলের পক্ষে উপযোগী হইবে এরূপ আশা করা বৃথা। এই কারণে জগতের সকল ধর্ম্মেই নানাবিধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অধিকার ভেদে প্রস্থান ভেদের আবশ্যকতা বোধ হয় জগতে এক হিন্দু ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে; সেই জন্যই বহু মত ও বহু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সত্ত্বেও হিন্দু ধর্ম্ম এক অখণ্ড সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া জগৎ সমক্ষে গর্ব্ব করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এই পুরাণসমূহে ধর্ম্ম মত বিশেষতঃ উপাস্য দেবতার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলগুলিই হিন্দুর নমস্য। এমন কি সকলগুলিকে একই বেদব্যাসের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেও হিন্দুর বিশেষ কষ্ট হয় নাই। অবশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে সকল পুরাণের এক কর্ত্তৃকত্বে বিশ্বাস করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক গবেষণা ও তুলনায় সমালোচনার ফলে পুরাণ সমূহের এক কর্ত্তৃকত্ব দাবীর মূল উচ্ছিন্নপ্রায়; কিন্তু তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে এক জনকেই সকলগুলির কর্ত্তা বলিলেও বিশেষ দোষ হয় না, বিশেষতঃ যদি সেই একজনকে পরম জ্ঞানী ও পরম মনীষী ও বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকারীর প্রতি সমান দয়ালু বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। আবার ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিলেও এতদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করা চলে যে একই প্রাচীন পুরাণ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছে।

* বায়ু পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

মৎস্য পুরাণেও কথিত আছে সর্ব্ব প্রথমে পুরাণ একখানিই ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে ঐ আদি পুরাণ ব্রহ্মার প্রণীত ছিল। বিষ্ণু পুরাণ বলেন বেদব্যাস আদিতে পুরাণ সংহিতা (একখানি) রচনা করিয়া তাঁহার সূতজাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে অর্পণ করেন। লোমহর্ষণের তিন শিষ্য তিন খানি পুরাণ সংহিতা রচনা করেন ইত্যাদি।

আমরা কথায় কথায় প্রকৃত প্রস্তাব হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের বক্তব্য, পুরাণ সমূহ একই বেদব্যাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিলেও সকল গুলিতে একমত প্রতিপাদিত হয় নাই। কতকগুলি পুরাণ শৈবমত প্রতিপাদক, কতকগুলি বৈষ্ণবমত প্রতিপাদক, আবার কতকগুলি শাক্ত মত প্রতিপাদক। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব মত প্রতিপাদক। পুরাণ মাত্রই অর্থবাদ-মূলক ও রূপকে পূর্ণ। এবং সকল গুলিতেই নিজ মতের শ্রেষ্ঠতা ও অন্য মতের হীনতা প্রদর্শনার্থ নানা গল্প কল্পিত হইয়াছে। অন্যমত অপেক্ষা নিজ মত উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা না করিলে সাধকের একনিষ্ঠতা সাধিত হয় না এবং একনিষ্ঠতা না থাকিলে সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অনেকে পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র সমূহের এই রীতিকে সঙ্কীর্ণতা-মূলক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ সঙ্কীর্ণতা সাধনের প্রথমাবস্থায় নিন্দনীয় নহে বরং প্রশংসনীয়। যিনি সাধন পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন তিনি ধীরে ধীরে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। নদীর আয়তন অধিক বিস্তৃত হইলে স্রোতোবেগ মন্দ হয় সুতরাং সাগরে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। একবার সাগরে পৌঁছিলে আর সঙ্কীর্ণতা কোথায়?

ভাগবত বৈষ্ণব মত প্রতিপাদক পুরাণ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার তত্ত্ব ভগবান্ বিষ্ণুতে অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেইজন্য কলিভয়ে ভীত ঋষিগণ জগতের উপকারার্থ যখন সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে নিষ্পাপ! তুমি সমস্ত পুরাণ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করিয়াছ, ভগবান্ ব্যাসের কৃপায় তোমার অবিদিত কিছু নাই। সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলন করিয়া যাহাকে মানুষদিগের নিশ্চয় মঙ্গল সাধন বুঝিয়া বিনিশ্চয় করিয়াছ তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ কর। এই কলিকালে প্রায় সকলেই অল্পায়ু ও অলস। প্রায় সকলেরই বুদ্ধির তেজ মন্দ; সকলেই বিঘ্ন সমূহে ব্যাকুল ও রোগাদি দ্বারা নিপীড়িত। সুতরাং তাহারা বহু শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা নিজ মঙ্গল সাধন করিবে সে বিষয়ে সম্ভাবনা অল্প। আর শাস্ত্রও বহুতর এবং তৎসমুদায়ে ভূরি ভূরি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। তৎসমস্ত কর্ম্ম নির্ণয় ও অনুষ্ঠান করা বড় সহজ নহে। অতএব জীব কুলের হিতার্থ তুমি সকল শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া সংক্ষেপে বর্ণন কর।" তখন সেই পুরাণজ্ঞ মুনি সকল শাস্ত্রের সার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ইত্যাদি।

ইহার ভাব এইরূপ:—স্বর্গাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অপেক্ষা স্বার্থশূন্য ভগবদ্ভক্তিই মানুষের পরম ধর্ম্ম। নারায়ণে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান জন্মে। অহৈতুক জ্ঞানের অর্থ স্বামীর মতে শুষ্কতর্কাদির অগোচর অর্থাৎ শুষ্ক তর্কাদির লেশশূন্য। উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও যদি হরিকথায় ভক্তি না জন্মায় তবে সে ধর্ম্ম পণ্ডশ্রম মাত্র।

ইহাই ভাগবতের উপদেশের সার। ভাগবত বর্ণনার পূর্ব্বেই পুরাণকার সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম বলিয়া দিলেন। যাবতীয় ভক্তি শাস্ত্রেরও উহাই গুহ্যতম তত্ত্ব। আমরা বারান্তরে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এখন শ্রোতৃগণকে ভাগবত শ্রবণে প্রবৃত্ত ও সাধকগণের একনিষ্ঠতা সাধনার্থ কিরূপ ভাবে অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভগবান্ বেদব্যাস লোকের হিতার্থ প্রথমে বেদ বিভাগ করিয়া পরে মন্দবুদ্ধি লোক ও বেদাধ্যয়নের অনধিকারী স্ত্রী-লোক ও শূদ্রাদির প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মহাভারত রচনা করিয়া সমুদয় বেদার্থ কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না। সেই জন্য তিনি এক দিন ক্ষুণ্ণমায়মান হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। বেদব্যাস তাঁহার নিকট নিজের চিত্তের অপ্রসন্নতার কথা ব্যক্ত করিলে নারদ বলিলেন "ব্যাস! তুমি লোকহিতকর বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেও ভগবান্ বাসুদেবের অমল যশঃ ও মহিমা কীর্ত্তন কর নাই। অতি মনোরম পদ বিন্যাস থাকিলেও যে শাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তন করা হয় নাই তাহা কেবল কাকতীর্থ অর্থাৎ কামনাদগ্ধ লুব্ধ ব্যক্তিগণেরই আদরণীয়। হরি-ভক্তির সহিত বিমিশ্রিত না হইলে অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানও শোভা পায় না। সুতরাং তুমি জন-সাধারণের মঙ্গলার্থ বাসুদেবের চরিত্র বর্ণন কর। এই বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলে ব্যাসদেব সরস্বতীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী শম্যাপ্রাণ নামক আশ্রমে সমাধিযুক্ত হইয়া ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং ভক্তি যোগদ্বারা নির্ম্মলীভূত চিত্তে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া তুষ্টি লাভ পূর্ব্বক অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবগণের উপকার সাধন মানসে ভাগবত সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ভাগবত শ্রবণ করিলে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-নাশিনী ভক্তি জন্মে। *

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন।

সবিতৃ-বরণ

লক্ষ যোজন দূরদেশে কক্ষ তুমি করেছ স্থির,
বক্ষঃ তোমার স্নেহে ভরা হে প্রশান্ত! হে গম্ভীর!
রক্ষে তোমার ন্যায়ের শাসন সোনার রথে তুমি রথী,
পুণ্যাসনে উপবিষ্ট দণ্ডধারী তুমি যতি।
তোমার কেতন সাতটী ঘোড়া বিশ্ব হিতে রথে জোড়া,
ধন্য তারা পুণ্য তারা উপযুক্ত প্রভুর গড়া।
পরের তরে স্ব সর্ব্বস্ব বিলাও তুমি স্বার্থ শূন্য,
দীপ্ত জ্যোতির মধ্য দিয়া ফুটাও জ্যোতিঃ জাগাও পুণ্য।
রুদ্র! তোমার রুদ্ররূপে ক্ষুদ্রও ধরে রুদ্রতা,
দিব্য তেজে দীপ্ত হয়ে শূদ্রও ত্যজে শূদ্রতা।
রথের চূড়ায় সেবার ধ্বজা বিশ্ব প্রীতির নিদর্শন,
আর্য্যগণের পূজ্য তুমি জ্যোতির্ম্ময় সুদর্শন।
দিবা রাত্র অবিশ্রান্ত পুণ্য কার্য্যে তুমি রত,
মুক্তি পথের তীর্থ তুমি, পিতৃরূপী সেবাব্রত।
তোমার স্নিগ্ধ কিরণ পাতে ফোটে অযুত পদ্ম ফুল,
তোমার গোপন চরণ পাতে নাস্তিকেরো ভাঙ্গে ভুল।
বিশ্ব মাঝে সেবার সাজে তুমিই মূর্ত্ত দেবতা,
ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি, তুমিই শম্ভু সবিতা।
বেদের ভাষায় তুমি আত্মা অন্তহীন মহাব্যোম,
দ্বৈতবাদীর জীবাত্মা তোমার রাজ্যে ঋক্ষ সোম।
তোমা হতে জগৎসত্তা মহাসৃষ্টি অনুলোম,
বিশ্ব বিলীন তোমার মাঝে বিলোমকালে তুমি ওম্।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী নাট্য-সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ ব্যাপিয়া যে সকল নাটকাদি রচিত হইয়াছে তাহাকে ইংরাজের জাতীয় নাট্য-সাহিত্য বলা যাইতে পারে না। এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ইংরাজের নাট্য-সাহিত্য রঙ্গালয়ের সহিত সম্পর্ক হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সম-সাময়িক জাতীয় জীবনের সহিত এই সময়ে রচিত নাট্যাবলীর কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না। পরিশেষে শতাব্দী আশীর কোঠায় পড়িলে, রঙ্গালয়ের সহিত নাট্য-সাহিত্যের

---

* ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত।

পুনর্মিলনের ফলে আবার ইংরাজের নাট্যকৃতি জাতীয় সাহিত্য সংজ্ঞা লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে।

এই দীর্ঘকাল যাবৎ ইংলণ্ডের রঙ্গালয় সকল যে বন্ধ ছিল তাহা নহে। বরং এই সময়ের মধ্যেই রঙ্গালয়ের এবং নাট্য বিদ্যার অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল নাটকাদি অভিনীত হইত, সেগুলি হয় ত একেবারে সাহিত্য-রস-বর্জ্জিত রঙ্গমাত্র, নতুবা মধ্যশতাব্দীর ফরাসীর নাট্যকারগণের নাটকাবলীর অনুবাদ বা অনুকরণ মাত্র, অথবা পূর্ব্ব যুগের ইংরাজী নাটক সমূহের পুনরভিনয় মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসীর আদর্শের উৎপ্রেরণা নিঃশেষিত হইবার ফলে উচ্চ অঙ্গের নাটক রচনা বিরল হইয়া পড়ে। সত্য বটে, এই সময়ে ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত আন্দোলনের বিচিত্র ভাব-স্রোতে সাহিত্যে যে সকল নূতন বিষয়, অভিনব ভাব এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাষা-রীতির আমদানী হইতে থাকে, নাটকীয় রচনারীতি তাহার সহিত হঠাৎ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে এই নব ভাবে সঞ্জীবিত সাহিত্যের অপর দিকের সমৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাহিত্যিকের দৃষ্টি নাট্যসাহিত্য হইতে পরাবৃত্ত হইলে কবিগণ স্বীয় রচনা নাট্যাকারে গ্রথিত করিতেন বটে, কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিলেও অভিনয়যোগ্য হইয়া উঠিত না। কবিবর বায়রণের (Byron) নাট্যকাব্যগুলি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার পরবর্ত্তী যুগে ম্যাথু আর্নল্ডের (Matthew Arnold) রচিত নাটকও এই জাতীয়। টেনিসনের (Tennyson) নাটকাবলীর অনতি প্রতিষ্ঠাও নাট্য সাহিত্যে এই বিরোধেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। ব্রাউনিং (Browning) ও সুইনবার্ণের (Swinburne) নাটক রচনা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণের প্রচেষ্টা হইতে মূল্যবান্ হইলেও বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। ফলতঃ অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল; যে সকল ইংরাজ নাট্যকারগণ রঙ্গালয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করিতেন তাঁহারা কেবল অভিনয়োপযোগিতার প্রতিই লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু সাহিত্য-রসিকের মনে আবেদনের চেষ্টা করিতেন না। তৎকালে এরূপ লোকের অভাব ছিল না, যাহারা দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতারণা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতেন অথচ 'কাব্যামৃত-রসাস্বাদ' কি বস্তু তাহা জানিতেন না। বলা বাহুল্য, রঙ্গালয়ের এই শ্রেণীর দর্শকগণের প্রীত্যর্থে যাহা রচিত হইত, তাহা প্রায়শঃ সাহিত্যপদবাচ্য হইত না। অপর দিকে বাইরনাদি কবিগণের নাটকাকারে গ্রথিত কাব্যাবলী ইংরাজের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত হইলেও অভিনয়ের অযোগ্য বলিয়া উহাদিগকে জাতীয় নাট্য সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যাইত না। সাহিত্য সংজ্ঞার উপযুক্ত নাটকাকারে গ্রথিত রচনা অভিনীত হইত না এবং ইংরাজ গ্রন্থকারগণের রচিত যে সকল নাটক অভিনীত হইত তাহাদিগকে নাট্য-সাহিত্য বলা যায় না। কিন্তু এ সকল নাটক অভিনয় করিয়াই রঙ্গালয়ের কাজ চলিত না। বস্তুতঃ অন্য এক শ্রেণীর নাটকই রঙ্গালয়ের প্রধান অবলম্বন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে স্ক্রাইব (Scribe) নামের ফরাসী নাট্যকার এক বিশেষ নাটকরচনাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। অভিনয় যোগ্যতাই তদ্রচিত নাটকগুলির প্রধান গুণ ছিল। ফলতঃ এই সময়ে কেবল ইংলণ্ডে নহে, পরন্তু ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে এই ফরাসীর ছাঁচে ঢালা নাটকেরই প্রাধান্য ছিল। ইংলণ্ডেও এই সকল যন্ত্র-নির্ম্মিত একই ধরণের সুগঠিত নাটক কোনরূপে পাত্র পাত্রীগণের নাম বদলাইয়া বা রূপান্তরিত করিয়া রঙ্গালয়ের দর্শকগণের মনোরঞ্জনার্থ অভিনয় করা হইত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ইংরেজী রঙ্গালয় সমূহে গম্ভীর বা চটুল, যে কোন ভাবাত্মক আধুনিক নাটক বলিতে ইউজিন স্ক্রাইব (Eugene Scribe) ভিক্টোরিয়েন সার্ডু (Victorien Sardau) প্রভৃতি প্রণীত ফরাসী নাটক সমূহের অনুবাদ বা অনুকরণ সম্ভূত নাটকই বুঝাইত। ইহার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত, এমন কি, শতাব্দী নব্বইএর কোঠায় পড়িলেও ফরাসীর নাট্য প্রভাবের প্রাধান্য অন্তর্হিত হয় নাই। ক্রাইটেরীয়ন (Criterion), হে-মারকেট (Hay-

[illegible]), সেণ্ট জেমস্ (St James's) ও কোর্ট থিয়েটার (Court Theatre) প্রভৃতি রঙ্গালয়ে পরে মৌলিক নাট্যের আবির্ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল নাট্যালয়ে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও ফরাসী নাট্যেরই প্রাধান্য ছিল। চার্লস উইণ্ডহ্যাম (Charles Wyndham) কর্তৃত্বাধীন সময়ে ক্রাইটেরিয়ান থিয়েটারের প্রারম্ভ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী (Vandeville) নাট্যের উপরই নির্ভর ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বীরবম ট্রী (Herbert Beerbohm Tree) হে মার্কেট থিয়েটারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন; তখনও তাঁহাকে প্রধানতঃ বিদেশাগত নাটক লইয়াই অভিনয় করিতে হইত।

জর্জ আলেকজাণ্ডার যখন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রথম ম্যানেজারী আরম্ভ করেন, তখনও তিনি এভিনিউ থিয়েটারে (the Avenue Theatre) দুইখানি ফরাসীর অনুকরণে গ্রথিত নাটক লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করেন। অতএব দেখা যায় যে এই সময় পর্য্যন্তও ফরাসীর অনুকরণই ইংরাজী নাট্যকারগণের সাধারণ কার্য্য ছিল। মৌলিক নাটক রচনা ইহারা কদাচিৎ করিতেন। রবার্টসন (Robertson), বায়রণ, আলবেরী (Allbery), গিলবার্ট (Gilbert), টম টেলার (Tom Taylor), চার্লস রীড (Charles Reade), হারম্যান মেরিভেল (Herman Merivale), জি. ডব্লু গডফ্রে (G. W. Godfrey)—সকলেই ফরাসী অনুকরণে বহু সংখ্যক নাটক রচনা করিয়াছেন। সীডনী গ্রাণ্ডী (Sydney Grundy) বিশ বর্ষ কাল এই কার্য্যেই শক্তি নিয়োগ করেন। যিনি পরবর্ত্তী মৌলিক যুগের প্রবর্ত্তক ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেই পিনারো (Pinero) পর্য্যন্ত একাধিক নাটকে ফরাসী অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রবার্টসন্ একবার মৌলিকতার প্রয়াস করিয়াছিলেন। ব্যানক্রফ্‌টের (Bancroft) কর্তৃত্বে প্রিন্স-অব-ওয়েল‍্স (Prince of Wales) থিয়েটারে ইঁহার কয়েকখানা হাস্যরসাত্মক নাটক অভিনীত হয়। তাহাতে একটু মৌলিকতার বাতাস বহিয়াছিল। অভিনয়ের প্রয়োগ-বিজ্ঞানে এখানে নূতনত্ব দেখা গিয়াছিল। যাহাই হউক, ইঁহাদের মত ছিল যে অভিনয়োপযোগী সাজ সজ্জা ও কথা বার্ত্তায় দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বজায় রাখা চাই। কিন্তু মৌলিকতার নূতন বাতাসের এই হাওয়া টুকু রবার্টসনের মৃত্যুর সঙ্গেই অন্তর্দ্ধান করে। তাহার শিষ্য আলবেরী অনুকরণ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন। অন্যতম শিষ্য টম্ টেলারের সংখ্যাতীত নাটক গুলি বিষয়বস্তুতে কখনও কখনও মৌলিক হইলেও রচনা-রীতিতে সেই কলগড়া ফরাসী ছাঁচেই ঢালা ছিল। মোট কথা এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ এবং চতুর্থ পাদেরও অধিকাংশ সময়কে ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের ফরাসীযুগ বলা যাইতে পারে। কেবল গম্ভীর ভাবময় নাটক সমূহেরই এই দশা ছিল তাহা নহে। পরন্তু সঙ্গীত সংযুক্ত নাটিকা এবং গীতিনাট্য প্রভৃতিতেও এই সময়ে ফরাসীর প্রাধান্য বিরাজিত দেখা যায়।

কিন্তু এইরূপে শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী প্রাধান্য লক্ষিত হইলেও, ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ শতাব্দী আশীর কোঠায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক নাট্য-রচনারও সূচনা হইতে থাকে।

ফরাসী প্রভাবের ক্রমিক অন্তর্দ্ধানের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, দুইটি বিষয় যুগপৎ এতদর্থে কার্য্য করিতেছিল। যে স্ক্রাইব প্রবর্ত্তিত রীতিগঠিত নাটক সমূহের সামান্য পরিবর্ত্তন ক্রমে ইউরোপের যে কোন দেশে রপ্তানী সম্ভবপর হইয়াছিল নিজ ফরাসী ভূমিতেই সেই রীতি ক্রমশঃ হতাদর হইয়া পড়িতেছিল, এবং ইংলণ্ডেও পূর্ব্বাপেক্ষা কৃতী, চিন্তাশীল ও মৌলিকতা-সম্পন্ন এক শ্রেণীর নাট্যকারের আবির্ভাব হইতেছিল। নূতন ফরাসী নাটক যে উৎকর্ষহীন হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু একই কারণের বিভিন্ন কার্য্য ফলে ফরাসীগণের নূতন নাট্যকলা প্রবাস-সহনাক্ষম ও ইংলণ্ডীয় নাট্যকারগণ মৌলিকতা-সম্পন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের নাট্যজগতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহার আলোচনা না করিলে ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের এই পুনর্জীবন লাভ সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইংলণ্ডের নাট্য জগতের যে

... ছিল, ... কারণ ... শতাব্দীর মধ্য ভাগে ... পরিবর্ত্তন ঘটে। ইতিমধ্যে লোকসংখ্যার অদ্ভুত বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং রেলপথ প্রতিষ্ঠার ফলে সহর মফস্বলে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা উপস্থিত হয়।

এতাবৎ কাল লণ্ডনে কেবল ড্রুরী লেন্ (Drury Lane) ও কভেণ্ট্ গার্ডেন্ (Covent Garden Theatre) থিয়েটারই নিয়মিত নাটক অভিনয় করিবার দাবী করিত। কিন্তু ১৮৪৩ খৃঃ আইন প্রচলিত হইলে তাহাদের এই একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয়। ইহার ফলে আরও অনেক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং অপরাপর সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় কাটতি ও যোগানের নিয়মানুসারে নাটকাদিরও রচনার সম্ভাবনা হয়। ফ্রান্স, জার্মেণী, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি দেশেও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও যাতায়াতের সুযোগ জনিত অবস্থান্তর ঘটিতেছিল। কিন্তু তত্রত্য রঙ্গালয় সকল সরকারী অর্থে পুষ্ট থাকাতে তথাকার নাট্যচেষ্টা ইংলণ্ডের ন্যায় সাধারণ পণ্যদ্রব্যের স্থল গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে ১৮৭৫খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপ-খণ্ডে পুরাতন প্রণালীই চলিতেছিল, তখনই ইংলণ্ডে উহা স্মৃতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পুরাতন প্রথার প্রতি রজনীতে নূতন নূতন নাটক অভিনীত হইত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হওয়াতে থিয়েটারের ম্যানেজার গণের পক্ষে বিপুল বিজ্ঞাপন প্রচার এবং চাক্‌চিক্যময় সাজ সজ্জার সমারোহ দ্বারা বিশাল দর্শকসংঘের তৃপ্তি বিধান করা আবশ্যক হইল। কাযেই খরচ পোষাইয়া লইবার নিমিত্ত প্রতি রজনীতেই নূতন নাটকের পরিবর্ত্তে, পর পর বহু রজনী একই নাটকের অভিনয় করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইল। অন্যূন পঞ্চাশ রজনীর কম অভিনয় করিলে বিশেষ লোক-সানের ব্যাপার হইত। আরও দেখা যাইত যে, কোন দক্ষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয় কার্য্য যে সকল রঙ্গালয়ের বিজ্ঞব ছিল, উহারাই বিশেষ উন্নতি লাভ করিত। ফলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রারম্ভেই লং'রাণ (Long run) ও 'অ্যাক্‌টর্ ম্যানেজারের (actor manager) রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এই ত গেল এক প্রকার পরিবর্ত্তনের কথা। আর্থিক কারণ বশতঃ আরও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রিন্স-অব্-ওয়েল্‌স্ থিয়েটারের চেষ্টায় ১৮৬৫—৭০ খৃঃ মধ্যে অভিনব রীতির প্রবর্ত্তনের ফলে রঙ্গালয় গুলির প্রতি সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অনুরাগ সঞ্জাত হয়। শতাব্দীর মধ্যকালীন বিশ বৎসরে যখন ফরাসীর প্রভাব সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় ছিল, সেই সময়ে রঙ্গালয়ের অবস্থা অনেকাংশে অধুনাতন যাত্রদলের রঙ্গালয়ের ন্যায় ছিল। দর্শক বৃন্দের মধ্যে অধুনাতম বিশিষ্ট ভদ্রলোক বড় দেখা যাইত না। বাস্তব জীবনের সহিত একেবারে সম্পর্ক-বিরহিত বিষয় সকলের অভিনয়ে রঙ্গালয়ের দর্শকেরা ... থাকিত। ফরাসী নাটকের পাত্র পাত্রীগণকে ইংরেজী ... বেশ ভূষায় উপস্থিত করিবার ফলে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্ত্তা নিতান্ত উদ্ভট বোধ হইত। এতাদৃশ অভিনয় উপভোগ করিবার ফলে দর্শকবৃন্দ একপ্রকার ভুলিয়াই যাইত যে, রঙ্গালয়ের পক্ষে এরূপ উদ্ভট পরিহার করা সম্ভবপর। রঙ্গভূমির দৃশ্য জগতের সহিত বাস্তব জগৎকে মিলাইবার জন্য তাহারা কদাপি চেষ্টা করিত না। কিন্তু নিতান্ত ... রকমের রসিকতা ও করুণ রসের প্রাণ-সংযোগহীন অভিনয় দেখিয়াই এই সকল অভদ্র লোকেরা বাহবা দিত। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আক্ষেপ করিতেন যে ধন দৌলত ও রীতি নীতিতে যাঁহারা দেশের আদর্শ তাঁহারা রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরে পা ফেলেন না। কিন্তু ব্যান্‌ক্রফ্‌টের কর্ত্তৃত্বে রবার্টসনের নাটকাবলীর অভিনয় কালে প্রিন্স-অব্-ওয়েল্‌স্ থিয়েটার ইহার পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সূত্রপাত করে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ও ... শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ভদ্র ব্যক্তিগণ ... এখানে বসিয়া আরাম অনুভব করেন, তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র রঙ্গালয়টিকে রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকদিগের বসিবার স্থান উচ্চ শ্রেণীর রুচি অনুসারে আসবাব পত্র ও সাজ সজ্জা দ্বারা সুশোভিত করিয়া একটি বিরামপ্রদ প্রমোদালয়ে পরিণত করা হয়। ... কথাবার্ত্তার ভঙ্গী, আসবাব পত্র ও বেশভূষার প্রচলন করিয়া এই নাট্যালয় ধনীগণের মনোহরণ করে। ফলে এই রঙ্গালয়েই প্রথমতঃ ৮।১০৲ টাকা দর্শনীর মূল্যে আসনের ব্যবস্থা ...

হইলেও এই আসনগুলি কখনও খালি পড়িয়া থাকিত না। ক্রমশঃ অন্যান্য রঙ্গালয়েও এই নীতি অবলম্বিত হইতে লাগিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানগণের মধ্যে জীবিকা স্বরূপ রঙ্গালয়ে নটবৃত্তি গ্রহণ করায় ক্রমসঞ্জাত আগ্রহও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর রঙ্গালয় প্রীতির আর একটি কারণ। মোট কথা রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন এই কালে জ্ঞানী সমাজের না হইলেও ধনী সমাজের একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের আসনগুলি অধিকার পূর্ব্বক বিশ্বনিন্দুক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ধনী সমাজের আবির্ভাব নাট্য জগতের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সুফল আনয়ন করে নাই সত্য, কিন্তু অনেক বিষয়ে কুফলপ্রসু হইলেও ইহার আর একটা ভাল দিক্ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অমার্জ্জিতরুচি অসভ্যতা অপেক্ষা বরং এই নিন্দুকগণের অপ্রশংসাও বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। তারপর, নাট্যকলায় বেশ-ভূষাদি বহিরঙ্গীয় বাস্তবতা, ও তাহার ফল-ভূত ও আনুষঙ্গিক ভাবে সমাগত ভব্য সমাজের এই নাট্যপ্রীতি, এই উভয়ের ক্রিয়া ফলে ক্রমশঃ সকলের মনে (নেপথ্য) রচনা ও সাজ সজ্জাদির ন্যায় পাত্র-পাত্রী গণের চরিত্রাঙ্কনেও কতকটা স্বাভাবিকতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। কেবল "উদ্ভটত্বের" ক্রীড়াস্থলী না হইয়া অসম্পূর্ণ ভাবে হইলেও রঙ্গালয় সমূহ যাহাতে ক্রমশঃই জীবন সমস্যার আলোচনা ও বাস্তব চিত্র প্রদর্শনের ভূমি হয় তদর্থে প্রয়াস দেখা দিল। অবশ্য এই তথা-কথিত উচ্চ শ্রেণীর প্রভাববশে নাট্যকারগণের দৃষ্টি-পথ সংকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের চিন্তা সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হইল বটে, কিন্তু এই সকল ত্রুটি পরিণামে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল; এবং বুদ্ধিমত্তা সহকারে বাস্তব-চিত্র প্রদর্শন সংপ্রতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হইলেও একেবারে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না থাকা অপেক্ষা অনেক ভাল হইল।

নাট্য-সাহিত্যের দিক্ হইতে এই রঙ্গালয়-প্রীতির ফল যাহাই হউক, অর্থাগমের হিসাবে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৬৫-৭৫, এই দশবৎসরে মফঃস্বল অঞ্চলে নাট্যালয়ের পরিচালন প্রণালী পরিবর্ত্তনের ফলে উপার্জ্জনের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এ সকল অঞ্চলের নাট্যালয়াদি পুরাতন রীতিতেই চলিয়া আসিতেছিল। প্রত্যেক বড় বড় সহরে এক একটি রঙ্গালয় এবং তথায় অভিনয়ার্থ এক একটী দল ছিল। ইঁহারা বহু বিধিসঙ্গত পুরাতন নাটকের অভিনয় করিতেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহর এবং গ্রাম সমূহ একত্র লইয়া একটি মণ্ডল রূপে গণ্য করিয়া বড় সহর হইতে অভিনয়ের দল-লইয়া একজন ম্যানেজার উহার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কখনও বা রাজধানীর কোন বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী একাকী বা দুই একটি সঙ্গী সমভিব্যাহারে মফঃস্বলের রঙ্গালয়-সমূহে স্থানীয় দলের সহিত মিলিয়া অভিনয় দেখাইতেন। বলা বাহুল্য, এই রীতিতে দৃশ্যাবলী, বেশ ভূষা, ও সাজসজ্জার অত্যন্ত অপ্রাচুর্য্য থাকিত এবং অভিনয় প্রায়শঃ সুচারু এবং সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হইত না। পক্ষান্তরে, নানারূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বিবিধ চরিত্রের পাঠ অভিনয় অভ্যাস করাতে এই প্রথায় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর যেমন কার্য্যশিক্ষার খুব সুবিধা ছিল, তেমনি তাহার বিচিত্র শক্তি উন্মেষিত হইবার সুযোগ লাভ করিত। নাট্যস্বত্ব আইনের বলে সুরক্ষিত ছিল না বলিয়া, এবং থাকিলেও, মফঃস্বলস্থ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ কোনরূপে কায়ক্লেশে কার্য্য চালাইতেন বলিয়া, নাট্যকারগণের বিশেষ অর্থ লাভের উপায় ছিল না।

কালক্রমে নানাস্থলে রেল বিস্তারের ফলে ক্রমশঃ এই রীতির পরিবর্ত্তন হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে কয়েক বৎসর মধ্যেই সহর হইতে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফেরার রীতি উঠিয়া যায়, এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের দুই এক বৎসর মধ্যে মফঃস্বলের দলগুলিও উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। কারণ, যাতায়াতের সুবিধা বশতঃ দেখা গেল যে, ইচ্ছা করিলে রাজধানী হইতে অভিনয়ার্থ দলকে দল লোক, এবং প্রচুর পরিমাণে দৃশ্য পটাদিও ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। এ বিষয়ে প্রিন্স-ওব্-ওয়েল্‌স্ থিয়েটারই প্রথমতঃ এক নূতন প্রথার সৃষ্টি করে। রবার্টসন্ প্রণীত নাটকগুলির অভিনয়ে বিশিষ্ট প্রকারের নাট্য-শিল্পের প্রয়োজন হইত; এই সকল নাটকের অভিনয়োপযোগী সাজ সজ্জা বেশ ভূষা, নাট্য-ভূমির

রচনা ও দৃশ্য পট-সমাবেশাদি ও অভিনয় এরূপ বিশিষ্ট-প্রকৃতিক ছিল যে মফঃস্বলের নাটকের দলের পক্ষে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করা একরূপ অসাধ্য ছিল। অথচ সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে এ সমস্ত লণ্ডন হইতে লইয়া গিয়া অভিনয় দেখান সম্ভব হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে একটি দল গঠিত হয়। উহারা লণ্ডনেই মহলাদি দিয়া রবার্টসনের একখানি নাটক (Caste) অভিনয়ার্থ প্রস্তুত করিয়া মফঃস্বলের রঙ্গালয়ে উহার অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তত্রত্য নাট্যামোদী ব্যক্তিবর্গকে লণ্ডনের নাট্যাভিনয়ের আস্বাদ প্রদান করে। অভিনয়ের বাধাহীন অনায়াস গতি, পাত্র পাত্রীগণের পরস্পর ব্যবহারের মাধুর্য্য, ইত্যাদি কলা-নৈপুণ্যে মফঃস্বলের চক্ষে একেবারে অভিনব সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়, এবং এই রীতি বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করে। ইহার দেখা-দেখি ঐ সঙ্গেই হে-মার্কেট থিয়েটারের নাটকের দল মফঃস্বলের রঙ্গালয় সমূহে যাইয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করে। এরূপ আরও বহু দল প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য যে এরূপ অবস্থায় মফঃস্বলস্থ নাটকের দলের টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ তাহাদের নাট্য কৌশল ইহাদের তুলনায় হাস্যাস্পদ হইত, এবং রাজধানী হইতে একটি দল যখন মফঃস্বলের কোন রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখাইত তখন স্থানীয় দলটি নিকর্ম্মা বসাইয়া রাখিতে হইত। ফলে ১৮৭৫ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মফঃস্বলের দলগুলি উঠিয়া গেল, এবং তত্রত্য অধিবাসী বর্গ নানারূপ খাপছাড়া ত্রুটিপূর্ণ অভিনয়ের পরিবর্ত্তে প্রাণ-হীন যন্ত্র-চলিতবৎ কিন্তু নিখুঁত অভিনয় দর্শনে নিজ নিজ তুষ্টি বিধান করিতে লাগিলেন। ইহাতে একদিক দিয়া যেমন কিছু উন্নতি দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে অপরদিকে তেমনই নাট্যজগতের ক্ষতি ও লক্ষ্যভূত হয়। পূর্ব্বে মফঃস্বলের রঙ্গালয় সমূহে নটনটীদের মধ্যে বিচিত্র কলা-কৌশল উন্মেষিত হইবার সুবিধা ছিল বলিয়া ইহাদিগকে রাজধানীর রঙ্গালয়ের দক্ষ শিল্পীগণের সূতিকাগৃহ বলা যাইত; কিন্তু এখন মফঃস্বলের অভিনয় লণ্ডনের অভিনয়ের অনুকরণ মাত্র হইয়া পড়িল। মফঃস্বলের রঙ্গালয়গুলি তাহাদের বিশেষত্ব হারাইয়া কেবল 'লণ্ডন-ইস্তাহারী' নাটকগুলির কাটাম মাত্রে পরিণত হওয়াতে স্থানীয় রঙ্গালয় সম্পর্কে অধিবাসীগণের নিজস্ব বলিয়া গৌরব অনুভব করিবার কিছুই রহিল না। আবার যাতায়াতের সুবিধা বশতঃ লণ্ডনের নাট্যকলা যেমন মফঃস্বলে আসিতে লাগিল, তেমনি মফঃস্বল হইতে অভিনয়-দর্শকগণেরও লণ্ডনে যাতায়াত সহজ হইল। ফলতঃ এই হইল যে লাঙ্কাশিয়ার (Lancashire) ইয়র্কশিয়ার (Yorkshire) ও মধ্যদেশস্থ জেলা সকলের অর্থশালী লোকেরা হয় লণ্ডনে গিয়া থিয়েটার দেখিতেন নতুবা লণ্ডনের দল মফঃস্বল সহরে আসিলে তথায় থিয়েটার দেখিতেন। এই সকল কারণে মফঃস্বলে উচ্চাঙ্গের লঘু বা গুরু ভাবাত্মক উভয় প্রকার নাটকেরই অবনতি সংঘটিত হয়। এবং তত্রত্য রঙ্গালয়গুলি কেবল গীতি বহুল প্রহসনাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য হয়।

আমরা নাট্য জগতের যে সকল পরিবর্ত্তনের বিবরণ উল্লিখিত করিয়াছি তাহা আধুনিক কালের অবস্থানুগত উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ইহার অন্য ফল যাহাই হউক, এই সকল অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের স্রোতে নাটক-রচয়িতার পক্ষে যে সুযোগ উপস্থিত হয় তাহাই নাট-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়।

নূতন রীতির ব্যবস্থা ফলে গ্রন্থকারের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। লণ্ডনের কোন থিয়েটারে তৎপ্রণীত কোন নাটক লোকপ্রিয় হইলে বহুদিন ধরিয়া উহার অভিনয় চলিত, দশদিকে রঙ্গালয় ভরিয়া যাইত, এবং বহু মূল্যের টিকিট বিক্রয় করিয়া খুব টাকা উঠিত। নাট্যকার ইহার একটা অংশ পাইতেন। কখনও বা কোন নাট্যকারের তিন চারি খানি নাটক একই সঙ্গে বিভিন্ন দলে মফঃস্বলে চলিতে থাকিত। ইহাতে তাহার একটা নিয়মিত আয়ের পন্থা হইত। পরিশেষে আন্তর্জাতিক গ্রন্থ-স্বত্বের বিধি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে অভিনয়-স্বত্ব রক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবপর হওয়াতে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আমেরিকা হইতেও

[illegible] অর্থাগম হইতে লাগিল। সুতরাং [illegible] নাটককারগণের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের "অন্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" অবস্থা ঘুচিয়া গেল। এক্ষণে তাঁহাদের অনেকের অবস্থা [illegible] ও সমৃদ্ধিপন্ন হইয়া উঠিল। ইহার ফলে তাঁহারা অধ্যয়নের অবসর হাতে সমর্থ হইলেন, বিশেষ চিন্তা ও সাবধানতার সহিত গ্রন্থ রচনার অবসর পাইলেন, এবং সময়ে সময়ে নিজে-দের ইচ্ছামত নাট্যকলায় নূতন পদ্ধতির পরীক্ষার্থ দুই একটা নূতন ভাবের রচনা করিবার সুযোগও প্রাপ্ত হইলেন। কারণ এরূপ পরীক্ষায় একবার কোন সুফল না ফলিলেও সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা রহিল না। এই সকল কারণে নাটক-রচয়িতা [illegible]গণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং জোর্জ আলেক্‌জাণ্ডার, উইণ্ডহাম (Wyndham) প্রভৃতি নাট্যাচার্য্যগণের সহানুভূতি পাইয়া এই প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। আর একটা কারণে বিশেষ করিয়া নাট্য সাহিত্যের উপকার সম্পাদিত হইল। দেশে বা বিদেশে গ্রন্থ-স্বত্ব রক্ষার বিধি নিয়মে [illegible] থাকিলেও এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছিল যে গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় নাট্যকারের অভিনয়-[illegible] হইত না। ইহার ফলে কাজেই আধুনিক লেখক [illegible] তাঁহাদের রচিত নাটকাবলী যাহাতে সাহিত্য-মর্য্যাদাও [illegible] করে, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হইতেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নাট্যকারগণের ন্যায় তাঁহাদের রচনা হাতের লেখা কাপিতে লুকাইয়া রাখিতে হইত না, বা কেবল নাটকের মহলা দেওয়ার [illegible] সংস্করণে লুকায়িত রাখিতে হইত না; পরন্তু এখন [illegible] গ্রন্থাকারে ছাপা করিয়া সাধারণ সাহিত্যের মত প্রকা-শিত করা সম্ভব হইল। রচয়িতাগণ এখন ভরসা করিতে পারেন যে, রচিত গ্রন্থ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনয় কালে [illegible] দর্শক বৃন্দের রুচি বা চিন্তার সীমার বহির্ভূত হইলেও [illegible] হইলে সাহিত্যরূপে জীবিত থাকিতে পারিবে।

এই সকল নানা কারণে নাট্য জগতে একদিকে যেমন [illegible] নাট্যরীতি অস্বাভাবিক স্রোতে অতি ধীরে ধীরে উহার [illegible] হ্রাসের লক্ষণ দেখা দিতেছিল, তেমনি অপরদিকে [illegible] নাট্যকারগণের মধ্যে মৌলিকত্বের আবির্ভাব হইতে ছিল। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে ১৮৬০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসী প্রভাবের প্রাবল্য [illegible] ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত ফরাসী নাটকের অনুবাদ ও অনুকরণ, ইংরাজ নাট্যকারের মামুলি কায ছিল। মৌলিক রচনায় তাঁহারা কদাচিৎ হাত দিতেন। কিন্তু ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ পর্য্যন্ত এই ফরাসী প্রভাবের পূর্ণ কালের মধ্যেই নব জীবনের প্রারম্ভ ধীরে ধীরে সূচিত হইতেছিল। এই দশ বৎসর মধ্যে ফরাসী প্রভাব অতি ধীরে ধীরে কমিতেছিল, এবং সেইরূপ অতি ধীরে ধীরে মৌলিক রচনা বৃদ্ধি পাইতে-ছিল।

ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের এই নব যুগ তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। ১৮৮০—৮৮ খৃঃ প্রথম যুগ, ১৮৮৯—৯২ খৃঃ দ্বিতীয় যুগ এবং তাহার পর হইতে তৃতীয় যুগের আরম্ভ। এই তিন স্তরেই ইতিহাসে সার এ. ডব্লু. পিনারোর (Sir A. W. Pinero) নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসী প্রভাবের পূর্ণ রাজত্বের মধ্যে সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উল্লেখ যোগ্য নাটক এবং হে-মার্কেট থিয়েটারে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আর একখানি নাটক অভিনীত হয়। এবং ১৮৮৫—৮৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার তিন খানি উৎকৃষ্ট প্রহসন অভিনীত হয়। টেরীর থিয়েটারে (Terry's Theatre) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে (Sweet Lavender) লঘু ভাবাত্মক নাটক অভিনয়ের পর হইতে মৌলিক হাস্য-রসিক নাট্যকার রূপে তিনি নাট্য-জগতে সম্মানের আসন প্রাপ্ত হন। এই স্থানে প্রথম স্তরের শেষ বলা যাইতে পারে। এই স্তরে পিনারো ব্যতীত অপর কোন নাটককারের রচনায় মৌলিক রস দৃষ্ট হয় না।

ইহার পরবর্ত্তী স্তর ১৮৮৯ হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। নব গ্যারিক থিয়েটারের (New Garrick Theatre) কর্ত্তৃত্বে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পিনারোর (The Profligate) নাটকের অভিনয় হইতে এই স্তরের আরম্ভ। এই নাটক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হইলেও মৌলিকতা হিসাবে পূর্ব্বের সকল নাটকে যাহা দেখা গিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক অগ্রসর। এই

স্তরে আরও অনেক নাট্যকারের মৌলিকত্ব দেখা যায়। জোন্স্ (H. A. Jones), সিডনী গ্রাণ্ডী (Sydney Grundy) প্রভৃতি যাঁহাদের নাটকাবলীতে এ পর্য্যন্ত কোন মৌলিক বিষয়ের চিহ্ন দেখা যায় নাই, তাঁহারাও এখন মৌলিকত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই সেণ্ট জেমস্ থিয়েটারের সম্পর্কে আর, সি, কার্টা (R. C. Carta), হ্যাল্ডন চেম্বার্স (Haldon Chambers) ও অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar Wilde) প্রভৃতি কয়েক জন নূতন লেখক নাট্য রচনায় মৌলিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন।

কিন্তু এই সময়ের পরে ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের নবযুগে আর একটি প্রভাবের কার্য্যফলে উহার তৃতীয় স্তর আরম্ভ হয়। রঙ্গালয় সম্পর্কিত নানা ব্যাপারের নব নব প্রথার পরিবর্ত্তন ফলে নাট্যকারগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিভা নানাদিকে স্ফুরিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইল। ইহার ফলে নাট্য সাহিত্যে যে নব জাগরণ দেখা দেয় তাহার দুই স্তর বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর অপর একটি চিন্তা-প্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় ফরাসী সাম্রাজ্য যুগের নাট্যকারগণের পুরাতন রীতির বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের নাট্য-সাহিত্যে নব যুগের পত্তন সুদৃঢ় হইয়াছিল। নাট্য-সাহিত্যের এই নব প্রথার ইতিহাসেও ফরাসী রাজধানী প্যারী নগরীর প্রচেষ্টাই সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ যোগ্য। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইউরোপীয় উন্নত দেশ সমূহের নাট্য কলায় ফরাসী প্রাধান্যই লক্ষ্যগোচর হইত। অথচ সেই ফরাসী দেশেই প্রথমতঃ পুরাতন ফরাসী রীতির বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। প্রথম অঙ্কে পাত্রপাত্রীগণের একটি হাস্য কৌতুকচ্ছটায় বিজড়িত উজ্জ্বল চিত্র প্রদান করতঃ পরবর্ত্তী দুই অঙ্কে ঘটনার উপর নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়া চতুর্থ অঙ্কের প্রায় শেষ ভাগে নাটকের কার্য্যের অন্তিম অঙ্ক (Climax) ঘটাইয়া পঞ্চম অঙ্কে শুভ পরিণামে নাটকের পরিসমাপ্তি করিয়া রজনী দ্বিপ্রহর না হইতেই যাহাতে দর্শকগণ বাড়ী ফিরিতে পারেন, তাহার সুযোগ প্রদান করাই ছিল স্ক্রাইবের রীতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে ফরাসীয় নাট্য জগতের এই রীতির বিরুদ্ধে একদল যুবক নানা আপত্তি উত্থাপন করিতে থাকে। এই রীতির গতানুগতিক কৃত্রিমতা তাহাদের অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছিল। এই রীত্যনুযায়ী নাটক-সমূহের শেষাঙ্কে আয়াস-সংঘটিত শুভ পরিণাম হইত বলিয়া অথচ সংসারে সুলভ এবং অনেক সময় ঘটনাস্রোতের স্বাভাবিক পরিণতি প্রসূত হইত না বলিয়া ইহাদের বিরক্তি জন্মিয়াছিল। অধিকন্তু এই সকল পুরাতন নাটকে মানব জীবন সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত হইত, কোঁৎ (Comte), ডারুউইন প্রভৃতির প্রচারিত প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশ মতের প্রচার ফলে উহার বিপরীত মানবীয় আদর্শের ধারণায় ইহারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। মানব জীবনের এই নূতন আদর্শের নাম প্রকৃত-বাদ বা Naturalism. ইহাই পরিণামে হেন্‌রি বেক্ (Henry Begue) এর রচনায় প্রযুক্ত হইয়া নাট্য-সাহিত্যে এক আন্দোলন উপস্থিত করে। ইহার ফলে নূতন রীতিতে যে সকল নাটক রচিত হইয়াছিল উহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও সংক্ষেপে 'নব নাটক' (New Comedy) নামে অভিহিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বেক্ পরলোক গমন করেন, এবং তাঁহার জীবনের শেষ দশ বৎসরে তিনি বিশেষ কিছু রচনা করেন নাই। কিন্তু এই সময় তাঁহার শিষ্যগণ নিশ্চেষ্ট ছিল না। ইঁহাদেরই মধ্যে একজনের মাথায় একটি নূতন কল্পনা উদিত হয়। এই ব্যক্তির নাম আঁদ্রি আঁতোয়া (Andre Antoine). ইনি বিবেচনা করিলেন যে, রীতিমত আটঘাট বাঁধিয়া নাট্য জগতে নূতন পদ্ধতির পরীক্ষার দিন আসিয়াছে এবং সেই উপায় অবলম্বনেই পুরাতন প্রচলিত পন্থার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। তাই তিনি একদল যুবক নাট্যকার লইয়া একটা নূতন রঙ্গালয় খুলিলেন, এবং অগ্রিম মূল্য প্রদান পূর্ব্বক অর্থ সাহায্য করতঃ ইঁহাদের অভিনীত নাটকাদি দেখিবেন এরূপ একদল দর্শকও প্রাপ্ত হইলেন। যাহাতে তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন নাটক অভিনয়ে সরকারী নাটক-পরীক্ষক কর্ম্মচারী বা (Censor)

আসিয়া রাগিণী দিতে পারেন, তজ্জন্য এই রঙ্গালয়ের অভিনয় সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। অন্যান্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অনুসৃত রীতির পরিবর্ত্তে নিয়ম করা হইল যে, ইঁহারা কোন নাটকই তিন রাত্রির অধিক কাল অভিনয় করিবেন না। এই রঙ্গালয়ই আধুনিক নাট্য-জগতে সুবিখ্যাত থিয়েটার লিব্রী (Theatre libre) বা স্বাধীন-তন্ত্র রঙ্গালয়। এখন ইঁহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহাই দেখা যাউক।

এই নূতন দলের উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁহারা ডুমা ও অগিয়ের নাটকাদি-বিহিত অস্বাভাবিক উপাদান গুলির নিরসন করিবেন। মূল গল্পাংশের অন্তর্বর্ত্তী আর একটি উপগল্প, প্রথমাঙ্কের পরবর্ত্তী দর্শকের স্মৃতি বিপর্য্যয়কারী ঘটনা-প্রাচুর্য্য, এবং শেষ অঙ্কের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ শুভ পরিণাম বিদূরিত করিতে হইবে। নাটকে সাক্ষাৎ ভাবে কোন মতবাদের প্রচার থাকিবে না, পরন্তু যথার্থ ভাবে চরিত্র-চিত্রণ থাকিবে। নাট্যকার বাস্তব জীবনের একটি টুকরা, ঠিক যে রূপ থাকে সেরূপ ভাবে, দর্শকের সমক্ষে তুলিয়া ধরিবেন; জোর করিয়া স্বীয় কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবেন না। নব প্রচারিত এই প্রকৃতি-সিদ্ধ আদর্শের অনুসারে অভিনয় কলাও যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পূর্ব্ব যুগের অভিনয়-কার্য্যের লক্ষণ ছিল যে, নাট্যকারের কোন রসিকতা-পূর্ণ বাক্য ফুটাইয়া তোলা হইত, অথবা অভিনয়কারীর কোন ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বা মুদ্রা-দোষ পর্য্যন্তও পরিপূর্ণ করিয়া দেখান হইত। আঁতোয়া ও তাঁহার সহচরগণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন অভি-নয়ের প্রতি কথায় ও অঙ্গ ভঙ্গীতে যেন কেবল নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণের মনোগত ভাব ও ব্যক্তিগত বিশেষত্বই দর্শকের বোধগম্য হয়।

থিয়েটার লিব্রী সংকল্পিত উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সফল করিতে পারে নাই। কার্য্যতঃ ইহারা পুরাতনের দোষ এড়াইতে গিয়া অপর চরমে উপস্থিত হয়; বাঁধা রীতির বিধি নিষেধের কড়া শাসন ছাড়াইতে গিয়া একেবারে শৃঙ্খলাচ্যুত হইয়া পড়ে। গল্প-গ্রন্থনে জটিলতা দোষের ছিল বটে, কিন্তু ইহারা অনেকে একেবারে গল্পাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাটকের সর্ব্বত্রই চরিত্র-বিশ্লেষণেই ব্যাপৃত হয়। অধিকন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই যেন অত্যন্ত প্রীতি সহকারে অতিরোচিত ভাষা এবং অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা ও বীভৎস চিত্রাদি দর্শকবৃন্দের সমক্ষে উপস্থিত করতঃ একদল নির্ব্বোধ কোলাহলকারী লোকের প্রশংসা লাভ করিয়া অন্যদিকে নানারূপ হিতকারী এই প্রতিষ্ঠানটির উপরে অনেকের বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে। ফলে ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত আট বৎসর লোকের কৌতুহল ও বিদ্রূপ উদ্রেক করিয়া ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে থিয়েটার লিব্রী উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে ইহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আঁতোয়া যে কেবল প্রকৃতি-মূলতাবাদী ফরাসী গ্রন্থকারগণের রচিত নাট্যা-দিরই অভিনয় করিতেন তাহা নহে, অন্য দেশস্থ যে সকল নাটকাদি পুরাতন ফরাসী নাটকের রীতি বা ভাবের অধীনতা-পাশ কাটাইতে পারিয়াছে তাহাদেরও অভিনয় হইত। এই হেতু থিয়েটার লিব্রীতে ইব্‌সেনের কয়েকখানি নাটকেরও অভিনয় হয়। ইব্‌সেনের নাটকাদিরও প্রচুর পরিমাণে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইব্‌সেনের নাটকাবলীর নূতনত্ব এই আন্দোলনে নূতন শক্তি সংযোগ করিয়াছিল। এই সকল নব নব চেষ্টার ফলেই ফরাসী দেশে 'নব নাটকের' অভ্যুত্থান হয়। থিয়েটার লিব্রী বহুকাল স্থায়ী না হইলেও নাট্য জগতে যে পরিবর্ত্তিত চিন্তা ধারায় নাটকের নূতন আদর্শ ও তাহার সাধনা কল্পে এই রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার কার্য্য-কলাপে সেই চিন্তা ধারা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে, এবং নাট্য জগতে এক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। নিজ ফরাসী দেশেও এক দল লেখক দূর হইতে থিয়েটার লিব্রীর এই দলের কার্য্য কলাপ পরিহার করিয়া চলিতেন বটে,কিন্তু ইহাদের প্রয়াসের ফলে নাট্য-জগতে যে নৈতিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন আসিল উহার ফল ভোগ করিতে তাঁহারাও অগ্রসর হন। এবং থিয়েটার লিব্রীর দলেরও কেহ কেহ নাট্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যে নাটক সমূহ লিখিয়াছেন তাহাই আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে 'নব নাটক' নামে অভিহিত হয়।

যে নূতন ভাবপ্রবাহের প্রেরণা বশে ফরাসী দেশে নাটকীয় সাহিত্যে এই যুগান্তর সংঘটিত হয়, সেই ভাবপ্রবাহ জর্ম্মেনী ও ইংলণ্ডেও বিস্তৃত হয়। থিয়েটার লিব্রীর অনুকরণে নাট্য জগতের স্বাধীন তন্ত্রের প্রসারার্থ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নূতন ভাবের নাটকাদি অভিনীত হইতে থাকে। জার্মেনীতে থিয়েটার লিব্রীর অনুকরণে বার্লিন সহরে ফ্রাই বুন্ (Frie Buhen) নামে স্বাধীন তন্ত্রের নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নব্য তন্ত্রের রঙ্গালয় সমূহের মধ্যে ফ্রাই বুন্ বিশেষ সৌভাগ্য-সম্পন্ন বলিতে হইবে। লণ্ডন ও প্যারী সহরস্থ অনুরূপ রঙ্গালয়গুলির ন্যায় ইহাকে লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই, পরন্তু প্রথম হইতেই বিশিষ্ট সমালোচকগণের পোষকতা প্রাপ্ত হইয়া এই নব্য তন্ত্রের নাট্যালয় নির্ব্বিবাদে স্বীয় আদর্শের প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। এই নব্য আদর্শের প্রচারে ইব্‌সেনের নাটকাবলীর প্রভাবও বিশেষ কার্য্যকর হইয়াছিল। জার্ম্মেনীতে ১৮৭৫ খৃঃ হইতেই ইব্‌সেনের রোমান্টিক লক্ষণাক্রান্ত নাটকাবলী প্রচারিত হইয়াছিল। শতাব্দী শেষ হইবার বিংশ বর্ষ পূর্ব্বেই ইব্‌সেন ও বোর্ণসন রচিত নাটকাদি জার্মেন রঙ্গালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল নাটকাদিও স্ক্রাইব, ডুমা প্রভৃতির রীতি-গর্ভ ছিল বলিয়া মৌলিক নব নাটকীয় যুগের প্রবর্ত্তন কল্পে ইহাদের প্রভাব কার্য্যকর হয় নাই। ইব্‌সেনের 'প্রেতাত্মা' (Ghosts) নাটকে প্রচলিত ফরাসী রীতি পরিত্যক্ত হইয়া অভিনব নাট্য-রীতি পরিগৃহীত হয়। ফ্রাই বুন্ থিয়েটারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই নাটকের অভিনয় হয়। ইহার পর হইতেই নাট্য জগতে নব যুগের প্রেরণা ও ইব্‌সেনের প্রভাব মিলিত হইবার ফলে অল্পকাল মধ্যেই জার্‌মেনীতে এক দল নূতন মৌলিক নাট্যকারের আবির্ভাব হয়। ফলে হাউপ্টমান (Hauptmann) ম্যাক্স হাল্‌ব্ (Max Halbe) হর্টেলবেন (Hartleben) প্রভৃতি নব্য তন্ত্রের নাট্যকারগণের রচনা সমূহ সাধারণ্যে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে অতঃপর ফ্রাই বুনের স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনতার ধ্বজা তুলিয়া রাখার প্রয়োজন দূরীভূত হয়। ফ্রাই বুনের দলের বহির্ভাগেও সুডারম্যান (Sudermann), স্নিজ্‌লার, ডেডেকাইণ্ড (Dedekind) ও হফমানষ্টাল (Hofmansthal) প্রভৃতি নাট্যকারগণ নব্য তন্ত্রের নাটক প্রণয়নে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

ফরাসী ও জার্ম্মান দেশের এই নূতন বাতাস ইংলণ্ডেও বহিয়াছিল। থিয়েটার লিব্রীর অনুকরণে লণ্ডনে স্বাধীন রঙ্গালয় (Independent Theatre) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উহার প্রথম অভিনয়ে ইবসেনের 'প্রেতাত্মা' নাটক অভিনীত হয়। এই রঙ্গালয়ে জোলার (Zola) রচিত নাটকাদির অনুবাদও অভিনীত হইত। কিন্তু এক বার্ণার্ড শ (Bernard Shaw) [বিপত্নীকের বাড়ী (Widower's Houses)] ব্যতীত অপর কোন মৌলিকত্ববিশিষ্ট নাট্যকারের আবির্ভাব এই রঙ্গালয় সম্পর্কে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এইরূপ নব্য রীতির প্রচলন ও ইব্‌সেনের নাটকাদির অভিনয় নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয় নাই। বিশেষতঃ ইবসেনের নাটকাদির অভিনয় লইয়া নাট্য-জগতে হুলস্থুল সহকারে প্রতিবাদ উপস্থিত হয়। অনেকে অবশ্য না বুঝিবার ফলে এই বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ যে বাস্তবিকই সুগভীর বিরাগ বশতঃই এই প্রতিবাদ কার্য্যে অগ্রসর হন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুবুদ্ধিবশেই হউক, বা বিপরীত বিশ্বাস বশতঃই হউক, প্রখ্যাতনামা নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই ইব্‌সেনের প্রতিবাদীপক্ষেই দণ্ডায়মান হন। মত প্রকাশ কালে ইব্‌সেনের সম্মানসূচক মন্তব্যাদি করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা তৎপ্রতি অনুরাগের অভাব লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ইব্‌সেন স্বরচিত নাটকাবলীতে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবে নানা প্রকার শিল্পগতিক রঙ্গ-চাতুর্য্য ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা একবার প্রত্যক্ষ করিলে চিন্তাশীল নাট্যকার উহা কখনও ভুলিতে পারেন না, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই শক্তির মোহে অভিভূত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে জন সাধারণের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ এবং যাঁহারা নাট্য সমালোচনায় জীবনাতিপাত করেন, তাঁহারাও ইব্‌সেনের প্রভাবে আক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ইব্‌সেনের নাটকের প্রতি তাঁহাদের বাস্তবিক বিরাগ ছিল বটে, কিন্তু

একবার এই নাটক দেখিলে পুরাতন রীতির নাটক আর তাঁহাদের ভাল লাগিত না, পরন্তু উহা অধিকতর বিরাগভাজন হইয়া পড়িত। অকিঞ্চিৎকর বিষয়মূলক ফরাসী নাটকের প্যানপেনে ভাবের স্বদেশীয় নাটকে আর তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। বস্তুতঃ নব্য তন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইব্‌সেনের আবিষ্কারে সকল দিকেই পুরাতনের প্রতি অনুরাগের অন্তর্দ্ধান এবং উন্নততর অজানা একটা কিছুর দিকে উত্তেজনা সকলেরই মনে সঞ্জাত হয়।

এইরূপে ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের তৃতীয় স্তরের আবিষ্কার সূচিত হয়। রবার্টসন প্রবর্ত্তিত বহিরঙ্গীয় বাস্তবতা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি জনিত চিন্তা ও নব প্রচেষ্টার অবসর, ফরাসী দেশে স্ক্রাইব প্রবর্ত্তিত রীতির পরিবর্ত্তে সরল ও স্বাভাবিক নাট্য রীতির প্রচলন, এবং সর্ব্বোপরি ইব্‌সেনের প্রতিভা সংস্পর্শে ইউরোপের নাট্য জগতে বিদ্যুৎস্পন্দন,—এই সকল সম্মিলিত হইয়া এই তৃতীয় যুগের ভিত্তি গঠিত করিয়াছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্টজেমস থিয়েটারে পিনারোর একখানি নাটকের অভিনয়ে এই যুগের আরম্ভ। এই নাটকে ইংরাজের সামাজিক জীবনের গভীর উদ্দেশ্য মূলক চিত্রণ দেখা দেয় এবং ইংরাজী নাটক কেবল ইংরাজের দেশেই আবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র ইউরোপের অনুরাগ লাভের অধিকারী হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত হয়। নাটকথানি দোষশূন্য না হইলেও ডুমা, সুডারমান, ব্যোর্ণসন, ইকাগারে (Echagarey) প্রভৃতির নাটকের সহিত তুলনার যোগ্য হইয়াছে, এবং নাট্যকলায় উহাদের অনুরূপ মর্য্যাদা পাইতে পারে। ইহার পরে পিনারো অপর কতকগুলি নাটকেও পরিকল্পনা ও চিন্তাশীলতায় মৌলিকত্বের পরিচয় দেন। গ্রাণ্ডী, চ্যাম্বার্স প্রভৃতি নাট্যকারগণও পূর্ব্বাপেক্ষা মৌলিকতা সহকারে বহু নাটক রচনা করেন। কেবল যে এই সকল পূর্ব্বপরিচিত নাট্যকারগণের রচনারই এই তৃতীয় স্তরে মৌলিকতার প্রসার দেখা যায় তাহা নহে। পরন্তু জে এন্ ব্যারী (J. N. Barrie) মিসেস ক্রেইজি (Mrs. Craijie) প্রভৃতি অনেক নূতন গ্রন্থকারও এই যুগে মৌলিক নাট্য রচনায় অগ্রসর হন।

পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তনে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়। ইহার মধ্যে কয়েকটি অল্পকাল স্থায়ী ছিল, কিন্তু ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত "ষ্টেজ সোসাইটি" (Stage Society) নামক নাট্য সমিতি বিশেষ শক্তি ও সহানুভূতি সহকারে পরিচালিত হইয়া নাট্য জগতে সবিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল। ইঁহারা বার্ণার্ড শ, ইব্‌সেন, মেটালিঙ্ক (Maeterlinck), হাউপ্টম্যান প্রভৃতির নাটক অভিনয় করিতেন। এস্থলেও দীর্ঘকাল একখানি নাটকের অভিনয় রূপ পূর্ব্বরীতি পরিত্যক্ত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে নাট্যকাররূপে গ্র্যান্‌ভিল বার্কার নাট্য জগতে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার ফলে ১৯০৪—১৯০৭ এই কয় বৎসর নাট্য জগতের মানস ক্ষেত্রে অসাধারণ কর্ম্ম প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয়। পুরাতন প্রথানুসারে প্রতি রজনীতে নব নব নাটকের অভিনয় ও 'লংরান' প্রথানুযায়ী একই নাটকের উপর্য্যুপরি বহুরজনী অভিনয়, এই দুই প্রথার মাঝামাঝি 'শর্ট রাণ' প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক ইঁহারা একখানি নাটক উপর্য্যুপরি অল্প কয়েক রজনী মাত্র অভিনয় করিতেন। এইরূপে ইঁহারা প্রধানতঃ বার্ণাড শ'র নাটকাবলীর অভিনয় দ্বারা উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগের সৃষ্টি করেন। জন গ্যালস্‌ওয়ার্দ্দী (John Galsworthy) প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারগণের রচনাও ইঁহাদের দ্বারা অভিনীত হয়। জিলবার্ট মারে (Gilbert Murrey) কর্ত্তৃক অভিনয় যোগ করিয়া লইয়া ইঁহাদের দ্বারা ইউরিপিডিসের (Euripedes) কয়েক খানা নাটকও অভিনীত হয়।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার, ষ্টেজ সোসাইটী এবং ডেড্রেন বার্কারের দলের চেষ্টার প্রভাব স্থানীয় অবস্থার সহিত মিলিত হইবার ফলে ডাব্লিন (Dublin) সহরেও আইরিশ ন্যাশনেল থিয়েটারের (Irish National Theatre) প্রতিষ্ঠা হয়। কবি ইয়েট্স (W. B. Yeats) ও জে, এম সিঞ্জে (J. M. Synge) প্রভৃতির নাটকাবলী এখানে

অভিনীত হয়। যাহাতে নিজেদের সহরেই নাটকের দল সংস্থাপিত হইয়া কোন নাটকের অল্প কাল স্থায়ী অভিনয় করিতে পারে এবং লণ্ডন হইতে একটা দল আসিয়া নাটক দেখাইয়া যাইবে এই প্রয়োজন না থাকে, তদর্থে ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাসগো সহরেও ব্যবস্থা হয়।

এইরূপে নানা ব্যবস্থায় নাট্য জগতে স্বদেশী ভাবের পুনরাবির্ভাবে নাট্য-সাহিত্যের পুনর্জ্জন্ম হয়, এবং সাহিত্য ও রঙ্গালয় এতদুভয়ের মধ্যে পুরাতন স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য যে আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে শ্রব্য কাব্য হিসাবে নাটকের অভাব নাই। টেনীসন, সুইনবার্ণ প্রভৃতির ন্যায় বর্ত্তমান রাজ-কবি রবার্ট ব্রিজেস (Bridges) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজ-কবি আলফ্রেড অষ্টিন (Alfred Austin) প্রভৃতি নাট্যাকারে বহুতর কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদিও এমন অনেক নাটক রচিত হইতেছে যে উহার অভিনয় হয় ত একেবারে অসম্ভব অথবা রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা কেবল পাঠকের মনেই অনুরাগ জন্মাইতে পারে, তথাপি গত পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় ইংরাজী নাটকাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় সাহিত্য-রসের অভাব অনুভূত হয় না। ফলতঃ রঙ্গালয় ও সাহিত্যের ব্যবধান পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে ঘুচিয়া গিয়াছে।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার।

আদর্শ ব্যায়াম-পদ্ধতি

বিগত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রতিভায়' প্রকাশিত 'জিম্‌ন্যাষ্টিক' শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত চতুর্বিধ জিম্‌ন্যাষ্টিকের দোষগুণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এই পদ্ধতি-চতুষ্টয়ের মধ্যে মূলতঃ খুব বেশী পার্থক্য নাই; বরং অনেক বিষয়েই অনেক সৌসাদৃশ্যই আছে এবং চেষ্টা করিলেই, ইহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য-বিধান করাও নিতান্ত কঠিন নহে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিভিন্ন পদ্ধতির গোঁড়াগণ, স্ব স্ব পদ্ধতির প্রতি অন্ধ অনুরাগ বশতঃ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, এইরূপ সামঞ্জস্য-বিধানের কোনও রূপ চেষ্টা না করিয়া, পরস্পরের দোষ-কীর্ত্তনেই নিজেদের সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তির নিতান্ত অপব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে প্রকৃত হস্তী পাখা, রজ্জু, বৃক্ষকাণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ড—ইহার কিছুই নহে। প্রত্যেক প্রকার পদ্ধতিরই ২।৪টী উৎকৃষ্ট গুণ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনটীই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নহে; এমন কি, উহাদের প্রত্যেকের উৎকৃষ্টাংশ লইয়া একটী মাত্র ব্যায়াম-পদ্ধতির সৃষ্টি করিলেও তাহাও আমাদের বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী আদর্শ পদ্ধতি হইতে পারিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাগুক্ত চারি প্রকার পদ্ধতির কোনটীতেই স্ত্রীলোকের পক্ষে উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা নাই। পুরুষের পক্ষে উপযোগী ব্যায়ামে যে স্ত্রী জাতির শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না, ইহা সহজেই অনুমেয়; অথচ স্ত্রী জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে যে পুরুষেরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত, তাহা বোধ হয় আর কাহাকে ও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং আদর্শ ব্যায়াম-পদ্ধতিতে স্ত্রীলোকের পক্ষেও উপযোগী ব্যায়ামের যথাসম্ভব ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

জিম্‌ন্যাষ্টিকের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই অনুমিত হইবে যে, সাধারণতঃ যুবকদের জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ যুবক মাত্রেরই কিছু না কিছু জিম্‌ন্যাষ্টিক করা উচিত। ইহাতে যে শুধু শরীরের বলাধান হইবে, তাহা নহে। তা ছাড়াও জিম্‌ন্যাষ্টিকের আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গুণ আছে। ইহাতে মন সর্ব্বদাই উৎফুল্ল থাকে, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয় এবং আত্মনির্ভরতাতে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্মুখ প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিয়া বিজয় লাভের আশা মানুষকে অনেক সময়ে অসাধ্য সাধনেও উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। তা ছাড়া, দশ জনে

একত্রে, একই উদ্দেশ্যে ও একই গুরুর নিকটে ব্যায়াম শিক্ষা করিলে, পরস্পরের মধ্যে একটা সৌহার্দ্দ্য, একটা সামাজিকতা জন্মিবারও সুবিধা হয়—পরস্পরের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বেশ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার ও একটা শক্তি জন্মে।

আজকাল কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য অনেক আখড়া স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহারা ঐ সকল আখড়াতে নিয়মিত রূপে ব্যায়াম শিক্ষা করে, তাহারা অনেক উপকারও পাইতেছে কিন্তু দুই চারি জন উৎসাহী যুবক ব্যায়াম করিলেই সমগ্র মানব জাতির শরীর ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে আজকাল শারীরিক শক্তি ব্যবহারের আবশ্যকতা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য আমাদের অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশীই সম্যক্ অনুশীলনের অভাবে দিন দিনই দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহার আশু প্রতিকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সখের খাতিরেই হউক বা বাধ্য হইয়াই হউক আমাদিগকে আজকাল অধিকাংশ সময়েই সহরে বসবাস করিতে হয়। কিন্তু শরীরের উপর সহর-বাসের একটা বিষময় ফল আছে। যাহাতে ঐ ফল ফলিতে না পারে, তজ্জন্য যথাযোগ্য ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা নিতান্ত দরকার। শুধু বাছা বাছা দুই চারিজন যুবককে "দিগ্বিজয়ী পালোয়ানে" পরিণত করিলেই জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে না; সমগ্র জাতির প্রত্যেকটী যুবকের শরীর ও মনের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

নিয়ম-বদ্ধ প্রণালীতে ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে অত্যল্প কালের মধ্যেই যে উৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে, সুপ্রসিদ্ধ "স্যাণ্ডো"ই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথম বয়সে স্যাণ্ডো নিতান্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন; কিন্তু কিছু কাল মাত্র প্রণালীবদ্ধ ভাবে ব্যায়ামানুশীল করিয়া এক্ষণে তিনি কিরূপ শক্তিশালী হইতে পারিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা আছে। এস্থলে এ বিষয়ের আরও দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। ২২ বৎসর ৪ মাস বয়স্কা কয়েকজন যুবতী রমণীকে ৭ মাস কাল মাত্র ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া এনেবাস্কে (Enebuske) নিম্ন লিখিত রূপ ফল পাইয়াছিলেন।—

	ফুস্‌ফুসের আয়তন	পদদ্বয়ের শক্তি	পৃষ্ঠদেশের শক্তি	বক্ষদেশের শক্তি	দক্ষিণ বাহুর শক্তি	বাম বাহুর শক্তি	সমষ্টি
শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে	২·৬৫	৯৩	৬৫·৫	২৭	২৬	২৩	২৩০
৬ মাস শিক্ষার পরে	২·৮৭	১২০	৮১·৫	৩২	২৮	২৫	২৯৩

সাধারণ সুস্থকায় যুবকের ১৬ বৎসর হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে শরীরের যে বৃদ্ধি হয়, তাহার সহিত নৌবিভাগের বিশেষ রূপ ব্যায়াম শিক্ষাপ্রাপ্ত ১৮৮ জন সমবয়স্ক শিক্ষার্থীর শরীরের বৃদ্ধির তুলনা করিয়া বেয়ার (Beyer) দেখিতে পাইয়াছেন যে, এই কয়েক বৎসর বিশেষরূপে ব্যায়াম শিক্ষার ফলে সাধারণ যুবকদের অপেক্ষা নৌবিভাগের শিক্ষার্থীগণের দৈহিক উচ্চতার পরিমাণ গড়ে এক ইঞ্চিরও কিছু বেশী বাড়িয়াছিল। শিক্ষার্থীগণের মধ্যে যাহার বয়স যত অল্প ছিল, শরীরের উচ্চতাও তাহার তত বেশী বাড়িয়াছিল, এবং শিক্ষার প্রারম্ভে এই বৃদ্ধির হার যাহা ছিল, শেষাবস্থায় তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। বেয়ার আরও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ১৬ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের ওজন প্রত্যেক বৎসরেই প্রায় সমান ভাবে বাড়িয়াছিল। উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে শরীরের ওজনও কিছু বাড়িয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বেয়ার অনুমান করেন যে বিশেষ প্রকার ব্যায়ামেই এই ওজন বৃদ্ধির মুখ্য কারণ।

শরীরের ভার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুসেরও আয়তন বৃদ্ধি আবশ্যক; বস্তুতঃ ইহাই ব্যায়ামের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপ কাঠি। কিন্তু প্রাগুক্ত পরীক্ষার ফলে বেয়ার দেখিতে পান যে, এই বিশেষরূপ ব্যায়ামের দ্বারা মাংসপেশী প্রভৃতির শক্তি ও আয়তন যে রকম বাড়িয়াছিল, ফুস্‌ফুসের আয়তন কিন্তু সে রকম বাড়ে নাই বরং শরীরের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের ওজনের সহিত ফুস্‌ফুসের আয়তনের অনুপাত অনেকটা কমিয়াই গিয়াছিল। যে পর্য্যন্ত ফুস্‌ফুসের আয়তন ঠিক সমানুপাতে বাড়ে তাহার পরও শরীরের আর কতটুকু ওজন বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে যে চারি প্রকার ব্যায়াম পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই মাপ কাঠি দ্বারা উহাদের মাপ করিলে, দোষ গুণের পরিমাণ সহজেই নির্ণীত হইতে পারে। বেয়ার আরও অনুমান করেন যে, ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে, শরীরের শক্তি সমষ্টির পরিমাণ অন্ততঃ পাঁচগুণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে "আজ কাল অনেকে শারীরিক শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ইহাতে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নিয়মিত রূপে ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে, সাধারণ সুস্থকায় যুবকমাত্রই অনায়াসে এই সমস্ত করিতে পারে। শুধু যৌবনাবস্থাতেই যে এইরূপ শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা নহে; পরন্তু, প্রণালীবদ্ধভাবে উপযুক্ত রূপ ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে, প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্তও শারীরিক শক্তির যথেষ্ট উন্মেষ ও বিকাশ হইতে পারে।" (১)

ব্যায়ামানুশীলনের এইরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্তও সকল দেশের সকল লোকের দৃষ্টি ইহার প্রতি সেরূপ ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্য অনেক বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বা অগ্রসর দেশ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ব্যায়াম চর্চ্চা বিষয়ে উহা এখনও ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির বহু পশ্চাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। মিঃ জে, এইচ, ম্যাক্‌কার্ডি গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকার স্কুল কলেজের ছাত্রদের জন্য যত ব্যায়াম-শিক্ষক আছে, সর্ব্ব সাধারণের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা তাহার তুলনায় অন্ততঃ ৭০ গুণ অধিক। গ্রেট ব্রিটেন্ ও জার্ম্মাণির লোক সংখ্যার অনুপাতে সেখানে চিকিৎসকের সংখ্যা যত, আমেরিকার লোক সংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা যথাক্রমে তাহার দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ! আমেরিকায় প্রত্যেক হাজার জন লোকের জন্য ২ জন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, ১·৮ জন ধর্ম্মযাজক ও ১·৪ জন আইন ব্যবসায়ী আছে, কিন্তু যদি দেশের সমস্ত ব্যায়াম-শিক্ষক কেবল মাত্র সামরিক বিভাগে প্রবেশোপযোগী যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা হাজার করা ·৫ জনের বেশী হইবে না, অর্থাৎ প্রতি দশ লক্ষ ছাত্রের জন্য ৫০ জন ব্যায়াম-শিক্ষক ও পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ! (২) পৃথিবীর মধ্যে উন্নতিশীল দেশ আমেরিকার অবস্থাই যখন এইরূপ, তখন ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সম্প্রতি আমেরিকাতে একটি বিষয়ে বিশেষ পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক স্কুল কলেজেই নানারূপ জিম্‌ন্যাষ্টিকের সঙ্গে সঙ্গেই 'দৌড়াদৌড়ি' প্রভৃতি অনেক রকম বাহিরের খেলারও (Field-sports) বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন স্কুল কলেজের খেলোয়াড় দলের (teams) মধ্যে বেশ তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে; অনেকে ব্যক্তিগত ভাবেও দৌড়, দ্রুতগমন, ভারী জিনিস দূরে নিক্ষেপ, সন্তরণ প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব

(১) H. G. Beyer. The Influence of Exercise on Growth. American Physical Education Review, September-December, 1896, Vol. 1. pp. 76-87.

(২) J. H. McCardy, Physical Training as a Profession. Association Seminar, March, 1902, vol. 10, pp, 11-24

দেখাইয়া দর্শক মণ্ডলীকে বিমোহিত করিতেছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে এই প্রকার ব্যায়াম পদ্ধতির প্রথম প্রচলন হয়। তখন আমেরিকাবাসীদের মধ্যে কেহই কোনও রূপ প্রতিযোগিতাতেই জগৎপ্রসিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু এই প্রথার প্রবর্ত্তনের অত্যল্পকাল মধ্যেই আমেরিকাতে যুগান্তর উপস্থিত হয় এবং এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমেরিকা-বাসীরা জগতের শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সমর্থ হইয়াছে। [নিম্নে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইল। ওয়েন্ নামক এক ব্যক্তি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৯ $\frac{4}{5}$ সেকেণ্ডে ১০০ গজ দৌড়িতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৯৬ অব্দে উইফার্স্ (Wefers) ২১ $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ডে ২২০ গজ দৌড়াইয়াছিল, এবং এ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অন্য কেহই এতদপেক্ষা বেশী দূর দৌড়াইতে পারে নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কিল্‌প্যাট্রিক্ (Kilpatrick এক মিনিট ৫২ $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ডে অর্দ্ধমাইল এবং কনেফ্ (Conneff ৪ মিনিট ১৫ $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ডে এক মাইল পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রিন্‌ষ্টিন্ (Prinstein) দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ২৪ ফুট ৭$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া উল্লম্ফন প্রদান বিষয়ে (Running high jump) সুইনিকে (Sweeney) এ পর্য্যন্ত কেহই পরাস্ত করিতে পারে নাই। ১৮৯৫ অব্দে সুইনি লাফাইয়া ৬ ফুট ৫$\frac{5}{8}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়াছিল। ইউরী (Ewry) নামক অপর এক ব্যক্তি ঠিক একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়াই লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ৫ ফুট ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্লানেগান (Flanagan) ১৬ পাউণ্ড বা প্রায় পাকি ৮সের ওজনের একটী হাতুড়ী ১৭২ ফুট ১১ ইঞ্চি দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌লিন (McLean) বাই সাইকেলে চড়িয়া দুই মিনিট ১৯ সেকেণ্ড দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়াছিল। (৩)]

আজ কাল আমাদের দেশেও কোন কোন স্কুল কলেজে, বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ রাজ পুরুষগণের আগমনোপলক্ষে সময়ে সময়ে দড়ি টানাটানি (Tug of war) প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম কৌশলের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মক্লান্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন ব্যতীত উহাদের আর কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা সন্দেহ। সারাটী বৎসর ব্যায়াম চর্চার নাম গন্ধও নাই, অথচ রাজপুরুষগণের আগমনের সময় নিকটবর্ত্তী হইলেই স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে একটা মহা ধুমধাম পড়িয়া যায়; ছাত্রদের মধ্যে যাহারা স্বভাবতঃই সুস্থ ও সবলকায়, তাহাদিগের দ্বারা দুই একটি কৌশল দেখাইয়া নিজেরা বাহাদুরী লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে দেশে উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর আগমন প্রতীক্ষায় এক রাত্রির মধ্যেই বিজ্ঞান সম্মত আদর্শ গো-শালার সৃষ্টি হইতে পারে, কেবল সেই দেশেই এইরূপ ব্যায়াম পদ্ধতির অস্তিত্ব সম্ভবপর! কিন্তু এতদ্দ্বারা দেশের ভবিষৎ আশাভরসার স্থল যুবক বৃন্দের কিছুমাত্র উপকার হইতেছে না বা হইতেও পারে না।

পুরাকালে গ্রীসদেশীয় যুবকগণ নানা রকম ব্যায়ামের চর্চ্চা করিত। এই সমস্ত ব্যায়াম যে শুধু তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা নহে। পরন্তু, ইহা তাহাদের ব্যায়ামকুশল প্রকৃতিরই পরিচয় দিত। প্রাচীন গ্রীসের ব্যায়াম-পদ্ধতি সমূহের সঠিক বিবরণ এক্ষণে পাইবার সম্ভাবনা নাই; তথাপি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সে সময়ের যুবকগণ বর্ত্তমান কালের যুবকগণ অপেক্ষা, প্রায় সকল বিষয়েই বিশেষতঃ উল্লম্ফন ও দৌড়াদৌড়িতে, অনেক উন্নত ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রীক আদর্শের সহিত তুলনায় বর্ত্তমান ব্যায়াম-পদ্ধতি সমূহ অনেকটা একদেশদর্শী বলিয়াই অনুমিত হইবে। সত্য

(৩) World Almanac, 1906 and Olympic Games of 1906 at Athens. Edited by J. E. Sullivan, Commissioner from the United States to the Olympic Games. Spalding's Athletic Library, New York, July 1916.

বটে, আজকালকার মত সেকালে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ করিবার জন্য এত যন্ত্র-পাতির প্রচলন ছিল না এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্যই সেকালের গ্রীকেরা শারীরিক শক্তির অনুশীলন করিতে বাধ্য হইত ; কিন্তু শারীরিক শক্তির যথাযথ অনুশীলন দ্বারা মন বা আত্মারও (Soul) যথাসম্ভব উন্নতি সাধন করাও প্রাচীন গ্রীসীয় ব্যায়াম-পদ্ধতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের ফলে আমাদের যে অবসাদ জন্মিয়া থাকে তাহার, বা বংশগত দুর্ব্বলতা বা অসম্পূর্ণতার প্রতিকার বিধানের জন্য তাৎকালিক ব্যায়াম-পদ্ধতিতে কোন প্রকার ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা ভালরূপে জানিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে, শুধু শারীরিক শক্তিনিচয়ের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনই আধুনিক ব্যায়াম-পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতেও নানারূপ ব্যায়াম-পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্তও প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তৎসমুদয়ের বিবরণ সংগ্রহের জন্য উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিক কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

অধুনা প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি সমুহ সম্বন্ধে এ যাবৎ যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে এতদ্দ্বারা দেহকাণ্ড (Trunk), স্কন্ধদেশ ও বাহু যুগলের যে পরিমাণ অনুশীলন হয়, পদাদির তাহা হয় না। শুধু তাহাই নহে ; এতদ্দ্বারা মনোবৃত্তি নিচয়েরও প্রয়োজনানুরূপ অনুশীলন হয় না, বা নৈতিক উন্নতি বা বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ খুব কম। তথাপি এই সমস্ত ব্যায়াম দ্বারা যে যুবকগণের যথেষ্ট শারীরিক উন্নতি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরীর ও মনের সম্বন্ধ যে অতি নিকট তৎসম্বন্ধে আজ কাল অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এমন কি, এ বিষয়ে একটী নূতন বিদ্যারই (Psycho-physiological Science) সৃষ্টি হইয়াছে। এই অভিনব বিজ্ঞানের আলোকে প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি সমূহের পরীক্ষা করিয়া উহাদের দোষভাগ পরিবর্জন পূর্ব্বক, গুণাংশ লইয়া আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আদর্শ ব্যায়াম-পদ্ধতি সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই বর্ত্তমান যুগের একটী প্রধান সমস্যা।

যে সকল কাজ কর্ম্মের ফলে আমাদের জীবিতকালের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, জিম্‌ন্যাষ্টিক্ তাহাদের অন্যতম। আজকাল অনেকেই আগাগোড়া বিবেচনা না করিয়া, জিম্‌ন্যাষ্টিক্ আরম্ভ করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে অনেক সময়েই আশানুরূপ ফললাভ হয় না, বা হইতেও পারে না। যে রকমের জিমন্যাষ্টিক্ই হউক না কেন, অঙ্গ পরিমাপ বিদ্যার (Anthropometry) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভবিষ্যতের আদর্শ ব্যায়াম-পদ্ধতি হইতে এই অভিনব বিদ্যাকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না। প্রত্যেক ব্যায়াম-মন্দিরেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিমাপের জন্য যথোপযুক্ত যন্ত্রাদি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আকর্ণন-যন্ত্রের (Sthethoscope) সাহায্যে কিরূপে হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কার্য্যের পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা যথাযথভাব শিখাইতে হইবে। যন্ত্রের সাহায্যে কিরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভিতরের ও বাহিরের ব্যাস নির্ণয় (Calipers) করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা নাড়ীর গতি ও প্রকৃতি (Sphygmograph) নির্দ্ধারণ করিতে হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তাহা বিশেষরূপে জানা অবশ্য প্রয়োজনীয়। শুধু তাহাই নহে। আমরা নিশ্বাসের সহিত কি পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করিতে বা প্রশ্বাসের সহিতই বা কি পরিমাণ ত্যাগ করিতে পারি (Spirometer) তাহাও জানা অত্যাবশ্যক। কারণ, ইহা না জানিলে, ব্যায়ামের দ্বারা ফুস্‌ফুসের কোনও রূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল কিনা, তাহা জানা যাইবে না।

(২) অঙ্গ-বিনিশ্চয়-বিদ্যা (anatomy), বিশেষতঃ, পেশী, অস্থি, হৃদ্‌পিণ্ড ও ত্বকের সহিত উহার সম্বন্ধ, বিশেষরূপে অধিগত করিতে হইবে। শরীরের এই সকল অংশের কার্য্য প্রণালী (Physiology) বিশেষতঃ উহার "পেশী বিজ্ঞান" (Myology)-অংশের সহিত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরিচয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। কোন্ প্রকার ব্যায়ামে আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ রসরক্তাদির গতি-প্রকৃতির কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, এবং কি উপায়েই বা

দেহ-যষ্টিকে ঠিক অনুভাব প্রদান করা যাইতে পারে তাহা না জানিলে, অভ্যস্ত ব্যায়ামের দ্বারা বাস্তবিক কোনও উপকার হইতেছে কি না, তাহা আদৌ জানিতে পারা যাইবে না। (৩) স্বাস্থ্যতত্ত্বে (Hygiene) সম্যক্ জ্ঞানলাভও অবশ্য কর্ত্তব্য। আহার্য্য সামগ্রী, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতির সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ে যে অভিনব তথ্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই তৎসমুদয় জানিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। (৪) আমাদের যুবকগণ অনেকে অনেক রকম যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম করিয়া থাকে। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির কোন্‌টীর দ্বারা শরীরের কোন অংশের কিরূপ পরিণতি সাধিত হয়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। (৫) জিম্‌ন্যাষ্টিকের ইতিহাস সম্বন্ধেও সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। মাত্র একশত বা দুইশত বৎসরের বা দেশ বিশেষের ইতিহাস পাঠ করিলেই চলিবে না। যত দূরবর্ত্তী কালের এবং যত বিভিন্ন দেশের জিম্‌ন্যাষ্টিকের ইতিহাস জানা যাইতে পারে, তাহা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে, পুরস্কার প্রভৃতির দ্বারাও ছাত্রগণকে এই বিষয়ের অধ্যয়নে উৎসাহিত করিতে হইবে। পুরস্কার ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন দ্বারা আর একটী ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। আজকালকার ছাত্রদের শতকরা প্রায় ৭০।৭৫ জনই নিতান্ত আলস্য ও ঔদাসীন্য বশতঃই ব্যায়াম-শাস্ত্রের কোনও রূপ চর্চ্চা করে না। কিন্তু পুরস্কার ও প্রশংসা প্রাপ্তির লোভ থাকিলে ইহাদের অনেকেই এবিষয়ে মনোযোগী হইতে, এমন কি, হাতে কলমে ব্যায়ামানুশীলনও আরম্ভ করিতে পারে।

আজকাল এদেশের প্রায় সমস্ত স্কুল কলেজেই নানারকম ব্যায়াম চর্চ্চার অল্পবিস্তর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং অনেক ছাত্রও ব্যায়াম করিয়া থাকে। কিন্তু এতদ্বারা বাঙ্গলার ছাত্রসমাজের শরীর ও মনের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, বা হইতেছে, তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালী পল্টন বিভাগে (The Bengalee Double Company) ভর্ত্তি হইবার জন্য যে সকল যুবক আবেদন করিতেছে, তাহাদের শতকরা ৭০।৮০ জনই সৈন্য বিভাগে প্রবেশের জন্য যে দেহ-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আমাদের ছাত্রদের অধিকাংশই কোনও রূপ ব্যায়ামচর্চ্চা করে না, যা অনেক সময়ে স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের কড়া আদেশে বাধ্য হইয়া প্রতিদিন একবার করিয়া ব্যায়াম-স্থলে সমবেত হইলেও, উহাতে যেন তাহাদের কোনও প্রকার অনুরাগ বা উৎসাহের উদ্রেক হয় না, শুধু নিয়ম লঙ্ঘন জনিত দণ্ড হইতে বাঁচিবার জন্যই যেন তাহারা "কলের মত" ঐ সমস্ত ব্যায়ামের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা কোনও প্রকার সুফল লাভের আশা কবিকল্পনা মাত্র বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন, উৎসাহহীন বিজ্ঞানের অননুমোদিত ব্যায়াম ব্যায়ামই নহে। যে কাজই করা যাক না কেন, তাহাতে একটা প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ না থাকিলে, তাহার পূর্ণ ফল লাভ করা যাইতে পারে না। আমাদের ছাত্রবৃন্দের হৃদয়েও এইরূপ আকাঙ্ক্ষার, এইরূপ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে হইবে। শুধু মৌখিক উপদেশ প্রদান করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আমাদের বোধ হয় যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জিম্‌ন্যাষ্টিক্‌কেও বিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং জিম্‌ন্যাষ্টিক্ বিদ্যাতে যাহারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে, তাহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিবিধ উপাধির সৃষ্টি করিলে, এবিষয়ে অনেক সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। ছাত্রদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির একটা বিশেষ মূল্য আছে। উপাধি লাভই ছাত্র জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়। সুতরাং সাধারণ ভাবে পাশ করিয়া ছাত্রেরা যেমন আজকাল, বি-এ, এম্-এ প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেছে, সেইরূপ জিম্‌ন্যাষ্টিকেও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা দিয়া ছাত্রগণ যাহাতে এ, বি, (A. B—Bachelor of Athletics; এ, এম্ (A. M.—Master of Athletics) প্রভৃতি বা ঐরূপ অন্য কোনও উপাধি লাভ করিতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার কোনও

ব্যবস্থা হইলে, অনেকে হয় তো শুধু এই উপাধি প্রাপ্তির আশাতেই শারীরিক ব্যায়াম চর্চায় অধিকতর মনোযোগী হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে কাজে আমাদের আনন্দ ও উৎসাহের উদ্রেক হয় না, তদ্দ্বারা আমাদের দেহ ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন হইতে পারে না। জিম্ন্যাষ্টি-কের দ্বারা আমাদের ছাত্র সমাজের এইরূপ উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যাহাতে এতদ্বিষয়ে তাহাদের হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন পাশ্চাত্য মনীষী প্রকৃত ব্যায়ামকে যুবঃনসুলভ আনন্দময় কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক, জিম্ন্যাষ্টিকের দ্বারা পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে হইলে ইহাকে এইরূপ প্রকৃতিই প্রদান করিতে হইবে।

শারীরিক ব্যায়ামাভ্যাসের একটা নৈতিক ফলও আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট (Grote) তৎপ্রণীত গ্রীসদেশের ইতিহাসের এক স্থলে বলিয়াছেন যে, সেকালের গ্রীসদেশবাসীগণ যত রকম বিদ্যাভ্যাস করিত, তাহার অর্দ্ধেকই ছিল শরীরবিষয়ক; কারণ, তাহারা মনে করিত যে দেহ কিছুমাত্র অপটু থাকিলে, আত্মার পূর্ণ পরিণতি সাধন আদৌ সম্ভবপর নহে, এবং দেহ ও আত্মার পূর্ণ পরিণতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সত্য বটে, আজকাল অনেকেই কোনও প্রকার কায়িক পরিশ্রম না করিয়াও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সম্প্রতি এই আদর্শের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কতিপয় বৎসর যাবৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ের পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, অতঃপর যে জাতি শারীরিক শক্তিতে যত গরিষ্ঠ হইতে পারিবে, সেই জাতিই এই পৃথিবীতে তত প্রাধান্য লাভে সমর্থ হইবে।

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

আত্ম-তৃপ্ত।

আমি মুক্ত করিয়া প্রাণ,
আপনার ভাবে আপনার মনে
গাইয়া যেতেছি গান।
আমার সে গান কারো ভাল লাগে,
কেহ সরে যায় সুদূরে বিরাগে,
কেহ ঘৃণা ভরে বিদ্রুপ করে,
কেহ করে স্নেহ দান!
আমি মুক্ত করিয়া প্রাণ,
আপনার ভাবে আপনার মনে
গাইয়া যেতেছি গান!

ওগো, বিশ্বের কোলাহল
স্পর্শ করিতে পারে না আমার
গোপন মরমতল!
নিশিদিন সেথা একাকী কেবল
আপনার ধ্যানে আপনি বিভল,
লয়ে সুখ দুখ বিষাদ-কৌতুক
হাসি আর আঁখি-জল!

ওগো, বিশ্বের কোলাহল
স্পর্শ করিতে পারে না আমার
গোপন মরমতল!

সদা হর্ষ-বেদনা মম
প্রকাশ করিতে পারিতেছি আজ
পুলক সে নিরুপম!
সে হরষ, সেই গৌরব আমার
ঘেরিয়াছে আজ মোর চারিধার,
সফল সাধন, সফল জীবন
দেব-নির্ম্মাল্য সম!

সদা হর্ষ-বেদনা মম
প্রকাশ করিতে পারিতেছি আজ
পুলক সে নিরুপম।

আমি তৃপ্ত আপনা মাঝ,
বিশাল ভুবন নিমেষে পাশরি'
পাশরি' দৈন্য-লাজ!
ক্ষুদ্র বিহগ কল-তানে গায়,
বিকচ কুসুম মাধুরী বিলায়,
মুখ পানে কার চাহে কিগো আর,
পূজি' রাজ-অধিরাজ!
আমি তৃপ্ত আপনা মাঝ
বিশাল ভুবন নিমেষে পাশরি
পাশরি' দৈন্য-লাজ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য *

প্রবন্ধের শীর্ষদেশে যে ধর্ম্মাত্মা নরপতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও আদর্শ সম্রাট্ ছিলেন। ভারতবর্ষ চিরকাল বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্য অল্লাধিক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। সময় সময় কোন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সমূহ জয় করিয়া তাঁহার নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করিতেন এবং সমস্ত রাজগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গ্রীক্ বীর সেকেন্দরের ভারত আক্রমণের পর যে সমস্ত রাজচক্রবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে একচ্ছত্র শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক এবং গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং 'বৰ্দ্ধন' উপাধিবিশিষ্ট হর্ষবর্দ্ধন বা শিলাদিত্য সমধিক প্রসিদ্ধ। গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাটুলীপুত্র নগর (আধুনিক পাটনা) মৌর্য্য ও গুপ্ত সম্রাট দিগের এবং পুণ্য-সলিলা সরস্বতীর তীরবর্ত্তী থানেশ্বর হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ প্রাচীনকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইত। পরে এই স্থান সমন্তপঞ্চক ও কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। যথা—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥"
—মনুসংহিতা।

"দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যোত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে ॥"
—মহাভারত বনপর্ব্ব।

"অন্তরে চৈব সংপ্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥
তস্মিন্ পরমধর্ম্মিষ্ঠে দেশে ভূদোষবর্জ্জিতে।
অষ্টাদশ সমাজগ্মুরক্ষৌহিণ্যো যুযুৎসবঃ ॥"
—মহাভারত আদিপর্ব্ব।

এই ভূভাগ প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যসাধনায় ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পৌরাণিক যুগে এই পবিত্র ভূমিতে মনু, ঋষভদেব ও ভরত প্রভৃতি রাজত্ব করিতেন। থানেশ্বর ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ। থানেশ্বর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। থানেশ্বর পীঠস্থান। স্থাণ্বীশ্বর মহাদেবের নাম। স্থাণ্বীশ্বর-নামেরই অপভ্রংশ থানেশ্বর। স্থাণ্বীশ্বর হইতেই থানেশ্বর নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

হর্ষবর্দ্ধন পিতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইয়াছিলেন। এই সময় গৌড়ে শশাঙ্ক নামে এক হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি হর্ষ-বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক নিহত করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি রাজা হইয়া শশাঙ্ককে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

---

* 'হর্ষচরিত' ও মিঃ ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ বিরচিত গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'—ত্রিপুরা শাখার ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

হর্ষ-বর্দ্ধন সিংহাসনাধিরোহণের পর ছয় বৎসর কাল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ছয় বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ নামে একটী অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের বৎসর অর্থাৎ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতে তাঁহার ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় পুলকেশী নামক নরপতি দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। নাসিক বা পঞ্চবটী তাঁহার রাজধানী ছিল। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত নরপতিগণ তাঁহার অধীন ছিলেন। অনুমান ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলকেশীর অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হন নাই। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উড়িষ্যার দক্ষিণস্থ গঞ্জাম প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই।

হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শৈব ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের চরিত অবলম্বন করিয়া কবি বাণভট্ট তাঁহার সুবিখ্যাত 'হর্ষচরিত' নামক আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। হর্ষচরিত গ্রন্থে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনের অতি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউয়েনসোয়াং (Hiuen Tsang) ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইত ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল তিনি ভারত বর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি "সিউকি" অর্থাৎ "পাশ্চাত্য রাজ্যের বিবরণ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তদানীন্তন ভারতের মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। হিউয়েন সোয়াং হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজধানীতে নিমন্ত্রিত হন। হিউয়েন সোয়াং ৬২৯ খৃঃঅব্দে জন্ম ভূমি হইতে রওয়ানা হইয়া খোটান, ইসিকুল (Issykkul) হ্রদ, বাহ্লিক, খাথিয়ান, কাবুল প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া ভারত বর্ষে আগমন করেন এবং ভারত বর্ষে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থান সমূহ ও অন্যান্য স্থান দর্শন করেন। তিনি বহুমূল্য গ্রন্থাদি ও পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সমূহ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হন, এমন সময় সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। তিনি হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবং ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত গ্রন্থের অনুবাদ ও ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।

হিউয়েন সোয়াং হর্ষবর্দ্ধনের সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিকের নিকট অতি মূল্যবান্। হর্ষচরিত রচয়িতা বাণভট্ট ও হিউয়েন সোয়াং হর্ষবর্দ্ধনের এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। হর্ষচরিতের আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক বিবরণ এই:—

প্রভাকরবর্দ্ধন থানেশ্বরের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম যশোবতী। যশোবতীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম রাজ্যবর্দ্ধন ও কনিষ্ঠের নাম হর্ষবর্দ্ধন। রাজ্যশ্রী নাম্নী তাঁহার এক কন্যা ছিল। কান্যকুব্জ বা কাণোজের মৌখরী রাজবংশসম্ভূত গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। রাজ্যবর্দ্ধন হূণ দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। হূণ দিগের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত থাকার সময় প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। হর্ষবর্দ্ধন রাজ্য বর্দ্ধনের নিকট পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন পিতার মৃত্যুতে গভীর শোকে নিমগ্ন হইলেন। রাজ্য বর্দ্ধন বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি হর্ষবর্দ্ধনকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষু হইলেন। এই সময় একটা বিশেষ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মালব দেশের অধিপতি দেবগুপ্ত কাণোজরাজ গ্রহবর্ম্মাকে বিনষ্ট করেন,

এবং তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। রাজ্য বর্দ্ধন এই আকস্মিক বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভগিনী পতির মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। এবং হর্ষবর্দ্ধনকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাণ্ডী নামক তাঁহার এক ভ্রাতা ও সৈন্যগণ সহ মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মালব-সৈন্য রাজ্যবর্দ্ধন কর্ত্তৃক পরাস্ত হইল। কিন্তু গৌড়ের অধিপতি শশাঙ্করাজ্যবর্দ্ধনকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন এই সংবাদ অবগত হইয়া ভ্রাতৃ বৈরীর বিনাশের জন্য স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ অর্থাৎ আসামের তদানীন্তন রাজা ভাস্করবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনকে সহায়তা করিবার জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ভাস্করবর্ম্মার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে ভাণ্ডীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভাণ্ডী মালব জয় করিয়া মালবসৈন্যগণকে বন্দী করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ভাণ্ডীর নিকট অবগত হইলেন যে, রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন এই সংবাদ অবগত হইয়া ভাণ্ডীকে গৌড়াধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ পূর্ব্বক ভগ্নীর উদ্ধারের নিমিত্ত নিজে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন বিন্ধ্যপর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া ভগিনীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান করিতে পারিলেন না। একদিন বিন্ধ্যপর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাঘ্রকেতুনামা পার্ব্বত্য জাতীয় জনৈক সামন্তরাজার সহিত হর্ষবর্দ্ধনের সাক্ষাৎ হইল। এই সময়ে শবর জাতীয় ভূকম্প নামক রাজা বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিবাসীবর্গের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় নির্ঘাট নামধেয় এক বলবান্ যুবক ব্যাঘ্রকেতুর সহিত ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। ব্যাঘ্রকেতু ও নির্ঘাট হর্ষবর্দ্ধনকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন ও সসম্মানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি নির্ঘাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি এই বন পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; আপনি কি কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা ও তাঁহার সহচরীগণকে এই অরণ্যে আগমন করিতে দেখিয়াছেন?" নির্ঘাট উত্তর করিলেন—"মহাশয়, বনে আমার অলক্ষিতে একটী মৃগও বিচরণ করিতে সক্ষম নহে। স্ত্রীলোক বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলা এই বনে বিচরণ করিলে অবশ্যই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেন।" অতঃপর নির্ঘাট তাঁহাকে বলিলেন,—"এই স্থান হইতে অদূরে পর্ব্বতমূলে নির্ঝরিণীর তীরে এক বন আছে, তথায় দিবাকর মিত্র নামক এক জন ভিক্ষু বাস করেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। তিনি আপনার ভগ্নীর সন্ধান বলিতে পারিবেন।" হর্ষবর্দ্ধন দিবাকর মিত্রের নাম শুনিয়াছিলেন। তিনি হর্ষের ভগ্নীপতি গ্রহ বর্ম্মার বাল্যবন্ধু ও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষু সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। দিবাকর মিত্র এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া হর্ষবর্দ্ধনের হৃদয় আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি নির্ঘাট কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে দিবাকর মিত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং ভগিনীর দুঃখ কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। দিবাকর মিত্র শুনিয়া দুঃখিত হইলেন কিন্তু কোন সন্ধান বলিতে পারিলেন না এই সময়ে হঠাৎ একজন যতি আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"আয়ুষ্মন্, আমি অদ্য প্রাতে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর তীরে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছিলাম, এমন সময় লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে বহু স্ত্রীলোকের করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একটী স্ত্রীলোককে তাহার সঙ্গিনীগণ বেষ্টন করিয়া আছেন। সম্মুখে চিতা সজ্জিত রহিয়াছে। রমণী চিতারোহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সঙ্গিনীদিগের মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে বলিলেন, "প্রভু আপনাদের হৃদয় দয়ার প্রস্রবণ। আমাদের রাণী চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত

হইয়াছেন। আপনি সদুপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন। আমি উত্তর করিলাম "অনতিদূরে আমার আচার্য্য অবস্থান করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইতেছি—তিনি আসিয়া ইঁহাকে রক্ষা করিবেন। রমণীকে এই কথা বলিয়া আমি প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। কৃপা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করুন। যতির কথা শুনিয়া সকলই গাত্রোত্থান করিলেন ও চিতা সমীপে গমন করিলেন। রাজ্যশ্রী ভ্রাতার দর্শন পাইয়া ও বৌদ্ধভিক্ষুর উপদেশে শান্তিলাভ করিলেন। এইভাবে রাজ্যশ্রীর উদ্ধার হইল। কিন্তু রাজ্যশ্রী গৃহে যাইতে সম্মত হইলেন না। বৌদ্ধভিক্ষু হইবার জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে রাজধানীতে নেওয়ার অভিলাষী হইয়া ভগ্নীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনিও রাজধর্ম্ম পালন করিয়া অবশেষে ভগিনীর সহ একত্রে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষু হইবেন। রাজ্যশ্রী অতঃপর গৃহে ফিরিলেন। বাণভট্ট এই পর্য্যন্ত লিখিয়া হর্ষচরিত অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তীকালের কার্য্যাবলী হিউয়েন সোয়াং এর বিবরণ ও শিলালিপি প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়।

ভারত বর্ষের একটী বিশেষত্ব এই যে, এই দেশে চিরকাল বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন আচার ব্যবহার পরস্পরকে পীড়ন না করিয়া উদারতার সহিত অনুষ্ঠিত ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা উপনিষদ্ ও বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাও চার্ব্বাক প্রভৃতি জড়বাদীদিগকে দার্শনিক হিসাবে সম্মান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত চিরকাল আদৃত ও অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল সেই সময়ে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের শক্তিও ক্ষীণ ছিল না। একই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছিল। হিউয়েন সোয়াং সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁহার গ্রন্থে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি হর্ষবর্দ্ধনের পিতা সৌর মতাবলম্বী ছিলেন। ইঁহার বংশের আদিপুরুষ পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। হর্ষচরিত গ্রন্থে বাণভট্ট ভৈরবাচার্য্যের ও পুষ্পভূতির কথা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা হইতে দৃষ্ট হয় যে তদানীন্তন ভূপতিগণ সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি কিরূপ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহারা একদিকে যেমন প্রবল পরাক্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন অপর দিকে অসাধারণ ত্যাগী ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ ছিলেন। যে সকল মহাপুরুষ এই সকল বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবন কত উন্নত ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ভৈরবাচার্য্য গভীর নিশীথে শ্মশানে সাধন করিতেছেন, পুষ্পভূতি ও ভৈরবাচার্য্যের অপর তিনটী শিষ্য তাঁর সহায়তা করিতেছেন—মহাকালহৃদয় নামক তন্ত্রোক্ত এইরূপ অনুষ্ঠানের একটী জীবন্ত চিত্র হর্ষচরিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মধুবনে যে তাম্র ফলকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে রাজ্য বর্দ্ধনকে সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দীল্লির উত্তরে সোণপথনামক স্থানে একটী তাম্র শাসনের মুদ্রাটি মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রভাকর বর্দ্ধন সূর্য্যোপাসক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন হর্ষবর্দ্ধন শিব ও সূর্য্য উভয়েরই আরাধনা করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি প্রকাশ্য ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৌদ্ধ সাধনা ও বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অশোককে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া তৎপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। এবং রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মন্দির সঙ্ঘারাম, চিকিৎসালয় ও পান্থনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রাণী হিংসা নিষিদ্ধ ছিল। তিনি নানা ধর্ম্মমতাবলম্বী জ্ঞানী ও পণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কান্যকুব্জ নগরে তিনি বৌদ্ধ মহাযান মতের উৎকর্ষ মাত্রা এবং সুমহান্ সঙ্ঘ সম্মিলিত করিয়াছিলেন।

রাজা হর্ষ বর্দ্ধন অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক

ভূপতি ছিলেন। তাঁহার দানশক্তি অলৌকিক ছিল। তিনি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গাযমুনার পুণ্য সঙ্গম-স্থান সন্নিহিত সুবিস্তৃত বেলাভূমিতে মোক্ষ-মেলা সম্মিলিত করিতেন। ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ষ্ঠ বারে যে মেলা সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাতে হিউয়েন সোয়াং উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই মেলায় যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই :— ৫ লক্ষ লোক বেলা-ভূমিতে সমবেত হইয়াছিলেন। হর্ষ বর্দ্ধন ২০ জন সামন্ত নরপতিগণ সহ এই মেলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুর্জ্জর প্রদেশের বল্লভীরাজ সুদূর পশ্চিম হইতে ও কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি সুদূর পূর্ব্ব দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি, দ্বিতীয় দিবস সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ও তৃতীয় দিবস শিবের প্রতি মূর্ত্তি এই মেলাক্ষেত্রে মহাসমারোহের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমাগত পঞ্চসপ্ততি দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন সাধু সন্ন্যাসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগকে অগণিত ধনরাশি দান করা হইত। রাজা তাঁহার মাণিক্য খচিত বহুমূল্য আভরণ ও বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত দান করিতেন।

হর্ষ বর্দ্ধনের সময় বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্থানের উত্তরাংশ কপিশা নামে অভিহিত হইত। সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ ভূভাগ এবং গান্ধার দেশ কপিশা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্জাবের কতকাংশ কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন নর্ম্মদা নদীর উত্তরস্থ ও হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ভূভাগের রাজগণ হর্ষ বর্দ্ধনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মৌর্য্য সম্রাট্‌দিগের সময় তাঁহাদের সাম্রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরও বিস্তৃত ছিল।

হর্ষের রাজত্বকালে প্রজাবর্গ সুখে কাল অতিবাহিত করিত। তাহাদিগকে ভূমির উৎপন্নের ৬ষ্ঠ ভাগের একভাগ কর দিতে হইত। প্রজাগণ করভারে প্রপীড়িত হইত না এবং কর সহজে আদায় হইত। অপরাধীর সংখ্যা কম ছিল। স্বীকারোক্তি করিবার জন্য অপরাধীদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা হইত না। উচ্চ রাজপুরুষগণ বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর পাইতেন। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য মজুরদিগকে রাজ সরকার হইতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইত। বিনা বেতনে বল পূর্ব্বক কাজ আদায় করা হইত না। দেশে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল।

এই সময়ে পঞ্জাব ও কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং মধ্যদেশ অর্থাৎ গঙ্গার উপত্যকা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল ছিল। মগধ, মালব এবং গুজরাট এই সকল প্রদেশ জ্ঞান ও সভ্যতায় উন্নত ছিল।

৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষ বর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। তিনিই উত্তর ভারতের শেষ একচ্ছত্র হিন্দু সম্রাট ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে যে হর্ষ চরিত রচয়িতা বাণ ভট্টের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি হর্ষ বর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি অতি শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী নামক গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। শোণ নদীর তীরস্থিত প্রীতিকূট নামক গ্রাম বাণভট্টের জন্ম স্থান। ইহা বিন্ধ্য পর্ব্বতের অন্তর্গত অতীব রমণীয় স্থান। বাণ ভট্ট বাৎসায়ন গোত্র সম্ভূত ছিলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন।

---

* যাঁহারা হর্ষ বর্দ্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও তাৎকালিক ভারতের অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা হর্ষ চরিত গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন। বিলাতের এসিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থের Cowell সাহেব কৃত উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন; সংস্কৃত-ভাষা-ভীরু ব্যক্তির পক্ষে তাহাই অবলম্বনীয়।

জয়পুর কাহিনী।

জয়পুর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অন্যান্য ভ্রমণকারী লেখকের অপেক্ষা বেশী সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। জয়পুরে আমি অনেক দিন বাস করিয়া সে দেশী ও প্রবাসী এবং স্থায়ী বাঙ্গালীদের সহিত বিশেষ ভাবে মিশিয়া গিয়াছিলাম। জয়পুরে আমি দুইবার গিয়াছি, দুইবারেই আমার নূতন নূতন বিষয় দেখিবার ছিল। আমি সে সকল কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকটিত করিব।

আমি আগরা হইতে জয়পুর যাই। আগরায় আমার জনৈক বন্ধু জয়পুরে কান্তিবাবুর নিকট আমার বিষয় পত্র দেন ও দিল্লির ডাক্তার স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা তৎকালে জয়পুর দরবারের প্রাইবেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় সংসার চন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট পত্র দেন। স্বর্গীয় কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎকালে দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী। তৎপর সংসারবাবু দেওয়ান হইয়াছিলেন।

আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে আগরা হইতে জয়পুর অবতরণ করিলাম। আগরা হইতে একটু সকালে মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করিয়া বাহির হই। পথে প্লেগের আড্ডায় আমাদিগকে বাঁদিকুই নামক স্থানে পরীক্ষা করিয়াছিল বলিয়া একটু বিলম্ব হইয়াছিল; তাহা না হইলে বোধ হয় আর একটু আগেই আমি জয়পুর পেঁ ছিতে পারিতাম। ট্রেন খানা যখন জয়পুরের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল তখন ষ্টেশনের বহু বিস্তৃত আলোর শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। যেন কোন সজ্জিত ইন্দ্রপুরীতে আমরা আসিয়া পৌছিতেছিলাম।

যখন রেল হইত অবতরণ করিলাম, তখন দেখি দুই জন ভদ্রলোক আগরা হইতে বাঙ্গালী যাত্রীর সন্ধান করিতেছেন। বাঙ্গালী বাবুদ্বয় যখন আমার নাম ধরিয়া আমাকে তল্লাস করিতেছিলেন তখন আমি যাঁহাকে ধরা দিলাম তিনি বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র সেন। মহেন্দ্র বাবু সংসার বাবুর ভ্রাতা, এবং জয়পুরের মিউনিসিপালীটার চেয়ারম্যান। এর মধ্যেই শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও (কান্তিবাবুর পুত্র) আমাকে ধরিয়া বসিলেন। আমি বলিলাম আমি মহেন্দ্র বাবুর আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িয়াছি, এখন আমার বিষয় তিনি জানেন। ঈশানবাবু মহেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন "এদেশ তীর্থের স্থান, যে আগে যাত্রী ধরে সেই তাহাকে দখল করে, সুতরাং ইহার উপর তোমার অধিকার নাই।" ঈশান বাবু চলিয়া গেলেন, অতঃপর মহেন্দ্রবাবুর সহিত আমিও জয়পুর সহরাভিমুখে চলিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি আমার জন্য হাতমুখ ধোয়ার গরম জল প্রস্তুত। তখন শীতকাল। আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ও জলযোগ করিয়া কান্তিবাবুর গৃহাভিমুখে সর্ব্ব প্রথমে চলিলাম। আমার সঙ্গী হইলেন সংসার বাবুর বাটীস্থ কলিকাতা প্রদেশের একজন কবিরাজ; তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন। অক্ষয় বাবুই ছিলেন আমার জয়পুরের পথ প্রদর্শক। কান্তিবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি তাঁহার সুবৃহৎ আঙ্গিনায় বহু অশ্বশকট, গোযান ও অশ্ব উপস্থিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি সজ্জিত ভাবে বহু ভদ্রলোক গৃহ প্রাঙ্গণের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। প্রথমে আমি মনে করিলাম, বোধ হয় এখানে একটী বিশেষ দরবার। ইহার পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম তাহা নহে। প্রত্যহ কান্তিবাবুর গৃহে এদেশের সরদারগণের একটী দরবার হয়। সরদারগণ কান্তিবাবুকে সেলাম করিয়া যায়। এই সেলাম স্বয়ং রাজারই প্রাপ্য কিন্তু রাজার অনবকাশ,ও কান্তিবাবু রাজার শিক্ষাগুরু, তজ্জন্য রাজা ইচ্ছা করিয়া এই অধিকার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। সরদারগণ যে সকল গাড়ী ও অশ্বে আসিয়াছিলেন আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। দরবার শেষ হইলে কান্তিবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। তখন সরদারগণ একে একে চলিয়া গিয়াছেন।

কান্তিবাবুর বাড়ী নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী রাউজা গ্রামে। তিনি প্রথমে গ্রামের মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। জয়পুর আসিয়া রাজার গৃহে শিক্ষক হন এবং পরে ভাগ্যের জোরে এই দুর্ল ভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কান্তিবাবু অতি ভদ্র

লোক। আমি তাঁহার সহিত যখন দেখা করিলাম তখন কান্তি বাবু কহিলেন "সংসার বাবুর বাড়ীতে আছেন বেশ, কিন্তু কথা এই আমার গৃহে মধ্যাহ্নে মৎস্য আসে, আপনি প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আমার গৃহেই আহার করিবেন ও বৈকালে গিয়া সংসার বাবুর ওখানে আহার করিবেন।" আমি মৎস্যাশী বাঙ্গালী সুতরাং নিরাপত্তিতে স্বীকার করিলাম। এই সকল মৎস্য প্রত্যহ উটের সাহায্যে কৃষ্ণা, গোদাবরী প্রভৃতি নদী হইতে রাজ সরকারের জন্য আসিয়া থাকে। কান্তিবাবু ব্যতীত অপর বাঙ্গালীরা এই মৎস্য পায় না, কারণ বাজারে মৎস্য বিক্রয় হয় না। এখানকার লোক মাছ খায় না। মধ্যাহ্নে সংসার বাবুর গৃহে স্নান ও জলযোগ করিয়া কান্তি বাবুর গৃহে সে দিন আহার করিলাম। কান্তি বাবুর পুত্র ঈশান বাবু কহিলেন "আপনি আর বরাবর সংসার বাবুর বাড়ী যাইবেন না, মধ্যাহ্নে এখানেই স্নানাদি ও করিবেন"। পরদিন হইতে তাহাই করিতে লাগিলাম।

আমাদিগের সব কাজ কয়েদী ভৃত্য ও কয়েদী ব্রাহ্মণ পাচকেরা করিত। কয়েদী ভৃত্য ও পাচক প্রত্যহ জেলখানা হইতে আসিয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে রাত্রেও কান্তি বাবুর গৃহেই তাহারা অবস্থান করে। কয়েদীদিগকে পয়সা দিয়া অপর গৃহস্থেরাও তাহাদের মাঠে, বাগানে, গৃহে কাজ করাইতে পারে। জেল দারোগার নিকট আবেদন করিলেই তাহাদিগকে পাওয়া যায়।

পরদিন আমি কলেজের প্রিন্সিপাল কালীপদ বাবুর বাড়ী গেলাম। কালীপদ বাবুর আসল বাড়ী রাউতা গ্রামে, কান্তি বাবুর তিনি আত্মীয়। প্রত্যহ বৈকালে কালী বাবুর বাড়ীতে বাঙ্গালী ও সেদেশীয় লোক লইয়া এক বৃহৎ আড্ডা হয়। সেখানে গল্প খেলা ও গানের আসর। কালী বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হইলে আমি মেঘনাথ বাবুর ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বাবুর বন্ধু বলিয়া তিনি কহিলেন "আপনি অপেক্ষা করুন এখানেই মেঘনাথ বাবুর সহিত দেখা হইবে।" মেঘনাথ বাবু জয়পুর কলেজের প্রফেসার। মেঘনাথ বাবুর সহিত আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। ক্ষণ বিলম্বে মেঘনাথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরপ্রসাদ বাবুর চেহারার সহিত মেঘনাথ বাবুর সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমি তাঁহাকে চিনিয়া কহিলাম "মেঘনাথ বাবু, ভাল আছেন ত? মাণিক কি চলিয়া গিয়াছে!" তারপর তাঁহার ছেলে মেয়েদের নাম ধরিয়া তাদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর করিলেন। মাণিক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি সকলেরই নাম জানি। কালী বাবু বুঝিতে পারিলেন যে মেঘনাথ বাবু আমায় চিনিতে পারেন নাই। তিনি কহিলেন "মেঘনাথ বাবু কি ইঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন?" মেঘনাথ বাবু উত্তর করিলেন, "হাঁ। চিনিয়াছি বই কি?" তখন তাঁহারা সকলে মেঘনাথ বাবুকে চাপিয়া ধরিলেন "বলুন দেখি ইনি কে?" মেঘনাথ বাবু কিন্তু অপারগ হইলেন। সকলে হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন "ইনি তোমার গৃহের সকলকে নাম ধরিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন আর তুমি ইহাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিতেছ না, এ কেমন ভদ্রতা?" তার পর কালীপদ বাবু তাঁহার কাছে আমার নাম বলিবা মাত্রই চিনিয়া ফেলিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার কাছে আমার বিষয় এক পত্র দেন তাহাই স্মরণ করিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। মেঘনাথ বাবুর সহিত আমি সেই গল্পের আড্ডা ত্যাগ করিলাম।

কি উদ্দেশ্যে সে আড্ডা পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম আগে সে বিষয় পরামর্শ করি নাই। তখন সন্ধ্যা, আর কোথায় যাইব, কয়েকটী দেব মন্দিরের আরতি দর্শন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। বৃন্দাবনের সকল আদি দেবতাই এখানে আছেন। একসময়ে যখন দেবদেবী মূর্ত্তি ভগ্ন হইবার সম্বন্ধে ভয় হয় তখন সেবায়েতগণ মূর্ত্তি সমূহ জয়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধিই বৃন্দাবনের আদি বিগ্রহ মূর্ত্তি এখানেই আছেন। কেবল মদনমোহনজী আছেন করৌলীতে। করৌলীর রাজার নিকট তৎকালের জয়পুরের রাজা কন্যা বিবাহ দিয়াছিলেন। দুহিতা এই বিগ্রহ চাহিয়া বসিলে তিনি উহা দান করিয়াছিলেন। সেই অবধি মদনমোহন বিগ্রহ করৌলী রাজধানীতে সেবা পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এ সমস্ত বিগ্রহের সেবাইতই বাঙ্গালী সুতরাং অনেকেই এক ঘর বাঙ্গালী আসিত হইলেন। জয়পুরে বিগ্রহ

বেশী সুতরাং বাঙ্গালীর সংখ্যাও জয়পুরে বেশী। এই সকল বাঙ্গালী দেশের মায়া কাটাইয়া জয়পুর রাজপুতনায়ই স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন। এমন বাঙ্গালীও এখানে আছেন যিনি বাঙ্গালাদেশ এ পর্য্যন্ত দেখেনই নাই। ইঁহারা যে দেশে ফিরিয়া গিয়া বাস করিবেন সে আশা আর নাই। তবে এখনও তাঁহারা বিবাহাদি সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশেই করিয়া থাকেন, কিন্তু কাশীর অধিবাসী বাঙ্গালীদের সহিত বিবাহাদি হইতে পারিলে ইঁহারা সে চেষ্টাও করেন না। এই প্রকার অবস্থায় বাঙ্গালীগণ বেশ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। রাজা বাঙ্গালীদিগকে আদর করেন।

রাত্র অধিক হইবে আশঙ্কা করিয়া সংক্ষেপে আরতি দর্শন সমাপ্ত করিয়া সংসার বাবুর গৃহে সমাগত হইলাম। রাত্রে কিন্তু এক প্রকার বিড়ালের মত শব্দ নিকটবর্ত্তী গাছ পালায় অনুভূত হইতে লাগিল; প্রথমে ব্যাপার কি বুঝিতে পারি নাই। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াও শুনি ঐরূপ বিকট শব্দ। তখন আমার পথ প্রদর্শক কবিরাজ মহাশয় আমাকে বলিলেন ইহা ময়ূরের শব্দ। ময়ূরেরা দেখিতে যেমন সুশ্রী উহাদের কণ্ঠ স্বর তেমনই বিশ্রী এবং কর্কশ। প্রাতে উঠিয়া দেখি পালে পালে ময়ূরেরা বিচরণ করিতেছে। আমি ভাবিলাম ভগবান্ সব বিষয় সকলকে সুন্দর করেন না। ময়ূরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে লাঠি দিয়া তাড়াইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পালে পালে সুশ্রী ময়ূরগণ যখন সংসার বাবুর আঙ্গিনা, রাস্তা ঘাট ছাইয়া পড়িল তখন আমি একবারে আত্মহারা হইয়া উহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলাম।

এখানকার মানমন্দির দেখিবার জিনিষ। কাশীতে ইহারই অনুরূপ মানমন্দির আছে। রাজা মানসিংহ এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ছায়াপাতে বা অন্য উপায়ে সময় নিরূপণ হয়।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া উঠিয়া বসিয়াছি এমন সময় দেখি একখানা গাড়ী সংসার বাবুর দ্বারে দাঁড়াইল, এবং মেঘনাথ বাবু অবতরণ করিলেন। মেঘনাথ বাবু আসিয়াই আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য জেদ ধরিলেন। আমি বলিলাম 'একবারে এখান হইতে আমি বাসা তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিব না, সংসার বাবু ইহাতে কি মনে করিবেন।' তখন ইহার ব্যবস্থা তিনিই করিবেন বলিয়া সংসার বাবুকে এ সংবাদ জানাইয়া কহিলেন "রাজেন্দ্র বাবু আমার দাদার বন্ধু, যদি তিনি আমার বাড়ীতে বাস না করেন বা আমি কোনরূপ আপ্যায়িত না করি তবে দাদা কি মনে করিবেন। আপনি অনুমতি দিলেই তাঁহাকে নিতে পারি"। তিনি অনুমতি দিলেন ও কহিলেন "আমাদের কর্ত্তব্য স্বদেশী কেহ এখানে আসিয়া যেন বিপদে না পড়ে। তোমার ওখানে ত কোন অসুখের কথা নাই। তবে রাজেন্দ্র বাবু একেবারে আমার গৃহ হইতে উঠিয়া না গিয়া তাঁহার একটা ট্রাঙ্ক অন্ততঃ এখানে রাখিয়া যান"। সুতরাং আমি একটা মাত্র ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া মেঘনাথ বাবুর গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। মধ্যাহ্নে মেঘনাথ বাবুর গৃহে আহার করিলাম। কালী বাবুর গৃহে সে তত্ত্ব দিতে ভুল করিয়াছিলাম। কিন্তু মেঘনাথ বাবু কহিলেন 'আমি সে গোল সারিয়া লইব'। পরদিন শুনিলাম আমার জন্য মহাসোল বা মহাসের মৎস্যের চচ্চরি ও মুরিঘণ্ট বেলা দুইটা পর্য্যন্ত থালায় পড়িয়া আমার উদ্দেশ করিতেছিল। কিন্তু যখন সংসার বাবুর বাড়ী হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি মেঘনাথ বাবুর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছি, তখন হয়ত সে উপাদেয় খাদ্য সারমেয়-ভোজ্য হইয়াছিল। আমিও তজ্জন্য লজ্জিত হইয়াছিলাম। মেঘনাথ বাবু সে তত্ত্ব দিলে আর এ গোল ঘটিত না।

বিকালে কালী বাবুর বাসা হইয়া আমরা সকলে বহির্গত হইলাম। আমাদের দল বিলক্ষণ পুষ্ট, সকলেই বাঙ্গালী, রাস্তা আলো করিয়া চলিয়াছি। বাঙ্গালীদের এখানে খুব সম্মান ও খাতির। বাঙ্গালীরা সকলেই উচ্চ রাজকর্ম্মচারী; তাই অপরিচিত বাঙ্গালী দেখিয়াও গাড়ী চড়া বড় বড় মানুষেরাও আমার মত ধুতি চাদর পরা বাঙ্গালীকে সেলাম করিতেছিল।

আমরা সকলে একটা বাগানে প্রবেশ করিলাম, ইহাতে কলিকাতার ইডেন উদ্যানের মত প্রত্যহ ব্যাণ্ড বাদ্য হয়। এখানকার বহু ভদ্রলোক বেড়াইতে এই বাগানে বিকালে

আসিয়া থাকেন এবং তখনই বাদ্য হইতে থাকে। এ সুযোগে আমার সে দেশীয় ও বাঙ্গালী বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপাদি হইল। এখানকার কলেজ বাঙ্গালীরই সম্পত্তি। কলেজে যত অধ্যাপক সব বাঙ্গালী, এমন কি স্কুলের শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত সব বাঙ্গালী। রাজার বাঙ্গালীদের উপর বড় শ্রদ্ধা। তাহা তাঁহার রাজ্য শাসন ব্যাপারে বাঙ্গালীর আধিপত্য দেখিলেই অনুমান হয়। যে সকল দেবালয়ের বাঙ্গালী সেবায়েত তাহাদিগকেও উপযুক্ত অর্থ বিত্তাদি দিয়া রাজা প্রতিপালন করিতেছেন। রাজা মানসিংহ যখন বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন, তখন হইতেই বাঙ্গালীদের আধিপত্য জয়পুরে বিস্তৃত হইয়াছে। রাজা মানসিংহ আকবরের সেনাপতি ছিলেন। তিনি এই জয়পুর রাজ্যেরই উর্দ্ধতন পুরুষ, তিনি যশোরের প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে জয় করিয়া সেখান হইতে যশোরেশ্বরী দেবীকে আনিয়া তাঁহার রাজধানী অম্বরে স্থাপন করেন। সেই সময় বাঙ্গালী সেবায়েতগণ এখানে আসেন। ইঁহারা যথেষ্ট ভূমি সম্পত্তি ও সুবিধা প্রাপ্ত হইয়া অম্বরে এখনও বাস করিতেছেন। একদিন প্রাচীর বেষ্টিত সরোবরে কুম্ভীরের খেলা দেখিয়াছি। মাংস কিনিয়া উহাদিগকে খাইতে দিলাম, উহারা কাড়াকাড়ি করিয়া সসংগ্রামে খাইতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া আমরা উদ্যান ত্যাগ করিলাম, এবং দেবালয়ের আরতি দর্শন করিতে গেলাম। গোপীনাথজীর ও গোবিন্দজীর মন্দির একটু দূরে বলিয়া সেখানে না গিয়া নিকটবর্ত্তী মন্দিরের আরতি দর্শন করিলাম। আমাকে নবাগত বাঙ্গালী দেখিয়া সেবায়েত বাঙ্গালীগণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক মন্দিরে আমরা এদেশী যাত্রা কৃষ্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিলাম। এইরূপ যাত্রা গান এখানে প্রত্যেক দেবালয়ে পালা করিয়া হয়। যে দেবালয়ে যেদিন হইবার নিয়ম সেদিন সেখানেই হইয়া থাকে। এদেশী বুলিতে কৃষ্ণ ও রাধিকার অভিনয় আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। সুশ্রী বালকদ্বয় রাধা ও কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। অতঃপর রাত্রি অধিক হইতেছে অনুমান করিয়া আমরা আসর ত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি আমার জুতা-বিভ্রাট উপস্থিত। আগরা ট্যানারীর নূতন জুতা জোড়াটা এখানে অপহৃত হইয়াছে। সুতরাং আমি প্রস্তরময় রাস্তায় খালি পায়। বাসায় আসিয়া ট্রাঙ্ক হইতে আমার প্রাচীন জুতা বাহির করিয়া লইলাম।

মেঘনাথ বাবু নিত্য চা-পায়ী নহেন, আমিও ছিলাম না। এদেশে আসিয়া এই শীত কালে হইয়া পড়িয়াছি। মেঘনাথ বাবুও আমার সঙ্গে সে নেশাসক্ত হইয়াছেন। ফরমাশের আগেই দেখি সব ঠিকঠাক। প্রাতে চা ও জলযোগ করিয়া কান্তিবাবুর সহিত দেখা করিয়া আমার ত্রুটীর কথা বলিতে গেলাম। মেঘনাথবাবু আমার সহযাত্রী। মেঘনাথবাবু আমার অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করিলে তিনি কহিলেন “অবস্থা ভালই, মাছের লোভটা ছাড়িয়া কেমন করিয়া গেলেন; তিনি কেমন বাঙ্গালী? যাহা হউক আজ আমার এখানেই তাঁহার মধ্যাহ্নাহার হইবে।” আমি সে বেলায় রহিয়া গেলাম মেঘনাথ বাবু চলিয়া গেলেন, তাঁহার কলেজে যাইতে হইবে। এ দেশে আসিয়া অবধি ভাল করিয়া পূজা আহ্নিক করি নাই; সেদিন কান্তিবাবুর বাড়ীতে সেটুকু হয়। মেয়েরা পুষ্প চন্দন দিয়া পূজার প্রচুর আয়োজন করিয়া দিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার করিয়া কান্তিবাবুর বাড়ীর গাড়ীতেই কলেজে গেলাম। লাইব্রেরী গৃহে অনেকের সঙ্গেই দেখা হইল। সমস্ত কলেজ প্রিন্সিপাল কালীবাবুর সঙ্গে ঘুরিয়া দেখিলাম; মেঘনাথ বাবু তখন পড়াইতেছিলেন তাঁহার সঙ্গে আলাপ তখন হইল না। লাইব্রেরী গৃহে গিয়া বসিলাম ও অদল বদল করিয়া অধ্যাপকগণ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন তাই দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে মেঘনাথ বাবুর সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলাম।

প্রায় সমস্ত সহরটাই সুদৃঢ়, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, সহরের কতক অংশ মাত্র এই প্রাচীরের বাহিরে। এ সকল স্থানেও বাঙ্গালীদের বাড়ী ও বাগান আছে। সে দেশীয়ের ত আছেই। কলেজ হইতে বাহির হইয়া একেবারে পশুশালায় আসিলাম। এখানে কলিকাতার জুলজিকেল গার্ডেনের অনুকরণে একটী উদ্যান আছে। এখানে বহু পশু পক্ষী রক্ষিত হইলেও কলিকাতার

জুলজিকেল গার্ডেনের ন্যায় তত বড় নহে, তথাপি সংগ্রহ উত্তম; বহু দুষ্প্রাপ্য পশু পক্ষীও দেখিলাম।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা সেই উদ্যানে গিয়া বাদ্যাদি শ্রবণ ও গল্প রসে আমোদ উপভোগ করিয়া দেবালয়ে কৃষ্ণ গুণানুবাদ যাত্রা শ্রবণে গেলাম। এবার কিন্তু যাহাতে জুতা বিভ্রাট ঘটিতে না পারে তাহার উপায় করিলাম। যাত্রা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চলিয়া আসিলাম। রাত্রে আহার প্রত্যহই মাংস ও লুচি বা রুটী দুগ্ধাদি সংযোগে। মেঘনাথ বাবুর বাড়ী আসিয়াও প্রত্যহ মৎস্যাহার চলিতে লাগিল। কান্তি বাবুর বাড়ীতেই মৎস্য আইসে; তথা হইতে প্রত্যহ আমার জন্য মৎস্য মেঘনাথ বাবুর বাড়ীতে আসিত। প্রচুর মৎস্য আসিত; আমাদের সকলের তাহাতেই চলিয়া যাইত। শীতকাল বলিয়া রাত্রে মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা। সকলেই একদিন রাজকীয় শ্মশান ক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছিলাম, শ্মশানে প্রায় প্রত্যেক মন্দিরেই লিঙ্গ আছেন। রাজা ও রাণীদের নাম জয়পুরী ভাষায় মন্দির গাত্রে লিখিত আছে।

এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা লজ্জাশীলা ও পরদানবিস, বাঙ্গালীদেরই মত। বাঙ্গালীদের মত এখানকার স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর কার্য্য করিয়া থাকে। যে সকল কাইঞা বা জৈন দিগকে আমরা বাঙ্গলায় ব্যবসা করিতে দেখি,—তাহারা রাজপুতনাবাসী,—জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, বা বিকানীর প্রদেশের লোক। কেহ কেহ বা গোয়ালিয়ার ও ইন্দোর প্রদেশেরও আছে। এই সকল প্রদেশে বহু জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

এদেশীয় লোকের বিবাহ প্রণালী প্রায় আমাদেরই মত। প্রভেদ কেবল বর ঘোড়ায় চড়িয়া যোদ্ধৃবেশে বিবাহ করিতে যায়। তখন মাঘ ও ফাল্গুণ মাস। এই সময় এখানে অনেকগুলি বিবাহ দেখিয়াছি। অধিকন্তু বিবাহ সভায় কোন কোন স্থানে নিমন্ত্রিতও হইয়াছি। বিবাহে আমাদের মত কলাগাছ পুতিয়া মন্ত্র পাঠ হয় না, বাহিরে সভা করিয়া পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইয়া থাকেন। বরের সঙ্গে বরযাত্রীরা শোভাযাত্রা করিয়া যায়। বন্দুক, বোম, বাজী ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত আছে। এক একটা বড় বিবাহে অসংখ্য অশ্বারোহী যায়; যেন একটা দেশ জয় করিতে ইহারা চলিয়াছে।

সরস্বতী পূজার দিন আমি জয়পুরে। এখানকার রাজার বিদ্যাপূজা চমৎকার। রাজার শিক্ষাগুরু কান্তিবাবু, এ দিনে কান্তি বাবুরও পূজা হয়। কান্তি বাবুকে লইয়া রাজা শোভা যাত্রায় বাহির হন। অসংখ্য বন্দুকধারী সিপাহী, বহু সজ্জিত হস্তী ও অশ্ব, তার মধ্যে রাজা কান্তি বাবুকে লইয়া অশ্ব শকটে বাহির হন। এই শোভাযাত্রা বড় চমৎকার। পুণ্যের বলে কান্তিবাবু জীবন ধন্য করিয়াছেন।

এখানে একটী বৃহৎ রাজকীয় লাইব্রেরী আছে। আমরা সেই লাইব্রেরীর উপরিভাগে ছাদে উঠিয়া এই শোভাযাত্রা দেখিয়াছিলাম। এই লাইব্রেরীতে পূর্ব্বে বাঙ্গলা পুস্তক পত্রিকা ছিল না। কান্তিবাবু আসিয়া অসংখ্য বাঙ্গলা পুস্তক পত্রিকা লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করিতেছেন। লাইব্রেরীতে বসিয়া পত্রিকা পাঠ করা যায়। চাঁদাদাতৃগণ পুস্তকাদি গৃহেও নিতে পারেন। আমি তদ্রূপ সভ্য না হইলেও পুস্তকাদি ইচ্ছামত স্বাক্ষর করিয়া নিতে পারিতাম। আমার জন্যই এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

আমি আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে কান্তি বাবুর স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে। তিনি সেখানেই স্ত্রীর শ্মশানে মন্দির প্রস্তুত করিতেছেন দেখিলাম। রাজকীয় শ্মশান ক্ষেত্র হইতে উহা অনেক দূর। এখানে একটী রাজকীয় দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। হাঁসপাতালে গিয়া দেখিলাম, রোগীর সংখ্যা অতি সামান্য। রোগ এখানে খুব কম হয়। কেবল কয়েকজন মাত্র ঘা ও উপদংশ রোগী দেখিলাম, একটী স্ত্রীলোকের উদরী রোগ দেখিয়াছিলাম। বাঙ্গালী ডাক্তার কহিলেন, শীতকালে এদেশে রোগ কম হয়, গ্রীষ্মকালে রোগ বেশী হয়। তাও আমাদের দেশের মত নহে। হাঁসপাতাল গৃহ প্রাঙ্গণে অনেকগুলি কয়েদীকে কাজ করিতে দেখিলাম। উহারা গৃহাদি পরিষ্কার করিতেছে ও বাগানের কাজ করিতেছে। পাকা বাড়ী প্রস্তুতের আয়োজনও করিতেছে। কয়েদীদের সঙ্গে একজন

করিয়া প্রহরী থাকে। ইহারা পলাইয়া যাইতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখে ও তাহাদের দ্বারায় কাজ করাইয়া লয়।

এখানে নদী নাই, এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে; তাহাতে একদিন স্নান করিয়া আসিয়াছি। এই নদী হইতেই আমার জন্ত জল আসিত।

রাজ বাটীতে সপ্ততল একটী বৃহৎ প্রাসাদ আছে, তাহার নাম হাওয়া-মহল। এই হাওয়া মহলে পূর্ব্বে রাণীগণ হাওয়া খাইতেন, এখন অসংখ্য কবুতর বাস করে। রাজ বাটীর বাহিরের প্রকোষ্ঠ যেমন বড় ভিতরের অন্তঃপুরও আয়তনে কম নহে। রাজার অনেক মহিষী, তন্মধ্যে একজন প্রধানা। ইঁহার গর্ভজাত সন্তানই রাজ্যাধিকারী হন; অপর রাণীদের পুত্রেরা বৃত্তিভোগী হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে সুন্দরী কন্যা থাকিলে তাহার পিতা রাজ-শ্বশুর হইবার ভরসায় রাজাকে কন্যা দান করে, আর রাজাও কখন কখন বিবাহপ্রার্থী হইয়া পাত্রী আনয়ন করেন। প্রধানা মহিষীরই অন্তঃপুরে প্রাধান্য বেশী। ইহা ব্যতীত রাজা যাহাকে ভালবাসেন তাহার প্রাধান্যও কম নহে। বিলাসিতার উপকরণ কোন অংশেই কম নহে। পরিচারিকা ব্যতীত অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার কাহারও নাই। তবে কোন কোন ব্যক্তি সে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা রাজার বিশ্বস্ত ভৃত্য বা পার্শ্বচর। মহিষীদের পিতা বা ভ্রাতা প্রভৃতিকেও রাজ অনুমতি লইয়া তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়।

এখানে একটী বৃহৎ দুর্গ আছে। ভারতের রাজকুমার বা প্রিন্স-অব-ওয়েল্স্ যখন জয়পুরে আসিয়াছিলেন তখন দুর্গ-গাত্রে পর্ব্বতোপরি কালো পাথরের উপর সাদা মারবেল পাথরে Welcome শব্দ লিখা হইয়াছিল। এখানকার সৈন্য-গণকে প্রত্যহ শীতকালে কুচকাওয়াজ করিতে দেখিলাম।

এখানে জলের কল আছে। সহরের এক পাশেই এই কল স্থাপিত হইয়াছে। আমরা একদিন তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে একটী ইংরেজী ধরণের হোটেল ইংরেজ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বিদেশী বড়লোক ভ্রমণ করিতে আসিলে এখানে আশ্রয় পান। এখানে যাঁহারা আসেন তাঁহারা রাজকীয় শকট ও হস্তী ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া সহরে একা গাড়ী এবং গরুর গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়।

এখানে একটী বাজার আছে। তাহার নাম চকবাজার। চকবাজারে বহুতর দেশী ও বিলাতি দ্রব্যের দোকান আছে। চকবাজারের চারিদিকেই প্রশস্ত সড়ক। বাজারের কোন কোন অংশ সড়কের উপর পড়িয়াছে। বাজার প্রায় সারাদিনই লাগিয়া আছে। ইহা ছাড়া সপ্তাহে দুই দিন করিয়া একটী হাট এখানেই সড়কের উপর বসে। যত সব আবশ্যকীয় দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। প্রাতে একটী বাজার বসিয়া থাকে, সেখানে তরিতরকারী ও দুগ্ধাদি পাওয়া যায়। ধান্য ও গোধূমাদি চকবাজারেও বিক্রয় হয়, তাহা ছাড়া অন্য একটী শস্যের বাজারও আছে। এ প্রদেশে শস্যের মূল্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক কম সুতরাং একজনের সামান্য খরচায় বেশ চলে। দুগ্ধাদির মূল্যও কম। মাংসও অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। এখানকার হিন্দুরা কালী বাড়ীতে পাঠা বলি দিয়া মাংস খায়। গোমাংস নাই, গোবধে গুরুতর দণ্ড হয়। মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বা নাই বলিলেও চলে, সুতরাং গোবধও হয় না; তার পর আইনের বন্ধন আছে।

হস্তী শালায় বহুতর হস্তী আছে। মধ্যে মধ্যে ইহাদের মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। উহা বেশ দেখিবার জিনিষ। আমি একদিন দেখিয়াছিলাম। অশ্বশালায়ও অগণ্য অশ্ব। এতদ্ব্যতীত রাজগৃহে নানাবিধ পক্ষী আছে উহারা মুখে মুখে ভগবানের স্তোত্র কহিয়া থাকে। উহারা পার্ব্বত্য পক্ষী। ময়না পাখীও এখানে দেখিলাম।

রাজ দরবার গৃহ বা দেওয়ানী আম ও দেয়ানী খাস দেখিবার জিনিষ। এই দুই গৃহের ভিট ও ছাদ সবই সাদা মার্ব্বেল প্রস্তরে রচিত। এখানে মার্ব্বেল পাথরের কার্য্য করিয়া থাকে এমন কতগুলি কারিকর আছে। সাদা পাথরের থালা বাটি, ঘটী, গ্লাস, টেবিল, চেয়ার ও খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। যে জয়পুরী পাথরের নাম আমরা শুনিয়া থাকি উহা জয়পুরে পাওয়া যায় না। জয়পুরে জিনিষ মাত্র প্রস্তুত হয়;—পাথর

আইসে মাকরানা পর্ব্বত হইতে। মাকরানা হইতে পাথর আগ্রা, জয়পুর, বরদা, মহিসুর, বোম্বাই ও নিজাম রাজ্যে প্রেরিত হয়। তথায় গিয়া কারিকরের হাতে পড়িয়া মনোমত জিনিষ প্রস্তত হয়। জয়পুরে পিতলের জিনিষ উৎকৃষ্ট হয়। পিতলের কারখানায় বাঙ্গালী অধিপতি। এই পিতলের জিনিস নানা দেশে রপ্তানী হয়। আমি এখান হইতে পিতল ও পাথরের জিনিস আনিয়াছিলাম; মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ।

জয়পুর রাজধানীর সমস্ত গুলি বাড়ীই এক পদ্ম-পলাশ বর্ণের হইতে হইবে, অন্য রঙ্গ করিবার রাজাদেশ নাই। বড় বড় প্রশস্ত রাস্তার উপর এরূপ বাড়ীগুলি বড় সুন্দর দেখায়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ গলিগুলি বড় অপরিষ্কার ও সেখানে যে রকম ইচ্ছা বাড়ী করা যাইতে পারে।

রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী অম্বর এখান হইতে দশ মাইল দূরে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। রাজা মানসিংহের আমলে সেখানে রাজধানী ছিল। এখন উহা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। এখন মাত্র লুপ্ত-প্রায় প্রাচীন অট্টালিকাসমূহ রাজধানীর সাক্ষ্য দান করিতেছে। অম্বরের সেই পরিত্যক্ত অট্টালিকা সমূহ রাজাদেশে মেরামত ও সর্ব্বদা পরিষ্কার করা হয়। তখনকার কারুকার্য্য দেখিয়া মনে হয় যেন আজ কালই ইহার কর্ম্ম করিয়া গিয়াছে। এখন কি আর দেশে এমন শিল্পী আছে? এই অম্বরেই যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির। এখনও দেবীর পূজা রীতিমত হয়। প্রত্যহ এখানে একটী করিয়া ছাগ বলি হয়, তাহা ছাড়া সাধারণের পূজায়ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। বহুতর দেবোত্তর সম্পত্তি এই কালি বাড়ীতে দেওয়া হইয়াছে। উহাদ্বারা বেশ সেবা চলে। আমি উপস্থিত থাকা কালে দেখিলাম একজন জমীদার অনেকগুলি খাজনার টাকা আনিয়া সেবায়েতকে বুঝাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দেবীর সেবায়েতগণ বাঙ্গালী। রাজা মানসিংহ ইঁহাদিগকে এখানে আনয়ন করেন। তারপর আর তাহারা দেশে যান নাই। বাঙ্গালা হইতে বিবাহের বর ও কন্যা আনয়ন করেন। তাহারাও আর বোধ হয় জীবনে দেশে যাইতে পারেন না।

আমি একটী অল্পবয়স্ক রমণীকে দেখিলাম। ইনি বাঙ্গলা ভাষায় আলাপ করেন। বাকুড়া জেলা হইতে সেবায়েতের পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষায় আলাপ করিয়া মনে করিলেন যেন স্ব গ্রামের আত্মীয় লোক পাইয়াছেন। আর যাঁহারা প্রাচীন আছেন তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছেন। এই সকল স্ত্রী পুরুষ দেখিলে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। ভাষা, পরিচ্ছদাদি সবই সে দেশী।

অম্বর দেখিয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি কালী বাবুর গৃহের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সকলেই যেন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমার আগমনে যেন গল্প জাল করিয়া জমিয়া উঠিল। বিপিন বাবু (চট্টোপাধ্যায়) তাঁহার স্বাভাবিক কতকগুলি গল্প করিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গলার যেগুলো হাকিমের গল্প চমৎকার হইয়াছিল, তাহা এখনও মনে আছে। আমরা সকলে উঠিয়া আজও যাত্রা শুনিতে এক দেবালয়ে গেলাম। তার পর যাত্রা শুনিয়া সে দিনের মত গৃহযাত্রা করিলাম। আমার জুতা বিভ্রাটের পর হইতে বড় সাবধানে জুতা রক্ষা করিতাম বলিয়া আর হারাণ যায় নাই। কৃপণের ধনের মত সেই ছেঁড়া জুতা জোড়াটী রক্ষা করিতেছিলাম বলিয়াই কথাটা বার বার বলিতে হইতেছে।

পরদিন প্রাতে বিশ্রাম ও মধ্যাহ্নে কান্তি বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া এক মহাদেব দেখিতে গেলাম। মহাদেবের মাথা দিয়া প্রস্রবণের মত সর্ব্বদাই জল উঠিতেছে।

মহাদেবের মন্দির দেখিবার যোগ্য কিন্তু এখানে কোন ভদ্রবসতি নাই। এখান হইতে রক্ষিত অরণ্য প্রদেশে গেলাম। ওখানে নানাজাতীয় হরিণ ও ব্যাঘ্রাদি শিকারের জন্য আছে। রাজা ও অভ্যাগত রাজগণ এখানে শিকার করিয়া থাকেন। স্থানে স্থানে মাঁচা বাঁধা আছে, মাঁচার উঠিয়া বহু আরণ্য জন্তু দেখিতে পাইলাম। মাঁচা অনেক উচু, বাঁশের সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে স্থান

পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। পথে কোন বিভ্রাট রাত্রিতে না ঘটে তজ্জন্য অস্ত্রধারী প্রহরী সঙ্গে ছিল। এ প্রদেশে অস্ত্র আইন নাই, যে সে লোক যত ইচ্ছা বন্দুকাদি রাখিতে পারে। অদ্য আমার কালীবাবু প্রিন্সিপালের বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ সুতরাং আহারের জন্য একেবারে সেখানেই গেলাম। রাত্রে আর মেঘনাথ বাবুর গৃহে গেলাম না। রাত্রে গিয়াই দেখি দরবার প্রস্তুত, আমি আহ্নিক করিয়া জলযোগ করিয়া দরবারে আসিয়া পুনরায়, প্রথম হইতে গল্পগুলি কহিবার জন্য বিপিন বাবুকে অনুরোধ করিলাম।

একদিন করৌলী গিয়াছিলাম। জয়পুর হইতে হিণ্ডন রোড্ ষ্টেশনে নামিয়া করৌলী যাইতে হয়। আমার যাওয়ার সুবিধা পূর্ব্বেই কান্তিবাবু করৌলী রাজবাটীতে লিখিয়া করিয়াছিলেন বলিয়া আমি হিণ্ডন রোড্ নামিয়াই রাজকীয় শকট পাইলাম। করৌলীতে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন। উঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, মদনমোহনজী বিগ্রহের সেবায়েত। উঁহারা চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী। করৌলীর দেওয়ান রায় বাহাদুর ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। মদনমোহনজীর বিগ্রহ ও যাহা দেখিবার তা দেখিয়া আমি জয়পুর ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্র ১২টা হইয়া গিয়াছে। আশুবাবু বলিয়া একজন ভোলানাথ বাবুরই আত্মীয় জয়পুর রেল ষ্টেসনে কাজ করেন। আমি জয়পুর রাজধানীতে এত রাত্রে প্রবেশের অধিকার পাইব না বলিয়া আশুবাবুর গৃহেই জলযোগ করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতে উঠিয়া দেখি অসংখ্য ময়ূর ও পারাবত এবং বন্য পক্ষীগণ মাল গুদামের শস্যাদি আহার করিতেছে। উহারা পরমানন্দে কলহ করিয়া খাইতেছে, দেখিয়া বড় তৃপ্তি বোধ হইল। জৈনধর্ম্মাবলম্বীগণ পশুপক্ষীকে ভোজন করাইয়া পুণ্য ও তৃপ্তি লাভ করেন। আজ আমার আসিবার কষ্ট ছিল না সুতরাং হাঁটা পথেই সংসার বাবুর গৃহে উপস্থিত হইলাম। প্রাতরাশ এখানে করিয়া মেঘনাথ বাবুর গৃহে চলিলাম। জয়পুর রাজধানী উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। রাত্রে ৯টা পর্য্যন্ত সহরের প্রবেশ দ্বার খোলা থাকে। ১১টা পর্য্যন্ত বড় দরজা বন্ধ হয় ও ক্ষুদ্র দরজা খোলা থাকে উহা দিয়া কেবল মানুষ চলিতে পারে। ১১টার পর দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। তবে দিবাভাগে রাজকীয় অনুমতি লইয়া রাখিলে প্রহরীরা দ্বার খুলিয়া দেয়। এই অসুবিধা হেতু আমি রাত্রে সেখানেই ছিলাম।

একদিন আমি মেঘনাথ বাবুর সহিত আহার করিয়া কলেজে গেলাম এবং তথা হইতে প্রিন্সিপালকে বলিয়া তিনি আমার সঙ্গী হইলেন। আমরা রাজকীয় কাছারী বাড়ী বা বিচারাদালত দেখিতে গেলাম। এখানকার দেওয়ানী ফৌজদারী বিচার এক হাকিমেই করিয়া থাকেন হাকিমগণ আমাদিগকে দেখিয়া কাজ ফেলিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের বিচার করিতে অনুরোধ করিলাম। তদনুসারে তাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হাকিমদের সম্মুখে বসিয়া হাটু গাড়িয়া উকীলগণ সওয়াল জবাব বক্তৃতাদি করেন। এখানে বাঙ্গালী হাকিম বা উকীল দেখিলাম না, আফিসের লোকও সে দেশীয়। একজন মুসলমান সে দেশী উকীল দেখিলাম তিনি আমাদের সঙ্গে বহু গল্প ও রহস্য করিলেন। এরূপ রহস্যামোদী লোক কদাচিৎ পাওয়া যায়। এখানে একটী কাউন্সিল আছে, রাজা তাহার সভাপতি, রাজ্যের বড় রাজ-সম্পর্কিত লোক এই কাউন্সিলের মেম্বার। কান্তিবাবু ও সংসার বাবু ইহার মেম্বার। যত কিছু কাজ এই দুই জনেই করেন। অপর মেম্বারেরা কাছারীতে আসিয়াও বিছানায় পড়িয়া নিদ্রা ও গড়াগড়ি যান। কাউন্সিলের মধ্যে ও রাজার সম্পর্কিত আত্মীয় লোক আছেন, তন্নিম্নে রাজ আত্মীয় লোক নাই। রাজা ইহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। বিচারকগণ দেখিয়াছি পাল্কীতে কাছারীতে যাতায়াত করেন। এই সকল পাল্কী বেহারা রাজ সরকারের নিযুক্ত। কাউন্সিলের মেম্বরেরা অন্যযানে যাতায়াত করেন।

মহারাজার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় জন্মিয়াছিল। তিনি আমার গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন এবং আমি তাঁহার অবসর সময় তাঁহার নিকট যাইতাম। মহারাজ যখন বিলাত গিয়াছিলেন, তখন তিনি হিন্দু মতে সর্ব্ব প্রকার হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য

আদেশ পত্র দেন, আমিও স্বীকার হইয়া পত্র লিখি। কিন্তু আমার নাম মহারাজার বাঙ্গালী সহযাত্রীদের নামের লিষ্টে সংবাদপত্রে বাহির হইল দেখিয়া সামাজিকগণ আমার উপর চটিয়া গেলেন ও আমি যাহাতে বিলাত যাইতে না পারি তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। আমি গৃহে আবদ্ধ হইলাম। আমার মাতা কহিলেন "তুমি যদি বিলাত যাও তবে মরিয়া কার হাতে পিণ্ড পাইব, তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র"। সুতরাং মাকে পিণ্ড পাওয়াইবার জন্তই আমি আর বিলাত যাইতে পারিলাম না। জয়পুরের মহারাজা যেমন হিন্দুভাবে বিলাত গিয়াছিলেন তাহা জানিয়া আমাকে যাঁহারা নিষেধ করিয়াছিলেন তাঁহারা পরে অনুতপ্ত হইলেন। বর্ত্তমান মহারাজা শৈশবে তাঁহার এক আত্মীয় কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন। তিনি শৈশবে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার আদেশে সমাতৃক বৃন্দাবনে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। সমাতৃক রাজবালক বৃন্দাবনে আসিলে যে আত্মীয় তাঁহাকে প্রতিপালন করেন তাঁহার পত্নীকে রাজা "মা" বলিয়া ডাকিতেন। তিনি জীবিত কালেই আমি জয়পুর যাই। তাঁহার সেই মায়ের কষ্টের কথা জ্ঞাপন করায় তিনি তাঁহাকে জয়পুরে যাইতে কহিলেন, কিন্তু সাধ্বী রমণী বৃন্দাবনেই মরিলেন।

জয়পুরের লোকেরা ডাক্তারী ঔষধ কম খায় বা খায়ই না। কবিরাজী ঔষধ খায়। আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে কিন্তু এখানে ভিজিটের পরিমাণ অতি সামান্য। চিকিৎসকেরা সামান্ত পয়সা ভিজিট পাইয়া রোগী দেখিয়া থাকে। কবিরাজী পড়িবার ব্যবস্থা এখানে আছে। সংস্কৃত টোল আছে। ছাত্রগণ অনেকেই রাজ-সরকারী বৃত্তি পাইয়া থাকে। জ্যোতিষেরও এখানে চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে। এদেশীয় ব্যবসায়ীরা বড় কৃপণ। তাহারা পয়সা লাগিবে ভয়ে কাপড় ধোলাই করে না। নিদৃষ্ট সংখ্যক টাকা না হইলে তাহারা দুবেলা খায় না, কেহ কেহ দুগ্ধাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ কৃপণের বাড়ীতেও কদাচিৎ বিবাহাদি উৎসবে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া যায়, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা।

একদিন গোমুখী পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলাম। গহ্বরে একটী গোমুখ আছে, তাহা দিয়া অনবরত জল আসিতেছে। ইহা কোন তীর্থ নহে কিন্তু কোন কোন পথিক তীর্থ জ্ঞানে ইহাতে স্নানাদি করে। পর্ব্বতের ঝরণার জল বড় পরিষ্কার দেখিয়া আমিও স্নান করিলাম, কিন্তু মেঘনাথ বাবু তাহা করিলেন না। সে দিন রবিবার সুতরাং গৃহে ফিরিবার তাড়াতাড়ি ছিল না। গহ্বরের নিকটবর্ত্তী একটী বাগান হইতে আঙ্গুর ও বহু ফল তুলিয়া জলযোগ করিলাম। আঙ্গুরগুলি ক্ষেত্রজাত, কিছু টক আছে বলিয়া মেঘনাথ বাবু কম খাইলেন, আমি সবই খাইলাম। খরমুজার মত এক প্রকার ফল চিনি সংযোগে খাইলাম, কিন্তু ও ফলের নামটী আমার মনে নাই।

ওখানে কয়েকটী তুলার কল আছে ঐ সমস্তও একদিন দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

প্রায় দুইমাস কাল অতি তৃপ্তির সহিত জয়পুর বাস করিয়াছিলাম। পরে নিরানন্দ হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলাম। অতি প্রাতে গাড়ী ছাড়ে সুতরাং দিনের বেলায়ই মেঘনাথ বাবু রাত্রে দরজা খুলিয়া দেওয়ার জন্ত পাশ লইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি সে রাত্রে সংসার বাবুর বাড়ী থাকিয়া খুব প্রাতে উঠিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। আর একবার কিছুদিনের জন্ত বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম তখনও জয়পুরে বন্ধুদিগকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। বড় আনন্দময় স্থান, এ জীবনে কখনও ভুলিব না।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ।

'সে কেমন'

(অনুবাদ)

('She walks in beauty·········'Lord Byron.)

জলদ-মুক্ত,
তারকা-যুক্ত,
নিশিগিনী যথা—
হেসে ধীরে যায়,

শুভমতি সে বালা
পরি' ফুলমালা
সুষমা-গরবে
হাসিয়া বেড়ায়!

আঁধারের মাঝে
যাহা ভাল সাজে,
যাহা ভাল রাজে
উজ্জ্বলতায়,

সে সকলি এসে
দেহে তার মিশে,
সাজায়েছে, মরি!
কি চারু ভায়!

যে কোমল আলো,
নিশি মাঝে ভালো,
যাহা দিবা ভাগে
যায় না দেখা,

তার ফুল্লানন
যুগল নয়ন
রয়েছে সতত
তাহাতেই মাখা।

তার দেহ মাঝে
যেখানে যা আছে,
তাহাতেই তারে
মানায় বেশ,

আলো সমাধান
সূত্র পরিমাণ
বেশী কম হলে
মাধুরী শেষ!

তার সে মাধুরী
আনন উপরি
ফুটায়েছে কিবা
কোমল আভা,
পরে কেশ দিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে
দেখায়ে গিয়াছে
আপন শোভা।

সেই রমণীয়
ফুল্ল কমনীয়
আননে ফলিত
ভাবনা গুলি
অতি সযতনে
"হৃদয়"-রতনে
সরাসরি করি
রেখেছে তুলি।

শান্ত, সুকোমল,
ভাবে টল মল,
বদন কমল,
শোভা নিকেতন,

যবে লাজ, হাসি,
উঠে তাহে ভাসি
কি আছে এমন
চারু দরশন ?

তার সে সুষমা
পূর্ণ মধুরিমা
রাজে গো তখন
লোহিত রাগে !

বিগতসততা
শত মধুরতা
উপরে তাহার
ভাসিয়ে জাগে।

জাগে তার মাঝে
চারুতর সাজে
শান্ত মন খানি
সুখ শান্তি ভরা,—
পবিত্র হৃদয়
যা হতে উদয়
দিব্য অনুরাগ
মন মুগ্ধ করা !

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

সম্রাজী বনাম সম্রাজ্ঞী

(আলোচনা)

কয়েকদিন হয় সাপ্তাহিক একখানা সাহিত্য পত্রে "সম্রাজী বনাম সম্রাজ্ঞী"—শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধটীর মর্ম্ম এই যে উল্লিখিত সাপ্তাহিক পত্র কোনও একখানি মাসিক পত্রিকার কোনও প্রবন্ধে সম্রাজী শব্দটার প্রয়োগ দর্শন করিয়া উহাকে অপপ্রয়োগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; অন্য একজন সমালোচক ও আবার ঐ সমালোচকের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহারই অনুকূলে সম্রাজী শব্দের অসাধুতাই প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের উদ্দিষ্ট প্রবন্ধকার তাদৃশ অযথা নিন্দাবাদের অনৌচিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্রাজী শব্দটী যে সাধু, অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত ইহাই সমর্থন ও সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইঁহার মতে সম্রাজী শব্দটী যদিও হয় ত মাসিক পত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঠিক সেই অর্থের বাচক না হউক অর্থাৎ আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় সর্ব্বভূমীশ্বরী রাজ্ঞীকে (Empress) না বুঝাউক, তথাপি শব্দটী স্বতঃ অসাধু বা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ অপশব্দ নহে। ইনি বলেন সম্রাজী শব্দটী যখন সম্রাটের জায়া বা কন্যাকে বুঝাইবে তখন উহা অপশব্দ নহে সাধু শব্দই বটে। কিন্তু স্বয়ং সর্ব্বভূমীশ্বরীকে (Empress) বুঝাইলে তখন অপশব্দই বটে। সর্ব্বভূমীশ্বর পুরুষ (Emperor) বা সর্ব্বভূমীশ্বরী স্ত্রী (Empress) কে বুঝাইলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই কেবল সম্রাজ্ শব্দ ব্যবহৃত হইবে। সমালোচকের শেষোক্ত সিদ্ধান্তে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কারণ সম্রাজ্ শব্দ উভয় লিঙ্গেই সমান থাকিবে। স্ত্রীত্ব ইচ্ছা করিয়া ইহার উত্তর কোনও স্ত্রীপ্রত্যয়ের বিধান কোনও ব্যাকরণে নাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সমালোচক সম্রাটের পত্নী বা সম্রাটের কন্যা বুঝাইলে যে স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ শব্দে ঙীষ্ প্রত্যয় করিয়া সম্রাজী শব্দ সাধন করিয়াছেন এবং তাহার সাধন সমর্থনও করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেটী তাঁহার আকস্মিক প্রমাদ ব্যতীত অন্য আর কি হইতে পারে? পাণিনির "পুংযোগাদাখ্যায়াম্" এই সূত্রের রহস্য সমালোচক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন কিনা বুঝা যায় না। আমার এই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য এই যে, যেন শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনরূপ মিথ্যা ধারণা সুকুমার মতি শিক্ষার্থীদিগের কোমল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া না যায় এবং তাহারা যেন চিরকাল ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী না থাকে।

প্রথমে দেখা যাউক, পাণিনির "পুংযোগাদাখ্যায়াম্"

এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি? ভট্টোজীকৃত ইহার বৃত্তিই বা কি? বৃত্তিটী এইরূপ "যা পুমাখ্যা পুংযোগাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্ততে ততো ঙীষ্ স্যাৎ।" যে শব্দ পুরুষের আখ্যা (নাম) পুরুষ বাচক সেই শব্দ পুংযোগে ভার্য্যাকে বুঝাইলে তাহার উত্তর ঙীষ্ হয়। ভার্য্যা না বুঝাইলে ঙীষ্ হয় না। যথা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বোপদেব গোস্বামী "পত্ন্যামপালকন্তাৎ" অর্থাৎ পত্নীকে বুঝাইলেই পুংবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হইবে অন্যার্থে হইবে না। অতএব কন্যা বুঝাইলে কখনই ঙীষ্ বা ঈপ্ হইবে না; ভার্য্যা বুঝাইলেই এবং কেবল অকারান্ত শব্দের উত্তরই ঙীষ্ হইবে, অন্য স্বরান্ত বা হলন্ত শব্দের উত্তর হইবে না। এ সম্বন্ধে ভট্টোজী স্বকৃত বৃত্তিতে যদিও অকারান্ত বলিয়া স্পষ্ট কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই,তথাপি সূত্র সমূহের বিধি নিষেধাদি-রূপ পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। এই স্থলে মুগ্ধ বোধের পূর্ব্বোক্ত সূত্রবৃত্তির দুর্গাদাস কৃত ব্যাখ্যা দর্শন করুন। যথা—"পত্যা উঢ়া পত্নী ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিবাহকর্ত্তা উপলক্ষ্যতে ইত্যত আহ পুংবাচকাদিতি। যাদৃগ্-জাতীয়স্য বিপ্রতিষেধো বিধিরপি তাদৃগ্‌জাতীয়স্যেতি-ন্যায়াৎ পালকান্তবর্জ্জনাদ্ অকারান্তাদেবায়ং বিধিরিতি। অন্যথা পুংসঃ পত্নী ইত্যাদাবপি প্রসজ্যেত (ঈপ্ ভবেৎ)"। পত্নী বুঝাইতে পাণিনি আবার ঈপ্ বিধান করিয়া আরও তিনটী পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন। যথা—"পূতক্রতোরৈচ।" অর্থাৎ ভার্য্যা বুঝাইলে পূতক্রতু শব্দে ঙীপ্ হয় (পূর্ব্বানুবৃত্তি) এবং অন্তে ঐকারাদেশ হয়। দ্বিতীয় সূত্র—'বৃষাকপ্যগ্নি কুসিত-কুসিদানা মুদাত্তঃ'। অর্থাৎ বৃষাকপি, অগ্নি, কুসিত ও কুসিদ শব্দে উক্তার্থে ঙীপ্ ও ঐকার অন্ত্যাদেশ হয়, কেবল ঐকারটী উদাত্ত স্বর হয়। তৃতীয় সূত্র—"মনোরৌ বা।" অর্থাৎ মনু শব্দে ভার্য্যা বুঝাইলে বিকল্পে ঙীপ্ হইবে এবং বিকল্পে ঔকার অন্ত্যাদেশ হইবে, পক্ষে উদাত্ত ঐকারও আদেশ হইবে। যথা মনুর স্ত্রী মনায়ী, মনাবী, পক্ষে মনুই থাকিবে। যদি ভার্য্যা বুঝাইতে অকারান্ত ভিন্ন শব্দের উত্তর ঙীষ্ বিধান অভিপ্রেত থাকিত তাহা হইলে পক্ষে মনু শব্দে ঙীষ্ হইয়া মন্বী পদ হইত। কিন্তু বৃত্তিকার পাক্ষিক উদাহরণ স্থলে ঙীষ্ করিয়া মন্বী করেন নাই,মনুই রাখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সূত্রার্থ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে অকারান্ত শব্দে ভার্য্যা বুঝাইলে ঙীষ্ হইবে, অন্য স্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত শব্দে হইবে না। অতএব সম্রাজ্ শব্দে কি স্ত্রী বুঝাইলে কি পত্নী বুঝাইলে কোথাও ঙীষ্ হইবার অবকাশ নাই। স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে একরূপই থাকিবে। হলন্ত শব্দের উত্তর অন্য কোনও অর্থে কোনও স্ত্রী প্রত্যয় হওয়ার বিধান ব্যাকরণ শাস্ত্রে নাই। নিতান্ত পক্ষে ভাগুরির মতে বিকল্পে আপ্ হইয়া সম্রাজা শব্দ সাধিত হইতে পারে।

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপ মবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
টাপঞ্চাপি হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা।"

এই কারিকা বলে হলন্ত শব্দে ইচ্ছা করিলে টাপ্ বা আপ্ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনও ঙীষ্ বা ঈপ্ হইবে না। অতএব কোনমতেই সম্রাজ্ঞী শব্দ ব্যাকরণসম্মত হইতে পারে না। সম্রাজ্ শব্দে ভার্য্যা বুঝাইলেও অন্ততঃ আপ্ই করা যাইতে পারে। সমালোচক যে কন্যা বুঝাইতে সম্রাজ্ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ বিধান করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা কোথাও পাই নাই।

এ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে সম্রাজ্ঞী শব্দ কোন মতেই ব্যাকরণসম্মত সাধু শব্দ হইতে পারে না। সম্রাজের স্ত্রী বা স্বয়ং স্ত্রী সম্রাট্ই হউন উভয়কেই সম্রাজ্ বলিতে হইবে, ইচ্ছা করিলে সম্রাজাও বলা যাইতে পারে। তবু সম্রাজ্ঞী কিছুতেই হইতে পারে না।

ইদানীং দেখা যাউক সম্রাজ্ঞী শব্দ অন্য কোনও উপায়ে সাধু বলিয়া রক্ষা করা যায় কিনা। এবং সম্রাজ্ঞী শব্দটী—যাহা বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যাইতেছে—তাহাও ব্যাকরণসম্মত সাধু শব্দ কিনা? অথবা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করা হইবে যে সম্রাজ্ঞী ও সম্রাজ্ঞী উভয়ই বিশুদ্ধ সাধু শব্দ নহে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক সম্রাজ্ঞী শব্দটী অন্য কোনরূপেও ব্যাকরণের নিকটে বসিয়া পরীক্ষা করিলে নিজের বিশুদ্ধি রক্ষা

করিতে পারে কিনা ? কেহ বলেন রাজন্ শব্দের সহিত সম্ পদের প্রাদি সমাস হইতে কোনও আপত্তি নাই এবং রাজন্ শব্দের উত্তর তৎপুরুষ সমাসে টচ্ করিবারও আপত্তি নাই ; তারপর টচ্ প্রত্যয়ান্ত বলিয়া তাহার উত্তর ঙীপ্ করিতেও কোন বাধা নাই ? আমরা বলি বাধা আছে। সম্-পদের পর কিবন্ত রাজ্ শব্দ থাকিলেই মকার মকার থাকিবে, অন্য শব্দ পরে সর্ব্বদাই সেই মকার অনুস্বার হইয়া যাইবে। যথা পাণিনীয় সূত্র :—"মোঽনুস্বারঃ"। পদান্তে মকার থাকিলে হল্‌বর্ণ পরে তাহার স্থানে সর্ব্বদাই (ং) অনুস্বার হয়। ইহার বাধক সূত্র যথা 'মো রাজি সমঃ কৌ' অর্থাৎ কিবন্ত রাজ্-ধাতু পরে থাকিলে সম্ শব্দের মকার স্থানে অনুস্বার হয় না। সম্রাজ্ঞী উক্ত সম্রাজন্ শব্দদ্বারাও হইতে পারে না। রাজন্ শব্দ কিবন্ত রাজ্ ধাতু নিষ্পন্ন নহে, উহা রাজ্-ধাতুর উত্তর উণাদি কণিন্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত হয়; অতএব পূর্ব্ব সূত্র বলে সমস্ত পদটী সংরাজ্ঞী হইয়া দাঁড়ায় সম্রাজ্ঞী হয় না। উক্ত অকারান্ত শব্দ বলিয়া তাহার উত্তর ঙীষ্ প্রত্যয় হওয়াও অসম্ভব।

অতঃপর যাঁহারা আদরের সহিত সম্রাজ্ঞী শব্দকে বিশুদ্ধ সাধু শব্দ বলিয়া প্রচার ও ব্যবহার করিতেছেন তাহাই বা কতদূর যুক্তিসঙ্গত দেখা যাউক। কেহ বলেন রাজন্ শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় করিয়া রাজ্ঞী হইতে কোনও বাধা নাই এবং সেই রাজ্ঞী শব্দের সহিত সম্-পদের প্রাদি সমাস হইতেও যখন কোন আপত্তি নাই, তবে সম্রাজ্ঞী পদ না হইবে কেন ? আমরা বলি তাহাতেও সম্রাজ্ঞী পদ নিষ্পন্ন হয় না। ম স্থানে (ং) অনুস্বার বাধা দিবে কে ?

অন্যেরা বলেন, আচ্ছা রাজন্ শব্দের সহিতই সম্ পদের প্রাদি সমাস হউক এবং "সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ" টচ্ প্রত্যয় না করি; পরে সম্রাজন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ করা যাউক, সম্রাজ্ঞী হইতে বাধা কি থাকিল ? এই স্থলেও একই উত্তর। 'মোঽনুস্বারঃ' সূত্র এড়াইবার জো নাই।

কেহ বলেন রাজ্ ধাতুর সহিত সহিত সম্-পদের গতি সমাস করা যাউক, বাধা কি ? রাজ্ ধাতুর উত্তর ও উপসর্গে এবং অনুপসর্গে উভয়তঃই কিপ্ হইতে পারে ? কিপ্ হইয়া সম্রাজ্ শব্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার উত্তর ঙীপ্ বা ঙীষ্ হওয়ার বিধান নাই।

অন্যেরা বলেন, সম্‌পূর্ব্বক রাজ্ ধাতুর উত্তরই কণিন হউক এবং সম্রাজন্ শব্দ হইলে তাহার উত্তর ঙীপ্ প্রত্যয় করা হউক। কিন্তু সেই স্থলে সংরাজন্ ভিন্ন সম্রাজন্ হওয়ার উপায় নাই। সংস্কৃত ভাষায় সম্রাট্ শব্দের অর্থে সংরাজন্ একটী শব্দও নাই।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল এই যে সম্রাজী কি সম্রাজ্ঞী কোন শব্দই ব্যাকরণসম্মত হইতে পারে না। সম্রাজ্ শব্দের স্ত্রীরূপ সম্রাজ্ই থাকিবে। একান্ত পক্ষে স্ত্রীত্ব লক্ষণ দেখাইতে ইচ্ছা করিলে আপ্ করিয়া সম্রাজাপদ করা যাইতে পারে। অথবা সংরাজন্ বা সংরাজ শব্দ সাধন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে সংরাজ্ঞী ও সংরাজী করা যাইতে পারে।

এখন দেখা যাউক সম্রাজী বা সম্রাজ্ঞী শব্দ উক্ত দ্বিবিধ অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় কোথাও ব্যবহৃত হইয়াছে কি না। আমরা যতদূর জানিয়াছি এরূপ শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় কোথাও দৃষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় না বা শুনাও যায় নাই। দুই এক ব্যক্তি ব্যবহার করিলেই তাহা শব্দ হয় না, লোক ব্যবহার চাই। কালী প্রসন্ন বাবু ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই নিন্দুক শব্দ শব্দত্ব লাভ করিতে পারে না। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়া শব্দের ব্যবহার ও প্রচার করিতে বঙ্গ-সন্তানের সাবধান হওয়া উচিত।

এস্থলে কেহ কেহ সম্রাজ্ঞী শব্দকে বৈদিক মন্ত্রে প্রযুক্ত দেখিয়া তাহার সাধুতা দেখাইতেছেন। "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" "সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব"। কিন্তু বৈদিক শব্দ লৌকিক ভাষায় বিশুদ্ধ বলিয়া স্থান পায় না। বৈদিক মন্ত্রে এমন কত শব্দ প্রয়োগ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার সহিত লৌকিক ব্যাকরণের কোনও মিল নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১। চার-ইয়ারী-কথা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত।

বিলাত ফেরত বাঙ্গালীরা অনেক কাল নিজেদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন, নামের পূর্ব্বে মিষ্টার না লিখিয়া শ্রী লিখিতে লজ্জিত হইতেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় লিখা দূরে থাকুক কথা বলা ও অপমানজনক মনে করিতেন। এখন আর সে দিন বোধ হয় নাই। 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ বাবু তাহার জলন্ত প্রমাণ।

চার জন ইয়ার ক্লাবে তাস খেলিতে খেলিতে রাত্রি দশটা বাজাইয়া ফেলিয়াছেন। হঠাৎ বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে আকাশে ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। সুতরাং আপাততঃ যাওয়া স্থগিত রহিল। কিন্তু কিসে সময় কাটিবে? চারি জনে মিলিয়া নিজেদের ভূতপূর্ব্ব প্রণয় কাহিনী কহিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই এই কথার পত্তন।

চারিজনই বিলাত-ফেরত, সুতরাং প্রণয়ও সবই বিলাতী অর্থাৎ ইংরেজ রমণীর সঙ্গে। একজন তাঁর Eternal Feminine খুঁজিতে খুঁজিতে এক পাগল ইংরেজ রমণীর সঙ্গে হঠাৎ প্রেমে পড়িয়া যান। পর মুহূর্ত্তেই জানিতে পারা গেল যে সে পাগল; 'সেই দিন হইতে চির দিনের জন্য Eternal Feminine কে হারিয়েছি, কিন্তু নিজেকে ফিরে পেয়েছি'। প্রমথ বাবু Eternal Feminine এর বাঙ্গালা করেন নাই; নারীত্বের সনাতন মূর্ত্তি বলিলে অর্থ প্রকাশ হয় কি?

দ্বিতীয় ইয়ার এক ইংরেজ রমণীর সঙ্গে প্রেম করিতে গিয়া কয়েকটী গিনি হারাইয়াই প্রাজ্ঞ হইয়াছিলেন। তৃতীয় ইয়ার একটী ইংরেজ রমণীকে কিছু দিনের জন্য প্রেমের বড়শীতে আটকাইয়াছিলেন কিংবা নিজেই আটকা পড়িয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁর শীকার সূতা ছিঁড়িয়া একটী ইংরেজ পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়। চতুর্থ ইয়ারের সঙ্গে একটী ইংরেজ পরিচারিকা প্রেমে পড়িয়াছিল,—কিন্তু সে এ জগতে থাকিতে তাহা প্রকাশ পায় নাই। 'একটী জর্ম্মাণ গোলার আঘাতে ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে' পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় টেলিফোনে তাহার অপ্রকাশিত প্রেমের দয়িতকে এ সংবাদ সে দিয়া গিয়াছে।

ইয়ারদের এই সব কথা পড়িবার সময় মনে হইতেছিল যেন অ্যানাটোল ফ্রান্সের বঙ্গানুবাদ পড়িতেছি। প্রমথ বাবু ফরাসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত। তাঁহার সেখানে ঋণ কত, জানি না।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গল্প, সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বিলাতী খাদ্যের' মত আমাদের নিকট তত সরস লাগে নাই। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'।

২। মৃগ-নাভি। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ প্রণীত। কয়েকটী ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি বিবিধ মাসিক পত্রিকায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রন্থাকারে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে গ্রন্থের ছাপা, কাগজ প্রভৃতি অতি সুন্দর হইয়াছে। মধ্যে ২ দুই একটী ছাপার ভুল না থাকিলে আরও মনোরম হইত। গল্পগুলি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহাদের মধ্যে নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ মধ্যে বহু রসেরই সমাবেশ রহিয়াছে কিন্তু কোন রসেরই প্রস্তর-তুল্য ঘন-সার দ্বারা পাঠকের হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস নাই। 'কাঁদাইয়া বা হাসাইয়া মারিব' এরূপ পণ করিয়া বসেন নাই বলিয়াই গ্রন্থকারকে আমরা সংস্কৃত সাহিত্যিকদের প্রশান্ত-গম্ভীর ভাবের উত্তরাধিকারী মনে করি। এক কথায় গ্রন্থখানি সম্বন্ধে রায় দিতে হইলে বলিব 'বেশ হইয়াছে'।

৩। ব্রজ-বেণু (গীতি মঙ্গল)। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় প্রণীত। গ্রন্থকার বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত সুকবি। তাঁহার এই কবিতাগুচ্ছ পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ইহার কোন কোন কবিতা 'প্রতিভায়' পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু মানব প্রকৃতিতে নহে বিশ্ব প্রকৃতিতেও যে পুরাতন অথচ চির-নূতন লীলা চলিয়া আসিতেছে, রাধাশ্যামের গোকুল লীলাকে আশ্রয় করিয়া কবি

অতি নিপুণভাবে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন।

৪। **কপাল-কুণ্ডলা-তত্ত্ব।**—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ললিত বাবু কিছু দিন যাবৎ বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন। কপাল-কুণ্ডলা-তত্ত্ব এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক সমালোচনা এখনও খুব উচ্চস্তরে উন্নীত হয় নাই। ললিত বাবুর মত লোক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা। সাধারণতঃ সমালোচনায় দেখি হয় খুবই বাহবাই দেওয়া হয় নতুবা কেবল ধিক্কারের ছড়াছড়ি। মধ্য যুগের ইউরোপের ধর্ম্মোন্মত্ত খ্রীষ্টানদের মত আমাদের দেশে এমন সব সাহিত্যিক আছেন যাঁরা কেবল গালিই পারিতে জানেন কিংবা কেবল নিরবচ্ছিন্ন স্তুতিবাদই করিয়া থাকেন। কিসে যে কোনও কবির সৃষ্টি-বিশেষের দোষ বা গুণ, অন্য কবির সৃষ্টির সঙ্গে তুলনায় কিংবা অন্য প্রকারে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা বিরল। নিন্দাই হউক আর প্রশংসাই হউক, সব কাজেই ধীরভাবে বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হইলে কাজটী সুসম্পন্ন হয়। বস্তু নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল বিশেষণদ্বারা নিন্দা বা প্রশংসা করিতে যাওয়া তরল মতির পরিচায়ক। কিন্তু তথাপি এত কাল এর বেশী আমাদের ভাগ্যে জুটে নাই।

ইউরোপীয় সাহিত্যে সাহিত্যের সমালোচনাও তার একটী প্রধান অঙ্গ। কারণ ইহাতে সাহিত্য বুঝিবার—তাহার দোষ গুণের সম্যক্ বিচার করিয়া স্থায়ী সাহিত্যরস আস্বাদন করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ললিত বাবু ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত। ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং এ দেশীয় প্রাচীনতর সাহিত্যের অনুরূপ সৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়া তিনি কপাল-কুণ্ডলার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

ললিত বাবু প্রথমেই কপাল-কুণ্ডলার দার্শনিক তত্ত্বের কথা তুলিয়াছেন। এবং কপাল-কুণ্ডলা যে একটা 'দার্শনিক প্রশ্নের কাব্যাত্মিকা আলোচনা' তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে বঙ্কিমের পূর্ব্বে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল এবং তাহার একটা উত্তরের চেষ্টাও হইয়াছিল। ললিত বাবু সংক্ষেপে সে গুলির পরিচয় দিয়াছেন। এবং ইউরোপের চেষ্টার সহিত বঙ্কিমের চেষ্টার তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় বা ইউরোপীয় প্রাচীনতর কোন্ কোন্ কবির নিকট বঙ্কিম কতদূর ঋণী তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। এরূপ ধরণের সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই খুব বেশী নাই; যতটুকু জানি, এই বোধ হয় প্রথম। ইংরেজী সাহিত্যে প্রত্যেক প্রসিদ্ধ কবিরই একাধিক সমালোচক আছেন যাঁরা সেই সেই কবির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; বঙ্কিম সম্বন্ধে ললিত বাবুকে সেই পদ গ্রহণ করিতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যয়ন যাঁরা করেন তাঁহাদিগকে পদে পদে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা লইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিমও অধীত হইয়া আসিতেছেন; বঙ্কিমের অধ্যয়নে ললিত বাবু যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার যথোচিত সমাদর হইবে আশা করি।

কিন্তু একটা কথা না বলিয়া এই মন্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হয় ললিত বাবু গ্রন্থখানিকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি এক কপাল-কুণ্ডলার চরিত্রের তত্ত্বই বিবৃত করিয়াছেন, সমগ্র কপাল-কুণ্ডলা বইখানার সমালোচনা করেন নাই। সেইজন্য অন্যান্য চরিত্র একেবারে বাদ পড়িয়াছে।

অবশ্যই ললিত বাবুর ব্যাখ্যার সহিত আমরা সম্পূর্ণ এক মত হইতে পারিয়াছি, এমন নয়। কিন্তু তাহা এখানে বক্তব্য নহে। তিনি যে সমালোচনার নুতন পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে চালাইয়াছেন সে জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করি।

তীর্থ ভ্রমণ।—৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্গীয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতামহ। নগেন্দ্র বাবু বলেন, "সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তীর্থ যাত্রার কালে যাইয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহা অতি সহজ কথায় আত্মতৃপ্তির জন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই বর্ণনায় কেবল তীর্থ মাহাত্ম্য বলিয়া নহে, এখনকার নানা স্থানের সমাজ চিত্র, লোক চরিত্র, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্থান লাভ করিয়াছে।"

নগেন্দ্র বাবু আরও বলেন, "সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে সময়ে গ্রন্থ রচনা করেন, সে সময়ে এ দেশে ভাল গদ্য গ্রন্থ বেশী প্রচলিত হয় নাই, তখনও সাধারণে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের ন্যায় পদ্য গ্রন্থেরই বেশী আদর করিতেন, তৎকালে প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট সুললিত গদ্যে রচিত অল্প গ্রন্থই প্রচারিত ছিল। এ হেন সময়ে সাহিত্যিক হইবার বাসনা শূন্য হৃদয়ে তিনি যেরূপ ভাষার সারল্য, রচনানৈপুণ্য, লিপি-কুশলতা ও মনের ভাব প্রকাশে সফলতা দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা।" নগেন্দ্র বাবুর এই অভিমত আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

গ্রন্থখানা ষাট বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। তখন বাংলা গদ্য আস্তে আস্তে গঠিত হইয়া উঠিতে ছিল। ভাষার ভাষাতত্ত্বান্বেষীরা ইহাতে অনেক উপাদান পাইবেন। সাধারণতঃ আমরা যেখানে বলিব 'করিলাম' বা 'গেলাম' সেখানে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন, 'করা হইল' বা 'যাওয়া হইল'। কর্ত্তৃবাচ্যের বদলে এইরূপ ভাববাচ্য কর্ম্মবাচ্য বা কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্যের প্রাধান্য অনেকটা সংস্কৃতের গন্ধবহ। এখন ও সংস্কৃতের অধ্যাপকদের মধ্যে শিষ্ট কথোপকথনে এরূপ প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়। যেন, কাজটা সম্পন্ন হইয়াছে বলিলেই যথেষ্ট হয়, 'আমি করিয়াছি' বলিয়া নিজেকে প্রাধান্য দেওয়া এবং কর্ত্তা মনে করা অনাবশ্যক। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আমরা দুই একটী উদাহরণ দিতেছি।—

"প্রাতে আগরার কেল্লার ঘাট হইতে বজরা খুলিয়া পাঁচ ক্রোশ আসিয়া এক চড়াতে লাগান করিয়া আহার হয়।" ।

"ঐ গ্রামের আড় পারের চড়াতে রাত্রে অবস্থিতি।" 'সন্ধ্যাতে গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া গমন করা হইল।'— ইত্যাদি।

গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। নগেন্দ্র বাবু যথেষ্ট খাটিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রগাঢ় পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয় অনেক অনাবশ্যক গবেষণা ইহাতে স্থান পাইয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থখানার মুখবন্ধ পুনরুক্তি দোষেও দুষ্ট। গ্রন্থকারের পরিচয় কিছু অনাবশ্যক রকমে দীর্ঘ হইয়াছে। পাদটীকায় যে সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মূল গ্রন্থ বুঝিবার জন্য তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। আলোচ্য গ্রন্থ হইতে আমরা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

মূল গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় আছে: 'গোকুল দর্শন করিয়া যমুনা পার হইয়া ২ ক্রোশ আসিয়া মথুরায় পহুছান হইল'। এইখানে পাদটীকায় মথুরা সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক গবেষণা রহিয়াছে। রামায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া টলেমি, আরিয়ান, প্লিনি প্রভৃতির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এসমস্তে নিশ্চয়ই নগেন্দ্র বাবুর প্রভূত অধ্যয়নের পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু এখানে তাহা প্রদর্শনের উপযোগিতা আমরা বুঝিতে পারি নাই। তথাপি এই লুপ্তপ্রায় রত্নটী উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমরা সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু ও কলিকাতার সাহিত্য পরিষৎকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দুই একটী ছাপার ভুল রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইত।

শ্রী—



প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ　　পৌষ ১৩২৩　　৯ম সংখ্যা

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী। *

জয় জয় মাতঃ বীণাপাণি
জয় জয় শ্বেত-শতদলবাসিনী।
এস মা হৃদয়ে করুণানিলয়ে
শত-শশধর-কিরণ-মালিনী।
উজলিয়ে হৃদি রহ নিরবধি,
উঠুক উথলি আনন্দ বারিধি,
ঝঙ্কারি বীণে উঠাও তানে,
সুর-নর-উল্লাস-কারিণী।
দিকে দিকে বহুক সঙ্গীত ধারা,
অম্বরে নাচিবে চন্দ্রমা, তারা,
গাহিবে গম্ভীরে শ্যামলা ধরা—
সরিৎ-সাগর-কণ্ঠ-শালিনী;
এ ক্ষীণ কণ্ঠ গাবে তারি সনে,
ললিত রাগিনী দাও তার তানে,
তোমার প্রসাদ যাচে তাই আজি
ওগো মা বরদে রাগ-মালা-রূপিনী।

শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

* এই গানটি সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক গীত হইয়াছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রসায়ন চর্চ্চা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩) জৈব রসায়ন

(Organic Chemistry)

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগৎ হইতে প্রাপ্ত যৌগিক পদার্থ সমূহ জৈব পদার্থ নামে পরিচিত। কার্ব্বন (Carbon) এই সকল পদার্থের স্থায়ী উপাদান; কাজেই জৈব-রসায়ন বলিতে কার্ব্বন ঘটিত পদার্থের রসায়ন বুঝায়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জৈব-রসায়নের যথাবিহিত ও ধারাবাহিক চর্চ্চা চলিতেছে। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই উন্নতিচিকীর্ষু পাশ্চাত্য মনীষী-গণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে জৈব রসায়ন অপ্রত্যাশিত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছে। বৈষয়িক চিন্তাশূন্য ধ্যানমগ্ন তাপসের ন্যায় সহস্র সহস্র জ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিত জৈব রসায়নের উন্নতিই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কঠোর ও ঐকান্তিক সাধনাদ্বারা বাণীর মন্দিরকে যে সকল রত্নাভরণে ভূষিত করিয়াছেন তাহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। জৈব রসায়ন এই ৫০।৬০ বৎসরে কি করিয়াছে তাহা বলিতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে,

বরং কি না করিয়াছে তাহাই সহজে বলা যায়। এক কথায় বলিতে হইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সকল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জৈব রসায়ন তাহাদের মধ্যে অন্যতম; জৈব পদার্থ সমূহকে বসায়িক ও চাক্রিক এই দুই বৃহৎ অংশে বিভক্ত করা হয়। বসায়িক বা মুক্তশৃঙ্খল-পদার্থশ্রেণী (Open-chain compound) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চর্ব্বি বা বসার সহিত সম্বন্ধবদ্ধ ও ইহাদের কার্ব্বন পরমাণু সমূহ মুক্তশৃঙ্খলাবদ্ধ। সঘ্রাণ বা চাক্রিক পদার্থের প্রত্যেকটীতেই অল্পাধিক মদগন্ধ লক্ষিত হয় এবং ইহাদের অণুমধ্যস্থ কার্ব্বন পরমাণুসমূহ চক্রাকারে আবদ্ধ। আলোচনার সুবিধার জন্য সাধারণতঃ চাক্রিক পদার্থসমূহকে পুনরায় সদৃশচাক্রিক (Homo-Cyclic) ও বিষমচাক্রিক (Hetero-Cyclic) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যাহাদের চক্র কেবল কার্ব্বন পরমাণুদ্বারা ঘটিত তাহাদিগকে সদৃশ-চাক্রিক এবং যাহাদের চক্রে এক বা একাধিক কার্ব্বন পরমাণুর পরিবর্ত্তে নাইট্রোজেন প্রমুখ অন্য কোন পদার্থাণু বিদ্যমান তাহাদিগকে বিষমচাক্রিক-পদার্থ বলা হইয়া থাকে। জৈব রসায়ন ইহার অনন্ত শাখা প্রশাখা লইয়া এত উন্নতি করিয়াছে যে বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে সাধারণতঃ পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হয়। গত বৎসরের জৈব-রসায়ন চর্চ্চার বর্ণনাকালেও এই প্রণালীই অবলম্বন করা হইয়াছে।

বসায়িক অংশ
(Alliphatic division)

বর্ত্তমান সময়ে যে চারিদিকে নানারূপ উচ্চ দরের গবেষণা চলিতেছে তাহার অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও গত বর্ষে বসায়িক পদার্থের রসায়ন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে গেলে মৌলিকতা হিসাবে তাহাদের অধিকাংশেরই কোন প্রকৃত মূল্য নাই বলিতে হয়। যে পরিমাণ গর্জ্জন হইয়াছে তদনুযায়ী বর্ষণ মোটেই হয় নাই। এরূপ হওয়ার প্রধান কারণ এই যে অনেক কৃতবিদ্য কর্ম্মীই নিজেদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ প্রকাশ করিতেছেন না। অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে জৈব-রসায়ন বিভাগে পরীক্ষা-মূলক গবেষণা করিতে হইলে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সংগ্রহ করা অসম্ভব। কাজেই অনেক কর্ম্মীকে বাধ্য হইয়া তাহাদের নিজস্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় এই অংশের গবেষণা সমূহের বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ বিবরণের ন্যায় উপভোগ্য ও প্রীতিকর না হওয়াই স্বাভাবিক। নিম্নে অপেক্ষাকৃত সন্তোষপ্রদ অনুসন্ধান সমূহের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা গেল।

হাইড্রোকার্ব্বন শ্রেণী
(Hydro-Carbons)

শুধু কার্ব্বন্ ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন পদার্থসমূহ হাইড্রোকার্ব্বন্ নামে পরিচিত। কেরোসীন প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যে সকল জিনিসের ব্যবহার সার্ব্বত্রিক সাধারণতঃ দেখা যায় বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের বিস্তৃত রাসায়নিক পরীক্ষায় শক্তি নিহিত না করিয়া কি উপায়ে অল্পব্যয়ে ও অধিকতর পরিমাণে উহারা উৎপন্ন হইতে পারে অর্থাৎ কি কি পন্থাবলম্বনে অর্থাগমের সুবিধা হওয়া সম্ভব, তাহা নির্দ্ধারণ ব্যাপারেই সমধিক সচেষ্ট হন। হাইড্রোকার্ব্বন্ শ্রেণী সম্বন্ধেও এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। অবশ্য আলোচ্য বর্ষে দুই একটি সারবান্ তত্ত্ব যে আবিষ্কৃত না হইয়াছে এমত নহে। খনিজতৈল তত্ত্ববিশারদ কিস্‌নার (Kishner) ভূগর্ভনিম্নস্থ দাহ্যতৈল সমূহের উৎপত্তি বিষয়ক পুরাতন অনির্দ্ধারিত প্রসঙ্গের পুনরাবতরণ করতঃ খনিজ তৈলের জৈব-উৎপত্তিবাদ খণ্ডন করিয়া জড়োৎপত্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, মৃত্তিকানিম্নস্থ খনিজ তৈল সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। সহজে বা শীঘ্র যে এই জটিল রহস্যের মীমাংসা হইবে এরূপ কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

অবিচলিত কর্ম্মী হ্যারিস্ (Harries) পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও কুচুক (coutchouc) সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক বহু নূতন তত্ত্ব সম্বলিত এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাকৃতিক কুচুকের একটি নূতন রাসায়নিক সূত্রের আভাস প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে এ পর্য্যন্ত কুচুকের বহু রাসায়নিক সূত্র প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু চরমে কোনটিই টিকে নাই। কাজেই আমরা এই বিষয়ে প্রায় প্রতিবৎসরই মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছি। ব্যবসায়িক হিসাবে বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ কুচুকের রাসায়নিক প্রকৃতি নিরূপণের উপরেই কৃত্রিম উপায়ে রবার (rubber) প্রস্তুতের সম্ভাব্যতা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। কাজেই এই বিশাল যশের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আশামুগ্ধ রাসায়নিকগণ অসাধারণ কার্য্যতৎপরতা সহকারে কিরূপ উঠিয়া পড়িয়া প্রতিযোগিতা করিতেছেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এ পর্য্যন্ত রবার সংশ্লেষণ সম্বন্ধে সাত শতেরও অধিক প্রণালীর সত্ব সংরক্ষিত (Patent) হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই প্রকৃত সিদ্ধকাম হন নাই। কৃত্রিম উপায়ে রবার সংশ্লেষিত হইলে উহা যুগান্তকর রাসায়নিক-আবিষ্কার সমূহের তালিকায় স্থান পাইবে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত Isoperene অণুর বহু মিশ্রণে (Polymerisation) কি কি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা সঠিকরূপে স্থিরীকৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যে কুচুকের পরমাণু সন্নিবেশ সম্বন্ধে কোন অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে এরূপ মনে হয় না।

বিগত ৩।৪ বৎসরে এসিটাইলিন্ (Acetyline) ঘটিত পরীক্ষায় আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। ধারাবাহিক অনুসন্ধানের ফলে গত বর্ষেও বহু সারবান্ ও উপাদেয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহারা যেন একটা বিস্তৃত ভবিষ্যৎ ব্যবসা ক্ষেত্রের দ্বার অনর্গল করিয়া কার্য্যান্বেষী কর্ম্মীদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছে। Acetyline দ্বারা, বিশেষতঃ বিভিন্ন সহায়ক পদার্থের (Catalytic Agent) সান্নিধ্যে যে সকল বিশ্লেষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়াও একরূপ অসম্ভব। শ্চিশ্চিবাবিন্ (Tschitschibabin) নামক রুষীয় পণ্ডিত এসিটাইলিনের ক্রিয়াসমষ্টির মূলতত্ত্ব-প্রকটক যে উদাহরণ রাশি সংকলন করিয়াছেন এস্থলে তাহা হইতে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করা গেল। এসিটাইলিন্ (১) অবস্থা পর্য্যায়ে Ammoniaর সহিত ক্রিয়া করিয়া Pyridine মূলক পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে; (২) ঐরূপে Sulphuretted Hydrogen এর সহিত মিলিত হইয়া Thiophene উৎপাদন করিয়া থাকে; (৩) Alumina সান্নিধ্যে ৪০° ডিঃ উষ্ণতায় বেন্‌জিন্ প্রমুখ হাইড্রোকার্ব্বনে এবং বায়ুর অপ্রতিহত গতি থাকিলে অল্লাধিক পরিমাণে Phenolএও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। মেয়ার (Meyer) ও ফ্রিকি (Fricke) আল্‌কাতরাস্থিত হাইড্রোকার্ব্বন্-শ্রেণীর পদার্থ সমূহের এসিটাইলিন্ হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত প্রস্তাব করিয়াছেন পূর্ব্বলিখিত পরীক্ষামূলক প্রমাণাবলী দ্বারা তাহা নূতনভাবে সমর্থিত হইতেছে। রাসায়নিক শিল্পে ইতিপূর্ব্বেই এসিটাইলিন্ হইতে Acetatedhyde এবং পরিশেষে Acetic অম্ল প্রস্তুতের প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে যে এসিটাইলিন্ হইতে আরও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়ে প্রচলিত হইবে এরূপ আশা করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

এল্‌কহল্ শ্রেণী
(Alcohols)

হাইড্রোকার্ব্বনের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন্ পরমাণুর পরিবর্ত্তে Hydroxy সংহতি (Group) সন্নিবেশিত করিলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাদের সাধারণ নাম Alcohol। যদিও বসায়িক এল্‌কহল্ সম্পর্কে বহু গবেষণা চলিতেছে, বিগত বৎসরের রাসায়নিক সাহিত্য খুঁজিলে তাহাদের ফল সম্বন্ধে বড় কিছু জানা যায় না। এল্‌কহলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবদ্ধ এল্‌ডিহাইড (Aldehyde) ও কিটোন (Ketone) সমূহের বেলায় পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য আরও অধিক

প্রযুজ্য। কাজেই এই অধ্যায়ে কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়ার কথা ব্যতিরেকে আলোচনা করার কিছুই নাই।

ভল (Wohl) অনুযায়ী Acetal হইতে এল্‌ডিহাইড্‌ সংশ্লেষণ-প্রণালীর বিস্তারণীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, এই সকল এল্‌ডিহাইডের কতিপয় সংখ্যক অণু সহজেই একত্র সম্মিলিত হইয়া নূতন জটিলতর অণুর সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই তথ্যটি অতি মূল্যবান্, কারণ ইহা হইতে মনে হয় যে, স্মিড্‌ট্ (Schmidt) প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসরণে কর্ম্মক্ষম Fructose ও Sorbose সংশ্লেষণ সম্ভবপর হইতে পারে।

গ্লিসিরিন্ হইতে Ester প্রস্তুত করা অত্যন্ত দুরূহ। আলোচ্যবর্ষে এই সম্পর্কে যে সকল গবেষণা হইয়াছে নিম্নে তাহার দুই একটির পরিচয় দেওয়া গেল। Triacetin প্রস্তুত ব্যাপারে বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক-কর্ম্মক্ষমতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এমিল্ ফিসার (Emil Fischer) বহু-হাইড্রক্সিযুক্ত এল্‌কহল্ (Poly-Hydroxy alcohol) অণুর ইচ্ছানুরূপ যে কোনও অংশ পরীক্ষা করার অতি সুন্দর অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন St. Andrews বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক আর্ভিন্ (Irvine) ও কুমারী ষ্টিল্ (Steele) প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক উভয়বিধ উপায়ে Mannitol এর ধর্ম্ম ও ক্রিয়াবলীর সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে গতপূর্ব্ববৎসর এই পদার্থটির পরমাণু সন্নিবেশপ্রদর্শক যে নূতন সূত্র প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহাই সমর্থিত হইতেছে। কিন্তু ক্রমেই যেন এই জটিল প্রসঙ্গটি জটিলতর ভাব ধারণ করিতেছে।

সর্করা শ্রেণী (Sugars)

মৌলিক সর্করা সমূহ উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে প্রাপ্ত, সাধারণতঃ ছয়টি কার্ব্বন্ পরমাণুযুক্ত; এলকহল্ ও এল্ডিহাইড বা কিটোন্ ধর্ম্মবিশিষ্ট, মিষ্টস্বাদ, দানাদার পদার্থ। সর্করা সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার আবিষ্কারের সঙ্গেই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ধাণীর বরপুত্র রাসায়নিক-কুলচূড়ামণি এমিল ফিসারের (Emil Fischer) নাম ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। এই অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা একনিষ্ঠ বিজ্ঞানসেবাব্রতীর ঐকান্তিক সাধনার ফলে সর্করা-রসায়ন-রহস্যের অগণিত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; ইহারই প্রতিভানিপুণ-করস্পর্শে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অসংখ্য প্রকারের সর্করা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে; ইঁহারই অলৌকিক উদ্ভাবনীশক্তি ও অসাধারণ মনীষাবলে আজ সাংশ্লেষিক রসায়নে নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এই অশীতিপর বৃদ্ধ, জ্ঞানভিক্ষু, পণ্ডিত তৃতীয় প্রকার Methyl Glucoside তৈয়ার করেন। ইতিপূর্ব্বে দুই প্রকার Methyl Glucoside এর কথাই রাসায়নিকগণের জানা ছিল। Glucose বা দ্রাক্ষা সর্করার সর্ব্ববাদীসম্মত পরমাণু-সন্নিবেশ-সূত্রানুসারে এই নবাবিষ্কৃত তৃতীয় Methyl Glucosideএর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই Glucose বা দ্রাক্ষা-সর্করার পরমাণু সন্নিবেশ-সূত্র (Constitutional formula) এ পর্য্যন্ত যে ভাবে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দ্রাক্ষা-সর্করাস্থিত কর্ম্মক্ষম অক্সিজেন্ পরমাণুটি যে, ছয়টি কার্ব্বন পরমাণুর যে কোন একটির সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিতে পারে এত দিনে সে বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন হইল। আর্ভিন স্বাধীনভাবে বহু পরীক্ষা করিয়া ফিসারের আবিষ্কার সমর্থন করিয়াছেন।

কিছুদিন যাবৎ সর্করা অণুস্থিত Hydroxyl সংহতি সমূহের যে কোন অংশের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সংহতির সমাবেশ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি আর্ভিন ও মেকডোনেল Glucose-mono-acetone এবং ফিসার Dibenzoyl—Dulcitol ও Tetra benzoyl-mannitol প্রস্তুতে কৃতকার্য্য হইয়া উপরি-বর্ণিতরূপ ক্রিয়ার শক্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এ সকল স্থলে অবশিষ্ট Hydroxyl সংহতি সমূহের কার্য্যকরী ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। বলা বাহুল্য যে, এই শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ ভবিষ্যতে নূতন সর্করা সংশ্লেষণের জন্য প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

হড্‌সন (Hudson) তৃতীয় প্রকার Golactose—pentacetate আবিষ্কার করিয়া Glucoseএর স্থায় Galoctose এরও তৃতীয় রূপের অস্তিত্বের পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। ভিয়ারম্যান (Weerman) কর্ত্তৃক সর্করা বিশেষকে অপেক্ষাকৃত কম আণবিক গুরুত্ব বিশিষ্ট নিম্নতর স্তরের সর্করায় পরিভাবিত (Degraded) করার একটা নূতন অথচ সহজ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। গত বর্ষে যাহারা সর্করার নানারূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এ স্থলে এডিনবরা (Edinburgh) প্রত্যাগত ডাক্তার সুধাময় ঘোষের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দ্রাক্ষা-সার্করিক পদার্থ শ্রেণী
(Glucosides)

কথনও কথনও উদ্ভিদ্‌ রাজ্যে জৈব অম্লের সহিত সম্মিলিত অবস্থায় দ্রাক্ষা-সর্করা পাওয়া যায়। এই সকল যৌগিক পদার্থকে Glucoside বলা হয়। রাসায়নিক হিসাবে ইহারা অত্যন্ত দুরুহ বস্তু। বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে ফিসার প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় অসংখ্য দ্রাক্ষা-সার্করিক পদার্থ (Glucoside) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং উদ্ভিদ্‌ দেহে এই শ্রেণীর পদার্থের সংগঠন, বিভাজন ও ইহাদের পরমাণু সন্নিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কৌতূহলপ্রদ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত বর্ষে এ ক্ষেত্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কয়েকটা Glucoside সংশ্লেষণ ব্যতিরেকে নূতন কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কয়েক বৎসর অসাধারণ কার্য্যতৎপরতা ও সফলতার পর আলোচ্য বর্ষে হঠাৎ যেন অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে। রাসায়নিক সাহিত্যে এই বিভাগে পরীক্ষকগণের নিষ্ফল প্রয়াস ও অনুশীলন প্রণালীর কাঠিন্যের বিস্তৃত বিবরণযুক্ত বিষাদময় কোলাহলে পরিপূর্ণ।

দ্বি-সার্করিক ও বহু-সার্করিক পদার্থশ্রেণী
(Di-saccharids and poly-saccharids)

দুই বা ততোধিক মৌলিক সর্করা অণুর সম্মিলন-জাত জটিল পদার্থ নিচয় যথাক্রমে দ্বি-সার্করিক ও বহু-সার্করিক পদার্থ বলিয়া পরিচিত। ইক্ষু-সর্করা দ্বি-সার্করিক পদার্থের অন্যতম উদাহরণ। উদ্ভিদ কোষের প্রধান উপাদান সেলুলোজ (cellulose) ও ধান্য গোধূমাদির শ্রেষ্ঠ উপকরণ শ্বেতসার (Starch) শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। গত বর্ষে এই দুই শ্রেণীর পদার্থ প্রসঙ্গে যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগই পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরালোচনা বা বিস্তৃত আলোচনা মাত্র এবং কোনরূপ মৌলিকতার দাবী করিতে পারে না।

Maltose ও Lactose এর যোগজ-পদার্থ (Derivative) সমূহের অধিকাংশেরই গলন-তাপাঙ্ক (Melting point) বা আপেক্ষিক ঘূর্ণনাঙ্ক (Specific Rotation value) নির্দ্দিষ্ট নাই; কাজেই এই সর্করাদ্বয় সনাক্ত করিতে হইলে উহাদের যৌগিক Osazone প্রস্তুত করিয়া তাহার গলনাঙ্ক গ্রহণ করাই একমাত্র সহজ উপায়। সম্প্রতি হড্‌সন্‌ ও জন্‌সন্‌ (Johnson)এই সর্করাদ্বয়ের যোগজ Octa-acetate এর পূর্ব্বোক্ত সংখ্যাদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে বেনজিনে দ্রব করিয়া সর্করা সমূহের আপেক্ষিক ঘূর্ণনাঙ্ক নির্দ্ধারণ করা সুবিধাজনক নহে। Celluloseএর মধ্যে দুইটি Glucose অণু যে ভাবে সংমিলিত, Lactose অণুর মধ্যেও যে একটি Glucose অণু ও একটি Galactose অণু ঠিক সেই ভাবে সম্মিলিত, তাহার কয়েকটা অকাট্য প্রমাণ সমাহৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণ পুনরায় যদি কখন সেলুলোজের (Cellulose) রাসায়নিক প্রকৃতি নির্দ্ধারণের প্রতি মনোনিবেশ করেন, উপরি বর্ণিত তথ্য তখন তাহাদের অনেকটা সাহায্য করিবে।

প্রিংস্যাম্‌ (Pringsheim) দেখাইয়াছেন যে, আলুজাত শ্বেতসারকে যেরূপ কিণ্ব (Enzyme) বিশেষের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট সর্করাতে অপকর্ষিত (Degraded) করা যায়, ধান্য জাত শ্বেতসারকেও তদনুরূপ অবনত করা যাইতে পারে। এই নবাবিষ্কৃত সত্য হইতে শ্বেতসার অণুর পরমাণু সন্নিবেশ সম্বন্ধে একটা নূতন আলোক পাওয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইলেও বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং শ্বেতসার মধ্যস্থ Phosphoric

অগ্রের পরিমাণ একরূপ নগণ্য হওয়া সত্বেও উহা যে বহিরাগত বা আগন্তুক ভাবে অবস্থিত নহে পক্ষান্তরে নির্দ্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থরূপে বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে প্রতিবৎসরই সংগৃহীত প্রমাণ-স্তূপ সমস্যাটিকে জটিলতর করিয়া তুলিতেছে।

আলোক-কর্ম্মক্ষমতা
(Optical activity)

কোন কোন জৈবপদার্থ ধ্রুবতাপন্ন আলোকরশ্মির (Polarised light rays) গতিকে সরল পথ হইতে দক্ষিণে বা বামে ঘুরাইয়া দিতে পারে। পদার্থবিশেষের এই ধর্ম্মকে আলোক-কর্ম্মক্ষমতা বলা হয়। প্রতি বৎসরই আলোক-কর্ম্মক্ষম নূতন পদার্থের সংশ্লেষণ বা উদ্ভিদ্ রাজ্য হইতে সংগ্রহের কথা আমাদের গোচর হইতেছে। ১৯১৫ সনে এ বিষয়ে যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে এস্থলে সংক্ষেপে তাহাদের কএকটির বিবরণ মাত্র দেওয়া গেল। এব্‌ডার্‌হেল্‌ডন্ (Abderhalden) d-epidibromohydrin এর পরমাণু সন্নিবেশ চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ডান্‌ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত রসায়নাধ্যাপক মেকেঞ্জি (Mackenzie) পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন যে আভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থাহেতু নিষ্ক্রিয় (Inactive due to internal Compensation) যৌগিক পদার্থকে আলোক-কর্ম্মক্ষম দ্রাবক (Optically active Solvent) হইতে স্ফটিকীভূত (Crystallised) করিয়া উহাকে কর্ম্মক্ষম অংশদ্বয়ে বিভক্ত করা যায়। এই পন্থাবলম্বনে যে অচিরেই বহু আলোক-কর্ম্মক্ষম পদার্থ সংশ্লেষিত হইবে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। Benzaldehyde কে আলোক-কর্ম্মক্ষম করা যায় বলিয়া আর্‌লেন্‌মেয়ার (Erlenmeyer) যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ভেডিকাইণ্ড (Wedekind) পরীক্ষামূলক ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাবলি সাহায্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই বিভাগে কর্ম্মিদের মধ্যে যাঁহারা গত বৎসর যশ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মেকেঞ্জির সহকারী কুমারী ওয়াকার (Miss Walker) ও কুমারী উইডোস্ (Miss Widdows) এর নামও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ নিচয়
(Nitrogen Compounds)

গত বর্ষে নুড্‌সেন (Knudsen) অতি সহজ উপায়ে Methylene-diamine dihydrochloride তৈয়ার করিয়াছেন। নিবিড়তা-পাদন (Condensation) ক্রিয়ার সাধিকরূপে Amino শ্রেণীর সাধাসিধা রকমের পদার্থের ব্যবহার উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে নুড্‌সেন-আবিষ্কৃত প্রণালীর গুরুত্ব শীঘ্রই উপলব্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়।

Aldehyde-Ammonia র ডেল্‌ফিন (Delphine) প্রদত্ত যে সূত্র এ যাবৎ গৃহীত হইয়া আসিতেছিল গত বৎসর উহার প্রতিকূলে যে সকল সূক্ষ্মপরীক্ষা-মূলক প্রমাণাবলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগকে পুরাতন মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিতেছে।

ডাবলিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ই, এ, ভারনার (E. A. Werner) কএকটি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের বলে কার্ব্বেমাইড (Carbamid) এর উন্মুক্তশৃঙ্খল সূত্র সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় গ্রাহ্য নহে এবং অবস্থাভেদে চাক্রিক সূত্রই অধিকতর উপযোগী বলিয়া উহার চাক্রিক গঠনের পক্ষে মত দিয়াছেন। এরূপ কল্পনার সাহায্যে সাইনেমাইডের (Cynamid) কতকগুলা কুহেলীময় প্রক্রিয়ার সুচারু ব্যাখ্যা করা যায়।

Amino সংহতি বিশিষ্ট আলোক-কর্ম্মক্ষম জৈব অম্লঘটিত পদার্থের পরীক্ষা ও সংশ্লেষণ ব্যাপারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও কতিপয় বিচক্ষণ কর্ম্মি ব্রতী ছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অশীতিপর বৃদ্ধ, জ্ঞানভিক্ষু, পণ্ডিত এমিল ফিসারের নাম শীর্ষস্থানীয়।

সদৃশচাক্রিক অংশ
(Homocyclic Division.)

গত বৎসর সদৃশচাক্রিক-পদার্থ রসায়ন সংক্রান্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি মৌলিকতায় ও সারবত্তায়

পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ প্রবন্ধ সমূহের সহিত তুলনায় কোন অংশে হীন নহে। অসংখ্য সাময়িক বাধাবিঘ্নের মধ্যেও বহু মূল্যবান্ গবেষণা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভূমিকায় কালক্ষেপ না করিয়া প্রসঙ্গ ভেদে নিম্নে বিগত বৎসরের উল্লেখযোগ্য গবেষণা সমূহের বিষয় যথা সম্ভব আলোচনা করা গেল।

সাধারণ প্রক্রিয়াবলি

(General Reactions)

যদিও কল্পনায় Toluene হইতে ৬টি Tri-nitro-Toluene এর উৎপত্তি সম্ভবপর, কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত উহাদের ৩টি মাত্র আমাদের জানা ছিল। আলোচ্য বর্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাকী ৩টি Tri-nitro-Toluene প্রস্তুত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার সংহতি-জড়িত বেন্জিন্ অণুতে Nitro সংহতি প্রবেশের নির্দ্দেশ বিষয়ে ঐ সকল সংহতির তুলনামূলক প্রভাব ও বিভিন্ন সংহতি জড়িত Nitro-Benzene হইতে উহাদের অপনয়নকালে "নাইট্রো" সংহতির প্রভাব সম্বন্ধে যে কয়েক খানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকখানাই গভীর পাণ্ডিত্য-পরিপূর্ণ।

যদিও কৃত্রিম রং প্রস্তুতের জন্য Naphthalene-Sulphonic অম্লসমূহ নিত্য প্রয়োজনীয়, তথাপি উহাদের কর্ম্মাদির প্রকাশিত বিবরণ একদিকে যেমন অসম্পূর্ণ অপর দিকে ঠিক তদনুরূপ অবিশ্বাস্য। সম্প্রতি Naphthalene-B-Sulphonic অম্লের প্রস্তুত প্রণালী ও ধর্ম্মসম্বন্ধে একখানা সারবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিপিং (Kipping), ওরটন্ (Orton), রুহিম্যান্ (Ruheman), হিউইট্ (Hewitt), মেলডলা (Meldola) ও থর্পের (Thorpe) সহকারী কুমারী হার্ষ্ট (Hurst) প্রমুখ কতিপয় সিদ্ধহস্ত রাসায়নিক সদৃশচাক্রিক পদার্থে ক্লোরিন্ পরমাণু প্রবেশ সময়ে পূর্ব্ববিদ্যমান অন্যান্য সংহতির প্রভাব পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে Amino সংহতির প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাহার পর যথাক্রমে Hydroxyl, Alkyloxyl ও Acetyl-amino সংহতির স্থান। Polyhydric-alcohol সমূহের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সীমা অতি সংকীর্ণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হেরিস্ (Harries) বায়ুদ্বারা পাইরগেলল্ (Pyrogallol)এর দহন পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আলোচ্যবর্ষে পাইরগেলল্, অর্সিনল্ (Orcinol) রেসর্সিনল (Resorcinol) প্রভৃতি কতিপয় পদার্থের দহন প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থলেই জটিলতর রাসায়নিক পদার্থের উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া-গিয়াছে। ইহা ছাড়া Phenolic ketone সংশ্লেষণের নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং Friedal-craft ও Grignord প্রক্রিয়া প্রয়োগে বহু সূক্ষ্ম পরীক্ষা হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত দুইস্থলে চেষ্টানুরূপ তথ্য আবিষ্কৃত বা নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বিবিধ।

১৯১১ সনে ফ্রাই (Fry) বেন্জিনের তাড়িতাণুক সূত্র (Electronic formula) প্রস্তাব করেন এবং এই সূত্রের সাহায্যে বেনজিনের ক্রিয়া সমূহের ব্যাখ্যা করতঃ এই কয় বৎসর যাবত স্বকীয় মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আলোচ্যবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পক্ষান্তরে এইমতের বিরুদ্ধবাদী হোল্ম্যান (Holleman) ও ব্রুনেল (Brunel) ফ্রাইয়ের মত উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টায় আছেন। এই পক্ষের মতে (১) ফ্রাইয়ের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে সকল প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার কোনটিই চূড়ান্ত নহে; (২) ফ্রাইয়ের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে হইলে এমন কয়েকটী কল্পনার সাহায্য লইতে হয় যাহা কোনও পরীক্ষামূলক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় না; (৩) এই তাড়িতাণুক সূত্র কোন রাসায়নিক নিয়ম প্রতিপালন করে না; এবং (৪) এই পর্য্যন্ত তাড়িতাণুক বহুরূপতার কোন দৃষ্টান্ত প্রকৃত পক্ষে পাওয়া যায় নাই। উভয় পক্ষের বাদপ্রতিবাদে যে মহা তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার আলোচনার চেষ্টা বৃথা; যাঁহারা এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে উৎসুক তাঁহাদিগকে আসল প্রবন্ধরাজী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বলা বাহুল্য বেন্জিন্ চাক্রিক পদার্থের মূলীভূত এবং এ পর্য্যন্ত কেকিউল

(Kekule) বেম্বার্জার (Bamberger) লেণ্ডল্ট (Landolt) প্রমুখ জৈব রসায়নের বিধাতৃ-পুরুষগণ বেন্‌জিনের ভিন্ন ভিন্ন সূত্র কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন। এমত অবস্থায় ক্রাইয়ের সূত্রের পক্ষে যত প্রমাণই কেন উপস্থাপিত হউক না, উহাকে হঠাৎ গ্রহণ করিতে গেলে অবিবেচকতার প্রমাণ দেওয়া হইবে।

গতপূর্ব্ব কয়েক বৎসরের ন্যায় ১৯১৫ সনেও রাসায়নিক নিবিড়তাপাদন (Chemical condensation) ও গত্যাত্মক আণবিক-রূপতা (Dynamic Isomerism) সম্বন্ধে পরীক্ষা পুরা দমে চলিয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রসঙ্গই এত দুরূহ ও দুর্ব্বোধ যে সহজ ভাষায় বা ২।৪ কথায় ঐ সকল গবেষণার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। এরূপ স্থলে শুধু এক রাশি শ্রুতিকটু বিদ্‌ঘুট্‌ নাম আওড়াইয়া কোন ফল নাই।

আভ্যন্তরীণ বিন্যাস-মূলক রূপতা

(StereoIsomerism)

প্রসঙ্গান্তরে পূর্ব্বে মৌলিক পদার্থের বহুরূপতার উল্লেখ করা গিয়াছে। জৈব রসায়ন শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক সময় একাধিক যৌগিক পদার্থ ঠিক একই পরিমাণ এবং একই মৌলিক উপাদানে গঠিত হইতে পারে। এই ধর্ম্মকে আণবিক বহুরূপতা (Isomerism) বলা হয়। বিভিন্ন ধারায় পরমাণু সন্নিবেশ হেতুই সাধারণতঃ আণবিক বহু-রূপতার উৎপত্তি। অন্যান্য কারণেও আণবিক বহুরূপতা ঘটিতে পারে। যে সকল পদার্থের কোন একটী কার্ব্বন্ পরমাণু ৪টি বিভিন্নধর্ম্মা পরমাণু বা সংহতির সহিত জড়িত সেরূপ স্থলে ঐ কার্ব্বন্ পরমাণুর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন-ধর্ম্মা পরমাণু বা সংহতি- সমূহ দুই প্রকারে সন্নিবেশিত হইতে পারে। কাজেই এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর বহুরূপতা দৃষ্ট হয়। একটা মোটামোটি ধারণা দেওয়ার জন্য পূর্ব্ববর্ণিতরূপ বহুরূপতাকে "আণবিক আভ্যন্তরীণ বিন্যাস মূলক বহুরূপতা" (Stereo-Isomerism) বলা গেল। এই শ্রেণীর পদার্থ তিন রূপে পাওয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় রূপ বিরোধধর্ম্মাত্মক ও আলোক-কর্ম্মক্ষম। তৃতীয় রূপ আলোক-কর্ম্মক্ষম অংশদ্বয়ের তুল্য পরিমাণে সংমিশ্রণ-জনিত আভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা হেতু নিষ্ক্রিয়।

আলোক-কর্ম্মক্ষম জৈব অম্লসমূহের নিষ্ক্রিয়তাপাদন (Racemisation) সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অবধারিত হইয়াছে বিগত বর্ষে মেকেঞ্জি ও কুমারী উইডোজ্ (Widdows) সুষ্পষ্টরূপে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। Cinnamic অম্ল সমূহের পরমাণু-সন্নিবেশ (Configuration) যে ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে ঠিক সেইরূপ পন্থা অবলম্বনে ষ্টোর্‌মার্ (Stormer) Stilbene সমূহের পরমাণু-সন্নিবেশ মীমাংসা করিয়াছেন। a-methyl,cinnamic অম্ল দুই অবস্থায় পাওয়া যায় বলিয়া এ পর্য্যন্ত ধারণা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ভার্‌নার্ (Werner) দেখাইয়াছেন যে প্রকৃত পক্ষে উহারা একই অম্লের দুই রূপ মাত্র। ১৯১৪ সনে কনিষ্ঠ আরলেন্‌মায়ার (Erlenmeyer,jun.) আলোক-কর্ম্মক্ষম Benzaldehyde প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী পরীক্ষার ফলে তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

জৈব মৌলিক-সংহতি সমূহ

(Organic Radicals)

কখনও কখনও দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ এমন ভাবে একত্র আবদ্ধ থাকে যে সর্ব্বপ্রকার প্রক্রিয়াদিতেই এই সকল পদার্থ-সমষ্টি মৌলিক পদার্থের অনুরূপ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পদার্থ সমষ্টিকে মৌলিক-সংহতি (Radicals) বলা হয়।

Triphenylmethyl আবিষ্কারের পর ঐ আদর্শের অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে অবিশ্রান্ত গবেষণা চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষেও তাহার বিরাম হয় নাই।

রাসায়নিক মাত্রেই জানেন যে meta-quinone এর অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। ১৯১৩ সনে ষ্টার্ক

(Stark) ও গ্রাবেন (Graben) Tetra-phenyl-my-lene প্রস্তুত করিয়া উহা meta-quinono ঘটিত বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু গত বৎসর শ্লেঙ্ক (Sclenk) ও ব্রন্স (Brauns) পূর্ব্বোক্ত মত ভিত্তিশূন্য এবং উহার অনুকূলে কোন অটল যুক্তি বা প্রমাণ নাই বলিয়া তার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সবর্ণ Triaryl-carbinol সমূহকে প্রকৃত পক্ষে Corboniun শ্রেণীর পদার্থ অথবা Quinocarbonium লবণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, সে প্রশ্নটী এখনও বিচারাধীন। এ প্রশ্নের সমাধান চেষ্টায় যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে তাহাদের ফল বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-মূলক। শিচিবাবিন (Tschitschibabin) দুই সূত্রই ব্যাখ্যেয় বলিয়া উভয় কুল রাখিয়াছেন। ভাইলেণ্ড Tetra-aryl-hydrazine সমূহের বিচ্ছেদন (dissociation) অনুশীলন করিতেছেন।

ডায়েজো পদার্থ-নিচয়

(Diazo compounds).

জৈব পদার্থ সমূহের ধর্ম্ম অনেকটা উহাদের পরমাণু-সন্নিবেশ বা রাসায়নিক গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কাজেই যে সকল পদার্থের বিশেষত্ব-দ্যোতক স্থায়ী অংশের পরমাণু-সন্নিবেশ সাধারণ তাহাদিগকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত ধরা হইয়া থাকে। এই রূপে জৈব পদার্থ সমূহকে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত করা যায়। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আলোচ্য "ডায়েজো" জাতীয় পদার্থও পূর্ব্বোক্ত এক শ্রেণীর নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ।

Diazo-phenol শ্রেণীর পদার্থ সমূহের পরমাণু-সন্নিবেশ বিভিন্ন দুই প্রকারে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাদের একটীই মাত্র গ্রাহ্য, কিন্তু সেটী যে কোনটী তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। গত পূর্ব্ব বৎসর ক্লিমেঙ্ক (Klemanck) দ্বিবিধ সূত্রেরই অনুকূলে বা প্রতিকূলে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা যায় তাহাদের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া Diazonium সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মত দেন। আলোচ্য বর্ষে মর্গেন (Morgan) ও পোর্টার (Porter) ক্লিমেঙ্কের মতের প্রতিবাদ করতঃ অন্য একটী সূত্রের পক্ষে নানারূপ যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আমরা আমাদের মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতেছি। হয়ত আর এক বৎসর পর আমাদিগকে পুনরায় নূতন আর কোনও সূত্রের পক্ষপাতী হইতে হইবে। এই সব কারণে মনে হয় যে এরূপ কুটিল প্রশ্নের সমাধান কল্পে কোনও সিদ্ধান্তে হঠাৎ উপনীত হওয়া সমীচীন নহে।

মেয়ারের (Meyer) মতে যখন কোনও ডায়েজো-লবণ ফিনল (Phenol)এর সহিত সম্মিলিত হয় তখন উহা দ্বিতীয় উপাদানের দ্বিত্ব-বন্ধন (Double bond) স্থানেই প্রথম সংলগ্ন হইয়া থাকে। অপর পক্ষে অয়ার্স (Auwers) ও মাইকেলিস্ (Michaelis)এর মতে পূর্ব্বোক্তরূপ স্থলে ডায়েজো-লবণ সর্ব্ব প্রথমে দ্বিতীয় উপাদানস্থ ফিনলের অক্সিজেন পরমাণুর অবশিষ্ট অব্যক্ত-আকর্ষণী-শক্তির (Residual affinitiy) দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কেরার (Karrar) দেখাইয়াছেন যে ডায়েজো-লবণ ও এমিন্ (Amine) এর সংমিলন এমিন্ সংহতিস্থিত নাইট্রোজেনের সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে।

চেটাওয়ে (Chattaway) দুইটী নূতন Ammonium perhaloid তৈয়ার করিয়াছেন। ইহারা জলে সহজেই দ্রবণশীল এবং চুণ সংস্পর্শে অব্যাপ্ত (Vacuum) স্থানে রাখিয়া দিলে ইহাদের দুইটী halogen পরমাণু চ্যুত হয়। পক্ষান্তরে Diozonium perhaloids সমূহ কিন্তু জলে এক প্রকার সম্পূর্ণ অদ্রবণীয় এবং চুণ সংস্পর্শে অব্যাপ্ত স্থানেও অভঙ্গুর। এখন চেটাওয়ে বলিতেছেন যে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার perhaloids এর ধর্ম্মের এই রূপ পার্থক্য Diazonium trihalide সমূহ মোটেই perhaloid আখ্যা পাইতে পারে না বলিয়া ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে যে তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই নূতন করিয়া সমর্থন করিতেছে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই একদিকে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ করষ্টার (Forster) ও অপর দিকে রাসায়নিক-

কুল-তিলক হান্‌স্‌ (Hantzsch) চেটাওয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া উহার বিরুদ্ধে যুক্তি রাশি প্রমাণ স্তূপীকৃত করিয়াছেন।

বহু চাক্রিক হাইড্রোকার্ব্বন্ শ্রেণী

(Polycyclic hydrocarbons)

যে সকল জৈব পদার্থাণুতে একাধিক চক্র বিদ্যমান,তাহারা বহুচাক্রিক পদার্থ নামে পরিচিত। এক-চাক্রিক পদার্থ সমূহের ন্যায় ধর্ম্ম ও রাসায়নিক গঠন ভেদে ইহাদিগকেও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই হিসাবে কার্ব্বন্ ও হাইড্রোজেন্ মাত্র যে সকল বহু-চাক্রিক পদার্থের উপাদান তাহাদিগকে বহু-চাক্রিক-হাইড্রোকার্ব্বন্ বলা হইয়াছে।

থিল্ (Thiele) এর মতে Indene এর কয়েকটী বিশেষ প্রক্রিয়া সুবোধ্য করিতে হইলে এতদণুস্থিত দ্বিত্ব বন্ধনীটী দোদুল্যমান (oscillating) ধরিয়া লওয়াই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে কোর্টট্ (Courtot) দেখাইয়াছেন যে থিলের ওরূপ কল্পনামূলক কোনও সিদ্ধান্তের আশ্রয় না করিয়াও Indene এর সর্ব্ববিধ প্রক্রিয়াই সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

শ্রীমতী রবিন্‌সন্ Homopiperonyl ও Homoveratryl alcohol হইতে ধাতব অম্ল সাহায্যে গঠিত দ্রব্য সমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আলোক প্রভাবে Acenaphthene পরিবর্ত্তিত হইয়া কি কি পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহা নিরূপণ বিষয়ে যে ধারাবাহিক সূক্ষ্ম পরীক্ষা চলিতেছে সে কথাও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

টারপিন শ্রেণী

(Terpenes)

ইহারা চাক্রিক-হাইড্রোকার্ব্বন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তবে বিশেষত্ব এই যে ইহাদের চক্রস্থিত কার্ব্বন্ পরমাণু সমূহের মিলন-ক্ষমতা প্রায়ই পরিতৃপ্ত—অর্থাৎ চক্র মধ্যে কোন দ্বিত্ব-বন্ধন (Double bond) থাকে না এবং অনেক স্থলে ইহারা পার্শ্ব-শৃঙ্খল (side chain) যুক্ত।

ইহাদের আণবিক একরূপতা (Isomerism) সাধারণতঃ এরূপ ভাবে প্রকটিত হয় যে পার্শ্ব-শৃঙ্খল বিশিষ্ট চক্র পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর চক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং পার্শ্ব-শৃঙ্খলশূন্য চক্র পার্শ্ব-শৃঙ্খল যুক্ত ক্ষুদ্র চক্রে পরিবর্ত্তিত হয়। আলোচ্য বর্ষে রোসেনভ্ (Rosanov) কর্ত্তৃক Cyclo-pentyl-carbinol হইতে cyclo-hexane প্রস্তুত প্রথম প্রকার পরিবর্ত্তনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নেমেট্‌কিন (Nametkin) কুমারী রোশেনকেভা (Rushenceva) ও আরও কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে Camphene প্রমুখ তিনটী দ্বি-চাক্রিক হাইড্রোকার্ব্বন এবং Alicyclic-carbinol ও Aldehyde সমূহের সহিত নাইট্রিক অম্লের ক্রিয়া বিশদ রূপে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। টার্পিন শ্রেণীর স্বতঃদহন (Auto-oxidation) বিষয়েও জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ ২।১ খানা মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ধাতুঘটিত জৈব পদার্থ

(Organic compounds of metals)

চেষ্টা করিলে জৈবপদার্থের চক্রস্থিত কার্ব্বন্ পরমাণুর সহিত কোন কোন ধাতব পরমাণু সংলগ্ন করা যায়। অল্প দিন হইল এই প্রকার ধাতু ঘটিত জৈব পদার্থের অস্তিত্ব প্রথম সূচিত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর মধ্যেই এই শ্রেণীর অসংখ্য পদার্থ সংশ্লেষিত হইয়াছে।

আর্‌সেনিক্ (Arsenic):—আর্সেনিক্ ঘটিত জৈবপদার্থ সমূহের মধ্যে Salversan উপদংশ প্রতিরোধ করিতে অব্যর্থ বলিয়া আশ্চর্য্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। পিচ্‌কারীদ্বারা অন্তর্নিক্ষেপ (Injection) করিয়া সেলভারসেন ব্যবহার করিতে হয় এবং এতজ্জন্য এই লবণটীকে প্রথমতঃ জলে গুলিয়া ক্ষার (Alkali) সংযোগে ইহার অম্লত্ব বিনাশ করিয়া লওয়ার

প্রয়োজন। শেষোক্ত কার্য্যে যথেষ্ট নিপুণতার দরকার এবং অনেক চিকিৎসক সহজে অতটা ক্লেশ করিতে স্বীকৃত হন না। জলে সহজে দ্রবণশীল, অম্ল বা ক্ষারধর্ম্ম শূন্য, অথচ রোগ প্রতিকারার্থ সেলভারসেনের ন্যায় কার্য্যকরী—এরূপ সেলভারসেন্-জাত পদার্থ প্রস্তুতের চেষ্টা পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে এবং তাহার ফলে এ পর্য্যন্ত Neo-salversanপ্রমুখ বহু নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু রোগনাশক রূপে উহারা সেলভারসেনের সমকক্ষ কি না তদ্বিষয়ে প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণও একমত হইতে পারেন নাই।

এন্টিমনি (Antimony) :—সেলভারসেন প্রস্তুত প্রণালীর অনুরূপ প্রণালী অনুসরণে সেলভারসেনের অনুরূপ এন্টিমনি ঘটিত জৈবপদার্থ সংশ্লেষিত হইয়াছে। ইহার ভেসজগুণ পরীক্ষাধীন।

সেলিনিয়াম্ (Selenium):—বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে জৈব পদার্থে সেলিনিয়াম পরমাণু প্রবেশ করাইবার যে কয়টী প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাণ্ডমায়ার (Sandmeyer) ও গটারম্যান (Gatterman) বর্ণিত প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয়। এই প্রণালী অবলম্বনে আলোচ্য বর্ষে কয়েকটী নূতন সেলেনিয়াম-ঘটিত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশেরই কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই।

বিষম-চাক্রিক অংশ

(Hetero-cyclic division)

এই অংশে ১৯১৫ সনে যে সকল গবেষণা হইয়াছে তাহাদের ফল যদিও আশানুরূপ সন্তোষ-জনক নহে, তথাপি সাময়িক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ গতবর্ষে এমন কতকগুলা গবেষণা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের তেমন মূল্য না থাকিলেও উহারা ভবিষ্যৎ উচ্চতর গবেষণার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। এস্থলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে যুগান্তকর আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে এরূপ আবিষ্কার প্রতিদিন বা প্রতি বৎসরই সাধিত হয় না এবং ইটের উপর ইট বসাইয়াই সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিম্নে বিষয়ভেদে এই অংশের অনুসন্ধান সমূহের যথোচিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করা গেল।

কয়েকটী নূতন শ্রেণীর বিষম-চাক্রিক পদার্থ

(Some new Hetero-cyclic Types)

ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই অতি জটিল রকমের নূতন শ্রেণীর বিষম-চাক্রিক পদার্থ জগতের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯১৫ সনে এই ধারার আংশিক ব্যতিক্রম দেখা যায়; কারণ এই বৎসরে যদিও Coumarinoline এর ন্যায় ২।১টী অতি কটমট রকমের পদার্থ তাহাদের অতি জটিল দেহভার লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, অধিকাংশ স্থলেই আবিষ্কৃত নূতন শ্রেণীসমূহের রাসায়নিক প্রকৃতি অতি সরল। আর্‌লিক (Ehrlich) ও বয়ার (Bauer) রঞ্জন উপকরণরূপে শিল্পে ও ভেষজরূপে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ব্যবহার-উপযোগী সেলেনিয়াম্ ঘটিত চাক্রিক পদার্থ প্রস্তুতের চেষ্টায় আছেন। ইঁহাদের গবেষণার ফল বৈজ্ঞানিক দিক্ হইতে কৌতুহলপ্রদ হইলেও স্থূলতঃ বিশেষ মূল্যবান্ নহে। এতদ্ব্যতীত 'আর্‌সেনিক্,' 'টাইটেনিয়াম্' ও 'মার্কিউরী' ঘটিত কয়েকটী বিষম চাক্রিক পদার্থও সংশ্লেষিত হইয়াছে।

Thiol-benzoic অম্লের নিবিড়তাপাদন ক্রিয়া

(Condensation reactions of Thiol-benzoic acid)

Keto-methylene সংহতি বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ নিচয় সহজেই কয়েক রকমের প্রতিক্রিয়ায় যোগ দান করে। আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক স্মাইলস্ (Smiles) ও ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ

ঘোষ এ বিষয়ে একটা নূতন কার্য্য ক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই পরীক্ষকদ্বয় Ethyl-aceto-acetate ও o. thiol-benzoic অম্লের সংযোগে 3.oxy.1.-thionaphthen উৎপন্ন করিয়াছেন। শেষোক্ত পদার্থটী সহজেই Thio-Indigoতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনেকে বোধ হয় জানেন ইহা নীল জাতীয় একটি অতি উজ্জ্বল ও স্থায়ী রঞ্জন উপকরণ।

পাইরল্ বর্গ

(Pyrolle and its Allies)

এই বিভাগে রুশিয় পণ্ডিত শ্চেলিনকেভ্ (Tschelinceve) শিষ্যগণ সহ উঠিয়া পড়িয়া কাজ করিতেছেন এবং ইহাদের চেষ্টার ফলে পাইরল সম্বন্ধে আমরা বহু সারবান্ ও প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারিতেছি। তন্মধ্যে এস্থলে ২।১ টীর মাত্র উল্লেখ করা গেল। Tri-pyrolle এর গঠন প্রণালী প্রভৃতির পরীক্ষামূলক আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই পদার্থের ডেনেষ্টেড্ (Dennestedt) নির্দ্ধারিত সূত্র কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। পাইরল হইতে একটী নূতন রঞ্জন উপকরণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ধৈর্য্য সহকারে পরীক্ষা চালাইলে ভবিষ্যতে যে আরও বহু মূল্যবান্ পদার্থ সংশ্লেষিত হইতে পারিবে তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছে।

ফিসার্ কয়েকটী trisubstituted-pyrolle এর রাসায়নিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে একটা নূতন আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল পদার্থ পিত্তাম্লের (Bile acids) সহিত সম্পর্কান্বিত বলিয়া ফিসারের গবেষণা বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান্।

পিরিডিন্ (Pyridine)

পিরিডিন্ একটী নাইট্রোজেন ঘটিত উৎকৃষ্ট জৈব দ্রাবক; এবং সহায়করূপে (Catalytic agent) বর্ত্তমান থাকিয়া অশেষবিধ রাসায়নিক সংযোগ ঘটাইতে পারে। পিরিডিনের এই সম্বন্ধ-সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা ব্যতিরেকে গত বৎসর রুশীয় রাসায়নিক শিচিবাবিন দুইটী Nitro-pyridine, 2. amino pyridine ও 2:6 dimino-pyridine আবিষ্কার করিয়াছেন। শেষোক্ত পদার্থটী ভবিষ্যতে Azo শ্রেণীর কৃত্রিম রং প্রস্তুতের জন্য দ্বিতীয় উপাদানরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

পেণ্টাজোল শ্রেণী

(Pentazole compounds)

লিফসিট্জ (Lifschitez) একমাত্র নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত পঞ্চাঙ্গ-চক্র (Five-membered ring) সমন্বিত কয়েকটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব যৌগিক পদার্থ সংশ্লেষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে Silver Pentazoleএর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিশুদ্ধাবস্থায় এই যৌগিক পদার্থপ্রাপ্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে পঞ্চাঙ্গ নাইট্রোজেনচক্র মোটেই ক্ষণভঙ্গুর (unstable) নহে,—পক্ষান্তরে বিশেষ দৃঢ়। যথোচিত অনুশীলন করিলে ভবিষ্যতে যে আরও অনেক মনোহর তথ্য আবিষ্কৃত হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

বিবিধ।

বার্জার (Barger) কয়েক বৎসর যাবৎ নানাবিধ প্রাকৃতিক জৈব পদার্থ ও আওডিন (Iodine)এর সমন্বয়ে নীল-বর্ণ উৎপত্তির পরীক্ষা করিতেছেন এবং তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে দুইটী সারবান্ তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন :—(১) পরিজ্ঞাত রাসায়নিক প্রকৃতি বিশিষ্ট কতিপয় সংশ্লেষিত বিষম-চাক্রিক পদার্থও আওডিন সহযোগে নীলবর্ণ উৎপাদন করিতে পারে; (২) আওডিনের সহিত মিলিত হইতে হইলে জৈব উপকরণটী লসলসা বা লই (colloidal) অবস্থায় থাকা চাই, অর্থাৎ উহা স্ফটিকাবস্থায় আওডিনের সহিত মিলিত হইয়া নীলবর্ণ উৎপাদন করিতে পারে না। ইহা হইতে মনে হয় যে উপযুক্ত গবেষণা করিলে আরও অনেক চিত্তাকর্ষী বিষয় জানা যাইবে।

বিভিন্ন y.cloroketone হইতে কতকগুলা বিষম-

চাক্রিক পদার্থ প্রস্তুতের সাধারণ প্রণালী নির্ণীত হইয়াছে এবং অধ্যবসায় সহকারে প্রণালীটির পর্য্যালোচনা করিলে সময়ে অন্ততঃ কতিপয় বিষম চাক্রিক পদার্থ অনেকটা সহজে সংশ্লেষিত হইতে পারিবে।

অক্সনিয়ম শ্রেণী

(Oxoniun compounds)

কলি (Collie) কর্ত্তৃক Dimethyl-pyroneএর কয়েকটী যুক্ত-লবণ প্রস্তুতের পর ইহা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয় যে স্থলবিশেষে কার্বন-মূলক যৌগিক পদার্থস্থিত অক্সিজেন ভস্মসংহতি (Basic group) বিশেষের বীজ-পরমাণু (Nucleur atom) রূপে অবস্থান করিতে পারে। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে অক্‌সিজেন ঘটিত বহু বিসদৃশ জৈবপদার্থেরই অম্ল সংযোগে যুক্তলবণ গঠনের ক্ষমতা আছে। অক্সিজেন পরমাণু বর্ত্তমান হেতুই এই সকল পদার্থ বিভিন্ন অম্লের সহিত মিলিত হইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে ঢাকা কলেজের কৃতি ছাত্র, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী উদীয়মান রাসায়নিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ অক্‌সিজেন পরমাণু সমন্বিত এই শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নিচয়ের অম্ল-সংযোগ-প্রবণতা সমগ্র অণুর পরমাণু সন্নিবেশ অনুসারে কি প্রকারে ও কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ মানসে বিস্তৃত পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে একখানা মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং উহা হইতে আমরা জানিতেছি যে অণুমধ্যে Ethylenic শৃঙ্খল বা Carbonyl প্রমুখ ঋণাত্মক সংহতি (Negative Radical) প্রবেশ করিলে ঐ অণুর অম্ল-সংযোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিষয়টী এখনও পরীক্ষাধীন এবং আশা করা যায় যে শীঘ্রই আরও নানাবিধ উপাদেয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত করিবে।

পায়রোন শ্রেণী ও ইহাদের জ্ঞাতি বর্গ

(Pyrones & there allies)

পায়রোন শ্রেণীর বস্তুর ক্রিয়াদি সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত কর্ম্মিদিগের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়নাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর নর্ম্মেন কলির নামই সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ যোগ্য। ১৯০৭ সনে ইনি (Ketone) সংহতিবিশিষ্ট পদার্থ নিচয়ের ধর্ম্ম পরীক্ষা করেন এবং এষণার ফলে Diacetyl-acetone যে জলাণুবিয়োগে Dimethyl Pyrone অথবা Orcinol এ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত হয়। কয়েক বৎসর বিরামের পর আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক কলি এই পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে orcinol acetyl-acetone এর সহিত সংযোজিত হইয়া Benzo pyronol শ্রেণীর দুইটি নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে। এই দুইটী পদার্থের সহিত Apigenin প্রমুখ প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণের ঘনিষ্ঠ সদৃশতা বর্ত্তমান আছে।

বেনজোপায়রোন ও ফ্লেবোন ঘটিত পদার্থ শ্রেণী

(Benzopyrone and Flavone derivatives)

এই বিভাগে বহু সিদ্ধহস্ত ও কৃতিকর্ম্মী গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ফলে আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত নূতন তথ্য রাশির পরিমাণও কম নহে। Ethyl-aceto-acetate যে phenol এর সহিত সংযোজিত হইয়া coumarin শ্রেণীর পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারে তাহা সুবিদিত। Ethyl-aceto-acetate এর কার্য্যকরী hydrogen অণুর পরিবর্ত্তে কোনও alkyl সংহতি সন্নিবেশিত থাকিলে ঐ পদার্থ Phenol এর সহিত কিরূপ ক্রিয়া করে তাহার বিস্তৃত পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি জেকবসন (Jacobson) ও ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ তিনখানি সুদীর্ঘ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়টী হৃদয়গ্রাহী হইলেও জটিলতা নিবন্ধন এস্থলে প্রবন্ধত্রয়ের সার সঙ্কলন করার চেষ্টা বৃথা।

কুমারী ওনেল (Oneill) এক শ্রেণীর নূতন ধরণের ফ্লেভোন-ঘটিত পদার্থের সংশ্লেষণ সাধন করিয়াছেন এবং সাময়িক ভাবে উহাদের জাতীয় নাম Diflavone রাখিয়াছেন। ডাইফ্লেবোম অণুর গঠন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যেন দুইটী ফ্লেভোন অণু দুই দিক হইতে আসিয়া পিঠে পিঠে মিলিয়া এক দেহ ধারণ করিয়াছে। ফ্লেভোন অণুর সঙ্গে ডাইফ্লেভোন অণুর যে সম্বন্ধ flavononc বা chromonone এর সঙ্গে ঠিক সেই ভাবে সম্বন্ধবদ্ধ পদার্থদ্বয় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই ; কিন্তু বোধ হয় বেশী দিন আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে হইবে না। নূতন আশায় আশান্বিত হইয়া কুমারী ওনেল দ্বিগুণতর উদ্যমে পরীক্ষা চালাইতেছেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ডাঃ ওয়াটসন (DrWatson) ও লিড্‌স্ নগরের বস্ত্রব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রসশালার অধ্যক্ষ প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণ-রসায়ন-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এ, জি পার্কিন (A. G. Perkin) সমবেত ভাবে কয়েকটী ফ্লেভোন-ঘটিত রঞ্জন উপকরণের বর্ণ কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত করার চেষ্টায় আংশিক সফলকাম হইয়াছেন এবং আলোক-সংশ্লেষণ-যন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে এই শ্রেণীর পদার্থের বর্ণ-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কয়েকটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

উদ্ভিদ্-রঞ্জক শ্রেণী

(Plant pigments)

যে সকল বিশেষ পদার্থের বর্ত্তমানতা হেতু উদ্ভিদ্ জগতে অগণিত প্রকার নয়নবিমোহন বিচিত্র বর্ণ পরিলক্ষিত হয় তাহারাই উদ্ভিদরঞ্জক নামে পরিচিত। ইহাদের রাসায়নিক প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল ও অনেক স্থলে পত্রে বা পুষ্পে ইহারা এত অল্প পরিমাণে অবস্থান করে যে উহাদের পরীক্ষা অসম্ভব মনে করিয়া এ পর্য্যন্ত রাসায়নিকগণ উদ্ভিদ্-রঞ্জক সমূহের প্রতি অনেকটা উদাসীন ছিলেন। ক্রমে এই ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং কিছু দিন যাবৎ বহু খ্যাতনামা রাসায়নিক এ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কৃতবিদ্য কর্ম্মীদিগের মধ্যে ১৯১৪ সনের নোবেল বৃত্তিভুক্ রাসায়নিক-কুল-তিলক ভিলস্‌টেটার (Wilstatter) সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী। গতবর্ষে গোলাপ প্রমুখ কতিপয় পুষ্পের রঞ্জক পদার্থের পরীক্ষা হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রটী নূতন, কাজেই কোন মতই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে না।

পত্র-হরিৎ

(Chlorophyl)

বৃক্ষলতাতৃণাদির হরিৎ বর্ণের আধার পদার্থটী পত্রহরিৎ নামে পরিচিত। ইহাকে ঠিক উদ্ভিদ্-রঞ্জক বলা যায় না। পত্রহরিতের পরমাণুসন্নিবেশ প্রভৃতি এত জটিল যে রাসায়নিকগণ বহুকাল অক্লান্ত ও কঠোর পরিশ্রমের পরও চেষ্টানুরূপ কিছু করিতে না পারিয়া যেন নিরাশ হইয়া ইহার পরীক্ষা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ভিলষ্টেটার সম্প্রতি বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কাজেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্যবর্ষে পত্রহরিৎ সম্বন্ধে তেমন বিপুল উদ্যমে পরিচালিত কোনও গবেষণার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। পত্রহরিৎ ও সদৃশ পদার্থ লইয়া এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে সম্প্রতি ভিলষ্টেটার তাহার ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী একত্র লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মৌলিকতা হিসাবে এরূপ প্রবন্ধের কোনও মূল্য নাই। ইউয়ার্ট (Ewart) বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের পত্র মধ্যস্থ রঞ্জক সমূহ পৃথক্ করিয়া তাহাদের উপর আলোকের কার্য্যকারিতা নিরূপণ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে বৃক্ষলতাদি কর্ত্তৃক অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) আত্মসাৎ (assimilation) প্রণালী প্রথমতঃ যতটা সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইতে অনেকটা জটিল। এলবার্ট (Albert) ও মেরি (Mary) ঠিক পত্রহরিতের ন্যায় গুণ ও প্রকৃতি বিশিষ্ট একটী নূতন উদ্ভিদ্-রঞ্জক সংশ্লেষণ করিয়া উহাকে কৃত্রিম পত্রহরিৎ নাম দিয়াছেন। এই পরীক্ষকদ্বয়ের মতে আলোক ও বায়ুর সাহায্যে প্রাকৃতিক অবস্থায় পত্রহরিতের যে সকল ক্রম-

পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কৃত্রিম পত্রহরিৎ দ্বারা রসায়নাগারে বসিয়া কয়েক মিনিটেই তাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এলবার্টু ও মেরির এই আবিষ্কার সুপ্রমাণিত হইলে পত্র হরিৎ সম্বন্ধে ভিলষ্টেটারের বহুবর্ষব্যাপী পরীক্ষা দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্ত সমূহ এক নিমেষে চূর্ণ হইয়া যাইবে।

উপক্ষার শ্রেণী (Alkaloids)

উদ্ভিদ্ জগত হইতে প্রাপ্ত,অতি জটিল রাসায়নিক প্রকৃতি-যুক্ত ও ঈষৎ ক্ষারগুণবিশিষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত এক জাতীয় বিষ-পদার্থ উপক্ষার নামে পরিচিত। তামাকের পাতায়, আফিমের রসে,কুচিলার মূলে উপক্ষার পাওয়া যায়। কতকদিন পর্য্যন্ত সুপরিচিত অথচ অবিশ্লেষিত কতিপয় উপক্ষারের রাসায়নিক গঠন প্রণালী (Chemical Constitution) নির্দ্ধারণের দিকেই বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টা একরূপ সম্পূর্ণ নিহিত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে পূর্ব্ব অজ্ঞাত বা অপরীক্ষিত নূতন উপক্ষার সংগ্রহের প্রতিই রাসায়নিকগণ অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। গত বৎসর কুইনাইন ও কুইনাইন-ঘটিত যৌগিক পদার্থ নিচয়ের উপর ক্লোরিনের ক্রিয়া, বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর আক্রমণে সিন্‌কমিনের (Chinconine) পরিবর্ত্তন, এবং প্যাভিন (Pavine) ও সিঙ্কোনিনের পরমাণুসন্নিবেশ সূত্র (Graphical Formulae) নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। ফ্রেণ্ড (Freund) ও ফ্লিসার (Fleuscher) পেপাভেরিন (Papavarine) হইতে উচ্চতর আণবিক-গুরুত্ব বিশিষ্ট উপক্ষার সংশ্লেষণের চেষ্টা করিতে গিয়া দুইটী নূতন উপক্ষারজ মিলিত-পদার্থ (alkaloidel Compound) তৈয়ার করিয়াছেন। টিফেনো (Tiffeneau) acetic anhydrideএর ক্রিয়া দ্বারা মর্ফিন (morphin) জাতীয় উপক্ষার সমূহকে তিনটী সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাদের সর্ব্বদা অজ্ঞাতনামা উপক্ষার লইয়া পরীক্ষা করিতে হয় এই প্রণালী তাহাদের যথেষ্ট উপকারে আসিবে। নোগা (Noga) দেখাইয়াছেন যে তুর্কিদেশীয় তামাক পাতায় নিকটীন্ (Nicotine) জাতীয় ৪টী বিভিন্ন উপক্ষার বিদ্যমান।

চন্না (Channa) হটেণ্টট্‌দের মধ্যে অতি তৃপ্তিকর খাদ্য বলিয়া বিবেচিত। সম্প্রতি হার্টউইচ (Hartwich) ও জুইকী (Zwichy) পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে চন্নায় Messembrine নামক একটী উপক্ষার আছে বলিয়াই উহার এত আদর। কারণ মেসেম্‌ব্রিন্‌এর গুণ ও ক্রিয়া কোকেন (Cocaine) এর ন্যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে কোকেনের আধার কোকা বৃক্ষের (Coca tree) পাতা দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের নিকট অতি আদরের খাদ্য এবং একমাত্র কোকা পাতা চর্ব্বণ করিয়া সহজেই অনাহার জনিত ক্লেশ ভুলিয়া তাহারা সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অক্লেশে কাজ করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত Strychnine, yohimbine, berberine প্রমুখ সুপরিচিত উপক্ষার এবং বৈজ্ঞানিক জগতে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত আরও অনেক উপক্ষার সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে বিশেষ মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল গবেষণার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অসম্ভব।

(৪) বৈশ্লেষিক রসায়ন
(Analytical chemistry)

বৈশ্লেষিক-রসায়ন চর্চা অপেক্ষা অধিকতর সাময়িক প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে কতিপয় পরিচিতনামা রাসায়নিকের কোনও নূতন গবেষণার সংবাদ পাওয়া যায় না। কাজেই উল্লেখযোগ্য গবেষণার পরিমাণও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় অনেক কম। প্রবন্ধের অপর তিন অংশ অপেক্ষা এই অংশের আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ার ইহাই কারণ। বুঝক করার সুবিধার জন্য প্রবন্ধের এই অংশকেও বিষয়ভেদে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বিশ্লেষণ

(Physical analysis)

কতিপয় ধাতব লবণের উপর বিয়োগ-রশ্মি (Cathode-Rays) ফেলিলে উহাদের রং পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উক্তরূপ প্রক্রিয়ায় sodium chloride—পীতবর্ণ, Potassium chloride—পিঙ্গল বর্ণ, Potossium bromide—গাঢ় নীলবর্ণ, Lithium chloride—উজ্জল পীতবর্ণ এবং Potassium carbonate রক্তবর্ণ ধারণ করে। বলা বাহুল্য সাধারণ অবস্থায় এই সকল লবণ বর্ণবিহীন ও স্বচ্ছ। অন্ধকার ও শৈত্যে উহাদের এই নূতন রং অবিকৃত অবস্থায় বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আলোক ও তাপ সংস্পর্শে বর্ণ তিরোহিত হইয়া উহারা শীঘ্রই পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এস্থলে বিস্ময়ের বিষয় এই যে দিবালোকে উহাদের বর্ণ তিরোহিত হইবার সময় অনুভব-যোগ্য স্বদীপকতা (Fluorescence) লক্ষিত হয়। গোল্ডষ্টেইন্ এই বিষয়ে বিস্তৃত পরীক্ষার পর সম্প্রতি দেখাইয়াছেন যে:—(১) বিয়োগ-রশ্মির ন্যায় অদৃশ্য ধূমল-রশ্মি সমূহও (ultra violet Rays) ধাতব লবণ বিশেষের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে; (২) ক্যেথোড রশ্মির প্রভাবে বর্ণ পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার সাহায্যে ধাতব লবণ সমূহের বিশুদ্ধতা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা যায়।

ট্রুব (Troube) অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নিরূপণের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

জড় বিশ্লেষণ

(Inorganic analysis)

গুণ-বিশ্লেষণ (Qualitative analysis):—অপরিচিত পদার্থে সোডিয়াম্ (Sodium) সনাক্ত করা যে কতদূর কষ্টকর ব্যাপার তাহা রাসায়নিক মাত্রেই অবগত আছেন। প্রথমতঃ সোডিয়ামের অগ্নিপরীক্ষা সকল সময় প্রত্যয়জনক নহে; দ্বিতীয়তঃ দ্রবাবস্থায় সুনিশ্চিতভাবে সোডিয়ামের অস্তিত্ব পরীক্ষা করার কোন উপায় এপর্য্যন্ত জানা ছিলনা। আলোচ্য বর্ষে সোডিয়াম ধাতুর বর্ত্তমানতা প্রমাণ করার একটি অতি সহজ ও সুন্দর প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রণালীর মূল সূত্র সোডিয়ামকে সুরাসারে (alcohol) অদ্রবণীয় Sodium Silicoflouride এ পরিবর্ত্তিত করা এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে একত্রে মেগনেশিয়াম বা লিথিয়াম ধাতু ঘটিত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলেও সোডিয়াম সনাক্ত করার কোনও অসুবিধা হয় না।

পরিমাণ বিশ্লেষণ (Quantitative analysis):—লেড্-মলিবডেট্ (Lead molybdate) সাহায্যে ফস্ফরাসের (Phosphorous) পরিমাণ নিরূপণ প্রণালী বহুকাল যাবৎ ইস্পাৎ প্রস্তুতের কারখানা সমূহে ব্যবহৃত হইয়া আসিলেও অন্য কোন বিভাগে উপযুক্তরূপে আদৃত হয় নাই। ১৯১৫ সনে রোপার (Roper) খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধি প্রভৃতি স্থিত অতি নগণ্য পরিমাণ ফস্ফরাস্ও এই প্রণালী সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করিয়া ইহার বিস্তার্য্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। নাইট্রেট ও নাইট্রাইট্ লবণ সমূহ Titanous hydroxide সংস্পর্শে নিমেষ মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে Ammonia তে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়াকে ভিত্তি করিয়া সম্প্রতি নেক্ট (Knecht) নাইট্রেট ও নাইট্রাইট্ লবণের পরিমাণ অবধারণ করার সহজ প্রণালী প্রস্তাব করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত Copper, aluminium, zinc, Platinum, ইস্পাৎ সংলগ্নস্থ vanadium, এবং tantalum এর সান্নিধ্যে Columbium ধাতুর পরিমাণ বিশ্লেষণের প্রচলিত প্রণালী সমূহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও বিশুদ্ধতর প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

গত বৎসর প্লেটিনাম ধাতু সম্বন্ধে একটী অতি সারগর্ভ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মাইলাস্ (Mylius) ও মেজুকেলী (Mazzucchelli) কয়েক বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টা ও বিস্তৃত গবেষণার ফলে—(১) বাজারে চলিত

সাধারণ প্লেটিনাম্ ধাতুর সঙ্গে যে সমস্ত বিমিশ্র পদার্থ থাকে সূক্ষ্মরূপে তাহাদের পরিমাণ নিরূপণ প্রণালী, (২) প্লেটিনাম্ শ্রেণীর ৬টী ধাতুর প্রত্যেকটীর গুণ বাচক ১৮টী করিয়া পরীক্ষা প্রণালী, (৩) প্লেটিনাম্ শ্রেণীর ৬টী ধাতু মধ্যে যে কোন একটীকে সম্পূর্ণরূপে অপর গুলা হইতে পৃথক্ করার প্রণালী ও (৪) প্লেটিনামের বিশুদ্ধতা নির্দ্ধারণের নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। অধিকন্তু এই পরীক্ষার প্রসঙ্গক্রমে Iridium Mercaptide এর অস্তিত্ব প্রমাণিত এবং Ammonium chloride এর প্রতি Ruthanium cloride এর ব্যবহারের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

জৈব বিশ্লেষণ

(Organic analysis)

গতবর্ষে Ethyl alchohol এর বর্ত্তমানে Methyl alcoholএর পরিমাণ নিরূপণ করার থর্প (Thorpe) প্রবর্ত্তিত পূর্ব্ব প্রচলিত প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

জৈব পদার্থের উপাদানভূত হেলোজেন্ (Halogen) এর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সুপরিচিত কেরিয়াস্ (Carius) প্রণালী অবলম্বন ব্যতিরেকে এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও উপায় ছিল না। এই প্রণালী একদিকে যেমন সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ অপর দিকে,পরীক্ষকের ব্যক্তিগত বিপদ্ আশঙ্কা-জনক। সম্প্রতি রবার্টসন হেলোজেনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার নূতন পন্থা নির্দ্দেশ্ করিয়াছেন। এই প্রণালীর মূল ভিত্তি এই যে chromic ও sulphuric অম্লমিশ্র সহযোগে উত্তপ্ত করিলে জৈব পদার্থের উপাদানভূত হেলোজেন উদ্বায়ু বাষ্পরূপে পৃথক্ হইয়া যায়। যাহারা জৈব-রসায়ন লইয়া মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত তাহাদের জন্য এই প্রণালী বিশেষ উপকারে আসিবে এইরূপ আশা করা যায়।

Tri-nitro-toluene নামটী সাধারণের নিকট অপরিচিত পূর্ব্ব হইলেও উহার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা T. N. T. কিছু দিন যাবৎ অনেকের নিকটই সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। T. N. T. কয়লার অন্তর্ধূম-বিপক (destructive distillation) দ্বারা প্রস্তুত আলকাৎরা (coal tar) হইতে উৎপন্ন টলউইন নামক হাইড্রোকার্বনের যৌগিক পদার্থ বিশেষ; এবং ইহা একটী অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক (explosive)। বর্ত্তমান সময়ে এই বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য বিশুদ্ধ টলউইনের প্রয়োজনীয়তা অচিন্ত্যপূর্ব্বরূপে উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু বাজারে প্রচলিত অপরিশোধিত টলউইনে বেঞ্জিন প্রমুখ নানাবিধ হাইড্রোকার্ব্বন্ মিশ্রিত থাকে। আলোচ্য বর্ষে স্বাধীনভাবে কলমেন (Colman) ও নর্থল লরি (Northol Laurie) অপরিশোধিত বা মিশ্রিত টলউইনের মাত্রা নিরূপণের ২টী বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বিস্ফোরক প্রস্তুতকারকদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

সেলুলোজ (cellulose) বিশ্লেষণের প্রণালী সমূহের মধ্যে কোন্টী উৎকৃষ্টতম তৎসম্বন্ধে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এত বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত-অভিজ্ঞতা শূন্য কোন রাসায়নিকের পক্ষে কেবল মাত্র প্রকাশিত মতামতরাশি পাঠ করিয়া সেলুলোজ বিশ্লেষণের কোন সহজ বিশ্বাস যোগ্য প্রণালী নাই বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক। সম্প্রতি ব্রিগ্স্ (Briggs) সেলুলোজ বিশ্লেষণের ভ্রমাশঙ্কা-শূন্য অথচ সহজ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া এই প্রসঙ্গের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ভেজালরূপে (১) ময়দাতে মিশ্রিত আলুজাত শ্বেতসারের পরিমাণ, (২) শূকর চর্ব্বিতে জলজন্তুর চর্ব্বির পরিমাণ এবং (৩) জান্তব মোমে খনিজ মোমের পরিমাণ নিরূপণের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রাপ্ত রবার মধ্যস্থ কুচুক্ (coutchouc) এর পরিমাণ ঠিক করার প্রচলিত বা প্রস্তাবিত প্রণালী সমূহের মধ্যে কোন্টী যে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রাহ্য আলোচ্য বর্ষে তাহার কোনও মীমাংসা হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও এ বিষয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়াছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহার একটা কূল কিনারা হইবে।

কৃষি বিষয়ক বিশ্লেষণ

(Agricultural Analysis)

আরসেনিক্ (Arsenic) ঘটিত নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থ কীটাদি বিনাশ করার জন্য কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু জলে দ্রবণীয় আর্সেনিক ঘটিত পদার্থসমূহ বৃক্ষলতাদির বিশেষ অনিষ্টকারী, অর্থাৎ কীট পতঙ্গাদি নাশক ঔষধে (Infectioides) জলে অদ্রবণীয় আর্সেনিক পদার্থ থাকাই একমাত্র বৈধ। অথচ বাজারে প্রচলিত এই শ্রেণীর ঔষধমধ্যে অনেক সময় জলে দ্রবণক্ষম আর্সেনিক ঘটিত যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তরূপ ঔষধসমূহ মধ্যে জলে দ্রবণশীল আর্সেনিকঘটিত পদার্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণের একটি সহজ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, এই প্রণালী তাঁহাদের যথেষ্ট উপকারে আসিবে।

আলোচ্য বর্ষে বায়ু বা জল সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নাই।

উপসংহার।

১৯১৫ সনে সমগ্র জগতে কি পরিমাণ রসায়ন চর্চ্চা হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার একটা মোটামোটি আভাস প্রদানের চেষ্টা করা গিয়াছে। অবশ্য হয় ত জটিলতা নিবন্ধন অনেক কথার আলোচনায় বিরত হইতে হইয়াছে, স্বীয় অক্ষমতা হেতু এরূপ গুরু বিষয়ের প্রতি যথোপযুক্ত সুবিচার করিতে পারি নাই, স্থানাভাব বশতঃ, প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও বহু সারবান্ বিষয়ের কথা বাদ দিতে হইয়াছে, পারিভাষিক শব্দের অভাবে ভাব তেমন পরিস্ফুট হয় নাই, কোন ২ স্থলে শ্রবণ-কর্কশ-বর্ণে পীড়াদায়ক বিদঘুট-দীর্ঘ নাম সমূহ পরিত্যাগের চেষ্টা করিতে গিয়া সঙ্গে ২ অনেক প্রীতিকর প্রসঙ্গও একেবারে বাদ দিতে হইয়াছে; যথাসাধ্য ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা সত্ত্বেও অজ্ঞাতভাবে বহু অমার্জ্জনীয় ভুল রহিয়া গিয়াছে, প্রসঙ্গতঃ দুই একটী অবান্তর কথায় অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছি, এবং যেমন করিয়া গুছাইয়া বলা উচিত ছিল তেমন করিয়া বলিতে পারি নাই ও প্রবন্ধ যতটুকু উপাদেয় করার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহার কিছুই হয় নাই। যাহা হউক আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে সাধারণ পাঠকগণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি অবজ্ঞা ও বীতরাগের মাত্রা যদি কিছুমাত্রও অপসারিত হয় এবং কাহারও হৃদয়ে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তি একটুও উদ্দীপ্ত হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব।

সম্প্রতি বাংলা ভাষায় নানারূপ বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বৈজ্ঞানিক জগতে যে সকল আবিষ্কার বা চর্চ্চা হইতেছে তাহার বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সম্মুখে স্থাপন করিতে কেহই প্রয়াস পান না। এক কথায় বলিতে গেলে জগতের জ্ঞান-সম্ভার আমরা যথোচিতরূপে গ্রহণ করিতেছি না। অথচ দেশে কৃতবিদ্য লোকের অভাব নাই।

পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) শারীর-বিজ্ঞান (Physiology), খনিজ বিজ্ঞান (Minerology), উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান (Botany), ভূ-বিজ্ঞান (Geology) প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গত বৎসর যে সকল গবেষণা হইয়াছে, যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী তিনি যদি সেই বিষয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে দেশের শিক্ষা বিস্তার, সাধারণ লোকের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন। এই সামান্য প্রার্থনা দীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকিবে না এইরূপ আশা লইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার।

মহাকবি

ভাস

প্রণীত

মধ্যমব্যায়োগ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ভীমসেন

ঘটোৎকচ

ব্রাহ্মণ কেশবদাস

কেশবদাসের পুত্র ত্রয়

সূত্রধার

স্ত্রীগণ

কেশবদাসের পত্নী

হিড়িম্বা

মধ্যমব্যায়োগ

স্থাপনা

সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্রধার। বামনরূপী ভগবানের যেই পায়ের কথা শুনিয়া বলী-পত্নীর হৃদয় অবসন্ন হয়েছিল, (ভগবানের) যেই পা কুবলয়ের কোষের মত নীল, যেই পা উত্তোলিত হয়ে ত্রিভুবনের (স্বর্গ, মধ্যপ্রদেশ ও পৃথিবী) মণিবন্ধরূপ অম্বর-সাগরে বৈদুর্য্য মণির শোভা বিস্তার করেছিল (ভগবানের সেই পা) আপনাদিগকে পালন করুক। *

আচ্ছা, সভাসদগণকেই একথাই বলি। একি! আমি এই কথা বলতে ব্যগ্র হয়েছি কিন্তু একটা কি শব্দ শুনছি না! আচ্ছা, দেখ্‌ছি।

* এই শ্লোকটির আর একটি অর্থ আছে—

ভগবানের চরণ যে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় (অবাধ গতির বাধা হওয়াতে) অসুর বধূগণের মনে অবসাদ হয়েছিল, যে আকাশ কুবলয় এবং ঝক্‌ঝকে খড়্গের মত কালো, যে আকাশ সুবিস্তৃত এবং যাহা ত্রিভুবনের একমাত্র মণিস্বরূপ, অম্বর-সাগরে বৈদুর্য্য মণির উৎপত্তির মত বোধ হয়, সেই আকাশ আপনাদিগকে পালন করুক।

পায়াৎ স বোহসুরবধূহৃদয়াবসাদঃ।
পাদো হরেঃ কুবলয়ামলখড়্গনীলঃ ॥
যঃ প্রোদ্ধতস্ত্রিভুবনৈকমণেঃ ররাজ।
বৈদুর্য্যসংক্রম ইবাম্বরসাগরস্য ॥

নেপথ্যে

বাবা, এটা কে ?

সূত্র। হাঁ, বুঝেছি—

'ভোঃ' শব্দ শুনে বুঝতে পাচ্ছি এ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কোনও ভীতিহীন পাপিষ্ঠ তাঁহাকে পীড়া দিচ্ছে।

নেপথ্যে

বাবা, এটা কে ?

সূত্র। এবার ঠিক বুঝেছি। মধ্যম পাণ্ডবের পুত্র হিড়িম্বার গর্ভজাত (হিড়িম্বারণি সম্ভূত) রাক্ষসাগ্নি শক্রহীন ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাচ্ছে। হায়, পত্নীপুত্রসমন্বিত ব্রাহ্মণের কি দুরবস্থা ! ব্রাহ্মণ—

নিজে বৃদ্ধ, তরুণ ও পথশ্রান্ত পুত্রগণ কর্তৃক পরিবৃত, পত্নী সমন্বিত, আবার রাক্ষস কর্তৃক অনুসৃত। সধেনু বৃষ ব্যাঘ্র কর্তৃক অনুসৃত হলে যেরূপ আকুল হয় (এই ব্রাহ্মণও) ঠিক সেইরূপ আকুল হয়েছে।

[প্রস্থান]

[রাক্ষস কর্তৃক অনুসৃত তিনপুত্র ও কলত্র পরিবৃত (ব্রাহ্মণ) কেশবদাসের প্রবেশ।]

বৃদ্ধ। ওগো, এটা কে ?

(ইহার) কেশগুলি তরুণ রবিকরের ন্যায় বিকীর্ণ, পিঙ্গল ও আয়ত চক্ষু (দুটা) ভ্রূকুটি-আবরণে সমুজ্জ্বল, (ইহাকে দেখতে) তড়িৎ-দীপ্ত মেঘ খণ্ডের ন্যায়, এবং যুগসংহারে প্রবৃত্ত কণ্ঠসূত্রান্বিত মহাদেবের ন্যায়।

প্রথম। বাবা, এটা কে ?

(ইহার) চোখ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, বক্ষদেশ উন্নত ও বিস্তীর্ণ, কেশজাল স্বর্ণের ন্যায় কপিশবর্ণ, পরিধেয় কৌশেয় বস্ত্র পীতবর্ণ শরীরের রং একরাশি অন্ধকারের মত, দাঁতগুলি পাণ্ডুর ও বিকশিত, এবং তাহাকে মেঘাচ্ছন্ন (দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার) চন্দ্ররেখার ন্যায় দেখাচ্ছে !

দ্বিতীয়। বাবা, এটা কে ?

হস্তিশিশুর দাঁতের ন্যায় ইহার দাঁত, লাঙ্গলের ন্যায় ইহার নাক, হাতীর শুঁড়ের ন্যায় ইহার বাহু, নীল মেঘের ন্যায় ইহার রং, ইহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় এবং ত্রিপুরাসুরের পুর ধ্বংসোদ্যত মহাদেবের রোষের ন্যায় ভীষণ দেখাচ্ছে।

তৃতীয়। বাবা, এটা কে আমাদিগকে পীড়া দিচ্ছে ?

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠের (হিমালয়ের পক্ষে) বজ্র যেরূপ, পক্ষিগণের (পক্ষে) শ্যেন যেরূপ, পশুগণের পক্ষে সিংহ যেরূপ আমাদের পক্ষেও এই পুরুষ শরীরধারী মৃত্যুর ন্যায় (সেরূপ)।

ব্রাহ্মণী। আর্য্য, এটা কে আমাদিগকে পীড়া দিচ্ছে ?

ঘটোৎকচ। হে ব্রাহ্মণ, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

স্ত্রী পুত্র রক্ষায় শক্তিহীন ও ত্রস্ত হ'য়ে, আমার ভয়ে ধৈর্য্যহীন ও বলহীন হ'য়ে গরুড়ের পক্ষাগ্রপবনচালিত রোষ-বহ্নি-তীব্র সকলত্র, আর্ত্ত, ভুজঙ্গের ন্যায় কি পলায়ন করবে ?

হে ব্রাহ্মণ, পালাতে পারবে না, পালাতে পারবে না।

বৃদ্ধ। ব্রাহ্মণি, ভয় নেই। পুত্রগণ, ভয় নেই। এর কথা শুনে বোধ হয় (এর) বিবেচনা আছে।

ঘটোৎকচ। হায় কি দুঃখ !

আমি জানি সব জায়গায় ও সব সময়েই ভাল ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে পূজায় পাত্র। কিন্তু মায়ের আদেশে হঠকারীর ন্যায় আজ আমার এই অকার্য্য ও কত্তে হ'ল।

বৃদ্ধ। ব্রাহ্মণি, তোমার কি মনে নাই ভগবান্ জলক্লিন্ন মুনি বলেছিলেন, এই বনে রাক্ষসের ভয় আছে সাবধানে যেও। তাই এই ভয়ের উৎপত্তি হ'য়েছে।

ব্রাহ্মণী। আর্য্য, আপনাকে এখন যেন উদাসীন দেখছি।

বৃদ্ধ। আমি হতভাগ্য, এখন কি করি বল ?

ব্রাহ্মণী। চেঁচাই তবে।

প্রথম। মা, কার নাম করে চেঁচাবে ?

এ স্থান নির্জ্জন, এক রাশি অন্ধকারের ন্যায় পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা চারিদিক রুদ্ধ, পর্ব্বতের অবকাশ স্থানে মৃগ ও পক্ষী বাস করে। এই বন মুনিগণেরই বাসের যোগ্য।

বৃদ্ধ। ব্রাহ্মণি, ভয় নেই, ভয় নেই। এই বন মুনিগণের বাসের যোগ্য একথা শুনে আমার ত্রাস যেন চলে

হরেঃ পাদঃ—(১) বামনরূপী নারায়ণের পা ; (২)আকাশ। অসুরবধূহৃদয়াবসাদঃ—(১) বলি-পত্নীর হৃদয়ের অবসাদ জনক। (২) অসুররাজনাগণের হৃদয়ে অবসাদ জনক। প্রোদ্যতঃ—(১) উৎক্ষিপ্ত ; (২)বিবৃত। খড়্গ—(১) সাধারণ অর্থ ; (২) কোষ।

গেছে। আমার মনে হয় অনতিদূরে পাণ্ডবগণের আশ্রম। আর পাণ্ডবগণ

বৃদ্ধপ্রিয়, শরণাগতবৎসল, দীনগণের পক্ষাশ্রয়ী, শৌর্য্য যুক্ত। যাহারা ভাব ও চেষ্টায় ভয় জন্মায় তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড বিধান কর্ত্তে সমর্থ।

প্রথম। বাবা, এখানে পাণ্ডবগণ বোধ হয় নেই।

বৃদ্ধ। পুত্র, তুমি জানলে কিরূপে?

প্রথম। তাঁদের আশ্রম থেকে আগত জনৈক ব্রাহ্মণের কাছে শুনেছি শতকুম্ভ যজ্ঞ কর্ত্তে তাঁরা মহর্ষি ধৌম্যের আশ্রমে গেছেন।

বৃদ্ধ। হায়! তাহলে আমাদের আর রক্ষা নেই।

প্রথম। বাবা, সকলে যায় নাই। আশ্রম রক্ষার জন্য মধ্যম পাণ্ডব রয়েছেন বলে শুনেছি।

বৃদ্ধ। যদি তাই হয় তবে সকলেই রয়েছেন মনে কর্ত্তে হবে।

প্রথম। (কিন্তু) তিনি এখন ব্যায়াম করার জন্য দূরে গিয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে।

বৃদ্ধ। হায়, তা হ'লে আর আমাদের আশা কি? পুত্র, একেই শান্ত কর্ত্তে চেষ্টা করব।

প্রথম। পরিশ্রমে কি প্রয়োজন?

বৃদ্ধ। পুত্রই প্রার্থনার বিষয়। আচ্ছা, দেখ্ছি। ওহে, আমাদের মুক্তি হবে না?

ঘটোৎকচ। প্রতিজ্ঞা কল্লেই মুক্তি হয়।

বৃদ্ধ। কি প্রতিজ্ঞা?

ঘটোৎকচ। আমার মা আছেন। মা আমায় বলেছেন, "পুত্র, আমার উপবাস কষ্ট দূর করবার জন্য এই বন থেকে একজন মানুষ খুঁজে আন।" তার পরই আপনার সঙ্গে আমার দেখা।

(যদি) পতিব্রতা পত্নী ও দুই পুত্রের সঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে চাও তা'হলে বলাবল বুঝে এক পুত্র বিসর্জ্জন দাও।

বৃদ্ধ। হায়, পাপিষ্ঠ রাক্ষস!

হায়, আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি! আমি কি শুনলুম! চরিত্রবান্ পুত্রকে রাক্ষসের মুখে দিয়ে আমি কেমন করে শান্তি লাভ করব?

ঘটোৎকচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার অনুরোধ শুনেও যদি এক পুত্র না দাও তা'হলে মুহূর্ত্তমধ্যে পত্নীর সহিত তোমাদিগকে বিনষ্ট করব।

বৃদ্ধ। এটাই দেখ্ছি আমার কর্ত্তব্য—

আমার দেহ যজ্ঞাদি দ্বারা কৃতকৃত্য, আবার বার্দ্ধক্যে জর্জ্জরিত সুতরাং পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ বিধি অনুসারে সংস্কৃত এই দেহ রাক্ষসাগ্নিতে আহুতি দেব।

ব্রাহ্মণী। আর্য্য, তা হবে না। পতিব্রতার একমাত্র ধর্ম্ম পতি। সুতরাং আমার দেহের বিনিময়ে এই শরীরের উপযুক্ত ফল লাভ করব এবং (পতিকুলও) রক্ষা করব।

ঘটোৎকচ। আমার মা স্ত্রীলোক চান না।

বৃদ্ধ। আমিই তোমার অনুগমন করব।

ঘটোৎকচ। যাও, সরে যাও, তুমি বৃদ্ধ।

প্রথম। বাবা, আমার একটু বলবার আছে।

বৃদ্ধ। পুত্র, বল।

প্রথম। আমার প্রাণের বিনিময়ে আমি গুরুজনের প্রাণ রক্ষা করব। বংশ রক্ষার্থ আপনি আমাকে ত্যাগ করুন।

দ্বিতীয়। আর্য্য, তা হবে না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই কুলে শ্রেষ্ঠ, আবার জ্যেষ্ঠ (পুত্রই) পিতার প্রিয়। সুতরাং আমিই যাব। আপনি গুরুলোকের নির্দেশ পালন করুন।

তৃতীয়। ভ্রাতৃগণ, তা হবে না।

ব্রহ্মবাদিগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার ন্যায় (পূজ্য) বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং গুরুলোকের প্রাণরক্ষা করা আমারই কর্ত্তব্য।

প্রথম। বৎস, তা হবে না।

পিতা বিপন্ন হলে জ্যেষ্ঠ পুত্রই তাঁকে উদ্ধার করে; সুতরাং পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকেই যেতে হবে।

বৃদ্ধ। হাঁ, বড় ছেলেই পিতার প্রিয়তম, সুতরাং তাকে আমি রাক্ষসের হাতে দিতে পারি না।

ব্রাহ্মণী। আর্য্য, আপনি যেরূপ জ্যেষ্ঠকে প্রিয়তম মনে করেন আমিও তেমনি কনিষ্ঠকে প্রিয়তম মনে করি।

দ্বিতীয়। পিতার বিপদ, এখন কারই বা প্রিয়?

ঘটোৎ। আমি প্রীত হ'য়েছি। শীঘ্র এস।

দ্বিতীয়। আমি আত্মজীবন দান করে পিতার প্রাণ রক্ষা কর্তে পেরেছি বলে ধন্য হয়েছি। মহৎ ব্যক্তিরা বন্ধুস্নেহ অপেক্ষা যমের স্নেহই প্রিয়তর (দুর্লভ) মনে করেন।

ঘটোৎ। আহা, এই ব্রাহ্মণের ছেলের বন্ধুস্নেহ কত গভীর!

দ্বিতীয়। বাবা, অভিবাদন কচ্ছি।

বৃদ্ধ। পুত্র, এস, এস।

হে পিতৃবৎসল, আত্মপ্রাণ দ্বারা পিতার প্রাণ রক্ষা করে অবিহিত আত্মা দ্বারা যাহা লাভ করা যায় না এরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও।

দ্বিতীয়। অনুগৃহীত হলুম। মা, অভিবাদন কচ্ছি।

ব্রাহ্মণী। বৎস, চিরজীবী হও।

দ্বিতীয়। অনুগৃহীত হলুম। আর্য্য অভিবাদন কচ্ছি।

প্রথম। বৎস, এস, এস।

তুমি শোভন গুণযুক্ত। আমাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর। তোমার কীর্ত্তি দ্বারা বন্ধুরাও আলিঙ্গিতা হইবে।

দ্বিতীয়। অনুগৃহীত হলুম।

তৃতীয়। আর্য্য, অভিবাদন কচ্ছি।

দ্বিতীয়। স্বস্তি।

তৃতীয়। অনুগৃহীত হলুম।

দ্বিতীয়। ওহে পুরুষ, আমার কিছু বলবার আছে।

ঘটোৎকচ। শীঘ্র বল।

দ্বিতীয়। এই বনের অবকাশে একটা জলাশয়ের মত কি দেখছি না! সেখানে আমার ভাবী পরলোকে তৃপ্তি লাভের জন্য তর্পণ করব।

ঘটোৎকচ। তোমার মনের বল খুব বেশী দেখছি। যাও। কিন্তু মার যে খাওয়ার সময় চলে যাচ্ছে। শীঘ্র এস কিন্তু।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়। বাবা, এই আমি যাচ্ছি।

বৃদ্ধ। হায়! হায়! তোকে চুরি করে নিয়ে গেল! চুরি করে নিয়ে গেল!

আমার মনোজ্ঞ বংশপর্ব্বতের তিনটি চূড়া ছিল। কিন্তু তার মাঝের শৃঙ্গটি ভেঙ্গে গিয়েছে। আমার মন বড় ব্যথিত হচ্ছে।

হা পুত্র! তুমি কোথায় গেলে?

তুমি তরুণ, তোমার রূপ এবং কান্তিও তোমার তারুণ্যের অনুরূপ। তুমি নিয়মপরতন্ত্র, অধ্যয়নাসক্ত। হস্তিদন্ত-ভগ্ন পুষ্পিত তরুর ন্যায় তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হলে!

ঘটোৎকচ। ব্রাহ্মণের ছেলে বিলম্ব কর্তে লাগল যে! মার খাওয়ার সময় চলে যাচ্ছে। কি করি! আচ্ছা, এই কথা যাক। ওহে ব্রাহ্মণ, তোমার ছেলেকে ডাক।

বৃদ্ধ। তোমার কথা রাক্ষসকেও অতিক্রম করেছে!

ঘটোৎকচ। রাগ করেন কেন? শান্ত হন, শান্ত হন। এটা আমার প্রকৃতিগত দোষ। আচ্ছা আপনার ছেলের নাম কি?

বৃদ্ধ। একথাও আমি শুনতে পারি না।

ঘটোৎকচ। হাঁ, ঠিক কথাই বটে। ওহে ব্রাহ্মণ কুমার তোমার ভাইর নাম কি?

প্রথম। তপস্বী মধ্যম।

ঘটোৎকচ। হাঁ, মধ্যমই তার উচিত নাম বটে। যাই আমিও। ওহে মধ্যম, মধ্যম, শীঘ্র এস।

(ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম। একি, এটা কার স্বর?

শত শত পক্ষি কূজিত, শ্বিপদসঙ্কুল, এই বৃক্ষবহুল নিবিড় বনে (কে) উচ্চ কণ্ঠে শব্দ কচ্ছে। ধনঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ এই স্বর শুনে আমার মন ব্যথিত হচ্ছে।

ঘটোৎকচ। ব্রাহ্মণের ছেলে বিলম্ব কচ্ছে যে! মায়ের

খাওয়ার সময়ও চলে যাচ্ছে। কি করি? আচ্ছা, উচ্চকণ্ঠে ডাকি। ওহে মধ্যম, শীঘ্র এস।

ভীমসেন। এই বনাবকাশে মধ্যম, মধ্যম চীৎকার করে আমার ব্যায়ামের ব্যাঘাত কচ্ছে? আচ্ছা দেখি। (ঘুরিয়া দেখিয়া) আহা এই লোকটি দেখতেও বেশ!

(ইহার মুখ) সিংহের (মুখের) মত, দাঁত সিংহের (দাঁতের) মত। মধু দৈত্যের (চোখের) মত ইহার চোখ। ইহার কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ-গম্ভীর, ভ্রূ পিঙ্গল, নাসিকা শ্যেন পক্ষীর (ঠোঁটের) মত, হস্তীর হনুর ন্যায় হনু, কেশজাল সুদীর্ঘ ও বিশ্লিষ্ট, বক্ষ সুবিস্তৃত, মধ্যদেশ কঠিন, গজরাজের ন্যায় গতি, বাহুযুগল পীন ও লম্বিত। ইহার দেহে বিপুল বল। এ নিশ্চয়ই লোকবীরের পুত্র। আর রাক্ষসীর গর্ভে যে ইহার জন্ম একথাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

ঘটোৎকচ। ব্রাহ্মণের ছেলে বিলম্ব কচ্ছে যে। মার খাওয়ার সময়ও চলে যাচ্ছে। এখন কি করি। আচ্ছা চীৎকার করে ডাকি। ওহে মধ্যম, মধ্যম, শীঘ্র এস।

ভীমসেন। ওহে, এই যে এসেছি।

ঘটোৎকচ। এত ব্রাহ্মণের ছেলে নয়। এ লোকটার চেহারা ত বড় সুন্দর! ইহার

আকৃতি সিংহের ন্যায়, বাহু কনক তালের মত, মধ্যদেশ গরুড় পক্ষের ন্যায় বৃত্তানুপূর্ব্ব। বিকশিত পদ্ম দলের ন্যায় চক্ষু দেখে বিষ্ণু বলে মনে হয়। বন্ধুর ন্যায় এ ব্যক্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছে।

ওহে মধ্যম, আমি তোমাকে ডাকছি।

ভীমসেন। তাইত আমিও এসেছি।

ঘটোৎকচ। কি! তুমি ও কি মধ্যম?

ভীমসেন। আর ত কেউ নই।

আমি অবধ্যগণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) মধ্যম, গর্ব্বিতগণের মধ্যেও আমাকে ধরা হয়। আমি বাড়ীতেও মধ্যম, ভ্রাতৃগণেরও মধ্যম।

ঘটোৎকচ। হবে।

ভীমসেন। আবার,

আমি পঞ্চভূতের মধ্যে মধ্যম (তেজ), পৃথার পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম, * জন্ম ধল্লেও আমি মধ্যম। আর সকল কাজেই আমি মধ্যম। †

বৃদ্ধ। মধ্যম বলে ডাকাতে তাঁকে মধ্যম পাণ্ডব বলেই বোধ হচ্ছে। ইনি দর্পের পক্ষে মৃত্যুরূপে এবং আমাদের উদ্ধারার্থ এখানে এসেছেন।

(প্রবেশ করিয়া)

মধ্যম। এই সরোবরে আচমন করে পদ্মপত্রোজ্জ্বল এবং পরলোকে দুর্লভ এই জল নিজেই নিজকে দান করেছি।

(অগ্রসর হইয়া) ওহে, আমি এসেছি।

ঘটোৎকচ। তুমি এই এলে। মধ্যম, মধ্যম এদিকে, এদিকে

বৃদ্ধ। (ভীমের নিকট আসিয়া) ওহে মধ্যম, এই ব্রাহ্মণ বংশ রক্ষা কর।

ভীমসেন। ভয় নেই, ভয় নেই। মধ্যম আমি আপনাকে অভিবাদন কচ্ছি।

বৃদ্ধ। বায়ুর ন্যায় দীর্ঘায়ু হও।

ভীমসেন। অনুগৃহীত হলুম। আর্য্য, আপনার ভয়ের কারণ কি?

বৃদ্ধ। শোন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পূর্ব্বাধিষ্ঠিত কুরুজঙ্গলে যুপ গ্রামে আমার বাড়ী। আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম কেশবদাস, আমার মাঠরস গোত্র ও কল্পশাখা। আমার গ্রামের উত্তর দিকে উদ্যামক গ্রামে আমার মাতুল বাড়ী। আমার মাতুলের নাম যজ্ঞবন্ধু, তাঁহার কৌশিকস গোত্র। তাঁহার ছেলের উপনয়ন উপলক্ষে সকলত্র

---

* পার্থিবানাং চ মধ্যম—রাজগণের মধ্যে মধ্যম (অপরার্থ)।

† সর্ব কার্য্যেষু মধ্যমঃ—যদ্যহং নোত্তমস্তথাপি মধ্যম, কথঞ্চিৎ সর্ব কার্য্যকরণকুশল ইত্যর্থঃ।

চলেছি।

ভীম। আপনার পথ নির্ব্বিঘ্ন হউক। তার পর—

বৃদ্ধ। তার পর কৃষ্ণ মেঘদেহ, পদ্ম দলের ন্যায় আয়ত চক্ষু, সিংহ গতি, প্রকাণ্ড দশন যে রাক্ষস নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করে তোমাদের সম্মুখেই সেই রাক্ষস সপরিজন আমাকে বধ করিবার জন্য উপস্থিত হ'য়েছে।

ভীম। বটে, এই (রাক্ষসই) ব্রাহ্মণের পথে বিঘ্ন ঘটিয়েছে! আচ্ছা ওকে শাস্তি দিতে হবে। ওহে দাঁড়াও।

ঘটোৎকচ। এই যে দাঁড়িয়েছি।

ভীম। ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করেছ কেন?

নক্ষত্ররূপ পুত্রগণ পরিবৃত, পত্নীর কমনীয় প্রভাযুক্ত এই বৃদ্ধ বিপ্রচন্দ্রের পক্ষে তুমি রাহুর ন্যায় এসে উপস্থিত হয়েছ দেখছি।

ঘটোৎকচ। হাঁ, তাই বটে। রাহুই বটে।

ভীমসেন। আঃ, এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ লৌকিক ব্যবহার জানেন না, তিনি পত্নীপুত্রপরিবৃত, আবার ব্রাহ্মণ অপরাধী হ'লেও অবধ্য সুতরাং তুমি তাঁকে ছেড়ে দাও।

ঘটোৎকচ। না ছাড়ব না।

ভীমসেন। (আত্মগত) এ না জানি কার ছেলে?

এ আমার সকল ভাইদেরই গুণ চুরি করেছে দেখছি; এ কে? আবার এর বালকোচিত বীরত্ব দেখে সৌভদ্রের কথা আমার মনে পড়ছে।

(প্রকাশ্যে) ওহে, ছেড়ে দাও বলচি।

ঘটোৎকচ। না, ছাড়ব না।

একে মার আজ্ঞায় ধরেছি, আমার পিতাও যদি ছেড়ে দিতে আজ্ঞা করেন তাও ছাড়ব না।

ভীমসেন। (আত্মগত) কি? মার আজ্ঞা! এই বেচারা দেখছি গুরুলোকের শুশ্রূষা পরায়ণ।

মনুষ্যের পক্ষে মাতা শ্রেষ্ঠ দেবতা, মার আজ্ঞায়ই আমাদের এই দশা।

(প্রকাশ্যে) ওহে, আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে।

ঘটোৎকচ। শীঘ্র বল।

ভীম। তোমার মার নাম কি?

ঘটোৎকচ। আমার মার নাম হিড়িম্বা রাক্ষসী।

আকাশ যেরূপ পূর্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক সনাথ হয় কৌরবকুলপ্রদীপ মহাত্মা পাণ্ডব কর্ত্তৃক তিনিও সনাথা।

ভীম। (আত্মগত) বটে। এ হিড়িম্বার পুত্র। এর গর্ব্ব উপযুক্তই বটে।

ইহার রূপ, বল ও গুণ পিতৃসদৃশ কিন্তু লোকের প্রতি এ যে নিষ্করুণ! ইহার মন কেমন? ওহে, ছেড়ে দাও বলছি।

ঘটোৎকচ। না ছাড়ব না।

ভীম। ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও। আমি ওর সঙ্গে যাব।

দ্বিতীয়। না না আপনি এরূপ করবেন না।

পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য আমি পূর্ব্বেই আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করেছি। আপনি রূপগুণযুক্ত যুবক, আপনি বেঁচে থাকুন।

ভীমসেন। আর্য্য, তা হ'তে পারে না। আমি ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন। ব্রাহ্মণেরা পূজ্যতম। সুতরাং আমার শরীরের বিনিময়ে ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করব।

ঘটোৎকচ। বটে। এব্যক্তি ক্ষত্রিয়। তাই এত অহঙ্কার। বেশ, একেই মেরে নেওয়া যাবে। আমাকে বাধা দেয় এ লোকটা কে?

ভীম। কেন, আমি।

ঘটোৎ। কি, তুমি?

ভীম। হাঁ, আমি।

ঘটোৎ। বেশ; তাহ'লে তুমিই আমার সঙ্গে এস।

ভীমসেন। বেশ, যার শরীরের বল খুব বেশী তার পিছনে যাব না। যদি শক্তি থাকে তবে জোর করে আমাকে লইয়া চল।

ঘটোৎকচ। তুমি কি আমাকে জান না?

ভীমসেন। আমার পুত্রবলে জানি।

ঘটোৎকচ। কি! কি! আমি তোমার পুত্র!

ভীমসেন। রাগ হয় কেন? রাগ করো না। সকল লোকই ক্ষত্রিয়দের পুত্র ব'লে অভিহিত হয়। এ জন্যই পুত্র বলেছি।

ঘটোৎকচ। লোকে ভয় পেলে যে উপায় অবলম্বন করে এখন তুমি তাই করেছ।

ভীমসেন। আমি সত্য করে বল্‌ছি ভয় কাকে বলে জানি না। তোমার কাছে সেটা জানতে চাচ্ছি। এই ভয়টা দেখতে কেমন বল। তার পর ভালমন্দ বুঝে যথাকর্ত্তব্য করব।

ঘটোৎকচ। আচ্ছা তোমাকে ভয় কি বুঝিয়ে দিচ্ছি, অস্ত্র লও।

ভীমসেন। অস্ত্র! অস্ত্র ত নিয়েই আছি।

ঘটোৎকচ। কি রকম?

ভীমসেন। রিপু নিগ্রহে সর্ব্বদা নিযুক্ত, স্বর্ণস্তম্ভের মত আমার দক্ষিণ বাহুই আয়ুধ।

ঘটোৎকচ। একথা আমার পিতার পক্ষেই শুধু খাটে।

ভীমসেন। ভীম নামে ইনি কে?

বিশ্বকর্ত্তা শিব, কৃষ্ণ, শক্র, শক্তিধর (কার্ত্তিকেয়), যম—এদের মধ্যে তোমার পিতা কার মত?

ঘটোৎকচ। এদের সকলেরই মত।

ভীম। এটা মিথ্যা কথা।

ঘটোৎকচ। কি কি! মিথ্যা! তুমি আমার পিতাকে নিন্দা কচ্ছ। বেশ, এই মোটা গাছটা তুলেই মার্‌ব। কি এটা দিয়ে তো মারতে পাল্লুম না, কি করি? বেশ! এই গিরিশৃঙ্গটা ভেঙ্গেই মারব।

এই গিরিশৃঙ্গ মার্‌লে এটা (তোমার) প্রাণ নিয়ে যাবে।

ভীম। বন্য হস্তী রুষ্ট হয়েও বনে ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে না।

ঘটোৎকচ। কি এতেও মার্‌তে পাল্লুম না! কি করি। আচ্ছা আমি ভীমসনের পুত্র, পবনের পৌত্র, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস, বাহুযুদ্ধে আমার সমান কেউ নেই।

(উভয়ের বাহুযুদ্ধ)

ঘটোৎকচ। (ভীমসেনকে বাঁধিয়া)

দৃঢ়পাশে পীড়িত হাতীর ন্যায় আমার বাহুছায়া পীড়িত হয়ে এখন আমার বাহুর শক্তি লঙ্ঘন করে আর পালাবে কোথায়?

ভীমসেন। (আত্মগত)

কি এ আমাকে বেঁধে ফেল্লে! ওহে সুযোধন, শত্রুপক্ষ বাড়্‌ছে! বেঁচে থাক। (প্রকাশ্যে) ওহে, সাবধান হও।

ঘটোৎকচ। হাঁ, সাবধান হয়েই আছি।

ভীমসেন। (বাহুযুদ্ধের বন্ধন খুলিয়া)

এখন দর্প ত্যাগ কর। তোমার বলবীর্য্য দেখে নিয়েছি! বাহুযুদ্ধে আমার অবসাদ হয় না।

ঘটোৎকচ। কি এতেও ত ওকে মারতে পাল্লুম না! কি করা যায়? আচ্ছা, আমি ত মার কাছ থেকে মায়াপাশ শিখেছি! মায়াপাশে বেঁধেই ওকে নেব। জল কোথায়? হে পর্ব্বত, জল দাও! এই যে জলধারা বয়ে যাচ্ছে! (আচমনান্তে মন্ত্রপাঠ) ওহে তুমি মায়াপাশে বদ্ধ হ'য়ে বিবশ হবে না। উৎসবে রজ্জুবদ্ধ শক্রধ্বজের ন্যায় শোভা পাবে।

(মায়াপাশে বন্ধন)

ভীমসেন। কি! মায়াপাশে বদ্ধ হলুম! কি করি? আমি মহেশ্বরের বরে মায়াপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার মন্ত্র শিখেছি। তাই জপ করব। আচ্ছা তাই করব। ওহে ব্রাহ্মণ কুমার! কমণ্ডলুতে করে জল আন।

বৃদ্ধ। এই যে জল।

(ভীমসেন মন্ত্রপাঠ করিয়া মায়াপাশ মোচন করিল)

ঘটোৎকচ। একি মায়াপাশ পড়ে গেল! এখন কি করি? আচ্ছা দেখি। ওহে তোমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

ভীমসেন। কি প্রতিজ্ঞা! আচ্ছা স্মরণ করেছি। যাও আগে

(উভয়ের পরিক্রমণ)

বৃদ্ধ। বৎসগণ, কি করব? এই যে বৃকোদর যাচ্ছেন। উগ্র বাহুবলযুক্ত ও জলদুগ্ররূপ এই রাক্ষসকে আক্রমণ করে বৃষ যেমন লীলাভরে আষাঢ়ধারা তুচ্ছ করে গমন করে ভীমসেনও সেরূপে ধীরে ধীরে গমন কচ্ছেন।

ঘটোৎকচ। এখানে থাম। আগে আমি গিয়ে মাকে খবর দিব।

ভীমসেন। বেশ, যাও।

ঘটোৎকচ। (অগ্রসর হইয়া) মা, অভিবাদন কচ্ছি। আমি ঘটোৎকচ। তুমি অনেকক্ষণ থেকে মানুষ খাবে বলে বসে আছ। আমি মানুষ এনেছি।

(হিড়িম্বার প্রবেশ)

হিড়িম্বা। বৎস, চিরজীবী হও। কি রকম মানুষ এনেছ?

ঘটোৎকচ। মা, তাকে কথায় মানুষ বলা যায়, কিন্তু পরাক্রমে মানুষ বলা যায় না।

হিড়িম্বা। তবে কি ব্রাহ্মণ?

ঘটোৎকচ। না, ব্রাহ্মণ নয়।

হিড়িম্বা। তবে কি স্থবির?

ঘটোৎকচ। না, বৃদ্ধ নয়।

হিড়িম্বা। বালক?

ঘটোৎকচ না, বালকও নহে।

হিড়িম্বা। তা হ'লে একে দেখব।

(উভয়ের গমন)

হিড়িম্বা। এই মানুষটিই কি এনেছ?

ঘটোৎকচ। মা, এ কে?

হিড়িম্বা। খেপা, ইনি দেবতা!

ঘটোৎকচ। কার দেবতা?

হিড়িম্বা। তোমারও আমার।

ঘটোৎকচ। প্রমাণ কি?

হিড়িম্বা। এই প্রমাণ। আর্য্যপুত্রের জয় হউক।

ভীমসেন। এ আবার কে? একি! এ যে দেবী হিড়িম্বা! আমরা রাজ্যহারা হ'য়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তুমি দয়াপরবশ হ'য়ে আমাদের দুঃখ দূর করেছ। হিড়িম্বে, এসব কি ব্যাপার?

হিড়িম্বা। (কাণে কাণে) এই ব্যাপার।

ভীমসেন। রাক্ষসের কাছ থেকে আর কি শিষ্টাচার আশা করা যেতে পারে?

হিড়িম্বা। ওরে খেপা, পিতাকে অভিবাদন কর।

ঘটোৎকচ। পিতঃ, ধার্ত্তরাষ্ট্র-বন-দবাগ্নি আমি ঘটোৎকচ আপনাকে অভিবাদন কচ্ছি, পুত্রের চপলতা ক্ষমা করবেন।

ভীমসেন। পুত্র, এস, তোমার এই ব্যতিক্রম শোভনই হয়েছে। (আলিঙ্গন করিয়া) তোমার পিতার হৃদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রবনদবাগ্নি পুত্রেরই অপেক্ষা কচ্ছে। পুত্র, অতিবলশালী হও।

ঘটোৎকচ। অনুগৃহীত হলুম

বৃদ্ধ। তাইত, এই যে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচ।

ভীমসেন। পুত্র, আর্য্য কেশবদাসকে অভিবাদন কর।

ঘটোৎকচ। ভগবন্, অভিবাদন কচ্ছি।

বৃদ্ধ। পিতার ন্যায় গুণ ও কীর্ত্তিসম্পন্ন হও।

ঘটোৎকচ। অনুগৃহীত হলুম।

বৃদ্ধ। বৃকোদর, তোমার (কৃপায়) আমার পরিবার রক্ষা পেল, তোমারও বংশের উদ্ধার হ'ল। আমরা তবে আসি।

ভীমসেন। আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত শুভ হয়েছে। অদূরেই আমাদের আশ্রম। সেখানে বিশ্রাম করে যাবেন।

বৃদ্ধ। আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েই যথেষ্ট আতিথ্য করেছেন, এখন আসি।

ভীমসেন। আচ্ছা তবে পত্নীর সহিত (নির্বিঘ্নে) গমন করুন। আবার যেন দেখা পাই।

বৃদ্ধ। বেশ, ভালকথা।

[সকলত্রপুত্র কেশবদাসের প্রস্থান।]

ভীমসেন। হিড়িম্বে, এদিকে। বৎস, ঘটোৎকচ এদিকে। আর্য্য কেশবদাসকে আশ্রম স্থানের দ্বার পর্য্যন্ত অনুগমন করি এস।

(ভরত বাক্য)

নদী হইতে যেমন সমুদ্র, হবনীয় দ্রব্য হইতে যেমন অগ্নি, মন যেমন ইন্দ্রিয় গণের নেতা সেরূপ ভগবান্ উপেন্দ্র আমাদের প্রভু।

[সকলের প্রস্থান।

মধ্যমব্যাযোগোঽবসিতঃ

শুভং ভূয়াৎ।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

ময়মনসিংহের গ্রাম্য গীতি।

বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই গ্রাম্যগীতের প্রচলন আছে। উহাদের ভাষা গ্রাম্য ও প্রাদেশিক ভাবাপন্ন। ময়মনসিংহের গ্রাম্য গীত এক প্রকার নহে; নানাভাবে, নানাসময় ঐ সকল গীত হইয়া থাকে। এই সকল গান করিয়া সাধারণ ও কৃষক শ্রেণীর লোকেরা আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। ভদ্র শ্রেণী অপেক্ষা ইহারা মনের আনন্দে ও সুখে আছে সন্দেহ নাই।

বৎসরের প্রথম ভাগে ও পূর্ব্ব বৎসরের শেষ হইতে জারি গান আরম্ভ হয়। উহা অধিকাংশই কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আউষ ও পাট ক্ষেতে যখন হাল বাহিয়া দেয় সেই সময় পর্য্যন্তই জারি প্রচলন থাকে, ইহার পর জারি অনেক স্থানেই আর হয় না। তার পর বর্ষা আসিয়া পড়িলে ময়মনসিংহের পূর্ব্বান্তভাগে নৌকাদৌড় হয়। এই নাও দৌড়ের গানই হইল জারি। জারি সে অঞ্চলে এই সময় প্রচলিত হয়। জারি গানটা মুসলমানী চরিত্রের ভাব লইয়া। ইহা একটা উপাখ্যান্ কথা। জারি ও হইতে থাকে আর ইহার মধ্যে পদ্মাপুরাণ বা পদ্মার গীতি আসিয়া পড়ে। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত পদ্মার গীত চলে। পদ্মার কাহিনী নারায়ণ দেব ও দ্বিজ বংশীদাস কর্ত্তৃক রচিত পদ্মাপুরাণে উক্ত হইয়াছে। এত দিন ঐ সকল পুস্তক হস্ত লিখিত ছিল, সম্প্রতি তাহাদের কৃত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। বিষহরি পূজা করিয়া শ্রাবণী সংক্রান্তিতে পদ্মাপুরাণ শেষ করিতে হয়। ময়মনসিংহের পূর্ব্বাঞ্চলে ও শ্রীহট্টে ইহার বিশেষ আদর।

পদ্মপুরাণ শেষ হইলেই কবির ঢোল বাজিয়া উঠে। কবি গান এই সময় আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীপূর্ণিমা ও দীপান্বিতা পর্য্যন্ত খুব চলে। বৎসরের অন্যান্য সময়ে বারোয়ারি কালী পূজা ইত্যাদিতেও কবিগান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কবিগানে বড়ই কবিত্ব ছিল, এখনও যে না আছে তাহা নহে, তবে ক্রমে কবিগানের আদর শিক্ষিত সমাজ হইতে লোপ পাওয়ার মধ্যে গিয়াছিল, এখন আবার কবির আদর ক্রমে বাড়িতেছে। কবির সরকারেরা স্বীয় উৎপন্ন বুদ্ধি প্রভাবে আসরে বসিয়াই অবস্থা মতে গান তৈয়ার করিয়া গাহিয়া থাকে, ইহা বড়ই ক্ষমতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

যখন কবিগান শেষ হইয়া গেল তখন কার্ত্তিক ব্রতের সং-এর গান, রাম দমন প্রভৃতি এবং ভাসান যাত্রা আসিয়া পড়িল। তখন সঙ্গে ঘাটুগানও চলিতে থাকে। ঘাটুগান বর্ষাকালে নাও দৌড়েও হইয়া থাকে। নাও দৌড় কেমন করিয়া হয় তা বোধ হয় অনেকের জানা নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের গৃহস্থেরা দৌড়ের নৌকা ক্রয় করিয়া অন্য নৌকার সঙ্গে জেদ করিয়া দৌড় চালায়। যে নৌকা অগ্রগামী হয় তাহার বাহবা পড়িয়া যায়। যেমন ঘোড় দৌড় হয়, নাও দৌড় ও সেই ভাবেরই। এক একটা নৌকায় একটা করিয়া ঝাঁজ বা কাঁসী থাকে, নৌকা দৌড়ের সময় সেই ঝাঁজ বা কাঁসী বাজাইয়া উৎকট শব্দে গায়ক ও বাহক দাঁড়ীদিগকে উৎসাহিত করা হয়; আর যখন অতি পরিশ্রমে গায়ক ও বাহক দাঁড়ীগণ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যায় তখন কোন বাসন দ্বারা উহাদিগের ঘর্ম্মাক্ত দেহে জল ছিটাইয়া দিয়া শীতল করা হয়। প্রকাণ্ড হাওর, বিল প্রভৃতিতে নাও দৌড় হয়। এক এক হাওড়ে ছয় সাতশত নৌকা আসিয়া জোটে। পূর্ব্বাঞ্চলের কৃষকদের তখন আর কর্ম্ম থাকে না। বাওয়া ধান্যই উহাদের সম্বল, জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাওয়া বাড়িতে থাকে, জলের সঙ্গে যেন জেদ করিয়া ফোপাইয়া লাফাইয়া বাড়িয়া উঠে। কৃষকে

তখন কি আনন্দ!

ভাসান যাত্রা ইত্যাদি চলিবার পরই হোলি বা হুড়ী গান। দোলের মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দোলের দিন ইহার শেষ। নানাদল একত্র হইয়া জয় পরাজয়ের গান করিয়া থাকে। হোলি গান কৃষ্ণ ও রাধিকা বিষয়ক প্রেম পর্ব্ব লইয়া। হোলিগানও যখন তখন তৈয়ার করিয়া গীত হইয়া থাকে। হোলি শেষ হইলেই জারি তাহার স্থান অধিকার করে।

এই সকল গান অধিকাংশই কৃষ্ণ বিষয়ক কিন্তু জারি গান মুসলমানী ব্যাপার লইয়া। কৃষ্ণ বিষয়ক গীত মুসলমানেরাও গাহিয়া থাকে। এ বিষয় মুসলমানদের বিলক্ষণ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। হোলি শেষ হইলেই জারি হয়। জারিটা বৎসরের শেষ ও পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত এক মাস, দুইমাস পর্য্যন্ত চলে। জারির সঙ্গে কোন উৎপন্ন বুদ্ধির দরকার নাই। যেরূপ গান বাঁধা থাকে তাহাই প্রায় গীত হয়, তবে কোন কোন ভাল গায়ক পরিবর্ত্তন করিয়াও লয়।

ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে সুসঙ্গ পরগণায় (গারো পাহাড়ের নীচ পর্য্যন্ত) গারো জাতির বাস। ইহারা পৌষ মাসে 'পাবন' নামক পর্ব্ব করে। তখন তাহারা মদ খাইয়া নেশা করে আর খোল বা ঢোলক বাজাইয়া গান করে। ইহাও প্রায় একমাস চলে। এই গান তাহারা গারো ভাষায় করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের একটা বিশিষ্ট উৎসব।

এখন 'অন্ন চিন্তা চমৎকার' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল শ্রেণীর লোকেরই অন্ন সমস্যা, জীবন সংগ্রামে সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে ব্যস্ত। সুতরাং আমোদ, আহ্লাদ, গীত বাদ্যে যোগ দেওয়ার অবসর এখন সকল শ্রেণীরই প্রায় লোপ হইয়া আসিতেছে।

আর একটা গান আমাদের দেশে চলিত আছে। উহার নাম বাউলা। বাউলা সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ স্থলে সারা রাত্রি হইয়া থাকে। প্রায় সকল স্থলেই বাউলা গীতে গাঁজার আড্ডা হইয়া থাকে। ইহার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, সব মাসেই গীত হয়। বাউলা গান আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া। ফিকির চাঁদের গানই বেশী গীত হয়।

পৌষের সংক্রান্তিতে বড় বড় মাঠে কুস্তি খেলা, ঘোড় দৌড় ও ষাঁড়ের লড়াই হইয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত এই সকল ক্রীড়া হয়। যখন যে স্থানে এই সকল ক্রিয়া হইবে তখন হাটে ঢোল দিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লোক জমায়েত করা হয়। এই উপলক্ষে প্রায়ই মারামারি কিলাকিলি পর্য্যন্ত হয়। এই প্রকার আমোদে সাধারণ ও কৃষক শ্রেণীর জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে।

দুর্গা ও কালী পূজা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, রাস পূজা প্রভৃতিতে যাত্রা গান হইয়া থাকে। বিবাহাদি উৎসবেও যাত্রাভিনয় হয়। সাধারণ লোকেরা দল বাঁধিয়া এই সকল গীতাভিনয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া থাকে। যাত্রাগানের অনুকরণেই ভাসান যাত্রা ও রাম দমন। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে রামায়ণ গীত ও গাজির কীর্ত্তন হইয়া থাকে। হিন্দুরা রামায়ণ গান করে ও মুসলমানেরা গাজির গান করে। মুসলমানদিগের গান করা বা গান শুনা নিষেধ থাকিলেও তাহারা সে নিষেধ না মানিয়া হিন্দু দেবদেবীর গান পর্য্যন্ত করিয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ।

রূপ।

অয়ি রূপ! অয়ি শিখা! মরণ-আহ্বান!
যুগে যুগে তোরি কাছে নত হয় মান
বিমুগ্ধ বিশ্বের! তুলাদণ্ডে নিখিলের
একদিকে একা তুমি, অন্যত্র বিশ্বের
সহস্র সম্পদ;—তবু তুমি গরীয়ান্।
কর্ত্তব্যের কঠোরতা, জ্ঞানীর সে জ্ঞান
ব্যর্থ হয় তোরি কাছে; তোরি তরে হায়,
কত রাজা কত রাজ্য ধূলাতে লুটায়।

ব্যর্থ করি তপস্বীর কৃচ্ছ্র-লব্ধ ফল
ছুটাও তোমার পাছে-করিয়া পাগল।
তোমার মদির পানে হয় যে বিভোর
অতৃপ্ত তিয়াষ তার শুধু হয় ঘোর,
সার্থক হও গো তুমি মানবের মাঝে,
দরশন দিলে চির-সুন্দর সাজে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ।

শল্য বিজ্ঞান ও অপনয়ন

(আলোচনা)

ভারতীয় আর্য্যদের গৌরবের যুগের নিদর্শন আমাদের বিশেষ আদরের বস্তু। কিন্তু নানা প্রকার বিপ্লবে যদিও বহু গৌরবের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, আজিকার মত ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁহাদের অসীম অনুসন্ধিৎসার ফলই জগতে প্রচারিত হইয়া, সভ্যতার আলোকে সকলের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিত। তাঁহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিঃশাস্ত্রাদি এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচ্যভারত বিজ্ঞানে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন কিছু কিছু আজও লুপ্তাবশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের প্রাচ্য গৌরবের অনুসন্ধান করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদ বিশেষ সহায়ক হইতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" আয়ুর্ব্বেদের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব লোক-লোচন-গোচর করাইয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইতেছেন। গত ভাদ্র মাসের পত্রিকায় "শল্য বিজ্ঞান ও অপনয়ন" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন। জিঘাংসু মানব জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত আছে, ক্রমশঃ মারণ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে রক্ষার উপায়ও বহুবিধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন যেমন যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের রক্ষার নিমিত্ত এম্বুলেন্সকোর রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, প্রাচীন কালেও সেইরূপ যুদ্ধে চলতি হাঁসপাতাল থাকিত এবং তাহার সঙ্গে বহু শল্য তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকও থাকিতেন; এই প্রবন্ধ শল্য বিজ্ঞানীয় অধ্যায়ই তাহার প্রমাণ দিতেছে।

কিন্তু দুঃখের সহিত আমাদের বলিতে হইতেছে যে, উক্ত প্রবন্ধটী যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মহর্ষি সুশ্রুতের বক্তব্য বিষয়গুলির সম্যক্ অর্থবোধ হইতেছে না। এবং অনেক স্থলেই অর্থ বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় অনিষ্টই সাধিত হইয়াছে। প্রাচ্য চিকিৎসার বিকৃত অনুবাদ জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায়, তাহার প্রতি জনসমাজের শ্রদ্ধার হ্রাস করা হইয়াছে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে কোন্ মূর্খ "গলায় কাঁটা বাধিলে গলা পর্য্যন্ত ভস্মরাশি মধ্যে রোগীকে পুতিয়া রাখিলে কাঁটা খুলিয়া পড়িবে" বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং এইরূপ ব্যবস্থার জন্য কোন্ ব্যক্তি প্রাচ্য চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিবে? সুতরাং ঐ প্রবন্ধের সংশোধন ও সমালোচনা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে. বিবেচনায় এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইতেছে। কোনরূপ বিদ্বেষপরবশ হইয়া আমরা একার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। আশাকরি দাস মহাশয় এই অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

প্রথমতঃ প্রবন্ধ লেখক শল্য শব্দের অর্থই বুঝাইতে পারেন নাই, এবং সেই জন্য অনেক স্থলে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। ভগবান্ সুশ্রুত বলিয়াছেন "সর্ব্বশরীরাবাধকরং শল্যম্"। যাহা কিছু শরীরের পীড়া উৎপাদন করে তাহারই নাম শল্য। ইহাতে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সমস্ত বস্তুরই পরিগ্রহ হইতেছে। অমূর্ত্ত বায়ু পিত্ত কফ বা শোকাদি শরীরকে কষ্ট দেয় বলিয়া তাহাদিগকেও শল্য বলা হইয়া থাকে। আবার তৃণমাত্র হইতে সামান্য কণ্টক পর্য্যন্ত যেমন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার যন্ত্রণার কারণ হয় বলিয়া তাহাকে শল্য বলা যায়, সেইরূপ ভুক্ত অন্ন, ভোজনের গ্রাস, মল, মূত্র, অধোবায়ু ও গর্ভ প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যখন শরীরের পীড়া উৎপাদন

করিতে থাকে তখন তাহারা সর্ব্বদা শরীরে অবস্থিতি করিলেও তাহাদিগকে শল্য বলা হইয়া থাকে।

এখন দাস মহাশয়ের প্রবন্ধাংশ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। সুশ্রুত বলিয়াছেনঃ—"অধিকারো হি লোহ-বেণু-বৃক্ষ-তৃণ-শৃঙ্গাস্থিময়েষু। তত্রাপি বিশেষতো লোহময়েষ্বেব বিশসনার্থোপপন্নত্বাল্লোহস্ত। লোহানামপি দুর্ব্বারত্বাদণু-মুখত্বাদ্ দূরপ্রয়োজনকরত্বাচ্চ শর এব অধিকৃতঃ।" দাস মহাশয়ের প্রবন্ধে লিখিত অনুবাদ :—"আগন্তুক শল্য বৃক্ষময়, তৃণময়, বেণুময়, ধাতুময়, শৃঙ্গময় বা অস্থিময় হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে ধাতুময় শল্যই পীড়াদায়ক কেননা উহা প্রায়ই সূক্ষ্ম মুখ ও দূর হইতে যোজিত হয় বলিয়া প্রাণ বিয়োগ-কারী।

যদিও লোহ শব্দে ধাতু মাত্রকেই বুঝায়, তথাপি এস্থলে মারক অস্ত্র প্রসঙ্গে সাধারণ ধাতুমাত্রকে না বলিয়া বিশেষ ধাতু লোহাকেই ধরা কর্ত্তব্য ছিল। এবং ধাতুময় শল্য মাত্রেই সূক্ষ্ম মুখ ও দূর হইতে যোজিত হয় না। ঐ অংশের অর্থকে বিকৃত না করিলে এইরূপ হওয়া উচিত :—যদিও শারীর শল্য ব্যতিরিক্ত দুঃখোৎপাদক পদার্থমাত্রেই আগন্তু শল্য বলিয়া কথিত হয় কিন্তু এই স্থলে লৌহ, বংশ, বৃক্ষ, তৃণ, শৃঙ্গ ও অস্থি ময় শল্যই কথিত হইবে। তাহার মধ্যেও বিশেষভাবে লৌহ ময় শল্যের বিষয় লিখিত হইবে। যেহেতু মারক অস্ত্র নির্ম্মাণে লৌহ বিশেষ প্রয়োজনীয়। লৌহের অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে শরই বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক কেননা শর দুর্ব্বার, সূক্ষ্মমুখ ও দূর হইতে প্রযুক্ত হয়।

দাস মহাশয় লিখিয়াছেন :—"ধাতুময় শল্য নিক্ষিপ্ত হইলে ঊর্দ্ধ, অধঃ, পশ্চাৎ, বক্র ও সরল এই পাঁচ প্রকার গতি হইয়া থাকে।" সুশ্রুত বলিয়াছেন—'সর্ব্বশল্যানাং পঞ্চবিধো গতি-বিশেষঃ'। এই স্থলে সর্ব্বপ্রকার শল্যকে কেবল ধাতুময় শল্যে পরিণত করার কোন হেতু দেখা যায় না। বংশ ও তৃণাদিময় শল্যের কি এ প্রকার গতি হয় না? কোন অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলেই তাহাকে শল্য সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, বা তাহার গতি জ্ঞানের আবশ্যকতা চিকিৎসা শাস্ত্রের নাই। শরীরে প্রবিষ্ট না হইলে তাহার শল্য সংজ্ঞাই হয় না সুতরাং এস্থলে শরীরে পাঁচ প্রকার গতিতে প্রবিষ্ট হয় বলাই কর্ত্তব্য ছিল।

কেবল অনুবাদ ব্যতীত মধ্যে মধ্যে কবিভূষণ মহাশয়ের একটু একটু টীপ্পণীও দেখিতে পাওয়া যায় যথাঃ—"ফুসফুস, রক্তাশয়, অন্ত্র, পাকাশয় ও আমাশয় ভেদ হইলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।" মস্তক হৃদয় ও বস্তিভেদ হইলে কি তবে মরণ হয় না? চরক ও সুশ্রুত এই তিনটীকেই প্রধান মর্ম্ম-বলিয়াছেন;সুতরাং এ তিনটীর কথা প্রথমে বলা উচিত ছিল। এইরূপ স্রোতঃ শব্দে 'রসরক্তবাহিনী শিরা' বলা নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। সুশ্রুত বলিয়াছেনঃ—"স্রোতস্ত্বিতি বিজ্ঞেয়ং শিরাধমনীবর্জ্জিতম্"। শারীর, ৯ অধ্যায়। এই অবস্থায় শিরাকে স্রোতঃ বলা অতি সাহসিকের পক্ষেই সম্ভবপর।

শল্যাপনয়ন প্রকরণে আরও অপূর্ব্ব বিষয়ের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দাস মহাশয়ের প্রবন্ধকে অনুসরণ করিয়া কেহ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসা ব্যপদেশে বহু জীবহত্যা হইতে থাকিবে। চিকিৎসাঙ্গের এইরূপ বিকৃত অনুবাদ প্রচারে বহু অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ শরীরে গভীর ভাবে কোন শল্য বিদ্ধ হওয়ায় যদি তাহা সাধারণ উপায়ে বাহির করা না যায় ও তৎস্থানে বিদাহ উপস্থিত হয় তবে তাহার সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেনঃ—"সাবগাঢ়ং শল্যমভি-দহ্যমানং পাচয়িত্বা তস্তপূয়শোণিতবেগাদ্গৌরবাদ্বা পততি।" দাসমহাশয় লিখিয়াছেন :—"শল্য দৃঢ়রূপে শরীরে বদ্ধ হইলে, সেই স্থান দগ্ধ করিবে"ইত্যাদি। অভিদহ্যমানং দেখিয়া তাহার 'দগ্ধ করিবে' এই বিধি কল্পনা করা ঠিক হয় নাই। উপরে দগ্ধ করিলে ঘার আয়তন উপরে বর্দ্ধিত হইয়া রোগীকে বেশী কষ্টই দিবে। বরং পচ্যমানাবস্থায় 'পাকল' যোগ দিয়া ভিতরে পাকাইলে অনেক সময় তাহার পূয ও রক্তাদির বহির্গমনের বেগে শল্যও বাহির হইয়া পড়ে, ইহাই সুশ্রুতের অভিপ্রায়।

মানবের নিত্য আহার্য্য অন্নও অনেক সময় অজীর্ণাদি বশতঃ শল্যস্বরূপ অর্থাৎ শরীরে যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে।

তখন তাহাকে অন্ন-শল্য বলা হয় এবং তাহাকে বাহির করিয়া ফেলাইবার চিকিৎসার জন্য ভগবান্ সুশ্রুত বলিয়াছেন "অন্নশল্যানি বমনাঙ্গুলিপ্রতিমর্শপ্রভৃতিভিঃ, বিরেচনৈঃ পকাশয় গতানি" অর্থাৎ অন্ন শল্য স্বরূপ হইয়া আমাশয়ে থাকিলে গলায় নখ ইত্যাদি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে বমন করাইয়া রোগীকে সুস্থ করিবে এবং সেই অন্ন যদি পকাশয়ে যাইয়া যন্ত্রণাপ্রদ হয় তবে তাহাকে বিরেচন দ্বারা নির্হরণ করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ অধোবায়ু, মল, মূত্র বা গর্ভ যদি যথাকালে বহির্গত না হইয়া শল্যস্বরূপ অর্থাৎ শরীরের পীড়ার কারণ হয় তবে প্রবাহণ অর্থাৎ কোঁথ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া ফেলিবে। সুশ্রুত বলেনঃ—"বাতমূত্রপুরীষগর্ভসঙ্গেষু প্রবাহনমুক্তম্।" কবিভূষণ মহাশয় এই দুই অবস্থায় চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলিয়াছেনঃ—"ভুক্ত-দ্রব্য গলনালীতে বদ্ধ হইলে কাসি বমন বা অঙ্গুলিদ্বারা তাহাকে বাহির করিবে, পাকাশয়ে আবদ্ধ হইলে বিরেচন দ্বারা নির্গত করিবে, বাতমূত্র পুরীষস্থানে কিম্বা গর্ভাশয়ে থাকিলে বেগ প্রদানে বাহির করিবে।" কি চমৎকার কল্পনা! ভুক্তদ্রব্য গলনালীতে আবদ্ধ হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু পকাশয়ে তাহার আবদ্ধ হইবার কোন হেতু দেখা যায় না। আরও বিচিত্র এই যে অবশেষে ভুক্তদ্রব্য বাত,মূত্র বা মলাশয়ে না হয় কোন না কোন পরিণতিতে উপস্থিত হউক, কিন্তু যখন ভুক্তদ্রব্য গর্ভাশয়ে যাইয়া আবদ্ধ হইবে তখন না জানি কবিভূষণ মহা-শয়ের শারীরজ্ঞান কি অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিবে!

সর্পাদি দংশনজনিত সবিষ শোণিত ও দুষ্ট স্তন্য (স্তনে শোথ বা বেদনা জন্মাইলে) তাহাদিগকে চুষিয়া বা শৃঙ্গযন্ত্র প্রয়োগে বাহির করিয়া ফেলিবে। এস্থলে দাস মহাশয় স্তন্যে বিষ সংসর্গ করাইয়া যথার্থ চিকিৎসা বলেন নাই।

শল্যাপনয়নীয় অধ্যায়ে আমাদের ৪টী অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম—গলা বা অন্নবহ-স্রোতে কাঁটা বিঁধিলে যদি সংদংশ যন্ত্র (Laryngeal Forceps) দ্বারা তাহা বাহির করা অসম্ভব হয়; দ্বিতীয়,—জলে ডুবিলে বহুজল খাইয়া জলপূর্ণোদর হইলে; তৃতীয়,—অন্নের গ্রাস গলায় বাধিলে, চতুর্থ,—গলায় বাহু ইত্যাদি দ্বারা পীড়নে বা গলায় দড়ীর ফাঁশ লাগাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চিকিৎসার আবশ্যক হয়। দূরবর্ত্তী দূরে থাকুক নিকটবর্ত্তী চিকিৎসক ডাকিয়া আনিতে আনিতেই অনেক সময় রোগীর প্রাণবিয়োগ হইতে পারে; এজন্য এই আকস্মিক বিপদের প্রতীকারের উপায় সকলের জানা থাকা আবশ্যক। সুশ্রুত এসম্বন্ধে সূত্র করিয়াছেনঃ—

(১) অস্থিশল্যমন্যদ্বা তির্য্যক্ কণ্ঠসক্তমবেক্ষ্য * * মৃদুনা দন্তধাবনকূর্চ্চকেন অপহরেৎ প্রণুদেদ্বান্তঃ। ক্ষতকণ্ঠায় মধুসর্পিষী লেহ্যং প্রযচ্ছেৎ ত্রিফলাচূর্ণং বা মধুশর্করামিশ্রম্।

(২) উদকপূর্ণোদরমবাক্শিরসমবপীড়য়েৎ ধুনীয়াদ্ বাময়েদ্বা ভস্মরাশৌ বা নিখনেদামুখম্।

(৩) গ্রাসশল্যে তু কণ্ঠাসক্তে নিঃশঙ্কমনববুদ্ধং স্কন্ধে মুষ্টিনা-ভিহন্যাৎ স্নেহং মদ্যপানীয়ং বা পায়য়েৎ।

(৪) বাহুরজ্জুলতাপাশৈস্তু কণ্ঠপীড়নাদ্বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শ্লেষ্মাণং কোপয়িত্বা স্রোতো নিরুনদ্ধি লালাস্রাবং ফেণাবমনং সংজ্ঞানাশঞ্চা পাদয়তি; তমভ্যজ্য সংস্বেদ্য শিরোবিরেচনং তস্মৈ তীক্ষ্ণংদদ্যাৎ রসঞ্চবাতঘ্নং বিদধ্যাৎ।

উপর্য্যুক্ত সংস্কৃত সরল হইলেও যদি কেহ বিকৃতার্থ পরিগ্রহ করেন শঙ্কায় উহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

(১) গলনালীরমধ্যে যদি মৎস্যাদির কাঁটা বা অন্য কোন পদার্থ বক্রভাবে বাধিয়া যায় তবে .... কোমল দাঁতমাজা ব্রাসের সাহায্যে বাহিরে বাহির করিয়া ফেলিবে; (যদিতাহা অসম্ভবহয়) তবে তাহাকে ঠেলিয়া ভিতরে অর্থাৎ আমাশয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবে। আজকাল এই কার্য্যের জন্য এইস্থলে অনুদ্ধৃত চুলের লুটীর বদলে সুন্দর প্রোব্যাঙ্ (Probang) নামক যন্ত্র ও দাঁতমাজা ব্রাসের বদলে থ্রোটব্রাশ (Throat Brushes) নামক যন্ত্র দ্বারা সুবিধাজনক কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার উদ্ভাবনের মূল এই সুশ্রুতোক্ত ব্যবস্থা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই রূপে কাঁটা বাহির করিতে গলনালীতে কাঁটার আঘাতে যে ক্ষত হইবে তাহার শান্তির জন্য রোগীকে ঘৃত ও মধু অথবা ত্রিফলা চূর্ণ মধু ও চিনি দিয়া লেহন করিতে দিবে।

(২) জলে ডোবার জন্য বেশী পরিমাণ জল খাইয়া নিঃসংজ্ঞ হইলে তাহার পা ধরিয়া মাথা নীচে ঝুলাইয়া পেটে চাপ দিবে এবং ঝাঁকাইতে থাকিবে। (এখনও জলেডোবা রোগীকে পা ধরিয়া ঘুরানের প্রণালী সাধারণ লোকেও অবগত আছে) অথবা কোনতীব্র বামক ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে অথবা মুখ পর্য্যন্ত ছাইএর গাদায় (বমন না হওয়া পর্য্যন্ত) পুতিয়া রাখিবে।

(৩) গলায় অন্নাদির গ্রাস আটকাইলে তাহার অজ্ঞাতসারে কোন শঙ্কা না করিয়া ঘাড়ে একটী কিলদিবে। অথবা তৈলাদি স্নেহ পদার্থ, মদ্য বা জল পান করাইবে।

(৪) কাহারও গলা বাহুইত্যাদিদ্বারা চাপিয়া ধরিলে ও কেহ গলায় দড়ী ইত্যাদি দিলে তাহার বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে প্রকোপিত করিয়া (উর্দ্ধজত্রুগত) স্রোত সকল রুদ্ধ করিয়া ফেলে ও তাহার মুখ হইতে লালাস্রাব হয় এবং ফেণা উঠিতে থাকে ও সংজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়। এই পর্য্যন্তই চিকিৎসার কাল তাহার পরও ঐরূপ ফাঁস হইতে উদ্ধার না করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। তাহাকে উদ্ধার করিয়াই বাতহর তৈলাদি মাখাইয়া স্বেদ দিতে থাকিবে ও তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন অর্থাৎ মরিচ কায়ছালাদির নস্য দিবে। পরে জ্ঞান সঞ্চার হইলে পথ্যের নিমিত্ত বাতঘ্ন দ্রব্যের দ্বারা সংস্কৃত মাংসের যুষ দিবে।

তুলনায় সমালোচনার জন্য এস্থলে কবিভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—"অস্থি বা অন্য কোন দ্রব্য গলনালীতে তির্য্যগ্ভাবে আবদ্ধ হইলে * * * জল পান করাইয়া অধোমুখে রাখিয়া রোগীকে শব্দ ও বমন করাইবে অথবা গলা পর্য্যন্ত ভস্ম মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। তাহাতে যদি কণ্ঠনালী ক্ষত হয় তবে ঘৃত, মধু, সর্করার সহিত ত্রিফলাচূর্ণ পান করিতে দিবে। ভুক্তদ্রব্য গলাধঃকরণকালে যদি কণ্ঠদেশে কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হয়, তবে পীড়িত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠদেশে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিবে। অস্থিতে বিদ্ধ হইলে যন্ত্রদ্বারা বলপ্রয়োগে বাহির করিবে। শল্য যদি এপ্রকার বিদ্ধ হয় যে সহজে তাহাকে টানিয়া বাহির করা যায় না তবে তাহাকে উপড়াইয়া ফেলিবে। ইহাতে যদি বায়ু প্রকুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে কুপিত করিয়া শরীরের সকল দ্বাররোধ করাইয়া দেয় এবং মুখ হইতে লালা ও ফেণা নিঃসৃত হইতে থাকে ও রোগী সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে তবে মর্দ্দন ও ঘর্ম্ম নিঃসরণ করাইবে। মুহুর্মুহুঃ শীতল জল দ্বারা আশ্বাসিত করিবে ও রোগীকে বিরেচনার্থ তীক্ষ্ণ বীর্য্য রস ও বায়ু শান্তি জন্য অন্যবিধ বিধান সকল অবলম্বন করিবে।"

জলে ডোবা রোগী ও গলায় দড়ী দেওয়া রোগীর চিকিৎসাটা গলায় কাঁটা বিঁধা রোগীর শিরে অর্পণ করিয়া কবিভূষণ মহাশয় বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন নাই। তাঁহার উপদেশ মত গলায় কাঁটা বাধিলে যদি রোগীকে ছাইএর কাদায় পুতিয়া রাখা হয় অথবা গলায় শল্য বাধিলে (?) কণ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করা হয় তবে তাহার কি অবস্থা হইবে কবিভূষণ মহাশয় কি বিবেচনা করিয়াছেন? টানিয়া বাহির করিতে না পারিলে তাহাকে কি প্রকারে উপড়ান যাইতে পারে তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। অধিক সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন; উভয় অনুবাদ পাঠ করিয়া সুধীবর্গ সদসৎবিবেচনা করিবেন। বিস্তরেণালম্।

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র সরস্বতী ভিষগাচার্য্য।

গোরক্ষপুর।

১৩২২ বাং ১০ই বৈশাখ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বেনারস কান্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে গোরক্ষপুরের টিকেট লইয়া রওয়ানা হইলাম। কাশী হইতে গোরক্ষপুর যাইতে হইলে বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে দিয়া যাইতে হয়। কাশীতে এই রেলওয়ের দুইটী ষ্টেশন আছে। একটি বেনারস কান্টনমেণ্ট ও আর একটী বেনারস সিটী। কান্টনমেণ্ট ষ্টেশন ছাড়াইয়া বেনারস সিটী ষ্টেশন। সিটী ষ্টেশনে অনেক লোক উঠিল। শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। বেনারস সিটী ষ্টেশনের পর সারনাথ ষ্টেশন। সারনাথ বৌদ্ধ যুগের স্মৃতি লইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। গাড়ী সারনাথ ছাড়া-

ইলে পর আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রি ৪টার কিছু পূর্ব্বে ভাটনি ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিল। ভাটনী ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইতে হয়। বেনারস হইতে ভাটনী ষ্টেশন পর্য্যন্ত শাখা রেলপথ। কাটিহার হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ কোম্পানীর মেইন বা প্রধান লাইন। ভাটনী ষ্টেশন মেইন লাইনের উপর অবস্থিত। আমরা ভাটনী ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া গোরক্ষপুরের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর গাড়ী আসিল। প্রাতে ৪॥টার সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু বেশ আরামপ্রদ বোধ হইল। আমি এই অঞ্চলে পূর্ব্বে আর কখনও আসি নাই। রেল পথের উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এ অঞ্চলে মাঠের দৃশ্য বড় সুন্দর ও অনেকটা বাঙ্গলা দেশের মত। লক্ষ্ণৌ সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা যেরূপ তৃণশূন্য ও শুষ্ক দেখিয়াছি এ স্থানে তেমন নহে। এই স্থানের মাঠ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত এবং উভয় দিকে দূরে ও নিকটে বৃক্ষপল্লবাদি পরিশোভিত পল্লী দৃষ্ট হয়। গোরক্ষপুর জেলা নেপালের সন্নিহিত। গোরক্ষপুরের মৃত্তিকা সরস এবং এই জিলায় প্রচুর বৃক্ষাদি ও জঙ্গল আছে। আমরা কোন কোন ষ্টেশনে বহু কাষ্ঠ সজ্জীকৃত দেখিতে পাইলাম। এই সকল কাষ্ঠ স্থানান্তরে চালান দেওয়া হয়। উত্তর দিকে বহুদূরে শালবন ও গভীর অরণ্য দৃষ্ট হয়। গোরক্ষপুরের ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে গভীর শালবন। রেলপথ শাল বন ভেদ করিয়া চলিয়াছে। গোরক্ষপুরের নিকট প্রকাণ্ড জলা আছে। আমরা প্রাতে অনুমান ৭॥ ঘটিকার সময় গোরক্ষপুর পৌছিলাম।

গোরক্ষপুরে বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রধান কার্য্যালয় ও কারখানা। রেলষ্টেশন বহুস্থান ব্যাপিয়া আছে। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম এবং একখানা গাড়ী করিয়া শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের মন্দিরে যাইতে ষ্টেশন হইতে ১½ মাইল পশ্চিমদিকে যাইয়া অর্দ্ধ মাইল পরিমাণ উত্তরদিকে যাইতে হয়। আমরা কিয়ৎকাল মধ্যেই মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজীর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ শিবের অবতার ছিলেন। শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজীর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগকে নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বা কাণকাটা সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণের কর্ণে ছিদ্র থাকে এবং তাহারা কর্ণে স্ফটিক বা ধাতু নির্ম্মিত বৃহৎ অঙ্গুরী বা কুণ্ডল পরিধান করিয়া থাকে। ইহাই এই সম্প্রদায়ের চিহ্ন। শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজীর সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে তাহা এই :—গোরক্ষনাথ গুরুর নিকট সন্ন্যাস করিয়া গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ইঁহার গুরুর নাম মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ। গুরু শিষ্য উভয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন এক রাজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা পরম ভক্তিভরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজপুরীতে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করিলেন। গুরু থাকিতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু গোরক্ষনাথ বলিলেন "প্রভু! গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছি—রাজপুরীতে অবস্থান করা সঙ্গত নহে। প্রভু! আমাকে যাইতে অনুমতি দিন।" গোরক্ষ নাথ চলিয়া গেলেন; এদিকে মৎস্যেন্দ্রনাথ রাজপুরীতে অবস্থান করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেন ও অবশেষে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তিনি সাধন ভজন ছাড়িয়া দিলেন এবং মোহপরবশ হইয়া প্রাকৃত জনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কতককাল পর গোরক্ষনাথ গুরুর সন্ধান লইতে আসিয়া দেখিলেন যে সর্ব্ব নাশ হইয়াছে—গুরু সাধন ভজন সমস্ত ভুলিয়া বিষয়ে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তখন গোরক্ষনাথ অন্তরালে থাকিয়া থাকিয়া কৌশলে গুরুর পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিলেন। মৎস্যেন্দ্র রাজপুরী ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। এই কিম্বদন্তী শিবাবতার গোরক্ষ নাথ সম্বন্ধে কি অপর কোন গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে তাহা বলা কঠিন।

শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের মন্দির হইতেই এই স্থানের নাম গোরক্ষপুর হইয়াছে। গোরক্ষনাথের মন্দিরে শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের আসন আছে। এই স্থানে প্রত্যহ ভোগ ও আরতি

হয়। মন্দির পূর্ব্বদ্বারী। মন্দিরের সম্মুখে সিঁড়ির উত্তরে শ্রীশ্রী৺ভৈরবের স্থান। এই স্থানে অসংখ্য ত্রিশূল সংস্থাপিত। যাত্রীগণ এই স্থানে ত্রিশূল দিয়া থাকেন। আমরা বড় ছোট অসংখ্য ত্রিশূল একত্র সংস্থাপিত দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনের উত্তরে একটী বিল্ব বৃক্ষ মূলে শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজিউর ধুনী আছে। এই ধুনীর অগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। যাত্রীগণ ধুনীর জন্য কাষ্ঠ দিয়া থাকেন। শত শত বৎসর যাবৎ এই ধুনী এই স্থানে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ধুনীর উপর একটী চালাঘর আছে। শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজীর মন্দিরের পশ্চিমের বারান্দায় প্রাচীরের গাত্রে বৃহৎ কালিকা মূর্ত্তি। মন্দিরের উত্তর পশ্চিমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধু মহাত্মাবর্গের সমাধিস্থান। এই সমাধি স্থানে বহু সমাধি আছে। মন্দির ব্যতীত এস্থানে আরও অনেকগুলি ইষ্টকালয় ও গৃহ আছে। মন্দিরের স্থান বহুদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকে আম্র বাগান। অপর পারে ও আম্র বাগান আছে। মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর দিকে যে অট্টালিকা আছে তাহার উত্তরে বাগান। বাগানে একটী বড় ইন্দারা আছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম পারে ভীমসেনের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি শায়িত অবস্থায় আছে। পুকুরপারে আম বাগানে এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বানর। বানরেরা স্বচ্ছন্দ মনে বেড়াইয়া থাকে। মন্দিরের ভূমির স্থান ছাড়াইয়া পূর্ব্বদিকে ও উত্তর দিকে বহুদূর বিস্তৃত বাগানের পর বাগান। এই সকল বাগানে আম পেয়ারা প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে। শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথজীর মন্দিরের স্থান ও চতুর্দ্দিকস্থ স্থান অতি নির্জ্জন। গোরক্ষনাথ অতি জাগ্রত দেবতা। এই গোরক্ষনাথ জীর আসন ও ধুনী ও কালিকা মুর্ত্তি দর্শন করিলে কেমন পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়। এই স্থান সাধনের পক্ষে অতি শ্রেষ্ঠ। কত মহাপুরুষ এই স্থানে যোগাসনে যোগ সাধন করিয়াছেন। এখনও এই সম্প্রদায়ে বহু শ্রেষ্ঠ যোগী ও সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন। যে সকল মহাপুরুষের সমাধি এই স্থানে আছে ইঁহারা সকলেই যোগসিদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীমদগম্ভীর নাথ বাবা গোরক্ষপুরে আছেন। ইনি গোরক্ষ নাথ মন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ। ইনি অতি শ্রেষ্ঠ যোগী ও সিদ্ধ পুরুষ। ইনি পূর্ব্বে গয়াধামে একটী পর্ব্বত গহ্বরে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিতেন। তাহার সাধনার স্থানটী এখনও বর্ত্তমান আছে। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং ইনিই এই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদিগের নিকট প্রচার করেন। শ্রীশ্রীমদগম্ভীর নাথ বাবা কৃপা করিয়া বহু বাঙ্গালী নর নারীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার প্রশান্ত গম্ভীর ভাব দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এই মহাপুরুষের হৃদয় স্নেহ দয়া ও কোমলতার প্রস্রবণ। ইনি অতি অল্পভাষী। ইঁহার কথা অতি ধীর, কোমল ও প্রাণস্পর্শী। বাঙ্গালীদের প্রতি এই মহাপুরুষের কৃপা অসাধারণ। ১৩২১ বাং সনের মাঘমাসে ইনি কলিকাতা আসিয়া মাসাধিক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় আমি ইঁহাকে প্রথম দর্শন করি। প্রত্যহ বহু সংখ্যক নরনারী আসিয়া ইঁহাকে দর্শন করিতেন, দূরদূরান্তর হইতেও অনেকে ইঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহা তেতালা বাড়ী, এই বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। বাড়ীটাতে যেন নিত্য উৎসব ছিল। এই সময়ে অনেকে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন।

অতঃপর ঐ সনের চৈত্রমাসে তাঁহাকে কুম্ভমেলায় দর্শন করি। হরিদ্বারে নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের আখরা আছে। এই স্থানে এই সম্প্রদায়ের বহু সাধু সন্ন্যাসী সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমদগম্ভীর নাথ বাবার কয়েকটী বাঙ্গালী শিষ্যও এই সময়ে হরিদ্বারে গিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীমদগম্ভীর নাথ বাবার নিকট গিয়াছিলাম। বাবা কৃপা করিয়া আমাকে প্রসাদ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের উপর যে সকল মহাত্মা প্রভাব বিস্তার করিতেছেন শ্রীমদগম্ভীর নাথ বাবা ইঁহাদের মধ্যে একজন।

গোরক্ষপুর গোরক্ষনাথের মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীমদগম্ভীরনাথ বাবা এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন বলিয়াও

এই মন্দির অনেকের নিকট একটী প্রধান আকর্ষণের স্থান হইয়াছে। আমরা যখন গোরক্ষপুর যাই তখন এই মহাপুরুষ একটী দূরবর্ত্তী গ্রামে গিয়াছিলেন। সুতরাং এই সময়ে আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। বাবার একটী বাঙ্গালী শিষ্যকে এই স্থানে দেখিতে পাইলাম। ইনি ব্রহ্মচারী। ইনি এখানে থাকিয়া বাবার সেবা করেন। ব্রহ্মচারী আমাদিগকে বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের মন্দিরে অনেক মোহান্ত সন্ন্যাসী থাকেন। অন্নরুটী প্রভৃতি দ্বারা গোরক্ষনাথজীর ভোগ হয়। আমরা গোরক্ষনাথ জীর প্রসাদ পাইয়াছিলাম। ভৈরবের নিকট সময় সময় পাঠা-বলি হয়। এক স্থানে একটী বৃক্ষতলে কালী মাতার নিকট পাঠা বলি হয়।—সন্ধ্যার সময় গোরক্ষনাথ মন্দিরে খুব জাক জমকের সহিত আরতি হয়।

গোরক্ষনাথ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী দালানের ভিতর দেখিলাম একটী সন্ন্যাসী দরজা বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে সাধন করিতেছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম এই দালানে কোন দেবতার মূর্ত্তি আছে সেই জন্য দরজার ফাঁক দিয়া আমরা ভিতরে দৃষ্টি করিয়াছিলাম।

শিবরাত্রির সময় এই স্থানে বৃহৎ মেলা হয়। প্রতি বুধবার গোরক্ষনাথ মন্দিরে ক্ষুদ্র মেলা হইয়া থাকে। শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় এই স্থানে রামলীলার উৎসব হয়। মহাষ্টমীর দিন মায়ের পূজা হয়। গোরক্ষনাথ মন্দিরে বেশ একটী জাগ্রত ও জীবন্ত ভাব। এই স্থানে অনেক প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক তন্ত্র আছে; তাহা নররক্তে লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোরক্ষ নাথ মন্দিরে কোন মূর্ত্তি বা বিগ্রহ নাই। গোরক্ষ নাথ জীর আসন পূজা করা হয় ও আসনের সম্মুখে ভোগ দেওয়া হয়। গোরক্ষনাথ প্রথম শিবাবতার। গোরক্ষনাথ কখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ভর্ত্তৃহরি গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। ভর্ত্তৃহরি মালবের রাজা ছিলেন, উজ্জয়িনী তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ভর্ত্তৃহরির গৃহ ত্যাগ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে। ভর্ত্তৃহরি অতি ন্যায়বান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজা বর্গ সুখে ও সানন্দে কালাতিপাত করিত। এক দিন একজন সন্ন্যাসী রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া ভর্ত্তৃহরিকে একটী সুন্দর ফল প্রদান করিয়া বলিলেন "মহারাজ, এই ফল ভক্ষণ করিলে জরা ও ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠ ন্যায়বান্ ও প্রজারঞ্জক; আপনি দীর্ঘজীবী হইলে এবং সুস্থ থাকিলে প্রকৃতি-পুঞ্জের কল্যাণ হইবে সুতরাং আপনি ফলটী গ্রহণ করুন"। ভর্ত্তৃহরি ফলটী গ্রহণ করিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন এবং অন্তঃপুরে গমনকরতঃ তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীকে প্রদান করিলেন। রাণী ফলটী রাখিয়া দিলেন। রাণী কোতোয়ালের প্রতি আসক্তা ছিলেন। তিনি ফলটী কোতোয়ালকে প্রদান করিলেন। কোতোয়াল একটী বারাঙ্গনার প্রতি আসক্ত ছিল। সে বারাঙ্গনাকে ফলটী দান করিল। বারাঙ্গনা মনে মনে ভর্ত্তৃহরিকে ভাল বাসিত কিন্তু ভর্ত্তৃহরি তাহা জানিতেন না। বারাঙ্গনা ফলটী ভর্ত্তৃহরিকে প্রদান করিল। ভর্ত্তৃহরি ফলটী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন; এই ঘটনার পর তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি গভীর রজনীতে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। ভর্ত্তৃহরি ফলের ঘটনাটী লক্ষ্য করিয়া একটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা।
সা চান্যমিচ্ছতি জনং স জনোন্যরক্তঃ॥
অস্মৎকৃতেঽপি চ তুষ্যতি কাচিদন্যা।
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥

ভর্ত্তৃহরির গৃহত্যাগের পর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি ভ্রাতাকে ভুলিলেন না। ভর্ত্তৃহরির অনুসন্ধানের জন্য নানাস্থানে লোক প্রেরণ করিলেন। অবশেষে ভ্রাতার সংবাদ পাইয়া গঙ্গাতীরে চুনার বা চণ্ডা নগরে উপস্থিত হইলেন। চুনার দুর্গ ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই যে রাজা জরাসন্ধ এই দুর্গ নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন। এই স্থানে রামায়ণোক্ত গুহক চণ্ডালের রাজধানী ছিল বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে। ভর্ত্তৃহরি চুনারে থাকিয়া যোগ সাধন করিতেন। বিক্রমাদিত্য চুনারে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতাকে গৃহে ফিরাইয়া নিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিনি বিষয় জ্ঞান ত্যাগ করিয়াছেন এবং অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনি কি পুনরায় বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারেন? ভর্ত্তৃহরির নিকট রাজসিংহাসন তুচ্ছ পদার্থ। তিনি গৃহে ফিরিলেন না। বিক্রমাদিত্য চুনারে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এই মন্দিরে থাকিয়া ভর্ত্তৃহরি কতককাল সাধনা করিয়াছিলেন। ভর্ত্তৃহরির স্থাপিত শিব এখনও বর্ত্তমান আছে। রাজা গোপীচন্দ্র গোরক্ষনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। গোপীচন্দ্র কোন দেশের রাজা ছিলেন নির্ণয় করা কঠিন। ত্রিপুরা জিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত মহাশয় ত্রিপুরার অন্তঃপাতী ময়নামতী নামক গ্রামে একটী প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি পাইয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বৈকুণ্ঠ বাবু বলেন যে গোপীচন্দ্র ময়নামতীর রাজা ছিলেন। তিনি যে গোরক্ষ নাথের শিষ্য ছিলেন তাহা এই পুঁথিতে লিখিত আছে। ময়নামতী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার প্রাপ্ত দুইখানা পুঁথি আমাকে দিয়াছেন। সুবিধা হইলে এই সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব। ভর্ত্তৃহরি ও গোপীচন্দ্র উভয়েই যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথজীর শিষ্যদের মধ্যে এই দুই জনের আসন অতি উচ্চ। প্রবাদ এই যে ইঁহারা উভয়েই অমর।

আমরা এতক্ষণ গোরক্ষনাথজী ও গোরক্ষনাথের মন্দিরের কথা আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি গোরক্ষপুর সহর ও গোরক্ষপুর জিলা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গোরক্ষপুর সহর গোরক্ষপুর জিলার প্রধান নগর। গোরক্ষপুর সহরে গোরক্ষপুর বিভাগের কমিশনর বাস করেন। এই স্থানে একটী টাউনহল আছে। ইহার নাম কেম্পিয়ারহল। কেম্পিয়ার নামক জনৈক ইউরোপীয় জমিদারের অর্থে এই হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। টাউনহলের চতুর্দ্দিকে সুন্দর উদ্যান আছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থ ১৯০৩ সালে এই উদ্যান প্রস্তুত করা হয়। গোরক্ষপুরে পূর্ব্বে একটী সেনাবাস ছিল। এখন তাহা নাই। শীতকালে গোরক্ষপুরে গুর্খাসৈন্য সংগ্রহের এবং ক্রমে তাহাদিগকে সৈন্যদলে ভুক্ত করার জন্য একটী সেনাবাস খোলা হইয়া থাকে। গোরক্ষপুর সহরে একটী দেশীব্যাঙ্ক আছে। সহরের লোকসংখ্যা ৬৪ হাজারের অধিক। এই সহরে বিস্তর ফলের বাগান আছে।

গোরক্ষপুর বিভাগে তিনটী জিলা গোরক্ষপুর, বস্তি ও আজমগড়। গোরক্ষপুর ও বস্তি সরযূনদীর উত্তরে এবং আজমগড় দক্ষিণে অবস্থিত। গোরক্ষপুর নেপালের সংলগ্ন। নেপাল পার্ব্বত্য প্রদেশ। এ নিমিত্ত গোরক্ষপুরের উত্তরভাগ জঙ্গলাকীর্ণ। এই অঞ্চলে বাঘ, চিতাবাঘ, বন্যমহিষাদি বিস্তর। এস্থানে গণ্ডারও আছে। গোরক্ষপুর জিলায় অনেক নদী ও বিল আছে। রাপ্তি ও তাহার করদ রোহিণী ও আমিনদীই প্রধান। গোরক্ষপুর জিলার উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর শালবন। এই জিলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগ স্বাস্থ্যকর। উত্তর ও পশ্চিমভাগে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়।

এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বৌদ্ধযুগে এই স্থান বিশেষ উন্নত ছিল। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগর গোরক্ষপুর জিলার উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের সমীপবর্ত্তী বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। কুশী নগরে বুদ্ধদেব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বহু পণ্ডিতের মতে গোরক্ষপুর জিলার অন্তর্গত কাশিয়া নামক গ্রামই প্রাচীন কুশীনগর। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ এই মতের সমর্থন করেন না। তিনি অনুমান করেন যে ছোট রাপ্তি নদী ও গণ্ডক নদীর সঙ্গম স্থলের নিকট প্রাচীন কুশীনগর অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গোরক্ষপুর মগধের গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। চীন পরিব্রাজক হোয়ান সোয়াং (Hieuen Tsang) সপ্তম শতাব্দীতে গোরক্ষপুর জিলার উত্তর ভাগে অনেক ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই অঞ্চল জনশূন্য ছিল। এই স্থানে পূর্ব্বে ভাড়গণ ও পরে রাজপুতেরা রাজত্ব করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে গোরক্ষপুর জিলা কান্যোজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনৈক মুসলমান এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। আকবরের সময়ে গোরক্ষপুর সরকার গঠিত হইয়া অযোধ্যাপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু মোগলদের অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের পুত্র রাজকুমার মোয়াজ্জম এই স্থানে আগমন করেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই স্থানে মোয়াজ্জমাবাদ নামে একটী বিভাগের সৃষ্টি হয়। অযোধ্যার নবাবদিগের আমলে গোরক্ষপুর তাহাদের অধীনে ছিল। কিন্তু গোরক্ষপুরে স্থানীয় হিন্দু রাজাদেরই আধিপত্য ছিল। ১৮০১ সালে গোরক্ষপুর ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই স্থানে দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং ইংরেজদিগকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল।

গোরক্ষপুর জিলায় চাউল,যব,ও গম উৎপন্ন হয়। এই স্থানে চিনি প্রস্তুত হয়। গোরক্ষপুর জিলা হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঠ রপ্তানী হয়। নেপালের সহিতও গোরক্ষপুরের কারবার আছে।

গোরক্ষপুর নগর ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে শতাসী রাজপুতগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। গোরক্ষনাথের মন্দির এস্থানে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। গোরক্ষনাথজীর নামানুসারে নগরের নাম গোরক্ষপুর হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গল ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি ছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন।

জয়দেবের শ্রীরাধা

(১)

ব্যাসদেব বর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ব্রজলীলায় যে ভূমিতে ব্রজ গোপীগণ শ্রীহরির নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে, প্রেমিক ভক্ত জয়দেব গোপীবৃন্দের সেই অপ্রমেয় আত্ম ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গীতগোবিন্দে শ্রীরাধার চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রেমিকা শ্রীরাধা যে প্রেমের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে সাধনার অন্ধকারময় পথে যেমন করিয়া আজ ভগবানের মন্দির দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াইয়াছে, গীতগোবিন্দ তাহারই পূর্ণাভিব্যক্তি মাত্র। কবিত্বাকাঙ্ক্ষীগণ ইহাকে কাব্যের ভিতরে টানিয়া আনিয়া শ্রীরাধিকাকে যদি কবি কল্পনার অলৌকিক নায়িকার আসন দিতে ইচ্ছা করেন, জয়দেবের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্যরচনায় কবিযশ প্রাপ্তি প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। তাই, ভক্তের নিকট শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা—সাধকের কাছে সে ভগবানের মধুর ভাবের আদর্শ সাধিকা।

নন্দ দুলালের প্রথম সন্দর্শন যে দিন শ্রীরাধার চিত্তে প্রেমের ভাব জাগাইয়া দেয়,—পরে, সংসারের শত গঞ্জনা কলঙ্কও যেদিন তাহার মুগ্ধ হৃদয়ের পরানুরক্তির প্রবল আবেগ কালার প্রতিকূলে আনিতে পারে নাই, আবার, বুক ভরা ভালবাসা দিয়াও যে দিন মথুরার পথ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইতে গিয়া বিফলতার কঠোর আঘাতে শ্রীরাধার কোমল চিত্ত অবসন্ন হইয়াপড়ে,—তার পর জাগতিক ব্যাপারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্ত্তনের উপর দিয়া অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পরাণ বঁধুর প্রিয় সন্দর্শন শ্রীরাধিকার অবসন্ন হৃদয়ে চেতনার সঞ্চার করে নাই। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিসাফল্যের স্বর্ণ সুযোগ আর তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

শ্রীহরির নিকট প্রেমিকা রাধা হৃদয়ের যা কিছু আপনার সবই বিক্রয় করিয়াছে। বিনিময়, শুধু বনমালীর প্রাণ ভরা প্রিয় সন্দর্শন, আর তাঁহার কান্ত সমুজ্জ্বল পদারবিন্দের অমৃতময় স্নিগ্ধ পরশ। শ্রীহরি ব্রজভূমি আঁধার করিয়া যাওয়ায় বিরহিণী সে পরশ অনেক দিন পায় নাই। এতদিন স্মৃতির মন্দিরে যে শ্যামের মধুর চিন্তায় এই দীর্ঘ বিরহ কাটিয়াছে, আজ বহুদিন পরে বসন্তোৎসবের মধুর নিশায় বাসন্তীকুসুম-পরিশোভিত যমুনার তটনিকুঞ্জে তাঁহারই মোহন বাঁশরীর সাড়া পাইয়া শ্রীরাধিকার আবেগ-আকুল চিত্ত গোপীবৃন্দের সঙ্গে প্রিয়-সমাগমের মধুর মিলন আশায় একান্তাগ্রহে শ্যামের পানে ছুটিয়া

চলিয়াছে। ব্রজগোপীকার চঞ্চল চরণধারা শ্রীরাধিকার অপেক্ষা করিল না। তাই, সে সকল ছাড়িয়া অভীষ্ট দেবতার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

একদিকে প্রিয় সম্মিলন আশায় হৃদয়ের আকুল আবেগ, অন্যদিকে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারদেহলতিকায় অসহ্য কঠোর পথশ্রান্তিতে যখন শ্রীরাধিকা অধিকতর কাতরা, তখন প্রিয়-সহচরী বসন্তোৎসবের মধুর বর্ণনাদ্বারা সে ব্যাকুল চিত্তের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল।

জয়দেব ইহাই ভাবে গাহিয়াছেনঃ—

বসন্তে বাসন্তী-কুসুম-সুকুমারৈ-রবয়বৈঃ
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাং॥
অমন্দং কন্দর্পজ্বর-জনিত-চিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরলমিদমূচে সহচরী॥

এইখানে জয়দেব বসন্তবর্ণনাদ্বারা প্রেমাকুল চিত্তের সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার পরানুরক্তির পরীক্ষা করিতে গিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রেমের রাজ্যে আদর্শ প্রেমিকার আসন দান করিয়াছেন। যেমন অঙ্গুলি সঞ্চালনে স্রোতস্বতীর তীব্রবেগ উজান বহাইবার চেষ্টা সফলতায় পরিণত হয় না তেমনি প্রেমিকার উজ্জ্বল প্রেমধারা সান্ত্বনাদ দ্বারা প্রিয়তমের প্রতিকূলে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না।

তাই, যখন প্রিয়সখীর মধুর বসন্তবর্ণনা দ্বারা তাহার প্রেমোদ্বিগ্ন হৃদয় প্রবোধ না মানিয়া বরং উদ্দীপ্তভাব ধারণ করিল, তখন সহচরী নাতিদূরে গোপীবৃন্দের সহিত নৃত্যপরায়ণ বসন্তোৎসবে রত মুরারিকে দেখাইয়া শ্রীরাধিকার পাগলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রাগমাধুরী জাগাইয়া দিয়া গাহিল;—

চন্দনচর্চ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী।
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।

সখি, দেখ, দেখ, শ্রীহরি বিলাসবিমোহিত গোপীবৃন্দের সহিত ক্রীড়ায় উন্মত্ত রহিয়াছেন। ইঁহার নীলতনু চন্দনানুলিপ্ত, পরিধানে পীত বসন, কণ্ঠদেশ সুদৃশ্য বনমালায় বিভূষিত। ক্রীড়াকালে মণিময় মকরকুণ্ডল সঞ্চালিত হওয়ায় প্রিয়তমের কপোল যুগল বিকশিত হইয়া মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীরাধিকা অতৃপ্ত নয়নে সে অপরূপ রূপসুধা পান করিতে লাগিল।

জয়দেব এখানে শ্রীরাধিকার চরিত্র সাধকের ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। শব্দ স্পর্শ রূপাত্মক সকল ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আনন্দময় প্রেমের অমৃতাস্বাদ লাভ করাই সাধকের সাধন-সাফল্য।

তাই, শব্দ ও রূপের ভিতরে প্রাণপ্রিয় শ্যামকে পাইয়া শ্রীরাধা আজ যে আনন্দ লাভ করিয়াছে তাহা আনন্দময় প্রেমের অমৃতাস্বাদ ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। সাধক প্রেমের এই বিহ্বল আনন্দের ভিতরে যতক্ষণ আপনার পূর্ণতা লাভ করিতে না পারে, যতক্ষণ অপার অনন্তের মধ্যে নিজের সান্ত ভাব মিশাইতে না পারে, ততক্ষণ সে সাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

তাই, স্পর্শ-লোলুপা শ্রীরাধা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া লজ্জা মান ভয় নিন্দা ও কলঙ্ক পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ-শীতল বক্ষে বিরহ ক্লিষ্ট তনুখানি ঢালিয়া দিয়া আপনার পূর্ণতা লাভ করিল।

এইখানেই সাত্ত্বিকার সাধন-সাফল্য-প্রাপ্তি—এইখানেই সান্তের সহিত অনন্তের গাঢ় সম্মিলন।

(২)

আবার, সংসার ও সমাজের ভিতর থাকিয়া ভগবানের সাধনার অধঃপতন যে সম্ভব ইহারই আভাস দিয়া কবি গাহিয়াছেন,—

"বিহরতি বনে রাধা সাধারণ-প্রণয়ে হরৌ
বিগলিত নিজোৎকর্ষা দীর্ঘাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী-
মুখর-শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীং॥

শ্রীরাধা অন্তরে বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেও বাহিরে সে সংসারী—আয়ানের প্রেয়সী পত্নী। তাই সংসারের আবিলতার মধ্যে থাকায় প্রেমোৎকর্ষ প্রেমিকার হৃদয়

প্রান্তে সুনির্ম্মল গগনের কোলে এক ফোঁটা মেঘের মত যে অহঙ্কারের সঞ্চার করিয়াছে ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

জয়দেব স্বর্গের আদর্শ-তুলিকায় শ্রীরাধিকার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। উন্নতি ও অবনতির ভিতর দিয়া শ্রীরাধিকা সাধনার পথে যেমন করিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন জয়দেব শুধু তাহাই দেখাইয়াছেন।

শ্রীরাধিকার হৃদয়ের এ অহঙ্কার একমাত্র হৃদয়গ্রাহী ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ জানিত না। তাই প্রাণপ্রিয়া রাধিকাকে অপেক্ষা না করিয়া গোপীবৃন্দের সহিত তিনি ক্রীড়ায় রত হইলেন।

প্রিয়তমের এ অনাদরটুকু প্রেমিকার সহিল না।

তাই, পরাণ-বঁধু শ্যামের সাধারণ প্রণয় দর্শনে অহঙ্কারে আঘাত লাগায় শ্রীরাধিকার হৃদয়ে একটু ঈর্ষার উদয় হইল। তাই, প্রিয়তমকে ছাড়িয়া শ্রীরাধিকা চলিয়া আসিলেন।

ইহা নারী হৃদয়ের স্বভাব। আপনার প্রিয় বস্তুকে অন্যের উপভোগ্য দেখিলে স্নেহশীলা রমণীর চিত্তে এ ভাব আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

শ্রীরাধিকা যে অভিমান ভরে আপনার প্রিয়তমকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে অভিমান অধিকক্ষণ রহিল না। বিরহের কাছে সে আপনিই আসিয়া ধরা দিল।

তাই বিরহক্লিষ্টা দীনা রাধিকা নিভৃত নিকুঞ্জের অন্যতম কুটীরে শ্যামের পুনঃ সমাগম আশায় সখীকে কহিলেন ;—

* * * * *

"সখি হে কেশিমথনমুদারং
রময় ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারং"

শ্রীহরির জগন্মোহন মূর্ত্তি অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধিকা জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এখানে প্রিয়তমের পূর্ব্বলীলা মনে পড়ায় ব্যাকুল হইয়া সখীকে কহিলেন ;—

হস্তস্রস্তবিলাসবংশ-মনৃজুভ্রূবল্লি-মদ্বল্লবী
বৃন্দোৎসারী দৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলং।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিত স্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ ॥

সখি! ব্রজ বালাগণে পরিবৃত হইয়া নিকুঞ্জ মন্দিরে বিরাজমান প্রাণাধিক শ্রীহরির সকল লীলাই আমার মনে পড়িতেছে। তাঁহার তৎকালীন করস্খলিত বিলাস-বংশী, বঙ্কিমভ্রূ, গোপিকাদের পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত এবং স্বেদ বারিতে পরিপ্লুত গণ্ডস্থল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। সে দিন সহসা আমাকে উপস্থিত দর্শনে শ্রীহরি চমকিত হইয়া উঠিলেন। সলজ্জ হাস্য তাঁহার বদন মণ্ডলে অপরূপ শোভা সম্পাদন করিল। হায়! সেদিন প্রিয়তমকে পাইয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম আজ বসন্ত সমাগমে আনন্দোৎফুল্ল জগতের অপরূপ রূপলহরীও আমার অন্তরে সে আনন্দ দিতেছে না।

এইখানেই রাধিকার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইল।

আজ সে বিরহের মধ্য দিয়া সাধনার প্রকৃত পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(এ)

শ্রীরাধার বিরহ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এ বিরহের সান্ত্বনা নাই—নিবৃত্তি নাই—প্রতিকার নাই। ইহা আবেগময় উজ্জ্বল জল রাশির মত—বিরহিণীর প্রাণঘাতী।

এ বিরহে প্রেমিকার প্রাণ রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্যামের প্রিয় সমাগম বুঝি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না—বুঝি এই ক্ষণেই জীবন বিফলে যায়।

তাই, সহচরী চিন্তিতা হইয়া শ্যামের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। শ্রীহরির নিকট রাইয়ের বিরহবার্ত্তা জানাইতে গিয়া সখীর মুখে জয়দেব গাহিয়াছেন,—

"নিন্দতি চন্দন মিন্দুকিরণ মনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং।
সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা॥

বিরহ আজ তাহার প্রকৃত বিরাট রূপরাশি লইয়া রাধিকার অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাই, তাহার আজ এত যন্ত্রণা। তাই, আজ সে চন্দন, যাহা বিলাসিনীর বিলাসের প্রেয় উপাদান তাহা ত্যাগ করিয়াছে। ইন্দুকিরণ, যাহা জগতের শান্তিপ্রদ আজ তাহাও তাহার নিকট অপ্রিয়। আর, মলয়পবন, যাহা কবি কল্পনায় বিরহোদ্দীপক হইলেও বিশ্বের অনুরঞ্জক বৃকভানুনন্দিনী রাধার আজ তাহাও গরলবৎ। সব ছাড়িয়া আজ সে প্রিয়তমের উৎকট বিরহে দীনা। কামভয়ে (অন্তত্র কামনা) শ্রীকৃষ্ণে বিলীনা।

— বিরহের এইরূপ প্রাখর্য্যই সাধকচিত্তে ভগবৎপ্রাপ্তির উপযোগিতা আনিয়া দেয়; সুতরাং সাধকশ্রেষ্ঠ রাধিকা আজ বনমালীর উপযুক্তা। আজ তাহার প্রেমের সাধন সার্থক

(৪)

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই আজ রাজনন্দিনীর একমাত্র সম্বল; আর তাহার কিছুই নাই। অভীষ্ট দেবতার অপরূপ রূপরাশি হৃদয়ে ধরিয়াই রাধা আজ শ্রীহরির প্রেমহ্রদে নিমগ্না।"

• আজ তাহার হৃদয়ে শ্রীহরি, ধ্যানে শ্রীহরি, ধারণায় শ্রীহরি, তাহার সমাধিও, বুঝি, শ্রীহরি। আজ সে বিহ্বল হইয়া বিশ্বের মরমে মরমে শ্রীহরিকে অনুপ্রবিষ্ট দেখিতেছে।

এখন বিরহ-যন্ত্রণায় যদি জীবন যায় তাহাতে শ্রীরাধিকার আর ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই। তাহার চিত্তবৃত্তি এখন ধীর, স্থির, নিরুদ্ধ, অস্তিত্বহীন প্রায়।

সে এখন সমাধিমগ্না।

একথা আমরা সখীর মুখেই পাইয়াছি। সহচরী শ্রীহরিকে বিরহবার্ত্তায় জানাইয়াছে,—

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামং। ইত্যাদি।

গীতগোবিন্দের অন্যান্যস্থলেও জয়দেব শ্রীরাধার সাধন তত্ত্বের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৫)

বিশ্ব জুড়িয়া শ্রীরাধিকার অন্তরে আজ ভগবানের ডাক পড়িয়াছে। তাই, ভক্তের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারিলেন না। যে কণ্টকটি ভক্তঅঙ্গে বেদনার সৃষ্টিকরে ভগবান্ তাহা আপন বক্ষে তুলিয়া লন। তাই, শ্যামের বিরহবিধুরতা দর্শনে প্রিয়সখী অভিসারের উদ্যোগ করিয়া রাধিকাকে কহিল,—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহর-বেশং
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশং।

শ্রীরাধিকা যাহা চায় তাহা পাইয়াছে। যাহার জন্য সে লজ্জা, মান, ভয়, যশ, ঐশ্বর্য্য সকলি বিসর্জ্জন দিয়াছে, যাহার জন্য এই দীর্ঘদিন অসহ্য কঠোর বেদনা আপনার বুক পাতিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছে আজ তাহা সে পাইয়াছে।

সে চায় বিশ্বের প্রেমানন্দে আপনাকে বিলীন করিতে। সে চায়—বাহিরের অভীষ্ট দেবতাকে অন্তরের মণিময় সিংহাসনে চিরাধিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে। সে চায় বিশ্বের বহিরাবরণের অন্তরালে লুকাইয়া প্রিয়তমের অমৃতোপম অতৃপ্ত চির উপভোগ। চিত্তের অন্তরালে থাকিয়া বিরহের মধ্যে তাহার সে কামনা আজ পূর্ণ হইয়াছে। তাই তুচ্ছ নায়িকার অভিসারে আর তাহার মন নাই, শক্তি নাই।

তাই অভিসারে সহচরীর সকল আয়োজন ব্যর্থ হইল। জয়দেব এই অভিসারের বর্ণনায় শ্রীরাধিকার জারত্ববুদ্ধি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীরাধিকার প্রেমোৎকর্ষ অপেক্ষা ভগবানের ভক্তপ্রিয়তাই অধিক প্রকাশ পায়।

(৬)

গীত গোবিন্দের অপরাংশে বিরহিনীর বিরহ বর্ণনায় জয়দেব প্রেমিকার প্রেমোৎকর্ষই জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং সে সব কথার পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র।

গীত গোবিন্দের দশম সর্গে বর্ণিত শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের সামান্য আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

শ্রীরাধিকাকে অভিসার গমনে অশক্ত জানিয়া বিরহসন্তপ্ত শ্রীহরি রাধার কুঞ্জে আসিয়া উপনীত হইলেন।

তখন শ্রীরাধা যে অভিমানের বশবর্ত্তিনী হইয়া প্রিয়তমকে কটূক্তি করিয়াছিল, তাহা সাধিকার সাধনাপথের কণ্টক নহে; তাহা মানব হৃদয়ে স্বাভাবিক।

বহুদিন পরে, বহু সাধ্য-সাধনার পরে অথবা দীর্ঘ বিরহের পরে নিজের প্রিয়জনকে পাইলে মানব হৃদয়ে এ অভিমান আপনিই আসিয়া থাকে। তাই স্নেহসুখবঞ্চিত প্রবাসী পুত্রের হৃদয় প্রবাস-প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জননীর পবিত্র স্নেহে আপনাকে পূর্ণ করিয়া এই অভিমানের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অথবা পতিপ্রাণা প্রিয়পত্নীর অভিমান ভাঙ্গিতেই পতির সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হয়।

বস্তুতঃ ইহাকে অভিমান উপাধি দেওয়া যায় না। অভীষ্ট প্রাপ্তির আনন্দোচ্ছ্বাসই ইহার প্রকৃত অভিধান।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চাটুবাক্যে রাধিকার দুর্জ্জয় মান ভঞ্জন করিলেন। ইহাতে ভগবানের নিকট ভক্তের সমধিক আদরই প্রকাশ পায়।

ভক্ত কবি জয়দেব এইরূপে প্রেমিক সাধকের আদর্শ-তুলিকায় এবং বিচিত্র সাধন-বর্ণে শ্রীরাধিকার চরিত্রে যে পবিত্র প্রেমের ছবি ফলাইয়া তুলিয়াছেন আমি তাহারই সমালোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

যাঁহারা সাধক ও প্রেমিকের প্রাণ লইয়া জয়দেবের শ্রীরাধিকাকে দেখিয়াছেন তাঁহারাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিম উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যথা কাব্যগত নায়িকার হিসাবে গীতগোবিন্দে শ্রীরাধিকাকে দেখি নাই; তাই তাহার কথা বলিতে পারি না।

শ্রীঅভিলাষ চন্দ্র কাব্যতীর্থ।

মদন ভস্ম।

বদ্ধ পদ্মাসনে বসি' ধ্যানমগ্ন যোগী,
রুদ্ধশ্বাস নির্নিমেষ লোচনত্রিতয়,
গুরুভারে বসুন্ধরা কাঁপে টলমল,
পাতালে বাসুকী কাঁপে থর থর থরি
অতি কষ্টে ভূমিভার করিয়া ধারণ;
বিশ্ব বুঝি ডুবে চির অতল পুরীতে।

আড়ম্বরহীন হেন উগ্র তপস্যায়
শান্তভাব পরিপূর্ণ সে আশ্রম দেশে
কলরব অলিকুল নীরব গুঞ্জনে
পাখীদল নাহি গাহে, শাসনে নন্দীর
মৃগকুল ইতস্ততঃ করেনা ভ্রমণ,
পত্রপুষ্পতরুদল নিষ্পন্দ সুস্থির।

সহসা সে দেশে পশি পর্ব্বতনন্দিনী
সখী সহ ত্রিলোচনে করে নিরীক্ষণ—
উন্নমিত ঊর্দ্ধবপুঃ, অধোদেশ যেন
নিথর নিশ্চল স্থির নিরোধে বায়ুর,
ভুজঙ্গ-জড়িত ঘন বদ্ধ জটাজাল,
সমুন্নত অংসদেশে বাঁধা মৃগাজিন
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-লগ্ন শোভে গাঢ় নীল,
ভ্রূবিক্ষেপহীন অক্ষি স্থির-পক্ষ্মপুট
নাসিকাগ্র লক্ষ্য করি কৃচ্ছ্র তপে রত;
সেই মূর্ত্তি শরতের জলধর সম
অচঞ্চল থির ধীর প্রশান্ত গম্ভীর,
শান্ত সরোবর যেন বীচিক্ষোভহীন
নিবাত নিষ্কম্প দীপ অথবা নিশীথে।

পুষ্প-পয়োধর ভারে অবনতা বালা
বালারুণারুণ বাসে সৌম্য কলেবর
পুষ্পদল পল্লবিতা লতা সম কম,
ঢালিয়া চরণ তলে ফুল্ল ফুল দল
মালা নিয়ে গলদেশে করিতে স্থাপন—
যেমতি উদ্যতা সতী; টঙ্কারিল হুয়ে
ফুল-ধনু ফুলবাণ ফুলধনু মাঝে,
ঝঙ্কারিল অলিকুল সুমধুর রোলে;

দিকে দিকে পিকবধূ ধরে কুহুতান,
মৃগ মৃগী ছুটাছুটি করে চারি ভিতে,
কাম-সখা ঋতুরাজ মনোহর সাজে
বিরাজিত পুষ্পরাজি-রাজিত কন্দরে ;
মুঞ্জরিল মঞ্জু কুঞ্জে বিকচ বল্লরী
শাখিশাখে পাখিদল কল কল রবে
ঘোষিল অকাল বার্ত্তা বসন্ত ঋতুর।

সুদৃঢ় আসন-বন্ধ হইল শিথিল,
বেদি' পরে যোগিচিত্ত টলিল চকিতে,
চন্দ্রোদয়ে ধৈর্য্যচ্যুত মহাসিন্ধু সম
উছলিল ধূর্জ্জটির সুবিশাল বপুঃ,
খুলে গেল দ্বার যত শত পথে বেগে।
'কি হেতু অকালে চিত্ত উঠিল নাচিয়া ?'
পরীক্ষা করিতে যোগী জিতেন্দ্রিয় বীর
ইতস্ততঃ করে' ধীর দৃষ্টি সঞ্চালন
নেহারিল বাণাসন সহ পুষ্পবাণ
নিক্ষেপিছে পুষ্পবাণ তাঁহারি উপর ;

উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রদেব দীপ্ত ক্রোধানলে,
বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র কাঁপে ওষ্ঠাধর
কণ্ঠে গর্জ্জে ভুজঙ্গম হুঙ্কারি ভীষণ ;
তপোভঙ্গে ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গী করিয়া
ঊর্দ্ধ আলা সমাযুক্ত তৃতীয়াক্ষি হ'তে
প্রলয়ের ভীমবহ্নি করে উদ্গিরণ ;

"সংহর সংহর প্রভো ক্রোধ ভয়ঙ্কর"
অমর বৃন্দের বাণী উঠিল আকাশে,
মুহূর্ত্তে নয়নজাত দীপ্ত হুতাশন
ভস্মীভূত মদনেরে করিল মহীতে।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১। নূতন বঙ্গের পুরাতন কাহিনী।—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড প্রণীত এবং 'বরিশাল শাখা পরিষদের উৎসাহ ও অনুমোদনে প্রকাশিত'। মূল্য একটাকা, ছাত্রদের জন্য বার আনা।

"বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।" গ্রন্থকার মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিতেছেন 'উল্লিখিত আশ্বাস বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার অবতারণা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি ; নচেৎ মৎসদৃশ অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করা নিতান্ত ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে'। তাঁহার এই বিনয়ের প্রশংসা করি, কিন্তু তিনি যে সমস্ত তত্ত্ব সঙ্কলিত করিয়াছেন তাহা যে নিতান্তই তুচ্ছ, এমন নহে। তাঁহারই কথায়, "বাঙ্গালার ইতিহাস অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, কিন্তু খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর দেশের অবস্থা অর্থাৎ তৎকালীন বাঙ্গালার সমতল-বাসী হিন্দু, মুসলমান এবং পার্ব্বত্য অঞ্চলের মানবসমূহ কতগুলি জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং তাহারা কি ভাবে কাল যাপন করিত, তত্তদ্ বিবরণ সম্বলিত কোন ইতিহাস এ যাবৎ বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হয় নাই। প্রাচীন রোম গ্রীসের লোকেরা কিরূপ পোষাক পরিত, কি কি ব্যায়াম করিত, তাহাদের আমোদ প্রমোদ কিরূপ ছিল, কি তাহাদের আহার্য্য ছিল, ইত্যাদি বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের মস্তিষ্কে বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কিন্তু দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের দেশের জীবন কিরূপ ছিল সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে ঠকিতে হইবে। সুতরাং বৃন্দাবন বাবু এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের একটা উপকার করিয়াছেন। আর কিছুদিন পরে হয় ত এসকল সংগ্রহ করারও উপায় থাকিত না।

'নূতনবঙ্গ' কথাটী গ্রন্থকার বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সী অর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন এবং 'পুরাতন' শব্দে তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীকেই বুঝাইতেছেন। সুতরাং 'পুরাতন' শব্দটা খুব প্রাচীন সময়কে বুঝাইতেছে না। অনুপ্রাসের খাতিরে এরূপ নামকরণ হয় নাই ত?

সাধারণতঃ ইতিহাস বলিতে এদেশে রাজাদের অর্থাৎ যাহাদের পরপুরুষ এখন জমীদার তাহাদেরই শুধু বিবরণ বুঝায়। বৃন্দাবন বাবু সে সব স্বাদহীন বিবরণ সংগ্রহ না করিয়া যে দেশের ও জন সাধারণের অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তিনি তখনকার দিনের জাতি বিভাগ, ব্যবসায়ভেদ, চিকিৎসা প্রণালী হাট বাজার, খেলা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য স্থাপত্য, চাষ আবাদ, আচার ব্যবহার প্রভৃতির বৃত্তান্ত সংগৃহীত করিয়াছেন। আর একটী বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তখনকার দিনে যে মানুষ বিক্রয় হইত একথা নিয়া সে দিন কলিকাতা 'সামাজিক গবেষণা' সমিতির অধিবেশনেও আলোচনা হইয়াছে। বৃন্দাবনবাবু দলিল পত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে গ্রন্থখানিকে আমরা অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করি।

গ্রন্থের প্রথমেই কোন্ কোন্ স্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বিবরণ আর একটু বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। এবং গ্রন্থের ভিতরেও স্থানে ২ পাদটীকায় কোথা হইতে তথ্যটী গ্রহণ করা হইল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। অবশ্য সব বৃত্তান্তই যে তিনি পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এমন নহে; অনেক বিষয়ই হয় ত কিম্বদন্তী হইতে, কিংবা নিজের অভিজ্ঞতা কিংবা গ্রামবৃদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু সে সকল বিষয়েরও মূল সূত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা উচিত ছিল।

আর গ্রন্থখানায় প্রচুর মুদ্রাকরপ্রমাদ রহিয়াছে। আশা করি, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধিত হইবে।

বৃন্দাবন বাবুর বর্ত্তমান সংগ্রহ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ভবিষ্যতে তিনি ইহা আরও বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইবেন, এ আশাও আমরা করিতে চাই।

২। সতীর গৃহধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ প্রণীত এবং ঢাকা কটন লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রেশমী মলাট, মূল্য একটাকা।

গ্রন্থখানার কাগজ ও মলাট ইত্যাদি ভাল কিন্তু ছাপার ভুল স্থানে স্থানে রহিয়াছে। খুলিতেই ৫৭ম পৃষ্ঠায় আমাদের দৃষ্টি পতিত হইল এবং এই এক পৃষ্ঠায়ই 'প্রশংসা' শব্দটী দুই বার 'প্রসংসা' মুদ্রিত হইয়াছে, 'শ্বশুর' শব্দ 'শশুড়' হইয়াছে, শ্বশুরের পত্নী বাচক শব্দে অনাবশ্যকরূপে 'ড়' পড়িয়াছে, এবং 'অভ্যস্ত' 'অভ্যাস্ত' হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে মনে হয়, ইহা ভ্রমহীন হওয়া উচিত ছিল।

বাংলাদেশে ধুঁয়া উঠিয়াছে 'পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করিয়া থাকে।' এমনদিনে একজন পুরুষ স্ত্রীলোককে পতিভক্তি শিখাইবার জন্য গ্রন্থ লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বাংলার হৃদয় এখনও অপরিবর্ত্তিত; এবং ইব্‌সেন্ বার্ণার্ড শ'র 'নূতন নারী'র (New Woman) আদর্শ কলিকাতার বাহিরে ক্রিয়া করিতেছে না।

ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্যে একটা তর্ক উঠিয়াছে, নারীত্বের চরম পরিণতি পত্নীত্বে না মাতৃত্বে? টলষ্টয় প্রভৃতির মতে মাতৃত্বই নারীত্বের চরম উদ্দেশ্য; ইব্‌সেন্ প্রভৃতির মতে পতির সম্পূর্ণরূপে সমকক্ষ—পতির সকল অধিকারে অধিকারিণী পত্নী হওয়াই নারীর চরম লক্ষ্য। ইহা ছাড়া, ইউরোপে আধুনিক সাহিত্যে এমনও নারীচরিত্রের সৃষ্টি হইতেছে, যে সন্তানের জননী হওয়া ভদ্রমহিলার অনুপযুক্ত মনে করে এবং সম্ভাব্যমান মাতৃত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আত্মহত্যাও করিয়া থাকে। এমন দুর্দ্দিনে সুধেন্দুবাবু কালিদাসের কণ্বমুনির কিংবা কবিকঙ্কণের গৃহীত গৃহিণীর আদর্শ বাঙ্গালার কুলবধূর সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা আনন্দের কথা।

অবশ্যই, এরূপ গ্রন্থ সাহিত্যে স্থায়ী আসন পায় কিনা

সন্দেহ। উপহারের উপযুক্ত গ্রন্থ; এবং এই উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হইবে, এ ভরসা আমরা করি।

শ্রীউমাপতি ধর।

কৃপণ

সখি

তুমি নিজে কহিছ কৃপণ ?
দাতা তবে না বুঝি কেমন !
ওই যে বিকচ কলি জগতে 'আপনা' বলি
সুষমা-সুবাস-মধু করে বিতরণ,
ভাবে না নিজের কথা, দিতে শুধু আকুলতা
হৃদয়-ভাণ্ডার খালি করিয়া মোচন,—
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

২

ওই যে অদৃশ্য-টানে নদী ধায় সিন্ধু পানে
সরস শীতল করি নিখিল ভুবন,
রাখে না কিছুর আশ বুক ভরা 'কল'-ভাষ
ব্রত শুধু তাপিতের দাহ নিবারণ,—
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

৩

ওই যে বাদল-ধারা ঝরিছে বিরাম-হারা
মরুভূ ধরায় করি শ্যামল শোভন,
প্রতিদান নাহি মাগে শুধু করে অনুরাগে
শুষ্ক-কণ্ঠ চাতকের পিপাসা হরণ,—
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

৪

ওই যে ঊষার পাখী ললিত সুরবে ডাকি'
করিছে অখিল-চিতে অমিয় সিঞ্চন,
ধারে না কাহারো ধার দিয়ে নিজে উপহার
আপনার মহাভাবে আপনি মগন,—
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

৫

ওই যে সোনার চাঁদ -রহিয়াছে প্রেম-ফাঁদ
দিশে দিশে সুধা-কণা করি বিতরণ,
চাহে না কাহারো মুখ, শুধু হর্ষ, শুধু সুখ,
পরায়ে ঘুমন্ত-বিশ্বে স্বপ্ন-আভরণ,—
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

৬

ওই যে বসন্ত ধীরে চুম্বিয়া এ ধরণীরে
জাগায় অবশ প্রাণে তড়িত-চেতন,
করে না যাচনা কিছু, নাহি ভাবে উঁচু নীচু,
প্রীত শুধু বিকাইয়ে সর্ব্বস্ব আপন,—
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

৭

ওই যে লতাটী প্রিয়ে, সহকারে আলিঙ্গিয়ে
রচিয়াছে একখানি মায়া-নিকেতন,
না কয়ে একটি বাণী শুধু লয় ধন্য মানি
প্রাণেশে প্রসূন-অর্ঘ্যে করিয়া পূজন,
তুমিও কি তেমতি কৃপণ ?

৮

তুমি যেগো একাধারে আর্পিয়াছ অভাগারে
সবাকার ভালবাসা করি আহরণ;
তৃষিত ব্যথিত চিত, তৃপ্ত আজি আশাতীত,
পূর্ণ যেন আজন্মের উদগ্র সাধন!
তুমি শুধু রিক্ত-করে চেয়ে আছ প্রেম ভরে
গোপন অন্তর মুক্ত করিয়া কখন!
হে দেবী, জীবনময়ী, কল্যাণী প্রেয়সী অয়ি,
তবু যদি আপনারে কহ গো "কৃপণ"
দাতা তবে না বুঝি কেমন !!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

(বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন)

গত কয় বৎসর বঙ্গের নানাস্থানে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। সম্মিলন মাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণ উপকারী সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মিলনে যে পরিমাণে অর্থব্যয় হয় এবং যেরূপ বহুসংখ্যক সাহিত্যিকের আগমন হয় তাহাতে কাজ যে সেই পরিমাণে আশানুরূপ হয় না এই কথাটা জানাশুনা লোকের মধ্যে প্রায়ই শুনা যায়। অথচ এ বিষয়ে রীতিমত আলোচনা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হ না। এই অত্যাবশ্যক আলোচনাটী সাময়িক পত্রাদিতে আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। আমার মতগুলিই অভ্রান্ত এবং সকলের অনুসরণীয় এইরূপ আমি ভাবি, আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাকে এত বড় নির্বোধ বিবেচনা করিবেন না।

বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের পরস্পর আলাপ পরিচয় হইবে এবং বিগত বৎসরে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিভাগে কে কিরূপ কাজ করিয়াছেন তাহা জানিতে পারা যাইবে লোকে স্বভাবতঃ এইরূপ আশা করে। কিন্তু তাহাদের আশা কতটুকু সফল হয় সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। যে সকল দেশবিখ্যাত মনীষি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন তাঁহারা বিগত বর্ষের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা অতি অল্পই করিয়া থাকেন। আর সাহিত্যিক বর্গের পরস্পর পরিচয়ের জন্য বিশেষ কোনও বন্দোবস্ত থাকিতে কোনও অধিবেশনে ত দেখি নাই।

কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলা যাক। আজকাল প্রতি অধিবেশনে পাঁচজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। যিনি সাহিত্য বিভাগের সভাপতি তিনি যদি গত বৎসরে বাংলা সাহিত্যে কোন্ কোন উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, কোন্ কোন্ রচনাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে, কোন্‌টি বা সমাজের পক্ষে হিতকারী হয় নাই, ইত্যাদি প্রসঙ্গের আলোচনা করেন তাহা হইলে বাস্তবিকই শ্রোতৃবর্গের উপকার হয়। সভাপতি যে নিজের মতই জোর করিয়া বলিবেন তাহা নহে—অন্যান্য বিজ্ঞ লোকেও কি বলিতেছেন তাহারও উল্লেখ করিবেন। কোনও বিষয়ে যদি দুই দলে দুইটি বিভিন্ন মত পোষণ করেন তাহা হইলে সভাপতি দুই দলেরই বক্তব্য উপস্থিত করিবেন। অবশ্য এরূপ একটি অভিভাষণ লিখিতে সভাপতিকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইবে; তবে তিনি আবশ্যক বিবেচনা করিলে জন কয়েক সহকারীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন এবং সহকারীগণের শ্রমলব্ধ বিষয়গুলি আপনার অভিভাষণের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। *

প্রায়ই দেখা যায় সমাজের সম্মিলনের সভাপতিগণ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহারা কেবল বাংলা সাহিত্যের আলোচনা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান কালের ইংরাজি ফরাসী, হিন্দি, মারাঠী প্রভৃতি সাহিত্যের আলোচনা করিবেন এবং সেই সকল সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অবস্থা প্রশংসার্হ কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, যদি আমরা এইরূপ আশা করি তাহা হইলে কি নিতান্ত অন্যায় হয়?

সাহিত্য বিভাগে যেরূপ, ইতিহাস বিভাগেও সেইরূপ সভাপতির নিকট গত বর্ষের ঐতিহাসিক গবেষণার সমালোচনা শুনিবার আশা করিয়া থাকি। প্রায়ই দেখা যায় সভাপতি মহাশয় নিজের ও নিজের দলের কাজ টুকুর কথাই বলিলেন, অন্যান্য কর্ম্মীর কাজ সম্বন্ধে ভাল করিয়া কিছু বলিলেন না। ইতিহাস বিভাগে এই দলাদলিটা এত বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে সাধারণে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে। সভাপতি মহাশয় এই সঙ্কীর্ণতার গলি অতিক্রম করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। বার্ষিক আলোচনার আর একটি শুভ ফল এই ফলিবে যে, আমরা জানিতে পারিব কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে কোনও কাজই হইতেছে না। হয় ত জানিতে পারিব সিরাজদ্দৌলা এবং পাল

---

* আমার যতদূর জানা আছে, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই একটা করিয়া বার্ষিক সাহিত্য-সমালোচনা যথোপযুক্ত শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঠিক বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত বিভাগের খবর দিতে যাওয়ায় তাঁহার একার উপর বড় বেশি চাপ পড়ে।

বংশ সম্বন্ধে বাঁধানুবাদ শুনিতে শুনিতে বঙ্গবাসীর কাণ ঝালা পালা হইয়া যাইতেছে অথচ আমাদের সামাজিক ইতিহাসের নানা বিভাগে উল্লেখযোগ্য কাজ অতি অল্পই হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, সকলেই জানেন রাজপুতনার ইতিহাস নব্য বঙ্গসাহিত্যে বেশ একটি ছাপ রাখিয়াছে। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে টড সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার পর আর কাহাকেও ত রাজপুতনার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে বড় একটা দেখিলাম না। অথচ রাজপুতনায় প্রবাসী বাঙ্গালীর অভাব নাই। আর দেশ ভ্রমণ উপলক্ষেও সে দেশে অনেক বাঙ্গালী গিয়া থাকেন। শুনিয়াছি এখনও সেখানে চারণের গান শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও লেখক কি তাহা এ পর্য্যন্ত সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন?

দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আজকাল বাংলা সাহিত্যে তেমন কাজ কিছু হইতেছে না,—যে টুকু হইতেছে তাহার মূল্য কত এবং কি করিলে ভাল রকম কাজ হয় সে বিষয়ে দর্শন ও বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিদ্বয় বিচার করিবেন। নানা কারণে আপাততঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশিত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে সভাপতি মহাশয় যদি বৈদেশিক ভাষায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনাবলির সারোদ্ধার করিয়া আমাদের উপহার দেন তাহা হইলে আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই। তবে এ কাজ এক জনের পক্ষে অসম্ভব, সেইজন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা আবশ্যক। মনে করুন একজন রাসায়নিককে ভার দেওয়া হইল, আপনি বিগত বৎসরে রসায়ন বিদ্যার নানাদেশে কিরূপে গবেষণা হইয়াছে তাহারই একটী সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্মিলনে পাঠ করুন। *

সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হইবার পর অনেকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষত্ব মোটেই থাকে না—লেখকগণ তাড়াতাড়িতে যা হক কিছু একটু লিখিয়া আনিয়া পড়েন। ইহাতে অনেক সময় ব্যয় হয়—যথা সাহিত্যিকগণের মধ্যে পরিচয়ের জন্য সময় পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া (সম্মিলনের ভাষায় প্রবন্ধগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত করিয়া) যদি সভাপতি লেখকগণকে একে একে শ্রোতৃমণ্ডলের নিকট পরিচিত করিয়া দেন এবং কোনও লেখকের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা সম্বন্ধে কাহারও কোনও জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি যদি প্রশ্ন করিতে পারেন ও লেখক তাহার যথোচিত উত্তর দান করেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই অত্যন্ত উপকার হয়।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যত সময়ের আবশ্যক সম্মিলনে তত সময় পাওয়া যায় না,—এরূপ একটা আপত্তি উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে আমি বলি যে নানা অনাবশ্যক কার্য্যে সম্মিলনের মূল্যবান্ সময়ের অনেকটা অপব্যয়িত হইয়া থাকে। কতকগুলি মামুলি ধরণের গান ও কবিতা পাঠ বাদ দিলে কোনও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই এবং নিমন্ত্রিত বর্গকে সাদর সম্ভাষণ ও অনুষ্ঠাতৃবর্গকে ধন্যবাদ প্রদানের পালা অত্যন্ত দীর্ঘ না করিলেও চলে। শেষের দিন কতক গুলি প্রস্তাব সমর্থনে অনেক সময় যায় কিন্তু তাহাতে ফল অনেক ফলে না।

আর একটা জিনিস সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সম্মিলনে অনেক বিখ্যাত লেখক অনুপস্থিত থাকেন। সন্দেহ হয়, সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ লেখকদিগকে আনিবার জন্য যথোচিত যত্ন না করায়ই এইরূপ ঘটে। রবি বাবুর মত একজন সাহিত্য সম্রাট্‌কে আনিতে হইলে একজন মাতব্বর লোকের উচিত তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া আনা। তা ছাড়া এটী একটী সুবিদিত রহস্য যে অনেক ভদ্রলোক সাহিত্যের বাণিজ্য অবলম্বন করিলেও লক্ষ্মী তাঁহাদের গৃহে বাস করেন না। এরূপ লোককে পাইতে হইলে সম্মিলনের কর্ত্তব্য কোনও বন্ধুর সাহায্যে গোপনে তাঁহাদিগকে পাথের (Travelling allowance) প্রদান। ইহাতে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, সভামণ্ডপের সজ্জা, রাজসই ভোগ প্রভৃতি

* প্রবন্ধটী লেখা হইবার পর কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রতিভা'তে দেখিলাম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র সরকার মহাশয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের রসায়ন চর্চ্চার একটী সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

খরচ কিছু কমাইলেই তাহা পাওয়া যাইবে। রসনার ভোগ কমাইয়া মস্তিষ্কের ভোগ বাড়াইতে হইবে।

আর একটী ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। সম্মিলনের অঙ্গ স্বরূপ একটী পাঠাগার (reading room) স্থাপন। সভাপতিগণ যে সকল পুস্তকের নাম উল্লেখ করিবেন, লোকে সেই পাঠাগারে সে সমস্ত পুস্তক নাড়াচাড়া করিতে পারিবেন এবং ইচ্ছা হইলে কোনও পুস্তক কিনিতেও পারিবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্মিলনের চারিশাখার যুগপৎ অধিবেশন

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর সতীশ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে আলোচনার অবসর দিয়াছেন। তিনি নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। উহাদের সকলগুলি হয় ত আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি না। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পরিচালন প্রণালী ইতস্ততঃ সমালোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমাদেরও কিছু বক্তব্য আছে। তন্মধ্যে দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলন হইতে সম্মিলনে চারিটি স্বতন্ত্র শাখার অধিবেশন হয়। কেবল চারিটি স্বতন্ত্র শাখা হইলে বিশেষ আপত্তি কিছু থাকিত না বটে, কিন্তু এই চারিটি শাখার অধিবেশন একই সময়ে হওয়াতে এই প্রথা নানা মতান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে এই শেষোক্ত প্রস্তাব লইয়া ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। সাধারণতঃ পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ নাই, কিন্তু এ বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস একটু দেখা প্রয়োজনীয়। তর্কবিতর্কের পরে ভোট লিয়া অবশ্য যুগপৎ-অধিবেশনপ্রার্থীগণ জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে জয় বিনা কৌশলে লাভ হয় নাই। প্রথমতঃ, এই প্রস্তাব অভ্যর্থনা সমিতিতে গৃহীত ও এতদর্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া ফেলা হইয়াছিল, ও সংবাদ-পত্রাদিতে এরূপভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, তাহাতে সম্মিলনে সমাগত প্রতিনিধিগণের মতের অপেক্ষা রাখা হইয়াছে, এ ধারণা অনেকের মনেই ছিল না। প্রস্তাবের স্বপক্ষে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ মহাশয়গণ স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এক সময়ে অধিবেশন হইবে জানিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে যুগপৎ অধিবেশনের বিরোধী হইয়াও যাহাতে প্রস্তুত ব্যবস্থার শেষ মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনে বিভ্রাট না ঘটে, তজ্জন্যই শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ যুগপৎ অধিবেশনের পক্ষে মত দেন।

দ্বিতীয়তঃ, 'হাঁ' বা 'না' উভয়পক্ষবাদীগণের হস্ত গণনা করিয়া প্রথমবার বিরুদ্ধবাদীগণের পক্ষেই বেশী হইয়াছিল। ইহাতে আপত্তি করিয়া দ্বিতীয়বার গণনা করায় 'হাঁ'র পক্ষে ২।১টি বেশী দেখা যায়। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণের দুই ভাগ করিয়া দেখাইবার (Division) প্রার্থনায় 'না'র দলের স্থান মঞ্চের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হয়। কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে ২।১ জন প্রধান ব্যক্তিকে টানাটানি করিয়া মঞ্চের উপর লোক উঠাইতে দেখা গিয়াছিল। অতঃপর ৭।৮টি ভোট বেশী হইয়া 'হাঁ'র দলের জয় হয়। সভাতে প্রায় একশত লোক উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার মত স্থানে এরূপ অল্প সংখ্যার বেশী কমের উপর নির্ভর করিয়া একটা আমূল পরিবর্ত্তন করা উচিত হয় নাই বলিয়া আমরা মনে করি। জনসাধারণের মতে যেখানে কার্য্য হয় সেখানে সর্ব্বত্রই একটা স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য (যথা, ⅔, ¾) দেখিয়া কায হয়।

এইরূপে নূতন ব্যবস্থার জয় হইয়াছিল। প্রস্তাবকারীগণ বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, ইহা কেবল কলিকাতার জন্যই অন্যত্র ইহার সুবিধা বা প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহার একটা প্রভাব আছে। ফলে বর্দ্ধমানে এবং যশোহরেও যুগপৎ অধিবেশনই হইয়াছে। কলিকাতা সম্মিলনে চারি শাখার একত্র অধিবেশন কিরূপ হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ভুক্তভোগীগণ জ্ঞাত আছেন। দুইটি শাখার সভাপতিদ্বয়ের অভিভাষণ পাঠকালে গলা চড়াইয়া পরস্পরের স্বর ডুবাইবার চেষ্টা, একজন সভাপতির গণ্যমান্য শ্রোতা না পাইয়া সভা ছাড়িয়া যাইবার ভয় প্রদর্শন, অপর

এক সভায় লোক জুটাইবার জন্ত কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক আগন্তুক-গণকে টানাটানি, এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ—ইহা সকলেরই মনে থাকিবে। কার্য্যবিবরণীতে যত কৃতার্থতার আভাসই দেওয়া হউক না কেন, সাধারণের এ ব্যবস্থা মনঃপুত হয় নাই। সহর মফঃস্বলে নানা সংবাদ পত্রে এ বিষয়ে মন্তব্যাদি পাঠ করিলেই ইহা জানা যাইবে। কলিকাতার পরে নূতন ব্যবস্থায় যত অধিবেশন হইয়াছে কোনটিতেই সুফল হয় নাই। যশোহর অধিবেশনের সমালোচনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ভারতবর্ষে" ইহার আলোচনা করিয়াছেন। সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত আমরা একমত নহি, কিন্তু তিনি যোগ্যতার সহিত দেখাইয়াছেন যে,নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সম্মিলন পূর্ব্ব আদর্শ পরিত্যাগ করতঃ এক নূতন আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন, এবং তাহাতেও বিফলকাম হইতেছেন। সাহিত্যে লোকের অনুরাগসঞ্চার, ও সাহিত্য-সৃষ্টি ইহার কোন্ আদর্শ সম্মিলনের আদর্শ হইবে, তাহা লইয়া চূড়ান্ত বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। যাঁহারা কলিকাতা সম্মিলনে যুগপৎ অধিবেশনের বিপক্ষে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধহয় পূর্ব্ব আদর্শই বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী মনে করেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রায় কমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। দেখা যাইবে, ইহাদের মধ্যে বিশেষজ্ঞও আছেন। যতদূর মনে পড়ে, মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপরোক্ত প্রবন্ধ রচক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতিরও এই মত। প্রবাসী, গৃহস্থ, স্বরাজ, খুলনাবাসী প্রভৃতি যাঁহারা সম্মিলনের উদ্দেশ্য ও প্রণালী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই মতই দিয়াছেন।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের আদর্শ কি হইবে তাহা লইয়া সম্মিলনে বিচার এ-পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু এ বিচার হওয়া এখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। নূতন উপায়ে যে সকল হইতেছে না তাহা রমেশ বাবু দেখাইয়াছেন। অপর দিকে আমরা জানি যে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন তাঁহারা একবার কোন সম্মিলনের অভিজ্ঞতা পাইলে আর যাইতে চাহেন না। কারণ, সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্মিলনে গিয়া যদি কিছু শুনিতে চাহে তাহা এই—বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ মনীষিগণ কোন্ বিষয়ে কি নূতন বলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে মৌলিক চর্চ্চায় সাহায্য করিবার শক্তি সাধারণের নাই, এবং অতিগভীর নূতন তত্ত্বসকলও তাহাদের দুরধিগম্য। ফলে, সম্মিলনের প্রতি সাধারণের অনুরাগ কমিয়া গিয়া উহা সাহিত্যের বহির্ভাগে কোন একটা উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির প্রবেশ করাইতে হইলে সাধারণকে এরূপ দূরে রাখিলে চলিবে না। বর্ত্তমান যুগপৎ অধিবেশনের ফল বা অন্তর্গূঢ় উদ্দেশ্য যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়গণের অভিভাষণাদিতে সাধারণকে দূরে রাখিবার কোন উদ্দেশ্য নাই, বরঞ্চ এই সকল অপেক্ষাকৃত নীরস বিষয়ে সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তাই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ শাখাগুলির এইরূপ একই সময়ে অধিবেশনে এই উদ্দেশ্য পণ্ড হইতেছে, এবং বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে, অপর উদ্দেশ্যটিও সাধিত হয় না।

এরূপ অবস্থায় এই বিষয়ের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা শিক্ষিত সাধারণ ক্রমশঃ বর্ত্তমান সম্মিলনের আশা ছাড়িয়া দিবে। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ক্রমশঃ বর্দ্ধমান সার্থকতা দৃষ্টে বোধ হয় যে সাহিত্য-বিস্তার ও আধুনিক জগতের নানা বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা সাধারণের বাঞ্ছনীয়। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের হিতাকাঙ্ক্ষী। মৌলিক গবেষণার সহায়ার্থ বিশেষজ্ঞগণের পরস্পর আলোচনার প্রয়োজন নাই, এ কথাও বলি না। তবে সম্মিলন তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত স্থান কি না, এবং সম্মিলনের দ্বারা কোন অধিকতর বাঞ্ছনীয় উদ্দেশ্য সাধনের আবশ্যকতা আছে কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য। সাধারণের মধ্যে সাহিত্য-বিস্তার, নব নব বিষয়ে সাধারণের অনুরাগ-সঞ্চার, ইহাই সম্মিলনের উদ্দেশ্য হইবে, অথবা মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কারার্থ আলোচনার অবসর-প্রদানই সম্মিলনের উদ্দেশ্য হইবে, ইহার বিচারের প্রয়োজন। যদি শেষোক্ত উদ্দেশ্যই গৃহীত হয়, তবে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য-সাধনার্থ অপর কোন আয়োজন সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় কি না, এ সঙ্গে তাহারও আলোচনার প্রয়োজন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার

প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ — মাঘ ১৩২৩ — ১০ম সংখ্যা

পাখীর গার্হস্থ্য জীবন।

প্রথম প্রস্তাব—নীড়নির্ম্মাণ।

বিবাহিত জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান উৎপাদন ও সন্তান পালন। সকল মানুষ এই কর্ত্তব্য সম্যক্ পালন করেন, এমন কথা বলা যায় না, সকল পাখীও এই কর্ত্তব্যের প্রতি সমান মনোযোগী নয়। পরভৃত ভিন্ন সকল গায়ক পক্ষীই নীড় নির্ম্মাণে, অণ্ডরক্ষণে, ও সন্তান পালনে সঙ্গিনীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে ও তাহার ক্লেশ অপনোদনে যথাসাধ্য যত্নবান্ হয়। কিন্তু যে সকল পাখী কেবল দৈহিক বলে বা নর্ত্তননৈপুণ্যের সাহায্যে প্রণয়িনীর চিত্ত আকর্ষণ করে তাহাদিগকে প্রায়ই বিবাহিত জীবনের ক্লেশকর কর্ত্তব্য গুলির প্রতি একান্ত উদাসীন থাকিতে দেখা যায়। প্রবন্ধান্তরে বিলাতের রাফ্ট্ (Ruft) ও বাষ্টার্ডের (Bustard) কথা বলিয়াছি; ইহারা বিবাহের কিছুদিন পরেই গার্হস্থ্যজীবনের সকল দায়িত্ব পত্নীর স্কন্ধে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যায়। আমাদের দেশের ডাহুক ও মেগা-পোডিস্ জলপিপিরও সন্তান পালনের ভার সম্পূর্ণ রূপেই মাতার উপর ন্যস্ত হয়। তবে এই সকল পক্ষিশিশু খাদ্য সংগ্রহের ও ভ্রমণের ক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে বলিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতার ঔদাসীন্যে ইহাদের বড় একটা অনিষ্ট হয় না। মেগাপোডিস্ জাতীয় পাখীদের শিশুরা আবার মাতাপিতা উভয়ের স্নেহ হইতেই বঞ্চিত। এই সকল পাখীরা সবল চরণের সাহায্যে মৃত্তিকা ও পত্রের স্তূপরচনা করিয়া তাহার মধ্যে অণ্ডপ্রসব করিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় একটি স্তূপের মধ্যে ১০।১৫টি পক্ষিণী অণ্ডপ্রসব করে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা আর আপন আপন সন্তান চিনিয়া লইতে পারে না। আবার কোন একটি পক্ষিণীর পক্ষে একস্তূপে জাত সকল শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং স্তূপ নির্ম্মাণ ও অণ্ড প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের সকল দায়িত্বের অবসান হয়। পিতৃমাতৃস্নেহ বঞ্চিত মেগাপোডিস্ শিশু উড়িবার ক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে স্তূপ হইতে বাহির হইতে পারিলে আর তাহাদিগের শত্রুহস্তে পড়িবার বড় বেশী আশঙ্কা থাকে না। মেগাপোডিস্ ব্যতীত আর কোন পক্ষিশিশুই জন্ম হইবা মাত্র উড়িতে পারে না।

সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত পাখীর প্রথম প্রয়োজন নীড়। মনে রাখিতে হইবে, পাখীর বাসা মানুষের গৃহের না

বাসের নিমিত্ত নির্ম্মিত হয় না। সুতরাং ইহাদের স্থায়িত্বের দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রায়ই দরকার হয় না। সাধারণতঃ দুই সপ্তাহের মধ্যেই পাখীর ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। সুতরাং এই স্বল্প সময়ের উপযোগী করিয়া তাহারা বাসা তৈয়ার করে। কিন্তু নীড়নির্ম্মাণের প্রণালীতে ও স্থান নির্ব্বাচনে পাখীরা সৌন্দর্য্য জ্ঞানের ও কলাকুশলতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করে।

নীড়

ডিমে উত্তাপ দেওয়ার জন্যই বাসার প্রয়োজন; তাই সকল পাখী বাসা নির্ম্মাণ করে না। আফ্রিকার উট পাখীর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহারা কুকুরের মত মাটি আচরাইয়া সামান্য একটু খাদ করিয়াই ডিম পাড়ে। মরুভূমির ভীষণ উত্তাপই ডিমের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও শৃগাল প্রভৃতি জন্তুর ভয়ে অষ্ট্রিচ দম্পতি দিবারাত্র অণ্ডের নিকট সতর্কভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারত বর্ষের প্রাটিনা-কোলেরাও (Pratinacoles) খালি মাটির উপরই ডিম পাড়ে। বিলাতের প্লোভার ও টার্ণ জাতীয় (Ringed Plover and Terns) কোন কোন পাখী বালুকাশয্যায়ই ডিম রক্ষা করে। কিন্তু এই সকল ডিমের সহিত ইহার চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের এমন সাদৃশ্য যে নিতান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই ইহাদিগকে সহসা ডিম বলিয়া চিনিতে পারেন না। হংসজাতীয় পাখীরা খালি জমির উপর কেবল আপনাদের বুকের পালক বিছাইয়া লয়। আবার অক (Auks) গুইলমট (Guillemots) প্রভৃতি কয়েকটি বিলাতী পাখী সমুদ্রের তীরে খাড়া পাহাড়ের কিনারায় ডিম পাড়িয়া রাখে। এইজন্য অক ও গুইলমটের ডিমের আকৃতি অন্যান্য পাখীর ডিমের আকৃতি হইতে একটু বিভিন্ন। সকল পাখীর ডিমেরই একটা দিক্ সরু, কিন্তু এই দুইটি পাখীর ডিমের একটা দিক এত সরু যে ঝড়ের বাতাসেও পাহাড়ের খাড়া কিনার হইতে গড়াইয়া পড়ে না; সরু প্রান্তটিকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে। ভগবান্ এত কৌশল করিয়াও কিন্তু এই সকল ডিম, বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ অক ও গুইলমটের প্রতি বৎসরই একই জায়গায় দলে দলে ডিম পাড়িয়া তা দিতে বসিয়া যায়। তখন শিকারীরা নৌকা লইয়া সমুদ্রের কিনারায় গিয়া পাহাড়ের উপরে পাখীর ঝাঁকে গুলি ছুড়েন। ভীত পাখীগুলি যেমন ত্রস্তভাবে ডিম ছাড়িয়া উড়িয়া পলাইতে যায় তখনি তাহাদের পায়ের ঠেলা লাগিয়া শত শত ডিম সমুদ্রের জলে পড়িয়া যায়। ইহাতে শিকারী, তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা যে কি আমোদ পান তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু এই নিষ্ঠুর আমোদের জন্য প্রতি বৎসর শত শত পাখীর ডিম সমুদ্রের জলে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।

সকল পাখী বাসা নির্ম্মাণ করে না

উট পাখী

অক ও গুইলমটের ডিমের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য

উপরে যে সকল পাখীর কথা বলা হইল তাহারা কেহই বাসা তৈয়ার করে না, খোলা যায়গায় ডিম পাড়িয়া দেয়। কিন্তু ইহাদের ডিমের বর্ণ চতুর্দ্দিকের দৃশ্যের অনুরূপ বলিয়া ডিম লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বোধ হয় আদিম যুগে পাখীরাও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সরীসৃপদিগের মত মাটিতে শাদা শাদা ডিম পাড়িয়া রাখিত। কিন্তু সরিসৃপদিগের মধ্যেও যেমন নিউজীলণ্ডের টেন্টেরা লিজার্ডের (Tentera-Lizard) রঙ্গিন ফোটাওয়ালা ডিম হয়, সেইরূপ পাখীদের মধ্যেও হয় ত প্রথমও কখনও কাহারও কাহারও সাদা ডিমের উপর কোন বর্ণের বা কোন প্রকারের দাগের ঈষৎ আভাস দেখা যাইত। মনে করুন এই সকল পাখীরা খাদ্যের অভাবের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাহাদের আদি নিবাস ছাড়িয়া কোন শ্বাপদ-বহুল অরণ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিল। অসম্ভব নয় যে,

আদিম পাখী বাসা নির্ম্মাণ করিত না, তাহার ডিমের বর্ণও সাদা ছিল

ডিমের বর্ণের ক্রম বিকাশ

তখন কোন কোন শ্বাপদ কোন প্রকারে অণ্ডের স্বাদ পাইয়া তাহার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে। এই নূতন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল কেবল সেই ডিমগুলি যেগুলির খোসায় অন্য বর্ণের সম্পাত হইয়াছে। সুতরাং ভূতলে প্রসূত ডিমের মধ্যে কেবল চিত্রিত ডিমগুলিই রক্ষা পাইল ও তাহা হইতে শাবক উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই শাবকেরা কেহ কেহ উত্তরাধিকারসূত্রে আপনাদের জননীর চিত্রিত অণ্ড প্রসবের স্বভাব লাভ করিল। শ্বেত ডিম্ব প্রসবকারী পাখীদের মধ্যেও কেহ কেহ অণ্ড রক্ষার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া গর্ত্তে বা বৃক্ষ শাখায় অণ্ড প্রসব করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের সন্তানেরাও উত্তরাধিকারসূত্রে বৃক্ষ কোটরে বা মৃত্তিকার গর্ত্তে অণ্ড প্রসবের অভ্যাস পাইল। কোন কোন পাখী হয় ত ডিমে তা দেওয়ার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, মৃত্তিকার উপর বা বৃক্ষের কোটরে তৃণ বা পল্লব বিছাইয়া লইলে অণ্ডে উত্তাপসঞ্চারে সুবিধা হয়। এবং তাহাদের এই অভিজ্ঞতা হইতেই হয় ত ক্রমবিকাশ রীতির প্রভাবে নীড় নির্ম্মাণ প্রথার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, পাখীর শ্বেত অণ্ডে বর্ণ সম্পাতের ও পক্ষীসমাজে নীড় নির্ম্মাণ প্রথা প্রচলনের উদ্ভবের উপরি উক্ত ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। শালিক, দয়েল, টিয়া প্রভৃতি পাখী গাছের কোটরে বা দেওয়ালের ফাটালে বাসা তৈয়ার করে। এই সকল যায়গায় আলো কম হইলেও গাঢ় অন্ধকার থাকে না। তাই এই কয়টি পাখীর ডিমই রঙ্গিন। শালিকের ডিম ঈষৎ নীল, টিয়ার ডিম ঈষৎ সবুজ, দয়েলের ডিমে ফিকে সবুজের উপর ফিকে খয়েরী রঙ্গের ছিটা। এই কয়টি রঙ্গই অল্প অন্ধকারের সহিত মিশিয়া যায়। মাছরাঙ্গা প্রভৃতি গভীর গর্ত্তে ডিম পাড়ে; তাহার অণ্ড প্রসবের স্থান মানুষ বা অপর সকল প্রাণীর দৃষ্টির অতীত; তাই মাছরাঙ্গার ডিম চকচকে সাদা, কারণ তাহার বাসা বহু উচ্চে; মানুষ বা অপর কোন শত্রু সেখানে সহজে যাইতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের জন্যই ক্রম-বিকাশ রীতির প্রভাবে আদিম যুগের সরীসৃপ বিশেষের দেহে পক্ষ সংযোগে পক্ষিজাতির উদ্ভব হইয়াছে। সেইরূপ শত্রু হইতে ডিম রক্ষার প্রয়োজনে ক্রমবিকাশ রীতির প্রভাবে পক্ষীজাতি নীড় নির্ম্মাণ কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে ও তাহাদের অণ্ডে প্রতিবেশ দৃশ্যের অনুরূপ বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ হইয়াছে।

যে সকল পাখী গর্ত্তে ডিম পাড়ে; মাছরাঙ্গা

ক্রমবিকাশ রীতির হিসাবে যে সকল পাখী খোলা মাটিতে বা পাহাড়ের গায় ডিম পাড়ে তাহাদের পরেই যাহারা গর্ত্তের মধ্যে ডিমে তা দেয় ইহারা এখন পর্য্যন্ত নীড় নির্ম্মাণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই। আদিম কালে সেই যে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অণ্ডগুলিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য গর্ত্তে লুকাইয়াছিল সেই অবধি ইহারা আর সে প্রাচীন রীতির কোন পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করে নাই। আমাদের দেশে এই প্রকৃতির পাখীর অভাব নাই। একজাতীয় ক্ষুদ্রকায় খুনিয়া নদীর তীরের গর্ত্তে বাস করে। এই ক্ষুদ্র পাখীটিকে দেখিলে কাহারও বিশ্বাস হইবে না যে তাহাদের ক্ষুদ্র চঞ্চু ও ক্ষীণ চরণই তাহাদের গভীর আবাস গর্ত্তের খনন যন্ত্র। হংস জাতীয় কোন কোন পাখীও গর্ত্তের মধ্যে আপনাদের বুকের পালক বিছাইয়া ডিম পাড়ে। কিন্তু গর্ত্তবিহারী পাখীদিগের মধ্যে মাছরাঙ্গাই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। আমাদের দেশে অনেক প্রকারের মাছরাঙ্গা আছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মাছরাঙ্গাকে বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কখন কখন বাসগৃহের মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ ভিত্তিতে চারি পাঁচ হাত গর্ত্ত করিয়া থাকে। বঙ্গ দেশের সাদা বুক ওয়ালা মাছরাঙ্গা কূপ ও পুষ্করিণীর পায়েই গর্ত্ত করে। কূপের পারে কখন কখন ইহাদের গর্ত্ত একশত ফিটের অধিক নীচেও দেখা গিয়াছে। মাছরাঙ্গা সকল সময় নিজে গর্ত্ত খনন করিবার ক্লেশ স্বীকার করে না। সুবিধা মত স্থানে ইন্দুরের পরিত্যক্ত গর্ত্ত পাইলে তাহাই দখল করিয়া লয়। অনেক সময় যে গর্ত্তের মালিককে বেদখল করে না এমনও নয়। মাছরাঙ্গা

গর্ত্তের মধ্যে খর বা পাতা কিছুই বিছায় না—কেবল গর্ত্তের প্রান্তটিকে একটু বিস্তৃত করিয়া লয়। মাছরাঙ্গার গর্ত্তে তৃণ পল্লবের পরিবর্ত্তে মৎস্য কণ্টকের কঠিন শয্যা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কণ্টকশয্যার সন্নিবেশে অবশ্য কোন প্রকারের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসৃত হয় না। পণ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন মাছরাঙ্গার বাড়ীর কাঁটার আসবাব গুলি গৃহ স্বামীরই ভুক্ত খাদ্যের অজীর্ণ অংশ। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অজীর্ণ খাদ্য মলদ্বারের পথে না যাইয়া গলনালী ও মুখের পথে বাহির হইয়া আসে। শোনা যায় যে ব্রিটিশমিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ (British Museum) একবার মাছরাঙ্গার একটি অবিকৃত কণ্টকনীড়ের জন্য একশত পাউণ্ড বা পনর শত টাকা দিতে রাজি হইয়াছিলেন।

ডাক্তার শার্প (Dr. R. B. Sharpe) বলেন যে মাছরাঙ্গা যে কেবল জলের ধারেই গর্ত্ত করে তাহা নহে ; জলাশয় হইতে অনেক মাইল দূরেও ইহাদের গর্ত্ত তিনি দেখিয়াছেন। বিলাতের সাধারণ মাছরাঙ্গাও আমাদের দেশের মত মাটীতেই গর্ত্ত করে ; কিন্তু ডাক্তার শার্প একবার টেমস্ নদীর অর্দ্ধ মাইল দূরে মেইডেন হেড (Maidenhead) নগরীর এক উদ্যান তরুর কোটরে একটি মাছরাঙ্গার বাসা দেখিয়াছিলেন।

তরু কোটরবাসী মাছরাঙ্গা

কোন কোন মাছরাঙ্গা আবার উইটিপি ও পিপরের টিপিতেও জবর দখলে গর্ত্ত করিয়া বসে। মাছরাঙ্গা পরিবারে সকলেই মৎস্যাশী নহেন। মলাক্কা (Molucca) ও নিউ গিনি (New Guinea) দ্বীপে এবং অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্বাংশে এক প্রকার দীর্ঘপুচ্ছ মাছরাঙ্গা আছে। (Racket-tailed Kingfisher) ইহারা বানপ্রস্থাবলম্বী কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু জলের সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া ইহারা অরণ্যনিবাস অবলম্বন করিয়াছে। দীর্ঘকর্ণ নামা মার্জ্জারের মত "নিত্য স্নায়ী নিরামিষাশী ব্রহ্মচারী চান্দ্রায়ন-ব্রতচারী না হইলেও পূর্ব্বাঞ্চলের এই দীর্ঘপুচ্ছ মাছরাঙ্গারা মোটেই মৎস্যাশী নহে। স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক না খাইলেও স্বচ্ছন্দ বনচারী কীট পতঙ্গের দ্বারাই এই শাক্ত বংশের বৈষ্ণবটী দগ্ধ উদরের পূর্ত্তি সাধন করিয়া থাকেন। সুতরাং আহারের হিসাবে বৈরাগী হইলেও কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী মাছরাঙ্গাটির পরস্বাপহরণে কখনই বৈরাগ্য দেখা যায় না। ইঁহারাই পিপ্‌রের বাসায় নিজেদের বাসা করিয়া লয়েন।

পিপরের বাসায় মাছরাঙ্গা

বোর্ণিয়োর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে (North-west Borneo) এক প্রকার মাছরাঙ্গা আছে (Ruddy Kingfisher—Halcyon coromandas) ; ইহারা তথাকার উগ্রপ্রকৃতি মৌমাছির চাকে ডিম পাড়িয়া রাখে। স্যার হিউ লো (Sir Hugh Low) একবার ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই অদ্ভুত প্রকৃতি মাছরাঙ্গার কয়েকটি ডিম পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে অগ্নিসংযোগে মৌমাছিদিগকে না মারিয়া কিছুতেই এই মধুমক্ষিকা-রক্ষিত অণ্ড সংগ্রহের উপায় নাই, তাই এই পর্য্যন্ত রুডি কিংফিসারের বাসার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আর কোন তথ্যই সংগৃহীত হয় নাই।

মৃত্তিকায় গর্ত্ত খননকারী পাখীদের কথা বলা হইল। এখন বৃক্ষকোটরবাসী বিহঙ্গদিগের কথা আলোচনা করা যাউক। এই প্রসঙ্গে কাঠঠোকরার কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িবে। মাছরাঙ্গার ন্যায় কাঠঠোকরাও বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল বঙ্গদেশ কেন, পৃথিবীর প্রায় দেশেই কোন না কোন জাতীয় কাঠ-ঠোকরা আছে। গাছে গর্ত্ত খনন করিলেও কাঠ-ঠোকরারা গাছের কোন অনিষ্ট করে না। কারণ কীটদষ্ট জীর্ণ এবং অন্য কারণে গলিত বৃক্ষকাণ্ডেই কাঠ-ঠোকরা তাহার চঞ্চুর পরশু চালনা করে। কাঠঠোকরার গর্ত্তে কোন আসবাবই নাই ; যদি গর্ত্ত খনন কালে জীর্ণ বৃক্ষের গুড়া গর্ত্তের তলায় পড়ে তবে তাহারই উপর কাঠ ঠোকরা অণ্ড প্রসব করে। যদি গর্ত্তে গাছের গুড়া মোটেই

বৃক্ষ কোটর নিবাসী পাখী ; কাঠঠোকরা

না পড়ে তাহার জন্তও নির্ব্বিকার কাঠ-ঠোকরা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করে না; শূন্য গর্ত্তেই ডিম পাড়িয়া রাখে। এইখানে কাঠঠোকরার পুচ্ছের গঠন বৈচিত্র্যের উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কাঠঠোকরার পুচ্ছ নিতান্ত ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পুচ্ছই তাহার কুঠারচালন কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। অন্যান্য সকল পাখীর পুচ্ছ অপেক্ষা কাঠঠোকরার পুচ্ছের পালক অধিক শক্ত। পাখী কাঠুরিয়ার কঠিন পুচ্ছের পালক-দণ্ডের অগ্রভাগ আবার অতিশয় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম। বৃক্ষকাণ্ডে কুঠার চালনা করিবার সময়ে কাঠ-ঠোকরা গাছের গায়ে এই পুচ্ছ পালকগুলি চাপিয়া ধরে। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে অন্যান্য পাখীর ন্যায় কাঠ-ঠোকরা গাছের ডালে ডালে লাফাইয়া বা হাঁটিয়া বেড়ায় না, ইহারা প্রকৃতই গাছ বাহিয়া চলে। এই কার্য্যও ইহাদের বিচিত্রগঠন পুচ্ছের সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার পতঙ্গভুক্ দীর্ঘপুচ্ছ মাছরাঙ্গার (Racket tailed Kingfisher) ন্যায় দার্জ্জিলিঙ্গের এক জাতীয় কাঠঠোকরাও পিপীলিকার বাসায় গর্ত্ত করে। গেমি সাহেব (Mr, J. Gammie) বলেন যে চারবার তিনি দার্জ্জিলিঙ্গের নিকট রুফাস্ কাঠ-ঠোকরার (Rufous wood-pecker) ডিম পিপীলিকার বাসা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার একটি বাসা গভীর জঙ্গলে প্রায় দুই সহস্র ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর একটি বাঁশের মাথায় ঝুলিতে ছিল, অপর তিনটি বাসা আবাদী জমির পাশে নালার কিনারায় জঙ্গলে ছোট ছোট গাছে পাওয়া গিয়াছিল। সব কয়টি বাসাই ভূমি হইতে ৮।১০ ফিটের মধ্যে ছিল। পিপীলিকাদের বাসাগুলি আকারে গোল— অনেকটা য়ুরোপের ভেস্‌পা ব্রিটেনিকা (Vespa britannica) জাতীয় বোলতার বাসার মত। পাখীর আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া পিপীলিকারাই বাসা ছাড়িয়া পালায় অথবা রুফাস

পিপীলিকার বাসায় গর্ত্ত খনন; দার্জ্জিলিঙ্গের রুফাস্ কাঠঠোকরা

কাঠঠোকরা কেবল পিপীলিকার পরিত্যক্ত বাসাতেই দখলী পরওয়ানা জারি করে, তাহা গেমি সাহেব নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে এই পিপীলিকাই রুফাস কাঠঠোকরার প্রধান খাদ্য। গেমি সাহেব ইহাদের পাকস্থলী ব্যবচ্ছেদ করিয়া তন্মধ্যে বহু পিপীলিকা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং ইহারা পিপীলিকার বাসা জোর করিয়া দখল করে বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্গদেশের আরও একটি পাখী বৃক্ষের জীর্ণ কাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ডিম পাড়ে। বাখরগঞ্জ অঞ্চলে ইহাদের নাম কলা পাখী। ইহাদের পুচ্ছ ও ডানা গাঢ় সবুজ, প্রকাণ্ড মাথা, গলা ও চঞ্চুর রঙ্গ অনেকটা ছাতারিয়ার গায়ের বর্ণের অনুরূপ। এই পাখীর ডাক অনেকটা হুলুধ্বনির মত। নিরামিষ ফলাহারী হইলেও ইহ'রা যে নিজেদের বাস গর্ত্ত তৈয়ার করিয়া লয় তাহাতে সন্দেহ নাই। একবার একটা নবখনিত কলাপাখীর গর্ত্ত তৃণ ও কর্দ্দমের দ্বারা বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বন্দিনী পক্ষিণী ভিতর হইতে নূতন গর্ত্ত খনন করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

কলা পাখী

কোটরনিবাসী পাখীদের মধ্যে ধনেশের প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক। ভারতবর্ষ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকায় ধনেশ পাখী (Hornbill) দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলেও ধনেশ আছে। ইহারা বৃক্ষকোটরে বক্ষের পালক বিছাইয়া ডিম পাড়ে, তার পর পুরুষ ধনেশ ধূপের মত এক প্রকার পদার্থের দ্বারা ছোট একটি ছিদ্র মাত্র রাখিয়া গর্ত্তের মুখ একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ধনেশের গর্ত্তের দেওয়াল নির্ম্মাণের উপকরণ তাহার পাকস্থলী হইতে নির্গত হয়। দেওয়ালের ছোট ছিদ্রটি এমন যায়গায় রাখা হয় যে স্ত্রী-ধনেশ ডিম না ছাড়িয়াই ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া আপনার প্রকাণ্ড চঞ্চু বাড়াইয়া

ধনেশ বা হর্ণবিল

দিতে পারে। যতদিন ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির না হয়, ততদিন পুরুষ ধনেশ কীট পতঙ্গ, ফল ও নানা প্রকারের উদ্ভিদের বীজের গুলি পত্নীকে খাইতে দেয়। ধনেশের আহার্য্যের গুলি আবার এক প্রকার পাতলা চর্ম্মের মোরকে আচ্ছাদিত থাকে। এই চর্ম্মও পুরুষ ধনেশের পাকস্থলী হইতে বাহির হয়। ছানা বাহির হইলে স্ত্রী-ধনেশ গর্ত্তের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া বাহির হয় ও স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া শাবকের রক্ষণাবেক্ষণ ও খাদ্য সরবরাহ করিতে থাকে। পক্ষিণী বাহির হইবার পর আবার গর্ত্তের মুখ বন্ধ করা হয়; শাবকেরা বড় হইলে জননীর মত ভিতর হইতে গর্ত্তের গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়ে। বার বার গর্ত্ত বন্ধ করিবার মাল মসলা ও পত্নী ও শাবকের খাদ্যের আচ্ছাদন স্বীয় দেহ হইতে সরবরাহ করিতে করিতে পুরুষ ধনেশ দিন দিন দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। বন্দিনী পক্ষিণী কিন্তু এই সময় স্বামীর অবিশ্রান্ত যত্নে হৃষ্ট পুষ্ট হয়। বিখ্যাত পর্য্যটক লিভিংষ্টোন (Livingstone) লক্ষ্য করিয়াছেন যে অনেক সময় পুরুষ ধনেশ দেহের এইরূপ অবিরাম অপচয় আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। তাই শাবক জন্মিবার পর পক্ষিণী যখন সুস্থ সবল দেহে আপনার কারা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহির হয় তখন দৈহিক অপচয়ের ফলে ক্ষয়িতবল পুরুষ-ধনেশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ধনেশ কখনও নিজে গর্ত্ত তৈয়ার করে না। ইহারা হয় অপরের পরিত্যক্ত গর্ত্ত অধিকার করে, অথবা স্বাভাবিক কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত বৃক্ষকাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে। জন্ম ঋতুতেই ইহারা পালক পরিবর্ত্তন (Moult) করে। সেইজন্যই বোধ হয় শত্রুর আক্রমণ হইতে অণ্ডে উপবিষ্ট পক্ষিণীকে রক্ষা করিবার জন্য ধনেশ তাহার গর্ত্তের মুখ গাঁথিয়া ফেলে। হোজ্ (Mr. Hose) সাহেব বলেন যে একবার কোন বাসা হইতে নিরুপদ্রবে ছানা লইয়া বাহির হইতে পারিলে ধনেশ-দম্পতী প্রতিবৎসরই সেই বাসায় ফিরিয়া আসে। পক্ষিণী ও শাবক নিহত হইলে পরের বৎসর পুরুষ ধনেশ পুরাতন বাড়ীতে নূতন পত্নী লইয়া আসে। পক্ষী ও পক্ষিণী উভয়েই নিহত হইলে আর অন্য কোন ধনেশই পোড়োবাড়ীতে ঘর তুলিতে চায় না।

পক্ষিণী যখন বাসায় কারাগারে বন্দী থাকে, তখন তাহার প্রতিপালক স্বামীর মৃত্যু হইলে অনাহারে মরিবার কথা। কিন্তু এমন অবস্থায় অন্যান্য পুরুষ ধনেশ আসিয়া পক্ষিণী ও তাহার শাবকদিগকে খাওয়াইয়া যায়।

স্ত্রী ও সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষ ধনেশ আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া দৈহিক উপাদানে প্রাচীর নির্ম্মাণ করে। কিন্তু এই প্রাচীরই অনেক সময় পক্ষিণী ও তাহার সন্তানগণের মৃত্যুর কারণ হয়। পক্ষিণীকে খাওয়াইবার সময় যে তাহার আহার্য্যের দুই একটি গুলি না পড়িয়া যায় এমন নহে। এই গুলিতে অনেক সময় নানা প্রকার উদ্ভিদের বীজ থাকে। বৃক্ষের তলে মাটিতে পড়িয়া এই বীজে চারা উৎপন্ন হয়। ধনেশের অধিকৃত বৃক্ষকোটরের নীচে এই প্রকার গাছের চারা দেখিয়াই বোর্ণিয়োর অধিবাসীরা তথায় এই অদ্ভুত চরিত্রের পক্ষীর অবস্থিতি অনুমান করিয়া লইতে পারে। এমন কি এই প্রকারের চারার আকৃতি ও সংখ্যা দেখিয়া তাহারা কয় বৎসর ধরিয়া এই গাছে ধনেশ আসিতেছে, কতদিন হইল ডিম পাড়িয়াছে তাহাও বলিয়া দিতে পারে। এদিকে ধনেশের ছানা ও ভ্রূণ বোর্ণিয়োর আদিম অধিবাসী দিগের অতি প্রিয়খাদ্য, এবং পূর্ণবয়স্ক ধনেশের পুচ্ছপালক ইহাদের সামরিক পরিচ্ছদের শোভা বৃদ্ধি করে। তাই একবার বাসার সন্ধান পাইলে আর পক্ষিণী ও তাহার সন্তানদের রক্ষা থাকে না। পুরুষ পক্ষীকে তাড়াইয়া দিয়া বাঁশের মই বাহিয়া তাহারা একেবারে ধনেশের বাসার কাছে গিয়া হাজির হয়। ধনেশের কষ্টনির্ম্মিত দেওয়াল ভাঙ্গিবা মাত্রই ভীত পক্ষিণী গর্ত্তের উপরের দিকে পলাইতে চেষ্টা করে। তখন অসভ্যেরা তাহাকে কাটা গাছের ডাল দিয়া টানিয়া বাহির করে। হোজ সাহেব বলেন যে বোর্ণিয়ো বাসীরা ধনেশের ছানা ও ভ্রূণ খাইতে এত ভালবাসে যে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষেও ইহা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে। ডাক্তার ওয়ালেস (Dr. A. R. wallace) মালয় দ্বীপপুঞ্জে

অবস্থানকালে একটি ধনেশের ছানা পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহার দেহ জেলির পিণ্ডের মত নরম ও স্বচ্ছ।

যে সকল পাখী মৃত্তিকায় বা বৃক্ষকাণ্ডে গর্ত্ত করিয়া বা অপরের নির্ম্মিত গর্ত্ত দখল করিয়া অণ্ডরক্ষা করিতে প্রয়াস পায় তাহাদের সম্বন্ধে মোটামোটি আলোচনা করা হইল এখন যে সকল পাখী বৃক্ষকোটরে, দেওয়ালের ফাটালে বা দেওয়ালের গায়ে, অথবা বৃক্ষ শাখায় মৃত্তিকা দ্বারা বা তৃণ অথবা ছোট ছোট ডাল বিছাইয়া নীড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অণ্ড প্রসব করে তাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাউক

মাটির বাসা

প্রথম মৃত্তিকানীড় নির্ম্মাতাদিগের কথাই বলিব। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের ফেয়ারি মার্টিনের (Fairy Martin) বাসাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। এই পাখী বঙ্গদেশেও একেবারে বিরল নহে। কলিকাতার শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটি পুরাতন বাড়ীতে আমি ফেয়ারি মার্টিনের অনেকগুলি বাসা দেখিয়াছি।

ভারত বর্ষের ফেয়ারি মার্টিন

ফেয়ারি মার্টিনেরা বহুসংখ্যক একত্র এক যায়গায় বাসা করে। সাধারণতঃ ছাদের নিকট কড়ি ও বরগার কাছে ইহাদের মৃত্তিকাগৃহ নির্ম্মিত হয়। মার্টিনের উপনিবেশ দেখিলে বাস্তবিকই আনন্দ হয়। চঞ্চল পাখীগুলি কলরবে চারিদিক মুখরিত করিয়া বিচিত্র গতিতে লীলাভরে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বাসায় প্রবেশ করিতেছে, আবার মুহূর্ত্ত পরেই বাহির হইয়া যাইতেছে। যেন ইহাদের জীবনে কোন দুঃখ, কোন কর্ম্ম নাই; নিরুপদ্রব ক্রীড়া, কোলাহল ও আনন্দের মধ্যেই যেন তাহাদের জীবন নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ইহাদের বাসাগুলিও দেখিতে বেশ সুন্দর; যেন ছাদের গায়ে কড়ির পাশে গেরুয়া রঙ্গের ছোট ছোট কলসীর শ্রেণী গলা বাড়াইয়া আছে। বাসাগুলির ভিতরে ও বাহিরে কোমল পালকের সুন্দর আস্তরণ। বোধ হয় নিজেদের পালকই গৃহ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়। পরলোকগত প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ গুল্ড সাহেব (Gould) বলেন, "অষ্ট্রেলিয়ার ফেয়ারি মার্টিনের নীড় নির্ম্মাণ বহু পক্ষীর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়"। ভারতবর্ষের ফেয়ারি মার্টিনের বাসা নির্ম্মাণেও দুই বা ততোধিক পাখীকে খাটিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা এমনই ক্রীড়া পরায়ণ, যে বাসার প্রধান উপাদান কর্দ্দমের গুলি চঞ্চুপুটে বহন করিয়া আনিবার সময়েও ইহারা কোন পরিশ্রম করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের বাসাগুলি সুন্দর হইলেও তাহার নীচের জায়গাটা বড়ই অপরিষ্কার থাকে। পাখীর মল ও বাসার উপাদান জমিয়া সে জায়গাটাকে আবর্জ্জনময় করিয়া ফেলে। তাই নিতান্ত জ্ঞানপিপাসী জীবতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন আর কেহই ইচ্ছা করিবেন না যে তাঁহার বারান্দার ছাদে ফেয়ারি মার্টিনেরা উপনিবেশ স্থাপন করুক। ইহারা পাহাড়ের গায়েও বাসা তৈয়ার করে। জব্বলপুরের অদূরে পিসনহারি মন্দিরের নিকট পাহাড়ে আমি ফেয়ারি মার্টিন দেখিয়াছি। বঙ্গ দেশের কোন কোন যায়গায় ফেয়ারি মার্টিনকে চাতক বলে।

মার্টিনেরা সোয়ালো পরিবারের পাখী। সোয়ালোরাও মার্টিনদের মত মাটির বাসা তৈয়ার করে। পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন জাতীয় সোয়ালো আছে, ভারতবর্ষেও

সোয়ালো

আছে। সম্রাট্ আকবরের ফতেপুর শিকারি প্রাসাদের সোপানশ্রেণীও সোয়ালোর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। যে সোপানশ্রেণী বাহিয়া সম্রাট আকবর প্রত্যহ প্রাসাদের দ্বিতল হইতে অবতরণ করিতেন তাঁহার উত্তর পার্শ্বে এখন (অন্ততঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে) সোয়ালোর বাসায় চড়ুই বাস করিতেছে।

আমেরিকার গুয়েকারো, ওভেনবার্ডের ও ফ্লেমিঙ্গোর কথা বলিয়াই মৃত্তিকানীড় নির্ম্মাতা পাখীদের কথা শেষ করিব। পৃথিবীর সকল মহাদেশেই ফ্লেমিঙ্গো দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনের দক্ষিণাংশে জলা-ভূমিতে, এবং মিশরের নীলনদের তীরে দলে দলে ফ্লেমিঙ্গো বাস করে। সাধারণতঃ ইহাদের এক একটি দলে চারি পাঁচ কুড়ি পাখী থাকে।

ফ্লেমিঙ্গো

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে সিন্ধুদেশের হ্রদ ও তড়াগে সহস্র সহস্র ফ্লেমিঙ্গো আসিতে দেখা যায়। ফ্লেমিঙ্গো সারস জাতীর পাখী; সাধারণতঃ জলে

থাকিতেই ভাল বাসে। সন্তরণপটু হইলেও ইহারা সাধারণতঃ হাঁটু জলে হাঁটিয়া বেড়ায় ও দীর্ঘ গলার সাহায্যে জল হইতে ছোট ছোট মাছ, কীট ও গুগলি প্রভৃতি ধরিয়া খায়। ফ্লেমিঙ্গো-সারস জল এত ভালবাসে যে, নীড় নির্ম্মাণ ও অণ্ড প্রসবের জন্যও জল ছাড়িয়া যাইতে রাজি হয় না। জনন-ঋতুতে ইহারা জলার মধ্যেই সারি সারি মৃত্তিকাস্তূপ তুলিয়া বাসা তৈয়ার করে। সাধারণতঃ স্তূপ গুলি জলের উপর হইতে ৩।৪ ইঞ্চি উপর পর্য্যন্ত তোলা হয়। তাহার মাঝখানে একটু খাদ করিয়া তাহাতে ডিম পাড়িয়া ফ্লেমিঙ্গো জননী লম্বা লম্বা পাদুখানি গুটাইয়া ডিমে তা দিতে বসিয়া যায়। পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে ফ্লেমিঙ্গোরা ডিমে তা দিবার সময় বাসার দুই দিকে দীর্ঘ চরণ দুই খানি ঝুলাইয়া রাখে।

গুয়েকারোর (Guacharo) নিবাস দক্ষিণ আমেরিকায়।

গুয়েকারো বা তৈল-পাখী

হোয়াগ জিনের মত এই পাখীরও কোন নিকট জ্ঞাতি নাই। সুতরাং, অনুমান করা অসঙ্গত নয়, যে ইহারা কোন অধুনা লুপ্ত আদিম পক্ষিপরিবারের একমাত্র প্রতিনিধি। শিশু কালে ইহাদের শরীরে অত্যধিক চর্ব্বি থাকে বলিয়া ইহাদিগকে তৈল-পাখীও (Oil bird) বলা হয়। বাস্তবিক গুয়েকারোর ছানা একটি প্রকাণ্ড চর্ব্বির পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের অন্যতম অধ্যক্ষ ডাক্তার শার্পের নিকট প্রথম যখন গুয়েকারোর ছানা প্রেরিত হইয়াছিল, তখন তিনি সহজে চর্ব্বির পিণ্ডে পক্ষি শাবকের অস্তিত্ব সন্ধান করিয়া লইতে পারেন নাই। গুয়েকারো একেবারে নিশাচর, দিবাভাগে কখনও বাহির হয় না। সাধারণতঃ সমুদ্রের ধারে পর্ব্বতের গহ্বরে ইহাদের মৃৎকুলায় নির্ম্মিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মের জন্য ট্রিনিডাড দ্বীপ হইতে যে গুয়েকারোর বাসা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার জন্য ডাক্তার বিভান রেক (Dr. Bevan Rake) নৌকা করিয়া সমুদ্রের কিনারায় পর্ব্বতের গহ্বরের নিকট গিয়াছিলেন। ডাক্তার রেক ও অন্যান্য খ্যাতনামা প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে গুয়েকারোর প্রধান খাদ্য এক প্রকার ফল; কিন্তু এই ফলের বীজ ইহারা কখনও খায় না। সুতরাং ধনেশের বাসার তলার মত গুয়েকারোর বাসার নীচে পর্ব্বত গহ্বরেও গাছের চারা হয়। কিন্তু আলোক ও উত্তাপের অভাবে এই চারাগুলি সেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। চর্ব্বির লোভে পেরুর অধিবাসীরা মশাল জ্বালিয়া গুয়েকারোর বাসা হইতে ছানা ধরিয়া লইয়া আইসে।

গুয়েকারোর ন্যায় ওভেন-বার্ড (Oven Bird) বা উনুনপাখীরাও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। এই পাখীর বাসা বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক।

ওভেন বার্ড বা উনুন পাখী

দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিস অধিবাসীরা এই পাখীটিকে খুব ভালবাসে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে ইহারা খ্রীষ্টিয় পর্ব্বদিনগুলিতে কখনও কাজ করে না। ওভেন বার্ডের আকারের তুলনায় তাহার মৃত্তিকাগৃহ খুবই প্রকাণ্ড বলিতে হইবে। ইহাদের এক একটি বাসা বা উনুনের (দেখিতে উনুনের মত বলিয়া ইহার নাম উনুন বা ওভেন হইয়াছে) ওজন ৪।৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উনুন-পাখীর ঘরের সদর দরজা বেশ বড়—মানুষ তাহার মধ্যে অনায়াসে হাত চালাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এই সতর্ক পাখীটি সদর দরজার পরেই আর একটা দেওয়াল তৈয়ার করে। এই দেওয়ালের পরে তাহার খাস কামরা। এই খাস-কামরায় সুকোমল তৃণের শয্যায় ওভেন-পাখী শাদা শাদা ডিম পাড়িয়া রাখে। এই পাখীর মৃৎগৃহ নির্ম্মাণে যে পরিমাণে মাটির আবশ্যক হয় ও ইহারা এক একবারে যতটুকু মাটি ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে বহিয়া আনিতে পারে, তাহা ভাবিলে ইহাদের অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তৃণ ও বৃক্ষশাখার নির্ম্মিত বাসার কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে পক্ষীজগতের আরও দুইটি অদ্ভুত

সুরুয়ার বাসা ও সেলভিন সুইফ্‌টের বাসা

বাসার কথা আলোচনা করা যাউক। এই দুইটি বাসাই সুইফ্‌ট (Swift) জাতীয় পাখীদের কলা কুশলতার পরিচয় দেয়। সুইফ্‌ট জাতীয় পাখীরা সাধারণতঃ আপনাদের লালার সহিত ঘাস বা পালক সংযোগ করিয়া বাসা তৈয়ারি করে। বোর্নিয়ো ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য

যায়গায় এক প্রকার সুইফ্‌ট আছে (Edible Swiftlet) যাহারা কেবল মাত্র লালার দ্বারাই এক প্রকার শ্বেত-বর্ণের নীড় নির্ম্মাণ করে। চীনদেশের অধিবাসীরা ঐই লালা নির্ম্মিত বাসার সুরুয়া খাইতে খুব ভাল বাসে; সুতরাং বাঙ্গলায় ইহাকে সুরুয়ার বাসা বলা যাইতে পারে। মালয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রতি বৎসর অনেক টাকার সুরুয়ার বাসা চীনে রপ্তানি হয়। দ্বিতীয় প্রকারের একটি বাসা ১৮৫৮ সালে অসবার্ট সেলভিন সাহেব (Osbert Salvin) গুয়াটিমালার (Guatemala) পাহাড়ে আবিষ্কার করেন এই বাসাটি সুইফ্‌ট্‌ পরিবারের এক জাতীয় পক্ষীকর্ত্তৃক লালা সংযোগে উদ্ভিদ্‌ বীজের দ্বারা নির্ম্মিত। সেলভিনের আবিষ্কৃত অদ্ভুত বাসাটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে আবিষ্কর্ত্তার নাম অনুসারে বীজের বাসা নির্ম্মাতা সুইফ্‌টের নাম হইয়াছে সেলভিনের সুইফট (Salvin's Swift)। সেলভিন সুইফ্‌ট্‌ বৃক্ষ হইতেই বীজ সংগ্রহ করে অথবা উড়ন্ত বীজ ধরিয়া আনিয়া বাসা তৈয়ার করে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। ইহারা শত্রুদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য বাসার একটা জুয়া মুখ তৈয়ার করে। সাপ অথবা টিকটিকি সেই মুখে বাসায় ঢুকিলে ডিমের সন্ধান পায় না, একটি খালি কুঠরীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। সেলভিন সুইফ্‌ট্‌ লালার সাহায্যে পাহাড়ের গায়ে ঝুলানো বাসা তৈয়ার করে। সুরুয়ার বাসাও পর্ব্বতের গহ্বরে ঝুলান থাকে।

বেশীর ভাগ পাখী খড় অথবা ডালপালা দিয়া বাসা তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু খড়ের বাসাগুলিতেও নির্ম্মাণ প্রণালীর বৈচিত্র্য নিতান্ত কম নহে।

খড়ের ও গাছের ডালের বাসা। ঘুঘু, শালিক, বুলবুল ও হলদে পাখী

ঘুঘু কতকগুলি খড় ও ঘাস ছড়াইয়া বাসা তৈয়ার করে — সে কোন উচ্চাঙ্গের নির্ম্মাণ প্রণালীর ধার ধারে না। একবার দেখিয়াছিলাম একটা জবার গাছের ঘন ডালের মধ্যে কাদা সমেত দূর্ব্বাঘাস পাতিয়া ঘুঘু বাসা করিয়াছে। শালিক এবং দয়েলের বাসা ইহা হইতে এক ধাপ উচ্চে। ইহারা হয় দেওয়ালের ফাটালে, না হয় বৃক্ষ-কোটরে, অথবা ঐ রকমেরই কোন একটা গুপ্ত জায়গায় খড় বিছাইয়া বাসা করে। কিন্তু ইহারা ডিম রাখিবার সুবিধার জন্য বাসার মধ্য-স্থলটা বাটির মত গোলাকার গর্ত্তের ন্যায় করিয়া রাখে। সুতরাং ইহাদের খড় বিছাইবার মধ্যেও একটু কারিকুরী আছে। বুলবুল ও হলদে পাখী আরও উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। ইহারা উভয়েই তৃণ ও খড়ের সাহায্যে বাটির মত বাসা তৈয়ার করে। কিন্তু একই আকারের বাসা হইলেও, বুলবুল ও হলদে পাখীর রচনা প্রণালীতে পার্থক্য আছে। বুলবুলের বাসা অধিকতর দক্ষতার সহিত বোনা ও অধিকতর পরিচ্ছন্ন। এতদ্ভিন্ন বুলবুল দুই তিন খানি খাড়া ডালের ফাঁকে খড় জুড়িয়া বাটি বুনিয়া তোলে, আর হলদে পাখী দুইখানি সমান্তরাল ডালের মাঝখানে বাটিটি ঝুলাইয়া দেয়। কাক চিল প্রভৃতি পাখীরা ছোট ছোট ডাল দিয়া বাসা তৈয়ার করে। বাহির হইতে ইহাদের বাসা দেখিতে তেমন সুশ্রী না হইলেও ভিতরের দিকটা দেখিতে মন্দ নয়। ডিম রাখিবার জায়গাটি বাটির আকারেই গঠিত। প্রত্যেক পাখীর নীড়-নির্ম্মাণ-প্রণালীর কথা আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। সুতরাং দেশী ও বিদেশী কয়েকটি আশ্চর্য্য বাসার কথা বলিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

প্রথমতঃ আমাদের চিরপরিচিত ক্ষুদ্রকায় প্রতিবেশী টুনটুনির বাসার কথা বলা যাউক। টুনটুনি বড়ই সতর্ক পাখী।

টুনটুনি

নির্ম্মাণ কালে মানুষের চক্ষে পড়িলে অসমাপ্ত বাসা পরিত্যাগ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। ছেলেবেলায় গল্পে শুনিয়াছিলাম বেগুন গাছে আকুসি দিয়া বেগুন পারিতে গিয়া বেচারা টুনটুনির পিঠে কাঁটা ফুটিয়া পিঠটা একেবারে ফুলিয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকও টুনটুনি বেগুনের মত বড় পাতা-ওয়ালা ছোট ছোট গাছের দুই বা ততোধিক পাতা জুড়িয়া তাহার মধ্যে খড় এবং তূলা দিয়া বাটির মত বাসা তৈয়ার করে। পত্রান্তরালে লুক্কায়িত টুনটুনির বাসা সহজে কাহারও চক্ষে পড়িবার সম্ভাবনা

নাই।

বঙ্গদেশের পাখীদের মধ্যে বাবুই বোধ হয় অদ্বিতীয় শিল্পী- খেজুরের পাতা হইতে চঞ্চুপ্রয়োগে প্রয়োজন মত আকারের টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়া বাবুই আপনার অপূর্ব্ব নীড় রচনা করে। নীড় নির্ম্মাণে বাবুই-পত্নীও স্বামীকে সাহায্য করিয়া থাকে। বাবুইর বাসা সকলেই দেখিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই। বাসার ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখিবার জন্য বাবুই নীড়মধ্যে মৃত্তিকাপিণ্ড জুড়িয়া দেয়।

বাবুই

বাবুই দলবদ্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। তাই একই যায়-গায় অনেকগুলি বাবুইর বাসা ঝুলিয়া থাকিতে দেখা যায়। বাবুই অনেক সময় কেবল আনন্দের জন্যও বাসা নির্ম্মাণ করে। এই বাসার ডিম রাখিবার থলিয়া থাকে না আফ্রিকার কাল বাবুইরা অনেকে একত্রিত হইয়া একটি খুব বড় রকমের বাসা তৈয়ার করে। এই বাসায় বিভিন্ন দম্পতির জন্য বিভিন্ন কক্ষ থাকে। বাসার কোনরূপ অনিষ্ট হইলে ইহারা সকলে মিলিয়া তাহা মেরামত করে। দূর হইতে ইহাদের প্রকাণ্ড বাসাকে চালাঘরের মত দেখায়। অনেক সময় এই বিরাট বাসার ভারে ইহার অবলম্বন বৃক্ষশাখাই ভাঙ্গিয়া যায়।

আফ্রিকার কাল বাবুই

দক্ষিণ আফ্রিকার পেণ্ডুলিন টিটের বাসাও অতি কৌতুহলোদ্দীপক। ডাক্তার শার্প বলেন যে ইহা এত সুন্দর যে, কোন পাখীর বাসা বলিয়াই বিশ্বাস হয় না। বাসার গায় হাত দিলে মনে হয় যে,ইহা অতি উৎকৃষ্ট মখমল বা কার্পেটের তৈয়ারি। কি করিয়া যে এই ছোট্ট পাখিটি তুলা দিয়া এরূপ চমৎকার বাসা বুনিয়া তোলে তাহা ধারণা করা কঠিন। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পেণ্ডুলিন টিট আবার বাসার প্রবেশ পথে একটি ছোট দরজা তৈয়ার করে। এই দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করা যায়।

Penduline Tit
পেণ্ডুলিন টিট

নীড়-নির্ম্মাণ-পটুতা পাখীদের সহজাত সংস্কার মাত্র নহে। শিশু ও বয়স্ক পাখীর বাসার নির্ম্মাণকৌশলের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহারা বাসার স্থান নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে। প্রবন্ধের প্রথমেই অষ্ট্রেলিয়ার মেগাপোডিসের কথা বলিয়াছি; তাহাদের স্তূপ নির্ম্মাণের স্থান-নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেগাপোডিস জাতীয় পাখীরা ডিমে তা দেয় না। কিন্তু ডিমে যাহাতে উত্তাপ-সঞ্চার হয় তাহার প্রতি ইহারা একেবারে উদাসীন নহে। সাধারণতঃ ইহারা উষ্ণ প্রস্রবণের নিকট কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় ইহাদের স্তূপ রচনা করে। ইহাদের বাসভূমিতে শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় প্রকারের বালুকাই আছে; কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণের বালুকা অধিকতর উত্তাপ সঞ্চয় করিতে সক্ষম বলিয়া বুদ্ধিমান্ মেগাপোডিস কৃষ্ণভূমিতেই অণ্ড প্রসব করিবার জন্য স্তূপ নির্ম্মাণ করে।

ঝড়ে বা অন্য কারণে বাসা উল্টাইয়া গেলে নূতন বাসা নির্ম্মাণের সময় ছোট ছোট পাখীরাও এমন স্থান নির্ব্বাচন করে যেখানে পুনর্ব্বার ঐ প্রকারের দুর্ঘটনা ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পাখীদের নীড়-নির্ম্মাণ-দক্ষতা ও নীড় সংস্থাপনের স্থান নির্ব্বাচন দেখিয়া কিছুতেই মনে হয় না যে, ইহারা একেবারে বুদ্ধিহীন ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত। পরন্তু বহু পক্ষী অনেক অসভ্য মানুষ অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

কল্পনা

সৃষ্টি যবে উঠে নাই ভাসি
মহাব্যোম মাঝে,
শুধু শূন্য—মহাশূন্য ছাড়া
নাহি কিছু রাজে;

শূন্যতাও বুঝি বা যখন
না ছিল প্রকাশ,
কি যে ছিল—না ছিল কেহই
কে দিবে আভাস ;
হে কল্পনে, তুমি ছিলে ধ্রুব
আগে সকলের,
বিধাতার দ্রষ্টা চক্ষুরূপে
বীজ ভবিষ্যের।
ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ রহি' মোরা
দূর দূরান্তরে,
শুনি যেন উদার আহ্বান
আমাদের তরে।
মনে হয় প্রিয়তম সে যে
যাঁর এই বাণী,
তাঁর কাছে ছুটে যেতে চাই
ভেঙ্গে গৃহ খানি।
চাই মোরা অসীমেরে যে গো
ছিঁড়িয়া বাঁধন,
তুমি যবে সীমার প্রাচীরে
খোল বাতায়ন।
অতীত ও ভবিষ্য বিস্তার
অশেষ অপার,
মুহূর্ত্তেতে কর কেন্দ্রীভূত
দুই পারাবার ;
রহে না গো নিকট, নিকট,
দূর নহে দূর ;
ক্ষণেকেতে সৃজ শত বিশ্ব
ক্ষণে কর চুর ;
কোথা ঊর্দ্ধ-অধঃ ? কোথা রূপ ?
বিরূপ কোথায় ?
স্পর্শে সবে তোমার মায়ায়
স্বরূপ হারায়।

রূপ রস যেই জগতেরে
করিছে গোচর,
ক্ষুদ্র সে যে ; তারে ছাড়ি রহে
কত চরাচর ;
সে অজানা অদৃষ্ট বিশ্বের
লভিতে আভাস,
হে কল্পনে, সাথে নিয়ে কহ
আশ্বাসের ভাষ ;
ভাসে যদি বদ্ধ কোলাহলে
অসীমের গীতি,
তুমি শুধু পার ধরিবারে
সেই পুণ্য-স্মৃতি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ।

রবিন্দ্রীয় কথা-সাহিত্যে কল্প-পন্থা

কল্পপন্থা বা Romanticism জিনিসটা কি এবং বস্তু-পন্থার সহিত তাহার পার্থক্যটা কোন্ জায়গায় সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য ইউরোপীয় সাহিত্যের Romance ও Novel এর সৃষ্টির ইতিহাসের উপর পূর্ব্বাহ্নেই একটু চোখ বুলাইয়া লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ে নামিতে ইচ্ছা করি।

ঘটনাবিবৃতির সাহিত্যকলা প্রধানতঃ তিনটি সাহিত্য-বিভাগে আপনাকে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। প্রথমে মহাকাব্যে, মধ্যযুগে রোমান্সে ও বর্ত্তমানে নভেলে ও ছোটগল্পে। রোমক সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ভাষা হইতে দেশে দেশে অনেকগুলি প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাদেরই রোমান্স বলা হইত। তার পর ফ্রান্সে ও স্পেইনে এই সব দেশ-ভাষার গদ্যে যত সব কাহিনী রচিত হইতে লাগিল ক্রমে তার সবগুলিকেই রোমান্স আখ্যা দেওয়া

হইল। এখন মধ্যযুগের খাঁটি রোমান্স বলিতে আমরা আর্থার সার্লিম্যানের মত ঐতিহাসিক, স্পেইন পর্তুগালের এমেডিস্ গল্‌মেরিনের মত কাল্পনিক ও সুপ্রাচীন গ্রীক পুরাণ ও ইতিহাসের হার্কিউলিস্, অ্যাকিলিস্ ও সেকেন্দ-রের মত বীরগণের বীরত্বকাহিনীকেই বুঝিয়া থাকি। এই সব রোমান্স আদর্শ বীরগণের জীবনকথা বলিয়াই, এবং সমস্ত দেশের হৃদয়-লোক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই তাদের মধ্যে মহাকাব্যেরও লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং নানাদিকে তারা যে মহাকাব্যেরই উত্তরলোকে উত্তরাধিকারী রূপে প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই সব কাহিনীর অন্য লক্ষণও আছে। এদের মধ্যে দৈত্যপরীরাও আসিয়া ঢুকিয়াছেন। আর্থার যুদ্ধ করিয়াছিলেন স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে, অর্দ্ধঅসভ্য তুহিনশীতল উত্তরদেশের গথিক কল্পনার বিরাটকায় অতিমানব দৈত্যেরা তাই এই সব-কাহিনীতে তাদের রক্তের উৎসব জমাইয়া তুলিয়াছে; সার্লিম্যাল লড়িয়াছিলেন প্রাচ্য স্যারাসেনদের সঙ্গে, সেই সব বীরত্ব-কথার অস্ত্রঝঞ্ঝনার ফাঁকে তাই বিলাসলীলায়িত আরব কল্পনার পরীরাণীদের নূপুর নিক্বণ শোনা যায়। বর্ত্তমানযুগে-যে সব কথাগ্রন্থকে আমরা রোমান্স বলি,—যেমন স্কট ও হুগো ডুমা ও বঙ্কিমের লেখা,—তারা আর্থার প্রভৃতি আদর্শ বীরগণের জীবন কাহিনী লইয়া রচিত না হইতে পারে, দৈত্যপরীঘটিত খাঁটি অতিলৌকিক রসটা তাদের মধ্যে নাই সত্য, তবু তারা মধ্যযুগের রোমান্সের মতই প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার আবেষ্টণ হইতে মানব মনকে ইতিহাসের কিম্বা কল্পনার কল্পলোকের দিকেই তুলিয়া ধরে। এই খানেই মধ্য ও বর্ত্তমান যুগের রোমান্সের জ্ঞাতিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকের ইটালীর Novelle (ফরাশী Nouelle) হইতেই প্রধানতঃ Novel কথাটি ইংরাজী সাহিত্যে আমদানি হইয়াছে। ইটালীতে Novelle বলিতে কোনো একটা নূতন গল্প—যা নাকি নূতন রকম কৌতূহল উদ্রিক্ত করিতে পারে—তাকেই বুঝাইত। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ হইতে ফরাসী দেশে Troveurs নামধেয় পর্য্যটনশীল গ্রাম্যকবিগণ কর্ত্তৃক রচিত Fabliaux নামীয় পদ্যগল্পগুলি রোমান্স ভাষায়ই রচিত এবং গীত হইতেছিল সত্য, তবু আধুনিকের চক্ষে সে গুলিই নভেলের আদিমতম চেষ্টা বলিয়া প্রতিভাত হইবে। মানব-জীবন এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক ঘটনা এবং ভাবস্রোতকে সরল স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করিবার ভঙ্গিটা এদের মধ্যেই প্রথম প্রকাশ পাইয়া উঠে। মধ্যযুগের ইটালীয় কথা সাহিত্যের উপর এদের প্রভাবটা কম ছিল না। তবে ইটালীই নভেলের ভিত্তিপত্তন করিয়াছে একথা ঠিক; এবং ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, সে সম্বন্ধে তার বিশেষ একটা উপযোগিতাও ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ইটালীতে বর্ব্বরাভিযানের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই, ইটালীর সমরোৎসাহ একেবারে নিবিয়া গিয়াছে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশপতিরা গৃহকলহে ব্যাপৃত; সমস্ত দেশের হৃদয় অধিকার করিয়া এবং বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মহাকাব্য ও রোমান্স-সাহিত্যোচিত কোনো বীরের উদ্ভব তখন অসম্ভব ছিল। তার পর আবার একদিকে ল্যাটিন ভাষার নাগপাশ, অন্যদিকে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কড়াক্কড় পাহাড়া এড়াইয়া, ইটালীয় মনের রোমান্সের উদ্দাম কল্লোচ্ছ্বাসে ছাড়া পাইবার মুহূর্ত্ত মাত্র অবকাশ ছিল না। কিন্তু এ সব কারণ মিলিয়া অন্য দিক দিয়া [illegible] বরিয়াছে দান্তে ও পেট্রার্ক যে নব অভ্যুদয়কে সাহিত্যে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা আধুনিকতারই আবাহন, প্রাচীন রোমান্সের স্বপ্ন-কুহেলিকাকে তাঁরা বর্ত্তমান জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদের আনন্দে এবং আধুনিক কল্পনার সংযত আলোক দিয়া মুহূর্ত্তেই ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। এই ইটালীয় নব অভ্যুদয়ের ত্রয়ীর যে তৃতীয়ব্যক্তি সেই বোকাসিওর "ডিকেমেরণে" রোমান্সের পাণ্টাচেষ্টাই যে ক্রমে সাহিত্যের আসর জুড়িয়া বসিতেছে; তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বোকাসিও তাঁর গল্পগুলিতে মহাকাব্য ও রোমান্স সাহিত্যোচিত বিরাটের দিকে তাঁর কল্পনাকে এলাইয়া দেন নাই, প্রাচ্যমূল গল্পসাহিত্যে ও মধ্যাব্দীর বীরত্ব-ব্যাপারের ফাঁকে ফাঁকে যে সব অনাবশ্যক সাধারণ জীবনের ঘটনা ঢুকিয়া গিয়াছিল, সেই গুলিকে এবং Fabliaux ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার উপরই এক প্রচ্ছন্ন প্রেরণায় তাঁর কল্পনাকে

সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এমন কি, যদিও ভাল হয় নাই, দুচারিটি গল্পে তিনি তাঁর সমসাময়িক জীবনের চিত্র আঁকিতেও বিরত হন নাই। প্রাচীন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ট গল্পী কবি সোরের উপর এই বিশেষমুখী গল্প গল্পচেষ্টার প্রভাবের কথা ভাবিলে বোকাসিওকে বর্ত্তমান নভেল ও ছোটগল্প রচয়িতার আদিপুরুষ বলিয়া ধারণা হইবে। কারণ, বোকাসিও কর্তৃক প্রভাবান্বিত চসায়ের পর হইতেই কতকটা আধুনিক ছাঁচে গল্প লেখা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। একদিক দিয়া যেমন এই নব-অভ্যুদয়ের আধুনিকতা অন্য দিক দিয়া তেমনি পেরবিলেইস, সারভেন্‌টিস এর মত ব্যঙ্গবিশারদদের চেষ্টা ক্রমে রোমান্সকে অপসারিত করিতে এবং পরোক্ষে নভেলসৃষ্টি সাহায্য করিয়াছে। লি সেইজের "গিলব্লাসে" সারভেন্‌টিসে প্রভাব আছে, এবং তদানীন্তন স্পেইনে প্রচলিত চোরবাট পাড়ের যত গল্প সাহিত্য-বদমায়েসগণের আদিজনক গুজম্যানকে কেন্দ্র করিয়া বিকুশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাদেরও সুপরিস্ফুট ছায়া তাতে পরিলক্ষিত হয়। এই নিম্নতম মানব চিত্রণের ধারাটা লে সেইজ হইতে স্মলেটের ভিতর দিয়া আসিয়া ডিকেন্স ব্যালজ্যাক ও জোলার মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই। এই নিম্নমানব চিত্রণের দিক দিয়া গিলব্লাসকেই ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রথম নভেল বলা যাইতে পারে। এই নিম্নমানব চিত্রণই নভেলের আদি ধারা। কিন্তু ঘরাণো ঘটনাকে ঘরাণো ভাবে বর্ণনার ভঙ্গি দিয়া ফরাসী সাহিত্যের The Princess of Cleves এই যুগ প্রবর্ত্তনের দাবীটা বেশী করিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাও Marivaux র Marianne র মত তেমন বিখ্যাত নয়। শেষোক্ত গ্রন্থটিই আধুনিক নভেলের হৃদয়-বিশ্লেষণের ধারাটিকে কায়েমী করিয়া দিয়াছে। Richardson ও Roussean এবিষয়ে মেরিভোরই শিষ্য।

আধুনিক নভেলের এই দুইটি প্রধান ধারা—নিম্নমানব চিত্রণ ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ—ফরাসী লে সেইজ ও মেরিভোই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

নভেলের ধারা যখন একবার প্রবর্ত্তিত এবং বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তখন আর পুরাণো খাঁটি রোমান্সের দিকে বর্ত্তমান জগতের ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান কালে যাঁরা কল্পপন্থী বলিয়া বিখ্যাত, তাঁদের মধ্যেও নভেলী বস্তুপন্থাটি বিদ্যমান আছে। এমন কি স্কটের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ডিফো ও স্মলেটের পদাঙ্কানুসরণে নিম্ন মানব চিত্রণ স্পৃহার বস্তুপন্থাটিই প্রধান, না, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কল্প-পন্থাটাই প্রধান, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সত্য কথা বলিতে কি আমাদের এমনও সন্দেহ হয় যে, স্কট মূলে নেহাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুপন্থী, তাঁর মনের উপর শুধু কল্প-পন্থার তা লাগিয়াছে বৈ নয়। আমাদের বঙ্কিমেও বস্তু-পন্থার সন্ধান পাই। কিন্তু স্কটের মত কল্প ও বস্তু পন্থা তাঁর মধ্যে আলগা থাকিয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুলভ বস্তু-সংযম ও উনবিংশ শতাব্দীর কল্পলীলা তার মধ্যে সুন্দর ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার বস্তুচিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু বস্তুর আবেষ্টণের মধ্যে তাঁর মনকে বদ্ধ থাকিতে দেন নাই। বাংলার সংসারজীবনের উপর তিনি শ্রেয়ঃপন্থার (Idealism) ধ্রুবজ্যোতির আলোকপাত করিয়াছেন ও কথা-সাহিত্যে সেটাই তাঁর স্বকীয় পথ। কিন্তু তাঁর শক্তিশালী লেখনী কল্পপন্থা কিম্বা আলোকপন্থার লোভকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতে পারে নাই, এবং তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের লাভ বৈ কোনোরূপ ক্ষতির কারণ হয় নাই। তাঁর দুই একটি কল্প-পন্থী রচনা নিয়াই আমরা এখানে একটু আলোচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে কথা সাহিত্যে কলম ধরিতে আরম্ভ করিয়াই ঐতিহাসিক উপন্যাসের কল্প-পন্থায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক কলায় ইতিহাস তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' এবং 'রাজর্ষিতে' মুদ্রিত হইয়া আছে। কিন্তু সেটা তাঁর নিজস্ব পথ নয় বলিয়াই তাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই দুইটি কথা-

গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কর্ম্মগতি গ্রন্থ-বর্ণিত চরিত্রগুলির হৃদয়-প্রাচুর্য্যকেও অপূর্ব্ব কর্ম্মধারায় নিক্ষেপ করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে দোলা দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই উপন্যাস দুইটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের গৌরব অর্জ্জন করিতে পারে নাই, এবং বাঙ্গালী হৃদয়ের ভাবগ্রস্ততার চিত্র হইয়াও বাংলাদেশের খাঁটি বস্তুচিত্রের গৌরবও হারাইয়া বসিয়াছে। বাস্তবিক এ দুটি mongrel রচনারই নিদর্শন-স্থল। রবীন্দ্রনাথের idealismই এখানে বস্তু-সম্পর্ক-হীন অবস্থায় কল্পপন্থী ঐতিহাসিক কাঠামের মধ্যে তার অস্বাভাবিক প্রকাশের সন্ধান খুঁজিতেছে। এই idealism বাস্তবতাবর্জ্জিত হইলেও এই গ্রন্থদ্বয়ে লেখকের একমাত্র নিজস্ব জিনিষ; ঐতিহাসিক কাঠামটা নেহাৎ জোড়াতাড়ার ব্যাপার; তাহা আগন্তুক মাত্র, আলগাই রহিয়া গিয়াছে। 'সাধনা'র যুগের ছোট গল্পে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে এই কৃত্রিম কল্প-পন্থী কাঠামটা একেবারে খসিয়া গিয়াছে; কারণ সেখানে রবীন্দ্রের মন শ্রেয়ঃপন্থীর মত বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী হৃদয়ের মধ্যেই তরে আপন বস্তু-ভিত্তিটি খুঁজিয়া পাইয়াছে।

'সাধনা'র যুগে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই গল্পের বন্যা যুগে, রবীন্দ্রনাথ যখন দেশের মাটির উপর অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, যখন তিনি আপন শক্তির কেন্দ্রের উপর স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তখনই তিনি আপনার মনকে সেই কেন্দ্র হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া কল্প-পন্থার পরিধিতে মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য আশ্চর্য্য কৃতিত্বের সহিত ঘুরাইয়া আনিতে পারিয়াছেন। কারণ, তখন বস্তুকেন্দ্রের প্রবল আকর্ষণ থাকায় সেই মনের পক্ষে উন্মত্ত উল্কাপিণ্ডের মত কল্পপন্থী আত্মহত্যার সুগভীর গহনে ছুটিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে "দালিয়া" গল্পটি এই বস্তুসংযত কল্পপন্থার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নিদর্শন বলিলেও অন্যায় হয় না। "দালিয়া" রবীন্দ্রের সমস্ত গল্প ও উপন্যাস হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র প্রকৃতিতে উজ্জ্বল, প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা চোখে পড়ে। ইহা আপন বিশিষ্টতায় একরূপ একক হইয়াই আছে। এই বিশিষ্টতা অবশ্য ইহার রচনার কল্পপন্থী রীতি। রবীন্দ্রনাথ ক্ষণকালের জন্য তাঁর পরিচিত বাংলাদেশটি ভুলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালটা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর চোখ হইতে সরিয়া গিয়াছে, বাংলার ক্ষুদ্র নরনারীরাও তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন যাত্রা লইয়া সুদূরে মিলাইয়া গিয়াছে। আরাকান রাজ্য এবং আরাকান প্রান্তস্থিত এক ধীবরের কুটীর হইয়াছে এই গল্পের দৃশ্যস্থান; ঔরঙ্গজেবের ভয়ে পলায়িত শাসুজার কন্যারা এবং আরাকান যুবরাজ হইয়াছেন ইহার পাত্র পাত্রী। লোকালয় হইতে বহু দূরে নদীতীরবর্ত্তী নির্জ্জন ধীবরকুটীরে পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে ছদ্মবেশী যুবরাজ এবং শাহজাদীদের সরল এবং অনাবিল প্রেমের অভিনয়ই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উন্মুক্ত বিশ্ব প্রকৃতির মুখোমুখি করিয়া এবং তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া মানবপ্রকৃতিকে চিত্রিত করা এবং সর্ব্বপ্রকার স্থানীয় আবেষ্টণ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের উদার বিশ্বরঙ্গভূমিতে তুলিয়া ধরাটা কবিত্বময়ী কল্পপন্থী কল্পনারই রীতি। অল্প পরিসরের মধ্যে ইহাতে ঘটনা বেশ একটু গতি লাভ করিয়াছে, এবং এই গতিটা রোমান্সেরই জিনিষ। রোমান্স এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ন্যায় ইহাতে ঘটনাসংস্থান (setting) ও ঘটনার পরিণতি, সম্বন্ধাবস্থান (Situation) ও সৃষ্টি এবং ঘটনার কেন্দ্রানুগতা সমস্তই নাটকীয়ভাবে সম্পাদন করা হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র গল্প, কিন্তু একটি সুবৃহৎ শ্রেষ্ঠ নাটকের অথবা কথা-গ্রন্থের বীজোপাদান ইহাতে নিহিত আছে। বাস্তবিক ইহা যেন একটি বৃহৎ কথাগ্রন্থেরই ছাঁকা সংস্করণ আঁটাশাঁটা এবং সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত, অনাবশ্যকের ভাবে যাহা কোনো জায়গায়ই ভোতা হইয়া যায় নাই, যার প্রত্যেকটি অংশ হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, অত্যাবশ্যকীয়, তীক্ষ্ণ এবং সকোণ।

নবাবপুত্রীর কল্পপন্থাসুলভ প্রতিহিংসার নীতিও অবশ্য ইহাতে আছে, কিন্তু তাহা গল্পশেষে খাপ হইতে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত ছুরিকার মতই দ্বিধায় এবং কৌতূহলে ঝিকমিক করিতেছে

তার পক্ষে কল্পপন্থী রক্তারক্তিতে পর্য্যবসিত হইবার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। রোমান্সের ঘটনাগতির উপর ততটুকু বস্তুসংযম এই গল্পে আছে। ঠিক এই ধরণের গল্প রবীন্দ্রনাথ আর লিখেন নাই। ইচ্ছা করিলেই লিখিতে পারিতেন, তার সুস্পষ্ট আভাসটুকু দিয়াই ক্ষান্ত রহিয়াছেন। সেটা আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

"জয়পরাজয়কে"ও এই পর্য্যায়েই ফেলিতে হয়। ইহাতে অবশ্য "দালিয়া"র মত কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক কাঠাম অবলম্বন করা হয় নাই; কিন্তু ইহাতেও সেই অতীতেরই হিন্দুরাজসভার বিচারছবিকে অবলম্বন করিয়া একটা সত্যকে সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। ইহার ঘটনা-সংস্থানে এবং সম্বন্ধাবস্থানে কল্পপন্থী অতিরিক্ততা বর্ত্তমান, তবে ইহাতে কল্পপন্থা রীতির সঙ্গে বিগ্রহপন্থা রীতিটাও মিশিয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ চরিত্রসৃষ্টিতে দুটা দিক থাকে। একটা তার ব্যক্তিত্বের দিক, সেখানে সে স্বতন্ত্র, জগৎসংসার হইতে পৃথক; আর একটা সার্ব্বজনীনতার দিক, যেদিকে বিশ্বের সঙ্গে তার যোগ। যে চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের দিকটা বেশী পরিস্ফুট তাকে আমরা ব্যক্তিচরিত্র, আর যাতে সার্ব্বজনীনতার দিকটা বেশী ফুটিয়াছে, তাকে আমরা প্রতিনিধি-চরিত্র বলিতে পারি; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টিই এই দুইরকমের মশলার মিশ্রণেই প্রস্তুত। ব্যক্তি চরিত্র আঁকার বিপদ অনেক; তা আপনার অতিব্যক্তিত্বের গতিবেগে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির রাজ্যের বাহিরে গিয়া পড়িতে পারে, এবং সেখান হইতে তার মুখভঙ্গি, চিন্তাভঙ্গি এমন হাস্যকররূপে অতি-রঞ্জিত হইয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতে পারে, যাহাতে তাহার ব্যক্তিরূপ জলের নীচে দেখা মূর্ত্তির মতন ব্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। ঔপন্যাসিক-শ্রেষ্ঠ ডিকেন্স এই বিপদের হাত এড়াইতে পারেন নাই। মানব চরিত্রের সনাতন শুভ্রতাকে বিভিন্ন রঙে বিশ্লেষণ করিয়াই ব্যক্তি চরিত্র সৃষ্টি করিতে হয়, কিন্তু এই ব্যক্তির রঙকে অতি মাত্রায় উজ্জ্বল করিতে গিয়া তুলির পোঁছে পোঁছে তাকে মানবসম্পর্কবিরহিত বর্ণাভাবসূচক কালিমাতে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবার লোভ সামলানো সকলের পক্ষে সহজ নহে। অতি উচ্চগ্রামে ব্যক্তিত্বের সুর চড়াইতে গিয়া অনেক জায়গায় মানবসহানুভূতির তার ছিঁড়িয়া যায়। অন্যদিকে আবার প্রতিনিধি চরিত্রে সার্ব্বজনীনতাকে ঠিক ঠিক রাখিতে গিয়া তাকে জলীয় পান্‌সে এবং বর্ণগন্ধহীন করিয়া তুলা হয়; সৃষ্টির গৌরব তাতে ক্ষুণ্ণ হয়।

"জয় পরাজয়ে"র কবিশেখর, রাজকন্যা অপরাজিতা, পণ্ডিত পুণ্ডরীক, রাজা উদয়নারায়ণ—সকলেই প্রতিনিধি চরিত্র। তাঁরা শুধু বিশেষ বিশেষ মানবশ্রেণীর প্রতিনিধি নহেন; তাঁরা এক একটা আইডিয়ার প্রতিনিধি। আইডিয়ার বিগ্রহরূপে চরিত্রগুলি চিত্রিত হইয়াছে বলিয়াই এই গল্পে বিগ্রহপন্থী রচনারীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিগ্রহপন্থী ছায়াবাজী ইহাতে নাই। রবীন্দ্রনাথ আইডিয়া গুলিকে রক্তমাংসের এবং ব্যক্তিত্বের কায়া দিতে পারিয়াছেন। ইহাতে শেখর ও পুণ্ডরীকের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। রাজা উদয় ও প্রজাসাধারণ তার জয় পরাজয়ে বিচারক। এ যুদ্ধ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের মধ্যে। কবি শেখর সেই চিরন্তন নর এবং নারীকে লইয়াই, সেই অনাদি সুখদুঃখ লইয়াই তাঁর গান বাঁধেন; বৃন্দাবনের বাঁশির মহিমা ঘোষণা করাই তাঁর কাজ। তাঁর সুবঙ্কিম স্বচ্ছ তনুলতাটিও যেন বৃন্দাবনের বাঁশির মতই দক্ষিণা ভাবের হাওয়ায় আপনি ফুকারিয়া উঠে। পণ্ডিত পুণ্ডরীক শ্লোকরচনা করেন রাধাকৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের রূপক ব্যাখ্যা করিয়া, অপহ্নুতি কালসার কাকপদ প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া। প্রজাসনাথ উদয়নারায়ণ হইয়াছেন মূর্খ জনসাধারণের প্রতিনিধি,—যে জন-সাধারণ তাদের সুখদুঃখে কবির গানে আনন্দ ও সান্ত্বনা লাভ করে, কিন্তু পাণ্ডিত্য অথবা পাণ্ডিত্যের পণ্ডত্বের কাছে এক মুহূর্ত্তেই কিছু না বুঝিয়াই যেন আরো বেশী অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাদের চিরদিনের কবিকে ভুলিয়া পাণ্ডিত্যের কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দেয়। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মূর্খতার যে একটা অন্ধ মোহ আছে সেই

সত্যটাই শ্রোতৃমণ্ডলী সহ উদয়নারায়ণে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজকন্যা অপরাজিতা হইয়াছে গুণমুগ্ধ ভক্তহৃদয়—যে নাকি শুষ্ক পাণ্ডিত্যের গুরুগম্ভীর গর্জ্জনের মধ্যে অপরাজিত থাকিয়া আপনার স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া কবির প্রাণকে চিরকাল সঞ্জীবিত রাখে, আপন আলোক দিয়া সেখানে নিত্য সুখ এবং নিত্য দুঃখের স্বর্ণ কমল ফুটাইয়া তুলে এবং আপন স্বতঃ উৎসারিত পুষ্পিত ভক্তিপ্রীতির অম্লান জয়মাল্য দিয়া তার অবজ্ঞাত মরণাহত কবিকে বরণ করিয়া লয়। কবিও সেই একমাত্র ভক্তহৃদয়ের নক্ষত্রলোককে উদ্দেশ করিয়াই, কবি প্রেরণায় সেই আরাধ্যা দেবীকে লক্ষ্য করিয়াই, তাঁর অমর সঙ্গীতকে প্রেরণ করেন; এবং তারই সুখ দৃষ্টির আনন্দটুকুকে পাথেয় করিয়া অনন্ত যাত্রায় প্রয়াণ করেন। এই সত্যের দ্যুতিটি সমস্ত গল্পটিকে ছাইয়া থাকিলেও তাহা কায়ারই বিচ্ছুরিত জ্যোতিচ্ছায়া বৈ কিছু নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অর্থাৎ ইহার বর্ণিত হৃদয়-ভাবগুলি কোথাও রূপকের ছায়ারূপে পর্য্যবসিত হয় নাই। পরন্তু তাদের মধ্যেই রক্তস্রুত জীবনের তরঙ্গবিক্ষেপধ্বনি-টাই বেশী করিয়া কাণে বাজে, মাটীর পৃথিবীর স্থূল পাদক্ষেপ চিহ্নটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কবিশেখর প্রতিনিধি চরিত্র হইয়াও একটি বিশেষ ব্যক্তিজীবনের দুঃখ লইয়াই যেন আমাদের হৃদয়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করেন; কবিশেখর আপন প্রিয়জনকে আনন্দ বিলাইবার জন্য জীবন ব্যাপী গানের সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর সেই গানগুলি যখন উপেক্ষা বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল, তখনকার সেই কবিহৃদয়ের সুবিপুল বিফলতা ও অপরিসীম দুঃখের ভাবটাই আমাদিগকে আসিয়া নিবিড় ভাবে নাড়া দিয়া যায়। ব্যক্তি হৃদয়ের এই প্রকাণ্ড ব্যর্থতাকেই যেন শেষে আমরা জগৎ জোড়া ট্র্যাজিডির রাজ্যে তুলিয়া ধরিয়া তাকে একটা সর্ব্ব জনীনতার মূর্ত্তি দিয়া দিই। তখন দেখি, যাহা একলার ছিল, সমগ্র বিশ্বজনের হৃদয়ে তাহা ঘনাইয়া আসিয়াছে; যেন দেখি, এই পরাজয় জগতের সমস্ত মন্দের কাছে সমস্ত ভালোর পরা-জয়, জড়ের কাছে আত্মার পরাজয়, জটিল চক্রান্তের কাছে সতীত্বের পরাজয়, পার্থিব ক্ষমতামদ ও নিষ্করুণতার কাছে পিতাপুত্রীর স্বর্গীয় স্নেহবন্ধনের পরাজয়, বস্তুজীবন ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের কাছে জীবনের আদর্শের পরাজয়। এই পরাজয়ের কাহিনী বক্ষে লইয়াই এগামেম্‌নন্ ও ইডিপাস্, ওথেলো, লিয়ার ও হ্যামলেট, ব্রাণ্ড ও দেশবৈরী (Enemy of the people) পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই পরাজয় কীটের মতন জগতের সমস্ত সৎকর্ম্মের প্রাণের মধ্যে তার কৃষ্ণ দংশন-লাঞ্ছন অঙ্কিত করিয়া দেয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাজিডির মধ্যে তাঁর গল্প শেষ করেন নাই। শেখর যখন আপন বিফল কীর্ত্তিগুলিকে অগ্নি শিখায় সমর্পণ করিয়া দেশের উপেক্ষার মতন তীব্র হলাহল আকণ্ঠ পান করিতেছিলেন তখনও তাঁর জন্য এক জায়গায় শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা সঞ্চিত হইতেছিল।

যে রাজকন্যা অপরাজিতা তাঁর সমস্ত গানের উৎস এবং কেন্দ্র, যাকে তিনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর স্বহস্তের জয়মাল্য অথবা বরমাল্য যখন কবি লাভ করিলেন, তখনই তাঁর জীবনের বিফলতা ঘুচিয়া গেল; জীবন একমুহূর্ত্তে সার্থক, সুন্দর ও মহিমময় হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই জয়ের খবর রাখে কে? পৃথিবীতে তাঁর পরাজয়টাই যে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। আমরা পাঠক, যতক্ষণ এই গল্প কাব্যের চৌম্বক ক্ষেত্রে বাস করি, ততক্ষণ শেখরের জয় ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং গল্পকার না বলিলেও শেখরের মৃত্যুর পর অপরাজিতা তাঁর উপযুক্ত কীর্ত্তি মঠ গড়িয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁর অনুতপ্ত দেশবাসীরা যে অশ্রু-সিক্ত পূজোপচারে সেই মঠকে নিত্য অভিসিঞ্চিত করিত, সেই কথা মনে মনে বেশ জানি, কিন্তু এই গল্পের মোহ কতক্ষণ! আমরাই শেষে সংসারজীবনে জগতের ট্র্যাজিডিকে আরো করুণ এবং ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই। কাজেই আমাদিগকে জড় এবং অজড়ের টানা-হেঁচড়ায়, বস্তু-জীবন এবং আদর্শ-জীবনের মধ্যে হোঁচট খাইতে খাইতে কোনো রূপ উত্তর পাইবার অপেক্ষা না রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্ন করিয়াই যাইতে হয়, জয় কার? পরাজয়ই

বা কাহার? "জিত্‌ল সে যে জিত্‌ল কি না" এজীবনের কার্য্যকলাপ দিয়া তার কোনো মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র থাকে না।

এই গল্প ঠিক কবে রচিত হইয়াছিল জানি না। সেই সময়কার কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা হইতে কোনো অনুরূপ বাস্তব ঘটনা-সঞ্জাত কবিহৃদয়ের বেদনা হইতেই যে এই অমর গল্পটি ভাষা ও কবিত্বের বর্ণগন্ধে এমন ভরপুর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল ততটুকু হয় ত সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে; কিন্তু সেই বাস্তব শিকড়টুকু খুঁড়িয়া তুলিবার বিশেষ কোনো দরকার দেখিতেছি না; ফুলটি পাইয়াছি, ইহাই পরম লাভ। ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যের তর্কজালকে যে শাণিত ব্যঙ্গের ছুরিকা দিয়া ছিন্ন করিতে এবং "কাণাকড়ি" সমালোচককে যে "টাকা"র আভিজাত্যগর্ব্বরূপ উপহাসের অস্ত্র দিয়া আঘাত করিতে জানিবেন, এই গল্পে দেখিতে পাই সেটি এখনো বেশীর ভাগ খাপেই বদ্ধ রহিয়াছে; পণ্ডিত পুণ্ডরীক প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়াও তাই তাঁর বিরাট বপুঃ ও সুতীক্ষ্ণ নাসা এবং উন্নত ললাট লইয়া প্রকাশ্য বিদ্রূপবাণে কবি শেখরকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিতেছেন। বাস্তবিক এই গল্পে পণ্ডিত পুণ্ডরীককে বিদ্রূপ করার চেয়ে কবি শেখরের করুণ অসহায় ছবিটি ফুটাইয়া তুলাই কবির উদ্দেশ্য ছিল, এবং গল্পের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যও অবশ্য সেই খানেই। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বযশ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপেক্ষা এবং বিদ্রূপের অস্ত্রটিও যখন তেমন ভাবে শাণ দেওয়া হয় নাই, তখনকার সেই অবজ্ঞাত দুচারিটি ভক্তজনের সহানুভূতিলোলুপ তরুণ কবিহৃদয়ের বেদনা দিয়াই এই গল্পসৃষ্টি সম্ভব ছিল।

এই গল্পের কল্পপন্থী ঘটনাসংস্থানটি 'দালিয়া'র মত ইহাকেও রবীন্দ্রের অন্যান্য গল্প হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহাতে বিগ্রহ-পন্থী রীতি প্রবেশ করিলেও তাহা কল্পপন্থার আড়ালেই কাজ করিতেছে। রবীন্দ্রীয় কথাসাহিত্যে এই 'জয় পরাজয়ে' এবং 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র মধ্যেই প্রথম বিগ্রহপন্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁর গল্পচেষ্টার সবুজপত্রী যুগের আলোচনার সময় এই বিগ্রহপন্থার সঙ্গে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।

"একটি আষাঢ়ে গল্পে"র ছাঁচটি অতীত রূপকথার যুগের। কিন্তু ইহার ঘটনা-সংস্থান ও ভঙ্গি কল্পপন্থী হইলেও বিগ্রহ-পন্থাই ইহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের যে বিধিদত্ত অক্ষয় তূণ লইয়া জন্মিয়াছিলেন, তার সবগুলি একে একে শাণিত হইয়া বাহির হইতেছে, সেই খবরটুকু এই রচনার মধ্যে আমরা পাই। ইংরাজাগমনের পূর্ব্বকার আমাদের এই নির্ব্বিকার তাসরাজ্য, এই দোদুল্যমান পুতুলের বাঙ্গলাদেশকে যেমন তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা পরে শক্তির পরিণত অবস্থায়ও করিয়াছেন কি না সন্দেহ,—অন্ততঃ এমন মধুর ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া এমন সুন্দর কল্প ও বিগ্রহপন্থী আবরণের ভিতর দিয়া আর করেন নাই, তাহা নিশ্চিত।

এই গল্পের যে একটি পুষ্পপেলব সৌন্দর্য্য আছে তাহা কল্পপন্থারই সৌন্দর্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পেলব পল্লব-পুষ্পের ভিতর দিয়া ব্যঙ্গের কাঁটাগুলিকে এমন তীব্রভাবে উঁচু করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই গল্পে সেইগুলিরই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে; কল্পপন্থা এখানে বিগ্রহপন্থার দাস হইয়াই কাজ করিতেছে। ব্যক্তিত্বমর্য্যাদাহীন সমাজের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত বাংলার নির্জ্জীব প্রতিনিধি নরনারীগুলিকে তাসের ছবিতে পর্য্যবসিত করিয়া লেখক তাঁর তত্ত্বচেষ্টা এবং ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যকে আশ্চর্য্যরূপে সফল করিয়াছেন, পাঠককে রক্ত-মাংসের স্বাদ দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যেই ছিল না। এই খানেই "জয় পরাজয়ে"র সহিত "একটি আষাঢ়ে গল্পে"র তফাৎ। "জয় পরাজয়" বেশীর ভাগ আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করে, কিন্তু "একটি আষাঢ়ে গল্পের" তৃপ্তিটা বহুল পরিমাণে মানস।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচেষ্টা এই দুইটি গল্পে ছাড়া আর একটী গল্পে কল্পপন্থী কাঠাম অবলম্বন করিয়াছে। সেটি হইয়াছে "রীতিমত নভেল"। লেখক ইহাতে রোমান্সের অথবা কল্পপন্থী রচনা রীতিকে কল্পপন্থী রচনারীতি দিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। Cervantes তাঁর Don Quixote এবং Chaucer

তাঁর Rime of Sir Thopas এ এই রোমান্সের বিকৃতিকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। Moliere ও Boileau ও এই রোমান্সের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যঙ্গশক্তিকে নিয়োগ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁদের মত রবীন্দ্রনাথেরও উদ্দেশ্য রোমান্সের বিকৃতিকেই ব্যঙ্গ করা, প্রকৃত রোমান্সকে নয়। তবে "রীতিমত নভেল" না রাখিয়া গল্পটির নাম রীতিমত রোমান্স রাখিলেই বেশী শোভন হইত। এই দুইটি শব্দ ভাষার রহস্যময় অভিব্যক্তির নিয়মে তাদের আদিম অর্থ হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছে, তা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

শেষ তিনটি গল্পে দেখি, লেখকের ব্যঙ্গচেষ্টাই কল্পপন্থার আবরণ খুঁজিয়াছে, কল্পপন্থাটা তাই তাদের মধ্যে কম বেশী অপ্রধান হইয়াই গিয়াছে। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে "দালিয়া"ই তাঁর একমাত্র খাঁটি কল্পপন্থী প্রচেষ্টা।

অনেকেই হয়ত উৎসুক হইয়া রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" "কঙ্কাল" "মণিহারা" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গল্প কয়টির আলোচনার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। এই গুলিকে আমি রবীন্দ্রনাথের অলোক-পন্থার নিদর্শনস্বরূপ অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চাই। কল্পপন্থা ও অলোক-পন্থা দুইটিই অবশ্য সাহিত্যে অতিরিক্ততা, এবং অনেক বিষয়ে সমানধর্ম্মী। দুটিই অজানা রাজ্যের সোণালি ছটা লইয়া আমাদের নয়ন মনে আসিয়া প্রতিফলিত হয়, কিন্তু আমি পূর্ব্বকার এক প্রবন্ধে বলিয়াছি "একটি উদয়াকাশের বর্ণচ্ছটা, আর একটি অস্ত-আকাশের বর্ণচ্ছটা"। বাস্তবিক অলোকপন্থা হইয়াছে সাহিত্যের পরিণত অবস্থার সামগ্রী, যৌবনশেষের Romance কাজেই রবীন্দ্রনাথের ঐ গল্প গুলির আলোচনার লোভ আমাকে এখানে সাম্‌লাইতে হইল, আপনাদিগকেও সেই দায় হইতে নিষ্কৃতি দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক নভেলগুলি বস্তুপন্থার মাটি মাড়াইয়াই শ্রেয়ঃপন্থার ধ্রুবজ্যোতি লোকে গি। পৌঁছিয়াছে, সেগুলিতে কল্পলোকের রঙ ধরে নাই। "নৌকাডুবি" এ বিষয়ে আমার মনে হয় তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হইতে পৃথক্। ইহাতে বস্তুপন্থার প্রাত্যহিকতার উপর শ্রেয়ঃপন্থা ছাড়া নৌকাডুবা এবং রমেশকমলার মিলনব্যাপারে একটা কল্পপন্থী কাব্যাতিরিক্ততার সন্ধান পাই। তরুণ সন্ন্যাসী নলিনাক্ষের কমলাপ্রেমের মতন ইহাতে শ্রেয়ঃপন্থার শুভ্রতাটিও আপনার দিক্‌প্রান্তকে কল্পপন্থার কল্পরঙে রঙিয়া লইয়াছে। নানাদিক দিয়া দেখিলে "নৌকাডুবি"ই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বজনপ্রিয় উপন্যাস হওয়া উচিত। "নৌকাডুবি"র বিস্তৃত সমালোচনা আর এখানে করিলাম না, "প্রতিভা" পত্রে পূর্ব্বেই আমি তাহা করিয়া চুকিয়াছি।

আমাদের দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথাসাহিত্যিক প্রচেষ্টায় কল্পপন্থাকে আর কোথাও কাজে লাগান নাই। সেই ক্ষমতা তাঁর যথেষ্ট ছিল, এইটুকু জানাইয়া তিনি আমাদের আশাকে শুধু জাগাইয়াই দিয়াছেন, তৃপ্ত করেন নাই। সম্মিলিত বাঙ্গালী হৃদয়ের প্রত্যাশা কি সেদিক্ দিয়া তাঁর নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইতে পারে না? অন্ততঃ আর দুচারটা 'দালিয়া, দুই একটা 'নৌকাডুবি'? কিন্তু জানি, এ অন্যায় অনুরোধ! যা পাইতেছি তার বদলে কিছু চাহিব সেই মূর্খতা আমাদের নাই।

শ্রী সুখরঞ্জন রায়

দূত-বাক্য।

(মহাকবি ভাস প্রণীত)

স্থাপনা

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের প্রবেশ

সূত্রধার। যাঁর শরীর ও নখ তাম্রবর্ণ (তাঁর যে) পায়ের দ্বারা নমুচি-দৈত্য আকাশে হত হয়েছিল, সেই (জগৎ-প্রসিদ্ধ) এবং সর্ব্বলোক-নন্দন পাদযুগল আপনা-

* ঢাকা সাহিত্যপরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দিগকে পালন করুক। *

আচ্ছা সভাস্থ সভ্যগণকে এই কথাই বলি। এ কি! আমি ত বলতে উৎসুক, কিন্তু একটা শব্দ শুনছি না? আচ্ছা দেখছি।

(নেপথ্যে)

ওহে দৌবারিকগণ, মহারাজ দুর্য্যোধন আজ্ঞা কচ্ছেন।—

সূত্রধার। হয়েছে! বুঝেছি—

পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বিবাদ বেধেছে। তাই দুর্য্যোধনের আদেশে ভৃত্য মন্ত্রশালা সজ্জিত কচ্ছে।

[প্রস্থান]

(কঞ্চুকীয়র প্রবেশ)

ওহে দৌবারিকগণ, মহারাজ দুর্য্যোধন আদেশ দিচ্ছেন—আজ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে মন্ত্রণা করব (মনে কচ্ছি)। সকল রাজাকে ডেকে আন। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ দুর্য্যোধন এদিকেই আসছেন—

শ্যামবর্ণ যুবক, সাদা রেশমি চাদর উত্তরীয়ের মত (তাঁর) গলায়, (তিনি) ছত্র ও চামর যুক্ত; কৃতাঙ্গরাগ, শ্রীসম্পন্ন, মণিদ্যুতিতে (তাঁর) শরীর সুরঞ্জিত, পূর্ণিমা তিথিতে নক্ষত্র বেষ্টিত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে।

(পূর্ব্বোক্তরূপে দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এই রণোৎসব হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল একথা ভেবে আমার আনন্দপূর্ণ হৃদয়েও যেন একটা রোষের উদ্ভব হচ্ছে। পাণ্ডবসৈন্যের বড় বড় মত্ত হস্তীগুলির মুসলের মত দাঁতগুলি তুলে ফেলতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

কঞ্চুকীয়। মহারাজের জয় হ'ক। মহারাজের আদেশ মত সকল রাজাকেই ডেকে এনেছি।

দুর্য্যোধন। বেশ করেছ। এখন তুমি অন্তঃপুরে যাও।

কাঞ্চুকীয়। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[নিষ্ক্রান্ত]

দুর্য্যোধন। আর্য্য বৈকর্ণবর্ষদেব, আমার মোট সৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী। কে এর সেনাপতি হওয়ায় উপযুক্ত।

কি বলছেন? এটা গুরুতর বিষয়! পরামর্শ ক'রে বলব!

ঠিক কথা! আসুন, মন্ত্রশালায় আসুন। আচার্য্য, অভিবাদন কচ্ছি। মন্ত্রশালায় প্রবেশ করুন। পিতামহ, অভিবাদন কচ্ছি। আসুন মন্ত্রশালায়। মাতুল, অভিবাদন কচ্ছি মন্ত্রশালায় আসুন। আর্য্য বৈকর্ণবর্ষদেব, আসুন আপনারাও মন্ত্রশালায় আসুন। ক্ষত্রিয়গণ, শীঘ্র আপনারাও সকলে মন্ত্রশালায় আসুন। বয়স্য কর্ণ, আসুন আমরাও যাই।

(প্রবেশ করিয়া)

আচার্য্য, এই কূর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হন। পিতামহ, এই সিংহাসনে আপনি বসুন। মাতুল, আপনি এই চর্ম্মাসনে বসুন। আর্য্য বৈকর্ণবর্ষদেব আপনারাও বসুন। ক্ষত্রিয়গণ, আপনারাও বসুন।

কি! আমি বসছি না কেন জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? হায়! সেবাধর্ম্ম! আচ্ছা, আমিও বসি। বয়স্য কর্ণ, আপনিও বসুন।

(বসিয়া)

আর্য্য বৈকর্ণবর্ষদেব, আমার মোট সৈন্যসংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী; এর মধ্যে কে সেনাপতি হতে পারে?

কি বলছেন? পূজনীয় গান্ধাররাজ বলবেন? বেশ, মাতুল আপনিই বলুন।

কি? মাতুল বলছেন, পূজ্য গঙ্গাকুমার থাকতে আর কে হ'তে পারে?

হাঁ, মাতুল ঠিক কথাই বলেছেন। আচ্ছা বেশ, পিতামহই হউন। আমারও এই ইচ্ছা।

---

* 'তন্বুতাম্রনখেন' এই অংশের অর্থ নিম্নলিখিত রূপও হতে পারে—ক্ষুদ্র তাম্র বর্ণ নখ যার এরূপ পদ দ্বারা।

প্রবল-বায়ু-তাড়িত মহাসাগরের গর্জ্জনের ন্যায় সৈন্যগণের কোলাহল, পটহের শব্দ ও শঙ্খনাদ এবং গাজেয়ের শিরোদেশে পতিত অভিষেক সলিলের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী রাজগণের হৃদয়ও নিপতিত হউক।

(কাঞ্চুকীয়ের প্রবেশ)

কাঞ্চু। মহারাজের জয়। পাণ্ডব শিবির হতে পুরুষোত্তম নারায়ণ দূত হ'য়ে এসেছেন।

দুর্য্যোধন। বাদরায়ণ, কি বলছ তুমি? কংসভৃত্য দামোদর তোমার পুরুষোত্তম হ'ল? সেই রাখালটা তোমার পুরুষোত্তম! বার্হদ্রথ কর্ত্তৃক যার বিষয়, কীর্ত্তি ও ভোগ বিলুপ্ত হয়েছে, সে তোমার পুরুষোত্তম! যে আমার ভৃত্য তার একটা সদাচারের সাধারণ জ্ঞান নেই! আবার এর কথাটা বেশ গর্ব্বপূর্ণ। কি নীচ!

কঞ্চুকীয়। মহারাজ প্রসন্ন হন। মানসিক উদ্বেগে সদাচার ভুলে গে'ছি।

[পদতলে পতন]

দুর্য্যোধন। কি, উদ্বেগ! হাঁ, মানুষের ত উদ্বেগ আছেই। ওঠ! ওঠ!

কাঞ্চুকীয়। অনুগৃহীত হলেম।

দুর্য্যোধন। হাঁ, এখন প্রসন্ন হয়েছি। এই দুত কে?

কাঞ্চুকীয়। এই উপস্থিত দূত কেশব।

দুর্য্যোধন। কেশব? বেশ, নিয়ে এস। হাঁ, এটা হল শিষ্টতা। রাজগণ, কেশব দূত হয়ে এসেছে। এখন তার প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তে হবে? কি বল্‌ছেন আপনারা? কেশবকে অর্ঘ্য দিয়ে পূজা কর্ত্তে হবে? না, এটা আমি কর্‌ব না। এ অবস্থায় তাকে বেঁধে রাখাই ভাল বোধ হচ্ছে।

বাসুভদ্রকে বাঁধতে পারলে পাণ্ডবেরা চক্ষুহীনের মত হবে; পাণ্ডবদের বুদ্ধি ও প্রতিবিধি লোপ পেলে অখিল ক্ষিতি একমাত্র আমার অধিকারে আসবে।

আর দেখুন, কেশবকে দেখে এখানে যিনি দাঁড়াবেন তাঁর দ্বাদশ সুবর্ণ মুদ্রা দণ্ড দিতে হবে। আপনারা সকলে সাবধান হউন। কিন্তু আমি কি করে না দাঁড়িয়ে থাকব? হাঁ উপায় স্থির করেছি। বাদরায়ণ, যে ছবিখানায় দ্রৌপদীর কেশ ও বস্ত্রাকর্ষণ চিত্রিত আছে সেই ছবিখানা নিয়ে এস ত? (জনান্তিকে) সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থাকব, কেশবকে দেখে দাঁড়াব না।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) মহারাজের জয়। এই সেই ছবি।

দুর্য্যো। আমার সাম্‌নে খুলে ধর।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ (প্রসারণ)।

দুর্য্যো। আহা, ছবিখানি দেখতে কিন্তু বেশ এই যে এখানে দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলে ধরেছে। দুঃশাসন কর্ত্তৃক ধৃত উদ্বেগ-চকিত-দৃষ্টি দ্রৌপদীকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রলেখার মত সুন্দর দেখাচ্ছে।

আর, ঐ দুরাত্মা ভীম ক্ষত্রিয়গণের সম্মুখে দ্রৌপদীকে অপমানিতা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে সভা-স্তম্ভ উত্তোলন কচ্ছে।

আবার, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক ও দয়ালু যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় হতবুদ্ধি হয়ে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বৃকোদরের ক্রোধ শান্ত কচ্ছে।

এদিকে রোষাকুললোচন স্ফুরিতাধরোষ্ঠ অর্জ্জুন রিপুমণ্ডলীকে তৃণের মত জ্ঞান করে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনের জন্যই যেন গাণ্ডীবের জ্যা আকর্ষণ কচ্ছে। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে নিবারণ কচ্ছেন।

এদিকে মৃগশাবক যেমন সিংহের পশ্চাদ্ধাবন করে সেইরূপ—বদ্ধপরিকর, ঢাল খড়্গধারী নকুল সহদেব সতেজে ও ক্ষিপ্রচরণে আমার ভ্রাতার অনুসরণ কচ্ছে। তাহাদের মুখরাগ মলিন হয়ে গেছে এবং রোষে তাহারা অধরোষ্ঠ দংশন কচ্ছে।

যুধিষ্ঠির তাদের সাম্‌নে এসে তাদিগকে (এইভাবে) নিবারণ কচ্ছে—

আমি নীচতা স্বীকার কচ্ছি, আমারই মতি নীচ হয়েছে।

যুক্তাযুক্ত বিচার করে তো·রা রোষ পরিত্যাগ কর। দ্যূত ক্রীড়ার অপমান এখন তোমরা সহ্য কচ্ছে পাচ্ছ না, কিন্তু পরে যে তোমাদের পরাক্রম নিন্দিত হবে।

ঐ দেখ ধূর্ত্ত গান্ধাররাজ পাশা ফেলে এবং গর্ব্বের সহিত হেসে যেন স্বীয় নিপুণতা প্রদর্শন করে শত্রুগণের হর্ষ সঙ্কুচিত কচ্ছে। আর স্বচ্ছন্দে স্বীয় আসনে উপবেষন করে অমুশ্রথী দ্রৌপদীর দিকে কটাক্ষপাত করে মাটিতে দাগ দিচ্ছে।

এদিকে আচার্য্য ও পিতামহ দ্রৌপদীকে দেখে লজ্জায় বস্ত্রান্তে মুখ ঢাকছেন। চিত্রটির কি সুন্দর রং! আর কি সুন্দর ভাবই ফুটে উঠছে! চিত্রটিও হয়েছে ঠিক, আর বেশ পরিষ্কার। আমার বড় আনন্দ হচ্ছে! কে এখানে?

কঞ্চুকী। মহারাজের জয় হউক।

দুর্য্যো। বাদরায়ণ, যার বাহন গরুড় মাত্র আমাদের বিস্ময়োৎপাদন করে, সেই দূতকে নিয়ে এস।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান।

দুর্য্যো। বয়স্য কর্ণ, পাণ্ডবদের অনুরোধে কৃষ্ণমতি কৃষ্ণ ভৃত্যের ন্যায় আজ এখানে দূত হ'য়ে এসেছে। সখে কর্ণ, যুধিষ্ঠিরের নারীর ন্যায় মৃদু বচন শোনবার জন্য তোমার কাণ দুটি প্রস্তুত কর।

(বাসুদেব ও কঞ্চুকীয়ের প্রবেশ।)

বাসুদেব। আজ ধর্ম্মরাজের কথায় আর অর্জ্জুনের প্রতি অকৃত্রিম সৌখ্য বশতঃ যুদ্ধদৃপ্ত যে দুর্য্যোধন হিত কথা শোনে না, তারই কাছে আমি দৌত্য গ্রহণ করে উপস্থিত হয়েছি। রিপুবাহিনীরূপ হস্তীর কুম্ভস্থলীদলনদক্ষ ভীমের দ্রৌপদী-পরাভব-জনিত কোপাগ্নি দ্বারা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পার্থ-শরোৎপন্ন প্রচণ্ড অনিল দ্বারা কুরুবংশবন ত বিনষ্ট হয়ে রয়েছে।

এই যে (সম্মুখে) সুযোধনের শিবির, এখানে ক্ষত্রিয়গণের সুরপুরসদৃশ আবাসগুলি স্বচ্ছন্দে রচিত হয়েছে, শস্ত্রশালা বিস্তীর্ণ হয়েছে, এবং বহুবিধ শস্ত্র সজ্জিত হয়েছে। অশ্বশালার উৎকৃষ্ট তুরঙ্গগণ হ্রেষারব কচ্ছে। হস্তীগুলি বৃংহন কচ্ছে। স্বজন-পরিভবহেতু যে ঐশ্বর্য্যের বিলয় আসন্ন হয়েছে সেই ঐশ্বর্য্য যেন স্ফীত হয়ে উঠেছে।

কর্কশভাষী, গুণদ্বেষী, শঠ, স্বজননির্দ্দয় সুযোধন আমার কথায় কাণ দেবে না।

বাদরায়ণ, প্রবেশ করব কি?

কঞ্চুকী। হাঁ, পদ্মনাভ, প্রবেশ করুন।

বাসুদেব। (প্রবেশ করিয়া একি, আমাকে দেখে ক্ষত্রিয়-মণ্ডলী উদ্বিগ্ন হচ্ছে। আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না, স্বচ্ছন্দে উপবেশন করুন।

দুর্য্যো। কি, কেশবকে দেখে সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডলী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল! উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বে যে দণ্ডের কথা আপনাদিগকে বলেছি, এবং যে দণ্ডের আদেশ দিয়েছি সেই দণ্ডের কথা স্মরণ করুন।

বাসুদেব। সুযোধন, তুমি যে স্থির হয়ে বসে রৈলে?

দুর্য্যো। (আসন হইতে পড়িয়া আত্মগত) কেশব যে এসেছে এটা প্রমাণিত হল।

উৎসাহের সহিত মতি স্থির করে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আসনে বসে ছিলাম। কেশবের প্রভাববশে আসন হতে পড়ে গিয়েছি। এই দূত অনেক মায়া জানে। (প্রকাশ্যে) ওহে দূত, এই আসনে উপবেশন কর।

বাসুদেব। আচার্য্য, বসুন। গাঙ্গেয়প্রমুখ রাজগণ, আপনারাও স্বচ্ছন্দে উপবেশন করুন। আমিও বসছি। (বসিয়া) এই ছবিটি ত দেখতে বেশ। ছি! ছি! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ এই চিত্রে চিত্রিত হয়েছে যে!

সুযোধন কি মূর্খ! সে স্বজনের অবমাননা ও আত্ম পরাক্রম দর্শন কচ্ছে! এই পৃথিবীতে এমন নির্ব্বোধ কে আছে যে সভায় আত্মদোষ উদ্ঘাটিত করে।

এই ছবি সরিয়ে ফেল এখান থেকে।

দুর্য্যো। বাদরায়ণ, নিয়ে যাও এই ছবি এখান থেকে।

কাঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ। (চিত্রপট অপনয়ন)

দুর্য্যো। ওহে দূত,

ধর্ম্মপুত্র, বায়ুপুত্র ভীম, ত্রিদশেন্দ্রপতির নন্দন ভ্রাতা অর্জ্জুন, অশ্বিনীকুমারের বিনীত যমলপুত্র, ভৃত্যবর্গের সহিত কুশলে আছে ত ?

বাসুদেব। একথা গান্ধারীপুত্রের অনুরূপই বটে। হাঁ, এরা সকলেই কুশলে আছে। আপনার শারীরিক, মানসিক, ও রাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ আপনাকে এই কথা বলেছেন—

"আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি, আমাদের প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হয়েছে। ধর্ম্মানুসারে যে বিষয় আমাদের প্রাপ্য তা বিভাগ করে দিন।"

দুর্য্যোধন। কি! বিষয়!

আমার পিতৃব্য বনে মৃগয়া কর্ত্তে গিয়ে অপরাধী হয়ে মুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি দার-নিস্পৃহ। যারা পরের ছেলে তাদের পিতা তিনি কিরূপে হলেন ?

বাসুদেব। আপনি পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ। আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি—

আপনার পূর্ব্বপুরুষ বিচিত্রবীর্য্য ক্ষয়রোগগ্রস্ত হলেন পর ব্যাসের ঔরসে ও অম্বিকার গর্ভে এই ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হল। তা হলে আপনার পিতা কিরূপে রাজ্য পেলেন ? মহারাজ, এমন কথা বলবেন না, এরূপ পরস্পর বিরোধের ফলে শীঘ্রই কুরুবংশের নাম শেষ হবে। সুতরাং রোষ পরিত্যাগ ও স্নেহ প্রকাশ করে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ যা বলছে আপনার তাই করা উচিত।

দুর্য্যোধন। ওহে দূত, তোমার রাজ্যবিষয়ক জ্ঞান নেই।

সক্ষম রাজকুমারেরাই শত্রু জয় করে রাজ্য ভোগ করে থাকে। রাজ্য ভিক্ষা করে লাভ হয় না, কিংবা দীনকেও রাজ্য দান করা যায় না। যদি রাজ্য লাভ কর্ত্তে তাদের বাঞ্ছা হয়ে থাকে, তা হলে তাদিগকে সাহস কর্ত্তে বল, নতুবা শান্তিভোগের জন্য মুনিসেবিত তপোবন আশ্রয় কর্ত্তে বল।

বাসুদেব। সুযোধন, আত্মীয়ের প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ বিধেয় নয়।

যে রাজশ্রী পুণ্য সঞ্চয়ের ফল, সেই রাজশ্রী লাভ করে যিনি সুহৃদ্বন্ধুকে বঞ্চনা করেন তিনি বিফলশ্রম হয়ে থাকেন।

দুর্য্যোধন। তোমার পিতার শ্যালক রাজা কংসের প্রতি ত তোমার দয়া হয় নাই। যারা সর্ব্বদা আমাদের অপকার করেছে আমরা তাদিগকে দয়া কর্‌ব কেন ?

বাসুদেব। এটা আমার দোষ আপনার মনে করে কি ফল ?

তিনি আমার জননীকে বহুবার পুত্রশোকার্ত্তা করে ছিলেন, আমার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, তজ্জন্য যমরাজ স্বয়ং তাঁহাকে সংহার করেছেন।

দুর্য্যোধন। তোমার দ্বারাই কংস সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত হয়েছে। নিজগুণ কীর্ত্তন করে ফল কি ? মনে করে দেখ—

মগধেশ্বর জামাতা কংসের মৃত্যুশোকে অভিভূত ও রোষাবিষ্ট হলে পর তুমি ভয়াতুর হয়ে পলায়ন করেছিলে। তখন তোমার শৌর্য্য কোথায় গিয়াছিল ?

বাসুদেব। সুযোধন, যারা ন্যায়ানুগামী তাদের শৌর্য্য দেশ, কাল ও অবস্থা সাপেক্ষ। আমাকে পরিহাস করা এখন ছেড়ে দিন। নিজের কাজ দেখুন—

ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহ করাই কর্ত্তব্য, তাহাদের দোষ ভুলে যান, উভয় লোকেই বন্ধুর সহিত সদ্ভাব রাখা কল্যাণকর।

দুর্য্যোধন। যারা দেবতার পুত্র তাদের সঙ্গে মানুষের বন্ধুতা কিরূপে সম্ভব ? তোমার এ সকল পুনরাবৃত্তি রেখে দাও। এসম্বন্ধে আর কোন কথা বলো না

বাসুদেব। (স্বগত) সামদ্বারা ইহাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা বিফল। স্বীয় স্বভাব কেহ পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে না। যাক্‌, এখন কর্কশ কথাদ্বারা ইহাকে উত্তেজিত করব। (প্রকাশ্যে) সুযোধন,

আপনি কি অর্জ্জুনের বলবিক্রম জানেন না?

দুর্য্যোধন। না, জানি না।

বাসুদেব। তা'হলে, শুনুন:

(অর্জ্জুন) কিরাতরূপধারী পশুপতিকে যুদ্ধে সন্তুষ্ট করেছে; যখন অগ্নিদেব খাণ্ডববন দগ্ধ কচ্ছিলেন তখন প্রবল বৃষ্টিধারা শরদ্বারা আচ্ছাদিত করেছে; ইন্দ্রের উৎপীড়নকারী নিবাতকবচ দিগকে স্বচ্ছন্দে বিনাশ করেছে; আর একা অর্জ্জুন বিরাট নগরে ভীষ্ম প্রভৃতিকে জয় করেছে।

আপনি যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এরূপ একটা কথাই আপনাকে বলছি—

ঘোষযাত্রা কালে চিত্রসেন যখন আকাশপথে আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল এবং আপনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কচ্ছিলেন তখন ফাল্গুণিই আপনাকে উদ্ধার করেছিল।

আর বেশী কথা বলে ফল নাই—ধৃতরাষ্ট্রতনয়, আমার কথা শুনুন, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য দান করুন। যদি তা না করেন তা হলে পাণ্ডবেরা সাগরাম্বা পৃথিবী জয় করে নেবে।

দুর্য্যোধন। কি! কি! পাণ্ডবেরা জয় করে নেবে?

হে পরুষবচনদক্ষ, ভীমরূপ ধারণ করে স্বয়ং মারুত যদি যুদ্ধ করেন, শক্র সাক্ষাৎ পার্থরূপ ধারণ করে যদি শরনিক্ষেপ করেন, তথাপি তোমার কথা শুনে পিত্রাধিকৃত, বলরক্ষিত আমার রাজ্যের একটি তৃণও তাহাদিগকে দেব না।

বাসুদেব। হে, কুরুকুলকলঙ্ক, অযশোলুব্ধ, আমি তৃণের কথা বলছি না, তৃণ ছাড়া অন্য জিনিষের কথাই বলছি।

দুর্য্যোধন। ওহে গোপালক, তৃণ ছাড়া অন্য জিনিষের কথাই তোমাকে বলতে হবে।

সুনির্লজ্জ, তুমি অবধ্যা নারী বধ করেছ। অশ্ব ও গোবৃষ বধ করেছ, মল্ল বিনাশ করেছ, তুমি আবার সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে চাও?

বাসুদেব দুর্য্যোধন, আমাকে নিন্দা কচ্ছেন?

দুর্য্যোধন। তোমার সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়!

আমার মাথায় পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ধারণ করা হয়, আমার মাথা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হয়েছে। যে সকল রাজন্য আমার অধীন ও অনুগমনকারী আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি, তোমাদের মত লোকের সঙ্গে কথা বলি না।

বাসুদেব। সুযোধন, আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। শঠ, বান্ধবস্নেহহীন, কাক, কেকর, পিঙ্গল, তোমার জন্যই এই কুরুবংশ অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। রাজগণ, আমি যাচ্ছি।

দুর্য্যোধন। কি, কেশব চলে যাবে? দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুর্বুদ্ধি, দুষ্টেশ্বর, এই কেশব দূতের কর্ত্তব্য অতিক্রম করেছে, একে বাঁধ। কি পাল্লে না? দুঃশাসন, তুমিও পাল্লে না!

এই কৃষ্ণ হস্তী ও অশ্ব বধ করেছে, রাজা কংসকে বধ করেছে। গোপালদের সঙ্গে থেকে শৌর্য্য কার্য্যে অনভিজ্ঞ রয়েছে। তার এখন ভুজবল নেই। রাজগণের সমক্ষে নিজের কথায়ই দোষী হয়েছে। একে শীঘ্র বাঁধ।

না, এ পাল্লে না! মাতুল, এই কেশবকে বাঁধুন। একি! মাতুলও বাঁধতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন! আচ্ছা, তা হলে আমিই তাকে পাশদ্বারা বাঁধব। (অগ্রসর)

বাসুদেব। সুযোধন আমাকে বাঁধতে চচ্ছে! আচ্ছা, সুযোধনের সামর্থ্য কত দেখি।

[বিশ্বরূপ ধারণ]

দুর্য্যোধন। ওহে দূত, অশ্ব ও গোবৃষ বধ করে তোমার দর্প হয়েছে! (আজ) যদি তুমি চারিদিকে দেবমায়া বা নিজমায়া সৃজন কর, কিংবা যদি দুর্নিবার দেবাস্ত্রও নিক্ষেপ কর তা হলেও আজ ক্ষত্রিয়দের সম্মুখে আমি তোমায় বাঁধব।

আঃ, একটু থাম। কৈ কেশবকে ত দেখছি না! ঐ যে কেশব। কেশবকে কত ছোট দেখাচ্ছে! আচ্ছা, একটু থাম; কৈ, দেখছি না ত! ঐ যে কেশব। (এবার) কেশবকে কত দীর্ঘ দেখাচ্ছে! কেশবকে ত দেখছি না। ঐ যে কেশব! একি, মন্ত্রশালার সর্ব্বত্রই যে কেশব! কি করব

এখন? আচ্ছা। ক্ষত্রিয়গণ, আপনারা প্রত্যেকে এক এক জন কৃষ্ণকে বাঁধুন। একি! নিজেরাই যে পাশ বদ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছে! মায়াবী, বেশ! বেশ!

আমার ধনুর উদর থেকে যে সকল বাণজাল নিঃসৃত হবে সে সকল বাণের ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে তোমার সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হবে, এবং শিবিকায় আরোহণ করে তোমাকে পাণ্ডব শিবিরে যেতে হবে। তখন পাণ্ডবেরা তোমাকে এ অবস্থায় বাষ্পরুদ্ধ নয়নে এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কত্তে কত্তে দেখবে।

[প্রস্থান]

বাসুদেব। আচ্ছা, পাণ্ডবদের কাজ আমিই সাধিত করব। সুদর্শন, এখানে আবির্ভূত হও।

(সুদর্শনের প্রবেশ)

সুদর্শন। ভগবানের আদেশ শুনে অত্যন্ত আনন্দের সহিত মেঘপরিবৃত হয়ে ধাবিত হয়েছি। কমলায়তাক্ষ, আজ কাহার প্রতি কুপিত হয়েছেন? আজ কার মাথায় আমাকে পড়তে হবে? ভগবান্ নারায়ণ কোথায়?

যাঁহার আদি কারণ অজ্ঞাত, যাঁহার স্বরূপ অচিন্ত্য, যিনি লোকরক্ষক, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি বিশ্বরূপধারী, যিনি শত্রুবলহন্তা (সেই ভগবান্ নারায়ণ কোথায়?)

(দেখিয়া) এই যে ভগবান্ হস্তিনাপুরদ্বারে দূতরূপে উপস্থিত! জল কোথায়? জল কোথায়? ভগবতি আকাশগঙ্গে, জল দাও। এই যে প্রবাহিত হচ্ছে। (আচমন করিয়া অগ্রসর হইয়া) ভগবান্ নারায়ণের জয়। (প্রণাম)

বাসুদেব। সুদর্শন, তুমি অপ্রতিহত-পরাক্রম হও।

সুদর্শন। অনুগৃহীত হলুম।

বাসুদেব। সুদর্শন, ভাগ্যবশে তুমি কাজের সময় উপস্থিত হয়েছ।

সুদর্শন। কাজের সময়! আজ্ঞা করুন, ভগবন্, আজ্ঞা করুন।

আমি কি মেরুমন্দর সমূহ বিপর্য্যস্ত করব? অথবা সমুদ্র সংক্ষোভিত করব? অথবা সমস্ত নক্ষত্র পৃথিবীতে পাতিত করব? দেব, তোমার প্রসাদে আমি কোনটাতেই অশক্ত নহি!

বাসুদেব। সুদর্শন, এদিকে এস। হে সুযোধন, হে চপল,

লবণজলধি, গিরিকন্দর, গ্রহচরিত বায়ুমার্গ—তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমার ভুজবলযোগে প্রাপ্তবেগ এই চক্র আজ তোমার কালচক্র হবে।

সুদর্শন। হে সুযোধনহন্তা! (ভাবিয়া) ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন।

ভূভার দূর করার জন্য পৃথিবীতে যাঁর জন্ম, তাঁর এরূপ অবস্থা হলে শ্রম বিফল হবে।

বাসুদেব। সুদর্শন, ক্রোধ হেতু কর্ত্তব্য ভুলে গেছি। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।

সুদর্শন। যে আজ্ঞা, ভগবান্ নারায়ণ। একি! এ যে সঙ্গিগণও এখানে! যিনি চরণত্রয়দ্বারা ত্রিলোক অতিক্রম করেছেন, ইনিই সেই (জগৎ) পূজ্য নারায়ণ। তোমরা ইঁহার শরণ লও। আমি এখন যাই। এই যে ভগবানের প্রধান অস্ত্র শার্ঙ্গ!

ইহার অঙ্গ কৃশ, মৃদু ও ললিত, শ্রীস্বভাব যুক্ত। ইহার মধ্যস্থলে হরি কর স্থাপন করিয়া থাকেন। শার্ঙ্গ শত্রু সঙ্ঘের যমস্বরূপ। কনকখচিতপৃষ্ঠ শার্ঙ্গ নবমেঘের পার্শ্বে চারু বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

ওহে শার্ঙ্গ, ভগবান্ নারায়ণের রোষ প্রশমিত হয়েছে, এখন প্রস্থান কর। এই যে ফিরে গেল। আমিও যাই। আবার এই যে কৌমোদকী এসে উপস্থিত হয়েছে।

কৌমোদকী মণিমাণিক্যখচিত বিচিত্রমাল্যশোভিত। সুররিপুগণের দেহনাশে কৌমোদকী জাততৃষ্ণা, অতি কঠোর, এবং দুর্নিবারবীর্য্য। মেঘবৃন্দানুসৃত হয়ে আকাশে গমন কচ্ছে।

হে কৌমোদকি, ভগবান নারায়ণের রোষ প্রশমিত হয়েছে, বেশ কৌমোদকি ফিরে গেল। আমিও যাই। আবার এই যে পাঞ্চজন্য সমাগত হয়েছে।

পাঞ্চজন্য পূর্ণচন্দ্র, কুন্দ, কুমুদ ও মুক্তার ন্যায় শুভ্রকান্তি। নারায়ণ তাঁহার আননসরোজ দ্বারা পাঞ্চজন্যকে অনুগৃহীত করেন। প্রলয়কালীন সাগরগর্জ্জনের ন্যায় ইহার শব্দ শুনে অসুরপত্নীগণের গর্ভপাত হয়ে থাকে।

হে পাঞ্চজন্য, ভগবানের রোষ প্রশমিত হয়েছে। ফিরে যাও। বেশ, ফিরে গেল। একি! আবার অসি নন্দকও যে এসে উপস্থিত হ'ল।

নন্দক যুদ্ধে নারীরূপধারী ও মহাসুরগণের ভীতি-জনক। নন্দক অতিক্রতবেগে আকাশে মহোল্কার ন্যায় চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

হে নন্দক, ভগবানের রোষ প্রশমিত হ'য়েছে। এখন তুমি যাও। যাক, ফিরে গেল। আমিও যাচ্ছি। এই যে ভগবানের সমস্ত অস্ত্রই এসে উপস্থিত হ'ল!

এই নন্দকখড়্গ স্বীয়তেজে সূর্য্যকেও পরাজিত করে। এই কৌমোদকী দৈত্যগণের কঠিন-উরঃস্থল চূর্ণ কর্ত্তে সক্ষম। এই শার্ঙ্গের জ্যারব প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায়; আর, শঙ্খের রাজা পাঞ্চজন্য শশিকরশুভ্র এবং ইহার রবও গম্ভীর।

হে শার্ঙ্গ, হে কৌমোদকি, হে পাঞ্চজন্য, হে শত্রুর বহ্নিস্বরূপ দৈত্যধ্বংসকারী নন্দক, ভগবান্ মুরারির রোষ প্রশমিত হয়েছে, তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর।

বেশ, ফিরে গেল। আমিও যাই। একি! বায়ু এত প্রবল বেগে বইছে কেন? সূর্য্যও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়েছে। পর্ব্বতগুলি বিচলিত হচ্ছে, সাগর ক্ষুব্ধ হচ্ছে, বৃক্ষ গুলি পতিত হচ্ছে। মেঘগুলি আবর্ত্তযুক্ত হয়েছে, বাসুকিপ্রভৃতি-সর্পগণ লুক্কায়িত হচ্ছে! একি ব্যাপার! ও! ভগবান্ নারায়ণের বাহন গরুড় এসেছে।

ভ্রাতার মোচনার্থ সুরাসুরগণের পরিখেদলব্ধ অমৃত মুরারির শত্রু হতে যৎকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত হয়েছিল এবং যে আপনাকে পৃষ্ঠে বহন করব বলে বর দিয়েছিল (সেই গরুড় এসেছে।)

হে কাশ্যপপ্রিয়পুত্র গরুড়, ভগবান্ দেবদেবেশের রোষ প্রশমিত হয়েছে। স্বস্থানে প্রস্থান কর। বেশ, ফিরে গেল। আমিও যাই।

অচ্যুত রুষ্ট হওয়ায় (সভাধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়েরা উদ্বিগ্ন হয়েছিল বলে) মুকুটের সহিত তাহাদের মাথা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল; এখন তাঁহার রোষ প্রশমিত হয়েছে শুনে শান্তভাবে স্বস্থানে গমন কচ্ছে।

যাই, আমিও রমণীয় মেরুগুহা আশ্রয় করি গিয়ে।

বাসুদেব। যাই, আমিও পাণ্ডব শিবিরে গমন করি।

(নেপথ্যে)

যাবেন না, যাবেন না।

বাসুদেব। একি! বৃদ্ধরাজের কণ্ঠস্বর বলে মনে হচ্ছে। মহারাজ, এই আমি এখানে আছি।

(ধৃতরাষ্ট্রের প্রবেশ)

ভগবান্ নারায়ণ, ভগবান্ পাণ্ডবহিতাকাঙ্ক্ষী, ভগবান্-বিপ্রপ্রিয়, ভগবান্ দেবকী নন্দন কোথায়?

হে শার্ঙ্গপাণে, হে ত্রিদশাধ্যক্ষ, আমার পুত্রের অপরাধের জন্য আমার এই শির তোমার পদ যুগলের উপর পতিত হল।

[পতন।

বাসুদেব। ছি! ছি! আপনি আমার পায়ে পড়্লেন! উঠুন, উঠুন।

ধৃতরাষ্ট্র। অনুগৃহীত হলেম। ভগবন্, এই পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

বাসুদেব। সমস্ত গ্রহণ কল্লুম। আর কি কল্লে আপনি সন্তুষ্ট হন?

ধৃতরাষ্ট্র। ভগবান্ যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হ'লে আর কি চাইব?

বাসুদেব। আচ্ছা, এখন তবে আসুন। আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

ধৃতরাষ্ট্র। যে আজ্ঞা, ভগবান্ নারায়ণ।

[প্রস্থান।

ভরত বাক্য

যে মহী সাগরপর্য্যন্ত বিস্তৃত, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বত যার কুণ্ডলস্বরূপ একচ্ছত্রা সেই মহীকে আমাদের রাজসিংহ শাসন করুন।

শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

রঞ্জেন আলো *

কোনও কাচের নলের দুই প্রান্তে দুইটি ধাতু-ফলক স্থাপন করিয়া যদি ঐ দুই প্রান্ত সম্পূর্ণরূপে আঁটিয়া দেওয়া যায়, এবং নলের পার্শ্বস্থ কোনও ছিদ্র দ্বারা যদি নলটীকে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া নলমধ্যস্থ বায়ু নিষ্কাশন করা যায়, তাহা হইলে ঐ নলকে Vacuum Tube বা বায়ু-শূন্য নল বলা হয়। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র দিয়া আমরা নলের অভ্যন্তর ভাগ হইতে ইচ্ছামত বায়ু সরাইয়া চাপ হ্রাস করিতে পারি। এখন ধাতু-ফলক দুইটিকে তার দিয়া তড়িৎ-প্রবর্ত্তক কুণ্ডলীর (Induction Coil) দুই মেরুর সহিত যোগ করিলে, নলের মধ্যে নানা বিচিত্র বর্ণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে থাকে। রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মধ্যে এই কয়টি অংশ দেখিতে পাওয়া যায় ;— প্রথমতঃ Anode এর চারিপার্শ্ব হইতে এক প্রকার গাঢ় লাল বর্ণের জ্যোতিঃ নির্গত হয়; তাহার পরে খানিকটা স্থানে বিক্ষিপ্ত আলো স্তরে ২ সজ্জিত থাকে ; Cathode হইতে সাধারণতঃ বেগুনে রঙের জ্যোতিঃ বাহির হয়। জ্যোতির পরে খানিকটা আঁধার (Crookes' dark space)।

বায়ুর চাপ আস্তে আস্তে কমাইলে বিদ্যুৎপ্রবাহে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তখন উজ্জ্বল মেরু-জ্যোতি গুলি আস্তে আস্তে কমিতে থাকে, এবং ক্রুক্‌সের অন্ধকার-ভাগ ক্রমশঃ নলের মধ্যে বিস্তৃত হইতে থাকে। বায়ুর চাপ যখন সাধারণ চাপের ১/১০০০ ভাগ হয়, তখন মেরু-জ্যোতিঃ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় এবং ক্রুক্‌সের অন্ধকারাংশ সমস্ত নলে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নলের পার্শ্বদেশ হইতে এক প্রকার তীব্র সবুজ রংঙের প্রস্ফুরক (Phosphorescent) আলো নির্গত হইতে থাকে।

ইংলণ্ডে ক্রুক্‌স, ভার্লে এবং জার্ম্মেণীতে প্লুকার হিটর্ফ, গোল্ডষ্টাইন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রস্ফুরক আলোর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা করেন।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, নলের মধ্যে একটা ক্রস্ বা অন্য কোনও পদার্থ স্থাপন করিলে, নলের পার্শ্বদেশে ছায়া পড়ে, অর্থাৎ সেই স্থান হইতে আর প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয় না। যদি নলের মধ্যে দুইখানি পরদা রাখা যায় তাহা হইলে ঐ বিন্দু দুইটির যোজক রেখা যে স্থানে নলের পার্শ্বে আঘাত করে, শুধু সেই স্থান হইতেই প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয়। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, যোগমেরু (anode) যেখানেই থাকুক না কেন, বিয়োগমেরু (Cathode) হইতে বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত কণা সকল মেরুর পৃষ্ঠের লম্বভাবে নির্গত হইয়া সরল-রৈখিক পথে ধাবিত হয়। তাহারা যে স্থানে নলকে আঘাত করে সেই স্থান হইতেই প্রস্ফুরক আলো নির্গত হয়। যদি বিয়োগ মেরু কুব্জ-পৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কণা সন্ধি-বিন্দুতে (Focus) সংহত হয়। ঐ সন্ধি-বিন্দুতে ধাতু ফলক রাখিলে অনেক সময় তাহা গলিয়া যায় ; অন্যত্র ধাতু-ফলক হইতে পূর্ব্বোক্ত তীব্র প্রস্ফুরক রশ্মি নির্গত হইতে থাকে।

যদি এক সরল-রৈখিক পথে ধাবিত Kathode কণা গুলিকে কোনও চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যদিয়া নেওয়া যায়, তাহা হইলে রশ্মির পথ সম্মুখের দিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। যদি কোনও তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্য দিয়া রশ্মিকে চালনা করা হয়, তাহা হইলে যে দিকে যোগমেরু, রশ্মি সেই দিকে ঘুরিয়া যায়।

এই উপায়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক পেরিন্ প্রমাণ করেন যে, রশ্মিগুলি সরল-রৈখিক পথে ধাবমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি এবং এই কণাগুলি বিয়োগ-তড়িৎ-যুক্ত।

ইংলণ্ডে ক্যাভেণ্ডিস্ ল্যাবরেটারীর অধ্যাপক স্যার জে,জে, টম্‌সন্ ও জার্ম্মেনী Carlruhe বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেনার্ড প্রমাণ করেন যে, এই কণাগুলির ওজন হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের প্রায় ১/১৮০০ অংশ, এবং তাহারা সকলেই প্রায় এক পরিমাণ তড়িৎ-বহন করে। অন্যান্য প্রমাণপ্রয়োগে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কণাগুলি যে তড়িৎ বহন করে, সাধারণতঃ তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ তড়িৎ থাকিতে

* যশোহর সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

পারে না। সুতরাং উহাকে তড়িতের পরমাণু আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তড়িতের পরমাণুর বেগ আলোর বেগের ১/১০ হইতে প্রায় ·৯৮ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই তড়িতের কণাকে তাড়িত-রেণু বলে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেণীর ভুর্জবার্গ (Wurzburg) বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক-দর্শনের অধ্যাপক রঞ্জেন এইরূপ নল লইয়া অদৃশ্য আলো সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন। অদৃশ্য আলো কাহাকে বলে একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে।

কোনও ত্রিশির কাচের (Prism) ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করাইলে অপর পার্শ্বের পরদায় রামধনুর সমস্ত বর্ণের সমাবেশ লক্ষিত হয়। সাদা রশ্মি সাত রঙের সমষ্টিতে গঠিত এবং উহা যখন বায়ু হইতে একবার কাচে প্রবেশ করে এবং পরে কাচ হইতে পুনরায় বায়ুতে নির্গত হয়, তখন এই বিভিন্ন রশ্মিগুলি বিভিন্ন পরিমাণে তির্য্যকৃবর্ত্তিত হইয়া পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লাল আলো সব চেয়ে কম তির্য্যকৃবর্ত্তিত হয়, বেগুনে আলো সবচেয়ে বেশী তির্য্যকৃবর্ত্তিত হয়। এইরূপে একটী সরু আলোকরশ্মি বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহাকে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) বলে।

কিন্তু সাদা আলোতে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকারের আলো আছে—আমরা খালি চোখে তাহাদিগকে ধরিতে পারি না, কিন্তু বিশেষ যন্ত্রযোগে তাহারা শীঘ্রই ধরা পড়ে। লালের উপর অংশে তাপমান যন্ত্র রাখিলে তাপমান শীঘ্র বাড়িয়া যায়। বেগুনের নীচের অংশে কোনও প্রস্ফুরক পদার্থ রাখিলে তাহা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বর্ণচ্ছত্র শুধু একদিকে লাল, অপরদিকে বেগুনে রং-এই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের চক্ষু তত সূক্ষ্ম যন্ত্র নয় বলিয়া আমরা লালের উপর দিকের এবং বেগুনের নীচের দিকের অন্যান্য আলো ধরিতে পারি না। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মতে আলোক আকাশের স্পন্দন-জনিত তরঙ্গশ্রেণী। বৈজ্ঞানিকগণ বিশিষ্ট উপায়ে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, লাল আলোর দৈর্ঘ্য· ·৭৩ × ১০৫ c. m. আর বেগুনে আলোর দৈর্ঘ্য ·৪৩ × ১০৫।

জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হার্ত্জ্ প্রমাণ করেন, যে, যদি কোনও তাড়িতোৎপাদক যন্ত্র স্বতঃপ্রবর্ত্তক কুণ্ডলী (self-Induction coil) এবং তাড়িতাধারের (Capacity) সহিত একশ্রেণীতে (Series) যুক্ত থাকে, তাহা হইলে যন্ত্র চালাইলে আকাশে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। স্বতঃপ্রবর্ত্তক কুণ্ডলী এবং আধারের পরিমাণ অনুসারে এই তরঙ্গের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হার্ত্জের পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আলোর তরঙ্গ ও এই তড়িৎ-জাত তরঙ্গ, উভয়ে একই আকাশের স্পন্দন-জাত, শুধু উভয়ের মধ্যে পরিমাণের তফাৎ মাত্র। হার্ত্জের পরে অনেক বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ যন্ত্রদ্বারা অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ, এবং নানাবিধ উপায়ে অতি দীর্ঘ আলোক বা তাপের তরঙ্গ উৎপাদন করিয়া উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যে তাড়িতজাত তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য 8 centimetre। জার্ম্মেনীতে রুবেন্‌স সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ লোহিতাতীত তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন; উহার দৈর্ঘ্য ৩·১৩ m. m. আচার্য্য বসুর পরে জার্ম্মেনীর অধ্যাপক ফন্ বেয়ার আরও ক্ষুদ্র তাড়িত-তরঙ্গ উৎপাদন করিয়াছেন, উহার দৈর্ঘ্য দুই মিলিমিটার মাত্র। সুতরাং এখনও আকাশ তরঙ্গের পূর্ণ শৃঙ্খলে আড়াই সপ্তক ব্যবধান আছে।

যাহা হউক, রঞ্জেন হিটর্ফের নল হইতে অদৃশ্য আলো উৎপন্ন হয় কিনা তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছিলেন।

অদৃশ্য আলো ধরিবার জন্য তিনি নল হইতে খানিক দূরে একটা Bariam-platino-cyanide পরদা রাখিয়াছিলেন। এই পরদাতে অদৃশ্য আলো পড়িলে উহা হইতে প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে।

নলে যাহাতে বাহিরের আলো প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি কালো কাগজ দিয়া নলটাকে সম্পূর্ণ মুড়িয়া তাড়িত যন্ত্র চালাইয়া দেন। কিন্তু তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে দূরস্থ পরদা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো নির্গত

হইতেছে।

রঞ্জেন এই দৃশ্য দেখিয়াই উহার সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করিলেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে, তড়িত্তরেণু যে স্থানে কাচের নলকে আঘাত করে সেই স্থান হইতে এক প্রকার নূতন অদৃশ্য আলো নির্গত হয়। এই আলো পরদার উপর পড়িলে পরদা হইতে তীব্র প্রস্ফুরক আলো বাহির হইতে থাকে।

পরীক্ষাতে এই নূতন আলো'র নানা আশ্চর্য্যজনক গুণ ও ধর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িল। কাঠ, প্রাণি দেহের মাংস, কাগজ ইত্যাদি যে সমস্ত পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো যাতায়াত করিতে পারে না, এই নূতন আলোক অনায়াসে তাহাদের ভিতর দিয়া যাইতে পারে। যেমন কোনও কাচের বাক্সকে সাধারণ আলোকদ্বারা আলোকিত করিলে অপর পার্শ্বস্থ পরদায় শুধু বাক্সের মধ্যস্থ মুদ্রাদির ছায়া পড়ে, বাক্সের ছায়া পড়ে না, সেইরূপ কাঠের বাক্সকে এই নূতন আলোদ্বারা আলোকিত করিলে পরদায় শুধু মধ্যস্থ টাকা পয়সার ছায়া পড়ে। মানবদেহের কোন অংশে রঞ্জেন আলো প্রয়োগ করিলে পরদায় শুধু কঙ্কালের ছায়া পড়ে। রঞ্জেন আলোর এই অদ্ভুত ধর্ম্ম থাকায় উহা এখন অস্ত্র চিকিৎসায় খুব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রঞ্জেন প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে এই নূতন আলো সাধারণ আলোর মত ধর্ম্মবিশিষ্ট—কিন্তু শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। যদি কোন সাধারণ আলোর রশ্মি কোন ধাতুর সমতল পৃষ্ঠের উপর তির্য্যক্-ভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে উহা ধাতুপৃষ্ঠ হইতে লম্বের সহিত সমান কোণ করিয়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ধাতুপৃষ্ঠ সমতল না হইয়া যদি বন্ধুর হয়, তাহা হইলে আলোর রশ্মি এক বিশিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে ইংরাজীতে Diffuse Reflexion বলে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা যায় যে রঞ্জেন আলো সাধারণ সমতল ধাতুপৃষ্ঠ হইতে নিয়মিত ভাবে প্রতিফলিত হয় না, যে বিন্দুতে ধাতুপৃষ্ঠকে আঘাত করে, সেই বিন্দু হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ আলো যখন এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করে তখন রশ্মি তির্য্যক্-বর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু রঞ্জেন আলোর রশ্মি কোন বিশিষ্ট দিকে তির্য্যক্-বর্ত্তিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণ আলোককে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইলে অপর পার্শ্বের পর্দ্দায় ঠিক জ্যামিতিক ছায়া পড়ে না, ছায়ার আসে পাশে খানিক দূর পর্য্যন্ত আলো থাকে; ইহাকে ইংরাজিতে Diffraction বা সমাবর্ত্তন বলে। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র ব্যবহার করিয়াও রঞ্জেন আলোর সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না।

সুতরাং দেখা গেল যে রঞ্জেন আলোর ধর্ম্ম সাধারণ আলোর ধর্ম্ম হইতে অনেক বিভিন্ন,—সাধারণ আলোর মত রঞ্জেন আলোর প্রতিফলন, তির্য্যক্ বর্ত্তন বা সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা, বা প্রমাণ করা যায় না। এইজন্য এক দল বৈজ্ঞানিকের মত ছিল যে, রঞ্জেন আলো বাস্তবিক আকাশের স্পন্দন জাত তরঙ্গ নয়, অতি ক্ষুদ্র ধাবমান তাড়িত-নিরপেক্ষ (electrically neutral) কণাসমূহের সমষ্টি মাত্র।

কিন্তু এই অনুমানের অনুকূলেও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

জার্ম্মেণীর প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্লাঙ্ক (Planck), ভীন (Wien), এবং (Stark) ষ্টার্ক ১৯০৭।৮ খৃষ্টাব্দে অন্যবিধ প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন করেন যে, যদি রঞ্জেন আলো বাস্তবিকই সাধারণ আলো বা আকাশ-তরঙ্গের প্রকার ভেদ মাত্র হয়, তাহা হইলে উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য $১০^{-৮}$ C. M অর্থাৎ সাধারণ দৃশ্যমান আলোর সহস্রভাগের একভাগ মাত্র হইবে। এই উপপত্তিদ্বারা রঞ্জেন আলোর প্রতিফলন, সমাবর্ত্তন, বা তির্য্যক্ বর্ত্তন না থাকার কারণ বেশ বুঝা যায় আকে যে সমতল হইতে প্রতিফলিত হইবে, সেই সমতলস্থ কণাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব আলোকের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অত্যন্ত হ্রস্ব হওয়া দরকার। যদি পারস্পরিক দূরত্ব অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে আলো ঠিক মত প্রতিফলিত না হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; ইহাকে ইংরাজীতে Diffuse Reflexion বলে। এই জন্যই মসৃণ কাচ-পৃষ্ঠ হইতে আলোক রীতিমত

প্রতিফলিত হইতে পারে। কিন্তু অমসৃণ কাচপৃষ্ঠে কণাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব অত্যন্ত অধিক বলিয়া আলো ভালরূপ প্রতিফলিত হয় না, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ঠিক একই কারণে রঞ্জেন আলোর সমাবর্ত্তন পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। আলোকের সমাবর্ত্তন (Diffraction) ব্যাপারটা একটু ভাল করিয়া বোঝা দরকার। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আলোক আকাশের স্পন্দন-জাত তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। কোনও স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তরঙ্গ ফিরিয়া না যাইয়া খানিকটা ঘুরিয়া বাধাকে অতিক্রম করিয়া যায়। জলের তরঙ্গে অনেকেই এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। শব্দ-তরঙ্গেও এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—শব্দ বায়ুর তরঙ্গমাত্র এই বিষয় অনেকেরই জানা থাকিতে পারে। মনে করুন, কোনও প্রাচীরের দুইপার্শ্বে দুই জন লোক আছে; এক পার্শ্বস্থ লোকটি কোনও কথা বলিলে অপর পার্শ্বের লোকে তাহা শুনতে পায়, বায়ুতরঙ্গ প্রাচীর ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে যাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণ-পটহে আঘাত করে। তবে প্রাচীরটা যদি খুব উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে শব্দ-তরঙ্গ আর ততটা ঘুরিতে পারে না, এবং অপরপার্শ্বের লোকে কিছুই শুনিতে পারে না।—আলোক-তরঙ্গ সম্বন্ধেও একই কথা, তবে আলোক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সমষ্টি বলিয়া অতি ক্ষুদ্র বাধাতেই সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়, বাধা ঘুরিয়া যাইতে পারে না। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, আলো সরল-রৈখিক পথে ধাবিত হইতেছে। তবে বাধা যদি খুব তীক্ষ্ণ ও সোজা হয় (যেমন ছুরির ফলা), তাহা হইলে দেখা যায় যে, অপর পার্শ্বের পরদায় ঠিক বাধাটীর ছায়া না পড়িয়া, ছায়ার মধ্যেও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত খানিক আলো, খানিক আঁধার থাকে, এবং আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ আঁধার হইয়া যায়। ইহাকেই আলোকের সমাবর্ত্তন বলে।

গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, যদি আলোকের সমমাত্রাবিশিষ্ট (Of the same dimension) কতকগুলি স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রেখা পরস্পর সজ্জিত করা হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া গমন করিবার সময় বিভিন্ন প্রকারের আলো বিভিন্ন পরিমাণে সমাবর্ত্তিত হয়। কোনও কাঠের ফ্রেমে অতিসূক্ষ্ম কতকগুলি তার পরস্পর সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত করিলে, এই যন্ত্রের গঠন উপলব্ধি করা যায়। এইরূপ যন্ত্রের অপরপার্শ্বে মুকুর (Converging lens) রাখিলে বিভিন্ন প্রকারের আলো বিভিন্ন বিন্দুতে সংহত হয়।

সুতরাং এই উপায়ে আলোককে বিশ্লিষ্ট করা যায়। জার্ম্মেনীতে Fraunhofer প্রথমে এই উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু আমেরিকা দেশীয় রোলাণ্ড প্রথমে ইহাকে কার্য্যকরী করেন। তিনি কাচের উপরে হীরকের সূক্ষ্মধার দিয়া প্রতি ইঞ্চে পর পর প্রায় চৌদ্দ হাজার সমান্তরাল রেখা অঙ্কিত করেন। ইহাকে ইংরেজীতে Diffraction Grating বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সমাবর্ত্তন দ্বারা আলোক বিশ্লেষণ করিতে হইলে আলোকের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ অংশ পরপর সজ্জিত করা দরকার।

রঞ্জেন আলোর দৈর্ঘ্য যদি সাধারণ আলোর দৈর্ঘ্যের সংস্রভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে রঞ্জেন আলোর সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতে আরও সূক্ষ্ম রন্ধ্রপথ বা সূক্ষ্ম Diffraction Grating প্রস্তুত করা দরকার। কাচের উপর এক ইঞ্চে কোটি লাইন অঙ্কিত না করিতে পারিলে রঞ্জেন আলোর সমাবর্ত্তন লক্ষিত হইবে না। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈয়ার করা মানুষের সাধ্যাতীত। তবে যদি স্বভাবতঃই এমন জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপারটা মানুষের সাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মেনীর মিউনিক্ (Munich) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লাউএ (Laue) গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, স্ফটিক এরূপ Diffraction Gratingএর কাজ করিতে পারে। নানা প্রমাণ প্রয়োগে পদার্থতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে বস্তুর পরমাণুর ব্যাস $১০^{-৭}$ c. m. হইতে $১০^{-৮}$ c. m. পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বস্তুর পরমাণুর ব্যাস ও রঞ্জেন আলোর দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাত্রার।

কঠিন পদার্থের পরমাণুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ঐ একই মাত্রার। কিন্তু সাধারণ জিনিষে অণুগুলি এলোমেলো ভাবে বিস্তৃত থাকে বলিয়া তাহা দ্বারা Diffraction Grating এর কাজ হইতে পারে না, অর্থাৎ রঞ্জেন আলোর সমাবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু যে সমস্ত পদার্থকে দানা বা (Crystal) স্ফটিকের আকারে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অণুগুলি এক এক বিশেষ শৃঙ্খলামত সন্নিবিষ্ট থাকে। মনে করুন সৈন্ধব লবণের দানা;—এগুলিকে ঘনক্ষেত্রাকার বিশিষ্ট দানার আকারে পাওয়া যায়। Fedorov, Schonflies, Bravais প্রভৃতি স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই স্ফটিক কতকগুলি ঘনক্ষেত্রাকার আণবিক ইষ্টকের সংযোগে গঠিত। মনে করুন, কোনও ঘনক্ষেত্রের (Cube) আটকোণে আটটী সাদা বর্ত্তুল আছে, বর্ত্তুলগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। প্রত্যেক বর্ত্তুলকে আমরা এক একটী Sodium পরমাণু মনে করিতে পারি। এই ঘনক্ষেত্রগুলিকে যদি আমরা সমানভাবে পরপর সব দিকে সাজাইয়া যাই, তাহা হইলে একটী ঘনক্ষেত্রাকার আয়তন পাইব। প্রত্যেক ঘনক্ষেত্রের পৃষ্ঠের মধ্য-বিন্দুতে এক একটী কালো বর্ত্তুল স্থাপন করিলে আমরা আর এক শ্রেণী ঘনক্ষেত্র ১০ ˙ × ১০ ˙ পাই। এই কালো বর্ত্তুল গুলিকে আমরা chlorine পরমাণু বলিতে পারি। প্রত্যেক স্ফটিকের দুই পরমাণুর মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহার পরিমাণ রঞ্জেন আলোর পরিমাণের সমতুল্য। সুতরাং এই স্ফটিকের ভিতর দিয়া রঞ্জেন আলো প্রবেশ করাইলে প্রত্যেক পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আলোক সর্ব্বদিকে সমাবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। আলোর কতকাংশ বরাবর সরল-রৈখিক পথে চলিয়া যাইবে; সুতরাং অপর পার্শ্বে আলোক-চিত্রের ফলক রাখিলে, যে স্থানে রশ্মিটী ঠিক সোজা পড়িবে, তথায় একটী সাদা দাগ পড়িবে। প্রত্যেক পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আলোকের যে অংশ চতুর্দ্দিকে পরাবর্ত্তিত হইবে, তাহার মধ্যে কোন কোন দিকে সমস্ত আলোর তরঙ্গই এক এক কলাতে আলোক চিত্র ফলকে পৌঁছিবে। কোন দিকে বিভিন্ন ভাবে পৌঁছিবে। সুতরাং মধ্য-বিন্দুর চারিদিকে ছোট ২ দাগ পড়িবে। তখন গণিত শাস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা সহজেই আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যাইবে।

লাউয়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম রঞ্জেন আলোর পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এই উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহার সহযোগী Friedrich এবং Cupping উভয়ে মিলিয়া পরীক্ষা দ্বারা Laue এর অনুমানের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ লাউএ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রাকৃতিক দর্শনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

অধ্যাপক লাউএর আবিষ্কারের পর জার্মেণীতে Friedrich, Debye, Stark এবং ইংলণ্ডে W. H. Bragg, W. L. Bragg, Moseley, Darwin প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক গণ রঞ্জেন আলো সম্বন্ধে অনেক গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত সভ্য দেশেই রঞ্জেন আলো সম্বন্ধে পুরাদমে কাজ চলিতেছে।

এই সমস্ত কর্ম্মীদের মধ্যে লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Bragg এবং তাঁহার পুত্র W. L. Braggর কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহারা রঞ্জেন আলোর বিশ্লেষণ এবং স্ফটিকের আণবিক গঠন সম্বন্ধে অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া ১৯১৫ সনের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। Bragg প্রমাণ করেন যে কোনও স্ফটিকের ভিতর দিয়া রঞ্জেন আলো প্রবেশ করাইলে এক দিকে যেমন আলোকের পরাবর্ত্তনের জন্য ফটোগ্রাফে বিশিষ্ট ছায়া পড়ে, অপর দিকে তেমনই আলোর কতকাংশ বিশেষ বিশেষ তল হইতে নিয়মিতভাবে প্রতিফলিত হয়। পূর্ব্বে স্ফটিকের আধুনিক গঠন সম্বন্ধে স্ফটিকতত্ত্ববিদ্‌দের মত খানিকটা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনে করুন, Zinc Blende স্ফটিক ইহার সম পরিমাণ দস্তার ও গন্ধকের যোগে গঠিত এবং ঘনক্ষেত্রাকার স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। ঘনক্ষেত্রের যে কোন বাহুর দিক্‌কে আমরা স্ফটিকের অক্ষরেখা বলিতে পারি, এবং অক্ষরেখার সহিত লম্বভাবে অঙ্কিত তলকে প্রধান-তল বলিতে পারি।

স্ফটিক তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, যখন আঘাতে বা অন্য কোন কারণে স্ফটিক ফাটিয়া যায়, তখন স্ফটিকের দুই অংশ প্রধান-তলে বিশ্লিষ্ট হয়—এইজন্য প্রধান-তলকে "অবচ্ছেদের তল" বলা যায়। অভ্র সকলেই দেখিয়াছেন;—অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, অভ্র অতি ক্ষুদ্র স্ফটিক সমূহের সমবায়ে গঠিত। অভ্রের পাতগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। এই স্তরগুলি স্ফটিকের অবচ্ছেদ তল, অর্থাৎ এই তলে পরমাণু-সর্বাপেক্ষা ঘন-সন্নিবিষ্ট।

Bragg এর মতে এই সমস্ত বিশিষ্ট তলে পরমাণুগুলি খুব ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই তল হইতে রঞ্জেন আলো নিয়মিত ভাবে প্রতিফলিত হইবে। পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা নিজেদের অনুমান যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে ঠিক সমতল পাওয়া গেলে রঞ্জেন আলো ও সাধারণ আলোর ন্যায় নিয়মিত ভাবে প্রতিফলিত হয়। সাধারণ কুব্জপৃষ্ঠ কাচ হইতে সাধারণ আলো যেমন প্রতিফলিত হইয়া সন্ধিবিন্দুতে সংহত হয়, অভ্রের কুব্জপৃষ্ঠ মুকুর হইতেও রঞ্জেন আলো সেইরূপ প্রতিফলিত হয়।

Bragg এই প্রতিফলিত রঞ্জেন আলোর (Intensity) প্রখরতা মাপিবার জন্য খুব সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ গ্যাস্ তাড়িত-অপরিচালক, কিন্তু গ্যাস্‌কে রঞ্জেন আলো দ্বারা আলোকিত করিলে, গ্যাসের অণুগুলি বিয়োগ তড়িৎযুক্ত তড়িৎরেণু (Electrons) এবং যোগতড়িৎ যুগ (অণুবীজ) [Positive nucleus] আংশিক এই দুইভাগে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তড়িৎ সহজেই গ্যাসের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। এই প্রথাকে ইংরেজীতে Ionization বলে, বাঙ্গলায় আমরা রেণুবিভাজন বলিতে পারি। রঞ্জেন আলোর প্রখরতা বা তেজ যত অধিক হইবে, রেণুবিভাজনও ততই প্রবল হইবে।

প্রতিফলিত রঞ্জেন আলোককে এইরূপ অল্পচাপে আবদ্ধ বাষ্পপূর্ণ আধারের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইলে মধ্যস্থ বাষ্পের "রেণু বিভাজন" হইতে থাকে;—সুতরাং 'রেণু বিভাজন' মাপিলেই প্রতিফলিত আলোকের তেজ বা প্রখরতা ঠিক পরিমাণ করা যায়। ব্রাগের উদ্ভাবিত "রঞ্জেন আলোর বর্ণচ্ছত্র মাপক যন্ত্র" লাউয়ের যন্ত্র অপেক্ষা খুব অল্প সময়ে ভাল ফল দান করে।

সাধারণ আলোক যেমন নানা আয়তনের তরঙ্গের সমষ্টি, রঞ্জেন আলোও তেমনই নানা আয়তনের তরঙ্গের সমষ্টি। ব্রাগের "বর্ণচ্ছত্র মাপক যন্ত্রে" তরঙ্গগুলি বিভিন্ন পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

লাউ-এর আলোক-লিপি [Radio-gram] এবং Bragg এর 'বর্ণচ্ছত্র' মাপক যন্ত্রের সাহায্যে স্ফটিকের আভ্যন্তরিক গঠন নির্ণয় করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করা যাইতেছে। এই দুই যন্ত্রেই কাজ করিতে খানিক সময়ের প্রয়োজন হয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টেরাডা, আলোক-চিত্রের ফলক ব্যবহার না করিয়া প্রস্ফুরক পরদা ব্যবহার করেন। লাউএর উদ্ভাবিত উপায়ে আলোর যেখানে দাগ পড়ে, টেরাডার উদ্ভাবিত প্রণালীতে সেই সমস্ত স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্ফুরক আলো নির্গত হইতে থাকে। সুতরাং শুধু চোখে দেখিয়াই স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধে খানিকটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই উপায় ততটা সূক্ষ্ম নয় বলিয়া স্ফটিক তত্ত্ববিদ্‌গণ এখনও ইহার সম্যক্ ব্যবহার করেন না।

লাউ-এর যুগপ্রবর্ত্তক আবিষ্কারের পর হইতে রঞ্জেন আলো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্বত্র কাজ করিবার সাড়া পড়িয়াছে। জার্ম্মেণী এবং ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও কর্ম্মীর অভাব নাই। উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম তাহা হইতে কাজ কর্ম্মের ধারা কতকটা বোঝা যাইবে। প্রধানতঃ স্ফটিকের মধ্যে পারমাণবিক সংস্থান, এবং রঞ্জেন আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় লইয়াই বর্ত্তমানে আলোচনা হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে স্ফটিকতত্ত্ববিদ্ Schonflejs, Bravais, Fedorov প্রভৃতি মনীষিগণ স্ফটিকের গঠন সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন সে সমস্ত প্রায়ই ঠিক।

শ্রীমেঘনাথ সাহা।

সায়ণ মাধব

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ কোন্ সময়ে লিখিয়া ছিলেন, তাহার কোনও বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাতে কোনও রাজাদেশের কথাও লিখিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থে পাতঞ্জল দর্শনের মত ব্যাখ্যার পর তিনি এই মাত্র লিখিয়াছেন যে, ইহার পর সমস্ত দর্শনের শিরোমণিস্বরূপ শাঙ্কর দর্শন অন্যত্র লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তাহা অর্থাৎ শাঙ্কর-দর্শনের আলোচনা উপেক্ষিত হইল।

"বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে তিনি শাঙ্কর দর্শনের মত বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; অতএব "বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ" রচনার পর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ রচিত হইয়াছে আপাততঃ এমত বলা যাইতে পারে। কিন্তু "বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ" রচনার সময়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া "বিদ্যারণ্য" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ে পূর্ব্বাশ্রম-সম্বন্ধ নামাদি নির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না; অতএব বলিতে হয় যে, শাঙ্কর দর্শন সম্বন্ধে তিনি "বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ" ব্যতীত গ্রন্থান্তর লিখিয়াছিলেন।

তিনিই শেষ বয়সে সংন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক "বিদ্যারণ্য„ নামে পরিচিত হইয়া "পঞ্চদশী" গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য রামকৃষ্ণ উক্ত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন। উক্ত "বিদ্যারণ্য"ই ভগবৎ-পাদ শাঙ্কর স্থাপিত শৃঙ্গেরী মঠের আধিপত্য স্বীকার করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অথর্ব্ব বেদের ভাষ্যোপদ্ঘাতে সায়ণাচার্য্য যে বিদ্যারণ্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিই পূর্ব্বাশ্রমে সুগৃহীত-নামা মাধবাচার্য্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং অথর্ব্ব-বেদভাষ্য রচনার পূর্ব্বেই তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশী গ্রন্থের আরম্ভে বিদ্যারণ্যমুনি শঙ্করানন্দ নামক গুরুকে প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

"নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে
সবিলাসমহামোহগ্রাহ-গ্রাসৈককর্ম্মণে"

উক্ত শঙ্করানন্দ মঠস্বামীই বিদ্যারণ্যের সন্ন্যাসোপদেষ্টা গুরু বলিয়া মনে হয়।

মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের উপক্রমে শার্ঙ্গপাণির পুত্র সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী নিখিলাগম-বেত্তা সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু নামক গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"পারঙ্গতং সকলদর্শনসাগরাণা
মাত্মোচিতার্থচরিতার্থিতসর্ব্বলোকম্
শ্রীশার্ঙ্গপাণিতনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং
সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণু-গুরুমন্বহ মাশ্রয়েহহম্॥

এই স্থানে ইহা বলা আবশ্যক যে, অত্রত্য আগম শব্দে শৈবাগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রই অভিহিত হইয়াছে। কারণ, মাধবাচার্য্য তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন, তদীয় গ্রন্থ পাঠেই এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং তাঁহার তন্ত্র-পারদর্শিতারও পরিচয় পাওয়া যায়, আর ইহাও জানা যায় যে, যাঁহারা বেদস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, সুধু আলোচনা নহে—গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন, তাঁহারাই তন্ত্র শাস্ত্রেরও নিবন্ধ লিখিতেন।

মাধবাচার্য্য "কালমাধব" নামক স্মৃতিনিবন্ধে কালনিরূপণ প্রসঙ্গে একটি বিচারের অবতারণা করিয়া কণাদ-দর্শনাপেক্ষা তান্ত্রিক দর্শনের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্ত্যনুসারে যে কেবল বৈশেষিক দর্শনাপেক্ষাই শৈবাগম দর্শনের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু ঋষিপ্রণীত অন্যান্য দর্শনাপেক্ষাও তান্ত্রিক দর্শনের মহত্ত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তিনি তান্ত্রিক দর্শনের মত ভোজদেবকৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভোজদেব "কামধেনু" নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধের রচয়িতা, তিনি অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়েও প্রভূত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কালের অনিত্যত্ব প্রতিপাদক বিচারটি এইস্থলে উল্লেখ যোগ্য। মাধব বলিয়াছেন, যদি মনেকর কণাদমুনি তীব্র তপস্যার দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া তদনুগ্রহে সর্ব্বজ্ঞত্ব পদ লাভ করিয়া বেদের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন; অতএব মন্দবুদ্ধিগণ বেদের যে অর্থ বুঝিয়া থাকে তাহা হইতে

অর্থান্তর অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ দেখান উচিত? এরূপ হইলেও যাঁহার অনুগ্রহে কণাদ মুনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই শিবই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ; অতএব তাঁহার মতানুসারে কণাদ-মতেরই অন্যপ্রকার উপপত্তি করা অত্যন্ত উচিত।

ভগবান্ শিব সমস্ত আগমে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব-নিরূপণাবসরে কাল-তত্ত্বের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। ভোজরাজ সমগ্র শৈবাগমের সারভূত অর্থ আর্য্যার দ্বারা সংগ্রহ করিয়া শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, ও বিদ্যা, এই শুদ্ধ পাঁচটি তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, অন্যান্য তত্ত্বের নির্দ্দেশাবসরে সেই গুলিকে মায়ার কার্য্য বলিয়াই কালের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যথা—পুরুষ কর্ত্তৃক জগতের নির্ম্মাণের জন্য মায়া হইতে পাঁচ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সেই পাঁচটি তত্ত্ব কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা, এবং রাগ নামে অভিহিত। মায়ার সহিত এই একাদশতত্ত্বের (শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা শুদ্ধ এই পাঁচ তত্ত্ব এবং কাল প্রভৃতি পাঁচ তত্ত্ব ও মায়া, মিলিত হইয়া একাদশ) এবং সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নামতঃ নির্দ্দেশ করিয়া, ক্রমে সেই গুলিকে বিবৃত করিবার সময়ে তিনি বলিয়াছেন, নানাবিধ শক্তিময়ী সেই মায়া প্রথমতঃ কালতত্ত্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কাল, ভাবী, বর্ত্তমান এবং ভূত জগৎকে কলন করে (বুঝাইয়া দেয় অথবা সংহার করে); অতএব ইহা কাল নামে অভিহিত হয়। †

নিখিল-শৈবাগমসারমার্য্যাভিঃ সংগৃহ্ণাণো ভোজরাজঃ শুদ্ধানি পঞ্চতত্ত্বানি 'শিব-শক্তি-সদাশিবেশ্বর-বিদ্যাখ্যানি' নির্দ্দিশ্যোত্তরাণি নির্দ্দিশন্মায়াকার্য্যোক্তিপূর্ব্বকমেব কালং নিরূদিক্ষৎ।

"পুংসো জগতঃকৃতয়ে মায়াতস্তত্ত্বপঞ্চকং ভবতি
কালো নিয়তিশ্চ তথা কলাচ বিদ্যাচ রাগশ্চেতি"

তানি মায়াসহিতান্যেকাদশতত্ত্বানি, সাংখ্যপ্রসিদ্ধপঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি চোদ্দিশ্য ক্রমেণ বিবৃণ্বন্নিদমাহ—

"নানাবিধশক্তিময়ী সা জনয়তি কালতত্ত্ব মেবাদৌ
ভাবি ভবদ্‌ভূতময়ং কলয়তি জগদেষ কালোঽত ইতি"

কাল মাধব। ১ম প্রকরণ। ১৪ পৃ।

ভোজরাজের গ্রন্থের টীকা হইতেও মাধবাচার্য্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।* তাঁহার উক্তিতে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, জগতের উৎপত্তিস্থান (যাহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে,) সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, শৈবাগমোক্ত মায়া এবং শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত নিত্যকালস্বরূপ ঈশ্বর, একই পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগতের কারণরূপে বিবেচিত হইয়াছে, শ্রুতিস্মৃতিমতে অবিনশ্বর কালাত্মক পরমেশ্বরই জগতের উৎপত্তিস্থান; শৈবাগম বা তন্ত্রশাস্ত্র মায়াকেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; সুতরাং জগৎ কারণের নাম মাত্রেই ভেদ, পরমার্থতঃ ইহা একই পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। **

মাধবাচার্য্য জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরের উপক্রমে বুক্কণ-নরপতির সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে যে সমস্ত হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন, তাহাতেও শৈবাগম সিদ্ধান্তের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

---

† অথ মন্যসে, মহতা তপসা শিব মারাধ্য তৎপ্রসাদলব্ধ-সর্ব্বজ্ঞত্বপদঃ কণাদ-মহামুনির্বেদতাৎপর্য্যং সম্যগ্ বেত্তীতি বেদস্যৈব মন্দমতিপ্রতীতাদর্থাদর্থান্তরং নেতব্যমিতি, এবমপি যস্য প্রসাদাদয়ং সর্ব্বজ্ঞতামলভত, সএব শিবোমুখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি তন্মতানুসারেণ কণাদমতস্যৈবান্যথানয়ন মত্যন্তমুচিতম্। শিবোহি সর্ব্বেষ্বাগমেষু ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি নিরূপয়ন্ কালতত্ত্বস্যোৎপত্তি মঙ্গীচকার।

* তত্র টীকাকার ইত্থং ব্যাচখ্যৌ—"নন্বেষ কালো নৈয়ায়িকাদিভির্নিত্যোঽভ্যুপগতোঽত আহ ভাবি-ভবদ্ভূতময়মিতি। ভূতাদিরূপেণ ত্রিবিধত্বাদচেতনত্বে সতি অনেকত্বে-নাস্যানিত্যত্বং সিদ্ধ মিতি ভাবঃ। কেন কার্য্যেণাস্য সিদ্ধি রত আহ, কলয়তি জগদেষ কালোঽত ইতি। চিন্নিক্ষিপ্রাদি-প্রত্যয়দ্বারেণ কলয়তি আক্ষিপতীত্যর্থঃ"।

** তচ্চোৎপত্তিস্থানং সাংখ্যোক্ত-প্রকৃতির্বা শৈবাগমোক্ত-মায়া বা শ্রুতি-স্মৃত্যুদিত-নিত্য-কালাত্মক ঈশ্বরো বা ভবিষ্যতি। (২৩ পৃ কা।)

বহ্ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে প্রগুণয়ত্তৎপঞ্চ-মূর্ত্তিপ্রথাম্
তত্রায়ং স্থিতিমূর্ত্তি মাকলয়তি শ্রীবুক্কণ-ক্ষ্মাপতিঃ
বিদ্যাতীর্থমুনি স্তদাত্মনি লসন্মূর্ত্তি র্বসুগ্রাহিকা
তেনাস্য স্বগুণৈ রখণ্ডিতপদং সার্ব্বজ্ঞ্য মুদ্যোত্যতে। ৩

ইহার অর্থ,—সমস্ত উপনিষদে যে ব্রহ্ম প্রতীয়মান হয়, সেই ব্রহ্মই শৈবাগমে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিরোধ ও অনুগ্রহ পাঁচপ্রকার ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর বামদেব ও সদ্যোজাত এই পাঁচ মূর্ত্তির প্রথা (প্রসিদ্ধি অথবা বিস্তার) প্রকটিত করেন, ইহা প্রতিপাদিত হয়। সেই পঞ্চ মূর্ত্তির মধ্যে এই রাজা (বুক্কণ) স্থিতিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন। সেই মূর্ত্তির অর্থাৎ নরপতিরূপধারি স্থিতিমূর্ত্তির আত্মাতে (অন্তঃকরণে) স্ফুরিত-মূর্ত্তি বিদ্যাতীর্থমুনি (রাজার গুরু) সমস্ত জগতের অনুগ্রাহিকা মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যে হেতু এই রাজা বেদান্তোক্ত পরং ব্রহ্ম, যে হেতু ইনি আগমোক্ত মহেশ্বরের স্থিতিমূর্ত্তি, যে হেতু বিদ্যাতীর্থমুনিও ইঁহার অন্তঃকরণে সন্নিহিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন; অতএব এই রাজার সর্ব্বজ্ঞত্ব অবিসংবাদে সকলের হৃদয়েই প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ সকলেই ইঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করেন †

মাধবাচার্য্য সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহে পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দুই প্রকার মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কামিক-কারণ-প্রপঞ্চ প্রভৃতি আগম সংজ্ঞক তন্ত্রে যে যে মন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে সেই গুলিকে তান্ত্রিক মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* সর্ব্বদর্শনের অন্তর্গত শৈবদর্শন, রসেশ্বর দর্শন প্রভৃতিতেও তিনি তন্ত্রাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মাধবপ্রণীত গ্রন্থনিচয় পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, তিনি নিজ গুরুর প্রতি "সর্ব্বজ্ঞ" এবং "নিখিলাগমজ্ঞ" এই দুইটি বিশেষণ যথার্থই প্রযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে ভক্তজনসুলভ অতিরঞ্জন প্রতীয়মান হয় না। কারণ, গুরুর তাদৃশ বিদ্যাবত্তা না থাকিলে শিষ্যের এইরূপ অনন্যসাধারণ জ্ঞান কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে?

উক্ত শার্ঙ্গপাণিতনয় সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুই মাধবাচার্য্যের তান্ত্রিক গুরু ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ পরাশর-মাধবে এবং কাল-মাধবে তিনি ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যাতীর্থকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

যথা—

সোহং প্রাপ্য বিবেকতীর্থপদবী মাম্নায়তীর্থে পরং
মজ্জন্ সজ্জন-সঙ্গতীর্থনিপুণঃ সদ্বৃত্ততীর্থং শ্রয়ন্।
লব্ধা মাকলয়ন্ প্রভাবলহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থমুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্"

ইহার অর্থ,সেই আমি বিবেকরূপ (সদ্বিবেচনা স্বরূপ), তীর্থপদবী (শাস্ত্র প্রবেশের পথ) প্রাপ্ত হইয়া আম্নায়তীর্থে (বেদ স্বরূপ পবিত্র জলাশয়ে) অবগাহন করিতে করিতে সজ্জনের সমাগম রূপ উপায়বিষয়ে নিপুণ হইয়া, সদাচাররূপ উপায় অবলম্বন করিয়া,শ্রীভারতীতীর্থ হইতে সামর্থ্যপ্রবাহ লাভ হইয়াছে এ মত মনে করিয়া, বিদ্যাতীর্থকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকণ্ঠকে অব্যাহত রূপে ভজন করিতেছি।

† সর্ব্বাসূপনিষৎসু প্রতীয়মানং যৎপরংব্রহ্ম, তদেব শৈবাগমেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহার-নিরোধনানুগ্রহলক্ষণ-পঞ্চকৃত্য-সিদ্ধ্যর্থমীশান-তৎপুরুষাঘোর-বামদেব-সদ্যোজাত-লক্ষণানাং পঞ্চানাং মূর্ত্তীনাং প্রথাং প্রসিদ্ধিং বিস্তারং বা প্রগুণয়তি প্রকটীকরোতীতি প্রতিপাদ্যতে। তত্র তাসু মূর্ত্তিষয়ং ভূপালঃ স্থিতি-মূর্ত্তিং ধত্তে। তস্যামূর্ত্তে রাত্মনি লসন্‌বিদ্যাতীর্থ মুনিঃ কৃৎস্নস্য জগতোঽনুগ্রাহিকা মূর্ত্তি রিত্যুচ্যতে। যস্মাদয়ং ভূপো বেদোক্তং পরং ব্রহ্ম, যস্মাচ্চাগমোক্তা মহেশ্বরস্য স্থিতি-মূর্ত্তিঃ, যস্মাচ্চ শ্রীবিদ্যাতীর্থমুনি স্তদাত্মনি সংনিধায় প্রকাশতে, তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব মস্য রাজ্ঞ উৎকর্ষেণাবিদ্বজ্জনাগোপাল-মবিবাদেন প্রতিভাসতে।

* তেচ মন্ত্রা দ্বিবিধা বৈদিকা স্তান্ত্রিকাশ্চ·· ···
তন্ত্রেষু কামিক-কারণ-প্রপঞ্চাদ্যাগমেষু যে যে বর্ণিতা স্তে তান্ত্রিকাঃ।

এই শ্লোকের অর্থানুসারে ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যাতীর্থ এই উভয়েই মাধবাচার্য্যের উপাধ্যায় বা গুরু বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু কালমাধবের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা 'সুদর্শন মাথুর' অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—তীর্থ-পদান্ত নামের দ্বারা গুরু, গুরুতর ও গুরুতম এতত্ত্রিতয়ের নাম অর্থাৎ গুরু, গুরুর গুরু, ও তদ্‌গুরুর নাম স্মরণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইঁহার মতে মাধবের গুরু ভারতীতীর্থ, তদ্‌-গুরু বিদ্যাতীর্থ, এবং বিদ্যাতীর্থের গুরু জাহ্নবীতীর্থ এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে।

আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত 'জৈমিনীয়-ন্যায়-মালা-বিস্তারে'র সম্পাদক পণ্ডিত শিবদত্ত শর্ম্মা শ্রীবিদ্যাতীর্থকে ভারতীতীর্থেরও গুরু বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া স্বমত সমর্থনের জন্য সুদর্শনমাথুরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিদ্যাতীর্থের উদ্দেশ্যে ভারতীতীর্থকৃত বেদান্তাধিকরণমালায় নমস্কার শ্লোক উপন্যস্ত করিয়াছেন। যথা—

অয়ং শ্রীবিদ্যাতীর্থঃ ভারতীতীর্থযতেরপি গুরুরেব প্রতীয়তে। অতএব কালমাধবব্যাখ্যাতা সুদর্শনমাথুরঃ—

ব্যামূঢ়ানাং মিহতনুভৃতাং জাহ্নবীতীর্থমেকং
বিদ্যাতীর্থং প্রকৃতিবিমলং সদ্বিবেকোদয়ানাম্
সর্ব্বেষান্তু প্রথমসুখদং ভারতীতীর্থমাহু
স্তদ্‌ভাবাপ্তে বিমলমনসো নির্ণয়ে শক্তি রস্তি॥

ইতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং তীর্থপদাবসানানি চ (গুরু) গুরুতর-গুরুতমনামানি স্মৃতানি। তথাহি বেদান্তাধিকরণমালাদৌ ভারতীতীর্থস্য পদ্যম্।

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণম্
বৈয়াসিকীন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে ময়া॥

প্রদর্শিত কালমাধব শ্লোকের অর্থ এইরূপ হইতে পারে—এই জগতে মোহগ্রস্ত শরীরিদিগের, জাহ্নবী তীর্থ (পক্ষে উপাধ্যায় বিশেষ) একমাত্র আশ্রয়। ইহাও ধ্বনিত হয় যে, মোহপরবশ মানবদিগের পক্ষে অর্থাৎ মোহবশতঃ যাহারা পাপাচরণ করে, তাহাদের পক্ষে জাহ্নবী গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ অর্থাৎ পাপনাশক, পবিত্র পদার্থ। যাহাদের সদ্বিবেকের উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা সদ্বিবেচনাসম্পন্ন, তাহাদের পক্ষে-স্বভাব নির্ম্মল বিদ্যাতীর্থ মুনি আশ্রয়ণীয়। ধ্বনিত অর্থ, সদ্বিবেচনা উদয়ের পক্ষে অর্থাৎ সদ্বিবেচনা লাভ করিতে হইলে স্বভাবতঃ নির্ম্মল বিদ্যারূপ তীর্থ (উপায়) অবলম্বনীয়। পণ্ডিতগণ ভারতীতীর্থ যতিকেই সকলের পক্ষে প্রথম সুখপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রকেই প্রথমতঃ ভারতীতীর্থের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ধ্বনিত অর্থ, পণ্ডিতগণ ভারতীরূপ তীর্থকে (ভাষা স্বরূপ উপায়কে) সকলের পক্ষে প্রথম সুখদাতা বলিয়া থাকেন। কারণ ভাষাজ্ঞান না হইলে বিষয়ান্তর বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহাদের প্রতি চেষ্টা বশতঃ অথবা আমার প্রতি তাহাদের করুণাত্মক লীলাবশতঃ আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে; সুতরাং শাস্ত্রার্থ নির্ণয় বিষয়ে আমার শক্তি আছে। এই উক্তি হইতে ভারতীতীর্থ মাধবের গুরু এবং তদ্‌গুরু বিদ্যাতীর্থ, এমত বুঝা যায় না। প্রত্যুত ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যাতীর্থ ইঁহারা উভয়েই মাধবের গুরু এমনই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। ভারতীতীর্থ বৈয়াসিকী ন্যায়মালায় বিদ্যাতীর্থকে নমস্কার করিয়াছেন, ইহা হইতে বিদ্যাতীর্থ ভারতীতীর্থের গুরু এই মাত্রই বুঝা যায়। যিনি ভারতীতীর্থের গুরু তিনি মাধবেরও গুরু হইতে কোনও বাধা দেখা যায় না। একাধিক গুরুকে নমস্কার করা সে কালের রীতি বলিয়াই মনে হয়। পঞ্চদশীর টীকাকার ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যাতীর্থ এই উভয়কেই নমস্কার করিয়াছেন, এবং গ্রন্থশেষে নিজকে উভয়ের কিঙ্কর বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* চতুর্থাশ্রমে বিদ্যারণ্যনামে পরিচিত মাধবাচার্য্য 'বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ' গ্রন্থের ফল বিদ্যাতীর্থ গুরুর উদ্দেশ্যে অর্পিত করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাতীর্থও যে মাধবাচার্য্যের সাক্ষাৎ গুরুই ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। 	ক্রমশঃ

শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

* নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরো
প্রত্যক্‌তত্ত্ব-বিবেকস্য ক্রিয়তে পদদীপিকা।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্যমুনিবর্য্যকিঙ্করেণ শ্রীরামকৃষ্ণাখ্য-বিদুষা বিরচিতা ব্রহ্মানন্দান্তর্গত-বিষয়ানন্দ-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

যদ্বিদ্যাতীর্থগুরবে শুশ্রূষান্যা নরোচতে তস্মাৎ
অন্বেষ্যা ভক্তিযুতা-শ্রীবিদ্যাতীর্থপাদয়োঃ সেবা।

আলো

(তুলসী দাস হইতে)

কুটীরের দীপশিখা,
প্রতি সন্ধ্যাকালে,
পড়ে গিয়া ধীরে ধীরে
সরসীর জলে।
নিকটেই আলো, তবু
কুমুদ না ফোটে;
প্রাণের আগল তার
তবু নাহি টোটে।
সুদূর আকাশ হ'তে
চাঁদিমার হাসি,
আসি যবে পড়ে, তার
বাঁধনের রাশি
ছুটে যায়; ছুটে যায়
সব মোহ তার,
লঘু হয়ে যায় তার হৃদয়ের ভার।

হে প্রাণেশ! কত বন্ধু
আছে সেই মত;
ভাই-ভগ্নী নিকটেতে
আছে কত শত।
তাহাদের ভালবাসা,
তাহাদের আলো,
আমার নিকটে, সখা,
লাগে নাক ভাল।
বহু দূরে আছ তুমি,
ক্ষতি তাহে নাই;
কণা আলো যদি তব
প্রতিদিন পাই।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

ত্রিপুরা-সুন্দরী

কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্ব প্রান্তে ১৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে উদয়পুর অবস্থিত। উদয়পুরের কোন এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে ত্রিপুরা-সুন্দরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। পীঠ-ক্ষেত্র বলিয়া ত্রিপুরা-সুন্দরীর বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। কুমিল্লানগরের পূর্ব্ব প্রান্তে জগন্নাথপুর নামক স্থানে জগন্নাথদেবের মন্দির অবস্থিত। জগন্নাথদেব এক্ষণ একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকায় আছেন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিগ্রহদেব যে মন্দিরে পূজিত হইতেন, তাহা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মন্দির "সতর-রতন" নামে খ্যাত।* সম্ভবতঃ সতরটী চূড়া আছে বলিয়াই ইহাকে "সতর-রতন" বলা হয়। এই মন্দিরটী অতীব সুন্দর ও বিস্ময়কর। যদিও সংস্কার অভাবে মন্দিরটীর অবয়ব মাত্র অবশিষ্ট আছে, তথাপি যিনি ইহা দর্শন করিবেন তিনিই মন্দিরের নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যের প্রশংসা করিবেন। মহারাজ রত্ন-মাণিক্য মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন; মহারাজ কৃষ্ণ-মাণিক্য ইহার শেষ করেন। মন্দিরটী বৃক্ষগুল্মাদিতে আচ্ছাদিত রহিয়া নীরব ভাষায় উহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমরা ৮ জগন্নাথ দেবের চরণামৃত ও আশীর্ব্বাদ-পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তখন বেলা প্রায় অবসান।

আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খেয়া যোগে গোমতী নদী পার হইয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর "সোণা মুড়া" নামক স্থানে কোন এক ভদ্র লোকের বাসায় আতিথ্য স্বীকার করিলাম। এবং একটু বিশ্রামান্তে দেবালয়ে

* জনৈক লেখক এই মন্দিরকে "সপ্তরত্ন" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি 'সতর রতন' সপ্ত-রত্নের অপভ্রংশ অনুমান করিয়াছেন। মন্দিরটী পঞ্চতল। কিন্তু উক্ত লেখক উহার সপ্ততল কল্পনা করিয়া সপ্তরত্ন নামের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং দুটী তল ভূ-প্রোথিত হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রস্তাব যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং মন্দিরের বর্ত্তমান নিম্নতলই যে প্রকৃত নিম্নতল ইহাতে কোন সংশয় নাই।

গমন করিলাম। এই দেবালয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ ঠাকুরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সেবায়িত একজন পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে ভক্তিমান্‌ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হইল। এই মন্দিরে আসিয়া বেশ আরাম পাইলাম। একজন যুবক ভাব-গদগদ স্বরে নাচিয়া নাচিয়া কিছু গুণগান করিলেন। ভক্তিপরায়ণ সদ্‌গুরুর শিষ্যদের দর্শনে মনে বেশ আনন্দের উদ্রেক হয়। তাঁহার সঙ্গীত বহুদিন স্মরণ থাকিবে।

তৎপরদিন অতি প্রত্যুষে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া বাসার কর্ত্তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এবং সোনামুড়া পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম। সোনামুড়া কুমিল্লা হইতে ৩ ক্রোশের পথ হইবে। ইহা ত্রিপুরা-পতির স্বাধীন রাজ্যের একটী মহকুমা। এখানে আদালত, ফৌজদারী ও হাঁসপাতাল আছে। সোনামুড়াতে দেখিলাম, বহুল পরিমাণ পার্ব্বত্য ছন, মুলিবাঁশ প্রভৃতি আমদানী হইয়াছে। এখান হইতে এ সকল দ্রব্য কুমিল্লা রপ্তানি হইয়া থাকে। সোনামুড়ার অন্তর্গত পার্ব্বত্য গ্রামসমূহ হইতে এ সকল দ্রব্য আনীত হইয়াছে, এরূপ অনুমিত হইল।

প্রাতঃকালীন সমীরণে ও বিহঙ্গের সঙ্গীতে আমাদের মনঃ-প্রাণ প্রফুল্ল হইল। আমরা গোমতী নদী দক্ষিণে রাখিয়া তাহার তীর দিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা 'কাঁকড়া-বন' বাজারে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব মনে করিয়াছিলাম। এবং যাহাতে ১০টা ১১টার সময় তথায় পৌঁছিতে পারি, এজন্য রৌদ্র উঠিবার পূর্ব্ব সময়টুকু একটু ত্রস্ত হাঁটিতে লাগিলাম। পার্ব্বত্য নদী গোমতী, আঁকিয়া বাঁকিয়া অজগরের মত ছুটিয়াছে। ইহাতে তরঙ্গের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু স্রোতের প্রখরতা এবং জলের আবর্ত্ত আছে। আমরা নীরবে চলিতে লাগিলাম। পার্ব্বত্য প্রদেশে পার্ব্বত্য নদীর কূলে প্রভাত সময়ে বিহগ-কূজন শুনিতে শুনিতে পদব্রজে পথ অতিক্রম করা কি যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব। আমরা মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই কাঁকড়া-বনে উপনীত হইলাম। এখানে একটী বাজার আছে। বাজারটী গোমতীর তীরেই অবস্থিত। আমরা এক স্থানে আশ্রয় লইলাম। অনন্তর ২ টার সময় আমরা উদয়পুর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

কাঁকড়া-বন হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাস্তার দূরত্ব অনুমান ৬ ক্রোশ হইবে। কাঁকড়া-বন হইতে ৩ ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া "জামজুরী" নামক স্থানে কোন এক ভদ্র লোকের গৃহে অল্পকাল বিশ্রাম করিলাম। জামজুরীতে একটী ক্ষীণ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া গোমতীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। এখানে পাটের আমদানী হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। কাঁকড়া বন হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত যে ৬ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া আসিলাম তাহাতে শ্রম বোধ করিলাম বটে, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রকৃতি-দেবীর নানাবিধ প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বেশ আনন্দ লাভ করিলাম। এসকল সুরম্য দৃশ্য ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার বিষয় নয়। স্থানে স্থানে রাস্তার উভয় পার্শ্বব্যাপী সুবিশাল গর্জ্জন বৃক্ষ পথিকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। কোন স্থানে ছোট বড় আমলকী বৃক্ষ, লতিকা-বেষ্টিত হইয়া ভাবুকের হৃদয়ে রস সঞ্চার করিয়া দিতেছে। আবার কোন স্থানে বা অল্প পরিমিত জমীতে অপরিমিত ধান্য উৎপাদিত হইয়া ও তৎপার্শ্বে লতা গুল্মাচ্ছাদিত কমনীয় উদ্যান সজ্জিত হইয়া শ্রান্ত পথিকের প্রাণে যথার্থই শান্তি বারি ঢালিয়া দিতেছে। এরূপে আমরা সানন্দ মনে পথ চলিতে চলিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উদয়পুরে আসিয়া উপনীত হইলাম। অতি পূর্ব্বে উদয়পুর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিল। আগরতলাতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে উদয়পুর নগর লোকালয় শূন্য হইয়া বহুকাল ভীষণ অরণ্যে সমাচ্ছন্ন থাকে। তখন দিবাভাগেও হিংস্র ব্যাঘ্রাদি নির্ভয়ে বিচরণ করিত। ১০।১২ বৎসর হইল উদয়পুরে ত্রিপুরা রাজ্যের একটী মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি উদয়পুরে ক্রমে লোকালয় স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। উদয়পুরে একটী সুবৃহৎ সরোবর আছে। উহার পাড়ে

রাজ কর্ম্মচারীগণের ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের আবাস বাটী। এই দীর্ঘিকার পাড় ও তৎসন্নিহিত স্থান লইয়া বর্ত্তমান সহর প্রতিষ্ঠিত। দীঘির পাড়েই মহকুমার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বাটী ও কাছারী। একটু দূরে সরকারী ডাক্তারখানা ও তহশীল কাছারী।

আমরা সন্ধ্যার সময় কোন এক ভদ্র লোকের বাসায় গমন করিলাম। এখানে বারদীর পূজ্যপাদ ৺ব্রহ্ম চারীর এক বৃহৎ ছবি কোন এক ভক্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা মনোল্লাসে এখানে রাত্রি যাপন করিলাম। রজনী প্রভাত হইলে ভগবতী ৺ ত্রিপুরাসুন্দরীর নাম লইয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম, এবং প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করিয়া ৺ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺ ত্রিপুরাসুন্দরীর পাদপদ্ম দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। আমরা এখানে "পীঠ" সম্পর্কে কিছু কহিব। প্রজাপতি দক্ষালয়ে মহাসমারোহে যজ্ঞ ক্রিয়া হইতেছে। দেবগণ, ঋষিগণ, যজ্ঞ-ভূমিতে যোগদান করিয়া যজ্ঞের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই যজ্ঞে সকলই সমবেত হইয়াছেন একমাত্র শম্ভু যজ্ঞ দর্শনে বঞ্চিত আছেন। তাঁহার যজ্ঞ-দর্শনের নিমন্ত্রণ হয় নাই। শিবপত্নী সতী পতির অনুমতি-ক্রমে পিতৃভবনে যজ্ঞ দর্শনে গমন করিলেন। পিত্রালয়ে যাইতে দুহিতার আবার নিমন্ত্রণ পত্রের অপেক্ষা কি? সতীর আগমনে দক্ষপুরীর সকলই আনন্দিত হইলেন। স্বয়ং দক্ষ, প্রাণ-সমা কন্যাকে দর্শন করিয়া ক্ষণকাল মোহিত হইলেন; কিন্তু জামাতার প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা বশতঃ তিনি দুহিতার প্রতিও আর স্নেহ রক্ষা করিতে পারিলেন না। দক্ষ, দ্বেষ-মূলক শ্লেষ বাক্যে দেবাদিদেব মহাদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা সতী এই অচিন্তনীয় ঘটনা দর্শনে মৃত-সদৃশা হইলেন। তিনি পতিনিন্দা শ্রবণে শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া যজ্ঞ কুণ্ডে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া জগৎ-বাসীকে পতিপ্রেমের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। পত্নীর প্রাণত্যাগের কাহিনী শ্রবণ করিয়া পশুপতি শোকান্বিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কৈলাসধাম হইতে দক্ষপুরে আগমন করিয়া যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন এবং সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া "তাণ্ডব" আরম্ভ করিলেন। এই ভয়ঙ্কর নৃত্যে জগন্মণ্ডল প্রকম্পিত হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া জগৎ-পাতা বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এই এক এক খণ্ড যে স্থানে পতিত হইয়াছে অদ্যাপি সেই স্থান "পীঠ" ক্ষেত্র নামে মহাতীর্থে পরিগণিত। ৺সতীর দক্ষিণ চরণ ত্রিপুরায় পতিত হইয়াছে। তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী ৺ ত্রিপুরা-সুন্দরী। এসম্বন্ধে প্রাচীন কবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় অন্নদা-মঙ্গল গ্রন্থে গাহিয়াছেন :—

"দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়॥"

সুতরাং এই হিসাবে ৺ ত্রিপুরাসুন্দরীর বিশেষ মাহাত্ম্য আছে বলা যাইতে পারে। এবং এই তীর্থ যে মহাতীর্থ এরূপ বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না।

উদয়পুর সহর হইতে ৺ দেবীর মন্দির ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমরা পুকুরে স্নান করিয়া ৺ শিব লিঙ্গ দর্শন করিলাম। মঠের সম্মুখে একটী ছোট নাটমন্দির। নাটমন্দিরের সংলগ্ন স্থানে এক প্রাচীন দেবমন্দির দৃষ্ট হইল। যখন উদয়পুর ত্রিপুরার মহারাজগণের রাজধানী ছিল, তখন এইস্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার অর্চ্চনা হইত। চতুর্দ্দশ দেবতা, বর্ত্তমানে ত্রিপুরার রাজধানী "রাজধানী" নামক স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। অতি প্রাচীন কালে এই দেবতা, ত্রিপুরা-রাজগণ কর্ত্তৃত অতিসমারোহে পূজিত হইতেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তখন চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট নরবলি দেওয়া হইত। চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের উত্তর প্রান্তে আর একটী ছোট ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে। উহাতেই সম্ভবতঃ লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হইত। এসকল দেবতাবিহীন জীর্ণ মন্দির সকল দর্শন করিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হইল। আমরা এখানে আর বিলম্ব না করিয়া বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে রওনা হইতে লাগিলাম।

উদয়পুরের পূর্ব্ব গৌরব এখন লোক চক্ষুর অন্তরালে।

রাজধানীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরের গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছে। যিনি উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে সমর-কৌশলী রাজা বলিয়া মনে করি। এহেন স্থানে রাজধানী স্থাপন, তাঁহার সুগভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। আমরা উদয়পুরের বিবরণ কিছুই বিবৃত করিলাম না। যাঁহারা ইতিহাসপাঠে শ্রদ্ধান্বিত, তাঁহাদিগকে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺কৈলাস চন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

আমরা বেলা ৭।৮ টার সময় ৺ত্রিপুরা-সুন্দরীর মন্দিরে উপনীত হইলাম। এখানে আসিয়া আমরা শ্রীশ্রীদেবীর দর্শনে নয়ন-জীবন স্বার্থক করিলাম। দেবীর বাড়ীতে আসিয়াই চিত্তে কি এক গভীর ভাবের সঞ্চার হইল। এই স্থানটী এমনই নির্জ্জন, এমনই স্থানে অবস্থিত, এমনই ইহার প্রাকৃতিক গুণ যে, এখানে আসিলে চঞ্চল চিত্তও স্থির না হইয়া পারে না। অদ্য দীপান্বিতা। অদ্য ৺শ্যামাপূজার পক্ষে অতি প্রশস্ত দিন। আজ শ্রীশ্রী৺ত্রিপুরা-সুন্দরী মাতার বাড়ীতে বিশেষ সমারোহে পূজা সম্পন্ন হইবে। মধ্যাহ্ন-সময়ে ৺দেবীর পূজা হইল। ৺মায়ের বাড়ীর পার্শ্বে আম্র-কানন। মধ্যাহ্ন সময়ে একটী আম্র বৃক্ষের মূলে নীরবে একাকী বসিয়া যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার মূল্য অনেক। ফলতঃ এ সকল রমণীয় পুণ্য-ক্ষেত্রে আসিয়া কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলে স্থান-মাহাত্ম্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন তীর্থ ভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজন আছে কি না তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন অন্তরে স্থান পায় না। আমরা সংসার কোলাহল হইতে অত দূরে,—পর্ব্বত-শিখরে আসিয়াছি; এখানে আসিলে বস্তুতঃই ভগবচ্চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তার উদ্রেক হয় না। মনে হইল যেন কি এক নূতন দেশে আসিয়াছি—এখানে শোক-দুঃখের চিহ্ন মাত্র নাই। এখানে সকল বস্তুই যেন সজীব; সকলই যেন আনন্দরসে সিক্ত। রজনীযোগে ৺ দেবীর পূজা সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইল। দেবী ত্রিপুরা-সুন্দরীর মন্দিরটী প্রাচীন ১৫০১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্ম্ম-মাণিক্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ উক্ত মন্দিরের ক্ষোদিত লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। যথা,—

"আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধর্ম্মমাণিক্যদেবো।
যাগে যস্য হরীশঃ ক্ষিতিতল মগমৎ কর্ণতুল্যস্য দানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লোকমাত্রেঽম্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদরাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ সে দবৈঃ"।

এখানে দেবীপূজার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। মায়ের সেবার এক এক কাজের জন্য এক এক জন কার্য্যকারক বংশানুক্রমে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা বৃত্তিভোগী। তাঁহাদিগকে তজ্জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। প্রতিদিন মায়ের নিকট অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। অমাবস্যায় ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। দশমী তিথি ব্যতীত প্রতিদিন দেবীর নিকট ১টী করিয়া ছাগ দানের নিয়ম আছে।

শ্রীমণীন্দ্রকিশোর সেন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

সভাপতির অভিভাষণ—বাঁকীপুরের অধিবেশনে

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণের এক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিতেছি। 'অদ্য আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শুধু বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য গঠন করিলেই চলিবে না, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি উপায়ে জগতের অপরাপর দেশের বিদ্বজ্জনেরও আরাধ্য হইতে পারে তাহার চিন্তা করিতে হইবে'। 'বঙ্গসাহিত্য বলিলেই যাহাতে একটা বিরাট সাহিত্য বুঝায়, বিশ্বের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বুঝায়, এমন ভাবে বঙ্গসাহিত্যের গঠন করিতে হইবে।'

'ভাষার অমরত্বের এবং সর্ব্বত্র প্রসারের কারণ হইল, সম্পদ'। অতএব 'বাঙ্গলার মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেন, কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া মাতৃ-ভাষাতেই প্রকাশ পূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার

গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন'।

'বাঙ্গালাজাতির ইতরভদ্র সকলের মনে একবার কোন ক্রমে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আমার মাতৃভাষার অভ্যুদয়ের সহিত একসূত্রে আমার নিজের তথা মদীয় জাতির অভ্যুদয়ে গ্রথিত।' 'এই সময়ে ভুলিলে চলিবে না' যে, 'যতদিন.........বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্য্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর-ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়-প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্ব-সাহিত্যে অন্তর্নিবেশ অসম্ভব।"

সভাপতির আসন হইতে সাহিত্যের সাধারণ প্রয়োজন বিষয়ে কোন প্রস্তাব উপস্থাপিত করা সম্মিলনের সভাপতির উপযুক্ত কার্য্য। এই প্রস্তাবটি অবশ্য সম্মিলনের ক্ষেত্রে নূতন নহে। তবে স্যার আশুতোষ যদি তাঁহার অনন্যসাধারণ উদ্যম দ্বারা ইহাকে সফলতা প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার কৃতিত্ব থাকিবে।

স্যার আশুতোষের অভিভাষণে একটি গুণ সবিশেষ লক্ষণীয়। আমরা দেখিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভাপতিগণের অভিভাষণে বহু আধুনিক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক প্রশংসা দ্বারা, সভাপতি-পদোচিত নিরপেক্ষতার বিসর্জ্জন করা হইত। তাহাতে অনেকে উপযুক্ত না হইয়াও প্রশংসা পাইত, আবার কেহ উপযুক্ত হইয়াও অনাদৃত থাকিত। স্যার আশুতোষ একটিমাত্র স্থলে ছাড়া এ রীতির প্রশ্রয় না দিয়া বিচারকোচিত নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

শাখা-সমূহের অধিবেশন—সংবাদপত্রের বিবরণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মিলনে পরিচালন ব্যবস্থার কয়েকটি পরিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য। সম্মিলনের চারি শাখার যুগপৎ অধিবেশনের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে বাঁকীপুরে একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আমরা কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি। তথায় শাখাগুলির যুগপৎ অধিবেশনের পূর্ব্বে, এক বিজ্ঞান শাখা ব্যতীত অপর শাখাগুলির সভাপতিগণের অভিভাষণ সাধারণ সম্মিলনেই পঠিত হইয়াছিল। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ-গণ আপনাদের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছেন বলিয়া সংবাদ-পত্রে দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কি সম্মিলনের সাধারণ প্রতিনিধিগণকে একেবারে দূরে রাখিতে চান? এবারকার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইলে সম্মিলনের প্রতিনিধি সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

নিয়মাবলী—সম্মিলনের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণার্থ পাঁচ জনের * একটি নূতন সমিতি হইয়াছে। যে রীতিতে ইহার গঠন হইয়াছে তাহাতে ইহা টিকিবে কি না, সম্মিলনের পরিচালন-সমিতির সহিত এই সমিতির কি সম্বন্ধ হইল, এবং ঢাকার আগামী সম্মিলন কোন্ নিয়মাধীনে হইবে, তাহা এখনও বুঝা যায় না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে যাহাই স্থির হউক না কেন, যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তথাকার কর্ম্মীগণের স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আশা করি, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

* স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ও শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী।



প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩২৩ ফাল্গুন ১১শ সংখ্যা

পাপের শাস্তি।

যাহা পুণ্য নয় তাহাই পাপ এই বলিয়া পাপের লক্ষণ করিলে নৈয়ায়িক উপহাস করিবেন না, এমন নয়; কিন্তু ইহা অপেক্ষা পাপের কোন ভাল লক্ষণ করাও কঠিন। এই লক্ষণে ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই জানা; অথচ জানা বস্তুর যে লক্ষণ দেওয়া অনাবশ্যক তাহাও ঠিক। তথাপি আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দার্শনিকের চক্ষে না হউক, কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট পাপ-পুণ্য এমনই তরল জিনিষ যে, তাকে ন্যায়-সিদ্ধ লক্ষণের বজ্র-আঁটুনীতে বাঁধিয়া ফেলা কঠিন; আর ইতিহাসেও দেখিতে পাই, যদিও একটা পাপ ও আর একটা পুণ্য যে আছে, এ বিশ্বাস অনাদিকাল হইতে না হইলেও অনেক কাল মানব সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা পুণ্য, তাই নিয়া বহু মতভেদ ঘটিয়াছে। আর অন্যান্য জটিল দার্শনিক সমস্যার ন্যায় পাপ ও পুণ্য এই বিরোধের জন্মসম্বন্ধেও জগতের মনীষীগণের ঐকমত্য হয় নাই। অনেকে বলেন, কর্ম্মের মধ্যে পাপ ও পুণ্য এই যে একটা ভেদ আমরা করি, তাহা চিরকালই যে মানুষ করিয়াছে, এমন নয়। অতি আদিম অসভ্য জাতিদের মধ্যে এ ভেদ-জ্ঞান বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ; থাকিলেও, তত পরিস্ফুট নহে; আর ইতর জন্তুর মধ্যে, এ ভেদ একেবারেই নাই; এবং ইতর জন্তুর সহিত মানুষের পূর্ব্বপুরুষের সহিত পরপুরুষের সম্বন্ধের মত একটা সম্বন্ধ আজকাল মোটামুটি স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদ একটা চিরন্তন সত্য নয়। মানুষের সমাজে, একটা বিশিষ্ট অবস্থায়, কোনও এক সময়ে তার জন্ম হইয়াছে।

আবার কেহ ২ বলেন যে, পাপ-পুণ্যের ভেদ নিত্যবস্তু; বিশ্ব-সৃষ্টির ও বিশ্বরক্ষার মূলে ইহার স্থান; ভাল ও মন্দ নিয়াই জগৎ—এ উভয়ই জগতের জন্মকাল হইতেই বর্ত্তমান; এবং মন্দের ভিতর দিয়া, মন্দকে নিহত করিয়া—তাহাকেই উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিয়া জগতের গতি এক সুমহৎ উদ্দেশ্যের দিকে চলিয়াছে। আলো ও আঁধার যেমন, পাপ ও পুণ্যও তেমনই জগতের অস্থিমজ্জাগত ভেদ; ইহা রহিয়াছে বলিয়াই আমরা জগৎকে জগৎ বলিয়া চিনি।

ইহা হইতে একটা প্রাচীনতর বিশ্বাস জেন্দাবেস্তায় পাওয়া যায়। আলো ও আঁধার, দেব ও অসুর, ওর্মাজ্‌দ্ ও আহ্‌রিমান্‌

ঈশ্বর ও সয়তান—এ উভয়ের কলহ—এ উভয়ের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী লীলা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি, এ বিশ্বাসও প্রাচীন কালে কেহ ২ করিয়াছে।

জগতে পাপ ও পুণ্যের কলহ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; এখনও পাপ চাহে পুণ্যকে নিহত করিয়া ফেলে; এখনও পুণ্য আশা করে অন্তিমে তাহারই জয় হইবে। শিব ও অশিবের এই দ্বন্দ্ব অনেক কাল এই পৃথিবীতে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহা চিরকালই ছিল এবং ভবিষ্যতেও কালের সীমা পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, তাই নিয়াই মতভেদ।

পাপপুণ্যের জন্ম নিয়া যেমন, তাদের স্বরূপ নিয়াও তেমনই মতভেদ হইয়াছে। স্পার্টায় এক সময়ে মনে করা হইত, ধরা না পড়িয়া চুরি করিতে পারা পরম ধর্ম্ম—বীরের উপযুক্ত গুণ; মতের সঙ্গে মত না মিলিলে, জীয়ন্ত মানুষকে আগুণে পুড়াইয়া মারা খৃষ্টান ইউরোপে এক সময়ে স্বর্গকামীর কর্ত্তব্য মনে করা হইত; দেবতার নামে মেয়ে উৎসর্গ করিয়া দিয়া ব্যভিচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এখনও এদেশে স্থানে ২ পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এগুলিকে এখনকার শিক্ষিত নীতিজ্ঞান আর ভাল মনে করে না। নীতিজ্ঞানের এইরূপ পরিবর্ত্তনের উদাহরণ ইতিহাসে বিরল নহে। সুতরাং দেখিতে পাই, 'কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ'—কোন্‌টা পুণ্য আর কোন্‌টা পাপ, এই নিয়া ঐকমত্য অত্যন্ত দুর্লভ।

তবে, একটা বিষয়ে ইতিহাস মোটামুটি একই কথা বলিয়া আসিতেছে। ইতিহাস আরম্ভ হইবার আগের কথা ধরিতেছি না, যতদিন হইতে মানুষের ইতিহাস জানা যায়, তার মধ্যে মোটের উপর পাপ ও পুণ্যের একটা ভেদ যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা বোধ হয় ঠিক। কিন্তু কোন্‌টা পাপ ও কোন্‌টা পুণ্য এই বিষয়ে সকলে সকল সময়ে যখন এক কথা বলে নাই, তখন পাপ কি না জানা থাকিলে, পুণ্য কি বুঝান শক্ত, এবং পুণ্যের জ্ঞান না থাকিলে পাপের লক্ষণ দেওয়াও কঠিন।

কাজেই আমরা পাপের একটা পরিচ্ছিন্ন লক্ষণ নিয়া আরম্ভ করিতে পারিতেছি না। আমরা যে সময়ে লিখিতেছি তখন লোকের মনে পাপ ও পুণ্যের একটা ধারণা রহিয়াছে; আমাদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমরা ভাবিতে চাই. পাপের শাস্তির কথা; পাপের স্বরূপ বিচার করা আমাদের বর্ত্তমান চেষ্টার বাহিরে।

পাপের যে শাস্তি হয়, এ বিশ্বাস হারাইলে মানুষের সমাজের কি অবস্থা হইত, কল্পনা করা কঠিন; কারণ পাপ পুণ্যের ভেদ, যে দিন হইতে মানুষ করিতে পারিয়াছে, সে দিন হইতেই সে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, পাপীর শাসন হইবে। পাপী কি ভাবে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিবে কিংবা সে ভোগ হইতে সে মুক্তি পাইতে পারে কি না, তাই নিয়া জগতে মতভেদ দৃষ্ট হয়; কিন্তু পাপের যে একটা কুফল আছে, সে বিষয়ে ধর্ম্মজগতে দ্বিমত নাই।

আমাদের পূর্ব্বমীমাংসা হয় ত বলিবেন, কর্ম্মই কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে সমর্থ; পাপ করিয়া থাকিলে তাহার ফল নষ্ট করিবার জন্য পুণ্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। জড়জগতে যেমন দুইটী বিরোধী শক্তি পরস্পরকে বিনষ্ট করিতে পারে, রসায়নে যেমন একটী বস্তুর ক্রিয়া অন্য একটী বিরোধী বস্তুর ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দিতে পারে,—বিষের ক্রিয়া যেমন ঔষধ নষ্ট করিয়া দেয়, তেমনই পাপের ক্রিয়া,—তাহার কুফল,পুণ্যই নষ্ট করিতে সক্ষম। বেদান্ত আবার তার চেয়েও উপরে উঠিয়াছেন; পাপ এবং পুণ্য উভয়ই কর্ম্ম; শুধু পাপের নয়, সমস্ত কর্ম্মের ফল ধ্বংস করিয়া দেয় জ্ঞান। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'; ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম আপনাহইতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।' ব্রহ্মকে যিনি দেখিতে পান সেই জ্ঞানী পুণ্যপাপ অতিক্রম করিতে পারেন। কর্ম্মমাত্রের ফল, সুতরাং পাপেরও ফল ধ্বংস করিবার প্রকৃষ্ট উপায় জ্ঞান।

পুণ্যাচরণ ও জ্ঞান ছাড়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার অন্য উপায়ও কথিত হইয়াছে। ভগবানে ভক্তি এবং তাঁহারই প্রেরিত, তাঁহারই অংশে জাত যীশুতে বিশ্বাস পাপমুক্তির একমাত্র উপায়, খ্রীষ্টান জগতে এ ধারণা অত্যন্ত প্রবল।

ভক্তিতে যে মুক্তি হয়, ধর্ম্মের খনি ভারতে এমতও উপেক্ষিত হয় নাই। ভগবানে একান্ত অনুরক্তি ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন।

পাপী যে শুধু নিজের চেষ্টায়,—কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি দ্বারাই পাপ হইতে উদ্ধার পাইবে এমনও নয়। পাপীর তারণের নিমিত্ত যুগে ২ যে মহাত্মাদের আবির্ভাব হয়, কিংবা স্বয়ং ভগবান্ মানুষ বেশে মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন, ইহাও জগতের একটী প্রাচীন বিশ্বাস। ইহুদীদের মধ্যে একের পর আর ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে; পাপে সমাচ্ছন্ন ইহুদী জাতির উদ্ধারের জন্য, তাহাদিগের মুক্তির পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত, স্বয়ং ভগবান্ ইঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন; তাহাতেও এ জাতির উদ্ধার হয় নাই, তাহাতেও ইহারা ইহাদের কল্পিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পর একজন সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ মহাপুরুষ, একজন 'মেসায়া' আসিবেন, এই ভরসায় ইহারা বসিয়া আছে।

ইহুদীরা যে ত্রাণ-কর্ত্তার আশায় বসিয়া আছে, ঈশ্বর বহুবার তাহাদিগকে যে ত্রাণ-কর্ত্তার আশা দিয়াছেন, খ্রীষ্টানেরা যীশুতে সেই পরিত্রাণের কর্ত্তা লাভ করিয়াছে।

ভারতেও একবার নয়, দুইবার নয়, দশ দশ বার ভগবান্ মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়াছেন। তবে, ভারতে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য বোধ হয় পাপীর উদ্ধার নয়, তার বিনাশ। গীতায় ঈশ্বর বলিতেছেন, 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' ভগবানের আবির্ভাব হইতে সাধুরই পরিত্রাণ হইবে, পাপীর হইবে বিনাশ।

মানবজাতির উদ্ধারের জন্য ভগবানের অবতরণে এই যে বিশ্বাস, মুসলমান-ধর্ম্মও তাতে ন্যূনাধিক সায় দিয়াছে। খ্রীষ্টানেরা যেমন যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র স্বীকার করিয়াছেন, যীশু হইতে, তাঁহারই মধ্যস্থতায় মুক্তি হইবে এরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, মুসলমানেরা মহম্মদকে সেরূপ মধ্যস্থ মনে করেন নাই বটে; কিন্তু মহম্মদ জগতের সর্ব্বশেষ মহাপুরুষ এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথই চরম সত্য ও গরিষ্ঠ পন্থা, ইহা মুসলমানদের প্রধান বিশ্বাস।

এত সব পন্থা সত্ত্বেও, যে পাপীর উদ্ধার না হইবে, ইহার কোনও একটীকেও, যে পাপী গ্রহণ না করিবে, তাহার পাপ-ভোগ কিরূপে হইবে? খ্রীষ্টান মুসলমান ও ইহুদী, ইহাদের সকলেরই বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের প্রদর্শিত পথ যে গ্রহণ না করিবে, তাঁহার ধর্ম্ম যে অনুসরণ না করিবে, তাহার অদৃষ্টে চিরন্তন নরক। এই দেহ ত্যাগ করিয়াই পাপীর আত্মা নরকে প্রবেশ করিবে, আর অনন্তকাল সেখানে বিবিধ যন্ত্রণায় সে পাপের ফল ভোগ করিবে। এই ভীষণ বাসস্থানের বর্ণনা সাহিত্যের এক অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে; ইতালীর জগদ্-বিখ্যাত কবি দাঁতের অন্যতম কাব্যই এই নরক-বর্ণনা নিয়া। হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্যেও এই নরকের নানাবিধ ভীষণ চিত্র পাওয়া যায়; সেখানে বোধ হয় নরকের সংখ্যাও অন্য সাহিত্যের চেয়ে বেশী। অন্যূন চৌরাশিটী নরক বিবিধ প্রকার পাপীর বিবিধ পাপের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু নরক ছাড়া অন্য প্রকারেও পাপের ভোগ হইতে পারে, হিন্দুর কল্পনায় ইহাও দেখা যায়। জন্ম হইতে জন্মান্তর, দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণও পাপভোগেরই প্রকারান্তর। অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, কীট দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ দেহ পর্য্যন্ত, নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া আত্মা নিজের দুষ্কৃতেরই ভোগ করে।

পাপের ভোগই তাহার শাস্তি। বিহিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মুক্তি না হইলে পাপের শাস্তি যে হইবেই, এ বিশ্বাস সুতরাং অতি প্রাচীন। কিন্তু এই বিশ্বাসের সহিত আর একটী বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত; সেটী পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

ভ্রম যেমন ক্রমে অপনোদিত হয়, সত্য বস্তুর জ্ঞানও তেমনই ক্রমেই জন্মিয়া থাকে, সমস্ত বস্তুর জ্ঞানে পূর্ণ একটী মন নিয়া মানুষ এ পৃথিবীতে আসে না। সুতরাং কোনও এক বিষয়ের জ্ঞান, কি অবস্থায় মানুষ লাভ করে, এই প্রশ্ন তুলিলেই সেই বস্তু যে অসত্য এরূপ ইঙ্গিত করা হয় না। পরলোকে বিশ্বাস কখন কি অবস্থায় মানুষের মনে জন্মিল, মনীষীদের গবেষণায় ইহাও একটী প্রশ্ন; কিন্তু এই

প্রশ্ন তোলার অর্থই এ নয় যে, ইহা একটী নিতান্তই ভ্রান্ত বিশ্বাস। পণ্ডিতেরা জানেন যে, পরলোকে বিশ্বাস মানুষের মনে চিরকালই ছিল না। ফরাসী পণ্ডিত রেঁনা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পরলোকে একান্ত আস্থাবান্ ইহুদীদের মধ্যেও কোনও একটা বিশিষ্ট সময়েই এ বিশ্বাসের অভ্যুত্থান হয়।

পাপের যে শাস্তি হইবেই এ বিশ্বাসের সহিত পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসের অতি নিকট সম্বন্ধ। তথাপি, পরলোকের অস্তিত্বে মানুষ কখন বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল, এ প্রশ্ন আমরা তুলিতে পারি; এবং আমরা জানি যে, ব্যক্তি বা জাতি যখন দেখিতে পায় যে, এ পৃথিবীতে পাপের শাস্তি হইতেছে না, অথচ পাপের যে শাস্তি হইবে এ বিশ্বাসও সে যখন কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না, তখনই সে মনে না করিয়া পারে না যে, এখানে যাহা হইল না অন্যত্র তাহা হইবেই। কিন্তু 'অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে'—পাপ পুণ্যের ফল ইহলোকেই যে মানুষকে ভোগ করিতে হয়, ইহাই বোধ হয় প্রাচীনতর বিশ্বাস। বাইবেলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের ঐহিক ধন-দৌলত, শারীরিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি পুণ্যের লক্ষণ, আর দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখ পাপের ফল,—এ বিশ্বাস হিন্দুর সাহিত্যে যেমন পাওয়া যায় বাইবেলেও তেমনি পাওয়া যায়। 'রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ, আত্মাপরাধ-বৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্।' রোগ, শোক প্রভৃতি নিজেরই অপরাধের ফল। হিন্দুর এ বিশ্বাস এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, কোন্ পাপে কোন্ রোগের উৎপত্তি হয় এবং কোন্ রোগের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত, তাহা পর্য্যন্ত সংহিতাদিতে বিবেচিত হইয়াছে। বাইবেলেও জবের উপাখ্যান প্রভৃতিতে ঐ একই বিশ্বাস বর্ত্তমান রহিয়াছে। জবের প্রচুর সম্পত্তি, তাহার সুস্থ ও সবল সন্তান সন্ততিতে ঘর ভরা, মেষাদি পশুর তাহার অভাব নাই, গোলাঘরে তার শস্য ধরে না; সকলেই জানে জব্ পরম ধার্ম্মিক; সে উপাসনা না করিয়া জল গ্রহণ করে না,—ঈশ্বরে তাহার পরম ভক্তি। এবং এই ভক্তি রহিয়াছে বলিয়াই তাহার এত সুখের আয়োজন। কিন্তু যখন সয়তানের পরামর্শে জবের পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার সুখের আয়োজন সমস্তই একে একে কাড়িয়া নেওয়া হইল,—যখন তাহার নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যটুকু পর্য্যন্ত দূর হইল, যখন দারুণ কুষ্ঠের যন্ত্রণায় জব্ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তখন তাহার বান্ধবেরা আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেন, 'জব্, তোমার বহু পুণ্য আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন উৎকট পাপ তুমি করিয়াছ, তা না হইলে তোমার এ শাস্তি কেন?' পাপের শাস্তিতে বিশ্বাস যেমন প্রাচীন, ঐহিক সুখ-দুঃখেই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল ভোগ হয়, এ বিশ্বাসও তেমনই প্রাচীন।

কিন্তু বর্দ্ধমান অভিজ্ঞতার সহিত মানুষ দেখিতে পাইল যে, সব সময় এ জগতেই পাপ পুণ্যের বিচার হয় না। দারিদ্র্য এখন আর পাপের ফল নয়, রোগের যে কারণ বিজ্ঞান বাহির করিতেছে তাহাতে পাপের চেয়ে কীটাণু-বিশেষেরই সহায়তা বেশী; আর সমাজের অভিমত পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলেই ধনবান্ হওয়া যায় না; এবং ধার্ম্মিকেরও রোগ শোক অনিবার্য্য। ঐহিক সুখদুঃখের সহিত পাপ-পুণ্যের যে একটা নিকট সম্বন্ধ আগে কল্পনা করা হইত, এখন আর তাহা স্বীকৃত হয় না। অবশ্যই এখনও আমরা এ বিশ্বাস একেবারেই হারাই নাই; এখনও আমরা বিশ্বাস করি, পাপের একটা অনুশোচনা আছে, এবং সেই পরিমাণে অন্ততঃ পাপ কষ্ট দিয়া থাকে; এবং অমিতাচার প্রভৃতি অপুণ্যের অনুষ্ঠান হইতে অসুখের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু বন্যা কিংবা ভূমিকম্প কিংবা মহামারী যখন দেশশুদ্ধ লোকের দুঃখ উৎপাদন করে, তখন তাহা তাদের পাপেরই ফল এরূপ মনে করা আজ কাল কষ্টকল্পনা। তা ছাড়া, প্রবঞ্চনা চৌর্য্য প্রভৃতি যে গুলিকে সমাজ একবাক্যে অন্যায় স্বীকার করে, সে সমস্ত উপায় দ্বারাও যে ধন প্রভৃতি সুখের আয়োজন লাভ করা যায়, ইহাও আমরা চক্ষের সাম্‌নে অহরহঃ দেখিতেছি। সুতরাং ঐহিক সুখ-দুঃখেই যে পাপ-পুণ্যের

চূড়ান্ত বিচার হয় না, এ বিশ্বাস ক্রমশঃ মানুষের না হইয়া পারে না। যাহা এখানে হইল না, অথচ যাহা না হইয়া পারে না, নিশ্চয়ই তাহার জন্য অন্য স্থান ও সময় রহিয়াছে। সুতরাং পরলোকেই পাপ পুণ্যের শেষ বিচার হইবে। অনেকে বলেন, এই রূপে মানুষ পরলোকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে। পাপ-পুণ্যের ভবিষ্যৎ বিচারের জন্য একটী পরলোক প্রয়োজন,—পরলোকের অস্তিত্বের পক্ষে ইহা একটী প্রধান যুক্তি।

ইহলোক পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার পুরা মাত্রায় দিতে পারে না, ইহা যখন মানুষের অনুভবে আসিল, তখন হইতেই তাহার মনে ইহলোকের প্রতি একটা অনাস্থা জন্মিল। সর্ব্বত্র না হইলেও অনেক জায়গায়ই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের মূলে যে এই প্রবল অনাস্থা রহিয়াছে তাহা ঠিক। সন্ন্যাসী মনে করেন, লোক-সমাজ পাপপুণ্যের ঠিক বিচার করিতে পারে না; মানুষের পরীক্ষার নিমিত্তই ভগবান্ তাহাকে এই সংসারে প্রেরণ করেন; বুদ্ধিমান্ যে, সে সংসারের গোলকধাঁধাঁ হইতে মুক্তির জন্য সহজেই ইহা হইতে সরিয়া পড়ে; আর, অবিবেকী সহস্র আবর্ত্তে ঘুরিয়া, সহস্র বন্ধনের দুঃখ ভোগ করিয়া তবে আসল পথ ধরিতে পায়। তুমি আমি যারা সন্ন্যাসী নই, তারাও অল্পবিস্তর বুঝি যে, সমাজে পাপপুণ্যের ষোলআনা বিচার হয় না; তবে আমরা যে সমাজ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হই না তাহার কারণ, আমাদের এ বিশ্বাস প্রবলভাব ধারণ করে নাই,—সংসারের প্রতি আমাদের অনাস্থা আংশিক মাত্র; ইহা যে সৎকর্ম্মের পুরস্কার একেবারেই দিতে পারে না, এ বিশ্বাস আমরা করি না।

প্রাচীনকালে মানুষ বিশ্বাস করিত যে, দেবতার স্পষ্ট-কর্ত্তৃত্বে কিংবা তাঁহারই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মানব জীবনের সকল সুখদুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই জন্যই প্রথম যখন মানুষ ভরসা করিত যে, ঐহিক দুঃখে বা সুখেই পাপপুণ্যের শাস্তিপুরস্কার হয়, তখন সে ইহাও বিশ্বাস করিত যে, দেবতার কর্ত্তৃত্বেই তাহা সম্পন্ন হয়। ঈশ্বর স্বয়ং রোগশোক দ্বারা পাপীর শাস্তি দেন, এবং সুখসম্মান দ্বারা স্বহস্তে পুণ্যের পুরস্কার করেন। কিন্তু ক্রমে মানুষের কর্ত্তৃত্বাভিমান যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, তখন সমাজ মনে করিতে লাগিল যে, তাহার পাপপুণ্যের বিচার করিবার শক্তি আছে, এবং ব্যক্তিও তখন আশা করিতে লাগিল যে, সমাজই এ বিচার করিবে। এখন আমরা ইহলোকে পাপ-পুণ্যের যে বিচার আশা করি তাহা সমাজের বিচার, বিচারাধি-করণে সমাসীন স্বয়ং ঈশ্বরের বিচার নহে।

পাপপুণ্যের সম্পূর্ণ বিচার করিতে পারে না বলিয়া সকলেরই যদি সংসারের প্রতি একান্ত অনাস্থা হইত, তাহা হইলে সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়িত। সমাজ যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ না হইলেও পাপপুণ্যের কতকটা বিচার সমাজ করিতে পারে, লোকে এ বিশ্বাস হারায় নাই। আমরা এখনও বিশ্বাস করি, সম্পূর্ণ না হইলেও পাপের কতক শাস্তি এবং পুণ্যের কতক পুরস্কার এ পৃথিবীতেই হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সমাজের নিকটই আমরা আশা করি যে, সে পাপপুণ্যের বিচার করিবে এবং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি দিবে; এবং, সমাজ যেখানে অপারগ হয় সেখানেই আমরা পরলোকের ভরসা করি। এখানে যাহা অপুর্ণ থাকে তাহারই জন্য পরলোক —এখানে যাহার শাস্তি বা পুরস্কার হইল না, পরলোকে তাহার তা ঘটিবে, ইহা সাধারণের দ্বিতীয় বিশ্বাস।

সুতরাং দেখিতে পাই, পাপের শাস্তি আমরা প্রধানতঃ সমাজের বিচার হইতেই আশা করি। যে দিন হইতে মানুষ পাপের শাস্তিতে বিশ্বাস করিয়াছে, সে দিন হইতেই সে ইহলোকেই এই বিচার আশা করিয়া আসিয়াছে। ইহ লোকে সম্পূর্ণ বিচার পায় নাই বলিয়াই, পরলোকের ভরসা তাহার মনে এত দূর দৃঢ় হইয়াছিল। তথাপি এখনও ইহলোকের বিচারে মানুষ একেবারে নিরাশ হয় নাই; এখনও আমরা ভরসা করি সমাজ পাপের শাস্তি দিবে। কিন্তু সমাজ কি পাপের শাস্তি সম্যক্ দেয়?

সমাজ যে কোন কোন পাপের শাস্তি দেয়, তাহা একটী স্থূল সত্য। চুরি করা পাপ, চুরি করিলে সমাজ শাস্তি দেয়। পরের অনিষ্ট করা পাপ; যে করে সমাজ যথাসম্ভব তাকে শাস্তি

দিয়া থাকে। সমাজের শাস্তি যারা ভোগ করে কয়েদ-খানা তাঁদের স্থান। কিন্তু সমাজ যাহা যাহা পাপ মনে করে সে সমস্ত গুলির শাস্তি দিতে পারে কি না সন্দেহ এবং কি উদ্দেশ্যে এবং কি অধিকারে ব্যক্তিকে সে শাস্তি দেয়, তাহাও একটী আলোচ্য বিষয়।

সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর সম্বন্ধ একটী জটিল বিষয়; এবং এই সম্বন্ধের ফলে অবস্থাবিশেষে ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার যে অধিকার সমাজের আছে, তাহাও একটী জটিল বিষয়। সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও আত্মরক্ষার কথা সর্ব্বাগ্রে ভাবিতে হয়। আর, সমাজের অনিষ্ট ব্যক্তির স্বতন্ত্র বা সমবেত চেষ্টা দ্বারাই উৎপাদিত হয়; সুতরাং অনিষ্টকারী ব্যক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার সমাজের আছে। যাহারা পাপ করে, যাহারা অন্যের দ্রব্য লুণ্ঠন করে কিংবা অন্য উপায়ে পরের অনিষ্ট করে, তাহারা সমাজেরই অনিষ্ট করে; সুতরাং সমাজ আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে দমন করিতে বাধ্য। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিতও যদি ব্যক্তির সেই সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে সমাজ যে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় এই বিষয়ে বিশেষ কোন জটিলতা থাকিত না। কিন্তু সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ আরও বিস্তৃত। আত্মরক্ষা যেমন সমাজের করণীয়, ব্যক্তির রক্ষাও তেমনই সমাজেরই কর্ত্তব্য। ব্যক্তি আশা করিতে পারে যে, সমাজ তাকে সুপথে চালিত করিবে, তার সর্ব্ববিধ উন্নতির সুবিধা করিয়া দিবে। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে সাজা দিলেই সমাজের কর্ত্তব্য ষোলআনা সম্পাদিত হইল না।

সমাজে ত সকলই আর পাপ করে না; অনুসন্ধানে জানা যায়, পাপ-প্রবণতাটা কোনও এক শ্রেণীবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সবদেশেই সমাজের শাস্তি যারা ভোগ করে, তাদের সংখ্যা উচ্চশ্রেণীর চেয়ে নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী; অথচ এই উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভাগ সমাজেরই কৃত কর্ম্ম। ধনীর চেয়ে নির্ধনেরই সাধারণতঃ চুরি করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। অথচ এই ধনী-নির্ধন ভেদের জন্য সমাজ সম্পূর্ণ না হইলেও কতক অংশে দায়ী; অসভ্যদের মধ্যে এই ভেদ অত্যন্ত কম, প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে এই ভেদ ছিল কি না সন্দেহ; আর, আধুনিক হিসাবে যে সমাজ যত উন্নত, তার মধ্যেই এই ভেদ তত বেশী; সুতরাং ধনীনির্ধনের তারতম্যের জন্য সমাজ একেবারেই দায়ী নয় এমন নয়। এবং এই জন্যই, নির্ধনের যে কোনও এক বিশিষ্ট পাপ করিবার ইচ্ছা হয়, তার জন্যও সমাজ দায়ী। চোরের মনে সমাজই চুরি করিবার ইচ্ছা উৎপাদন করে; এর পরে তাহাকে শত্রু মনে করিয়া কেবল শাস্তি দেওয়া সমাজের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত নহে। খুনী, ডাকাত প্রভৃতি অন্যান্য পাপীর পাপচিকীর্ষার জন্যও অনেকে আজকাল সমাজকেই মূলতঃ দায়ী করিয়া থাকেন। সুতরাং পাপীর শাস্তি দেওয়ার বেলায় সমাজ বাহিরের একজন শত্রুর সহিত ব্যবহার করিতেছে, এরূপ মনে করিলে চলিবে না। পাপীও সমাজের অন্তর্ভুক্ত একজন; অন্য দশ জনকে যেমন শিক্ষা ও আচারের শাসন দ্বারা সমাজ নিজের মনের মত গড়িয়া লয়, পাপীকেও তেমনই করা উচিত। পাপী যদি দশ জনের মত না হয়, তবে তাহা সমাজেরই অকৃতকার্য্যতা। নিজের অকৃতকার্য্যতার জন্য অন্যকে শত্রু মনে করা ভুল। সমাজের মনীষীগণ এখন ইহা বুঝেন ও স্বীকার করেন।

সামাজিক শাস্তির মূলে প্রতিহিংসা কোন দিনই বর্ত্তমান ছিল না, এমন নয়। আগে কোন ২ দেশে চুরি করিলে চোরের ডান হাত কাটিয়া ফেলা হইত; খুনীর ফাঁসির ব্যবস্থা এখনও প্রায় সব দেশেই রহিয়াছে। ইহুদীরা যে বলিত 'চোখের বদলে চোখ, এবং দাঁতের বদলে দাঁত, এবং জীবনের বদলে জীবন', তাহাই ছিল সামাজিক শাস্তির প্রাচীন মূলমন্ত্র। কিন্তু এখন আমরা ব্যক্তির প্রতি সমাজের একটা কর্ত্তব্য স্বীকার করি। প্রাকৃতিক অবস্থায় একজন মানুষ আর এক জনের অনিষ্ট করিলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি যেমন প্রতিহিংসাচরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইত, সমাজকে সেরূপ করিতে দেখিলে এখন আর আমরা সন্তুষ্ট নই। তবে, সমাজ যে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়, তার অর্থ কি?

সমাজ এখন শাস্তি দিবার বেলায় দুইটী উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখে। প্রথমতঃ শাস্তিকে এখন শিক্ষারই উপায়ান্তর মনে করা হয়। কুপথে যে চলিয়াছে তাহার পথ যে সুপথ নয়, ইহা তাহাকে বুঝাইবার জন্যই শাস্তির প্রয়োজন; সে জানুক যে, ঐ পথে বহু কণ্টক। তাহাকে ঐ পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা। পাপীর সংস্কারই সুতরাং শাস্তির প্রয়োজন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যের মনে পাপের বিভীষিকা জাগাইয়া দিয়া অন্যকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা সমাজের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। যারা পাপ করে নাই অথচ পাপ করিতে পারে, পাপীকে শাস্তি দিয়া সমাজ তাহাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে পাপের কুফল কি। এই ভাবে মানুষ পাপকে ভয় করিতে না শিখিলে পাপ দমন করা কঠিন। শাস্তি দিবার বেলায় সুতরাং ভবিষ্যৎ পাপের নিবারণ সমাজের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

তথাপি, প্রতিহিংসা করিয়া আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যটীও একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও সমাজ বলিতে যায়, 'যে ব্যক্তি দ্বারা আমার অনিষ্ট হয় সে আমার শত্রু; শত্রুর প্রতি হিংসা না করিলে আত্মরক্ষা অসম্ভব।' ব্যক্তিমাত্রই ন্যূনাধিক সদসৎ বিবেচনার অধিকারী; সমাজই এই বুদ্ধির স্রষ্টা নয়। অথচ এই বিবেচনা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অসৎ আচরণ করিবে, সে কেন শাস্তি ভোগ করিবে না? আত্মোন্নতির পথে তাহাকে সহায়তা করা সমাজের কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু সমাজ তার কর্ত্তব্য ষোল আনা সম্পাদন করিতে পারিল না বলিয়াই যে, ব্যক্তি তার অনিষ্ট করিবে এমন কোন যুক্তি নাই। দরিদ্র পিতা সব সন্তানের সমান শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন না; কিন্তু তাই বলিয়া যে সন্তান পিতৃহন্তা হইতে চায়, তাকেও গৃহে স্থান দিতে হইবে, এমন নয়। তা ছাড়া সমাজ যে নিজের কর্ত্তব্য একেবারেই অবহেলা করে এমনও নয়। যারা পাপ করে না তারা যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, পাপীও সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। অন্য দশজনের দৃষ্টান্তে পাপী যদি নিজকে শোধরাইতে না পারে, তবে সে নিজেই তার জন্য দায়ী; সমাজ কেন তাহার সহিত শত্রুর মত ব্যবহার না করিবে?

যে উদ্দেশ্যেই হউক, সমাজ যে পাপীকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করে, ইহা সত্য। এই চেষ্টা যদি সমাজের না থাকিত, তাহা হইলে সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া পড়িত। সমাজ পাপের দণ্ড দিতে পারে এবং সেই পরিমাণে পুণ্যের পুরস্কার করিতে পারে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে বলিয়াই আমাদের নীতি-জ্ঞানের সহিত সমাজের কতক পরিমাণে অন্ততঃ সামঞ্জস্য রহিয়াছে; এবং সেই জন্যই পাপ-পুণ্যের বিরোধ ও পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করিয়াও আমরা সমাজে অবস্থিতি করিতে পারিতেছি। যদি এমন হইত যে, সমাজ একেবারেই পাপের শাস্তি দিতে পারিত না, তা হইলে, হয় আমরা পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করিতাম না, কিংবা সমাজ ত্যাগ করিতাম।

কিন্তু তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মানুষের সমবেত নীতিজ্ঞান যাকে অন্যায় মনে করে, তাহা এখন, পর্য্যন্তও সব সমাজে অবাধে চলিয়া আসিতেছে; শুধু তাই নয় অনেক স্থানে পূজার আসন পর্য্যন্ত লাভ করিতেছে। স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা, পরের অনিষ্ট করা প্রভৃতি যে গুলিকে আমরা অন্যায় মনে করি, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে২ সেগুলি কোন সমাজ হইতেই একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই; বরং একটু সভ্য বেশ ধারণ করিয়া ইহারাই সমাজে আধিপত্য করিতেছে। আমরা চোখের সামনে সর্ব্বদা দেখিতে পাই, অর্থের প্রভুত্ব কত টুকু; সমাজের শাসন অনুসারে আমরা সর্ব্বদাই ধনবান্‌কে বড় মনে করিতে বাধ্য। কিন্তু এই ধন বহু উপায়ে অর্জ্জিত হইতে পারে; অথচ ধনবান্‌কে সম্মান করিবার সময় সমাজ এই উপায়ের দিকে বড় দৃকপাত করে না। সমাজের চক্ষে ধনের প্রাচুর্য্যে যার জীবন সফলতা লাভ করিয়াছে, ইতিহাস তার অনেক পাপ মুছিয়া ফেলে। সমাজ এইখানে পাপের যে শুধু শাস্তি দেয় না, তা নয়, পাপের নিন্দা করিতেও ভুলিয়া যায়। আর, অনবরতই যে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যায়, সমাজে যার কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা আছে সেই জানে, সে কখনও বড় হইতে পারে না। ছোটকে সচ্চরিত্র বলিয়া বাছিয়া নিয়া সমাজ প্রশংসা করিতেও ভুলিয়া যায়। মুখে যাহাকে পুণ্য বলা হয়, সমাজ কার্য্যে এখানে তাকে পুরস্কৃত করা দূরে থাকুক

প্রশংসাও করে না।

পাপপুণ্যের বিচারে সমাজের এই অক্ষমতা অনেক কাল নীতিতত্ত্বের চক্ষে ভাসিতেছে। পুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিতে অসমর্থ হইয়া তাই কেহ ২ সমাজের উপর বিরক্তির সহিত বলিয়াছেন 'পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার।' সমাজের পুরস্কারকে তুচ্ছ মনে করিবার উদাহরণ ইতিহাসে বহু রহিয়াছে। কিন্তু এই তুচ্ছ মনে করায় ফল কি? যাঁরা তুচ্ছ করেন তাঁরাই সংখ্যায় কম, তাঁরাই সমাজে অকৃতকার্য্য, তাঁরাই সমাজের অবহেলার পাত্র। সংসার-প্রবেশেচ্ছু মানব যখন তাঁদের উপদেশ শুনিবে, তখন না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না, কারণ তাঁদের উপদেশ ত সাফল্যের পথ নয়।

ভবিষ্যতে, মৃত্যুর পরপারে পুরস্কার লাভ ঘটিবে এই আশায় পুণ্যাচরণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন। এ জগতে পুণ্য নিষ্ফল হইল বলিয়া নিরাশ হওয়া উচিত নহে, একদিন না একদিন তার পুরস্কার হইবেই,—ধর্ম্ম পৃথিবীকে এ কাহিনী অনেক বার শুনাইয়াছে; কিন্তু কই, তাতে ত সমাজের গতি ফিরে নাই। সাধারণ মানুষ মনে করে, আমি কর্ম্ম করিব এই খানে, আমাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে এই খানে, আমাকে বহুকাল সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে এইখানে; অথচ যে কাজ এখানে সুখ দিতে পারে তাহা না করিয়া কবে, কোন্ অজানা দেশে সুখ ঘটিবে এই আশায় বর্ত্তমানে অসুখকর কার্য্য কেন করিব? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

তাই বর্ত্তমানে আবার এক নূতন শক্তিবাদের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। নীট্‌চে প্রভৃতি বলিবেন, যে উপায়ে জীবনে সাফল্য হয় তাহাই নীতি। প্রভুত্ব, শক্তি ও প্রাচুর্য্যে যে উপায়ে জীবনকে পূর্ণ করা যায় তাহাই নীতি। সব রকমে, শারীরিক, ও আর্থিক সম্পদে, যে উপায়ে বড় হওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম। যে উপায়ে মানুষ ছোট হইয়া যায়, যে উপায়ে মানুষকে হেয় করিয়া দেয়, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সেই উপায়; এ গুলি সুতরাং অধর্ম্ম।

দুই হাজার বৎসরের উর্দ্ধকাল মানুষের সমাজ মুখে ধর্ম্মকে বড় বলিয়া কার্য্যে অনেক অধর্ম্মের পূজা করিয়া আসিয়াছে; আজ তাহার জবাবদিহির সময় উপস্থিত! আজ সমাজকে স্থির করিতে হইবে, সে যাহা যাহা পাপ মনে করে, আপ্রাণ যত্নে সে সমস্তের শাস্তি দিবে কি না। এতকাল ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দার্শনিক আশায় ২ ছিলেন, ক্রমে সমাজ আপনাকে শোধরাইয়া লইবে; ক্রমে সমাজ হইতে সব পাপ দূর হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সমাজ ঘুণাক্ষরেও পাপের পুরস্কার করে, সে পর্য্যন্ত পাপ মরিবার নয়। তাই আজ সমাজকে স্থির করিতে হইবে যাহাকে পাপ মনে করা হয়, তাহার বিচার ও শাস্তির জন্য সে প্রস্তুত কি না। পরলোক কিংবা ইহলোকেরই ভবিষ্যতের আশায় আর কত কাল বসিয়া থাকা চলে? যদি সমস্ত পাপের শাস্তির জন্য সমাজ প্রস্তুত না হয়, তাহা হইলে, তাকে তার পাপ-পুণ্যের ধারণা আবার নূতন করিয়া দেখিয়া কিছু ২ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। নীতিজ্ঞান ও জীবনের কর্ম্মের মধ্যে যে একটা জোড়াতালির সম্বন্ধ এত কাল ছিল, এখন আর তাহা টিকিবে কিনা সন্দেহ।

ইউরোপের বর্ত্তমান সমর আজ এই সমস্যাকে বিশেষ ভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। ছোটর অধিকার সম্বন্ধে সমাজ অনেক কাল অনেক মধুর কথা বলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কার্য্যে দুর্ব্বলকে নিষ্পেষিত করিতে সবল কখনও ভুলিয়া যায় নাই; এবং সবলের উপাসক সমাজ সে জন্য সবলকে কদাচিৎ শাস্তি দিতে চেষ্টা করিয়াছে; এমন কি, ইতিহাস স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সে জন্য সব সময় সবলকে নিন্দাও করা হয় নাই। আজ সবল, স্পষ্ট কথায় বলিতে যায়, দুর্ব্বল হওয়াই অধর্ম্ম, কারণ তাহার ফল কষ্টভোগ। এখন সমাজ হয় সবলের এই নূতন নীতি গ্রহণ করিবে, নয় এত কাল যাহা যাহা পাপ মনে করিয়া আসিয়াছে, নূতন করিয়া সে সমুদয়ের শাস্তির বিধান করিবে।*

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

"মীন-চেতন"-প্রসঙ্গ।

অল্প দিন হইল, বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সম্পাদকতায় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শ্যামদাস সেনের ভণিতা-যুক্ত "মীন-চেতন" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পুথিখানি নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং কবিত্ব-সম্পদেও উহা অত্যন্ত সুন্দর ও সমাদর-যোগ্য। উহাতে যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা আছে, তাহা সাধারণতঃ বাঙ্গালা অপর কোন পুথিতে একান্ত দুর্ল্লভ। দুঃখের বিষয়, ভট্টশালী মহাশয় একখানির অধিক পাণ্ডু-লিপির সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া উহার সম্পাদন-কার্য্যে নানা ত্রুটী ও প্রমাদ সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। একাধিক প্রতিলিপি না পাইলে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির সুপ্রকাশ যে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই স্বীকার করিবেন। তাই বোধ হয় 'গড়া গড়ি' স্থলে 'গজগড়ি' পাঠ, 'লেপ' অর্থ-বাচক সাধারণ একটা 'নেহালী' শব্দের জন্য আকাশ-পাতাল-পরিভ্রমণ, 'টুপি' অর্থ-বাচক 'টোব' শব্দের অদ্ভুত হাস্য-জনক অর্থ এবং পুথির নানা স্থানে নানা উদ্ভট কল্পনার বিজৃম্ভন ঘটিয়াছে। ভট্টশালী মহাশয় প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা-শীল ও অনুরাগ-সম্পন্ন, তাহাতে তিনি সকলেরই প্রশংসা-লাভের যোগ্য। বিস্মৃতির অতল জলধি-তল হইতে এই অমূল্য গ্রন্থখানি উদ্ধার করিয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্যের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থখানির নাম 'মীন চেতন' নহে ও উহার রচয়িতা শ্যামদাস সেনের নাম জাল,—উহার প্রণেতা চট্টগ্রাম-বাসী সেখ ফয়জুল্লা—এখন এরূপ একটা কথা উঠিয়াছে। ঐ কথার মূলে কোন সত্য নিহিত আছে কি না, কেবল তৎসম্বন্ধে দুটি কথা বলাই আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথিতনামা প্রাচীন সাহিত্যিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহোদয়ই পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য সমাজের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে "সভাপতির অভিভাষণে" প্রসঙ্গ ক্রমে "মীন-চেতন" সম্বন্ধে প্রাগুক্তরূপ অভিমত পরিব্যক্ত করেন। সেই অভিমতের বিপক্ষে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ভট্টশালী মহাশয় তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। দীনেশ বাবু বিশেষ কারণ ও প্রমাণ ব্যতীত এরূপ কথা বলিয়াছেন, এরূপ মনে করিয়াই সম্ভবতঃ ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। এরূপ করিবার পূর্ব্বে "মীন চেতনের" আরও প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত সত্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা করিলেই তাঁহার ন্যায় প্রত্নতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে উচিত কাজ হইত।

এই ক্ষুদ্র লেখকের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক উক্ত পুথি- খানির একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। ভূমিকাদির ছাপা শেষ হইলেই উহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। তিনখানি প্রতিলিপির সাহায্যে উহার সম্পাদন-কার্য্য শেষ হইয়াছিল। তার পর উহার আরও পাঁচখানি প্রতিলিপি আমার হাতে আসিয়া পড়ে। মোট এই আটখানি প্রতিলিপির মধ্যে চারিখানি খণ্ডিত এবং অবশিষ্ট চারিখানি সম্পূর্ণ। খণ্ডিত পুথিগুলির আদ্যন্ত নাই। সুতরাং উহাদের সাহায্যে পুথির প্রকৃত নাম, প্রতিলিপি-কারকের নাম এবং সন তারিখ জানিবার কোন উপায় নাই। তবে দুইখানি পুথিতে—

"হএ জদি রাথ কথা নহে জদি নাই।
তবে জদি কহি কথা গোরখের বিজই।"
"হএ জদি রাখো * * *।
এবে কহি আমি গোর্খের বিজহই॥"

এরূপ পদ দেখিয়া পুথির নাম "গোরক্ষ বিজয়" বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভট্টশালী মহাশয়ের উল্লেখিত আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" এই গ্রন্থের পরিচয় দিবার সময় প্রথমোদ্ধৃত পদ দেখিয়াই আমি উহার "গোরক্ষ বিজয়" নাম দিয়াছিলাম। তার উপর আমার আদর্শ পুথি খানির শেষে এরূপ লিখিত আছে:—"গোর্খা বিজয়াএ পুস্তক সমাপ্ত। * * * সয়থর শ্রীডোমন পাট্টা (?) পুস্তক মালিক শ্রীবেচারাম দাস ও শ্রীপরাণ ভক্ত

রাজ (?) ওলদে কণ্ঠমণি দাস পর পিতমোহা অভিরাম দাস ॥" আমার অবলম্বিত দ্বিতীয় পুথিখানির শেষে এরূপ লেখা আছে:—"ইতি মিননাথ চৈতন্য গোর্খ বিজয় সমাপ্ত। স্বাক্ষরমিদং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চৌধুরী সাং বানীগ্রাম।" আমার আর একখানি পুথিতে এরূপ লেখা আছে:—"ইতি গোর্খ বিজয় পুতি সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী দেব শর্ম্মণঃ।" উহার আরম্ভেও "অথ শ্রীগোর্খ বিজ পুস্তক লিখাতে" বলিয়া লিখিত আছে। আমার আর একখানি পুথির শেষে যাহা লেখা আছে, তাহা এই:—"ইতি গোর্খ বিজয়া পুস্তক সমাপ্ত। * * * লিখিতং শ্রীশ্রীলোকমন ঠাকুর সাং জোগারা (জোয়ারা)। এই পুস্তকর মালিক শ্রীকাথেছেরা রাধাচরণ ঠাকুর সাং বৈদ্ম-পাড়া॥" উহার আরম্ভে লেখা আছে—"অথ গোরর্খ বিজয় পুস্তক লিখীতে।" এখন জিজ্ঞাসা করি, এরূপ অবস্থায়ও কি পুথির নাম "মীন চেতন" বলিতে হইবে? ভাল কথা, ভট্টশালী মহাশয়ই বা উহার এই নাম কোথায় পাইলেন, তাহা ত বুঝিলাম না! তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের আরম্ভে বা শেষে তাঁহার প্রদত্ত নাম ভিন্ন লিপিকর প্রদত্ত কোন নাম ত দেখা যায় না। বরং তাঁহার পুথির ১ম পৃষ্ঠায় " * কহি শুন সভে গোর্ক্ষের বিজয়" এই খণ্ডিত পদ হইতে পুথিখানির "গোরক্ষ বিজয়" নামই সূচিত হয়। সকল দিক্ বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, উহার পূর্ণ নাম "গোরক্ষ-বিজয়—মীননাথ-চৈতন্য" অথবা "গোরক্ষ-বিজয় মীন-চেতন" হওয়াই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। সম্ভবতঃ আদৌ পুথির নাম ছিলও তাহাই; সংক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে উহা "গোরক্ষ-বিজয়" নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এ সামান্য নাম-বিপর্য্যয়ে যখন বিশেষ কিছু আসে যায় না, তখন আমরা উহা উপেক্ষা করিলেও পারি।

এখন ইহার প্রকৃত রচয়িতা কে, আমরা তাহাই দেখিব। "মীন চেতনের" দুই স্থলে যে দুইটি ভণিতা আছে, তাহা এই:—

(১) কহে সেন শ্যামদাসে প্রভুকে ভাবিয়া।
কহেন জে গোর্ক্ষনাথে স্থিরতা করিয়া॥ (২৪ পৃঃ)

(২) সেন সামদাসে কহে গোর্ক্ষ মহাশয়।
য়ানন্দে করিল তবে কদলি বিজয়॥ (৩৯ পৃষ্ঠা)

আমার অবলম্বিত আদর্শ পুথিতে যে ভণিতাগুলি আছে, তাহা এই:—

(ক) কহেন কবিন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী॥ (১০ পৃঃ)

(খ)(১) কহেন কবিন্দ্র দাসে সুন নরগণ।
সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী সুন বিবরণ॥

(২) কবিন্দ্র বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥ (১৩০ পৃষ্ঠা)

(গ) গোর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল॥ (১৫৩ পৃঃ)

আমার অবলম্বিত ২য় পুথির ভণিতাগুলি এই:—

(১) বলে হীন ভীমদাসে মনে অনুমানি।
সুনিয়া রচিলা সিদ্ধার সঙ্কেত যে বাণী॥

(২) কহে মির ফজুল্লাএ শুন রাজা মিন রায়
এবে আপনারে রক্ষা কর।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পিণ্ড রক্ষা কর॥

(৩) কহিলেক ফজুল্লাএ মনেতে ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া॥

(৪) কহে সেখ ফজুল্লায় বিচারিয়া পাজী।
স্ত্রীর বিষম মায়া বাদিআর বাজী॥
আলাপে বিলাপে হয় কামে হএ মত্ত।
কালকুল হিতাহিত তেজহে সমস্ত॥

আমার অবলম্বিত ৩য় পুথিতে নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি আছে:—

(১) বোলে কবি ভীমদাসে মনে অনুমানি।
সুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধা সবের কাহিনী॥

(২) কহে সেখ ফাজুল্লাএ সুন গুরু মীনরায়
এবে আপন চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা

গোর্খ বাক্য পিণ্ড রক্ষা কর ॥
(৩) কহে সেখ ফাজুল্লাএ মনেত ভাবিআ।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া ॥
(৪) কহে সেখ ফাজুল্লাএ বিচারি মন পাজ্রি।
স্ত্রীর বিষম মায়া জানে হাসি বাজ্রি॥

আমার ৪র্থ পুঁথির ভণিতাগুলি এই:—

(১) কএ হিন্ন ভিমদাসে মনে অনুমানি।
সুনিআ আসিলাম আমি সিদ্ধার জবানি ॥
(২) কহে সেক ফজুল্লা বিচারি মনপাজ্রি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জানে হাসি বাজী ॥

আমার পঞ্চম পুথির ভণিতাগুলি এই :—

(১) সেন শ্যামদাসে কহে প্রভুরে ভাবিয়া।
কহে গোর্খনাথে প্রভু স্থির কর হিয়া ॥
(২) কহে মির ফজরল্লা বিচারিয়া পাজি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জেন হাসি বাজি ॥

আমার ৬ষ্ঠ পুথিতে এই ভণিতাটি আছে:—

কহে সেক ফজুল্লাএ সুন গুরু মীন রায়
আপনার চিন্তা কর সার।
কামসাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোর্খবাক্যে পিণ্ড রৈক্ষা কর ॥

আমার ৭ম পুথিতে এই ভণিতাটি আছে :—

কহে হিন ফজুল্লাএ মনে অনুমানি।
রচিল সিদ্ধার সঙ্গীত জে বাণী ॥

আমার ৮ম পুথিতে এই ভণিতা দুইটি আছে :—

(১) কহে সেক কুজলাএ (ফজুল্লাএ) সুন গুরু মিন রায়
জবে আপনা চিন্তা সার।
কামসাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পুনি রৈক্ষ্যা কর ॥
(২) কহে সেক কুজল্লাএ (ফজুল্লাএ) বিচারি মন পাজী
স্ত্রীর বিসম মাআ জান হাসি বাজী ॥

"মীন চেতন":সহ নয় খানি পুথিতে যে ভণিতাগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, শ্যামদাস সেন, কবীন্দ্র দাস, ভীমদাস ও সেখ ফয়জুল্লা—এই কবি-চতুষ্টয়ই এই পুঁথিখানি রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চারি জন কবি মিলিত হইয়া এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, উক্ত চারি জনের মধ্যে অবশ্য এক জনেই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই একজন কে, এখন আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য।

শ্যামদাস সেন ও ভীমদাসের নাম বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম শ্রুত হইল। তাঁহারা বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। তাঁহারা কোথাকার ও কোন্ সময়ের লোক, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। পুথিখানি চট্টগ্রামের সম্পত্তি, তাহা উহার ভাষাই প্রতিপন্ন করিবে। সুতরাং বলিতে হইবে, তাঁহারা দুইজনও চট্টগ্রামের লোক ছিলেন।

কবীন্দ্র দাসের নামও এই প্রথম মাত্র শ্রুত হইলেও বঙ্গ-সাহিত্যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামধেয় এক কবি ছিলেন। তিনি পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারতের একাংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই রচিত গ্রন্থ "পরাগলী মহাভারত" নামে পরিচিত। তিনি গৌড়ের সম্রাট্ হোসেন সাহের আমলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "গোরক্ষ বিজয়" গ্রন্থখানি কিন্তু উক্ত সময়ের অনেক পূর্ব্বের রচনা বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। সুতরাং কবীন্দ্র দাস ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে এক ব্যক্তি বলিয়া নির্ণীত করা যাইতে পারে না। কবীন্দ্র দাসের নিবাস নিশ্চিত জানা না গেলেও পুথিখানি চট্টগ্রামের সম্পত্তি বলিয়া তাঁহাকে সহজেই চট্টগ্রামের লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

সেখ ফয়জুল্লার নাম নূতন হইলেও বঙ্গ সাহিত্যে "ফয়জুল্লা" নামক কবির নাম একবারে অপরিচিত নহে। চট্টগ্রামের মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে "মীর্জা ফয়জুল্লা নামক এক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবকাল জানা যায় নাই;

তবে, সম্ভবতঃ তিনি বৈষ্ণব কবিতার যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয় না। বৈষ্ণব কবিতার যুগ বলিতে খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বুঝায়; কিন্তু "গোরক্ষ বিজয়" খানি তাহার অনেক পূর্ব্বের রচনা বলিয়াই অনুমিত। সুতরাং বলিতে হইবে, সেখ ও মীর্জ্জা ফয়জুল্লা উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন। একটি ভণিতায় ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে "মীর" উপাধির সংযোগ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা যে অন্য লিপিকরের স্বপ্রদত্ত নহে, তাহাই বা কে বলিবে? আমাদের বিশ্বাস, সেখ ও মীর্জ্জা ফয়জুল্লা উভয়েই চট্টগ্রামের লোক ছিলেন।

পাঠকগণকে আগেই দেখাইয়াছি, "মীন চেতনের" দুই স্থলে দুইটি ও আমার একখানি পুথিতে একটি,—শ্যাম দাসের মোট এই তিনটি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; আর আমার তিন খানি পুথিতে এক একটি করিয়া ভীম দাসের তিনটি এবং একখানি মাত্র পুথিতে কবীন্দ্র দাসের ৩টি ভণিতা দেখা যায়। আমার প্রাপ্ত আটখানি পুথিতে সেখ ফয়জুল্লার নামে যথাক্রমে ১+৩+৩+১+১+১+১+২=১৩টি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। এই আটখানি পুথির মধ্যে চারিখানি যে আদ্যন্ত খণ্ডিত, সে কথা আগেই বলিয়াছি। উক্ত চারিখানি পুথি সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে তাহাদের মধ্যে সেখ ফয়জুল্লার আরও ভণিতা দেখা যাইত, সন্দেহ নাই। এখন, অধিক সংখ্যক পুথিতে অধিক সংখ্যক ভণিতা যাঁহার পাওয়া যাইতেছে, এই গ্রন্থখানি যে তাঁহারই রচিত, অন্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবল ইহা দ্বারাও তাহা দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে। সেখ ফয়জুল্লা ইহার আদি রচয়িতা না হইলে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক লিখিত এতগুলি প্রতিলিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যাইবে কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। ফলতঃ সেখ ফয়জুল্লাই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা এবং অন্য সকলেরই নাম প্রক্ষিপ্ত ও জাল, ইহা কেবল অনুমানের কথা নহে, তাহার প্রমাণও গ্রন্থ মধ্যে যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভণিতাগুলির ভাষা দেখিয়া বিচার করিতে গেলে শ্যামদাস সেন বা ভীমদাস কাহাকেও এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া অবধারণ করা যায় না। শ্যাম দাসের ভণিতা দুইটি কতকটা অসংলগ্ন ও খাপ ছাড়া, তাহা দৃষ্টি মাত্রেই বুঝা যায়। তবে কবীন্দ্র দাসের ভণিতাগুলি দেখিলে তাঁহাকেই ইহার রচয়িতা স্থির করিতে ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু তাহা সত্য হইলে এতগুলি প্রতিলিপির মধ্যে কেবল এক খানিতেই তাঁহার নাম পাওয়া যায় কেন? সেখ ফয়জুল্লার নামের স্থলেই যে তাঁহার নাম বসান হয় নাই, তাহারই বা বিশ্বাস কি? আমার আদর্শ পুথির একত্র-অবস্থিত (খ) (১) ও (২) ভণিতা দুইটি দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, সেখ ফয়জুল্লার নামটি উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে কবীন্দ্র দাসের নামটি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেবল এই একমাত্র পুথিতেও যদি সেখ ফয়জুল্লার নাম না থাকিত, তথাপি অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ভণিতার ভাষা মাত্র দেখিয়াই কবীন্দ্র দাসকেও ইহার একমাত্র রচয়িতা স্থির করা যাইতে পারিত না। কিন্তু প্রত্যেক পুথিতেই যখন সেখ ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহাকেই ইহার একমাত্র প্রণেতা বলিয়া মানিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। ইহা যে হিন্দু কবির রচনা হইতে পারে না, সে কথা আমরা আরও পরে প্রদর্শন করিতেছি।

এই 'গোরক্ষ-বিজয়' এক সময়ে "গাজীর গানের" পালার মত লোক মুখে গীত হইত। তাহার প্রমাণ এখনও কতকটা পাওয়া যায়। চেষ্টা করিলে আজও এদেশের বৃদ্ধ লোকের পাকস্থলী হইতে ইহার অনেকাংশ নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, সেখ ফয়জুল্লাই এই গাথার আদি রচয়িতা ছিলেন। পরে কেহ বা তাঁহার গ্রন্থ হইতে, কেহ বা লোক-মুখ হইতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে নিজ নিজ নাম সংযুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক কবির রচনায় অন্য লোকের ভণিতা দেওয়ার দৃষ্টান্ত প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বিরল নহে। বাহুল্য ভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। পাঠকগণ আর একটি কথা লক্ষ্য করিবেন, "মীন চেতনের" মত আমার আদর্শ পুথি, ২য় পুথি ও ৫ম পুথিগুলি হিন্দু লেখকের এবং ৪র্থ পুথিখানি একজন মঘের হাতের লেখা। আমার ৬ষ্ঠ,

৭ম ও ৮ম পুথিগুলি অসম্পূর্ণ বলিয়া তাহাদের লিপিকরের নাম জানা যায় নাই বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একখানি মঘের ও অপর দুইখানি হিন্দুর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। আমার ৩য় পুথিখানি মাত্র চান গাজী নামক জনৈক মুসলমানের লেখা। যদি ফয়জুল্লাই ইহার মূল রচয়িতা না হইবেন, তবে হিন্দু ও মঘ লেখকেরা স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁহার নাম বজায় রাখিবেন কেন, তাহার কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। কেবল ইহা দ্বারাও স্থির করা যায় যে, সেখ ফয়জুল্লাই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা এবং অন্যান্য সকলেরই নাম প্রক্ষিপ্ত ও জাল।

পক্ষান্তরে যদি আপত্তি করা যায় যে, "গোরক্ষ-বিজয়ের" মত এরূপ একখানি হিন্দু-যোগের গ্রন্থ কোন মুসলমান কবির রচিত হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে, তবে সে কথা খণ্ডন করিবার জন্যও বেশী দূরে যাইতে হয় না। এই গ্রন্থখানি যে "আদি পুরাণ" নামক কোন হিন্দু গ্রন্থের অনুবাদ বা তাহার ভাবাবলম্বনে রচিত, তাহা সকল প্রতিলিপিতেই স্পষ্টরূপে উল্লিখিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় ইহা মুসলমান কবির রচিত হওয়া কিছুতেই অসম্ভব মনে হইতে পারে না। মুসলমান কবি কর্তৃক হিন্দু-উপাখ্যান-রচনার দৃষ্টান্ত বেশী না থাকিলেও প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে তাহা একবারে বিরল নহে। কবি আলাওল, দৌলত কাজী, সুকুর মোহাম্মদ প্রভৃতি কবিগণ আমাদের এই কথার দৃষ্টান্তস্থল। বিশেষতঃ যোগশাস্ত্র-বিষয়ে মুসলমান কবিগণ বাঙ্গলায় যত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু কবিগণ ততটা লিখিয়া গিয়াছেন কি না, আজও জানা যায় নাই। এই সকল বাজে প্রমাণ ছাড়াও এই গ্রন্থে মুসলমানী ভাব ও ভাষার যে সকল ছায়া পতিত হইয়াছে, কেবল তাহাই ইহাকে মুসলমান কবির রচনা বলিয়া ঘোষণা করিবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে। পাঠকগণকে আমরা সে সমুদয় এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি :—

(১) "গোরক্ষ-বিজয়ের" প্রারম্ভে—

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন
নানারূপে কেলি করে না জাএ লক্ষণ॥
তবে প্রণামিয়ে তান নিজ অবতার।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার॥"

এই পদ্য-ত্রয় দ্বারা ইহা স্পষ্টই মুসলমানের রচনা বলিয়াই সূচিত হইতেছে। এই ভাবে কোন হিন্দু কবি কোন গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন কি না সমগ্র হিন্দু সাহিত্যেও তাহার দৃষ্টান্ত মেলা কঠিন। "প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার"—ইহা মুসলমান কবিরই নিজস্ব উক্তি। প্রাগুদ্ধৃত ৩য় পদ্যে "নিজ অবতার" শব্দে হজরত মোহাম্মদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নানা মুসলমান কবির রচনা উদ্ধৃত করিয়া প্রোক্তরূপ উক্তি সমূহের সমর্থন করা যাইতে পারিত, কিন্তু কথাগুলি এতই সত্য ও সন্দেহ-বিরহিত যে, তাহাতে আর অন্য প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখি না।

(২) "বোলে কহি দেও মোরে সয়ালের স্থিতি"—
গোরক্ষ-বিজয়—৩ পৃষ্ঠা।

"কহি দেয় সোয়াল সংসার জে স্থিতি"—ঐ—১১ পৃঃ।

"কহিয়া দেয় সাহালের স্থিতির জে নিষ্ঠা"—মীন-চেতন—৪১ পৃঃ।

"জার গুণে দেখি সয়ান সংসার"——ঐ—৪৪ ,,।

এই 'সয়াল' ('সকল' অর্থবাচক) শব্দটি চট্টগ্রামের মুসলমান কবিগণের নিজস্ব সৃষ্টি। বহু কবির রচনায় ইহার ভূরি প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। উপস্থিত "কেফায়তোল-মোছল্লিন" নামক একখানি মুসলমানী পুথি হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম :—

"শুদ্ধ মোহাম্মদ সখা প্রধান আল্লার।
যার প্রেমে সৃজিলেক সয়াল সংসার॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত 'সোয়াল' ও 'সাহাল' যে এই 'সয়াল' শব্দেরই অশুদ্ধ প্রয়োগ, তাহা দৃষ্টিমাত্রেই বুঝা যায়। ৪র্থ দৃষ্টান্তে নলিনী বাবু 'সয়াল' শব্দটিকে 'সয়ান' করিয়া ফেলিলেও উহা যে 'সয়াল' হইবে, তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না।

(৩) বিংসে কহ মনুরার কথাএ স্থান স্থিতি”—

মীন-চেতন—৪২ পৃঃ।

“নিদ্রাকালে মনুরায় কোন্‌খানে জাএ”—ঐ।

“কথাএ জর্ম্ম মনুরায় কথাতে সঞ্চরে”—

ঐ ৪৩ পৃঃ।

“বিনন্দ মন্দির ঘরে রহে মনুরায়”—ঐ ৪৪ পৃঃ।

“বসিয়া জে মনুরায় করএ বিশ্রাম”—ঐ।

“নয়ান জথাতে দৃষ্টি তথা মনুরায়”—ঐ।

“ফিরি আইসে মনুরায় আখির নিমিসে”—ঐ।

“নিদ্রাকালে মনুরায় কাজল কোঠাএ জাএ”—ঐ।

এই ‘মনুরা’ শব্দটি খাঁটি মুসলমানের সম্পত্তি। উহা ‘আত্মা’ অর্থের দ্যোতক। আরবী ‘মন্‌বরা’ হইতে বাঙ্গালায় ‘মনুরা’ হইয়াছে। সমগ্র হিন্দু-সাহিত্যেও এই শব্দের একটা দৃষ্টান্ত কোথাও মিলিবে কিনা, সন্দেহ আছে। “কাজল কোঠা” প্রয়োগেও একমাত্র মুসলমানেরই গন্ধ অনুভূত হইবে।

(৪) “থাকেত মিসিব থাক রৈব মাত্র সার” --মীনচেতন ৪৩ পৃঃ।

এই ‘থাক’ শব্দটী যে মুসলমানের সম্পত্তি, তাহা একটা বালকেও জানে। এরূপ উক্তিও সমগ্র হিন্দু সাহিত্যে বিরল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

(৫) “রামের জানকী জান মদনের রতি।
কৃষ্ণের নারী সত্যভামা তেজি নিজপতি।”

মীনচেতন ২৯ পৃষ্ঠা।

এই পদ্যের পাদ টীকায় ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন,—“শ্যামদাস সেনের শাস্ত্রজ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া মনে হয় না। সত্যভামা নিজ পতি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে ভজনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি শাস্ত্র জ্ঞানের পরিচায়ক নহে।” “মীন চেতনের” মত এরূপ একখানি উচ্চ দরের গ্রন্থ যে হিন্দুকবি রচনা করিতে পারেন, তাঁহার মুখে এরূপ অহিন্দুচিত অশাস্ত্রীয় কথা পরিব্যক্ত হইতে পারে কি না, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। ফয়জুল্লার মত কোন মুসলমানের মুখেই ঐরূপ ভ্রান্ত কথা বাহির হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক, এবং ফলে হইয়াছেও তাহাই।

ইহাকে মুসলমানের রচনা বলিবার পক্ষে এতদধিক প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, এখন বিজ্ঞ পাঠকগণই তাহা বলুন। ইহার পরও যদি কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকে, তিনি কৃপা করিয়া “মীনচেতনের” ৩৩ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিবেন। তাহাতে দেখা যাইবে, যোগ-তত্ত্ব-বিষয়ে যে সকল কথা ঐখানে বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মুসলমান-যোগের কথা। হিন্দু-যোগের সহিত মুসলমান-যোগের সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কতটুকু ও কোথায়, তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। কিন্তু সামঞ্জস্য বা পার্থক্য যাহাই থাকুক, কোন হিন্দু-কবির রচনাতেই ঐরূপ কথা কখন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কেহ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে আমরা বাধিত ও উপকৃত হইব। পক্ষান্তরে মুসলমান কবির রচনায় ঐরূপ কথা বিস্তর পরিদৃষ্ট হয়। আলিরাজার ‘জ্ঞান সাগর,’ সৈয়দ সুলতানের ‘জ্ঞান- প্রদীপ,’ মোহম্মদ সফির ‘নুর কন্দিল,’ আলাওলের কাব্যরাজি এবং মুসলমান কবিগণের ভাটিয়াল গান আমাদের এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ৩৮ পৃষ্ঠায় “কালান্ত লক্ষণ” প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ত আলিরাজার “যোগ-কালন্দরের”ই অনুকৃতি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইরূপে কবির ভণিতা, গ্রন্থের ভাব ও ভাষা বিচার করিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এখন দীনেশ বাবুর মত অনায়াসেই বলিতে পারি, এই গ্রন্থের নাম “মীনচেতন” নহে এবং শ্যামদাস সেন, ভীমদাস বা কবীন্দ্র দাস কেহই ইহার প্রকৃত রচয়িতা নহেন; ইহার প্রকৃত নাম “গোরক্ষ বিজয়„ এবং চট্টগ্রাম বাসী সেখ ফয়জুল্লাই ইহার একমাত্র ও প্রকৃত রচয়িতা।

“মীনচেতন”সম্পাদনে যে আরও নানা ত্রুটি ও প্রমাদ সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে, আগে একবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে অনেক প্রমাদ একাধিক প্রতিলিপির সাহায্য না পাওয়ায় ঘটিয়াছে; আবার অনেক প্রমাদ সম্পাদক

মহাশয়ের অজ্ঞতা প্রযুক্তও ঘটিয়াছে বটে। একবার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস ও আমি তাঁহার সম্পাদিত "ময়নামতীর পুথি" সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি ভ্রম ও ত্রুটি দেখাইয়া দিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে দেখিয়াছি, তিনি আমাদের যুক্তিসঙ্গত কথাগুলি অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অসার যুক্তি ও অনুমানগুলি বাহাল রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ বা অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে মনে বড়ই ভয় হয়। যিনি আপনার জিদ বজায় রাখিবার জন্য কোন যুক্তিতর্কেরই তোয়াক্কা রাখেন না, তাঁহার সঙ্গে তর্কসমরে প্রবৃত্ত হইলে লাঞ্ছনা ও পরাভব অবশ্যম্ভাবী। তাহা না হইলে আমরা দেখাইয়া দিতে পারিতাম যে, "মীনচেতন" খানি কেবল নামে ও গ্রন্থকার হিসাবে জাল নহে, উহার অন্তর্গত অনেক কথাই প্রক্ষিপ্ত ও অশুদ্ধ এবং ভট্টশালী মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ অনেক স্থলেই ঠিক নহে। প্রাচীন হাতের লেখা ঠিক ধরিতে না পারায় বহু স্থলেই তাঁহাকে মনগড়া পাঠ দিতে হইয়াছে। তাঁহার কল্পিত অনেক শব্দের অর্থই ঠিক হয় নাই; অধিকন্তু তাহা একান্ত হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে। কিন্তু বলিলে কি হইবে? ভট্টশালী মহাশয় কি আমাদের সে কথা শুনিবেন?

আবদুল করিম।

লালা মুসা বা প্রেমের জয়।

ভগবানের অসীম রাজ্যে নিত্য যে কত ঘটনা ঘটিতেছে, কত যে খেলা দৈনিক হইতেছে, তাহার খতিয়ান ভগবান্ বই অপর কাহারও দপ্তরে নিশ্চয়ই নাই। সেই অখণ্ড প্রতাপশালী বিশ্বরাজ্যের মালিকের মহাফেজ-খানা খুজিয়া যে খতিয়ান বা রোজ নামচা বাহির করা গিয়াছে, এটা ক্ষুদ্র কণাবিশেষ হইলেও তাঁহারই সম্পত্তির একাংশ।

দিল্লী ভ্রমণকালে একদিন যে স্মৃতি লক্ষ্য করিয়া, যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, বহুদিনের স্মৃতি হইলেও প্রত্যক্ষভাবে যেন সেই স্মৃতিস্তম্ভ আমার চক্ষে এখনও ভাসিতেছে; ঘটনাবলী যা অপরের মুখে শুনিয়াছিলাম তাহাও যেন হৃদয়মন্দিরে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে।

আজ প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমবার যখন দিল্লি গিয়াছিলাম, তখন আমি অম্বালা হইতে পাণিপথ হইয়া দিল্লী গিয়াছিলাম। তখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল; দিল্লীর নব নব দৃশ্য আমার নয়নপথে ভাসিতেছিল; আবার তাহাই মনোরাজ্যে স্থাপন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম। রেলগাড়ী হইতে নামিয়াই অবিলম্বে এক ভদ্র-গৃহে আসিয়া পঁহুছিলাম। ভদ্র লোকটীর নাম ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতেই আমার দিল্লী ভ্রমণের পালা সুরু হইল। ক্রমে এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলাম; আর বার দিন পর মফ্‌ফাইট হইবে, এ পর্য্যন্ত দিল্লী আছি। হেমবাবু আমরা সে পর্য্যন্ত আছি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। সুতরাং আমিও এক স্থানে সব দেখা শেষ না করিয়া আস্তে আস্তে কাজ সারিতে লাগিলাম। দিল্লির মাঠ বহু বিস্তৃত; এখানেই যত সব যুদ্ধ লড়াই হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ সব আমলেই এই দিল্লীতে তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দেখিবার বুঝিবার, অফুরন্ত জ্ঞান লাভ করিবার জিনিসের অভাব নাই। আমি হেমবাবুরই উপদেশ মত দেখিতে লাগিলাম। হিন্দু রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ, মুসলমান বাদসাহী আমলের শেষ চিত্র, নব্য রাজা ইংরেজের আধুনিক চিত্র সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। দিল্লির সমস্ত বিবরণ প্রদান করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলিতেছি।

দিল্লীর প্রকাণ্ড মাঠ, এমনটী বুঝি ভারতে নাই। তাই এখানে যত সব যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। তখনকার দিনে আজকালের জর্ম্মণদের মত চোরাই যুদ্ধ হইত না। বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরস্পরের শক্তি সরঞ্জাম লইয়া বল পরীক্ষা ও জয় পরাজয় হইত।

বেড়াইতে বাহির হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহারই একটা পুরা বিবরণ লইয়া আমার সঙ্গী কেদারবাবুকে বিরক্ত করিয়া তুলিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত অনুসন্ধানেচ্ছু দেখিয়া অযাচিত ভাবেই অনেকের বিবরণ আমায় বলিয়া দিতেন। এখনও যেন সেগুলি জাজ্জ্বল্যমান মনে করিতেছি। একদিন মাঠের মধ্যে একটা প্রস্তরস্তম্ভ বা টাওয়ার দেখাইয়া তিনি বলিলেন "ইহার নাম লালা-মুসার টাওয়ার।" ইহার ইতিহাস জানিতে চাহিলে তিনি তখন আর উত্তর না করিয়া তাড়াতাড়ি অপর দিকে চলিয়া গেলেন। তখন মক্‌ফাইট্ চলিতেছিল, চারিদিকে সৈন্য ও কামান গর্জ্জন করিতেছিল; ইহাই আমাদের একস্থানে দণ্ডায়মান থাকার অন্তরায় হইয়াছিল। তজ্জন্য কেবলই সে দিন ঊর্দ্ধশ্বাসে সলম্ফে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছি। যাহারা সখ করিয়া সে দিন মাঠে কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই আমাদের মত দশা।

বাসায় ফিরিয়া আসিলে কেদার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার আগেই তিনি "লালা মুসা টাওয়ারের" ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। এই দিল্লি নগরীতেই লালা নামক এক কায়স্থ বালক ও মুসা নাম্নী এক মুসলমান বালিকা একত্র বাস ও খেলা করিত। উভয়েই সমবয়স্ক, যেন এক বৃন্তে দুইটী ফুল। তাহারা উভয়ের কাছ ছাড়া হয় না; পিতা মাতা ডাকিলে গিয়া আহার করে; আর সব সময়ই একত্রে বাস।

কিছু দিন পরে মুসার বিবাহ স্থির হইল যমুনার অপর তীরে এক মুসলমান পল্লীতে। লালা একথা জানিত না। যখন উভয়ে বুঝিল যে মুসার বিবাহ, তখন একদিন মুসা লালাকে কহিল "ভাই, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কি আর বাঁচিব?" লালাও সে কথার প্রতিধ্বনি করিল "তবে আমিই কি আর বাঁচিব?" মুসা কহিল "ছিঃ! তুমি পুরুষ মানুষ তোমার কি হবে?" মুসার বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, উভয়ের উৎকণ্ঠা বাড়িল। অবশেষে এক দিন লালা-ময় মুসা-জীবনকে বৃন্ত চ্যুত করিয়া ফেলিল। সময় মত মুসার বিবাহ হইয়া গেল। মুসা স্বামী গৃহে চলিয়া গেল। চির দিনের তরে উহাদের সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা তাহারা স্বপ্নাতীত বলিয়া মনে করিত, তাহাদের অচ্ছিন্ন সেই সম্বন্ধরজ্জুর কোন্ অলক্ষ্য বন্ধন ভেদ করিয়া কঠোর শক্ত গেরো ছিন্ন হইয়া গেল! বিধির বিধান কে খণ্ডাইবে বল?

গভীর দুঃখ লইয়া, শূন্য দেহ বহন করিয়া লালা ও মুসা কতক দিন কাটাইয়া দিল। মুসা যমুনার অপর পারে স্বামী গৃহ হইতে পিতৃ গৃহে আসিবে, নির্দ্দিষ্ট দিনের নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তটার কথা লালাকে জানাইয়া দিল। যমুনা পুলিনে মুসার পালকী অবতরণ করিল—লালাকে দেখিবার জন্য। লালাও মুসার প্রতীক্ষায় উৎগ্রীব, উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছিল। মুসাকে দেখিয়াই লালা তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল; মুসাও জীবনের শেষ শুভ মুহূর্ত্তে আপনার কণ্ঠ লালার কণ্ঠে মিলাইয়া দিয়া কহিল "লালা, আমি দ্বিচারিণী নহি, আমি তোমাকেই জীবন দান করিয়াছি, তোমাকে পাইয়াই মরিব"! লালাও প্রতিধ্বনি করিল "তবে তাহাই।" আর উভয়ের স্পন্দন নাই, সারা-শব্দ নাই, উভয়েই যেন নিঃশব্দে কণ্ঠ মিলাইয়া দণ্ডায়মান; যেন অতি অল্প কালেই জীবনের কত কথা কহিয়া ফেলিতেছে।

সঙ্গীরা এই অবস্থা দেখিয়া উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে গিয়া দেখে কি সর্ব্বনাশ! এরা যে কেহই নাই! স্বল্প সময়ের মধ্যেই উহাদের প্রাণ পাখী উড়িয়া কোথায় উধাও হইয়া কোন্ রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে আবলম্বে উভয়েরই মাতৃ-পিতৃ-গৃহে এই অনভিলষিত, অভূতপূর্ব্ব, অভিনব সংবাদ প্রেরিত হইল; উভয় গৃহ হইতেই ক্রন্দন ধ্বনি পঁহুছিয়া যমুনা-সৈকত মুখরিত করিয়া তুলিল। ক্রমে এই প্রেমের জয় বা অভূত-পূর্ব্ব অমানুষিক সংবাদ দিল্লীময় রাষ্ট্র হইল, দলে দলে পুণ্য-ক্ষেত্রে, পুণ্যময় জীবনদ্বয়কে দেখিয়া পুণ্যবান্ হইবার লালসায় যমুনা-পুলিনে অসংখ্য নরনারী একত্রিত হইয়া গেল। এতগুলি মানুষ কোথায় ছিল? যে যাহার মতে পারিল, কেহ বা দোকান পাট বন্ধ করিয়া, কেহ বা সদ্য শিশুকে কাঁদাইয়া, কেহ বা গৃহস্থালী ফেলিয়া, কেহ বা রাজকীয় দপ্তর

ফেলিয়া যমুনা-পুলিনাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া ছুটিল। অহো কি অপরূপ দৃশ্য! মানবসঙ্ঘ যেন বহু বিস্তৃত সরোবরের জল-তরঙ্গের ন্যায় দ্রুত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে যথাসময়ে এ হেন অপরূপ সংবাদ বাদসাহের কর্ণগোচর হইল। দিল্লির সৈন্যাবাস হইতে অবিলম্বে বাদ্যধ্বনি যমুনা-পুলিনাভিমুখে চলিল। বাদসাহ আদেশ করিলেন, আমি স্বয়ং না আইসা পর্য্যন্ত যেন উহাদের অন্ত্যেষ্টি না হয়।

চারিদিকে প্রেমধ্বনি! প্রেমের জয়-রোল আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল। লালা-মুসার পবিত্র আত্মার স্বর্গ গমন বিষয়ে এবম্প্রকার প্রেমধ্বনি সহায়তা করিতেছিল।

যথাসময়ে দিল্লির একচ্ছত্র অধিপতি স্বয়ং ভারত-সম্রাট্ আসিয়া যমুনাপুলিনে উপনীত হইলেন। চতুর্দ্দিকে "আল্লা আল্লাহো" "হরি হরি বল" রবে যমুনা পুলিন তীর, ত্রস্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। বাদসাহ আসিয়া হুকুম দিলেন "উভয়কে যাহার তাহার ধর্ম্ম মত এক স্থানেই দাহ ও কবর দেওয়া হউক।" উহাদের পিতা মাতাকে কহিলেন "তোমরা ভাগ্যবান্, প্রেমের জয় যেমনটী ইহারা দেখাইয়াছে এমনটী আর কেহ দেখাইতে পারে নাই; তোমাদের কোন চিন্তা নাই, হাস্য করিতে থাক, আমি লালা-মুসার জায়গীর বলিয়া তোমাদিগকে কতক সম্পত্তি প্রদান করিব। ইহাদের শ্মশানের উপরে একটী চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদিগের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া দিব"। তাহাই হইল, ইহাই সেই লালা-মুসা টাওয়ার। লালামুসা নামক জায়গীর সম্পত্তি এখনও তাহাদের পর-পুরুষগণ ভোগ করিয়া আসিতেছে। ধন্য প্রেমের জয়, ধন্য লালা-মুসা!

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ।

শ্রী

তুমি কি মা দাঁড়িয়ে ছিলে
        কুজ্ঝটিকার আড়ে,
ছদ্মবেশে সিক্তকেশে
        পদ্মপুকুর পাড়ে?
এমন ভোরে তোমার কি মা
        লুকিয়ে থাকা সাজে?
অই যে তোমার আগমনী
        পাতায় পাতায় বাজে;
লাল টুকটুক্ অশোক থোপে
        শিমুল-শিরীষ গাছে
রাঙা পায়ের আল্‌তাটুকু
        টাট্‌কা লেগে আছে!
ঝোপের গায়ে উড়্‌ছে বায়ে
        "স্বর্ণলতার' চুল
মাথায় রূপার কিরীট খানি
        শুভ্র সাজ্‌না ফুল!
তুই, পালিয়ে যাস্ পাছে
তাই, দিকে দিকে পলাশ গুলি
        পথ আগুলি আছে।
ওগো, দখিণ দেশের রাণী,
অয়ি সবুজ বনের বাণী!
        হরিত বেশে ত্বরিত এসে
        কখন যে মা শীতের শেষে
                দিলি জানানি—
পোড়া বুকে হাত বুলালে,
চামর খানি গায় ঢুলালে,
        বিন্দু জানিনি,
                জননী!
পঞ্চমীর সে পোষা পাখী
ঘন ঘন উঠ্‌ছে ডাকি
        আজকে বিহান বেলা,
নবীন উষার তারে তারে
        রঙ্গীন সুরের মেলা!
শ্রী! তুই কি তবে আলি
কলমন্ত্রে ভরে দিলি
        আমার সকল খালি!

এস তবে অন্তরতর
ব্যথা-বেদন-হরা
এই যে বীণা বাজ্‌ছে নভে,
জোর করে আজ জাগ্‌তে হবে,
এমন আকাশ আর কি রবে,
এমন বসুন্ধরা ?

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

হাস্যরস ও চিকিৎসক

সংসারে যদি সব চেয়ে সুন্দর কিছু থাকে, তবে তাহা হাসি। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা হাসির একটা রূপও কল্পনা করিয়াছিলেন। যে দেশে রাগ-রাগিণীরও একটা স্পষ্ট মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল, সে দেশে হাসির মত অমন মধুর কোমল কান্ত সামগ্রীর একটা রূপ কল্পনা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাই আমাদের আলঙ্কারিকেরা অমন যে স্বচ্ছ, সরস জিনিস হাসি, তাহাতে ধবলতা আরোপ করিয়াছিলেন। হাসির মত অমন নির্ম্মল, শুভ্র জিনিস আর কি আছে ? তাই পর্ব্বত-রাজের তুষাররাশির উপমান খুঁজিতে গিয়া কালিদাস তাহাকে ত্র্যম্বকের রাশীকৃত অট্টহাস কল্পনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সকল হাসি সমান শুভ্র নহে। শিশুর অধর-কোণে যে অমৃতোপম হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে তাহা যেমন অনাবিল, ঘোর বৈষয়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন বিজয়-দৃপ্ত সংসারী শত্রুর পরাভবে যে হাসি হাসিয় থাকেন, তাহা তেমন অনাবিল নহে। নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করিয়া কুটিল চাণক্য, কিংবা ষোড়শ লুইর রক্তে স্নান করিয়া ফরাসী বিদ্রোহীরা যে হাসি হাসিয়াছিল, তাহা শিশুর স্বর্গীয় হাসি নহে। অধরের কোণে হাসির রেখা যে সব সময় একই মনের ভাব প্রকাশ করে না, হাসির বিশেষণসমূহই তার সাক্ষী! নিষ্ঠুর হাসি, তীব্র হাসি, বক্র হাসি, কুটিল হাসি প্রভৃতি যত প্রকার হাসির সহিত আমরা পরিচিত, তার সকল গুলির মধ্যেই যিনি হাসেন তাঁর হৃদয়ের আনন্দ ছাড়া আরও কিছু বর্ত্তমান থাকে।

যে কখনও প্রাণ খুলিয়া হাসে না তাহার সম্বন্ধে সতর্ক হইতে কবি উপদেশ দিয়াছেন। হাসির অতীত যে ব্যক্তি, সে হয় ঈশ্বর না হয় পশু। কিন্তু তথাপি এমনও লোক আছে, যাহার নিকট সমস্ত বিশ্বটা একটা বিরাট ক্রন্দন। আর যাহার হাসির নেশা এত যে, জগৎ জুড়িয়া একটা বিরাট বিশাল হাসির হিল্লোল ছাড়া আর কিছু সে দেখিতে পায় না, বলিতে হইবে সে ব্যক্তি হাতে স্বর্গ পাইয়াছে। হাসিবার অধিকার ভগবান্ যাহাকে না দিয়াছেন তাহার মত দুঃস্থ আর কেহ নাই।

সমস্ত বিশ্ব-সংসারের মানে খুঁজিতে যিনি নিরস্ত হন নাই, সেই যে বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি দার্শনিক, তিনি হাসিরও একটা মানে খুঁজিতে চাহিয়াছেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, আমরা কেন হাসি এবং কিসে হাসি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বে এত অনন্ত হাসির তরঙ্গ দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহার মানে বুঝে নাই, বুঝিতে হইবে ভগবান্ তাহাকে হাস্যরসে বঞ্চিত করিয়াছেন। দার্শনিক বলিতে চান, যাহা দেখিয়া আমরা হাসি, তাহা হইতে নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কেহ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলে আমরা হাসি, কেন না আমরা মনে করি, হোঁচট খাইবার অবস্থা আমরা পার হইয়া আসিয়াছি, অন্ততঃ বর্ত্তমানে আমরা হোঁচট খাওয়ার মত অবস্থার পর পারে, সুতরাং আমরা বড়। দার্শনিকের মতে সুতরাং হাসিবার বেলায় অন্য যাহাই আমাদের মনে থাকুক না কেন, তার সঙ্গে এই কুজ্ঞানটুকুও আমাদের হৃদয়ে থাকে যে, আমরা—যাহারা হাসিতেছি তাহারা—হাস্যাস্পদ ব্যক্তির চেয়ে বড়। বয়ঃপ্রাপ্ত জীবনের হাসি শিশুর অকারণ আনন্দের অনাবিল প্রকাশ মাত্র নয়; ইহাতে অনেক জ্ঞানের অণু মিশ্রিত রহিয়াছে। আমরা এক জনের না একজনের খরচে হাসি—এক জনের না এক জনের চেয়ে নিজেদিগকে বড় মনে করিয়া আনন্দ উপভোগ করি।

অবশ্যই, শিশুর মত অকারণ হাসি যে আমাদের একেবারেই জুটে না, তা নয়। এমনও অনেকে আছেন যাঁহারা না হাসিয়া কথা কইতে পারেন না; জীবনের প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক কথায় তাঁহাদের একটা অফুরন্ত আনন্দ রহিয়াছে।

কিন্তু সে আনন্দ, সে হাসি অন্যোতে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া কঠিন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য যাহাদের রহিয়াছে, হৃদয় যাহাদের নির্ম্মল ও অনাবিল, অস্পষ্ট হইলেও একটী ব্যক্ত হাসির রেখা তাহাদের অধর-কোণে লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু এ হাসির অংশ অন্যকে দেওয়া কঠিন। সাধারণতঃ আমরা বাহিরের কোন একটী কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়াই হাসি। এবং এই হাসিই আমরা যুগপৎ অনেকে উপভোগ করিতে পারি।

কে আছে এমন নির্ম্মম, যে শিশুর হাসি দেখিয়া পেচক-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে? কিন্তু শিশুর হাসির বর্ণনায় আমাদের জ্ঞান হইতে পারে, হাসি আসিবে কি না সন্দেহ। গোপাল ভাঁড়ের দেহটী যখন আমরা ভাবি, তখন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ হাসি দেখিতে পাই; কল্পনার চক্ষে অন্ততঃ সে মূর্ত্তিটী আমাদের দেখা না হইলে হাসি ফুটিবে না। ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়াই আমরা হাসি, শুধু তাহার বর্ণনা শুনিলে হাসি ফুটিতে চাহিবে না। সুতরাং শিশুর হাসি, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের হাসি ছাড়া আর যত রকম হাসি আছে, তাহা সমস্তই বাহিরের কোন না কোন একটা বস্তু উপলক্ষ্য করিয়া জন্মে। আবার এই বস্তুর চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলে যত সহজে হাসি উঠিবে, শুধু ভাষার বর্ণনায় তত সহজে হইবে না।

এই জন্যই সাহিত্যের মধ্যে মানবের যে হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যেই বেশী। কারণ, শ্রব্য কাব্যে ভাষার ঝঙ্কার হইতে হাস্যাস্পদ চিত্রটী আমাদের মানস-পটে আগে আঁকিয়া লইতে হয়; এবং এই অঙ্কনে যে আয়াস স্বীকার করিতে হয় তাহাতে ভবিষ্যৎ হাসির মাত্রা কিছু কমিয়া যায়। দৃশ্য-কাব্যে যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসিতে হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান থাকে; সুতরাং হাসি সহজেই উৎপন্ন হয়। অবশ্যই, নিপুণ শিল্পীর বর্ণনা-চাতুর্য্যে অনেক সময় শ্রব্য-কাব্যেও হাসির ফোয়ারা জমিয়া উঠে।

দৃশ্য-কাব্যেই হউক কিংবা শ্রব্য-কাব্যেই হউক, সাহিত্যের হাসি একটা কিছু উপলক্ষ্য করিয়া তবে জন্মে। ইহা অকারণ হাসি নহে, সুতরাং ইহার একটা কারণ চাই। এমন একটা বস্তু চাই যাহা হাসি উদ্রিক্ত করিতে পারে।

জগতের সাহিত্যে নানা সময়ে নানা শ্রেণীর লোক কিংবা নানা প্রকার ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া হাসিবার চেষ্টা হইয়াছে। কোথাও বা পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া হাসির সৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বা মূর্খ ইহার কারণ; কোথাও বা কবি, আর কোথাও বা দার্শনিক; কোথাও বা 'চিন্তাশীল', আর কোথাও বা নীলকমল; কোথাও বা ব্রাহ্মণ আর কোথাও বা যজমান এমন আদরের বস্তু হাসির কারণ হইতেছে। দার্শনিককে যে উপহাস করা হইয়া থাকে তার একটা স্মরণীয় দৃষ্টান্ত ম্যারিষ্টফেনিজের 'বারিবাহ' নামক নাটক, যাহাতে জগতের অমর দার্শনিক সক্রেতিস্ হইয়াছেন হাসির বিষয়। মূর্খ কখনও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং যে সব মূর্খের খরচে সাহিত্য হাসিয়াছে, তাহারা অজ্ঞাত-নামা। সংস্কৃত কাব্যের বিদূষক একাধারে ব্রাহ্মণ ও মূর্খ। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং ও ডিকেন্স্ প্রভৃতিতে আমরা অন্যান্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিচারকের প্রতি হাসির কটাক্ষ দেখিতে পাই। 'চিন্তাশীল'কে স্বয়ং চিন্তাশীল লেখক রবীন্দ্রনাথ উপহাস করিয়াছেন। 'নীলকমল' আমাদের অতি পুরাতন বন্ধু।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমে সমাজে দ্রুত যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, সেই সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের জীবন পরিবর্ত্তিত ভাবে গড়িয়া লইতে পারেন নাই বলিয়াই, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ 'বিদ্যা-দিগ্‌গজে' উপহসিত হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে যে সকল শ্রেণীর লোক উপহসিত হইয়াছেন, তাঁর মধ্যে 'দুর্গেশ-নন্দিনীর' 'বিদ্যা-দিগ্‌গজ' এক শ্রেণীর। ডেপুটী ও মুন্সেফ দিগকে স্বয়ং ডেপুটী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হাসির পাত্র করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। উকীলের বর্ণনা 'কান্ত' কবির লেখায় আছে। কিন্তু রোগের আবাস ভূমি বাংলাদেশে চিকিৎসককে উপহাস করিতে কেহই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত তেমন সাহস পান নাই। কিম্বদন্তীতে এক ভিষগ্‌রত্নের পরিচয় পাই, যিনি রোগীর নাড়ী ধরিয়াই চরকের বচন মনে করিয়া আওড়াইয়াছিলেন—

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যোতিং, ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরং';—অর্থাৎ কিনা জবাফুলের রসের সহিত শঙ্খের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া' ইত্যাদি। হারাণ গরু ফিরাইয়া পাইবার জন্য যিনি গো-স্বামীকে বিরেচক ঔষধ দিয়াছিলেন, তিনিও কিম্বদন্তীর কবিরাজ, সাহিত্যের যশঃ তাঁহার ভাগ্যেও ঘটে নাই।

কবিরাজ ছাড়া আরও অনেক প্রকার চিকিৎসকের সহিত আমরা পরিচিত; তন্মধ্যে ডাক্তার প্রধান। কিন্তু একটী ঝকঝকে মোহর হাতে তুলিয়া না দিলে যিনি বাড়ীর কিনারায়ও আসেন না, এবং যন্ত্রের সাহায্যে যিনি হৃদয়ের সকল রহস্য বলিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে উপহাস করিবার সাহস বাঙ্গালীর এখনও হয় নাই। সুতরাং যতদূর মনে পড়ে, বাংলা সাহিত্যে চিকিৎসককে, বিশেষতঃ ডাক্তারকে কোথাও উপহাস করা হয় নাই।

কিন্তু যে মহাদেশ ডাক্তারী শাস্ত্রের জন্মভূমি, সেই ইউরোপের সাহিত্যে ডাক্তার একাধিক বার তীব্র উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। ইংলণ্ডের ইদানীন্তন প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের অন্যতম বার্ণার্ড শ ডাক্তারদের উপর তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। নিজে নিতান্ত নীরোগ না হইলে এরূপ সাহস অনেকের পক্ষেই দুষ্কর। 'চিকিৎসকের উভয়-সঙ্কট' (The Doctor's Dilemma) নামক নাটকে বার্ণার্ড শ' এই সাহস করিয়াছেন। সেখানে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার যক্ষ্মারোগের একটা নূতন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া সরকার হইতে 'স্যর' উপাধি লাভ করিয়াছেন; চারিদিকে তাঁহার যশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এবং এত সব রোগী চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর দ্বারস্থ রহিয়াছে যে অনেকের সঙ্গেই দেখা করিবার অবকাশও তাঁর নাই। সমব্যবসায়ী সকলেই তাঁহার এই উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু সকলে তাঁর এই চিকিৎসা প্রণালীর সমর্থন করিতেছেন না। তাঁহার মতে এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু অবস্থা-বিশেষে রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। কিন্তু অন্য একজনের মতে, ইহাতে কোনই ফল পাওয়া যায় না, বরং হিতে বিপরীত হয়। তৃতীয় একজন মনে করেন যে, সর্ব্ববিধ রোগেরই একমাত্র মূলকারণ, দেহের মধ্যে একটী অনাবশ্যক ক্ষুদ্র থলের মত আছে, তাহা। সুতরাং দেহকে নিরাময় করিতে হইলে ঐ থলেটী কাটিয়া ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

উপাধি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর অন্যান্য ডাক্তারেরা তাঁহার সম্মানে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন এবং এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময় নীচে বসিবার ঘরে রোগীর মেলা জমিয়া গিয়াছে। 'ফরসুত নাই' বলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ডাক্তার সকলকেই বিদায় দিতেছেন। কিন্তু একটী স্ত্রীলোক কিছুতেই যাইবে না। অত্যন্ত বিরক্তির সহিত অবশেষে তিনি তাহাকে দেখা করিবার অনুমতি দিলেন। সে তাহার যক্ষ্মাক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসা তাঁহার হাতে সমর্পণ করিতে চায়। অনেক পীড়াপীড়িতে ডাক্তার তাঁহার নবাবিষ্কৃত ঔষধটী পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিবার অনুরোধে রোগীটী হাতে লইতে স্বীকার পাইলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের সময়াভাব, সুতরাং নিজের হাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে অন্য এক জন ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

যথারীতি ঔষধ প্রযুক্ত হইলে, রোগীর মরণ-কাল দ্রুত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন 'স্যর' ডাক্তার কহিলেন, ঔষধ ঠিক ঠিক প্রয়োগ করা হয় নাই; যখন দেহে ঋণ-তাড়িতের পরিমাণ বেশী হয়, তখনই ইহা প্রয়োগ করা উচিত; দেহের অবস্থা ঠিক ধরা হয় নাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'থলের' ডাক্তারটী কহিলেন, ঐ থলেটা কাটা হয় নাই বলিয়াই যত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল পণ্ডাপূর্ণ গবেষণার ভিতর রোগীর আত্মা দেহ মুক্ত হইল।

বার্ণার্ড শ' এই একখানি নাটকে ডাক্তারদের উপর আক্রমণের সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতির উপর আক্রমণও মিশ্রিত করিয়াছেন বলিয়া ডাক্তারদের প্রতি উপহাস একটু প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তারদের প্রতি উপহাসে একাধিক নাটকে ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার' (Moliere) যেমন কৃতকর্ম্মা হইয়াছেন, এমন বোধ হয় আর কেহ হন

নাই।

ডাক্তারদের প্রতি উপহাসের প্রধান কারণ, তাঁহারা নিত্য নূতন বিধি গ্রহণ করেন, নিত্য নূতন ঔষধ বদলান, দ্রব্যের নিত্য নূতন গুণ আবিষ্কার করেন, এবং অনেক সময় গুণ না জানিয়াও দ্রব্য ব্যবস্থা করেন। কখনও হয় ত শুনি, সকল রোগেরই উৎপত্তি রক্তে; সুতরাং যে কোন রোগ হইলেই, শরীর হইতে দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। কখনও হয় ত শুনি, পাকস্থলীই সকল রোগের আধার, সুতরাং উপবাসের মত আর ঔষধ নাই। আবার কখনও হয় ত শুনি, ঔষধ সেবন করিলে হজম হইয়া তাহা বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাহার গুণের যাহাতে পরিবর্ত্তন না ঘটে সেই জন্য মাংস কাটিয়া সোজাসুজি তাহাকে রক্তে চালাইয়া দেওয়া উচিত। কখনও হয় ত শুনি, পঁচা জিনিস মাত্রেই অস্বাস্থ্যকর; দই পচা দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং দইয়ের মত অপকারী জিনিস আর কিছু নাই। আবার কখনও শুনি, দই দুগ্ধজাত কীটাণু (Lactic Bacilli) নষ্ট করে, সুতরাং ইহা জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি সমস্ত রোগের মহৌষধ। ইত্যাদি প্রকার ক্ষিপ্র মত-পরিবর্ত্তনের জন্য এবং কতকটা অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞতা পোষাকের জাঁকে ঢাকিয়া রাখিতে চান বলি।, রোগীর পরম বন্ধু ডাক্তারকে মলিয়ার একাধিক নাটকে তীব্র উপহাস করিয়াছিলেন। ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে তাহার দুই একটীর পরিচয় আবার এখানে লাভ করিতে পারি।

'উড়ন্ত ডাক্তার' (The Flying Doctor) নামক নাটকে একটী যুবক প্রেমে পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রেমের আস্পদ বালিকাটীর পিতা মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দিতে ইচ্ছুক এবং সেই অনুসারে বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পিতার ঈপ্সিত জামাতাকে বরণ করিতে বালিকা আবার অনিচ্ছুক। এবং যাহাতে বিবাহ সহজে না হয়, সে জন্য সে পীড়ার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পিতা বাধ্য হইয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। যিনি ডাক্তার আনিতে গেলেন তাঁহারও ইচ্ছা প্রথমোক্ত যুবকের সঙ্গেই বালিকার বিবাহ হয়। সুতরাং তিনি সেই যুবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, এমন একটী ডাক্তার নিতে হইবে, যে রোগীর স্থানপরিবর্ত্তনের উপদেশ দেয়। তাহা হইলে, পরে যুবক যুবতীর মিলন ও বিবাহ হইতে পারিবে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহা আর ভাঙ্গা যাইবে না; সুতরাং একটু গালি দেওয়া ছাড়া পিতা আর কিছু করিতে পারিবেন না।

কিন্তু এমন ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাইবে? বৃদ্ধ পিতা একটু সাদাসিদে ধরণের লোক, সুতরাং তাঁহার চোখে ধূলি দিবার জন্য যে কোন একটা লোক হইলেই চলিবে। যুবকের চাকরটাকেই অতঃপর ডাক্তার সাজাইয়া নেওয়া স্থির হইল। চাকরও সম্মত হইল। সে মনিবকে কহিল, "আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না; আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সহরের যে কোন ডাক্তারের মত আমি যে কোন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিতে পারিব। প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুর পরে ডাক্তার আসে, কিন্তু আমার বেলায় দেখিতে পাইবেন যে, ডাক্তার গেলেই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত!"

মনিব তাহাকে শিখাইলেন, "তোমার বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। হিপোক্রেটিস্ ও গ্যালেনের নাম আওড়াইতে হইবে, আর, অবশ্যই চক্ষুলজ্জাও ত্যাগ করিতে হইবে।"

চাকর বলিল, "ও! আমাকে বুঝি দর্শন ও গণিত শাস্ত্র কপচাইতে হইবে? সে আমি খুব পারব"।

অতঃপর ইহাকে ডাক্তারের গাউনে সজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইল।

বালিকার পিতা জর্জিবাস্ কহিলেন;—"ডাক্তার বাবু, আপনাতেই আমার সমস্ত আশা ভরসা। আমার মেয়েটাকে আরাম করিয়া দিন্।"

ডাক্তার। হিপোক্রেটিস্ বলেন এবং গ্যালেনও বলেন, এবং অনেক যুক্তিসহকারে বলেন, যে, কাহারও রোগ হইলে সে কখনও সুস্থ বোধ করে না। আপনি আমাতেই আপনার সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করিয়া ভালই করিয়াছেন, কেন না আমিই হইতেছি উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, এবং খনিজ বিদ্যাতে

সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে চতুর এবং সব চেয়ে প্রাজ্ঞ ডাক্তার।"

পিতা কহিলেন, "শুনে সুখী হইলাম।"

ডাক্তার কহিলেন, "ভাব্‌বেন না যে, আমি একজন সাধারণ ডাক্তার, একজন সামান্য ডাক্তার। আমার তুলনায় আর সব ডাক্তারের এখনও জন্মই হয় নাই, মনে করা যাইতে পারে।"

ইহার পর ডাক্তার কতকগুলি যা তা ল্যাটিন শব্দ আওড়াইয়া গেলেন এবং 'দেখি' বলিয়া জর্জ্জিবাসেরই নাড়ী ধরিলেন। একজন তখন স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইনি রোগী নন, রোগীর পিতা। ডাক্তার কহিলেন, "তাতে কিছু আসে যায় না। পিতার রক্তই পুত্রীর রক্ত; এবং পিতার রক্তের দোষ দেখিয়াই আমি কন্যার রোগ জানিতে পারিব।"

জর্জ্জিবাস কহিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমার বড় ভয় হয়, মেয়েটী নাকি আর বাঁচে না।"

ডাক্তার কহিলেন, "আঃ! বলেন কি! তিনি কিছুতেই মরতে পারেন না। ডাক্তারের ব্যবস্থা পাইবার পূর্ব্বে তিনি কিছুতেই মরণসুখ অনুভব কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনার মেয়েকে একবার দেখ্‌তে পারি?"

অতঃপর রোগিণী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ডাক্তার কহিলেন, "তা হ'লে আপনি অসুস্থ?" মেয়ে কহিলেন "আজ্ঞে হাঁ।"

ডাক্তার। "সে ত বড় খারাপ! ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ নহেন। আচ্ছা, আপনি মাথায় এবং পিঠে বেদনা অনুভব করেন কি?"

রোগী। হাঁ।

ডাক্তার। আমিও তাই মনে করিয়াছিলাম। সেই যে বড় ডাক্তারের নাম করিয়াছি, তিনি জীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে অধ্যায়ে বলিয়াছেন—ওঃ, অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন। এবং দেখাইয়াছেন যে, দেহস্থ যে সমস্ত ধাতুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক রহিয়াছে; যেমন, বিষাদ আনন্দের বিরুদ্ধ; দেহে পিত্ত সঞ্চারিত হইলে আমরা হল্‌দে হইয়া যাই; আর, রোগের মত স্বাস্থ্যের বিরোধী আর কিছু নাই। সুতরাং, মেয়েটীর নিশ্চয়ই অসুখ করেছে।" ইত্যাদি।

তার পর টাকা নিবার সময়। জর্জ্জিবাস্ হাতে টাকা গুঁজিয়া দিতে গেলে ডাক্তার কহিলেন "আপনি আমায় ঠাট্টা করিতেছেন; আমি কখনও টাকা নেই না; আমি পয়সাখোর নই।"—এই বলিয়া টাকা কয়টী পকেটে পুরিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

"প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক' (Love is the best Doctor) নামক নাটকেও 'মলিয়ার' ডাক্তারদিগের প্রতি প্রচুর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। সেখানে এক জন ভদ্রলোকের কন্যার ব্যাধি সত্য না হইলেও চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি একেবারে চারজন ডাক্তার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহঁাদের মধ্যে একজন পূর্ব্বে আর এক বাড়ীতে এক সহিসের চিকিৎসা করিয়াছিলেন; সেই উপলক্ষে এই বাড়ীর এক পরিচারিকা তাঁকে দেখিয়াছিল। তিনি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সইসটী কেমন আছে!" পরিচারিকা কহিল, "ভালই আছে; সে মারা গেছে।" "মারা গেছে? হ'তেই পারে না।" পরিচারিকা কহিল, "হ'তে পারে কিনা জানি না, কিন্তু মারা যে গেছে, তা ঠিক।" ডাক্তার কহিলেন, "অসম্ভব! তা কি করিয়া হবে? হিপোক্রোটিস্ বলেন যে, এরূপ রোগ চৌদ্দদিন কিংবা একুশ দিনের দিন শেষ হবে। তার ত মোটে ছয় দিন অসুখ ছিল।"

যাহা হউক, তারপর বর্ত্তমান রোগীর সম্বন্ধে পরামর্শ হইবে। চারিজন নিরিবিলি বসিলেন। এক জন কহিলেন, "প্যারিস্ প্রকাণ্ড সহর। যার ব্যবসায় খুব বেশী, তাকে কত দূরই না ছুটাছুটি করিতে হয়!" আর একজন কহিলেন, "আমার একটা বেশ খচ্চর আছে, সেটা কিছুতেই হয়রাণ হয় না।" তার পর আর এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন যে আর্টেমিয়স্ ও থিওফেষ্ট্রাসের মধ্যে ঝগড়া হইল, তাতে আপনি কোন দিকে।" ইত্যাদি।

এবম্প্রকারে রোগীর ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে, এমন সময় রোগীর পিতা ত্রস্তভাবে আসিয়া কহিলেন, "আপনারা কি ঠিক করিলেন? রোগীর অবস্থা যে ক্রমেই খারাপ হইতেছে।"

তখন কে উত্তর দিবেন, তাই নিয়া ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। একজন বলেন আর একজনকে 'আপনি বলুন; উনি আবার আর একজনকে বলেন "আপনি বলুন।" ইত্যাদি আদবে অধীর হইয়া রোগীর পিতা যখন আবার তাগিদ দিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই সমস্বরে উত্তর করিতে লাগিলেন। শেষে বুঝা গেল, একজনের মতে 'রোগীর রক্তে অত্যন্ত উত্তাপ জন্মিয়াছে; সুতরাং তাহার রক্তমোক্ষণ প্রয়োজন।' দ্বিতীয় একজনের মতে 'রক্তমোক্ষণ করিলে পনর মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু হইবে; জোলাপ নেওয়া ছাড়া ইহার আর কোন ঔষধ নাই।" এইরূপে কলহ করিয়া দুইজন তৎক্ষণাৎ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বাকী দুইজনের দিকে চাহিয়া রোগীর পিতা কহিলেন, "এখন আমি কি করি, কার ব্যবস্থা গ্রহণ করি?" তৃতীয় ডাক্তার মন্থর ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'এ—রূ—প অ—ব—স্থায় অ—ব—শ্যই খু—ব বি—বে—চ—নার স—হি—ত কাজ ক—রিতে হয়। কেন না, হি—পো—ক্রে—টি—স্ বলেন, এ—সব অ—বস্থায় যে ভুল হ—ই—তে পারে তা—র ফ—ল বড় বি—ষ—ম।" চতুর্থ ব্যক্তিও তাহাতে সায় দিলেন। তার পর এই উভয়ের মতেই ঠিক হইল যে, রোগীর তলপেটে এক প্রকার বাষ্প জন্মিয়াছে যাহাকে গ্রীক ভাষায় যাহা বলে তাহার অর্থও বাষ্পই। এই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মস্তিষ্কে আরোহণ করিয়াছে। সুতরাং রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন—উভয়ই দরকার। একবারে উপকার না হইলে বার বার ইহাই করিতে হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি আবার কহিলেন, "ইহা খুবই সম্ভব যে, এরূপ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সত্ত্বেও আপনার মেয়ের মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু তা হইলেও আপনি অন্তত: এ কথা বলিতে পারিবেন যে বৈজ্ঞানিক প্রথামত তাঁর মৃত্যু হইল।" চতুর্থ ব্যক্তি সায় দিয়া কহিলেন, 'নিয়ম ভঙ্গ করিয়া রোগমুক্ত হওয়ার চেয়ে নিয়ম মত চিকিৎসা অনুসরণ করিয়া মরা ভাল।"

ইহার পর অন্য এক দৃশ্যে পঞ্চম এক ডাক্তার প্রথমোক্ত ডাক্তারদের যে দুইজন ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিতেছেন;—"আপনারা কি পাগল? রোগীর আত্মীয়ের সাম্‌নে এমন করিয়া ঝগড়া করিতে হয়? রোগীর সম্মুখে আমাদের সকলেরই একমত হওয়া উচিত এবং ভাল ফল যাহা হয়, তাহা সবই আমাদের চিকিৎসার গুণে হইয়াছে এরূপ বলিতে হয়, আর কুফল মাত্রেই অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে হয়।" ইত্যাদি।

রোগ-নির্ণয়ে ডাক্তারদের যে মতভেদের চিত্র 'মলিয়ার' এখানে আঁকিয়াছেন, টীকাকার বলেন, ইহার মূলে ঐতিহাসিক সত্য রহিয়াছে। কার্ডিন্যাল্ ম্যাজারিনের চিকিৎসায়ও নাকি এরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছিল।

এইখানেই মলিয়ারের ডাক্তার-প্রীতি শেষ হয় নাই। "দায়ে পড়ে ডাক্তার" (The doctor in spite of him-self) নামক নাটকে দায়ে ঠেকিয়া এক কাঠুরিয়াকে ডাক্তার হইতে হইয়াছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কাঠুরিয়া তাহাকে খুবই উত্তমমধ্যম প্রদান করিয়াছে। তার পর অবশ্যই আপোষ হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর মনে মনে রাগ রহিয়া গিয়াছে। সে ভাবিতেছে, কিসে এই প্রহারের প্রতিদান দিবে, এমন সময় এক ভদ্রলোকের কন্যার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার খুঁজিতে খুঁজিতে দুই ব্যক্তি সেদিকে আসিয়া উপস্থিত। কাঠুরিয়া-পত্নী তাহাদিগকে কহিল, 'আমি একজন খুব ভাল ডাক্তারের খোঁজ বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাকে দেখিয়া হঠাৎ মনে হইবে না যে, সে ডাক্তার; এমনই তার পোষাক পরিচ্ছদ। আর সে যে ডাক্তার একথা তাকে স্বীকার করানও কঠিন। অনেক সময় খুব আচ্ছা রকম না ঠেঙ্গাইলে সে কিছুতেই স্বীকার পাইবে না যে, সে চিকিৎসা জানে। অথচ সে আশ্চর্য্য সব ঔষধ জানে। একটা স্ত্রীলোককে সকলেই মরা মনে করিয়া কবর দিতে নিয়া যাইতেছিল; ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলে পরীক্ষা করিয়া মরাই সাব্যস্ত করিয়াছিল; এমন রোগীকে সে এক ফোঁটামাত্র ঔষধ খাওয়াইয়া এমন আরাম করিয়াছিল যে, সে তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া চলাফেরা করিতে পারিয়াছিল। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বার বছরের একটী ছেলে উপর হইতে রাস্তায় পড়িয়া

গিয়া মাথা, হাত ও ঠ্যাং সব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। এই ডাক্তার গিয়া কি একটা আরক দিয়া কিছুক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ ঘসিয়া দিল, আর অমনি ছেলেটা উঠিয়া দৌড়িয়া খেলিতে গেল। অমন যে ডাক্তার, সে সহজে স্বীকার পাইবে না যে, সে চিকিৎসা জানে। ঐ বনে সে কাঠ কাটিতেছে।" এই বলিয়া কাঠুরিয়া পত্নী ইহাদিগকে তাহার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

কাঠুরিয়াকে প্রথম 'ডাক্তার' বলিয়া সম্বোধন করিতেই সে চমকিয়া উঠিল। প্রাথমিক ইস্কুলে একটু ল্যাটিন ব্যাকরণের বাহিরে সে কিছু পড়ে নাই। কিন্তু লাঠির মত আর যুক্তি নাই। দুজনে মিলিয়া যখন তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল তখন সে বুঝিল যে, ডাক্তার হওয়া ছাড়া আর তার গত্যন্তর নাই; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিখিল যে, যদি কাহাকে সহজে ডাক্তার বানাইতে হয় তবে তাহাকে খুব করিয়া ঠেঙ্গাইতে হয়।

রোগীর বাড়ীতে ঢুকিয়া রোগীর পিতাকে দেখিয়া আমাদের নকল ডাক্তার কহিতে আরম্ভ করিলেন,—"হিপোক্রেটিস্ বলেন—"তার পর আর কিছু মনে হইল না, অগত্যা কি করেন, এই বলিয়া বাক্য শেষ করিলেনঃ—"হিপোক্রেটিস্ বলেন—যে, আমাদের উভয়েরই এখন মাথায় টুপি দেওয়া উচিত।" প্রশ্ন হইল, "বটে, হিপোক্রেটিস্ এই কথা বলেন?"

"বলেন বৈ কি!"

"কোথায়, কোন্ অধ্যায়ে?"

"তাঁর সেই—টুপি সম্বন্ধে অধ্যায়ে।"

অতঃপর আর টুপি মাথায় দিতে রোগীর পিতার কোন আপত্তি রহিল না। তার পর যা ঘটিল, এখানে তার দরকার নাই। অবশেষে রোগী দেখিতে যাওয়া হইল।

রোগ আর কিছু নহে। হঠাৎ মেয়েটীর জিহ্বায় কি হইয়াছে, কিছুতেই কথা কইতে পারে না। বলা বাহুল্য, রোগ মিথ্যা, কিন্তু মূর্খ পিতা তাহা টের পান নাই। তিনি ডাক্তারকে কহিলেন, "একটু বিশেষ যত্ন নিয়া দেখুন; ইহার ব্যধি আর কিছু নহে—হঠাৎ ওর কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার। "আপনি কিছু ভাববেন না। আচ্ছা, আমায় বলুন দেখি, ওঁর কি খুব যন্ত্রণা হয়!"

পিতা। হয় বৈ কি!

ডাক্তার। আচ্ছা, উনি কি খুব কষ্ট পান?

পিতা। অত্যন্ত।

তার পর, নাড়ী ধরিয়া ডাক্তার কহিলেন, 'এই যে নাড়ী এইখানে, ইহা হইতে জানা যায় যে, ইনি বোবা।' তখন সকলে বলিলেন "আপনি ঠিক ধরিয়াছেন, এই ওঁর ব্যারাম।' উৎফুল্ল হইয়া ডাক্তার কহিলেন,'আমরা' বড় ডাক্তার যারা তার নাড়ী ধরিয়াই বলিয়া দিতে পারি, কি ব্যারাম; এই দেখুন না, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আপনার মেয়ে বোবা।

মেয়ের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,'কি হইতে এরূপ হইল?'

ডাক্তার। 'ওঃ! এর চেয়ে সোজা প্রশ্ন আর কি আছে! উনি কথা কইবার শক্তি হারাইয়াছেন বলিয়াই বোবা।"

পিতা। কিসে সে শক্তি গেল?

ডাক্তার। সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থকারই বলিবেন যে, জিহ্বার জড়তা হইতে এই শক্তির লোপ হইয়াছে।

পিতা। এই জিহ্বার জড়তা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

ডাক্তার। সে বিষয়ে আরিষ্টতল বলেন—ওঃ, তিনি অনেক আশ্চর্য্য সব কথা বলেন।

পিতা। আমি আপনার কথা মানিয়া লইতেছি।

ডাক্তার। ওঃ, তিনি খুব বড় লোক ছিলেন্।

পিতা। তাতে আর সন্দেহ কি।

ডাক্তার আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। যা হ'ক, এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়ে আসা যাউক। আমার মতে জিহ্বার এই ক্রিয়া লোপের কারণ শরীরের ভিতরের কতকগুলি দূষিত দ্রব পদার্থ—অর্থাৎ দূষিত দ্রব পদার্থ। যেখানে রোগের সৃষ্টি হয় সেখানে যে সব শক্তি রহিয়াছে তাহাদের ক্রিয়ায় যে সকল বাষ্প নিষ্কাশিত হয় তাহা যেন ইসে গিয়া…ইসে। আপনি

ল্যাটিন জানেন ?

পিতা। মোটেই না।

ডা। আপনি ল্যাটিন বুঝেন না ?

পিতা। না।

তখন ডাক্তার পরম উৎসাহের সহিত বাল্যে ল্যাটিন ব্যাকরণে যে কয়েকটী শব্দ শিখিয়াছিলেন তাহাই আওড়াইতে লাগিলেন ; যথা "ঈশ্বর পবিত্র। এক বচন, কর্তৃপদ। সৎ, সন্, সতী। উত্তমং, উত্তমঃ, উত্তমা।" ইত্যাদি। সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, 'কি পণ্ডিত ব্যক্তি!'

ডাক্তার বলিয়া যাইতে লাগিলেন ;—"সেই যে বাষ্পগুলির কথা বলিয়াছি, সেই গুলি বাম দিক হইতে অর্থাৎ যে দিকে যকৃৎ রহিয়াছে সে দিক হইতে, ডান দিকে অর্থাৎ যে দিকে হৃৎপিণ্ড রহিয়াছে সেদিকে, যাইবার সময়, ফুসফুস যাহাকে ল্যাটিন ভাষায় (একটা কিছু) বলে, এবং যাহার সঙ্গে মস্তিষ্ক, যাহা গ্রীক ভাষায় (একটা কিছু) কথিত হয়, সেই যে ধমনী যাহার হিব্রু ভাষায় একটা নাম আছে, তাহা দ্বারা সম্বন্ধ সেই যে ফুসফুস, তাহা ঐ বাষ্পগুলির পথে পড়ে ; এবং তার ফলে ফুস্‌ফুসের সমস্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ হইয়া যায় ; সেই যে বাষ্পগুলি —ভাল করিয়া বুঝুন—সেই বাষ্পগুলি উদর-গহ্বরে জাত একটা তরল পদার্থ দ্বারা দূষিত হইয়া—(এই খানে আর কিছু ল্যাটিন ঝাড়িলেন)। ইহা হইতেই আপনার মেয়ে বোবা হইয়া পড়িয়াছেন।" ইত্যাদি।

আর উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। এই টুকু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে দিন হইতে আমাদের কাঠুরিয়া একজন বড় ডাক্তারই হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং ইহার পর তিনি আরও অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

আড়াই শ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্যে ডাক্তারদের নিয়া কি বিদ্রূপের বন্যা বহিয়াছিল ইহা হইতেই আমরা তার প্রমাণ পাই।

ইউরোপের সাহিত্যের সহিত সে দেশের ডাক্তারদের সম্বন্ধ নিতান্ত দূর নহে। 'জন বুল' বলিলে যে ইংরেজকে বুঝায় তার জন্য একজন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক ডাক্তার বিশেষ মূল্যবান্ গ্রন্থও সাহিত্যে অর্পণ করিয়াছেন। আর, কাব্যের চরিত্র হিসাবেও একাধিক বার সে দেশের সাহিত্যে ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাই। ডাক্তার ফষ্ট অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রও জানিতেন। কিন্তু হাস্য-রসের আধার করিয়া ডাক্তারকে সাহিত্যে আনিতে মলিয়ারের মত আর কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

এমন তীব্র উপহাস যিনি করিয়াছিলেন, সেই মলিয়ার স্বয়ং এক রকম চিররোগী ছিলেন। তবে, তাঁহার মৃত্যু এত হঠাৎ হইয়াছিল যে, ডাক্তারকে বেশীক্ষণ নাড়ী টিপিতে হয় নাই। 'প্রেমই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক' নামক নাটকে এক পরিচারিকা মনিবকে কহিতেছে "এত গুলি ডাক্তার দিয়া কি হইবে? এক জনই কি রোগীকে মারিতে পারে না?" মনিব কহিলেন, "ডাক্তারেরা বুঝি রোগীকে মারিয়া ফেলে?" পরিচারিকা কহিল, "মারে না ত কি? আমি একজন লোককে জানিতাম, সে স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত যে, অমুক এই ব্যারামে মরিয়াছে না বলিয়া আমাদের বলা উচিত, অমুক চারিজন ডাক্তার ও দুই জন ঔষধ-বিক্রেতার কবলে পড়িয়া মরিয়াছে।" কিন্তু মলিয়রের ভাগ্যে এরূপ মৃত্যু ঘটে নাই। তাঁহার যক্ষ্মা ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও রোগ নিয়া নাটকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। রঙ্গমঞ্চে থাকার সময়ই রোগের বৃদ্ধি হয়, এবং বাড়ীতে আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রক্ত বমন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

শ্রীউমাপতি ধর।

নবীন চন্দ্র

নবীন বাবুর কাব্যগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) গীতি-কবিতা বা lyrics; (২) খণ্ড

কাব্য বা Narrative; (৩) মহাকাব্য বা Epic. "অবকাশ রঞ্জিনী" নবীন বাবুর গীতিকাব্য; 'পলাশীর যুদ্ধ' 'রঙ্গমতী' 'অমিতাভ' প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁহা খণ্ড কাব্য; 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই তিনখানি একত্র করিয়া ধরিলে, নবীন বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে ইহাকে একখানি মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। 'রৈবতকে' কৃষ্ণের প্রথম যৌবনের কার্য্যাবলীর কথা, 'কুরুক্ষেত্রে' তাঁহার মধ্য জীবনের কথা এবং 'প্রভাসে' তাঁহার শেষ জীবনের কাহিনী গুলি কবিতায় বিবৃত হইয়াছে। মহাকাব্যের সমস্ত গুলি লক্ষণ এই তিনখানি গ্রন্থের ভিতর না থাকিলেও নর-নারায়ণ বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে মহাভারতের প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে তাহাকে মহাকাব্য বলিতে আমাদের আপত্তি নাই। আমরা ইহাকে মহাকাব্য বলি আর নাই বলি, ইহার ভিতর কবির কাব্য-কলা ও জীবনের যে ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে তো আমাদের কোনও বাধা নাই। আমরা এখানে তাহার কাব্য-কলাটাই একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শিল্প-কলার আলোচনা ভারত-বর্ষে খুব বেশী না হইলেও—একেবারে যে হয় নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইউরোপেই এই বিষয়ে খুব বেশী আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে। এই বাদ-প্রতিবাদের ফলে কাব্য-কলার যে কতরূপ নাম-করণ হইয়াছে তাহা গুছাইয়া বলা বাস্তবিকই একটু কঠিন। কিন্তু আমেরিকার প্রসিদ্ধ কাব্য-সমালোচক অধ্যাপক নেলসন (Prof Neilson) এই সমস্ত বাদ প্রতিবাদ, আলোচনা ও সমালোচনার ভিতর এক স্থানে একটি ঐক্য দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রায় সকল সমালোচকই কাব্যকলাকে মূলতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে কাব্যে কল্পনার উদ্দাম বিকাশ, তাহা রোমান্টিক্ (Romantic); যাহাতে ঘটনা ও বর্ণনার ভিতর প্রকৃতির অনুকৃতির ছায়া অধিক, তাহা রিয়ালিষ্টিক্ (Realistic); যাহাতে উন্মাদ কল্পনা ও কঠোর সত্য কোনও বশেষ নিয়ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া সংযত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহার ভিতর লঘু কল্পনা কিম্বা অনাবৃত সত্যের বিকাশ হয় নাই, যে কবিতার ভিতর Reason বা প্রজ্ঞাই প্রাধান্য পাইয়াছে তাহা ক্লাসিক (Classic), এই শ্রেণীবিভাগানুসারে কলা রাজ্যে আমরা ব্রাউনিং (Browning) ও রবীন্দ্রনাথের স্থান পাই না। তাঁহাদের কাব্যে অতীন্দ্রিয়ের কথাই বেশী ফুটিয়া উটিয়াছে। বিধিবদ্ধ কোন নিয়ম প্রণালীর মধ্যেও তাঁহাদের কল্পনা সংবদ্ধ রহে নাই। সমালোচকগণ ইঁহাদিগকে মিষ্টিক্ (Mystic) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের কাব্যে কল্পনার প্রাধান্য হেতু ইহাদিগকে ব্যাপকার্থে রোমান্টিক্ (Romantic) বলা যাইতে পারে। নবীনচন্দ্রকেও আমরা রোমান্টিক্ বলিব।

নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্য সমূহে পুরাতনের অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিক কল্পনাপূর্ণ কাহিনীগুলিকে নূতন ভাবে ও নূতন কল্পনায় ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য; 'অমিতাভ' পড়িতে পড়িতে মনে হইবে না—সিদ্ধার্থ সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের একটা অজ্ঞাত পার্ব্বত্য সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হইবে না, আমরা আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও বর্ত্তমান রুচি হইতে বিভিন্ন কোনও একটী পুরাতন সমাজ বা পুরাতন রুচির মধ্যে বর্দ্ধিত কোনও ব্যক্তির কথা পাঠ করিতেছি। 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র', ও 'প্রভাস' কাব্য হইতে কয়েকটি নাম ও স্থানের কথা ভিন্ন পুরাতন সমাজের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কাব্যের নর নারী পুরাতনের প্রাকৃত ও অতিলৌকিক সমস্ত ভাব ও সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত করিয়া, বর্ত্তমানের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, হৃদয়ের সহজ ও চিরন্তন বৃত্তিগুলি লইয়া আমাদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যগুলিকে আমরা রিয়ালিষ্টিক (Realistic) বলিতে পারি না। কারণ, ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-দৃষ্ট কোনও ঘটনার বা অবস্থার কথা বড় বেশী শুনিতে পাই না। ইহার ভিতর কবি, কল্পনার অতীত কাহিনী গুলির মূল-তত্ত্ব যে ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের কতকগুলি চিরন্তন সত্য পুরাতনের সমস্ত অলৌকিকতা ও অতি-লৌকিকতা পরিহার করিয়া কবির সূক্ষ্ম

অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনার বলে সুন্দর ও সুমহান্ হইয়া আমাদের মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রৈবতক পর্ব্বতে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সেই অস্তায়মান লক্ষ্মী-পূর্ণিমার শেষ যামে সেই কবিত্বপূর্ণ প্রথম কথাবার্ত্তার পর হইতে, প্রভাস তীর্থে বলরামের সমুদ্র যাত্রা পর্য্যন্ত আমরা একটা আদর্শ, একটা উচ্চ কল্পনার প্রেরণা 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসের' ভিতর দেখিতে পাই। এই আদর্শ কোনও বিশেষ সমাজ বা বিশেষ দেশের জন্য নয়, উহা চির-জটিল, চির-রহস্যময় মানব-প্রকৃতির চিরসত্য মহান্ আদর্শ। উহা আকাশে বাতাসে ভাসমান জ্যোতির্ম্ময় 'হোলি গ্রেল'(Holy grail)এর জন্য সাধনা; এই 'হোলি গ্রেল' (Holy grail) দেখিতে হইলে গ্যালাহেড (Galahad) এর মত নির্ম্মল, কৃষ্ণের মত উদার হইতে হইবে। 'অমিতাভে'র এই উচ্চাদর্শের জন্য অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। যেখানে মানবপ্রকৃতি আছে, সেখানেই এই অনুসন্ধান দেখা যাইবে। টেনিসন্ কাব্যের খাতিরে হোলি গ্রেল এর রূপক সৃষ্টি করিয়াছিলেন; নবীনচন্দ্রও কাব্যের খাতিরেই সর্ব্বশক্তিমান,সর্ব্ব-নিজস্ব নর-নারায়ণেরা কল্পনা করিয়াছিলেন। টেনিসন্ এর 'হোলি গ্রেল' (Holy grail) কাব্য কলাহিসাবে মিষ্টিক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে; নবীনচন্দ্রের আদর্শ ও কাব্য-কলা রোমান্টিক্ শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত।

রোমান্টিক্ কাব্যের প্রধান উপাদান কল্পনা; কিন্তু অসংযত বা অপ্রকৃত কল্পনা এই শ্রেণীর কাব্যে স্থান পায় না। সত্য যেখানে কল্পনার তুলিতে সুন্দর ও ভাব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই রোমান্টিসিজম্ এর পূর্ণ বিকাশ। সত্যকে লঙ্ঘন করিয়া কল্পনা যেখানে মিথ্যা করতালি পাইবার জন্য যশের কাঙ্গালী হইয়া কথা গাথিয়া গিয়াছে, সেখানে উহা অদ্ভুত (sensational) হইয়া উঠিয়াছে। এই অসংযত উন্মাদ কল্পনা রোমান্স্ এর উপাদান হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের নহে। বলিতে দোষ নাই,নবীনচন্দ্রের "রঙ্গমতী" রোমান্স্ হইলেও রোমান্টিক্ নয়। উহাতে যুদ্ধ, বিপদ হইতে হঠাৎ মুক্তি, মৃত্যুর পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার প্রেমোচ্ছ্বাস, প্রয়োজন মত অলৌকিক ভাবে মৃতের আগমন প্রভৃতি রোমান্স এর সমস্ত গুলি প্রাণোন্মাদক অদ্ভুত উপাদানই ইহাতে আছে; কিন্তু তবু উহা কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু এই "রঙ্গমতী"তেই নবীনচন্দ্রের অবস্থা সংঘটন প্রণালী (art of creating situation) এর প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। বৈশাখী ঝটিকায় তরঙ্গ-বিমুগ্ধ নদী–বক্ষে ভাসমান তরণীর উপর বীরেন্দ্র ও শঙ্করের কথাবার্ত্তাগুলি কবিত্ব হিসাবে অতি উপাদেয়। বাস্তবিক এই কাব্যখানির প্রথম সর্গের কোন্ স্থানে যে কবিত্ব নাই তাহা বলা যায় না। কলেরিজ্ (Coleridge) এক স্থানে বলিয়াছেন, একটা কবিতার মধ্যে সব স্থানে কবিত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু 'রঙ্গমতীর' প্রথম সর্গের প্রথম চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ লাইনটী পর্য্যন্ত কোথাও একটী কবিত্ব-শূন্য চরণ দেখা যাইবে না। মাঝিদের দাড় ক্ষেপনের তালে তালে ভাটিয়াল রাগিণীতে চন্দ্রকলার সেই সরস সুন্দর প্রেমগীত, সেই "একবার দুইবার, বধু মোর কণ্ঠহার" বলিয়া উজান গাহিয়া চলিয়া যাওয়া, পৃথিবীর প্রতি বসন্তের অভিশাপ প্রভৃতির কল্পনা পুরাপুরি রকমের রোমান্টিক, পর্ব্বত শিরে শিকারীর সুধামাখা গানটী পড়িতে পড়িতে মনে পড়িয়া যায় মান্‌ফ্রেড্ (Manfred) কাব্যের শিকারীকে। এই একখানি কাব্যে নবীন চন্দ্র স্কট্ এর রোমান্টিসিজম্ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এত সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব সত্ত্বেও স্বীকার করিতেই হইবে, 'রঙ্গমতী' ভাবে অদ্ভুত পূর্ণ। ইহা একখানি কবিতার রোমান্স।

"পলাশীর যুদ্ধ" নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত সৃষ্টি। নবীনচন্দ্র প্রথম যৌবনের প্রবল হৃদয়াবেগ ও উন্মত্ত কল্পনা লইয়া ভারতের ইতিহাসের একটী পৃষ্ঠার উপর কবির মতই একটী সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচলিত ইতিহাসের সত্যতায় কতদূর সন্দিহান ছিলেন, "পলাশীর যুদ্ধ"কাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মৃণালিনী' লিখিয়া বঙ্কিম বাবু বঙ্গ ইতিহাসের আর একটী ঘটনার উপর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। বার্ক(Burke) ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকের মত ফরাসী বিপ্লবের মূল

তত্ত্বটীর আলোচনা করিয়াছিলেন ; নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র কবির মত বাঙ্গালীর দিক হইতে ইতিহাসের দুইটী যুগ বিবর্ত্তন-কারী ঘটনার উপর অন্তর্দ্দৃষ্টি পাতিত করিয়াছিলেন। গেটে ইকারম্যান্ এর নিকট একদিন বলিয়া-ছিলেন "কাব্যের ভিতর আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা কর, তবেই তোমার লিখা সার্থক হইবে এবং তোমার মৌলিকতা বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।" "পলাশীর যুদ্ধে"ও নবীনচন্দ্র আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের গীতি-কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এই কাব্য খানির সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব ; এখন এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য-জগতে ইহা একখানি মৌলিক উপাদেয় কাব্য।

নবীনচন্দ্র যে রোমান্টিক তাহা তাঁহার ঘটনা-সংস্থান ও প্রকাশপ্রণালী (Method of expression) হইতে কতকটা বুঝিতে পারি। কিন্তু রস-বিকাশের দিক দিয়া না দেখিলে আমরা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা এই রসের দিক দিয়াই মুখ্য ভাবে কাব্যের আলোচনা করিতেন। রসই কাব্যের প্রাণ ; কবির প্রাণে রসানুভূতি না থাকিলে তাহার কাব্য জগতে স্থায়ী হইতে পারে না। যাহার প্রাণে যে রসের যত বেশী অনুভূতি, তাহার কাব্যে সেই রসের তত প্রাধান্য। কাজেই ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে, কাব্যের রসালোচনা দ্বারাই কবিকে ভাল রকমে বুঝিতে পারা যায়। প্রাণের এই রসানুভূতিই কবিকে অবস্থা বিশেষে রোমান্টিক, রিয়ালিষ্টিক বা ক্লাসিক্ করিয়া তোলে। কবির হাসি কান্না, স্নেহ-করুণা, গাম্ভীর্য্য উদারতা, এই রসানুভূতি হইতেই হয়। ভারতচন্দ্র চেষ্টা করিলেও রামপ্রসাদ হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ ; রাম প্রসাদ চেষ্টা করিয়াও ভারতচন্দ্র হইতে পারেন নাই। রসগ্রহণের ও রসপ্রকাশের শক্তি, জন্মের ষষ্ঠ দিবসে অন্যান্য বৃত্তির সহিত স্বয়ং বিধাতাপুরুষ আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে অঙ্কুররূপে নিহিত করিয়া যান। এই অঙ্কুরই অবস্থা বিশেষে প্রস্ফুটিত হইয়া কাহাকে প্রেমিক, কাহাকে কবি, কাহাকেও বা বীররূপে ফুটাইয়া তোলে। কবির কাব্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা, এই নিহিত অঙ্কুরের স্বাভাবিক শক্তির পরিস্ফুরণ হইতেই হইয়া থাকে। এই রসানুভূতি কল্পনার সঙ্গে মিশিয়া যখন কাব্যের ভিতর দিয়া বহিয়া যায়, তখনই কবি রোমান্টিক তখনই রোমান্টিক সিজম্ এর পূর্ণ-বিকাশ কাব্যের সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। নবীনচন্দ্রের কল্পনা-প্রবণ হৃদয় অবস্থা-সংঘটন, হাসি ও গাম্ভার্য্যের ভিতর দিয়া কিরূপ ভাবে রস গ্রহণ করিত, আমরা সেটুক বুঝিলেই তাঁহাকে ও তাঁহার কাব্যকলাটী অনেকটা বুঝিতে পারিব।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে অবস্থা-সংঘটন-কৌশল।

অনেকেই জানেন অবস্থা-সংঘটনের মধ্যে কাব্যের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য ফুটিয়া, উঠে। অবশ্য সমালোচনাক্ষেত্রে এই সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। কেহ কেহ এই অবস্থা-সংঘটনের উপর খুব বেশী জোর দিয়া বলেন,—কাব্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য ইহার উপরেই নির্ভর করে ; কেহ আবার ভাব প্রকাশ প্রণালীর (Method of Expression) উপর সমস্ত নির্ভর করে বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, অবস্থা-সংঘটন এবং প্রকাশ-প্রণালী---এই দুইটী বিষয়েরই উপর কবিতার কবিত্ব নির্ভর করে। প্রকাশ-প্রণালীর সঙ্গে হৃদয়ের আবেগের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; আবেগের আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে প্রকাশের প্রণালী বিভিন্ন রূপ আমরা দেখিতে পাই। অবস্থা-সংঘটন কৌশলের সহিত মনে কল্পনা শক্তি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কল্পনা না থাকিলে কবিত্বময় অবস্থার সৃষ্টি করা অসম্ভব। Matthew Arnold এই রূপ কবিত্বপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি যদি ক্লাসিসিজম্ এর মোহ ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে কবিতা লিখিতেন, তবে তাঁহাকে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে খুব উচ্চ আসন অধিকার করিতে দেখিতে পাই-তাম। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই অবস্থা সৃজনের শক্তির প্রভাবে উপন্যাস

লিখিয়াও আমাদিগকে যথেষ্ট কবিত্বের আস্বাদ দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দ্রজাল শক্তির প্রভাবে বালবিধবা ব্যর্থ-যৌবনা সুন্দরী রোহিণীকে যখন ঘনায়মান সন্ধ্যার স্বর্ণাভ আলোকে বকুল-কুঞ্জের অন্তরালে, কাল-সলিলা বারুণীর বাঁধা ঘাটে কলসী ভাসাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি, তখন বুঝি কঠোর সমালোচক বঙ্কিম কবিত্বের স্রোতে গাও ঢালিয়া দিয়াছেন। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের সঙ্গে জ্যোৎস্না-প্লাবিত গঙ্গা-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে অবসন্ন-হৃদয়া—প্রেম-ব্যাকুলা শৈবলিনী যখন প্রতাপকে ডাকিয়া কহে, 'প্রতাপ, বলতে পার, মরা গাঙ্গে আজি এই চাঁদের আলো কেন ?'—তখন সংসারের সুখ দুখে, সংসারের হিসাব নিকাশ সব ভুলিয়া যাইতে হয়। তখন আমাদের এই আঘাত সংঘাত-ক্ষুব্ধ প্রাণের মাঝেও কবিত্বের ঢেউ বহিয়া যায়। আমাদের মনে হয়, সেই বারুণীঘাটে সেই গঙ্গা বক্ষে—ভাব-মগ্না তেমনি যদি একটী রমণীকে দেখিতে পাইতাম!—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিলে বোধ হয় ব্যাপারটা এত সুন্দর, এত কবিত্বময় হইত না। আমরা কবির অবস্থা-সৃজন কৌশলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চাই। আমাদের মনে লয় "এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে যদি গো শুধু আসিত', এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ভুলিয়া থাকিবার সময় যদি আমার আরাধ্য, আমার বাসনার সামগ্রী আমার কাছে আসিত, তবে হৃদয়ের কথাগুলি পুষ্প হইয়া আমার হৃদয়কাননে ফুটিয়া উঠিত। কবির অবস্থা-সংঘটন কৌশলের মধ্যে এতই ভাব, এতই কবিত্ব! চিত্রের ছবি যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের ভিতর ফুটিয়া উঠে কবিতাও তেমনি চারিদিকের অবস্থা ও ঘটনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে কাব্য শুধু কতকগুলি রসহীন নিছক (Abstract) কথা নিয়া ফুটিতে পারে না। সত্য কথা কবিও বলেন—দার্শনিকও বলেন; কিন্তু দার্শনিকের কথা মনের ভাবরাজ্যকে অতিক্রম করিয়া একেবারে সোজা-সুজি যাইয়া মানুষের বুদ্ধিরাজ্যে উপস্থিত হয়; কবি সত্যগুলিকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে রাখিয়া, বুদ্ধিকে ভাবরাজ্যে টানিয়া আনেন। ভাব-রাজ্যের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে মানুষকে ধরিয়া রাখাই কাব্যের সৌন্দর্য্য; সাগর-প্লাবিষ্ট উর্ব্বর ভূমিখণ্ডের উপর সবুজ পত্রাচ্ছন্ন তরুরাজির মত ভাবেরাজ্যের উপর দিয়া অনন্ত সত্য রাজ্যের ভিতর চলিয়া যায়। এই সৌন্দর্য্য গভীর সত্যের সঙ্গে সংবদ্ধ; কিন্তু নয়ন ও মন দিয়া আমরা যে সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি, দার্শনিকের নীরস সত্যের মত তাহা শুধু বুদ্ধিরাজ্যের সীমার মধ্যে সংবদ্ধ নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই সত্য ও এই সৌন্দর্য্যকে ভাবরাজ্যে ধরিয়া রাখে কবির আবেগ ও কবির সৌন্দর্য্য পিপাসু কল্পনা। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু কল্পনা যখন নানা স্থান হইতে ফল ফুল লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাদের ভাবগ্রাহী মনটীকে এক সৌন্দর্য্যের রাজ্যে আনিয়া দেয়, তখন আমরা সেই রাজ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই এবং এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু কল্পনাকে কি বলিয়া প্রশংসা করিব তাহা ভাবিয়া পাই না।

কবির এই অবস্থা-সংঘটন-কৌশল হইতে যে আমরা কেবল সত্য ও সৌন্দর্য্যের আভাস পাই তাহা নহে; ইহার ভিতর দিয়া আমরা যখন কবিকেও ধরিতে পারি তখন এই অবস্থা-সংঘটনের সার্থকতা যেন আরও বাড়িয়া যায়। সকল কবিতায় কিছু আমরা একই রকমের অবস্থার-সংঘটন দেখিতে পাই না; আবার একই অবস্থা অনেক সময়ে বিভিন্ন কবিতার ভিতর বিভিন্ন রকমের ভাবোদ্রেক করে। এই বিভিন্ন অবস্থা সংঘটন প্রণালী ও বিভিন্ন প্রকার রস-বিকাশের ভিতর দিয়া আমরা কবিকে চিনিতে পারি।

আমি যাহা ভালবাসি, আমার ইচ্ছা হয় সকলেই তাহা ভাল বাসুক; আমি যাহা ঘৃণা করি, আমার ইচ্ছা হয় সকলেই তাহা ঘৃণা করুক। আমি যদি চিত্রকর হই, তবে আমার যাহা ভালবাসার ছবি, তাহা আমি এমনি ভাবে আঁকিতে চেষ্টা করিব—যেন তাহা সকলেই ভালবাসে। আমার ঘৃণার ছবি ও আমি এমনি ভাবে ফুটাইতে প্রয়াস পাইব যেন, তাহা সকলেরই মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। আমার এই ভালবাসা ও ঘৃণা করার ভিতর দিয়া আমি আমারই চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করি। এইজন্যই বিষয় নির্ব্বাচন, নির্ব্বাচিত বিষয়ের বর্ণনা প্রণালী (method of execution) ও অবস্থা-সংঘটন কৌশলের ভিতর দিয়া কবির অন্তর্নিহিত সত্য

প্রকৃতি ধরিবার প্রয়াস কাব্যসমালোচনায় আমরা খুব বেশী দেখিতে পাই। আবার এই বিষয়নির্ব্বাচন ও অবস্থা-সৃজন-কৌশল হইতে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করিবারও রীতি আছে। নবীন চন্দ্র প্রথম যৌবনে গীতি-কবিতার মধ্যে যে সমস্ত দৃশ্য ও অবস্থার সংঘটন করিয়াছিলেন,তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন; কেনই বা তিনি 'কুরুক্ষেত্র' ও পলাশী যুদ্ধের ঘটনা লইয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন; ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার কাব্যগুলি কোন্ শ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত।

নবীনচন্দ্রের নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করিলেই, নবীন চন্দ্রের কাব্য-কলা ও তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যাহ বলিয়াছি তাহার সত্যতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হইবে। কবিতাটী "পতিপ্রেমে দুঃখিনী" কোনও কামিনীর স্বগতোক্তি

"একদিন—হায় নাথ, পরে কিহে মনে
সেই দিনে?—একদিন নির্ঝরিণী পাশে,—
যথায় নিঃসৃত বারি তৃষিতে সন্তাসে,—
ভাসায়ে প্রনালি-শিলা স্ফটিক জীবনে,
বসিয়া ছিলাম, নাথ, শীতল ছায়ায়!
মধ্যাহ্ন রবির করে সলিল-শীকর
পতিত হইতেছিল ইন্দ্রধনু প্রায়;
বিকাশি কিরণ-ছটা মরি কি সুন্দর!

* * *

সর্ সর্ স্বরে শান্ত-নির্ঝর সলিল
পতিত হইয়াছিল রজত ধারায়;
ফাগুনে পল্লবে পূর্ণ অটবী ছায়ায়,
তীব্রতাপে ভীত মন্দ মধ্যাহ্ন আনিল
বেড়াইতেছিল ধীরে চুম্বি পত্রদল,
নাচাইয়া নিম্নবেণী অলকাকুন্তল,
দোলাইয়া কর্ণফুল—কলিকা কমল,
উড়াইয়া ধীরে ধীরে সুবার অঞ্চল।
শিলাতলে বসে সুখে বাল্য-নিবন্ধন,
অনাবৃত দেহলতা নব মুকুলিত,—
অতি মুকুলিত নহে,—নহে বিকশিত
সে মূর্ত্তি কি হয় না স্মরণে!"

এই কবিতায়ই আর এক স্থানে বিরহিণী পূর্ব্বসুখ মনে করিয়া বলিতেছে—

"আর একদিন নাথ;—সেইদিন, হায়!
পরে যবে মনে,—এই বিষন্ন অন্তর
হাসে, যথা হাসে শান্ত সুনীল সাগর,
ভাসে যবে পূর্ণশশী শারদ নিশায়।
আমরা পর্ব্বত শিরে শিলার উপর,
চক্রাকারে বেষ্টি যারে ঝাউ গীতরত—
দাঁড়াইয়া এই চিত্ত মোহিনী শিখরে।"

সেইস্থানে—

"অঞ্চল পাতিয়া সুখে করিয়া শয়ন,
বালিস দক্ষিণ বাহু শান্ত দুনয়নে,
চেয়ে আছি একদৃষ্টে একতান মনে;
অস্ত যায় দিন মণি লোহিত বরণ,
বিতরি অলক্তকান্তি পশ্চিম গগনে!
কনক কিরীট শিরে পাদপনিচয়
প্রণমিছে প্রভাকরে সায়াহ্ন পবনে;
হাসিছে প্রকৃতি মরি চারু শোভাময়!"

এই বর্ণনার আর বিশ্রাম নাই; একটী দৃশ্যের পর আর একটী দৃশ্য কবির কল্পনালোকে ভাসিয়া উঠিতেছে, কবি মনের আবেগে ভাষার তুলিকায় তাহাই আঁকিয়া যাইতেছেন। অস্তায়মান সূর্য্যের সুবর্ণ আলো বক্ষে লইয়া নীল-সলিলা বঙ্গসাগর তরঙ্গ তুলিয়া হাসিয়া চলিয়াছে; অদূরে "সুবর্ণ রেখা" সন্ধ্যালোকে রজত-রেখার মত দেখা যাইতেছে; পশ্চাতে মাঠে অগণন গাভি চড়িতেছে; সরোবর ঘাটে

"শোভিতেছে দীনা হীনা কুলনারীগণ,
কলসী কোমল কক্ষে রক্ত কলেবর!—"

তার পর কবি, চারিদিকের দৃশ্য একত্রিত করিয়া দুঃখিনী রমণীর মনের উপর কিরূপ ভাবে কাজ করিতেছে, সেই কথা বলিয়াছেন।

"মরালের কলরব বিহঙ্গ-কুজন,
তরুতলে শৃঙ্গনাদে রাখালের গীত,
বালকের ক্রীড়া-ধ্বনি, শৈশব সঙ্গীত,
গ্রামবাসী কোলাহল, সাগর গর্জ্জন,
দূরবহ সন্ধ্যানিলে মধুর হইয়া
বিমোহিত করিতেছে শ্রবণবিবর।"

কিন্তু—

"দেখিয়া শুনিয়া মন হলো উচাটন,
ঢাকিল ভাবনা -মেঘে হৃদয় আকাশ;
কি ভাবনা—কেন অশ্রু কাহার লাগিয়া,
আছে কিহে মনে, নাথ?—বলেছি তোমায়!"

ভাব ও কবিত্বপূর্ণ কতকগুলি অতীত স্মৃতি এই কবিতাটীর প্রাণ। কিন্তু মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন এই স্মৃতি কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃত জীবনস্মৃতি নহে; কবি আপনার মনে যে সৌন্দর্য্যের আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তিনি এই কবিতাটীতে তাহারই একটী দিক আমাদিগকে দেখাইতেছেন। একটী বিরহিণী সুন্দরী যুবতী রমনীকে যেখানে রাখিয়া দেখিলে সুন্দর দেখা বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন তিনি তাহাকে সে স্থানে রাখিয়া নিজে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহা পাঠকদিগকেও তাহা দেখাইয়াছেন। "রঙ্গমতীতে" বীরেন্দ্রের অতীত স্মৃতিতে আমরা নবীনচন্দ্রের সৌন্দর্য্যাদর্শের আর একটী দিক দেখিতে পাই। "মেঘদূত" পড়িতে পড়িতে হঠাৎ বীরেন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল, তাহারা শৈশব-সঙ্গিনী কুসুমিকাকে; তাহার সহিত ছোট বেলায় লতা কুঞ্জে, সরস তটে, পর্ব্বত শিখরে স্বাধীন ভাবে সে কত খেলা, কত বিচরণ করিয়াছে; আজ তার মনে পড়িল—সে—

"কৈশোরে একদা,
মধ্যাহ্নে মৃগয়া অন্তে, দিবা দ্বিপ্রহরে,
একাকী বসিয়া ওই লতিকা শিবিরে" শীতল ছায়ায়—

বাঁশী বাজাইতেছিল; নীরব মধ্যাহ্ন-প্রকৃতি মুগ্ধ হইয়া সেই বাঁশরীর সুমধুর ধ্বনি শুনিতেছিল—কিন্তু—

"যেই যুবা দেখিল ফিরিয়া,
নীরবিল বাঁশী;—এক অপূর্ব্ব মূরতি—
কিশোরী বালিকা এক বিমুক্ত-কবরী।
স্নাত, কেশরাশি পড়ি প্রপাতের মত,
সুবর্ণ উরসে, অংসে. সুবর্ণ লতায়
পৃষ্ঠে পার্শ্বে অঙ্গে শ্বেত অমল—অম্বরে
বিকাশিছে কাল্পনিক শোভা মনোহর।"

নবীনচন্দ্রের নারীসৌন্দর্য্যের এই আদর্শ "রৈবতকে" আরও ফুটিয়াছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু মৃগয়ায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া নিদাঘ, মধ্যাহ্নের তীব্র রবিতেজে ক্লান্ত হইয়া নিজের ব্যর্থশ্রমের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসুদেবপুরীতে ফিরিতেছিলেন; কিন্তু—

"কুঞ্জ গৃহে ওকি মূর্ত্তি! থামিল চরণ।
সুন্দর একটী শ্বেত মর্ম্মর আসনে
বসি একাকিনী ভদ্রা! সেই আসনের
শ্বেত পৃষ্ঠ উপাধানে
রয়েছে অনাবধানে,
অধোমুখ; সদ্য স্নাত কেশরাশি পড়ি,
রাখিয়াছে তনুমুখ সর্ব্বাঙ্গ আবরি।
একটী হরিণ শিশু বসি পদতলে
কভু ঘ্রাণিতেছে পদ রক্তশতদল,
কভু নিরখিছে লুপ্ত বদন মণ্ডল।"

নবীনচন্দ্র এই যে সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিয়াছেন, ইহা হইতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলি বাদ দিলে এই সৌন্দর্য্যের কি কিছু অবশিষ্ট থাকে? সেই নীরব নির্জ্জন লতাকুঞ্জ, সেই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের নিবিড় নিস্তব্ধতা, সেই শ্বেত মর্ম্মর আসন, আর সেই হরিণ শিশু, এই কবিতাটী হইতে বাদ দেও, যাহা থাকিবে তাহাতে তোমার আমার তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কবির তাহাতে তৃপ্তি নাই—কবিতা তাহা লইয়া ফুটিতে পারে না। কিরূপ ভাবে অবস্থা সংঘটন করিয়া নিজের কল্পনা-মত সৌন্দর্য্য ফুটাইতে হয় রোমান্টিক নবীনচন্দ্র তাহা

জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়াই উপরে উদ্ধৃত কবিতাগুলির ভিতর তিনি এত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের রসানুভূতি সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১। রামায়ণ মহাকাব্য।—হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত, ও ঢাকা সিটী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থখানিকে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত মনে করে যাইতে পারে। বাংলা ১২৭৬ সনে ইহা প্রকাশিত হয়; বয়সে খুব প্রাচীন না হইলেও বিষয় ও ভাষা উভয়ই ইহাকে বাংলার উদীয়মান নবীন সাহিত্য হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতেছে। কৃত্তিবাসের অনুকরণে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দই ইহাতে প্রধান; দুই এক স্থল ভিন্ন অন্য কোন ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, 'এই রামায়ণ-রচনা বিষয়ে মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণই প্রধান অবলম্বন।' রাম-চরিত অবলম্বন করিয়া ভারতের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা তাহাদেরই অন্যতম।

গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই লুপ্ত প্রায় রত্নটীকে উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া আমরা প্রকাশককে ধন্যবাদ দিতেছি।

২। স্বাস্থ্য-নীতি (গার্হস্থ্য) ও স্বাস্থ্য-নীতি (ব্যক্তিগত)।—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু প্রণীত, 'স্বাস্থ্য সমাচার' পুস্তকাবলীর অন্তর্গত। দুইখানি গ্রন্থই অতি উপাদেয় ও আবশ্যকীয়। অতি সহজ ও সরস ভাষায় কার্ত্তিক বাবু স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় অনেক কথা এই দুই খানি বইয়ে সংগৃহীত করিয়াছেন।

প্রথম খানিতে গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত, কি প্রকারে পরিষ্কৃত বায়ু ও জলের সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি কিরূপে রক্ষিত হওয়া উচিত, ইত্যাদি গৃহস্থ-মাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় খানিতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের নিয়মাদি সংক্ষেপে অথচ সহজ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। প্রাতরুত্থান, দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন সংহিতাকারদের অনেক বিধান নূতন বৈজ্ঞানিক মত অনুসারে সমর্থিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

গ্রন্থ দুইখানির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে, ইহাদের মূল্য কিছুই নয়, বলিতে হইবে। প্রথম খানির মূল্য তিন আনা ও দ্বিতীয় খানির মূল্য দুই আনা মাত্র। আমরা গ্রন্থ দুইখানির বহুল প্রচার কামনা করি। আর, এরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াও কি উচিত নহে? এক সময়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গ্রন্থ ইস্কুলের ছেলেদিগকে সযত্নে পড়ান হইত। বাংলায় স্বাস্থ্যের এমন কোন উন্নতি হয় নাই যে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আর আমাদের ছেলেদের জানা প্রয়োজন নয়।

৩। হিন্দুর জীবন-সন্ধ্যা।—কাব্য-গ্রন্থ, প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বি, এ,—মূল্য এক টাকা। গ্রন্থের নামেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং একাদশটী সর্গে বিভক্ত। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে; সর্ব্বত্রই একটা বিপুল শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণ-মন আপ্লুত করিয়া দেয়। গ্রন্থখানা সুখপাঠ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহার দুইটী দোষ আমরা উল্লেখ করিতে চাই। প্রথমতঃ ইহাতে প্রচুর মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে; পরবর্ত্তী সংস্করণে সে গুলি শোধিত হইবে, আশা করা যায়।

ইহার আর একটী দোষ এই যে, বর্ত্তমানে যখন ভারতে একটা নূতন জাতি গঠনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এমন দিনে প্রাচীন কলহের কথা কাব্যের রঙ্গীন চিত্রে অঙ্কিত দেখিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন কি না সন্দেহ। গ্রন্থকারের যে শক্তি রহিয়াছে, সুনির্ব্বাচিত বিষয়ান্তরে তাহা নিবিষ্ট হইলে আরও উপাদেয় ফল দান করিতে পারিত বলিয়া মনে হয়।

নৈমিষারণ্য

বাঙ্গলা ১৩২২ সনের বৈশাখ মাসে হরিদ্বার হইতে আমরা নৈমিষারণ্য দেখিতে পাই।

নৈমিষারণ্য ভারতের পরমপবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র। এই স্থানে শৌনক ঋষি পশুহিংসা-বিহীন দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী সুমহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই স্থানে শৌনক ঋষির যজ্ঞ-সভায় রোমহর্ষণ সূত সমবেত ঋষিমণ্ডলীকে অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি শ্রবণ করাইয়াছিলেন। রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা সৌতি এই স্থানে মহাভারত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত আছে যে এই পবিত্র ক্ষেত্রে কলির অধিকার নাই। শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ কলির ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা মনোময় চক্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা এই চক্রের অনুগমন কর, এই চক্রের নেমি যে স্থানে বিশীর্ণ হইবে অর্থাৎ যে স্থানে এই চক্রের গতি শেষ হইবে তাহাই পাবন দেশ। তোমরা সত্য যুগের আবির্ভাব না হওয় পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান কর। এই স্থানে কলির অধিকার নাই।" ঋষিগণ তদনুসারে চক্রের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। চক্র-নেমি এই স্থানে আসিয়া বিশীর্ণ হইল ও ঋষিগণ এই পবিত্র কাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চক্রনেমি এই স্থানে বিশীর্ণ হওয়ায় এই স্থানের নাম নৈমিশারণ্য হইয়াছে।—যথা দেবী ভাগবতে ;—শৌনক উবাচ

"কলিকালবিভীতাঃ স্মো নৈমিশারণ্যবাসিনঃ।
ব্রহ্মণাত্র সমাদিষ্টা শ্চক্রং দত্বা মনোময়ম্॥
কথিতং তেন নঃসর্ব্বান্ গচ্ছধ্বেতস্য পৃষ্ঠতঃ।
নেমিঃ সংশীর্য্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্মৃতঃ॥
কলেস্তত্র প্রবেশো ন কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি।
তাবত্তিষ্ঠন্ত তত্রৈব যাবৎ সত্যযুগং পুনঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গৃহীত্বা তৎকথাং নবাম্।
চালয়ন্নির্গত স্তূর্ণ সর্ব্বদেশদিদৃক্ষয়া॥
প্রেত্যাত্র চালয়ংশ্চক্রং নেমিঃ শীর্ণোত্র পশ্যতঃ
তেনেদং নৈমিশং প্রোক্তং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্॥

বরাহ-পুরাণে কথিত আছে যে, বিষ্ণু নিমিষমধ্যে এই স্থানে দানব সংহার করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে।

"এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলং॥
অরণ্যেহস্মিং স্ততস্তেত নৈমিষারণ্য-সংজ্ঞিতং॥

বেলা ৮॥ ঘটিকার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রেল পথের উভয় দিকে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। একটী ষ্টেশন ছাড়াইয়া পরে "বেণীগঞ্জ" ষ্টেশন। আমরা যে গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম সেই গাড়ীতে একটী সন্ন্যাসী উঠিয়াছিলেন। তিনিও নৈমিষারণ্য দর্শনার্থ যাইতেছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত "হত্যাহরণ" তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া বেণীগঞ্জ ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। বেণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে "হত্যাহরণ" তীর্থ ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ষ্টেশন হইতে পদব্রজে যাইতে হয়। "হত্যাহরণ" তীর্থ একটী কুণ্ড ; এই কুণ্ডে স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য।

বেণীগঞ্জের পরেই "নিমষার" ষ্টেশন। আমরা এই ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। তখন বেলা ৯॥ টা। আমরা পাণ্ডার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। ষ্টেশন হইতে পাণ্ডার বাড়ী আধ মাইলের কম হইবে। আমরা পাণ্ডার বাড়ীতে জিনিসাদি রাখিয়া কতকক্ষণ বিশ্রামান্তে স্নান ও তীর্থদর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

আমরা সর্ব্বপ্রথম "চক্রতীর্থে" উপস্থিত হইলাম। চক্রতীর্থ

একটী কুণ্ড। যাত্রীগণ এই পবিত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। কুণ্ডের চতুর্দ্দিক ইষ্টক দ্বারা বান্ধান। কুণ্ডের তীরে মন্দির। কুণ্ডের তীরে স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন ও বিশাল নিম্ব, বট প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। আমরা চক্র-তীর্থের জল মস্তকে স্পর্শ করিয়া গোমতী নদীতে স্নান করিতে গেলাম।

আমরা বৈশাখের প্রখর সূর্য্য কিরণে বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম। গোমতী নদীতে স্নান করিয়া সুস্থ হইলাম। স্নানান্তে আমরা ব্রহ্ম কুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে ব্রহ্মাবর্ত্তের খুটা বলে। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ প্রাচীন কালে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে কথিত হইত। যথা—

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

সম্ভবতঃ এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমানা ছিল, এই নিমিত্ত এই স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্তের খুটা বলিয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমদিকে একটী বটবৃক্ষ। এই স্থানে একটী সাধুর আশ্রম আছে। পর্ণ কুটীরের অভ্যন্তরে সাধু বাস করেন।

এই স্থান হইতে আমরা ব্যাসদেবের আশ্রমে গমন করিলাম। এই স্থানটী অতি মনোহর। এই স্থানে কয়েকটী অতি প্রাচীন ও বৃহৎ বট ও নিম্ব বৃক্ষ আছে। কিম্বদন্তী এই, যে এই স্থানে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল। নিকটে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর মন্দির। ব্যাসদেবের আশ্রমের অনতিদূরে পূর্ব্বদিকে রাজা দশরথের তপস্যা স্থান। প্রবাদ এই যে, ভগবানকে পুত্র রূপে লাভ করিবার জন্য রাজা দশরথ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে আমরা পুনরায় চক্রতীর্থে আগমন করিলাম। চক্রতীর্থে কুণ্ডের তীরে কয়েকটী মন্দির আছে। একটী মন্দিরে শিবলিঙ্গ; মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে বিষ্ণু, সূর্য্য, নারায়ণ, গণেশ, দুর্গা, পার্ব্বতী ও দধীচি মুনির বিগ্রহ। নিকটে আর একটী মন্দিরে মহাবীরজির মূর্ত্তি আছে।

এই স্থান হইতে আমরা সূতের আসন দর্শন করিতে গমন করিলাম। এই স্থানে আসিয়া মনে কত পুণ্যস্মৃতি জাগরিত হইল। সূত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ আদি অধ্যয়ন করিয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে শৌনক প্রভৃতি ষষ্ঠি সহস্র ঋষির নিকট অধীত পুরাণসংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। যেমন শ্রোতৃমণ্ডলী, তেমনই বক্তা। মানস নয়নে দেখিতে পাইলাম ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ এই পুণ্যভূমিতে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র সম্মিলনে জল স্থল অন্তরীক্ষ পবিত্র হইয়াছে। তাঁহাদের পবিত্র শ্বাস প্রশ্বাস বহন করিয়া সমীরণ ধন্য হইয়াছে; যজ্ঞ কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত ঘৃতের পবিত্র গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়াছে। আর রোমহর্ষণ পুত্র সূত পবিত্র পুরাণ-সংহিতা কীর্ত্তন করিয়া জগতের জন্য অক্ষয় জ্ঞান ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এই স্থানে আসিলে ভারতের অতীত যুগের সাধনার কথা মনে পড়ে। এই স্থানে আসিলে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্ম জ্ঞানের স্মৃতি মনে উদিত হয়।

সূতের আসন একটী উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। এই স্থানটী একটী টিলার মত। চতুর্দ্দিকে বহু দূর বিস্তৃত উন্মুক্ত স্থান। টিলার উপর একটী মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক স্থানে বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার বিগ্রহ ও আর এক স্থানে সূতের আসন। এই মন্দিরের নিকটে উচ্চ ভূমির উপর আর একটী মন্দির। এই মন্দিরে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তি। ঋষিগণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হওয়ায় জন্য এই শিবের অর্চ্চনা করিতেন।

সূতের আসন দর্শন করিয়া আমরা ললিতাদেবীর বিগ্রহ দর্শনার্থ গমন করিলাম। পথে এক স্থানে একটী বৃহৎ বট বৃক্ষ মূলে একটী লোক দেবীর পূজার নিমিত্ত শাঁখা সিন্দুর আলতা প্রভৃতি উপকরণ ও ভোগের বাতাসা বিক্রয়ার্থ বসিয়া আছে। আমরা পূজার উপকরণ খরিদ করিয়া লইলাম। বেলা মধ্যাহ্ন হইয়াছিল। প্রখর সূর্য্য কিরণে রাস্তার বালুকা এত উত্তপ্ত ও বায়ু এত উষ্ণ হইয়াছিল যে, আমাদের যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। পথে হাঁটিতে পা যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল, আমরা অবসন্ন দেহে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

দেবীর মন্দিরটী অতি বৃহৎ। মন্দির প্রাঙ্গন ইষ্টক দ্বারা বান্ধান। মন্দির প্রাচীরবেষ্টিত। মন্দিরাভ্যন্তরে মায়ের পিত্তল নির্ম্মিত সুন্দর দশভূজা মূর্ত্তি। মায়ের মূর্ত্তি চামেলী পুষ্পের মালা দ্বারা অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করা হইয়াছে। চামেলী ও অন্যান্য ফুলের গন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর আমোদিত হইয়াছে। ললিতাদেবীর খুব মাহাত্ম্য। স্থানটী বেশ জাগ্রত। এই স্থানে আসিলে মনে বেশ আনন্দ ও তৃপ্তি হয়। মন্দিরের বাহিরে একটী বৃহৎ ইন্দারা আছে। ইন্দারার জল অতি উৎকৃষ্ট। আমরা বড় শ্রান্ত হইয়াছিলাম। ললিতা দেবীর প্রসাদী মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ও ব্রাহ্মণ প্রদত্ত ইন্দারার সুশীতল জল পান করিয়া আমরা সুস্থ হইলাম।

ললিতা দেবীর মন্দিরের প্রাচীরের বাহিরে "পঞ্চ প্রয়াগ" কুণ্ড। কুণ্ডের তীরে সুবৃহৎ বটবৃক্ষ শোভা পাইতেছে।

নৈমিষারণ্য বহুদূর বিস্তৃত। ৮৪ ক্রোশ ব্যাপী স্থান নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। ফাল্গুন মাসে ১৫ দিন ব্যাপিয়া সাধু সন্ন্যাসী ও যাত্রীগণ নৈমিষারণ্য পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। আমরা নিম্নষার ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান গুলি মাত্র দর্শন করিয়াছিলাম। নিমষার হইতে ৬ মাইল দূরে "মিশ্রিক" নামক ষ্টেশন। মিশ্রিক নৈমিষারণ্যের অন্তর্গত। মিশ্রিক ষ্টেশনের নিকটে দধীচি মুনির আশ্রম। বৃত্রাসুরের উপাখ্যান হিন্দু মাত্রেই জানেন। বৃত্রাসুর বধের নিমিত্ত বজ্র নির্ম্মাণের, জন্য দধীচি মুনি ইন্দ্রের প্রার্থনা অনুসারে নিজ দেহের অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত আছে যে, এই পুণ্য ক্ষেত্রে সমস্ত দেবদেবীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। আমরা সময় অভাবে মিশ্রিক যাইতে পারি নাই।

নৈমিষারণ্যে আসিলে মনে বড় প্রশান্ত ও উদাস ভাবের সঞ্চার হয়। এই স্থানে লোকের বসতি বিরল। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড মাঠ ও স্থানে স্থানে বৃহৎ ও ঘন সন্নিবিষ্ট আম্র বাগান ও নানা জাতীয় বৃক্ষ শ্রেণী। স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রায় দেব মন্দির। এই স্থান সাধনার বিশেষ উপযোগী। স্থান মাহাত্ম্যে চিত্তে কেমন একটা প্রশান্ত ভাব স্বতই উদিত হয়। অতীত যুগের গৌরবের স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া মনে কেমন একটা বিষাদের ছায়া আনয়ন করে।

দেবী ভাগবতে নৈমিষারণ্য দেবীর পীঠ স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নৈমিষারণ্য যুক্ত প্রদেশের অন্তঃপাতী সীতাপুর জিলার অন্তর্গত। নৈমিষারণ্যে পূর্ব্বে রেলপথ ছিল না। কয়েক বৎসর হইল আউধ এণ্ড রোহিল খণ্ড রেলওয়ের বালামৌ জংশন হইতে সীতাপুর পর্য্যন্ত শাখা রেলপথ খোলা হইয়াছে। এখন নৈমিষারণ্য যাওয়ার বেশ সুবিধা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সাধন ক্ষেত্র। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া কত সাধক ও মহাপুরুষগণ এই পুণ্য ভূমিতে সাধনা করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক তীর্থস্থান সাধনার কেন্দ্র ভূমি। এক একটী তীর্থস্থান কত যুগ যুগান্তরের সাধনার স্মৃতি প্রাণে

জাগরূক করিয়া দেয়।

পৃথিবীর কোন্ দেশে এত তীর্থস্থান আছে? কোন্ দেশে এত সাধনার স্মৃতি বক্ষে লইয়া তীর্থস্থান গুলি পথিকের হৃদয়ের নিভৃত তন্ত্রীতে এমনই করিয়া আঘাত করে? কোন্ দেশে এত সুন্দর পর্ব্বত, নদ নদী বন, উপবন প্রান্তর ও নগর সুদূর অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করে? কোন্ দেশে যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এত সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের এমন সুন্দর মেলা হয়? অতীতের স্মৃতিই ভারতের একমাত্র সম্বল ও ভরসা। আমরা যেন এই পুণ্য স্মৃতি বক্ষে লইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেন।

প্রতিভা

৬ষ্ঠ বর্ষ　　　　চৈত্র ১৩২৩　　　　১২শ সংখ্যা

বার্ণার্ড শ'

কিছু দিন পূর্ব্বে আমি বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রবন্ধটী প্রকাশ্যে পঠিত হইয়াছিল এবং যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে।* প্রবন্ধ পাঠান্তে যে সমালোচনার দস্তুর আছে, সেই উপলক্ষে সভাস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, আমি শুধু বার্ণার্ড শ'র একটা দিকই দেখাইয়াছি;—প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে তিনি যে গুরু অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহারই শুধু আলোচনা করিয়াছি, তাঁহার অপরাহত ভাঙ্গিবার চেষ্টারই শুধু বিবরণ দিয়াছি; কিন্তু এই তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যেও, এই প্রবল ভাঙ্গিবার চেষ্টার ভিতরেও বার্ণার্ড শ'র গড়িবার একটা আকাঙ্ক্ষা আছে; অন্যান্য বহু কবি ও দার্শনিকের ন্যায় বার্ণার্ড শ'রও নূতন আদর্শের অনুযায়ী একটা নূতন, মহত্তর সমাজের সৃষ্টি,—একটা বলবত্তর মানবের সমষ্টি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আছে;—সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলি নাই। আমার প্রবন্ধের এই সমালোচনার ন্যায্যতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বার্ণার্ড শ' সম্বন্ধে আমার সকল কথা বলা হইল না, এই বলিয়াই আমি উপসংহার করিয়াছিলাম। তখন সময় ও স্থানের অভাবে যাহা অসম্পূর্ণ রাখিতে হইয়াছিল, এবার তাহা সম্পুর্ণ করিবার চেষ্টা কিছুদূর অগ্রসর করিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে কাহারও কাহারও মনে যে একটা ভুল ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাও অপনোদিত করা সঙ্গত মনে করি। সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, সর্ব্বদাই আমাদিগকে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন এবং অনেক সময় বিসদৃশ ও অদ্ভুত সব মতের আলোচনা করিতে হয়; কিন্তু একথা কেহ মনে করে না যে, যাহার মতের আলোচনা করা হয়, আলোচক তাহারই মত স্বীকার করেন। তথাপি বার্ণার্ড শ'র সব মতের সহিত আমার মতের ঐক্য আছে, এ ধারণা কিসে কাহারও কাহারও মনে ঢুকিল, বলিতে পারি না। বার্ণার্ড শ' যে সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, সে বিষয়গুলির সমস্তগুলির সম্বন্ধে আমি কখনও ভাবিয়াছি, একথা বলিলে প্রবঞ্চনা করা হয়। সুতরাং এ সব বিষয়ে আমার নিজের কোন মত আছে কিনা, [illegible] নিজেই জানি না; কারণ, না ভাবিয়া কাহারও [illegible] হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমার নাই।

আর, যে সমস্ত বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ [illegible] করিয়াছি, সে সকল বিষয়েও বার্ণার্ড শ'র [illegible] —একথা আমি কোথাও বলি নাই; কারণ, আমার

* প্রতিভা, আশ্বিন ১৩২৩

নিজের মত বলিবার কোন প্রয়োজন বা সুযোগ সেখানে ছিল না। অতঃপর বোধ হয়, ইহা স্বীকৃত হইবে যে, 'অদ্ভুত', 'বিদ্রোহী'—ইত্যাদি বিশেষণ যদি কাহারও প্রাপ্য হয়, তবে সে আমার নয়, বার্ণার্ড শ'র।

প্রশ্ন হইতে পারে বর্ব্বরোচিত এই সকল মতের অবতারণায় কি লাভ? জীবনের পথে আমরা কোথায় ঠেকিয়াছি? আমাদের সমাজ কি চলিতেছে না? আমার উত্তর, কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না; কিন্তু সাহিত্যের সকল চেষ্টাই একটা স্পষ্ট প্রয়োজনের জন্য হয়, তাহা বলিতে পারি না। জানিলে কি লাভ হইবে, তাই ঠিক করিয়া যদি মানুষ জ্ঞানের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে এত স্কুল কলেজ, এত পুস্তকালয়, এত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন আবশ্যক থাকিত তাহা ত বোধ হয় না। খ্রীষ্ট জন্মিবার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে এথেন্সে কে কি বলিয়াছিল, কিংবা খ্রীষ্ট জন্মিবার ১০৬৬ বৎসর পরে হেষ্টিংস্ নামক স্থানের লড়াইয়ে কারা কেন জিতিয়াছিল,—এ সব খবর জানিলে সস্তায় চাউল কিনা যায়, এমত ত নহে; আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের জর্ম্মেণ সাহিত্যের বিশিষ্টতা কি—সে খবরে কাহারও ব্যবসার সুবিধা হয়, এমতও নয়। তথাপি মানুষ এ সকলের তত্ত্ব রাখে এবং রাখিবে। এ সকলের আলোচনায় যাহা লাভ হয়, তার চেয়ে বেশী লাভ বার্ণার্ড শ'র আলোচনায় আমরা কেন আশা করি, তাহা জানি না।

বার্ণার্ড শ'র মত তাঁহার নিজের দেশেও গৃহীত হয় নাই; কোনও দিন কোথাও হইবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ করা চলে, যদিও ভবিষ্যৎ এতই অনিশ্চিত যে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। তথাপি, এ সকলের আলোচনা নিষিদ্ধ হইলে ইউরোপের ইদানীন্তন সাহিত্যের বিশেষ কিছু বলিবার থাকিত কি না সন্দেহ। বার্ণার্ড শ'র সর্ব্ব প্রধান সমস্যা বিবাহ; এই বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা আজ ইউরোপের সাহিত্যে এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইংলণ্ডেরই অন্যতম নাট্যকার, সম্মানিত স্যর আর্থার পিনারোর নাটকেও তাহার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। অবশ্যই, সকলের সমাধান কখনও এক হইবে না; কিন্তু প্রশ্ন যে উঠিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান ... কেহ বলেন, এ সকলের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের সনাতন নিষ্পত্তির উপরে বাক্য প্রয়োগ করিতে যাওয়া অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ। হইতে পারে; কিন্তু এই প্রবল তুফানের ধাক্কা যে নিজেদের ঘরের কোণেও লাগিতেছে! কোন্‌টা অর্ব্বাচীনতার লক্ষণ,—ইহা সামলাইতে চেষ্টা করা, না, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা?

ইউরোপের হয় ত মানসিক স্বাস্থ্য বড় ভাল নয়। এমন সব প্রশ্ন সে দেশের সাহিত্যে আজ উঠিতেছে, এমন সব চিত্র তথায় আজ অঙ্কিত হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে কখনও কাব্য-কলার বিষয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। শুধু ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, নরওয়ে, রুশিয়া, সর্ব্বত্রই—য়্যানাটোল ফ্রান্স, সুডারমান, ইবসেন্, টলষ্টয় প্রভৃতি অনেকেই ত প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে একটু না একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। কেহ বা কৌতুকচ্ছলে, কেহ বা উপদেশ-চ্ছলে, কেহ বা বিদ্রোহীর পরিপূর্ণ বিদ্বেষ-বুদ্ধি লইয়া শরাসনে জ্যারোপণ করিয়াছেন, এবং কাব্যের তূণীর হইতে বিশেষণ-শরজালে সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এ সকলের একেবারেই কোন খবর না রাখিয়া পারি কি?

ইউরোপকে অবহেলা করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। ম্লেচ্ছ বলিয়া আমরা হয় ত দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু ম্লেচ্ছ ত দূরে থাকে নাই। আর, আজ ইউরোপেরই অন্যতম প্রধান শক্তি জর্ম্মেণী স্পষ্ট করিয়া বলিতে চায় যে, শুধু সফেদ রঙ্গের মানুষের জন্যই এ পৃথিবী। ইউরোপের হাতে শক্তি আছে; হ'তে পারে, এ আসুর, জড়াশ্রিত শক্তি, —হ'তে পারে, ইহা আধ্যাত্মিক শক্তি নয়; কিন্তু ইহা শক্তি; সুতরাং ইহা হইতে ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে। যাহাদের হাতে এই শক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চিনি না, বলিলে তাহারা ক্ষুণ্ণ হইবে না, আমাদেরই জ্ঞানের পরিধি সংকীর্ণ হইয়া আসিবে। সুতরাং, চাঞ্চল্য হেতুই হউক, কিংবা স্বাভাবিক, সুস্থ গতিনিবন্ধনই হউক, ইউরোপের মন আজ কি নিয়া ব্যাপৃত—সে সংবাদ আমাদের রাখা উচিত।

আর, সব বিষয়েই যদি চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকিত, তাহা হইলে সাহিত্য এত দিন কি নিয়া বাঁচিয়া আছে ? মানুষের সেই চিরন্তন সুখদুঃখ—তাহার সেই সনাতন আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, সেই আশা, নৈরাশ্য—এ সকল ত হোমার বাল্মীকিতে প্রচুর প্রকাশ লাভ করিয়াছে। মানুষের সাহিত্য-চেষ্টা তথাপি সেখানেই শেষ হয় নাই কেন ? গেটে-সেক্সপীয়র, কালিদাস-ভবভূতির পরে যদি মানুষের আর কিছু বলিবার ও ভাবিবার না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর রঙ্গ-মঞ্চের ভূমিতে এত দিন আলুর চাষ হইত; কাণ্ট-হেগেল বা কণাদ-গোতমের পরে যদি মানুষের আর কিছু জিজ্ঞাস্য না থাকিত, তাহা হইলে আর অয়কেন—বার্গসোঁর কথা আমাদিগকে শুনিতে হইত না। এত সব চেষ্টার পরে যদি মানুষের আর কিছু ভাবিবার ও করিবার না থাকিত, তাহা হইলে এত দিন মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লিখিত হইয়া যাইত এবং মানবের জীবনে শেষ দাড়ি পড়িত। কিন্তু ভবিষ্যতে যত দূরই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, এই চরম সীমার সাক্ষাৎ ত কোথাও পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, বার্ণার্ড শ' প্রভৃতির সমাজ ও নীতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে যে সব বিকট মত, তাহার আলোচনায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। স্বীকার করি, সে সব মত কার্য্যে পরিণত করিলে আপাততঃ নিশ্চয়ই অনেক বিভ্রাট ঘটিবে এবং হয় ত বা অন্তিমেও ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহা জানিলেই যে মানুষের সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমন ত মনে হয় না। যদিই এমন ভঙ্গুর কোন সমাজ থাকে, তবে সে সমাজে বাস্তবিক কোন বন্ধন আছে কি ? পশুপক্ষীর সমাজে জীবন-ব্যাপী বিবাহ বন্ধন নাই, একথা কে না জানে ? তাহাতে ত মানুষের সমাজ টপকাইয়া পড়ে নাই। ইউরোপীয় সমাজে, মুসলমান সমাজে বিধবাদের বিবাহ হয়, একথা হিন্দু সমাজের সকল বিধবাই এখন জানেন; কিন্তু কই, পুনর্বিবাহের জন্য বিধবারা ত এখন পর্য্যন্ত কোন সমিতি গঠন করেন নাই। ইউরোপীয় রমণী অবরোধ-প্রথার অধীন নয়, একথাও আমরা অনেক কাল জানিতেছি; এবং এই অবরোধের বিরুদ্ধে আন্দোলনও ত হইয়াছে; কিন্তু ফল হইয়াছে কি ? যাহা অন্যত্র কার্য্যে দেখিয়াও আমাদের সমাজ গ্রহণ করে নাই, সেরূপ কোনও একটা বিষয়ে একটু তথাকথিত অগ্রসর মত জানিতে পারিলেই অগ্নি-সন্নিকর্ষে মাখনের মত আমাদের সমাজ গলিতে আরম্ভ করিবে, এ ভয়ের কোন হেতু আছে কি ?

হয় ত চারিদিকে শত শত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া আমরা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি, সহজেই ভীত হইয়া পড়ি; কিন্তু তথাপি বার্ণার্ড শ'র দুই একটা উক্তির আলোচনায়ই আমাদের সমাজে নূতন দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবের আবির্ভাব হইবে, এ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বরং অন্যান্য আলোচনার ন্যায় এ আলোচনারও লাভ আছে; যাহা খাঁটি সত্য, তাহাকে নিকটে পাওয়া যাইবে। সকল সমাজেরই কর্ত্তব্য, ব্যক্তির চিন্তা ও রসনাকে সংযত না করিয়া তাহার ক্রিয়া সংযত করা। যে যাহা খুসী ভাবুক এবং নির্ভীক চিত্তে তাহা প্রকাশ করুক, তাহাতে সমাজের কোন অনিষ্ট হইবে না; বরং নির্ভীক আলোচনার সুফল সমাজ পাইবে। কিন্তু কেহ হঠাৎ নূতন কোন নীতি অবলম্বন করিতে চাহিলে, নূতন পদ্ধতিতে দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ করিতে চাহিলে, সমাজ বাধা দিতে পারে। কেহ যদি বলে যে, দেশের ভূমিতে কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকা উচিত নয়, আর অমনই যদি কোন সমাজ ধর-পাকড় করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে সমাজের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু এই মত অনুসরণ করিয়া কেহ যদি জমীদারের জমীদারী লুট করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সমাজের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা জানি। সুতরাং বার্ণার্ড শ'র মত কেহ কার্য্যে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে আমরা সতর্ক হইব; শুধু আলোচনায় কোন ভয়ের কারণ নাই। অবশ্যই, আলোচনার ফলে যদি সকলেই কিংবা বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করে যে, ইহা অত্যন্ত সমীচীন মত এবং কার্য্যে অনুসৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে আর উপায় নাই। কিন্তু আমাদের ভরসা করা উচিত যে, সমাজের আচার অত

সহজে ভাঙ্গে না। তা যদি হইত, তবে যীশুকে ক্রুশে মরিতে হইত না, মহম্মদকে মদিনায় পলাইতে হইত না, এবং ইউরোপের এত সব লোককে ধর্ম্মমতের জন্য আগুণে পুড়িয়া মরিতে হইত না। সুতরাং সমাজের আচার সম্বন্ধে একটা নূতন দিক হইতে একটু আলোচনা করিতে আমরা সাহস করিতে পারি।

সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি। কিন্তু যাহারা একত্রিত হইয়া এই সমষ্টির সৃষ্টি করে, তাহাদের গণনা একাধিক প্রকারে হইতে পারে। বাঁশের ঝাড়কে কেহ কঞ্চির সমষ্টি মনে করে না; ইহা বাঁশেরই সমষ্টি, যদিও কঞ্চির সংখ্যা বাঁশের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। এখানে এক একটী বাঁশ যেন কঞ্চি-পরিবারের পিতা; তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেন কঞ্চি-সমূহ একটী ক্ষুদ্রতর সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের সমাজকেও তেমনই এক সময়ে ব্যক্তির সমষ্টি মনে না করিয়া পরিবারের সমষ্টি মনে করা হইত; বাঁশকে আশ্রয় করিয়া তার কঞ্চিগুলি যেমন একটী ক্ষুদ্র সমষ্টি সৃষ্টি করে, তেমনই পরিবারের পিতাকে আশ্রয় করিয়া একাধিক ব্যক্তি যে একটী ক্ষুদ্র সমষ্টির সৃষ্টি করে, সমাজকে ব্যস্ত ভাবে দেখিবার সময় সেই ক্ষুদ্র সমষ্টিকেই এক ধরা হইত। রোমের প্রাচীন আইনে আমরা এই প্রকার গণনার সাক্ষাৎ পাই। পরিবারকে 'সাম্রাজ্যের ভিতরে সাম্রাজ্য' (Imperium in Imperio) মনে করিয়া 'পরিবারের পিতাকে' (pater familias) রোমক আইন পরিবারের অন্য সকলের উপর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা করিয়া দিয়াছিল। আমরা—যাহারা গোত্র-প্রবরের হিসাব এখনও হারাই নাই—আমরা জানি পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি কেমন সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণায়, ইংলণ্ডে বিশেষতঃ, সমাজকে পরিবারের সমষ্টি মনে না করিয়া ব্যক্তির সমষ্টি মনে করাই রীতি। রুশো এবং হব্‌স্‌ প্রভৃতি দার্শনিক সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলেও এই ধারণা দেখিতে পাই যে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, পরিবারের সমষ্টি হইতে নয়। ইহা হইতে মনে হয়, যেন পরিবারের সৃষ্টি আগে না হইয়া সমাজের সৃষ্টিই আগে হইয়াছে; এবং সমাজ সৃষ্ট হইয়া যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়, এসিয়াটিক সোসাইটী, প্রভৃতির উৎপাদন করিয়াছে, তেমনই কোনও এক অতীত যুগে পরিবারেরও উৎপাদন করিয়াছিল। ইহার জন্য হয় ত সমাজকে বিশেষ বেগও পাইতে হয় নাই; একদা সংযুক্ত স্ত্রীপুরুষকে আমরণ কিংবা দীর্ঘকাল সম্বদ্ধ থাকিতে এবং সন্তান-পালনে পরস্পরের সহায়তা করিতে আদেশ করিয়া অতি সহজেই সমাজ পরিবারের উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল। এইরূপে পরিবার উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তির সৃষ্টি, তাহার লালন-পালন, ও তাহার শিক্ষার সুব্যবস্থা করা।

এই দুইটী মতের কোন্‌টী সমীচীন এবং ইতিহাসের দিক হইতে কোন্‌টী সত্য, সে বিচার এখানে অসম্ভব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সমাজ সম্বন্ধে ইদানীন্তন ধারণার মধ্যে ব্যক্তির প্রাধান্যই বেশী, তথাপি পরিবার এবং পিতার আধিপত্য একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। এখনও ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রকে পিতার ইচ্ছার অধীন রাখিবার জন্য সমাজের আইনে বিধান রহিয়াছে। ইহার কারণ স্পষ্ট। মানব শিশু এমন অশক্ত অবস্থায় এ পৃথিবীতে আসে যে, পিতা মাতার যত্ন না হইলে সে কখনও সমাজের অংশ, ব্যক্তিরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। এবং পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে আপনার স্বতন্ত্র অংশ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারে না।

পরিবার সম্বন্ধে এই কয়টী কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, নইলে বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় ভুল হইতে পারে। সমাজের চক্ষে বিবাহের প্রয়োজন ব্যক্তির উৎপাদন; এবং বিবাহ-বন্ধনের স্থায়িত্ব ও পরিবারের সত্তা সমাজ যে স্বীকার করে তাহার কারণ, ইহা দ্বারা ব্যক্তির লালন ও শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। উপন্যাসে হইতে পারে, কিন্তু জীবনের নাটকে বিবাহ শেষ অঙ্ক নয়, একটী বিষ্কম্ভক মাত্র; এবং ইহার পরেই জীবনের বাস্তবিক প্রধান ঘটনাগুলির আবির্ভাব হয়। 'পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা'—এই এক কথায় সমাজ সমস্ত নাটক উপন্যাসের সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছে এবং বিবাহ

সম্বন্ধে নিজের চূড়ান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে।

বিবাহ স্ত্রীপুরুষের মিলনের একটী বিশিষ্ট প্রকার। 'একটী বিশিষ্ট প্রকার' বলিতেছি এই জন্য যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে এবং অতি নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেও 'বিবাহ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অস্তিত্ব নাই, অথচ সেখানেও স্ত্রীপুরুষের মিলন হয়। এবং শুধু বিবাহের নয়, স্ত্রীপুরুষের সর্ব্বপ্রকার মিলন হইতেই ব্যক্তির উৎপত্তিই প্রকৃতির অভীপ্সিত।

কিন্তু বিবাহ নামক যে সামাজিক প্রথার সহিত আমরা পরিচিত এবং যাহা হইতে, শুধু ব্যক্তির নয়, পরিবারেরও সৃষ্টি হয়, তাহার আরও একটা ফল আছে। প্রকৃতির অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য বিবাহ না হইলেও চলে; কিন্তু বিবাহ দ্বারা এই উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই, তা ছাড়া, মানুষের চিত্তেরও উন্নতি হয়। বিবাহিত জীবনে যে একটা পবিত্রতা, যে স্নেহ-প্রেম, যে সহানুভূতি ও পরস্পরের হিত-চিকীর্ষার উৎপত্তি হয় তাহার মূল্যও কম নয়। বিবাহ—এবং তাহার ফল পরিবার, এই সকল উচ্চ চিত্তবৃত্তির উৎপাদনে ও পোষণে সহায়তা করে বলিয়াই সকল দেশের লোকই বিবাহকে এত পবিত্র মনে করে। নরনারীর যে বিশিষ্ট প্রকারের মিলন বিবাহে পর্য্যবসিত হয়, তাহার ফলে কেমন সব চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ও মার্জ্জনা সম্ভব, মানবের সমগ্র সাহিত্য-কলা তার সাক্ষী। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে—এই বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া মনুষ্যের কত মহীয়সী চিন্তা, কত গরীয়সী চিত্ত-বৃত্তিই না প্রকাশ লাভ করিয়াছে! শুধু প্রকৃতির উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য বিবাহই একমাত্র পন্থা নয়; শুধু পরিবার প্রতিষ্ঠাই বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য নয়; মানুষের চিত্তকে সংযত ও পবিত্র করা,—তাহার বিবিধ মূল্যবান্ ভাবের স্ফুরণে সহায়তা করাও বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য, এবং বোধ হয় প্রধান লক্ষ্য।

কিন্তু ইউরোপে আজ বিবাহ নিয়া যে আলোচনা হইতেছে, তাহাতে এই প্রধান লক্ষ্যটাই প্রায়ই চাপা পড়িয়া যায়। বার্ণার্ড শ'র আলোচনায় এই ত্রুটী অত্যন্ত স্পষ্ট। ইঁহারা যে উদ্দেশ্যে বিবাহের সংস্কার চাহিতেছেন তাহা আর কিছু নয়,—সুস্থ ও সবল ব্যক্তির সৃষ্টি, সুস্থ ও সবল পরিবারের প্রতিষ্ঠা, এবং সমাজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও সবলতার পুনরানয়ন। 'পুনরানয়ন'—কেন না, ইঁহাদের কাহারও কাহারও মতে এক সময়ে মানুষের এই স্বাস্থ্য ও সবলতা ছিল, কিংবা মানুষ তাহা পাইবার পথে যাইতেছিল; এমন সময় সমাজের বিধি সে পথের কণ্টক হইয়া পড়িয়াছিল।

এই যে আদর্শ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার দার্শনিক পিতা নীট্‌চে। কিন্তু নীট্‌চেরও দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্লেটোও এইরূপ আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার মত যদি কেহ কাব্যে উপস্থাপিত করিতেন, তাহা হইলে না জানি লোকে কি বলিত! বার্ণার্ড শ'ত তবু বিবাহের কথঞ্চিৎ স্থায়িত্ব অনিচ্ছা করেন না। কিন্তু প্লেটোর আদর্শ-রাষ্ট্রে বিবাহ নামক ব্যাপারের কোনরূপ গন্ধও থাকিবে না। সেখানে শুধু স্ত্রীলোক ও পুরুষ এবং অবশ্য সন্তানও থাকিবে; কিন্তু কোনও নারী কোনও ব্যক্তিবিশেষের স্ত্রী নয়, কোনও পুরুষ কোনও নারী-বিশেষের স্বামী নয়, এবং কোনও শিশু কোনও দম্পতীবিশেষের নিজস্ব নয়; সকলই শুধু রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রই নরনারীর মিলন ঘটাইয়া দিবে এবং উৎপন্ন সন্তানের পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। গোশালায় বৃষ ও ধেনুর মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে, তাহার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই রাষ্ট্রে নর-নারীর মধ্যে থাকিবে না।

(প্লেটোর প্রসঙ্গে মহাভারতের ঔদ্দালকি শ্বেতকেতুর উপাখ্যান মনে করা যাইতে পারে।—"পকান্নমিব রাজেন্দ্র! সর্ব্বসাধারণাঃ স্ত্রিয়ঃ।")

প্লেটোর এই দার্শনিক স্বপ্নের যে উদ্দেশ্য, নীট্‌চের দর্শন ও বার্ণার্ড শ'র কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। সুতরাং শ' যে এক 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, তা নয়। তাঁর চিন্তারও পিতা পিতামহ রহিয়াছে—একটা পরম্পরায় তাহা তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন;—"যে সকল লেখকের মতের সহিত আমার মতের সাদৃশ্য আছে, তন্মধ্যে বুনিয়ান, ব্লেক, হোগার্থ এবং টার্ণার (ইংলণ্ডের প্রাচীন লেখকদের মধ্যে পৃথক

ভাবে এবং সর্ব্বোপরি ইহাঁরা) এবং গেটে, শেলী, শোপেন্‌হর, ওয়াগ্নার, ইবসেন্‌, মরিস্‌, টল্‌ষ্টয়, এবং নীট্‌চে; এই সকল লেখকদের সমাজ সম্বন্ধে যে একটা বিশিষ্ট অনুভূতি ছিল তাহা আমার মতের সদৃশ।" বুনিয়ান্‌ ও নীট্‌চের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে অনেক প্রভেদ দেখা গেলেও, বার্ণার্ড শ' বলেন, এ উভয়ের সিদ্ধান্ত পৃথক্‌ নয়, শুধু প্রকাশের ধরণই ভিন্ন। বুনিয়ান্‌ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, নীট্‌চে তাহাই ডারুইন্‌ ও শোপেন্‌হরের পরবর্ত্তী যুগের ক্রম-বিকাশ শাস্ত্রের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

মনে হয়, বার্ণার্ড শ' অত্যন্ত প্রকাণ্ড দাবী করিতেছেন। তিনি যাঁহাদের সহিত সাদৃশ্য দাবী করিতেছেন তাঁহারা সকলই ইউরোপের সাহিত্যে শিষ্ট ও সম্মানিত শিল্পী। কিন্তু তাঁহাদেরও পরস্পরের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ রহিয়াছে; এবং বুনিয়ান্‌ বা গেটের মত লেখকের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য কোথায়, স্পষ্ট করিয়া তিনি তাহা দেখান নাই। অবশ্যই সাদৃশ্য যে খুঁজিয়া নেওয়া না যায় তা নয়; এবং এই দাবী যে তিনি করিতেছেন, তাহাতেই প্রমাণিত হয়, তিনি সম্পূর্ণ অভিনব মতের অবতারণা করিতেছেন, এ বিশ্বাস তাঁর নাই; তবে, তাঁর প্রকাশের ভঙ্গিটা অত্যন্ত স্বতন্ত্র এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

বুনিয়ান গেটের সহিত বার্ণার্ড শ'র সাদৃশ্য তত স্পষ্ট না হইলেও প্লেটো এবং বিশেষ ভাবে নীট্‌চের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। দার্শনিক ও নাট্যকারের মধ্যে এই যে সাদৃশ্য, তাহা ভাষার সাদৃশ্য নয়, প্রকাশ-ভঙ্গির সাম্য নয়,—ইহা আদর্শের ঐক্য। এবং এই আদর্শটা যে কি, তাহাও সংক্ষেপে আমরা পাইয়াছি। কিন্তু ইহা লাভ করিবার উপায় কি?

প্লেটো একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, নীট্‌চেও করিয়াছেন, বার্ণার্ড শ' ও করিয়াছেন। একটা নূতন কিছু গড়িতে হইলে, ভাঙ্গিতেও হয় প্রচুর; এবং এই ভাঙ্গার কথা এত জোরে বলেন বলিয়াই বার্ণার্ড শ' আমাদের রুচিতে এত আঘাত করেন। সমাজকে নূতন করিতে হইলে, তাহার দুইটী প্রধান বিধানেরই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে:—সমাজে ব্যক্তির উৎপত্তির বিধান অর্থাৎ বিবাহ, এবং সমাজের স্থিতির বিধান অর্থাৎ সমাজের ধন-বিভাগের বিধান। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থেই বার্ণার্ড শ' এই দুইটীরই কথা উত্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহ-প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; এবং যে ধন-বিভাগের বিধান অনুসারে একজন টাকা খরচ করিবার উপায় পায় না, আর একজন টাকার অভাবে না খাইয়া মরে, তাহারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এই দুই প্রণালীই আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনালোচিত, তাঁহার অন্যতম প্রধান-গ্রন্থ এবং কাহারও কাহারও মতে সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ, 'মানব ও অতি-মানব' (Man and Superman) নামক নাটকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে অর্থ-বিভাগের কথাটা তত স্পষ্ট না হইলেও উঠিয়াছে, এবং প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠ-মানব কি তাহাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। কিসে সমাজে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষের প্রাচুর্য্য হইতে পারে, তাহার বিষয়েও কিছু যে বলিতে চান নাই এমন নয়, কিন্তু ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

নাটক খানার গল্পাংশ এই। মিঃ ট্যানার্‌ নামক এক যুবক 'বিদ্রোহীর হস্ত-পুস্তিকা এবং পকেট-বন্ধু'—(Revolutionists' Hand-book and Pocket-Companion) নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানার ভিতরে কি আছে, তাহা রঙ্গমঞ্চে কোথাও না আসিলেও সমস্ত গ্রন্থখানা নাটক-খানার সহিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বইয়ে বার্ণার্ড শ'র ই নিজের মত; সুতরাং দুই একটী উক্তি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক নয়:—"বিদ্রোহী বলি তাকেই, যে সমাজের বর্ত্তমান বিধান-সব পরিত্যাগ করিয়া একটা নূতন স্থিতি-বিধানের পরীক্ষা করিতে চায়।" "সেই শ্রেষ্ঠ মানব নারীর গর্ভে পুরুষের ঔরসেই জন্ম গ্রহণ করিবে।" 'সমাজের উচ্চ নীচের মধ্যে বিবাহের যে বাধা আছে, তাহা দূর করিতে হইবে; সকল পুরুষকেই শুধু ভবিষ্যৎ পিতা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; এবং এই জন্য সর্ব্ব প্রকার সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, সুতরাং ধনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার উঠাইয়া দিতে হইবে।' ইত্যাদি। ইহাও ৬০ পৃষ্ঠার অধিক দীর্ঘ

একখানা পুস্তিকা। এই পুস্তিকার গ্রন্থকার মিঃ ট্যানার যে একটা উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একটু অনুধাবনের যোগ্য। ইনি এম, আই, আর সি (M I R. C) অর্থাৎ 'অলস ধনী শ্রেণীর একজন'(Member of the Idle Rich class). বলা অনাবশ্যক, ইহাঁর চরিত্রে বার্ণাড শ' নিজের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন এবং ইঁহারই কথায় এবং কার্য্যে সেই আদর্শ লাভের প্রণালী-নির্দ্দেশও করিতে চাহিয়াছেন।

ইনি বর্ত্তমানে প্রচলিত বিবাহ-বিধানের বিরোধী, সুতরাং বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। বিবাহ একটা ফাঁদ, একটা কয়েদ; যে ইহাতে পড়ে, তথা-কথিত স্নেহ-ভালবাসার দৌরাত্ম্যে সে অভিভূত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে বাধা পড়িয়া যায়। তাঁহার এই প্রকার মত সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে তাঁহার চারিদিকে এই ফাঁদ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

তাঁহার এক বন্ধু-কন্যার, তাঁহার এক বাল্য-সঙ্গিনীর পিতৃ-বিয়োগ ঘটিয়াছে। মৃত বন্ধুর উইল মতে অন্য এক ব্যক্তির সহযোগে তিনি এই কন্যার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম মিঃ র‍্যাম্‌স্‌ডেন্। ইনি ট্যানারের বিদ্রোহিতার একান্ত বিরোধী, সুতরাং ট্যানারের সহিত এক-যোগে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। কাজেই সেই বালিকা য়্যানিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ট্যানার ও র‍্যাম্‌স্‌ডেনের মধ্যে সে কাহাকে অভিভাবক স্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। সেয়ানা বালিকার মৃত পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মানেচ্ছা জাগিয়া উঠিল। র‍্যাম্‌স্-ডেনকে সে 'ঠাকুরদা' ডাকিত; এই ঠাকুরদার প্রতি ভালবাসায়ও তার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সুতরাং র‍্যাম্‌স্‌ডেন্ আর এড়া-ইতে পারিলেন না, ট্যানারকে সহযোগী রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই য়্যানির প্রেমে আর একজন 'পাগল-পারা' হইয়া আছেন; তাঁহার নাম অক্‌টেভিয়াস্। ইনি একটু কাব্যামোদী লোক; ভাবের বন্যায় ইঁহার হৃদয় ভরপুর। প্রেমের, এবং প্রেমের পরিণাম বিবাহের সুখ-স্বপ্নে তাঁহার কবি-হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। রমণী-সুলভ কোমলতায় তাঁর চরিত্র পূর্ণ। সকলেই তাঁকে একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। য়্যানিকে পাইবেন কিনা এই সন্দেহে তাঁর হৃদয় দোলায়-মান; য়্যানি একটু হাসিয়া কথা কহিলে বসোরার গোলাপ-গন্ধে তাঁর প্রেমিক হৃদয় মাতোয়ারা হইয়া যায়; য়্যানি অন্যের প্রতি একটু বেশী নৈকট্য দেখাইলে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইনি ট্যানারের কাছে স্বীকার পাইলেন যে, য়্যানিকে নায়িকারূপে কল্পনা করিয়া একটা প্রকাণ্ড কাব্য লিখিবার সাধ তাঁর আছে। ট্যানার তার স্বভাবসিদ্ধ রকমে উত্তর করিল, 'সাবধান, য়্যানি তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে।' তার পর অনেক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা হইল; রমণীর প্রেমে পড়া আর নিজের বিনাশ ইচ্ছা করা একই। কিন্তু অক্‌টে-ভিয়াসের কবিহৃদয় তাহাতে প্রবুদ্ধ হইল না।

ট্যানার তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, রমণীর প্রেম মাকড়সার জাল। মাকড়সা যেমন মক্ষিকাকে বলিয়াছিল 'আমার বৈঠকখানার একটু এস না!'—রমণীও তেমনই আকারে ইঙ্গিতে, হাসির হিল্লোলে, কায়ার লাবণ্য-ছটায়, অপাঙ্গের নিপুণ চাহনিতে পুরুষকে বলে 'ওগো, আমার প্রেমে একটু পড় না!' এবং মক্ষিকাকে আহ্বান করায় মাকড়সার যেমন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল, হাবে ভাবে পুরুষকে অভি-নন্দন করায়ও রমণীর তেমনই একটা উদ্দেশ্য আছে। রমণী চায় সন্তান, সে চায় নিজের মাতৃত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে; তাই সে পুরুষের আহ্বান! সুতরাং রমণীর প্রেমে পড়া অর্থ পরের কাজে নিজকে ব্যয়িত করা। "পুরুষ ছাড়া যদি রমণীর চলিত, এবং পুরুষ যদি রমণীর সন্তানের জন্য খাদ্য সংগ্রহ না করিয়া বরং সংগৃহীত খাদ্য খাইয়া ফেলিত, তাহা হইলে মাকড়সা এবং মৌমাছিরা যেমন তাহাদের সন্তানের পিতাকে সংহার করে, রমণীও তেমনই আমাদিগকে শেষ করিয়া ফেলিত।" ট্যানারের মতে নারীর চরম পরিণতি মাতৃত্বে; মাতৃত্বেই নারীত্বের আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তার অবসান। এবং পুরুষকে যে নারী গ্রাহ্য করে, তাহার কারণ সে এই মাতৃত্ব-বিকাশের সহায়।

কিন্তু এত সব দার্শনিক ব্যাখ্যায়ও কবি অক্টেভিয়াসের

জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল না। ট্যানারের অনিচ্ছা নয় যে, য়্যানি ও অক্টেভিয়াসের বিবাহ হয়। কিন্তু এই যে সকল প্রকার স্নেহ-ভালবাসারূপ দৌর্ব্বল্যের অতীত, দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল ট্যানার—ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জননী হইবার আকাঙ্ক্ষা য়্যানির হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। য়্যানির মা অক্টেভিয়াসকে স্নেহ করেন, কিন্তু জামাই চান ট্যানারকে। এবং ঘটনা-চক্রে শেষে এই দাঁড়াইল যে ট্যানারের সকল দর্শন আকাশে উড়িয়া গেল, য়্যানির প্রেমে তিনি বন্দী হইলেন। এবং এই কয়েদের প্রথম সোপান যে আলিঙ্গনটী হইয়াছিল, তাহাতে য়্যানি মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, কেন না ট্যানারের বাহুর শক্তি অসাধারণ।

এই খানেই নাটকের মূল ঘটনার শেষ। কিন্তু তাহার মধ্যে আরও দুইটী বিশেষ ঘটনা আছে, যাহা দ্বারা বার্ণার্ড শ' নিজের মতটা বিশদ ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। প্রথম ঘটনাটী অক্টেভিয়াসের ভগ্নীর গোপনে বিবাহ, আর দ্বিতীয়টী স্পেইনে ডাকাতের হাতে পড়িয়া ট্যানার প্রভৃতির একরাত্রি নিদ্রা এবং সেই নিদ্রায় একটি অদ্ভুত স্বপ্ন।

অক্টেভিয়াসের ভগ্নী ভাওলেট্ গোপনে একজন ধনী মার্কিন যুবকের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং দোহদ-লক্ষণ দেহে লইয়া র‍্যাম্স্‌ডেনের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে মনে করিলেন, ইনি বিবাহ না করিয়াই গুর্ব্বিণী হইয়াছেন; সুতরাং এই অবস্থায় লোকে যা করিয়া থাকে, তাই করিতে ইচ্ছা করিলেন; শ্রীমতী ভাওলেট্‌কে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু ভাওলেট্ নারাজ। অন্য সকলে রাগিয়া আগুন, কিন্তু ট্যানার, তাহার পক্ষে দাঁড়াইলেন এবং সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, সকলেরই এই নারীর সাহসের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; কারণ, ইনি পৃথিবীতে আর একটী জীবের আমদানীর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। এবং ভায়ওলেটকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'আপনি আইন অনুসারে বিবাহ করেন নাই, ইহাতে কিছু আসে যায় না; নারীর পক্ষে শক্তি ও সাহসের বড় আর গুণ নাই, এবং মাতৃত্বই নারীত্বের প্রশস্ত প্রারম্ভ।" বলা বাহুল্য, ইহা বার্ণার্ড শ'র মতেরই পুনরুক্তি।

ভায়ওলেট্ যে বিবাহ গোপন করিয়াছেন, তাহার মূলেও রহস্য আছে। তাঁহার স্বামীর পিতা একজন প্রকাণ্ড ধনী এবং পয়সা যত রকম সামাজিক সম্মান ক্রয় করিতে পারে, তাহার ষোল আনা তিনি পাইতে ইচ্ছুক। তাঁহার ইচ্ছা, কোন দুঃস্থ 'লর্ড'বংশে তাঁহার ছেলেকে বিবাহ করাইবেন। কিন্তু ছেলে প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া ভায়ওলেটের পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। পাছে পিতা রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন, তাই ভায়ওলেটেরই পরামর্শে আপাততঃ এই গোপন। ইংরেজের সমাজের প্রতি বার্ণার্ড শ'র আর একটী কটাক্ষপাত।

দ্বিতীয় ঘটনাটীর মধ্যে অনেক কলাকৌশল রহিয়াছে। কিন্তু কলাকৌশলের আলোচনা পূর্ব্বেও কোথাও করি নাই, এখানেও করিব না। ঘটনাটী এই;—ট্যানার প্রভৃতি মোটর গাড়ীতে দূর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, স্থান স্পেনের সিয়েরা নেভাডা পর্ব্বত। সেখানে এক ডাকাতের হাতে তাঁহারা বন্দী হইয়াছেন। ডাকাতের সর্দ্দার ট্যানারের সম্মুখীন হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার পরিচয় নিতে আজ্ঞা হউক; আমার নাম মেণ্ডাজোয়া, সিয়েরা কোম্পানীর অধিপতি। আমি ডাকাত; ধনীদিগকে লুণ্ঠন করিয়াই আমি জীবিকা অর্জ্জন করি।" ট্যানার অমনই ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তর করিলেন, 'আমি একজন ভদ্রলোক, আমার জীবিকা দরিদ্রদের লুণ্ঠন।" তারপর অবশ্যই ঠিক হইল—প্রচুর টাকা দিয়া ট্যানার এবং তাঁহার সঙ্গীরা মুক্ত হইবেন। কিন্তু আপাততঃ সেখানেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

সকলে নিদ্রিত হইলেন। তার পর রঙ্গমঞ্চে যাহা আসিল তাহা একটী স্বপ্ন। এবং যে সকল ব্যক্তির কথোপকথন তাহাতে রহিয়াছে, তন্মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের সেই পুরাতন চরিত্র ডন্ জুয়ানও রহিয়াছেন। ইঁহাদের কথোপকথনের ভিতরে বার্ণার্ড শ স্বর্গ-মর্ত্ত্যের চিত্র আনিয়াছেন। ডন্ জুয়ান কহিতেছেন, "সম্মান, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ন্যায়

প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই আবাসভূমি নরক"; "ভদ্র-মহিলারা যেখানে থাকেন সেখানেই নরক।" ইত্যাদি। আর এক জন কহিতেছেন, 'আমি ছিলাম ভণ্ড, সুতরাং স্বর্গে যাওয়া আমার উপযুক্তই হইয়াছে।' সয়তানের মুখে পাই, ইচ্ছা করিলেই নরক হইতে স্বর্গে যাওয়া যায়, তাহাতে কোন বাধা নাই। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে সকলেই স্বর্গে যায় না কেন'? সয়তান উত্তর করিল, 'স্বর্গ এমন বিশ্রী জায়গা, আমে দ-প্রমোদের একান্ত অভাব।"

এই সকলের, ভিতর বার্ণার্ড শ' গৃহীত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখানে করিতে চাই না। তাঁহার আসল বক্তব্য, অতি-মানবের উৎপত্তি; সে সম্বন্ধে তিনি ডন্ জুয়ানের মুখ দিয়া বলাইতেছেন;—"এত দীর্ঘ কালের ধর্ম্মবিশ্বাস, ললিত-কলা, বিজ্ঞান—শেষে মানুষের এই এক প্রার্থনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে—আমাকে একটী সুস্থ জন্তু করিয়া দাও।" সয়তানের মুখে পাই,—

"একটী ব্যুঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধবপু শতাধিক গ্রহণী-রোগগ্রস্ত, অপান-বায়ুদিগ্ধ, দার্শনিকের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী মূল্যবান্।'

এ ত সেই অতি-মানবের আদর্শ। কিন্তু ইহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সয়তান বলিয়াছে, তাহার এখনও জন্ম হয় নাই। একটী রমণী কহিলেন, 'তার জন্ম হয় নাই? হায়, তবে আমারও ত কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই!' সমস্ত বিশ্বের দিকে চাহিয়া রমণী কহিলেন, "A Father—a Father to the Superman!—সেই শ্রেষ্ঠ মানবের একজন পিতা—একজন পিতা চাই।" এই খানেই স্বপ্ন শেষ হইল।

কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর হইল কি? ট্যানারের চরিত্রে, ডন্ জুয়ানের চরিত্রে, নানা ভাবে বার্ণার্ড শ শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ আঁকিয়াছেন; কিন্তু তাহা পাওয়ার উপায় দেখাইয়াছেন যাহা, তাহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব? বিবাহের সংস্কার, সমাজ হইতে অভাব দূরীকরণ এবং সর্ব্ববিধ সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা,—এই ত তাঁর উপায়। কিন্তু মোগলসম্রাট হইয়া কাশী যাইতে হয় বলিলেই কাশীর পথ দেখাইয়া দেওয়া হইল না। বিবাহের সংস্কার কর বলিলেই এই আদর্শ লাভেরও পন্থানির্দ্দেশ হইল না। এই সংস্কারের পথে পদে পদে ভাবিবার আছে, তাহা বার্ণার্ড শ দেখান নাই। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য, বার্ণার্ড শ'র গঠন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

তবে তিনি, নিজে স্বীকার না পাইলেও, কবি। কবির প্রধান কার্য্য আদর্শের অঙ্কন। তাহা লাভের উপায় ভাবিবেন সামাজিক ও দার্শনিক।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

যবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীগণ এবং তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য *

আজকাল উরোপ ও আমেরিকাবাসীগণ তাঁহাদের বর্ত্তমান উন্নতির জন্য গৌরব বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভারতের গৌরব তাহার অতীত উন্নতিতে। বর্ত্তমান ভারত প্রচুর মানসিক শক্তি ও জড় উপাদান-সমূহের অধিকারী হইয়াও গৌরব অনুভব করিবার উপযুক্ত কার্য্য অতি অল্পই করিয়াছে। এখানে একজন জগদীশচন্দ্র বা ওখানে একজন রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কোন জাতিকে বড় করিয়া তোলে না। দেশের সাধারণ জনসমষ্টির প্রতিভাই জাতিকে মহৎ ও গৌরবান্বিত করিয়া তোলে। শিবাজি-কর্ত্তৃক একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এবং কিছুদিন পরে রণজিৎও অপর একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঐ সকল রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল কেন? জাতি ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র। কোন জাতির উন্নতি বা অবনতি

* আমেরিকা-প্রবাসী, যুক্তরাজ্যস্থিত উইস্কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, শ্রীমান্ হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত লিখিত "The Hindusthanees in Java and Our Duty towards them' নামক (Panama-Pacific Exhibition এ পঠিত) ইংরাজি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

ইহার উপাদনরাজির গুণাগুণের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে জাতিতে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক, সেই জাতি তত গৌরবান্বিত হইয়া ওঠে। অপর পক্ষে যে জাতিতে ঐরূপ ব্যক্তির সংখ্যা যত অল্প, সেই জাতি তত দ্রুতবেগে নগণ্য হইয়া যায়। আমাদের ঐ শেষোক্ত দশাই হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাগণের উদার জাতীয় ভাবের অনুসরণ, বা ঐ ভাব পোষণ করার জন্য যে রূপ জ্ঞান বা শি[illegible] সেরূপ শিক্ষিত বা জ্ঞানবিশিষ্ট ছিল না; এবং ঐ সকল সাম্রাজ্য-[illegible]গণের লোকান্তর-গমনের পর তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণে [illegible]র্থপরতা ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা (Provincialism) প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। প্রিণ্ট্জ মেটারনিকের (Printz Metternich) ভাষা প্রয়োগ করিলে বলিতে হয়, যে, ভারত কেবল মাত্র ভৌগোলিক হিসাবে এক দেশ (geographical Unit) বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। বৈদিক যুগে এবং তৎপরে যুধিষ্টির, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, এবং আকবরের সময়ে ভারতবর্ষ যে সমগ্র ভাবে একটি রাজনৈতিক ও আর্থিক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল, স্বার্থ-সাধনের উত্তেজনায় দেশের লোকের সে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। অতি অল্পদিন ধরিয়াই আমরা আমাদের জাতীয়তার ভাব ফিরিয়া পাইয়াছি। আমরা সমগ্র দেশের উপকারের জন্য প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা পরিহার করিতে পারিয়াছি। সুস্পষ্ট ভৌগোলিক সীমা-চিহ্নের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভারতের একটিমাত্র রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক আদর্শ থাকিতে পারে, এই পবিত্র সত্য সম্বন্ধে আমাদের জনগণ শিক্ষালাভ করিতেছে, এবং এই শিক্ষার প্রচারের উপরে যে জাতি পূর্ব্বে এতদূর পরাক্রমশালী ছিল সেই জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু আমাদের দেশ-হিতৈষণা-মূলক আন্দোলন-জনিত ব্যগ্রতা ও ব্যস্ততার ফলে আমরা এমন বহু বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি যাহা আমাদের অবহেলা করা উচিত ছিল না। এখন আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছি সত্য—যখন দেশের মঙ্গলের কথা ভাবি তখন প্রাদেশিক সীমা-রেখাগুলি আমাদের নিকট নিরর্থক হইয়া যায়। ওগুলি সমগ্র দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র। আত্ম-রক্ষার কঠোর সংগ্রামে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, জাতি ও ধর্ম্মগত বৈষম্য জাতীয় উন্নতির প্রকৃত পরিপন্থী নহে—বুঝিয়াছি যে, সার্ব্বজনীন স্বার্থরক্ষার জন্যই ভারতের বিবিধ নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলিকে এক সাধারণ ও সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হিন্দুস্থানী জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে—এবং ইহাও বুঝিয়াছি যে, ক্যানাডা, ফিজি, নেটাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং অন্যান্য স্থানের ঔপনিবেশিকগণ আমাদের আপনার জন, এবং তাহাদের পক্ষে প্রত্যেক স্থানের হিন্দুস্থানী জনগণ হইতে সুপরামর্শ ও নৈতিক সাহায্য পাওয়া আবশ্যক। আমাদের মতগুলিকে পুনরায় একটু উদার ভাবাপন্ন করিতে হইবে। আমাদের অতি আধুনিক ঔপনিবেশিক ভ্রাতাদিগের প্রতিই যে কেবল আমাদের মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে তাহা নহে; যে সমস্ত উপনিবেশ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরাকালে এমন ঔদার্য্যের সহিত সংস্থাপন করিয়া আমাদিগের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, সমুদ্রপারবর্ত্তী সেই সমস্ত উপনিবেশের অধিবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের স্বার্থের দিকেও আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের সাগর-বেষ্টিতা মাতৃভূমির বাহিরেও যে আমাদের আত্মীয়-জন আছে, এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ ভাবে এবং উপযুক্তরূপে চিন্তা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভারত মহাসাগরের অনতি-পরিচিত দ্বীপমালা-নিবাসী আমাদের যে সকল ভ্রাতৃগণ পূর্ণ ঊনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সভ্যতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, এবং এখনও পর্য্যন্ত যাহারা মাতৃভূমি কর্ত্তৃক লজ্জাজনক ভাবে বিস্মৃত হইয়াও অসংখ্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাদের গৃহীত সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য

কঠোর সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের অবস্থা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়া উচিত।

পূর্ব্ব অবহেলা পরিত্যাগ করিয়া "এসিয়ার উদ্যান" সেই যবদ্বীপের দিকে নেত্রপাত করা সম্প্রতি আমাদের অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উর্ব্বর ভূমি দেখিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রের ফসল সংগ্রহ-কার্য্যে তাঁহাদের বংশধরগণের অবহেলা তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাসের সেই অংশকে কলঙ্ক-পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি এত দীর্ঘকালের ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ সত্ত্বেও যবদ্বীপের হিন্দুগণ তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছেন; এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধটি এই আশায়ই লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবী হইতে আমাদের যবদ্বীপের ভ্রাতৃগণের অস্তিত্ব লুপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই যেন আমাদের স্বদেশীয়গণের হৃদয়ে উক্ত ভ্রাতৃগণের প্রতি অনুরাগ এবং আগ্রহের উদয় হয়, এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য যেন কোন প্রকারের কিছু করা হয়।

যবদ্বীপের ইতিহাস যেমন অনুপম, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। দ্বীপমালা-সমূহের মধ্যে যবদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী। মুখ্যতঃ ভারতের সমৃদ্ধিই যেমন অন্য জাতিকে তাহার প্রতি আক্রমণের পর আক্রমণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ যবদ্বীপের উর্ব্বরতাই তৎপ্রতি বহু জাতিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হিন্দু, চৈনিক, মুসলমান, ওলন্দাজ, ব্রিটিশ সকলেই তত্রত্য অতুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিতে দলে দলে ধাবিত হইয়াছিল। এই সকল জাতির প্রত্যেকেই তথাকার আদিম অধিবাসীগণের উপর তাহাদের আপন আপন সভ্যতার ছাপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহাতে অল্পাধিক কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যবদ্বীপে যাহা করিয়াছিলেন এবং তাহার যেরূপ ফল ফলিয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

দুইটী বিভিন্ন এবং পরস্পর দূরবর্ত্তী যুগে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। সুদূর ৭৫ খৃষ্টাব্দীতে কলিঙ্গ নিবাসী সমুদ্রগামী ব্যক্তিগণই সর্ব্ব প্রথম এই কার্য্যে ব্রতী হয়। একবার "এসিয়ার উদ্যানের" দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে, দলে দলে লোক যাইয়া ইহার উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রসমূহ এরূপ ভাবে ছাইয়া ফেলিল যে, ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণীতে এইরূপ লেখা সম্ভব হইল:—"যবদ্বীপের অধিবাসীগণ সকলেই হিন্দু ছিল। ঐ সকল হিন্দুগণ গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতে সিংহলে, সিংহল হইতে যবদ্বীপে, এবং যবদ্বীপ হইতে চীনদেশে সমুদ্রগামী জাহাজে উপনীত হইত, এবং ঐ সকল জাহাজের নাবিকগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল।" (১) সুমাত্রা দ্বীপেও বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মছ্‌লিপত্তন নিবাসী হিন্দুগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই সমৃদ্ধিশালী নবাবিষ্কৃত দেশ শীঘ্রই ভারতীয় সমগ্র হিন্দুদিগের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িল; এবং যখন প্রবল পরাক্রান্ত শকদিগের রাজ্য মহাবীর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধীন হইল, এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে স্থান-চ্যুত করিয়া হিন্দুধর্ম্মই রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের আসন গ্রহণ করিল, তখন দৃপ্ত ও স্বেচ্ছাচারী শকগণ তাহাদের প্রবল প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য যবদ্বীপেই উপযুক্ত সুযোগ পাইল। যবদ্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গুজরাটের কোন রাজপুত্র পঞ্চসহস্র সঙ্গীসহ ছয়খানা বৃহৎ জলযানে গুজরাট হইতে যাত্রা করেন এবং ৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঈপ্সিত দেশে উপনীত হন। উক্ত সাহসী বীর পুরুষ সওয়েল চেল (Sawela Chela) নামে তাঁহার নেতৃত্ব ঘোষণা করেন। পরে স্ত্রী ও সন্তানগণ

(১) "Entirely peopled by the Hindus who sailed from the Ganges to Ceylon, from Ceylon to Java and from Java to China in ships manned by crews professing Brahminical religion",—cited in R. K. Mukerjee's History of Indian shipping—P. 149."

সহ আরও দুই সহস্র লোক এবং বহু প্রস্তর ও পিত্তলের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে সুদক্ষ শিল্পী তাঁহাদের অনুগমন করে। দুর্দ্ধর্ষ তুরুক ও সাসানীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতের উত্তরস্থ পথগুলির অবরোধ, এবং মগধ রাজ্যের হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকর-বর্দ্ধনের পশ্চিমাভিমুখে বিজয়-অভিযান প্রভৃতি ঘটনা বহু শকগণকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এই সময়ে "বৌদ্ধ শিল্পকলাও শকদিগের সঙ্গে যবদ্বীপে চলিয়া গেল, এবং সেখানে বরবদরের খোদিত প্রস্তর-মন্দিরে চরমোৎকর্ষ লাভ করিল। এই মন্দিরই সমগ্র এসিয়া খণ্ডের মধ্যে বৌদ্ধ-শিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মহৎ ভাবোদ্দীপক নিদর্শন।" (২)

ইহাই যবদ্বীপে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার উপনিবেশ-স্থাপনের কাহিনী। এই চেষ্টা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিল, এবং ইহার ফল স্থায়ী হইয়াছিল।

প্রথমবারে হিন্দুধর্ম্ম, এবং দ্বিতীয়বারে বৌদ্ধধর্ম্ম আনীত হইলেও, যবদ্বীপে এই উভয়ের একত্র অবস্থানে পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। "উভয় ধর্ম্ম-বিশ্বাসই পাশাপাশি ভাবে বিরাজ করিতেছিল, উভয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিতেছিল, এবং সম্ভবতঃ একে অন্যের পূজাপদ্ধতিও অংশতঃ গ্রহণ করিয়াছিল।" (৩) পাশ্চাত্য দেশের লজ্জাজনক ধর্ম্মের গোঁড়ামি—যে গোঁড়ামির হাত হইতে সাম্যবাদী আমেরিকাও নিষ্কৃতি পায় নাই—তাহার কথা ভাবিলে বলিতে হয় যে, যবদ্বীপের এইরূপ উদারতা কেবল মাত্র প্রাচ্য দেশেই সম্ভব। ঔপনিবেশিকগণ এইরূপ উদার অন্তঃকরণ লইয়া শান্তিতে বসবাস করিত এবং সমগ্র জগতের প্রশংসা অর্জ্জনের উপযোগী শিল্পের ও বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিয়াছিল। যদি এই কার্য্য সমান ভাবে চলিতে থাকিত, তাহা হইলে যবদ্বীপ আজ অসভ্যদের নিবাসভূমি বলিয়া পরিত্যক্ত হইত না।

যবদ্বীপে ও ভারতে, এবং পরবর্ত্তী সময়ে যবদ্বীপে ও চীন-দেশে, বাণিজ্য-সম্পর্ক উত্তরোত্তর অসাধারণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বাণিজ্য-ব্যাপারে অত্যন্ত বৃহৎ জাহাজ সকল নিযুক্ত হইত। উহাদের পাটাতন জল হইতে এত উচ্চ ছিল যে "বহু ফুট দীর্ঘ সিঁড়ীর সাহায্যে তীরে অবতরণ করিতে হইত"। (৪) ভারত ও যবদ্বীপের বাণিজ্য-সংশ্রব সর্ব্বপ্রথম সুদূর ৬৩ ও ১৮০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। এই বাণিজ্য প্রধানতঃ করমণ্ডলের বন্দরসমূহ হইতে ও কলিঙ্গের সমুদ্রগামী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। মালাবারের বন্দর-সমূহ হইতেও কিছু কিছু বাণিজ্য চলিত। হিন্দু ব্যবসায়ীগণ দক্ষিণ-পশ্চিম যান্মাসিক বায়ুর (S. W. Monsoon) সাহায্যে ভারতীয় বন্দর হইতে রওনা হইত, এবং উত্তর-পূর্ব্ব যান্মাসিক বায়ুর (N. E. Monsoon) সাহায্যে দেশে ফিরিয়া আসিত। সাধারণতঃ এই সমুদ্রযাত্রার নয় দশ দিনের বেশী লাগিত না।

বর্ত্তমান নাবিকগণের নিকট বিজ্ঞান, কলকৌশল, এবং নানা প্রকার আবিষ্কারের যেরূপ মূল্য, পূর্ব্ব কালের নাবিকগণের নিকট যান্মাসিক বায়ুরও ঠিক সেই রূপ মূল্য ছিল। বাণিজ্য-পিপাসা, এবং রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনই হিন্দুগণের যবদ্বীপ-গমনের একমাত্র না হউক, দুইটি বলবৎ কারণ।

---

(২) "Buddhist art-tradition with the Sakas migrated into Java where they reached their highest expression in the magnificent sculpture of Barabadur—the grandest specimen of Buddhist art in the whole of Asia"—Havell.-Indian Sculpture and Painting p. 113.

(৩) "The two faiths existed side by side, the adherents of each agreeing to live amicably one with the other, and probably each adopting portion of the worship of the other's religion"—Boys, H. C,—Some Notes on Java, Allahabad. pp. 6—7.

(৪) "Ladders several tens of feet high in length had to be used to get aboard"—Chan-fu-kur. chn-fan-che (Chinese and Arab trade in the 12th and 13th centuries). Tr. by F. Hirth and W. W. Rockhill.

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সময়ে ভারতের জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল না, ঘন-সন্নিবেশ-হেতুও লোকে কষ্ট পাইতেছিল না; ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্র সকলের অল্পই কর্ষিত হইয়াছিল; দেশে খাদ্যের অভাব হইয়াছিল না। যে পর্য্যন্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যবদ্বীপটি সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, প্রসিদ্ধ, এবং হিন্দু ধর্ম্মের একটি কেন্দ্র-স্থান বলিয়া পরিগণিত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত যবদ্বীপের ঔপনিবেশিকগণ উহার উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। "একমাত্র ইহার (যবদ্বীপের নামই চৈনিক গ্রন্থ-সমূহে উল্লেখিত হইয়াছে··· ইহার এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে, আরবগণ সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ এবং উহা অধিবাসীগণকে ইহার নাম করিয়াই পরিচিত করিয়াছেন।" (৫)র এমন কি তৎসাময়িক পাশ্চাত্য পর্য্যটকদিগের মধ্যে যাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষ অধিক ছিল, সেই মার্কো পোলো (Marco Polo) সুমাত্রা দ্বীপে ছয়মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও তিনি উহার (সুমাত্রার) কোন স্বতন্ত্র নাম শোনেন নাই; অবশেষে অন্যান্য আগন্তুকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইহাকে ক্ষুদ্রতর যবদ্বীপ বলিয়া উল্লিখিত করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, যে যবদ্বীপ এমন সুবিখ্যাত, তাহা হইতে ইহা নিশ্চয়ই আকারে ছোট হইবে। সভ্যতা বিস্তারে এবং মাতৃভূমির সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ-স্থাপনে ঔপনিবেশিকগণের কার্য্য এই রূপ গৌরবজনক হইয়াছিল।

যে সমস্ত জাতি নৈতিক শ্রেষ্ঠতার দাবী করেন, যাঁহারা মুখে বলেন, যে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও মনুষ্যের জন্মগত অধিকার প্রচার, এবং পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন করার জন্যই তাঁহারা জগতে বর্ত্তমান আছেন, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিতে ইচ্ছু ক, তাঁহাদের চক্ষের উপরেই কি ঘটিয়াছে? পশ্চিম আমেরিকার বনাকীর্ণ ভূমিতে, আত্মরক্ষার নির্ম্মম অজুহাতে ঔপনিবেশিকগণ আদিম অধিবাসীদিগের উপর নিদারুণ অত্যাচার করতঃ তাহাদিগকে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু যবদ্বীপে সেরূপ হয় নাই। তথায় সমুন্নত ও সুসভ্য বৈদেশিকগণের আগমনের ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত আদিম অধিবাসীগণ অত্যাচার-প্রপীড়িত হয় নাই, বা তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। হিন্দু ঔপনিবেশিকগণ চরিত্র-মাধুর্য্য ও পর-মত-সহিষ্ণুতা দ্বারা আদিম অধিবাসীদিগের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন; এবং তাহাদিগকে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, ও ধর্ম্ম দান করিয়াছিলেন। আদিমনিবাসীগণ ধীর ভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সহিত ঐ সকল গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের তদন্তের বা তজ্জন্য দণ্ডপ্রদান করার আবশ্যক হয় নাই। তাহাদের উপর কখনও কোনরূপ বল প্রকাশ করা হয় নাই। উক্ত ধর্ম্ম ও সাহিত্যের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যই জন-সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং আপনা হইতেই তাহারা উহাতে সাড়া দিয়াছিল। এই শান্তিপূর্ণ উপনিবেশ-স্থাপন প্রণালী আর্য্য হিন্দুদিগের সেই মহা উদ্যমেরই অংশিক প্রকাশমাত্র, যদ্দ্বারা তাঁহারা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাষা, সাহিত্য, ও ধর্ম্মের বিস্তারই এক জাতির উপর অপর জাতির প্রভাব বিস্তারের উৎকৃষ্ট মানদণ্ড। অতএব আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, এই সব বিষয়ে ভারত ও যবদ্বীপে কতটা সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত ভাষাসমুহের মধ্যে যবদ্বীপের ভাষাই প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইহা সংস্কৃত বর্ণমালার নিয়মানুসারে "গঠিত বলিয়া স্বীকৃত" (Confessedly formed), এই ভাষা প্রচুর সংস্কৃত শব্দে পূর্ণ। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য একটি সুদীর্ঘ তালিকা হইতে নিম্নে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলাম :—

(৫) "The richest and most distinguished country of the Archipilego, & the principal seat of Hinduisun......It (Java) is the only name mentioned in the Chinese works; & the Arabs, such is its reputation... designate the whole Archipelago & all its inhabitanes by it"—Crawford, J., Hist. of Indian archipilego, Vol. III. p. 192.

এস্ত্রী (স্ত্রী); হুর্য্যো; চোন্দ্রো ; শশী ; পুত্রো; কাঞ্চোনো; হাকেশো (আকাশ); পূর্ব্বো; পৌচিম্ (পশ্চিম); উত্তোরো (উত্তর); দক্ষিণ; বুমি (ভূমি); গিরি (অথবা) পুর্ব্বোতো; শীলো (প্রস্তর, শীলা); মার্গ (বা) মার্গী (রাস্তা); বর্ষো (বৃষ্টি); সাগরো (বা) সমুদ্রো; পাবোকো (বা) অগ্নি; মেগো (বা) হিমো (মেঘ); পওঅবোনো (বা) সমীরোণো; সহদোরো (সহোদর); প্রলয়ো (মৃত্যু); উষোদো (ঔষধ); তক্ষোকো (সর্প); মদু (মধু); ব্রক্ষো (বৃক্ষ); পুঞ্জোরো (পিঞ্জর—কারাগার); ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখা যাইবে যে, বহুস্থলে সংস্কৃত স্বরবর্ণ "অ"-কারের পরিবর্ত্তে "ও"-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। বাঙ্গলায় অকারান্ত শব্দনিচয়ের উচ্চারণের মত এই ভাষায়ও ধ্বনি-পরিবর্ত্তনের নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে দ্বীপের ভাষায় এত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য, সেই দ্বীপের সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যও অবশ্যই অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় গ্রন্থই অনূদিত হইয়াছিল,—এবং এই দুইটি বিপুলকায় মহাকাব্যই ভারতের ন্যায় যবদ্বীপের লোকসাধারণের নৈতিক এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের সহায় হইয়াছিল। আমি যবদ্বীপের মহাভারত, অথবা যবদ্বীপ-বাসীরা যেরূপ বলিয়া থাকে, "ব্রাতযুদ" (ভারত যুদ্ধ) হইতে একটি অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"অওরঙ্গ (অঙ্গ) রাজের আক্রমণ যেন স্রোতের বেগ। পাণ্ডবদিগের সেনাদল সশব্দে অগ্রসর হইয়া কর্ণের সম্মুখীন হইল। তাঁহাদের প্রধানগণ তাঁহার গমনে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ঘননিবিষ্ট সেনাদল দলিত এবং সজোরে নিষ্পেষিত হইল। তাঁহার রথ শূন্যগর্ভ শব্দ করিয়া গরুড়ের ন্যায় বেগে অগ্রসর হইল। ......তাঁহার বাণগুলি সকল দিকেই ছুটিয়া চলিল ; তিনি যখন বজ্রাস্ত্র ত্যাগ করেন সেই সময়ে মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার বাণের গতি বন্ধ ছিল। তাঁহার বাণগুলি বৃষ্টিধারার ন্যায় অবিরাম শত্রুপক্ষের উপরে পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা মথিত, বিহ্বল, ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।"

বীরবর কর্ণের বীরত্ব-কাহিনী এই প্রকারে যবদ্বীপের মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণ সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযুজ্য। বোধ হয় যে, যবদ্বীপবাসীদিগের নিকট রামায়ণ 'ব্রাত যুদের (মহাভারতের) ন্যায় ততদুর মনোরম নহে। নিম্ন লিখিত অংশটি রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে পুত্রগণের মৃত্যুর পরে রামের বিরুদ্ধে রাবণের যুদ্ধযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে :—

"রাজা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়া গুম্ফ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখাবয়ব প্রজ্বলিত এবং বক্ষস্থল "ওয়ার-ওয়ারি" (?) পুষ্পবৎ রক্তবর্ণ হইল। সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল ; মুখের প্রান্ত ভাগগুলি কম্পিত হইতে লাগিল ; ভ্রূবল্লী কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি পৃথিবী হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আকাশে উঠিলেন। কপোত আক্রমণকারী বাজ পক্ষীরই মত তাঁহার গতিবেগ। পুত্রের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে দেখিয়া ইহাই মনে হইল যে, তিনি যেন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ডাক করিতেছেন, এবং তাঁহার সমস্ত শত্রুগণকে তাঁহার সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।"

শুক্রাচার্য্যের নীতিসূত্রও যবদ্বীপবাসীগণের অজ্ঞাত ছিল না। উক্ত গ্রন্থের মহৎ আদর্শসমূহের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তাহাদের নৈতিক আদর্শসমূহ গঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে যবদ্বীপবাসীদিগের নীতিশাস্ত্র মূলগ্রন্থের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি ইহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধার করিলাম :—

"সমাবস্থাপন্ন লোক দেখিয়া বন্ধুতা করিবে, বাঘ ও বনের মত কাজ করিও না। এক বাঘ ও এক বন ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইল, এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিল। লোকেরা যখন বনের কাঠ বা পাতা নিতে চাহিত, তখন তাহারা বাঘের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইত, এবং যখন তাহারা বাঘ মারিতে আসিত, বন তাহাকে

লুকাইয়া রাখিত। অনেক দিন পরে ব্যাঘ্রের বসবাসের দ্বারা বন মল-দূষিত হইয়া উঠিল, এবং ব্যাঘ্রের বন্ধুপ্রীতি হ্রাস পাইতে লাগিল। পরে বাঘ বন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং লোকেরা বনকে অরক্ষিত দেখিয়া দলে দলে আসিয়া কাঠ কাটিয়া ফেলিল......বন ধ্বংস হইয়া একটি অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইল। ব্যাঘ্রও বন ত্যাগ করায় দৃষ্টিপথে পতিত হইল ; লোকেরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল, এবং এই প্রকারে তাহাদের অমিল হওয়ায় বন নিঃশেষিত হইল ও ব্যাঘ্র প্রাণ হারাইল।"

উক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত কথাও আছে :—"শত-পদী জন্তুর বিষ থাকে মস্তকে, বৃশ্চিকের বিষ থাকে লেজে, সাপের বিষ থাকে দাঁতে, এবং লোকে জানে কোথায় এই বিষ পাওয়া যায়; কিন্তু খল মানুষের বিষ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকে না, পরন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া থাকে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"(৬)

এই সকল উদ্ধৃতাংশ প্রমাণ করে যে তৎকালে উপনিবেশ ও মাতৃভূমির মধ্যে চিন্তা-ধারার সাম্য ছিল। কিন্তু আমরা উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে যোগ রাখিতে শৈথিল্য করায় উহাদের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ইহার পর যবদ্বীপের উন্নতি ব্যাপারে ভারতবর্ষের আর কোন জীবন্ত প্রভাব ছিল না। এবং এই প্রকারে যবদ্বীপ যখন লক্ষ্যহীন হইয়া দিন কাটাইতেছিল, তখন আততায়ী ও তেজস্বী মোহম্মদীয়গণ সুদূর আরবদেশ হইতে, এবং তৎপরে লোভী ওলন্দাজগণ, একের পরে অন্যে যবদ্বীপে প্রবিষ্ট হইয়া যবদ্বীপবাসীগণের যে চিন্তাধারা সবে মাত্র সংহতি লাভ করিতেছিল তাহাতে নানা বাধা জন্মাইয়া দিল। নিঃসহায় যবদ্বীপবাসীগণ নবাগত সভ্যতার প্রভাবে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। তদবধি যবদ্বীপ আর ভারতের নহে। এ স্রোত কি এখন ফিরিবে? যদিও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব মোটের উপরে সমাজের মহোপকারই সাধন করিয়াছিল, তবুও যবদ্বীপবাসীগণের সকলেই উহা অবলম্বন করে নাই। যবদ্বীপের মুসলমান ধর্ম্ম, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের একটী সুবিধা-জনক মিশ্রণমাত্র। যবদ্বীপবাসীদের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কলিঙ্গ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বহুবাহুর রাজসভায় উপস্থিত হন, এবং বহুবাহু তাঁহাদিগকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন। বহুবাহু ছিলেন যবদ্বীপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের রাজধানী মোজাপাহিতের সর্ব্বশেষ বিক্রমশালী হিন্দু রাজা। ক্রমে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িলে বহুবাহুর বংশধরগণ, কলিঙ্গাগত ব্রাহ্মণগণ হইতে নব বল লাভ করিয়া, তাঁহাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র প্রজাগণসহ প্রধান-দ্বীপ-সংলগ্ন বালিনামক ক্ষুদ্রদ্বীপে উঠিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রকারে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ মধ্যে বালি হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র দুর্গস্বরূপ হইয়াছিল, এবং এখনও আছে।

বালিদ্বীপবাসী হিন্দুগণ শিবোপাসক। তাহারা সকলেই দৈনিক প্রাতঃকালীন প্রার্থনার প্রারম্ভে "ওঁ শিব চতুর্ভুজ" এই বাক্যটী উচ্চারণ করে। একদিন বালিবাসী হিন্দুদিগের কণ্ঠোচ্চারিত এই পবিত্র শব্দের প্রতিধ্বনি আলস্য-পরায়ণ আমাদের শ্রুতিপথে নিশ্চয়ই প্রবেশ লাভ করিবে। ইহা নিশ্চয়, তথাকার হিন্দুরাও আমাদের বিষয় জানিবার জন্য মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-সাহিত্য হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং ভারতে উহা আছে কিনা তৎসম্বন্ধে উৎকণ্ঠার সহিত অনুসন্ধান করেন। যবদ্বীপের সুলতান দরবারের ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ রেসীডেন্ট ও ঐতিহাসিক মিঃ ক্রফোর্ড (Crawford) একদা বালিদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার হিন্দুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় কিনা?

যবদ্বীপ বর্ত্তমান সময়ে হল্যাণ্ডের অধীন। অর্থগৃধ্নুতাই হল্যাণ্ডের উপনিবেশ সংস্থাপন নীতির চিরন্তন মূলসূত্র। যবদ্বীপে ওলন্দাজদিগকর্ত্তৃক তথাকথিত 'উন্নতি বিধায়ক

(৬) Crawford. vol. II pp. 25-33 c f. The Sukraniti (Tr. by Prof. B. K. Sarkar vol. XII of the Sacred Books of the Hindus series) ch. IV. sec. I. in the characteristics of friends.

আন্দোলনের" (Cultural movements) কোন যথার্থ তাৎপর্য্য নাই; উহা একটি আড়ম্বরপূর্ণ অশ্ব-ডিম্ব মাত্র। মিঃ বয়জ (Boys) তাঁহার "যবদ্বীপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" (Some notes on Java) নামক ক্ষুদ্রাবয়ব চমৎকার গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—"যবদ্বীপবাসী প্রজাগণের কিসে মঙ্গল হইবে সে বিষয়ে ওলন্দাজগণ চিন্তা করেন বলিয়া মুখেও বলেন না।......ওলন্দাজেরা যবদ্বীপ হইতে কেবল মাত্র রাজস্ব স্বরূপ যে টাকা আদায় করেন, তাহা তাহাদের উপনিবেশসমূহের আয়ের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক। হল্যাণ্ড ইচ্ছা করিয়াই তাহার পূর্ব্বদেশীয় প্রজাগণকে যথাসম্ভব মূর্খ ও অজ্ঞ করিয়া রাখে।'

ইহাই যবদ্বীপের বর্ত্তমান ভাগ্য। হল্যাণ্ড তাহার (যবদ্বীপের) স্বার্থের অর্থাৎ উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শাসন করার দোষে দোষী। আমরা তাহাকে আমাদের সভ্যতা দিয়াছিলাম, কিন্তু দেখা যায় যে, আমরা উহা রক্ষা করিতে ও পরিবর্দ্ধিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি।

এই কাহিনী, যাহা শুনাইতে আমি এত যত্ন নিতেছি তাহা কাল্পনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা ইতিহাস ও জনপ্রবাদ উভয়েরই কথা। এখন আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান বলিতেছে 'কর্ম্ম কর'। কিন্তু মনপ্রাণ না ঢালিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিলে চলিবে না। ইহার জন্য অধ্যবসায় সহকারে প্রণালীবদ্ধ ভাবে ও পর্য্যাপ্তরূপে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের আবশ্যক। অবশ্য এমন মত আমি কখনও পোষণ করি না যে, সমস্ত জগৎ হিন্দু, মুসলমান, বা খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাউক। জগতের উন্নতির জন্যই ইহা হওয়া উচিত নহে। অনেক সময় বৈচিত্র্যের অভাব, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে; ইহার পরিণাম কর্ম্মবিমুখতা বা নিশ্চেষ্টতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির মূল; এবং কর্ম্মের স্বাধীনতা ও অবস্থার বৈচিত্র্য না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসর কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "পূর্ব্ব পূর্ব্বই, আর পশ্চিম পশ্চিমই, ঈশ্বর করুন ইহার যেন অন্যথা হয় না, কিন্তু উভয়ই বন্ধুত্বে মিলিত হইবে।" (৭) আমরা বিভিন্ন এবং বিভিন্নই থাকিব। কিন্তু যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য আমাদের আদর্শ ও চিন্তা অর্থাৎ আমাদের সভ্যতাকে প্রতিযোগিতার বাজারে উপস্থিত করিতেই হইবে। ইহাকেই আমি "হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার" বলিতেছি। এইরূপ কার্য্য করা তখনই সম্ভব হইবে, যখন আমরা সকলেই রক্তের টান এবং একটি ইতিহাসের বন্ধন বিশেষ ভাবে অনুভব করিব।

যবদ্বীপের জন্য আমরা কি করিতে পারি? আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমি ইহা বিশেষভাবে অনুভব করি যে, আমাদের কিছু করা উচিত। ভারতে হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, উহাই আমাদের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিবে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কি যবদ্বীপবাসী হিন্দুগণের জন্য কিছু করিতে পারেন? আমি জানি না। কিন্তু আমি সাহস করিয়া একটি প্রস্তাব করিতেছি। হিন্দুধর্ম্মের মহত্তম আদর্শ সমূহের ব্যাখ্যান যদি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একতম মুখ্য উদ্দেশ্য হয়; যদি আমাদের হৃদয়ে আমাদের সভ্যতার যথার্থ গুরুত্ব পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই যে কোন সময়ে এবং যে কোন স্থানে, আবশ্যক মত, হিন্দুধর্ম্মের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হওয়াও এই প্রকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি প্রথমে আত্মরক্ষার দিকে লক্ষ্য না রাখ, তাহা হইলে আপন মহত্ত্ব কোন সাহসে অপরকে দান করিতে প্রবৃত্ত হইতে পার? আমাদের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যবদ্বীপবাসী হিন্দুগণের জন্য বৃত্তি (Scholarship) স্থাপন করুন, তাহারা হিন্দুত্বের জন্ম ভূমিতে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করুক। ইহাদ্বারা আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে, এবং আমাদের গত অমনোযোগিতার ফল অনেকটা সংশোধিত হইবে।

---

(৭) 'East is East and West is West, God forbid it should be otherwise but the twain shall meet in amity,"

সেই দিনই হিন্দুস্থানের গৌরবের দিন ছিল, যে দিন তক্ষশীলা, নালন্দা এবং ওদন্তপুরী আপন ঔজ্জল্যে উদ্ভাসিত হইয়া তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী দলে দলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কি এই সকল বিদ্যালয়ের উত্তরাধিকারী নহে? আমাদের যবদ্বীপের বা অন্য কোন স্থানের রক্ত সম্পর্কীয়দের কথা কি, সমগ্র জগৎ-বাসীকেই যেমন করিয়াই হউক এখানে আসিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা কি আমাদের উচিত নহে? ভারতীয় মুসলমানগণেরও তাঁহাদের যবদ্বীপনিবাসী সমধর্ম্মীগণের প্রতি একই জাতীয় কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আলিগড় কলেজের ন্যায় বিদ্যালয়ের প্রভাবের দ্বারা এবং বৃত্তিস্থাপন করিয়া তাঁহারাও তাঁহাদের যবদ্বীপবাসী নিরাশ্রয় মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে নূতন শক্তি ও প্রেরণা প্রদান করিতে পারেন। এইখানে আমরা একটি সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছি যাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য। স্বদেশের বাহিরে আমাদের যে সকল আপনার জন আছে, তাহারা হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক বা খ্রীষ্টানই হউক, —তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী আধ্যাত্মিক অভাবসমূহের পূরণ করা আমাদের একটি অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত; এবং কেবল মাত্র এই প্রকারেই আমরা ভারতের সঙ্গে তাহার সুদূর উপনিবেশগুলির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখিতে আশা করিতে পারি।

অনুবাদক—শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত।

রক্ত-মোক্ষণ

রক্ত-মোক্ষণের উপযোগিতা

কায়-চিকিৎসায় বমন-বিরেচনাদি কর্ম্ম যেরূপ নিত্যোপযোগী, শস্ত্র-চিকিৎসায় অনেকস্থলেই তদ্রূপ রক্তমোক্ষণকে বিশেষ উপযোগী বলা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল বৈদ্যক-চিকিৎসায় এই সব ক্রিয়ার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্যই অনেক সময় মুহূর্ত্তমাত্র চিকিৎসা-সাধ্য ব্যাধিতে সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতে হয়। আমাজীর্ণাবস্থায় তৎক্ষণাৎ বমন করাইলে যত শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, ভাস্করলবণাদি পাচক ঔষধ প্রয়োগে তত শীঘ্র ফল পাওয়া দুরাশা মাত্র। এইরূপ রক্ত-দুষ্টি জন্য ব্যাধিতে রক্ত-মোক্ষণ না করিয়া সংশোধক ঔষধের সাহায্যে রক্তশুদ্ধি শীঘ্র হইবার আশা নাই। ধন্বন্তরীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে:—

"একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্ত-মোক্ষণ মেকতঃ।
রক্তং হি ব্যম্লতাং যাতি তচ্চেন্নাস্তি ন চাস্তি রুক্॥
শিরাব্যধ শ্চিকিৎসার্দ্ধং শল্যতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতঃ।
যথা প্রাণিহিতঃ সম্যগ্ বস্তিঃ কায়চিকিৎসিতে॥"

রক্তদুষ্টি জন্য ব্যাধিতে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসায় যে ফল পাওয়া যায়, একমাত্র রক্তমোক্ষণেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। যেহেতু সে স্থলে রক্তই দূষিত হয় এবং তাহা বাহির করিয়া ফেলিলেই পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। শল্য-তন্ত্রে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণকে চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলা হইয়াছে, যেমন কায়-চিকিৎসায় একমাত্র বস্তি-প্রয়োগই (পিচকারী ও ডুস্ দেওয়া) চিকিৎসার অর্দ্ধেক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য মতে রক্ত-মোক্ষণ

পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে,—একদিন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র রক্ত-মোক্ষণই সর্ব্ব প্রকার চিকিৎসা-স্থানীয় ছিল। যাহার যে প্রকার ব্যাধিই হউক না কেন, প্রায়ই রক্ত-মোক্ষণ প্রধান প্রতীকার বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। কিন্তু এখন আর পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ পদে পদে রক্ত-মোক্ষণের ব্যবস্থা করেন না; সম্ভব, উক্ত প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন, বৈদ্যক মতে যে স্থলে রক্ত-মোক্ষণের বিশেষ উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থলেও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ উক্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন না। তন্মতে এই প্রক্রিয়া সর্ব্ব-সম্পূর্ণতা লাভ করিতে না পারায় অনেক স্থলেই কুফল দেখিয়া প্রায় পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

বৈদ্যক চিকিৎসায় পরিত্যাগের কারণ

বৈদ্যক-চিকিৎসায় রক্ত-মোক্ষণ কুফল দর্শনে পরিত্যক্ত হয় নাই। যে অজ্ঞতার অন্ধকারে অন্ধ হইয়া আমরা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ, আদিম সভ্য আর্য্যদের প্রথম উদ্ভাবিত শল্য-তন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি, যে যুগ-যুগান্তরীয় বিপ্লবে আমাদের সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকুও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যে অন্ধ-পরম্পরা-ন্যায়ে আমাদের গৌরব অতুল গ্রন্থরাজির শেষ চিহ্নের দুচারটি শ্লোকও অনেক স্থলে আমাদের নিকট অবুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে,—সেই অজ্ঞতা, সেই বিপ্লব ও সেই অন্ধ-পরম্পরানুসরণই রক্ত-মোক্ষণ পরিত্যাগের হেতু। ভারতে বৌদ্ধাধিকার প্রবলভাবে বিস্তৃত হওয়ায় দেশের রাজা ও পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। তাঁহারা জীবহিংসা ভয়ে চর্চ্চা (Research) ছাড়িয়া দেওয়ায় আয়ুর্ব্বেদের অবনতি হইতে থাকে। পরে ব্রাহ্মণাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও নবীন ব্রাহ্মণগণ শৌচভ্রষ্ট হইবার ভয়ে পূয-রক্তাদি স্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া অস্ত্র-চিকিৎসা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিতে থাকিলেন। এইরূপ অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় চিকিৎসা-ব্যপদেশে জীবহত্যা হওয়ার আশঙ্কায় তাঁহারা শেষে একেবারেই আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কালেই "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নান মাচরেৎ" প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। অশিক্ষিত নরসুন্দর অস্ত্রচিকিৎসক হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভাবিত যন্ত্র-শস্ত্রাদি ক্ষুর ও নরুনে পর্য্যবসিত হইল। বেদের হাতে রক্তমোক্ষণ, মালবৈদ্যের চক্ষুতে অস্ত্রোপচার ও নাপিতের ছেদন ভেদন ক্রিয়াই শল্য-তন্ত্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে থাকিল। দেশে প্রাচ্যদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শল্য-তন্ত্রের বিষয় জনসমাজ ভুলিয়া গেল। দোষ দর্শনে তাহাকে কেহ পরিত্যাগ করে নাই।

রক্ত মোক্ষণের উপায়

প্রাচীন কালে সাধারণতঃ রক্ত-মোক্ষণের জন্য চার প্রকার উপায় অবলম্বিত হইত। শিরাবেধ, শৃঙ্গ, অলাবু ও জোঁক লাগান। যন্ত্র প্রয়োগে শিরা উঠাইয়া তাহা অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করানকে শিরাব্যধ বলা হয়। শৃঙ্গদ্বারা রক্ত-মোক্ষণ করিতে হইলে ব্যাধিত স্থান সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে আঁচড়াইয়া দিয়া গবাদির শৃঙ্গযোগে চুষিয়া রক্ত বাহির করিতে হয়। এইরূপ লাউ-এর বশ ও জোঁক লাগাইয়াও রক্তস্রাব করান হইত। প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ দুই প্রকারে রক্ত মোক্ষণ করিতেন। এক জোঁক লাগান (Leeching) আর গ্ল্যাস লাগান (Cupping)। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটী বৈদ্যদের অলাবু লাগানের প্রতিরূপ মাত্র। শিরাবেধ করা প্রাচ্যদের নিজস্ব এবং একমাত্র শিরাবেধের দ্বারা তাঁহারা বহু প্রকার ব্যাধির উপশম করিতে সক্ষম হইতেন। ইহার কথঞ্চিৎ নিদর্শন সুশ্রুত সংহিতার শারীর-স্থানে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তাহার মধ্যে কতগুলি শিরাবেধের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য আমরা দেখাইতে পারি না, তথাপি অনেক স্থলে সুফল দেখিয়া তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তাহা অনুমান সকলেই করিতে পারেন।

প্লীহার রক্ত-মোক্ষণ

সুশ্রুত-সংহিতাকার শিরাব্যধ প্রকরণে প্লীহাচিকিৎসার জন্য বিধান করিয়াছেন :—

"বামবাহৌ কূর্পর-সন্ধে রভ্যন্তরতো বাহুমধ্যে প্লীহ্নি কনিষ্ঠানামিকয়ো র্মধ্যে বা।"

যদিও আমরা বুঝাইতে পারি না. কৃচ্ছ্রসাধ্য প্লীহা-ব্যাধি কি প্রকারে অতি অল্প আয়াসে বাম বাহু মধ্যে বা কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিয়া আরোগ্য হইতে পারে, তথাপি এই প্রকার চিকিৎসায় বহু কচ্ছপবৎ প্লীহাও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। সেই সব প্রক্রিয়ায় শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী শিরাবেধ করা না হইলেও কিন্তু তাহার ফল শিরা-বেধের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ৺ কাশীধামে একজনকে অবধৌতিক মতে প্লীহা চিকিৎসা করিতে দেখিয়াছি ; তিনি একখণ্ড শামুকের খোলা দিয়া বাম হস্তের মণিবন্ধের উপর শিরাবিশেষ কাটিয়া কার্পাসের ডাল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ঐ কর্ত্তিত শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিতেন। অবশ্য একটা মন্ত্রও সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতেন। এই প্রক্রিয়ায় বড় বড় প্লীহা সারিতে দেখা গিয়াছে। এদেশেও "প্লীহা কাটা"

নামে দুই প্রকার প্রক্রিয়া দেখা যায়। কাঠ ডুমুর, সেগুন প্রভৃতির কর্কশ পত্রের দ্বারা বাম বাহুর মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে ঘষিয়া ঘা করিয়া দেওয়া হয়, অথবা কনুই সন্ধির ভিতরের দিকে বাম বাহু মধ্যে 'গুল' করিয়া দেওয়া হয়। এই উভয় প্রক্রিয়াতেই কচ্ছপাকৃতি অতি বৃহৎ প্লীহাও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। এই উভয় প্রক্রিয়াই বাম বাহুর শিরা হইতে স্রাব করা উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়; সুতরাং ইহাকে শিরা বেধেরই রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

প্লীহার সহ বাম বাহুগত শিরার সম্বন্ধ

উপর্য্যুক্ত ফল দেখিয়া আমরা অনুমান করি যে বাম বাহুগত শিরা ও প্লীহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে। প্রাচ্য মহর্ষিগণ যোগদৃষ্টিতে ঐ সম্বন্ধ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিলেই প্লীহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, ইহা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। একটি রোগীর অবস্থাদৃষ্টে আমিও ঐরূপ সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছি। বহু স্থলেই প্লীহা ও যকৃতে প্রদাহ উপস্থিত হইলে বাম ও দক্ষিণ বাহুর মধ্যে বেদনা সঞ্চারিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব আমরা প্রত্যক্ষতঃ উক্ত শিরার সহিত প্লীহা বা যকৃতের কোন সম্বন্ধ বা শিরাবেধের প্রয়োজন না দেখাইতে পারিলেও "উরুগতা শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে গলগণ্ডের উপকার হইবে" তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না।

শিরাবেধে যন্ত্রপ্রয়োগ কর্ত্তব্য

শিরাবিদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে যন্ত্র প্রয়োগে শিরা উঠাইয়া লইতে হয়। অযন্ত্রিত ও অনুত্থাপিত শিরা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ। ঐ অবস্থায় শিরাবেধে সুবিধামত রক্তস্রাব হইতে পারে না এবং দুর্ব্বিদ্ধা শিরাতে নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। শিরা ব্যধ প্রকরণে নানা স্থানের শিরা বিদ্ধ করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্রোপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর, যে কোন উপায়ে শিরাটি বহির্ভাগে দৃষ্টিগোচর হইলেই হইল। তাহার জন্য শাস্ত্র লিখিত পন্থার অনুসরণ না করিয়া অন্য প্রকার স্বয়ং উদ্ভাবিত উপায়ও অবলম্বিত হইতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রকার শেষে বলিয়াছেন :—

"এবং যন্ত্রোপায়ানন্যাংশ্চ শিরোত্থাপনহেতূন্ বুদ্ধ্যাবেক্ষ্য বিদধ্যাৎ।"

মুখমণ্ডলে শিরাবিদ্ধ করিতে যন্ত্রণ-বিধির তাৎপর্য্য

সাধারণতঃ মুখের ভিতর ব্যতীত ঊর্দ্ধজত্রুগত শিরোত্থাপনের জন্য যে যন্ত্রণবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অর্থ লইয়া অনেক গণ্ডগোল হইয়া থাকে দেখিয়া আমি ঐ পাঠের কিছু আলোচনা করিব। "তত্র ব্যধ্যশিরং পুরুষং প্রত্যাদিত্য-মুখমরত্নিমাত্রোচ্ছ্রিতে উপবেশ্যাসনে সক্‌থ্নোরাকুঞ্চিতয়োর্নিবেশ্য কূর্পরসন্ধিদ্বয়স্যোপরি হস্তাবন্তর্গূঢ়াঙ্গুষ্ঠকৃতমুষ্টিমন্যয়োঃ স্থাপয়িত্বা যন্ত্রণশাটকং গ্রীবামুষ্ট্যোরুপরি পরিক্ষিপ্যান্যেন পুরুষেণ পশ্চাৎস্থিতেন বামহস্তেনোত্তানেন শাটকান্তর্দ্বয়ং গ্রাহয়িত্বা ততো বৈদ্যো ব্রূয়াৎ দক্ষিণহস্তেন শিরোত্থাপনার্থং নাত্যায়ত-শিথিলং যন্ত্রণমাবেষ্টয়েতি অসৃক্‌স্রাবণার্থং যন্ত্রং পৃষ্ঠমধ্যে পীড়য়েতি।" সুশ্রুত, শারীর ৮ম অধ্যায়।

এখন সুশ্রুতের যে কয় খানা বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে উক্ত অংশের অনুবাদ পাঠ করিয়া পাঠের কোনই তাৎপর্য্য গ্রহণ হয় না। ডাক্তার ওয়াইজ সুশ্রুত সংহিতার ইংরাজী ভাষায় যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আরও অস্পষ্ট ও বিচিত্র। এতদনুরূপ বাগ্‌ভট বচন যাহা চক্রপাণি সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও অনুবাদে কেহই মর্ম্ম পরিগ্রহ করাইতে সমর্থ হয়েন নাই। যত প্রকার মুদ্রিত সুশ্রুত পাওয়া যায় তাহাতে সর্ব্বত্র উক্তরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু টীকাকার ডল্লনাচার্য্য যে পাঠ ধরিয়াছেন তাহাতে অনুবাদের কোন গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি ব্যাখ্যাস্থানে বলিয়াছেন "সন্ধিদ্বয়স্য জানুসন্ধিদ্বয়স্য উপরি কূর্পরে নিবেশ্য ইত্যর্থঃ।" সুতরাং তিনি "কূর্পর-সন্ধিদ্বয়স্যোপরি" এই পাঠস্থানে 'কূর্পরে সন্ধিদ্বয়স্যোপরি' পাঠ বলেন; বাস্তবিক যদি 'কূর্পর' ও 'সন্ধি-দ্বয়'কে এক সমাসবদ্ধ পদ রাখিতে হয় তবে একটী অক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়া "কূর্পরসন্ধিদ্বয়স্যোপরি" স্থলে "কূর্পরসন্ধিদ্বয়মুপরি" করিলেই আর কোন অর্থ বোধের গণ্ডগোল থাকে না। গ্রন্থলিখিত পাঠ স্থির রাখিয়া অনুবাদ-

কারগণ কি প্রকারে অর্থ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। উক্ত পাঠে "নিবেশ্য" ক্রিয়ার কর্ম্ম কে হইবে? কেহ কেহ 'হস্তদ্বয় কূর্পর সন্ধিতে রাখিয়া' অনুবাদ করিয়াছেন; তাহা হইলে 'স্থাপয়িত্বা' কোন কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে? আরও, ইহার অনুবাদ-গ্রন্থ বাগ্‌ভটে লিখিত আছে "জানুস্থাপিত-কূর্পরং" সুতরাং কূর্পরকে জানুসন্ধিদ্বয়ের উপর রাখিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এবং পাঠে যে ভুল আছে তাহা একটু বিবেচনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন।

আমি ললাটগত শিরাবেধে যন্ত্রণ-প্রকার বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। উক্ত প্রকারে যন্ত্রিত করিলে মুখমণ্ডলের শিরা সকল পরিষ্কাররূপে দৃশ্যমান হয় এবং নির্ব্বাধে প্রমাণমত রক্তস্রাব হইয়া থাকে। উক্ত প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধ সুবাদ পাঠকদের বোধসৌকর্য্যার্থ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠকবর্গ পূর্ব্বানুবাদকারীর তথা-কথিত অনুবাদের সহ তুলনায় সমালোচনা করিবেন।

"সেই সময় রোগীকে অরত্নিপ্রমাণ উচ্চ (১৬ ইঞ্চি উচ্চ বেতের মোড়া বা জল চৌকী প্রভৃতি; বিনা আসনে বা তদপেক্ষা নিম্ন আসনেও কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু উচ্চ আসন না হয়) আসনে সূর্য্যের দিক সম্মুখ করিয়া উপবেশন করাইবে (উপযুক্ত আলোর জন্য "প্রত্যাদিত্যমুখং" বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিপ্রহরে উর্দ্ধমুখ করিতে হইবে না)। রোগীর সক্‌থিদ্বয় (পদদ্বয়) আকুঞ্চিত করাইয়া তাহার উপর কনুই সন্ধিদ্বয় স্থাপন করাইবে। তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতের মধ্যে রাখিয়া মুষ্টিবন্ধন করিতে বলিবে ও সেই মুষ্টিদ্বয় গলার যে প্রধান শিরাদ্বয় আছে তাহার উপর স্থাপন করিতে বলিবে। একজন পরিচারক রোগীর পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া একখানা কাপড় লম্বাভাবে ভাঁজ করিয়া রোগীর গলা ও মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া এক পেঁচ ঘুরাইয়া লইবে। ঐ কাপড়ের প্রান্তদ্বয় সে বামহস্ত চিৎ করিয়া ধরিয়া রাখিবে। তার পর বৈদ্য পরিচারক বলিবে, তুমি বাম হস্তে কাপড়ের প্রান্তদ্বয় ধরিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা পাক দিতে থাক, যেন কাপড়টা গলায় কসিয়া ফাঁস না আটকায় অথবা ঢিলা হইয়া না থাকে। এইরূপ ভাবে পাক দিলেই শিরা সকল দৃষ্ট হইবে। পরে কুঠারিকা দ্বারা শিরাবেধ করিয়া ধীরে রক্তস্রাব করাইবার জন্য পূর্ব্ববৎ পাক দেওয়া প্রান্তদ্বয় পৃষ্ঠের দিকে চাপিয়া ধরিবে। রোগী এই সময় মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া রাখিবে।"

সকলেই জানেন যে, যদি কাহারও গলা চাপিয়া ধরা যায় বা গলায় গামছা মোড়া দেওয়া যায়, তবে তাহার মুখমণ্ডল লাল হয় ও শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে। ইহাই মুখমণ্ডলের শিরোত্থাপনের যন্ত্র। তবে গামছা মোড়া দিলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মারা যাইতে পারে বিবেচনায় গলায় মুষ্টি রাখিয়া তাহার উপর দিয়া মোড়া দেওয়ার বিধান করা হইয়াছে। এইরূপে প্রধান শিরার উপর চাপ দেওয়ায় শাখা শিরাগুলি উত্থিত হইবার সুবিধা পাইয়া থাকে।

শিরাবেধে অস্ত্রনির্ব্বাচন

সাধারণতঃ শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে দুই প্রকার অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ললাটাদির ন্যায় কেবল অস্থি ও চর্ম্মের উপর শিরাবেধে কুঠারিকা ব্যবহৃত হয় এবং মাংসল প্রদেশে ব্রীহিমুখ শস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুঠারিকার বর্ণন প্রসঙ্গে ভোজদেব বলিয়াছেন :—

কুঠারিকা

"কুঠারিকায়া বৃন্তং স্যাৎ সার্দ্ধসপ্তাঙ্গুলায়তম্।
ফলমর্দ্ধাঙ্গুলায়ামং গোদন্তসদৃশং সমম্॥"

কুঠারিকার বৃন্ত (বাঁট) সাড়ে সাত অঙ্গুল দীর্ঘ ও ফলা অর্দ্ধাঙ্গুল দীর্ঘ হইবে। আকার অনেকটা আধুনিক দন্তবেষ্টচ্ছেদক অস্ত্রের (Gum Lance) ন্যায়। তবে তাহা অপেক্ষা বাঁটটী কিছু দীর্ঘ ও ফলার অগ্রভাগ গোদন্তের ন্যায় সরল, ঘোরাল নহে। শিরার সর্ব্বত্র সরলভাবে বিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শিরাবেধ ব্রণাদি ছেদনের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঈপ্‌সিত নহে। কুঠারিকার ধার কেশের মত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক।

ব্রীহিমুখ শস্ত্র

আর ব্রীহিমুখ শস্ত্রের বর্ণনায় বলিয়াছেন :—

"শস্ত্রং ব্রীহিমুখং কার্য্যমঙ্গুলানাং ষড়ায়তম্।

ষড়ঙ্গুলং তস্য বৃন্তং স্যাৎ ফলন্তু চতুরঙ্গুলম্ ॥
তন্মুখং ব্রীহিবিস্তারম্... ... ..."

ব্রীহি-মুখ শস্ত্র ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে। তাহার মধ্যে দুই অঙ্গুলি বাঁট ও চারি অঙ্গুলি ফলা। ফলার মুখ ধান্যের ন্যায় বিস্তারবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রথমে সূক্ষ্ম, মধ্যে স্থূল হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে। এই যন্ত্রকেই পাশ্চাত্য মতে ট্রোকার্স (Trocars) কহে। আর ইহার ধার কেশের মত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক।

অস্ত্র-ধারণ প্রণালী

কুঠারিকা দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে অস্ত্রখানি সাধারণ কুঠারের ন্যায় বামহস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিতে হইবে। পরে অস্ত্রের ফলাটি উত্থিত শিরার উপর লম্বাভাবে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সহযোগে ফলার মাথায় টোকা দিতে হইবে। টোকার বেগে ফলাখানি শিরার মধ্যে বসিয়া যাইবে ও শিরাকে লম্বাভাবে চিরিয়া ফেলিবে। মোক্ষণের সর্ব্বত্রই অস্ত্রখানি লম্বাভাবে প্রয়োগ করিয়া শিরাকে চিরিয়া ফেলাই বিধি। আড়ভাবে অস্ত্র করিলে শিরা ছিন্ন হওয়ার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রোগীর বিপদ্ ঘটিতে পারে। ব্রীহিমুখ শস্ত্রের বাঁট দক্ষিণ হস্তের তালুর মধ্যে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ফলা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া উত্থিত শিরার উপর বিদ্ধ করিতে হইবে। অতিরিক্ত মাংসল প্রদেশে এক যব পরিমাণ ও অন্যত্র অর্দ্ধ যব পরিমাণ গভীর করিয়া শস্ত্র বিদ্ধ করিতে হয়।

অস্ত্রাদির দোষে অথবা চিকিৎসকের অজ্ঞতাহেতু শিরা বিদ্ধ করায় নানা প্রকার বিপদ্ ঘটিতে পারে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও তৎপ্রতীকার শল্য-তন্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, আমরা বাহুল্যভয়ে আর তাহার উল্লেখ করিব না।

শৃঙ্গদ্বারা রক্তমোক্ষণ

আয়ুর্ব্বেদে ভিন্ন ভিন্ন দোষের দ্বারা রক্তদুষ্টিতে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রদ্বারা রক্তমোক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে। বায়ু দ্বারা দুষ্ট হইলে শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্ত দ্বারা দুষ্ট হইলে জোঁক লাগাইয়া ও শ্লেষ্মদুষ্টে অলাবু দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে শৃঙ্গ ও অলাবুদ্বারা রক্ত মোক্ষণের প্রকার প্রায় একরূপই। যথা :—

"তত্র প্রচ্ছিতে তনুবস্ত্রপটলাবনদ্ধসূত্রেণ
শৃঙ্গেণ শোণিত মবসেচয়েদা চুষণাৎ
সান্তর্দীপয়া অলাব্বা"

উভয় প্রকারেই রক্তমোক্ষণোদ্দিষ্টস্থান ত্রিকূর্চ্চকাদি অস্ত্র দ্বারা যবমাত্র ব্যবধানে রাখিয়া সরল রেখাকারে অঙ্গুলি প্রমাণ একটু চামড়া কাটিয়া ৪।৫টী দাগ দিতে হইবে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'পেঁচে' দেওয়া বলে। তারপর ঐস্থানে শৃঙ্গ লাগাইয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিতে হইবে। শৃঙ্গযন্ত্রের জন্য একটী গোশৃঙ্গ উভয় দিক সমান করিয়া কাটিয়া ছিদ্র বাহির করিয়া লইলেই হইল। শৃঙ্গ লাগাইবার পূর্ব্বে তাহার মাথার দিকে ৪।৫ পরল ন্যাকড়া একটু সূতা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া দরকার। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শৃঙ্গে মুখ না দেওয়ার উদ্দেশ্যে ও উত্তমরূপে বায়ু নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য এই প্রকার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। চোষণের বেগে শৃঙ্গের ভিতরের বায়ু বহির্গত হইলে শূন্য স্থান পূরণের জন্য প্রচ্ছিত স্থান দিয়া বেগে রক্ত বাহির হইতে থাকিবে। তৎকালে শৃঙ্গের মাথার দিকের মুখে একটী অঙ্গুলি চাপা দিয়া আর বায়ু প্রবেশ করিতে না দিলেই স্বতঃই শোণিত বাহির হইতে থাকিবে, আর কোন চেষ্টা করিতে হইবে না।

অলাবুদ্বারা রক্তমোক্ষণ

অলাবুর প্রক্রিয়াতেও বায়ু নিষ্কাশনই রক্ত বাহির করিবার উপায়। একটী তিত লাউএর বশের (পক্ক ফলের খোসা) মধ্যে দীপাদি প্রজ্বলিত করিয়া অথবা মধ্যে মদ্য দিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া অধোমুখ করিয়া ঝাড়া দিয়া অগ্নি নিবাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রচ্ছিত স্থানে মুখটী চাপিয়া ধরিলেই ভিতরের বায়ু দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় চামড়ার সহিত আটকাইয়া যাইবে ও শূন্য স্থান পূরণ জন্য রক্ত বহির্গত হইতে থাকিবে। অনেকেই দেখিয়াছেন একটী চাবি চুষিয়া ঠোঁটের সঙ্গে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ আটকাইয়া ধরে; ইহাও সেই প্রকার। পাশ্চাত্য মতে এইরূপ প্রক্রিয়াকে কাপিং (Cupping) করা বলে।

আমাদের দেশে এখনও বেদেরা শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া থাকে ও কেহ কেহ অলাবূর স্থানে বাঁশের চুঙ্গি লাগাইয়া থাকে। তবে চুঙ্গির মধ্যে আগুন না জ্বালাইয়া তাহাকে খুব গরম জলে ফুটাইয়া লওয়ার পর তৎক্ষণাৎ তুলিয়া গরম জল ফেলিয়া দিয়া প্রচ্ছিত স্থানে চাপিয়া ধরিতে হয়।

পেঁচে দেওয়ার অস্ত্রনির্ব্বাচন

ত্বকের প্রচ্ছান ক্রিয়া অর্থাৎ পেঁচে দেওয়ার জন্য সাধারণতঃ ত্রিকূর্চ্চক অস্ত্রই প্রশস্ত। কুশ পত্রাদি দ্বারাও কার্য্য চলিতে পারে। এই ত্রিকূর্চ্চকের বর্ণনা প্রসঙ্গে তন্ত্রকার বলিয়াছেন :—

ত্রিকূর্চ্চকাস্ত্রের বর্ণনা

"অঙ্গুলানি তথাষ্টৌ চ শস্ত্রং কার্য্যং ত্রিকূর্চ্চকম্।
ফলৈরওমুখাকারৈ রঙ্গুলৈ র্ব্বিতং ত্রিভিঃ।
একৈকস্য ফলস্যোযামন্তরং ব্রীহিসম্মিতম্।
বৃত্তং পঞ্চাঙ্গুলায়ামং কার্য্যং রুচকভূষিতম্।"

এই অস্ত্র মোট আট অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে ; তাহার মধ্যে তিন অঙ্গুলি ফলা ও পাঁচ অঙ্গুলি হস্তিদন্তাদি খচিত বাঁট হইবে। ফলা তিন খানা থাকিবে, প্রতি ফলার ব্যবধান এক ধান মাত্র হইবে। আজকাল এই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যমতে স্ক্যারিফিকেটস্ (Scarificators) নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাতে এক সঙ্গে ১২ খানি অস্ত্র থাকায় একবারে ১২টী দাগ পড়িয়া যায়। ইহা ত্রিকূর্চ্চকেরই উন্নত সংস্করণ বলিতে হইবে।

জোঁক লাগান

রক্তমোক্ষণের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে জোঁক লাগান সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলিয়া মনে করি। এই প্রক্রিয়ার উপযুক্ত জোঁক নির্ব্বাচনই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। এই প্রাণী সবিষ ও নির্ব্বিষ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। ভ্রমক্রমে বিষাক্ত জোঁক লাগান হইলে দংশন স্থানে অতিরিক্ত চুলকানি ও শোথ হয়। রোগী জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহাদি দ্বারাও আক্রান্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ জোঁকের মধ্যে আমরা কপিলা নামক জোঁকের দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইয়া থাকি। এই দেশের পদ্মপূর্ণ বিলের মধ্যে এই জাতীয় জোঁক বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা আকারে ক্ষুদ্র, রং ঈষৎ মেটে মেটে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণ বর্ণ দুইটা রেখা আছে। বিলের মধ্যে একটী মহিষ নামাইয়া দিলে তাহার গায়ে বহু জোঁক ধরিয়া যায়। মহিষ উঠিলে তাহার গা হইতে খুলিয়া লইয়া অতিরিক্ত রক্ত পান করিয়া থাকিলে তাহা বমন করাইয়া একটী কাচের জারের মধ্য পাঁক ও জল দিয়া রাখিলে বহুদিন ইহাদিগকে জীবিত অবস্থায় রাখা যায়। মধ্যে মধ্যে জল বদলাইয়া লইতে হয়। সুশ্রুত সংহিতায় এই পালিত জোঁককে শুষ্ক মাংসাদি আহার্য্য দেওয়ার কথা লিখিত আছে, কিন্তু আমি কয়েকটী জোঁককে কেবল পাঁক জলে রাখিয়া এক বৎসরের অধিক জীবিত রাখিয়াছিলাম ও তাহাদ্বারা দশ বার (১০।১২) বার কার্য্য করাইয়া লইলেও উহা মরিয়া যায় নাই।

জোঁক লাগাইবার প্রণালী

এইরূপ ভাবে সংগৃহীত জোঁক লাগাইবার পূর্ব্বে একটা শরার মধ্যে লইয়া অল্প সরিষার গুঁড়া ও বেশী পরিমাণে হরিদ্রার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া তাহার শরীর লিপ্ত করিতে হইবে এবং পরিস্রুত জল দিয়া তাহাকে ৪।৫ বার ধুইয়া লইতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় তাহার শরীর হইতে প্রভূত পরিমাণে লালা নিঃসৃত হইবে। পরে রোগীকে উচ্চাসনে পা ঝুলাইয়া বসাইয়া, অথবা যদি রোগী জোঁক দেখিয়া ভয় পায় তবে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিবে। ব্যাধিত স্থান একটু সাবান বা গোবর দিয়া ধুইয়া রুক্ষ করিয়া লইবে। পরে জোঁকটীকে একখানা আর্দ্র বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ধরিয়া তাহার মুখ ব্যাধিত স্থানে স্পর্শ করাইবে। যদি না লাগিতে চায় তবে ঐ স্থানে দুগ্ধ বা রক্ত দিবে অথবা স্থানটী একটু পেঁচে রক্ত বাহির করিয়া দিবে আমরা সর্ব্বত্রই একটু পেঁচে রক্ত বাহির করিয়া দিয়া থাকি। তাহা হইলে আর না লাগিবার আশঙ্কা থাকে না। ঐ সময় যদি জোঁকের মুখ অশ্ব খুরের ন্যায় বিস্তৃত হয়, তবে ধরিতেছে জানা যায়। তার পর একখানা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা জোঁকটী ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে

একটু জল ঐ কাপড়ের উপর দিতে হইবে। যদি দষ্ট স্থানে বেদনা বোধ হয় অথবা চুল চুল করে, তবে বিশুদ্ধ রক্ত আকর্ষণ করিতেছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে খুলিয়া ফেলিতে হইবে। টানিয়া খুলিতে হইবে না, জোঁকের মুখে লবণ বা হুকার জল দিলে আপনিই পড়িয়া যাইবে। যতক্ষণ দুষ্ট রক্ত আকর্ষণ করিবে, ততক্ষণ রোগী জোঁক লাগান আছে অনুভব ব্যতীত কোন যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবে না। উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত পান করিলে জোঁকটী আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।

জোঁকের চিকিৎসা

জোঁকটা দ্বারা পুনর্ব্বার কাজ লইতে হইলে তাহার এই সময়ে একটু চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা মনুষ্যরক্ত পান করার জন্য অসাধ্য ইন্দ্রমদ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। পড়িয়া যাওয়া মাত্র জোঁকটীর শরীরে চাউলের গুড়া মাখিবে এবং মুখে একটু তিল তৈল ও লবণ মাখাইবে। পরে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার পুচ্ছদেশ ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া সমস্ত রক্ত বমন করাইয়া ফেলিবে।

পরে একটা শীতল জলপূর্ণ সরায় কিছুক্ষণ রাখিয়া সুস্থ হইলে পূর্ব্ববৎ পাঁক ও জল দিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে।

কোন ব্যাধিতে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক এবং কোথায় কি উপায়ে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে তাহা বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল॥

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী ভিষগাচার্য্য

বাসন্তী।

বসন্ত উষার সন্ধ্যা শ্রান্ত-ধীর-পদে
নেমে আসে বসুধার চিত্ত-কোকনদে;
প্রশান্ত শান্তির ছায়া দিগন্তের তীরে
প্রসারিয়া অতর্কিতে! ধীরে ধীরে ধীরে,
শিরীশ সজিনা আর অতসী তরুর
সঙ্কুচিত পত্ররাজি, সলজ্জা বধূর
চারু অক্ষিপত্র হেন। কোকিলের তান
দূরে দূরে—বহুদূরে, গগন বিতান
মুখরিয়া থেমে আসে, চাষীর বাঁশীর
শেষ সুরটীর সম। প্রমত্ত অলির
বিদায় চুম্বন পূর্ণ মলয় পরশে
রসাল মুকুল ঝরে, যেন পড়ে খসে
বিরহী যক্ষের কোন গাঢ় আলিঙ্গনে
প্রেয়সীর কণ্ঠমালা ছিঁড়িয়া ভুবনে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দেওভোগের বৃষ।

চারি পাঁচ বৎসর গত হইল, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছয়গাও দেওভোগ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী একখণ্ড ভূমি খনন করিবার সময় একটি প্রকাণ্ড পাষাণ নির্ম্মিত বৃষ আবিষ্কৃত হয়। বৃষটি প্রথমে দেওভোগ গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী বুড়ীর হাট নামক স্থানে রক্ষিত হওয়ায় উহা দেওভোগের বৃষ বলিয়াই পরিচিত। বর্ত্তমানে উহা ঢাকা যাদুঘরের প্রবেশ দ্বারে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতেই বৃষটিকে বিশেষ প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। উহার শিঙ্গ ও কাণ অন্য কোনও প্রকার ধাতু বা প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত হইয়া যে উহার সহিত সংযোজিত হইয়াছিল, মস্তকের মধ্যবর্ত্তী গর্ত্তগুলি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কোন্ কালে যে উহা অপহৃত হইয়াছে জানা যায় না। লক্ষ্মীর কোন্ বরপুত্র কোন্ সময়ে যে উহার প্রতিষ্ঠা

করিয়াছিলেন, এত কাল পরে তাহা নির্ণয় করাও একপ্রকার অসম্ভব। তথাপি স্থানীয় অতি প্রাচীন প্রবাদাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে হয় তো বা ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই আশায়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

কবি জয়নারায়ণ ও রামগতি এবং বিদুষী কবি আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি পূর্ব্ববঙ্গের যে জমিদার বংশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, লক্ষ্মী-সরস্বতীর পরমপ্রিয় জবসার সেই জমিদার বংশের কীর্ত্তি কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। পূর্ব্বে ছয়গা গ্রামে জবসার এই বাবুগণের একটি কাছারি বাড়ী বর্ত্তমান ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৃষটি হয়তো বা তাঁহাদেরই স্থাপিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়াই আমাদের ধারণা। কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশেই জবসার জমিদার বংশের উত্থান হয়, কিন্তু বৃষটি যে সে সময়াপেক্ষাও প্রাচীন তাহা উহার বাহ্যিক অবয়ব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। জবসার বাবুদের নিজ বসত বাটিতে (জবসায়) স্থাপিত শিবলিঙ্গের মত অত বড় শিবলিঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে আর একটিও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। তথাপি উক্ত শিবের নিকট প্রদত্ত পাষাণের বৃষটি ছয়গায়ের বৃষ অপেক্ষা অনেক ছোট। নিজ বাটীতে স্থাপিত শিবের বৃষ অপেক্ষা একটা কাছারি বাড়ীতে স্থাপিত শিবের বৃষ এতটা বৃহৎ হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। আর তাহা সম্ভবপর বলিয়া লইলেও অত বড় বৃষটিকে বাটিতে না আনিয়া তথা হইতে ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী ছয়গায়েই ফেলিয়া দেওয়া কোন মতেই বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। জবসার জমিদার বংশের ক্ষমতা খুবই অল্পদিন পূর্ব্বে প্রবল ছিল। কাজেই তাহাদের স্থাপিত হইয়া থাকিলে এত বড় বৃষ সম্বন্ধে এই একটা প্রবাদ প্রচলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ কিছু নাই। কাজেই বৃষটী জবসার বাবুদের স্থাপিত বলিয়া অনুমান করার বিশেষ কোনই কারণ বর্ত্তমান নাই।

ছয়গা দেওভোগ বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। উক্ত ভূভাগের বহির্দৃশ্য ও স্থানীয় প্রবাদ এখনও উহার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থানটির দক্ষিণ দিক দিয়া পূর্ব্বে "লেদামের নদী" নামে একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা ছিল, এবং ছয়গা ও দেওভোগ উহারই উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এই নদীই বোধ হয় বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিত। ইহার অপর পার ইদিলপুর পরগণান্তর্গত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে "লেদামের মরা গাঙ্গে" কাচকী নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য ধৃত হইয়া বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ ও কেদার রায়ের জননীর জন্য তাহাদেরই নির্ম্মিত বর্ত্ম বহিয়া শ্রীপুরে নীত হইত বলিয়া উহা "কাচকীর দরজা" নামে খ্যাত হয়, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই 'কাচকীর দরজা" লেদামের নদীর উত্তর তীরে দেওভোগ গ্রামের সীমান্তে যেস্থানে শেষ হইয়াছে, তথায় একটি প্রাচীন গঞ্জ বা হাট বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহার নাম "বুড়ীর হাট।" লোকে এখনও কথাচ্ছলে কেদার জননীর দীর্ঘ জীবনের গল্প করিয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে কণ্টকযুক্ত বৃহৎ মৎস্য ভক্ষণে অসমর্থা ছিলেন বলিয়াই নাকি তাঁহার জন্য কণ্টকহীন কাচকী মৎস্য প্রেরিত হইত। কাজেই আমাদের অনুমান হয় যে, যেই স্থানে মৎস্য ধৃত হইয়া রক্ষিত হইত এবং যে স্থান হইতে উহা শ্রীপুরে প্রেরিত হইত তথায় মৎস্যাদির ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান হাটটির উদ্ভব ঘটিয়াছে; এবং বৃদ্ধা রাজমাতা ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া উক্ত হাট বুড়ীর হাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে হাটটি দক্ষিণ বিক্রমপুর ও সমগ্র ইদিলপুরের মধ্যে নৌকা (বুড়ী) ব্যবসায়ের কেন্দ্র বলিয়াও বিখ্যাত।

কিন্তু বক্ষ্যমাণ বৃষটি যে এই শ্রীপুরের রায় রাজাদের স্থাপিত তাহা বিশ্বাস হয় না। রায় রাজাদের গুরু বিখ্যাত তান্ত্রিক গোসাই ভট্টাচার্য্যের অন্যতম জামাতা সিদ্ধ পুরুষ আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয়ই রায় রাজাদের শাসন সময়ে প্রথমে ছয়গায়ে বাটী নির্ম্মাণ করেন; এবং সে সময়ে তিনিই তথায় একমাত্র ব্রাহ্মণ অধিবাসী ছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ছয়গাঁ ব্রাহ্মণ শূন্য ছিল; কারণ তাহারও পূর্ব্বে মুসলমানগণের উৎপীড়নে

স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ছয়গাঁ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে। কাজেই আচার্য্য-চূড়ামণির সময়ের স্থাপিত হইলে, তাহার ধনবান্ বংশধরগণ কর্ত্তৃক উহা বিসর্জ্জিত হওয়া কখনও সম্ভবপর মনে হয় না। চূড়ামণির বংশধরগণ এখনও সকলে সম্মিলিত হইয়া তৎস্থাপিত 'কালী খোলায়' প্রতি বৎসর মহা ধূমধামের সহিত কালী পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই বৃষ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে কোনও রূপ প্রবাদও শুনিতে পাওয়া যায় না।

প্রবাদ অনুসারে ষোড়শ শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ছয়গাঁ ও দেওভোগ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থান ছিল। লেদামের নদী বাহিয়া এখানে নাকি মগ প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ীগণও ব্যবসা করিতে আগমন করিত। যে স্থানে তাহারা বাজার স্থাপন করিয়াছিল, ছয়গাঁবাসীগণ এখনও সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ছয়গাঁয়ে অতি প্রাচীন বড় বড় ছয়টী দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন নাম বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান বলিয়া এই জলাশয়গুলি 'মঘুয়া দীঘি' নামে পরিচিত।

প্রবাদ, অতি প্রাচীন কালে একজন মগ নাকি ব্যবসা উপলক্ষে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আগমন করিয়া ছয়গাঁ গ্রামের প্রতিষ্ঠা করে, এবং যেরূপেই হউক এ অঞ্চলে প্রকাণ্ড জায়গীর প্রাপ্ত হওয়ায় সে এখানেই থাকিয়া যায়, এবং ছয়গাঁয়ই তাহার রাজধানী হয়। তাহার ছয়টি রাণী ছিল। সে প্রত্যেক রাণীকে এক একটি দীর্ঘিকা-সমন্বিত বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেয়। পরবর্ত্তী সময়ে দীর্ঘিকা-সমন্বিত ঐ ছয়টি বাড়ীই ছয় রাণীর নামানুসারে ছয়টি পল্লীতে পরিণত হয়। এখন উক্ত ছয়টী পল্লীর সমাহারে গ্রামটি ছয়গাঁ নামে পরিচিত। এই সমস্ত পল্লীর মধ্যে রাণীসারই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং তত্রত্য দীর্ঘিকা, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই রাণীসারেই প্রকৃত পাটরাণীর বাসভবন ছিল। তদ্ব্যতীত সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত একটী প্রকাণ্ড ভূভাগ 'দেউল বাড়ী' বলিয়া পরিচিত।

গ্রামের উত্তর দিকে 'বসন্ত রায়ের বাগ' বলিয়া একটি বিস্তৃত স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা হইতে একটি বৃহদাকার বত্ম গ্রামের উত্তর ও পশ্চিম দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অপর দিকে গ্রামের দক্ষিণে নদীর পরপার মুসলমানদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ছয়গাঁয়ের ঠিক বিপরীত দিকে বর্ত্তমান কুতুকপুর (?) গ্রামে তাহাদের একটি প্রমোদ-উদ্যান ছিল। কথিত আছে যে, ছয়গাঁয়ের জায়গীরদার বংশের ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া পড়িলে কুতুকপুরের মুসলমানগণ নদী পার হইয়া এপারের হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন করিত; কিন্তু ছয়গাঁয়ের জায়গীরদারগণ তাহার কোনই প্রতীকার করিতে পারিতেন না। এইরূপ অত্যাচারের ফলে ছয়গাঁ দেওভোগের হিন্দু, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ উক্ত স্থান ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন, এবং অল্পকাল মধ্যেই এ অঞ্চল মুসলমান করায়ত্ত হইয়া যায়।

ছয়গাঁ দেওভোগের প্রাচীন নাম জানা যায় না। প্রবাদে ছয়গাঁ গ্রামের বর্ত্তমান নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, আমরা উপরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দেওভোগ গ্রামের নামটিই উহার উৎপত্তির কারণ বলিয়া দেয়। এ অঞ্চলে 'দেওভোগ' নামে বহু গ্রামের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়; বোধ হয় উহারা (কুমারভোগ, ব্রাহ্মণভোগ প্রভৃতি গ্রামের মত) কোনও বিগ্রহের দেবোত্তর স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। গ্রাম মধ্যস্থ দীর্ঘিকাগুলি 'মঘুয়া দিঘি' বলিয়া অভিহিত। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকগণ মগশব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বুঝিয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ ছয়গাঁয়ে আগমনকারী জায়গীরদারকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই শ্রেণীর বিশ্বাসের আর একটি কারণ এই যে, সোনারগাঁ অঞ্চলেও এই শ্রেণীর 'মঘুয়া দীঘি'র অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, এবং ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সোনারগাঁ এক সময়ে মগদের হস্তগত ছিল। পাঠানবীর ঈশা খাঁ মসনদ আলীর মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী বীরাঙ্গনা সোনাবিবি মগরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া ত্রিবেণীর দুর্গে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। সোনামণির মৃত্যুর পরেই সোনারগাঁ আরাকান-রাজের হস্তগত হয়, এবং বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায় সোনারগাঁর মগদের সহিত সম্মিলিত হইয়া

মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা।* মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সম্বন্ধ যে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশ হইতেই ঐ অঞ্চলবাসীগণ তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল, এবং বাঙ্গালী নাবিকগণ যে সেখানে যাতায়াত করিত তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (†)। বৌদ্ধ-জগতে বিখ্যাত বিক্রমপুরের তান্ত্রিক বৌদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানও (অতীশ) কিছুকাল বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছিলেন। এখনও মঘুয়া তিলি 'মঘুয়া ব্রাহ্মণ' মঘুয়া কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয়। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থ সমূহে 'মঘুয়া' দোষ প্রাপ্ত বহু বংশের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখনও অনেক মগ পূর্ব্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ 'নোয়াখালী' চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় সুপারীর ব্যবসা করিয়া থাকে। কাজেই মগদের নাম হইতে যাহারা মঘুয়া দীঘির নামোৎপত্তি সন্দেহ করেন, তাহাদিগের মতটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কিন্তু মগ বলিতে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীই বুঝিতে হইবে, আমরা এ মত সমর্থন করিতে পারি না। মগ বলিতে চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের (যেখানে এখনও অনেক বৌদ্ধের বাস) লোকগণ স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বুঝিয়া থাকে, কিন্তু এদেশবাসীগণ হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, আরাকান ও ব্রহ্মদেশবাসী লোক মাত্রকেই মগ বলে। কাজেই মগ শব্দ দেখিলেই তাহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা নারাজ।

কেহ কেহ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান এই শ্রেণীর দীর্ঘিকা খননে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশে এমন একটা যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তখন সকলেই ঐ শ্রেণীর দীর্ঘিকা খনন করাইত। এই অনুমান প্রমাণহীন; অতএব ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়। ঐ শ্রেণীর সমস্ত পুকুরগুলি যে একই যুগে খনিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব; পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খনিত ঐ শ্রেণীর দীর্ঘিকা অনেক দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের উক্তিতে ঐ শ্রেণীর দীর্ঘিকাগুলি কেন যে 'মঘুয়া দীঘি' বলিয়া অভিহিত হইল, তাহারও কারণ বর্ণিত হয় নাই। কাজেই ঐ মত গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে 'মগ' শব্দে শাকদ্বীপ হইতে আগত লোক সমূহকেও বুঝাইয়া থাকে। এই শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণ (দৈবজ্ঞ) সূর্য্যোপাসক ছিলেন (১)। নগেন বাবুর উক্তিতে ঐতিহাসিক সত্য কতটা বর্ত্তমান আছে, তাহা ঐতিহাসিকদেরই বিবেচ্য; কিন্তু যদি উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে সূর্য্যোপাসক মগগণ কর্ত্তৃক সূর্য্য বরাবর পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান দীর্ঘিকা খনন মোটেই অসম্ভব নয় এবং এই মগগণ হইতে ঐ শ্রেণীর দীর্ঘিকা 'মঘুয়া দীঘি' বলিয়া পরিচিত হওয়া ত স্বাভাবিক। উপর্যুক্ত দুই মতের কোন্‌টি গ্রহণীয় তাহা ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিবেন।

প্রবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন ছয়গাঁর জায়গীরদারগণ ক্ষীণবল হইয়া পড়েন, তখনও বিক্রমপুর মুসলমান করায়ত্ত হয় নাই বটে; কিন্তু তত্রত্য হিন্দুরাজার ক্ষমতা নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিক্রমপুর যে তখন হতবল সেন-বংশীয়গণ কর্ত্তৃকই শাসিত হইতেছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ম্মারাজগণের শাসন সময়ে বর্ত্তমান ইদিলপুর পরগণা বিক্রমপুরেরই অন্তর্গত ছিল এবং ঐ ভূভাগও বিক্রমপুর বলিয়াই অভিহিত হইত (২)। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইদিল খাঁ নামে জনৈক মুসলমান উক্ত স্থানের প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া উহা ইদিলপুর নামে আখ্যাত হয়। গত সেটেলমেণ্টের

* Elliot's History of India—Takmili Akbarnama series.

† Prof Mukherjee's Indian Shipping and Maritime Activity.

(১) Archeological survey of Mayurbhanje এবং বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ খণ্ড।

(২) শ্যামল-বর্ম্মা দেবের তাম্রশাসন।

জরিপের সময় প্রাচীন কাগজ পত্র দৃষ্টে নিরূপিত হইয়াছে যে, ছয়গাঁ দেওভোগ ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম প্রকৃত প্রস্তাবে ইদিলপুর পরগণান্তর্গত। উপরে উল্লিখিত প্রবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান বিক্রমপুর মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বেই ছয়গাঁ দেওভোগ অঞ্চল তাহাদের হস্তগত হয়। কাজেই অনুমিত হয় যে, ইদিল খাঁর জীবদ্দশায়ই এ অঞ্চল তাহার করায়ত্ত হয় বলিয়া, তাহার শাসিত অন্যান্য ভূভাগের মত ইহাও ইদিলপুরেরই অন্তর্গত করা হইয়াছিল। আরও বুঝিতে পারা যায় যে, ইদিলপুর বর্ত্তমান বিক্রমপুরের পূর্ব্বে মুসলমান করায়ত্ত হয়; তৎপরে ছয়গাঁ দেওভোগ অঞ্চল, এবং তাহারও পরে বর্ত্তমান বিক্রমপুরে মুসলমাগণের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান হয়। মুসলমানগণ দুর্ব্বলসেন-রাজগণের রাজ্যান্তর্গত দুই একখানা করিয়া গ্রাম কাড়িয়া নিয়া তাহাদের রাজ্যের সীমানা ক্রমেই ক্ষুদ্র করিয়া তুলিতেছিল। সেন-রাজগণের অন্তিম অবস্থায়ই যে ইদিলপুর উক্ত নামে আখ্যাত হয়, তাহাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ফলে ছয়গাঁ দেওভোগের হিন্দুগণ পলাইয়া গেলে ঐ অঞ্চল মুসলমানের করায়ত্ত হইয়া পড়ে।

১১৯৯ খৃঃ বঙ্গদেশ মুসলমানের করায়ত্ত হওয়া সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও বিক্রমপুর ইহার পরেও শতাধিক বৎসর স্বাধীন ছিল। কাজেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বিক্রমপুরাধিপতি সেন-রাজগণের ক্ষমতা হীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যে সময় সেনরাজগণের অবস্থা শোচনীয় হয়, সে সময় ছয়গাঁর জায়গীরদারগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। কাজেই এই সময়ের পূর্ব্বে সেন-রাজগণের প্রতাপ বর্ত্তমান থাকিতে ছয়গাঁর জায়গীরদারগণ তাঁহাদের অধীনে ছয়গাঁ অঞ্চল শাসন করিতেন। বসন্তরায়ের নামটি প্রবাদের সহিত বিশেষভাবে জড়িত দেখিয়া বোধ হয়, তিনি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। ছয়গাঁর দেউল বাড়ীর মত দেউল বাড়ী বিক্রমপুর অঞ্চলে অনেক দৃষ্ট হয় এবং অনেকে ইহাদিগকে বৌদ্ধ যুগের বলিয়াও সন্দেহ করেন। (১)

কাজেই আমাদের বোধ হয় যে, ছয়গাঁয়ের রায় বংশ দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ক্ষমতাশালী ছিলেন। সে সময় বঙ্গদেশে শৈব ধর্ম্মই প্রবল ছিল (২) এবং পুরাণে শিবের নিকট পাষাণের বৃষাদি উপহার দিবার বিষয়ও উল্লেখিত আছে। কাজেই আমরা অনুমান করি যে, ছয়গাঁয়ের রায়-বংশ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং আমাদের আলোচ্য বৃষটি তাঁহাদেরই স্থাপিত শিবের নিকট উপহার দেওয়া হইয়াছিল। যে ভূভাগ শিবের দেবোত্তর স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই এখন দেওভোগ বলিয়া অভিহিত হয়, ইহাও আমাদের বিশ্বাস।

অনেক সময়েই প্রবাদ ইতিহাস আলোচনার পথ দেখাইয়া দেয়। জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ হইতে মাজিয়া ঘসিয়া সত্যটুকু বাহির করিয়া লওয়াও ঐতিহাসিকের একটি প্রধান কাজ। এখানে আমরা ছয়গাঁয়ে প্রচলিত কয়েকটি প্রধান প্রবাদ উপস্থিত করিলাম; ঐতিহাসিকগণ ইহার মধ্য হইতে কিছু মাত্র সত্য বাহির করিতে পারিলেও আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়।

---

(১) ঢাকার ইতিহাস, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত।

আইস্‌লণ্ডের সাগা-সাহিত্য

সাগা-সাহিত্যের মূল্য ও গৌরব

ইউরোপীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ যে কোনও প্রকার বীরত্বে পূর্ণ পুরাতন কাব্য-কাহিনী সাগা (Saga) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনী যে একেবারে ঐতিহাসিক তাহাও বলা যায় না, অথচ ইহারা কাল্পনিকও নহে। কিন্তু আইসলণ্ডের সাগা বলিতে আইসলণ্ডীয় ভাষায় তদ্দেশবাসী রচিত তত্রত্য কোনও বীরপুরুষের জীবন-কাহিনী সম্বলিত গদ্য কাব্য বুঝায়। আইসলণ্ডের এই সাগা-সাহিত্য জগতের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এবং ইহাই এই দ্বীপটির গৌরবের সামগ্রী।

মধ্য যুগের সুদীর্ঘ অমানিশার অবসানের পরে নব জাগরণের উষার সঞ্চারে যখন ইউরোপের বহু দেশে সমাজ ও সাহিত্য নব শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল, তখনও ইউরোপ-খণ্ডের উত্তরপশ্চিম কোণে দূরসমুদ্রমধ্যস্থ আইসলণ্ড দ্বীপ অসাড়বৎ পড়িয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কয়েক জন প্রত্নানুসন্ধানীর চেষ্টায় এতদ্দেশের প্রত্নসম্পদ ভবিষ্যৎ বিলোপের হস্ত হইতে রক্ষা পায়, এবং এই শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপে উত্তরাঞ্চলের সাহিত্যের প্রতি ক্রমবর্দ্ধনশীল লোক-রুচির সৃষ্টি হয়। ইহারই ফলে পরিশেষে আইসলণ্ডীয় সাহিত্যের প্রচার হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ বলিতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের পূর্ব্বে আইসলণ্ড দেশ জগদ্বাসীর নিকট এক প্রকার অজ্ঞাতই ছিল। (১) ঐ সময়ের পর হইতেই বহু পর্য্যটক ভ্রমণার্থ তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। ইঁহাদের দ্বারা নানা বিষয়ক বিবরণ প্রকাশিত হইবার ফলে এই দেশ সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অল্পদিনের পরিচিত হইলেও, এবং হিমানীপীড়িত এই দ্বীপটির বর্ত্তমান সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী অপর কোনও যোগ্যতা না থাকিলেও, সাগা-সাহিত্যের জন্মভূমি বলিয়াই আইসলণ্ড সভ্য সমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে।

কারণ এই সাহিত্যের এমন কতকগুলি গুণ আছে যে, তজ্জন্য সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়ের দিক দিয়াই এতদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সভ্য সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই সাগা-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা, প্রথমতঃ আইসলণ্ডের একটা কালপর্য্যায়-ক্রমিক প্রাচীন ইতিহাস ও তদ্দেশবাসীগণের পুরাতন রীতিনীতি ও সংসার-যাত্রার সুস্পষ্ট চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী সত্তরের কোঠায় পড়িলে রাজ্যবিপ্লবের ফলে নরোয়ের কতকগুলি অধিবাসী দেশ-ত্যাগ পূর্ব্বক আইসলণ্ডে বসতি উঠাইয়া লইয়া যায়। ঐ সময় হইতে বাণিজ্য বা লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে, সৈনিক বা চারণ বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন ব্যপদেশে ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, নরোয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ও বাল্টিকসাগরতীরস্থ জারমেণী

(১) ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এগ্যার্ট ওলাফসন (Eggert Olafsson) এবং বিয়ার্ণী পলসন (Bearni Pallson) প্রণীত আইসলণ্ডের ভৌগোলিকতথ্যসম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ সনেই সার জোসেফ ব্যাঙ্কসের (Sir Joseph Banks) সহচর রূপে ইউনো ফন ট্রইল (Uno von Troil) নামে এক সুইডেনবাসী ঐ দ্বীপে যান। ইনি পরে এই দেশ ও তথাকার সাহিত্য সম্বন্ধে পত্রাবলী রচনা করেন। উপরোক্ত পুস্তকখানি ও এই পত্রাবলীই প্রথমতঃ আইসলণ্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আইসলণ্ডের সাগা-সাহিত্য এখন ইউরোপে সুপরিচিত। বহু সাগার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। গুড়ব্রাণ্ডার ভিগফুসন (Goodbrander Vigfusson) রচিত সাগা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যের উল্লেখ আছে। উইলিয়ম মরিস, ম্যাগনিউসন, ও স্যার উইলিয়ম ড্যাসেণ্ট প্রভৃতির দ্বারাও সাগাগুলি সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ওলেনশ্লাগার (Ohlenschlager) ও নরওয়ের জগৎবিখ্যাত নাট্যকারদ্বয় ব্যোর্ণসন্‌ ও ইবসেন কর্ত্তৃক সাগা অবলম্বনে নাটকাদি রচনার ফলেও ইহার পরিচয় বিস্তৃত হইয়াছে।

প্রভৃতি ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে আইসলণ্ডের অধিবাসীগণের যাতায়াত ছিল। এই কারণে আইসলণ্ডের সাগা-সমূহে এই সমুদয় দেশ-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর, বিশেষতঃ নরোয়ে দেশ সম্বন্ধে প্রচুর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে, একরূপ এই সাগা-সাহিত্য হইতেই স্কেণ্ডিনেভীয় দেশদ্বয়ের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে। এইরূপে আমরা যে ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা কেবল রাজরাজড়াদের সিংহাসনারোহণ ও যুদ্ধবিগ্রহাদির বৃত্তান্তমাত্রেই পর্য্যবসিত নহে। তত্তদ্দেশবাসী জাতি-সমূহের প্রাচীন রীতিনীতি ও শিক্ষা-সাধনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আইসলণ্ডের এড্ডা (Edda) নামধেয় পদ্য সাহিত্য ও সাগা নামধেয় গদ্য সাহিত্যেই পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেশের লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে যে ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণও সাগা সাহিত্যের বাহিরে বড় দেখা যায় না।

এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাগাসাহিত্য বিশ্ববাসী সকলের পর্য্যালোচনাযোগ্য। কারণ, বিশ্ব-সভ্যতার প্রকৃতি, গতি, ও পরিণতি বুঝিতে হইলে, সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য ও সমাজ-বিধানের ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইবে; এবং তাহা হইলেই সাহিত্য ও সমাজেতিহাসের দিক হইতে ইউরোপীয় সাধনার স্তরগুলির প্রত্যেকটীর বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক হইবে। সাগা সাহিত্যের গৌরব এই যে, এই ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার একটী স্তরের সাহিত্যিক ও সামাজিক সাধনার যাহা বিশেষত্ব তাহা অন্য কুত্রাপি পাওয়া যায় না। ঐ স্তরের সামাজিক সাধনার পরিচয়-সূচক বিস্তারিত বিবরণ সাগার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং উহার ভাব-কর্ম্ম-চিন্তার পরিস্ফুট প্রকাশের যথোপযোগী সাহিত্যরূপও এই সাহিত্যেরই প্রকৃতিতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক কালের ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাহিত্য ও সমাজেতিহাসের ধারা সম্পর্কে অত্যন্ত মোটামুটিভাবে তিনটী যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) বীর-বৈভবের যুগ, বা হিরোয়িক (Heroic) যুগ; (২) কল্পনা-প্রধান ভাবুকত্বের যুগ, বা রোমান্টিক (Romantic) যুগ; ও (৩) আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক (Scientific) যুগ। ইহাদের প্রত্যেক যুগের সাধনা ও আদর্শ ভাষায় প্রকাশিত হইবার কালে স্বভাবতঃই সাহিত্যের অসংখ্য রূপের মধ্যে একটা বিশেষরূপ ধারণ করিয়া নিজ নিজ বিশেষত্ব খ্যাপন করিয়াছে। হিরোয়িক যুগের পক্ষে এই বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ হিরোয়িক এপিক্ (Epic) বা শৌর্য্য-কাহিনীপূর্ণ মহাকাব্য; রোমান্টিক যুগের পক্ষে রোমান্স অব শিভ্যালরী (Romance of chivalry) বা আর্ত্তত্রাতা, ধর্ম্মরক্ষয়িতা, শীল-সম্পন্ন যোদ্ধার অলৌকিক বীরকীর্ত্তির কাব্যকাহিনী; আর, বৈজ্ঞানিক যুগের পক্ষে রিয়ালিষ্টিক নভেল (Realistic novel) বা বস্তুতন্ত্র কথা-সাহিত্য (২)। ইতিহাসের

(২) উপরোক্ত যুগনির্দ্দেশ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইহাতে Mythological age দেবলীলার যুগ, Renaissance বা নবজাগরণের যুগ, এবং Classical age বা সংযম-নিয়ন্ত্রণার যুগ, প্রভৃতি সুপরিচিত যুগের উল্লেখ নাই। কিন্তু এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, উল্লিখিত রূপে যুগ-বিভাগ আমাদের উদ্দিষ্ট ভাব প্রকাশার্থ সাহিত্যের ইতিহাসে উপাখ্যান (Narrative) কাব্য সম্পর্কে একটা পরম্পরাসূত্র ধরিবার চেষ্টামাত্র। তবে ইহার স্বপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, দেবলীলোপাখ্যানের নায়কই পরে হিরো (Hero) সাগার নায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন [Ten Brink প্রণীত ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস দেখুন]। ক্লাসিকেল আদর্শ সাহিত্য বিষয়ে কোন নূতন রস-বস্তুর অধিকার বিজ্ঞাপিত করে না। উহা একটা প্রকাশের রীতিমাত্র। পরন্তু হিরোয়িকের পরবর্ত্তী যুগের আমরা দুইটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, রোমান্স (Romance), ও শিভ্যালরী (Chivalry)। সপ্তদশ শতাব্দীর আদিতে সার্ভাণ্টেস (Cervantes) প্রণীত ডন্ কুইক্‌সোট Don Quixote) প্রাথমিক রোমান্স-সৃষ্টির শেষ গ্রন্থ। ইহার প্রচণ্ড বিদ্রূপবাণে Romance of chivalry একেবারে মারা যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে ইউরোপে যে সাহিত্য-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, রোমান্স (Romance) হইতেই তাহা রোমান্টিক আন্দোলন নামে অভিহিত হইয়াছে; এবং রোমান্স কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত

হিসাবে যাহাকে মধ্যযুগ (Middle age) বলে, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত হিরোয়িক ভাবাক্রান্ত ছিল, এবং পরার্দ্ধ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে শিভাল্‌রীর (Chivalry) অভ্যুদয় হয়।

পরে দেখা যাইবে যে, এই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই আদিম সাগা রচনার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। বস্তুতঃ সাগাসাহিত্যের জন্ম-বিবরণের বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সাহিত্যে একদিকে যেমন ইউরোপের এই হিরোয়িক যুগের সমাজ ও সাহিত্যের বিশিষ্টতা-বাচক আদর্শ ও সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তেমনই অপর দিকে জার্ম্মেণীয় জাতিসমূহের আদি প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থার প্রকৃষ্ট বর্ণনাও ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইউরোপীয় জাতি-সমূহকে প্রধানতঃ গ্রীক, লাটিন, শ্লাভো-নীয়, জার্ম্মেণীয়, কেল্টিক প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান জার্ম্মেণী, অষ্ট্রীয়া, সুইডেন, নরোয়ে, ডেন্‌মার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, ও ইংলণ্ড দেশে পূর্ব্বকালে যে সকল জাতি বাস করিত, তাহাদিগকে বিভিন্ন শাখা ধরিয়া ইউ-রোপীয় মানব-পরিবারের জার্ম্মেণীয় জাতির কল্পনা করা হইয়াছে। রোমক সভ্যতা যখন ধীরে ধীরে ইউরোপের দক্ষিণাপথের সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইতেছিল, তখনও জার্ম্মেণীয় জাতি-সমূহ অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। রোমের রাজ-তন্ত্র-সভ্যতার প্রসার বশতঃ দেশে দেশে জাতি-সমূহ পূর্ব্বতন নিজস্ব-ভাব হারাইয়া রোমীয় রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য বিধানের অন্তর্গত হইয়া যাইতে লাগিল। তৎসঙ্গে অলৌকিক-রহস্য-মূলক (Mystical) খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তৃতিবশতঃ, এই সকল জাতির স্বকীয় প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বিভিন্ন দেশে পূর্ব্বপ্রচলিত বিচিত্র শাসন-প্রথার পরিবর্ত্তে রাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল, এবং পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে একই খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। খৃষ্টানধর্ম্মানুপ্রাণিত রোমীয় সাহিত্য-সাধনার প্রভাববশে ইউরোপে রোমান্টিক যুগের আবির্ভাব হইল, এবং প্রাচীন হিরোয়িক যুগের বীর-ধর্ম্ম খৃষ্টান আদর্শের অনুপ্রেরণায় শিভ্যালরীতে পরিণত হইল। এইরূপে ইউরোপীয় জাতি সকল স্ব স্ব বিশেষত্ব হারাইয়া ভাব-কর্ম্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে সমতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু জার্ম্মেণীয় জাতির যে শাখা স্কেণ্ডিনেভিয়া দেশের নরোয়ে প্রদেশে বাস করিত, তন্মধ্যে যাহারা আইসলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা দৈব-গতিকে এই বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। (৩)

খৃষ্টধর্ম্ম ও রোমকনীতির প্রভাবের বহির্ভূত বলিয়া আইস-লণ্ডের সাগা-সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী হিরোয়িক যুগের শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ নিদর্শনসমূহ রক্ষিত হইয়াছে। আবার সমতা-সাধিকা রোমক-সভ্যতার প্রভাবমণ্ডলের বহির্ভাগে অবস্থিত বলিয়া, জার্ম্মেণীয় জনগণের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনও এই সাহিত্যে পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। কারণ, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অন্যান্য দেশের অনুকরণে হারল্ড (Harald) যখন নরোয়ের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তৎপ্রতি-রোধে অসমর্থ, অথচ স্ব স্ব পূর্ব্বপ্রাধান্য হারাইয়া রাজাধীন হইতে অনিচ্ছুক, কতকগুলি লোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি অনুচরবর্গ সহ নবাবিষ্কৃত আইসলণ্ড দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। তথন

হইলেও শিভ্যালরীর (Chivalry) সম্পূর্ণ তিরোধান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে ঘটে নাই, বলা যাইতে পারে। বার্ক (Burke) ফরাসী বিপ্লবের কিছুকাল পূর্ব্বের ঘটনায় শিভালরীর অভাব লক্ষ্য করেন নাই কিন্তু এই বিপ্লব-কালের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, যে এখন সেই শিষ্টতার যুগ চলিয়া গিয়াছে (The age of chivalry is gone)। এই ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহারই পরিণামে আধুনিক জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ণ আবির্ভাব হইতে আরও ৬০।৭০ বৎসর লাগিয়াছিল। অতএব রোমান্টিক ও আধুনিক যুগের মধ্যে যুগ-ব্যবধান কল্পনা না করিলেও চলে।

(৩) Ker's Epic and Romance দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত নরোয়ে দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। ইহারও দেড় শতাধিক বর্ষ পরে আইসলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। (৪) কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বহুতর সাগা প্রচারিত হইয়াছিল। অতএব যে সমস্ত ধ্যান-ধারণার রক্ষাকল্পে ইহারা দেশ ত্যাগ করে, তৎসমুদয়ই জার্ম্মেণীয় জন-সঙ্ঘের স্বতন্ত্র জাতিগত বিশেষত্ব ছিল। আইসলণ্ডে বাস স্থাপন করাতে উহা সুরক্ষিত হইয়া আরও উগ্র ও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রকট হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সাগা সাহিত্যের মূল্য ও গৌরব ব্যাখা করিয়া অতঃপর আমরা উহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হইব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আইসলণ্ডীয় সাগা বলিতে ঐ ভাষায় রচিত তদ্দেশীয় বীরপুরুষের জীবনকাহিনী-সম্বলিত গদ্য কাব্য বুঝাইত। ইহাতে জীবনকাহিনীর ধারাবাহিক বিবৃতি থাকিত, এবং আবৃত্তির জন্য উহা কতকগুলি বাঁধা নিয়মে রচিত হইত। সাগা ও ইংরেজীর Say কথাটির মূল এক। ব্যুৎপত্তি অনুসারে "সাগা" অর্থে 'কাহিনী'—যে গল্প কথিত হয়। বাস্তবিক পক্ষেও এইরূপ বীরকীর্ত্তির কাহিনী প্রথমতঃ মুখে মুখে কথিত হইতে হইতেই এক বিশেষ আকারে অবয়ববদ্ধ হইয়াছিল। পরে লিখিত সাহিত্যের আবির্ভাব-কালে যখন এই সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ হইল, তখন পূর্ব্বে কথ্যভাবে প্রচারিত ছিল বলিয়া, উহাদিগকে সাগা নামে অভিহিত করা হইল। কিন্তু তখনও এগুলিকে মুখে মুখে আবৃত্তি করা হইত। লিখিতরূপ গ্রহণ করিবার পরে সাগার রচনারীতি স্থায়ী আকৃতি লইয়া লোকের পরিচিত হইয়া পড়িল। অতঃপর যখন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অনুরূপ সাহিত্য-রচনা করিতে চাহিলেন, তখন তাঁহারাও এই প্রচলিত সাহিত্য-প্রথাই অনুসরণ করিতে থাকিলেন।

কথিত কাহিনী হিসাবেই হউক, আর লিখিত গল্প হিসাবেই হউক, সাগা-সমূহের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বুঝিতে হইলে কতকগুলি কালবিভাগ স্মরণ রাখিতে হইবে। মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে, আদিম সাগাগুলিকে প্রথমতঃ কেবল মুখে মুখে আবৃত্তি করা হইত। ইহাদের কতকগুলি পরে লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে। অতএব, সাগা-সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে একটা কথিত যুগ, এবং একটা লিখিত যুগের কল্পনা করিতে হয়। আরী থর্গিলসন (Ari Thorgilsson) নামক একজন আইস্‌লণ্ডবাসী প্রায় ১১৩০ খৃষ্টাব্দে আইসলেণ্ডিংগা বোক (Islendinga bok) নামক গ্রন্থ লিখন দ্বারা ঐ দেশে লিখিত সাহিত্যের প্রচলন করেন। লিখিত সাগার মধ্যে যেগুলি আদিম, তন্মধ্যে ছোট প্রায় বিশটি ও বড় পাঁচটি সুপ্রসিদ্ধ (৫)। এই সমস্ত সাগাতে যে ঘটনারাজির উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা অধিকাংশ স্থলে ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বকার, এবং কোন স্থলেই ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পরের নহে।

সাগা-সাহিত্যের কাল ও শ্রেণী বিভাগ।

আরীর পূর্ব্বোল্লিখিত, গ্রন্থ ও ক্রষ্টনি (Kristni), ও নীয়োলা (Njal's Saga) প্রভৃতি নামীয় সাগা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ১০০০ খৃষ্টাব্দের দু এক বৎসর পরে, সমগ্র দেশবাসীগণ মহা-সমিতিতে আলটিং (Althing)

(৪) Nisbet Bain's Scandinavia দ্রষ্টব্য।

(৫) এই বড় সাগাগুলিতে যে কেবল প্রাচীন আইসলণ্ডীয়গণের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্ত রচনা-রীতিতে ইহারা সাগা-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (১) এ'র্বিগিয়া সাগাতে (Eyrbyggia Saga) এ'র (Ere) প্রদেশের অধিবাসীগণের বৃত্তান্ত উপলক্ষে প্রাচীন স্কেণ্ডিনেভীয় ধর্ম্ম ও দেশাচারের বর্ণনা রহিয়াছে। (২) এগিলের সাগা (Egil's Saga) ঘটনাবহুল ও অতিবিস্তৃত বটে, কিন্তু ইহার অপূর্ব্ব লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। (৩) ল্যাক্সডেল সাগা (LaxdaelSaga) ল্যাক্সডেল উপত্যকা বাসীগণের কাহিনী। ইহার প্রদত্ত তারিখগুলি সর্ব্বথা ঠিক নহে, এবং এতদন্তর্গত ঘটনাও রোমাণ্টিক ভাবের সমাবেশ

সম্মিলিত হইয়া সকলের এক মতে খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহণ করে। (৬) খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দেশবাসীগণের প্রকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় নাই, তথাপি ইহাও ঠিক যে এই উপলক্ষে একটি নূতন প্রভাব কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে জনগণের প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি ও বংশগত শোণিতাত্মক বিবাদ-বিসম্বাদের ঘটনা আদিম সাগাগুলির বিষয়ীভূত, উহাদে কোনটিই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচলনের বেশী পরবর্ত্তী নহে। এইর হেতুতে আইসলণ্ডের ইতিহাসে নবম শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত কাল সাগা-(কীর্ত্তিত)-যুগ (Saga age) বলিয়া অভিহিত হয় (৭)।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে কিছুকাল দেশে শান্তি বিরাজিত ছিল। সাগাগুলির রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিলেও ইহা জানা গিয়াছে যে, একাদশ শতাব্দীর এই শেষ ৭৫ বৎসরে পূর্ব্ব যুগের অতীত ঘটনা লইয়া বহু সাগাকাহিনী মুখে মুখে প্রচারিত হইতে থাকে। অতএব এই কালকে সাগা-সাহিত্য সম্পর্কে সাগা-রচনা অথবা সাগা-কথনের যুগ বলা যাইতে পারে।

ইহার পরে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে আইসলণ্ডে সাহিত্য প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ হয়। এই লিখিত সাহিত্যের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত সাগা-সকলের মধ্যে কতকগুলি লিখিত হয়। এই সময়, অর্থাৎ ১১৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে যে যুগের আরম্ভ হয় ও ১২২০ সনে শেষ হয়, তাহা সাগা-লিখন-যুগ নামে পরিচিত হইতে পারে।

লিখিত সাগা-সমূহেরও কয়েকটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। (১) কতকগুলি লিখিত সাগা, পূর্ব্বে যে সকল সাগা কথিত হইত, তাহাদেরই লিপিবদ্ধ হইবার ফল মাত্র। ইহাদের রচনা-কৃতিত্ব লেখকগণের প্রাপ্য নহে।

(২) এই লিখিত সাগার সাহিত্য-রূপের অনুকরণে আরও সাগা রচিত হয়। এইগুলির রচনা-কৃতিত্ব লিখন-যুগ-প্রবর্ত্তনের পরবর্ত্তী কাব্যকারগণের প্রাপ্য (৮)।

(৩) এই শেষোক্ত শ্রেণীর সাগাগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার সাগা-কীর্ত্তিত-যুগের পরবর্ত্তী ঘটনা লইয়া রচিত, আর কতকগুলি সমসাময়িক ঘটনাবলী অবলম্বনে ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃকই রচিত। ১১১৭—১১৮৪ খৃষ্টাব্দ

আইসলণ্ডীয় সাগার আদিপ্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও সাহিত্য হিসাবে এই কাহিনী মনোহর, তাহাতে সন্দেহ নাই (৪) গ্রেটিরের সাগা (Grettir's saga) ঐ নামধেয় প্রচণ্ডপরাক্রম একটি পলাতক দস্যুর অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বর্ণনায় পূর্ণ। এতদুপলক্ষে বহু দৈত্যদানব ও ভূতপ্রেতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে (৫) নীয়োলার সাগা (Njals saga) প্রধানতঃ নীয়োলা নামক আইনজ্ঞ ব্যক্তি ও তাঁহার পরিবার-বর্গের সুখদুঃখের কাহিনী। প্রসঙ্গতঃ ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে, এবং নানাস্থানে আইনের বিধান লইয়া আলোচনা থাকাতে ইহা হইতে আইসলণ্ডের প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের পরিচয় লাভ করা যায়। নীয়োলার সাগা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, এবং ঘটনা-বৈচিত্র্য ও রচনা-রীতির উৎকর্ষে ইহা সাগা-সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়।

(৬) নীয়োলার সাগা ৯৬—১০০ অধ্যায়।

(৭) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জার্ম্মেণীয় জাতির আদিম প্রকৃতির পরিচয় প্রদানই আইসলণ্ডীয় সাগা-সাহিত্যের বিশেষ মূল্যবত্তা; এবং খৃষ্টধর্ম্মের শিক্ষাদীক্ষার ফলে এই আদিম প্রকৃতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়। অতএব খৃষ্টীয় প্রভাব একেবারে বিজয়ী হইবার পরে যে যুগের আরম্ভ হয়, তাহার বৃত্তান্ত জানিতে হইলে সাগা-সাহিত্য-পাঠ অপরিহার্য্য নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বিশেষত্বের পরিচয় অন্য কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে এই যুগকে বিশেষ করিয়া সাগা-(কীর্ত্তিত)-যুগ বা সাগা ঘটনার যুগ বলা হয়।
—লেখক।

(৮) স্নরী ষ্টার্লুসন (Snorri Sturluson) রচিত হীমস্ক্রীংলা (Heimskringla) এইরূপ একটী সাগা। স্নরীর জীবিত কাল ১১৭৮—১২৪১ খৃঃ। অডিন ও অন্যান্য প্রাচীন জার্ম্মেণীয় ধর্ম্মের দেবদেবীগণের বৃত্তান্তাদির বর্ণনা সহকারে প্রাগৈতিহাসিক কালে এই কাহিনীর আরম্ভ হইয়াছে। পরে নরোয়ের রাজ-বংশের উৎপত্তি হইতে ১১৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

পর্য্যন্ত আইসলণ্ডীয় ঘটনা এই জাতীয় সাগার বিষয়ীভূত। (৯) এই শ্রেণীর সাগা সকল যে কেবল সমসাময়িক ঘটনা লইয়া রচিত তাহাই নহে, কোন কোনও স্থানে রচয়িতা স্বয়ং ঘটনার সহিত কর্ত্তৃরূপে জড়িত ছিলেন। ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(৪) কতকগুলি লিখিত সাগার বর্ণিত ঘটনাবলী সাগা-যুগের বা তৎপরবর্ত্তী কোনও কালেরই নহে, পরন্তু বহুল পরিমাণে কল্পনা-প্রসূত। কতক পরিমাণে বহুতর সাগা রচনার ফলে, কতক পরিমাণে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে, ক্রমশঃ কাল্পনিক-বৃত্তান্তঘটিত সাগা রচিত হইতে থাকে। কখনও অজ্ঞাত-কীর্ত্তি বা অনতিজ্ঞাত-কীর্ত্তি কোন পুরাকাহিনীর নায়ক সম্পর্কে, কখনও বা জার্ম্মেণীয় জাতির প্রাগৈতিহাসিক কালের আখ্যায়িকার নায়ক সম্পর্কে নানারূপ ঘটনার কল্পনা করিয়া এই শ্রেণীর সাগা-সমূহ রচিত হইত। (১০) ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীর সাগাসমূহেই প্রথমতঃ ইউরোপের রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব আসিয়া পড়ে।

(৫) ইহার ফলে বিদেশীয় প্রভাবযুক্ত কতকগুলি সাগার আবির্ভাব হয়। কতকটা ধর্ম্মবিধি-সম্পর্কে, আর কতকটা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আইস্‌লণ্ড নরোয়ে রাজ্যের অধীন হইবার ফলে, আইস্‌লণ্ডীয় সাগা-সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের বাতাস লাগিতে থাকে। ফলে কোন কোন সাগাতে (১১) ইউরোপের মধ্যযুগের শেষার্দ্ধের ভাবুকত্বলক্ষণ Romanticism) সংক্রমিত হয়; কতকগুলি সাগা বিদেশীয়দিগের গ্রন্থের অনুকরণে রচিত হয়; কতকগুলি রোমান্স (Romance) রাজাদেশে সাগাকারে ভাষান্তরিত

---

(৯) ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এখন ষ্টার্লুঙা (Sturlunga) নামে পরিচিত সাগাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ষ্টার্লুঙার মূল অংশের নাম আইস্‌লেণ্ডিঙ্গা সাগা (Islendinga Saga)। ইহার রচয়িতা ষ্টার্লু থর্থারসন্ (Sturlu Thortharsson) (জীবিতকাল—১২১৪—১২৮৪ খৃঃ)। তিনি আইসলেণ্ডিঙ্গাতে ১১৮৩—১২৬২ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী বিবৃত করেন। খৃঃ ১২৬০ সালে তিনি নরোয়ে দেশে গমন করিলে রাজা হোকনের (Hakon) পুত্র রাজা ম্যাগনুসের (Magnus) প্রিয়পাত্র হন। অতঃপর তদ্দেশে অবস্থান-কালেই তিনি রাজাজ্ঞায় হোকনের সাগা (Hakon's Saga) রচনা করেন।

[এই সাগার অন্তর্গত বিষয় অবলম্বনে ইবসেনের প্রসিদ্ধ নাটক প্রিটেণ্ডার্স (Pretenders) প্রণীত হইয়াছে।]

তৎকর্ত্তৃক ইহার পরবর্ত্তীকালে রচিত ম্যাগনুসের সাগারও (Magnus Saga) কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে। এই সাগাতে নরোয়ে রাজ্যের ইতিহাসের ১২৮০ খৃষ্টাব্দের পর্য্যন্তের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) ইহাদের মধ্যে ভল্‌সাঙা সাগা (Volsunga saga) সাহিত্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ। ইহার মূল ঘটনাই পরিবর্ত্তিতরূপে, জার্ম্মেণীয় জাতির রামায়ণ স্বরূপ নিবেলাঙ্গেন্‌লায়েড্ (Nibelungenlied) কাব্যের অন্যতম উপাদানরূপে দেখিতে পাই। সিগুর্ড (Sigurd) ও গুড্রুন্ (Gudrun) এবং গুন্নার (Gunnar) ও ব্রুণহিল্ড (Brunhild) প্রভৃতি এই সাগার পাত্রপাত্রীগণ নিবেলিঙ্গান্ কাব্যে সিগ্‌ফ্রিড্ (Siegfried) ও ক্রীমহিল্ড (Kriemhild), গুন্টার (Gunther) ও ব্রুণহিল্‌ড্‌রূপে দেখা দিয়াছেন। ওয়াগ্‌নার (Wagner) ও হেবেল (Hebbel) নামক জার্ম্মেণীর বিখ্যাত নাট্যকারদ্বয়ের নাটকাবলীর মধ্যেও নিবেলাঙ্গগণ সম্বন্ধীয় নাটক-চক্র অতি সুপ্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ওয়াগনার (Wagner) বিশেষ করিয়া ভল্‌সাঙা সাগার গল্পভাগই অনুসরণ করিয়াছেন। ইবসেন্‌ও কথঞ্চিৎ বিকৃতব্যবস্থায় এই সাগারই গল্পভাগ খাটাইয়া তাঁহার ভিকিংস্ (Vikings) নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

(১১) যথা নিবেলাঙ্গেন্ গল্পের অন্যতম মূল সম্বলিত Thedrik Saga.

হয় (১২); এমন কি, লাটিন ও গ্রীক সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ক অনুবাদ-সাগারও প্রচলন হয় (১৩)।

এই সকল সাগাতে যে বিদেশীয় মূলের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা নহে। অনুবাদ-মূলক সাগাসমূহেও কৃতিত্বের তারতম্য দেখা যায়। কতকগুলির অনুবাদ-কার্য্য যন্ত্র-চালিত অনুকরণমাত্র; কোন কোনটিতে ভ্রমপ্রমাদও লক্ষিত হয়; আবার অনেক সময়ে অনুবাদ-কর্ত্তা কেবল মাছি-মারা নকল না করিয়া বিদেশীয় বিষয়টিকে স্কেণ্ডিনেভীয় চিন্তা-ধারা ও পরিবেশের সহিত মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই সকল বিদেশীয় প্রভাবের ফলে প্রকৃষ্ট শ্রেণীর আইসলণ্ডীয় সাগা-সাহিত্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ একপ্রকার ভাব ও ভাষারই প্রচলন হইয়া পড়িল। ত্রয়োদশ শতাব্দী সাগাসাহিত্যের পরাকাষ্ঠার যুগ। ইহার পর হইতেই বিশেষ ভাবে দেখা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে এই সকল বিদেশী ভাবা-পন্ন সাগা লোক-সমাজে প্রচলিত এবং প্রীতিকর হইয়া পড়াতেই, ক্রমশঃ দেশে সাহিত্যিক রুচির অধঃপতন ঘটিয়াছে।

আইসলণ্ড যাহার গুণে জগৎ-প্রসিদ্ধ, সেই সাগা সাহিত্যের উদ্ভব এই দ্বীপে কেমন করিয়া হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তথায় এইরূপ কীর্ত্তি-কথার বহু উপাদান বর্ত্তমান ছিল, এবং উহা কহিবার প্রবৃত্তিরও অভাব ছিল না।

সাগা রচনার উপাদান ও প্রবৃত্তি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে খৃঃ নবম শতাব্দীর শেষপাদে রাজা হারল্ড কর্ত্তৃক রাজ্য-তন্ত্র প্রথার বিস্তারফলে কতকগুলি লোক নরোয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া যায়। ইহারি পূর্ব্বে সমাজ বিধানে রাজশক্তি প্রবল ছিল না। সমগ্র দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল, এবং উপরে রাজা থাকিলেও জার্ম্মেণীয় জাতির আদিম প্রকৃতি অনুসারে মণ্ডলেশ্বর প্রধানগণ অনন্যপরতন্ত্রভাবেই জীবন যাপন করিতেন। অধিকন্তু, অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগপর্য্যন্ত, এই যুগে ঐ সকল স্থানের সাহসিক অধিবাসীগণ সমুদ্রোপকূলভূমিতে লুণ্ঠনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ ও ধনসঞ্চয় করিত। এই কারণে ইহাদের প্রকৃতি পরচ্ছন্দানুবর্ত্তনের আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। ফলতঃ তাহারা হারল্ডের বিজয়ী শক্তির প্রতিরোধে অসমর্থ হইলে, নিজেদের জীবন-প্রণালী অব্যাহত রাখিবার জন্য দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রতিপত্তিশালী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন ও অনুচর-বর্গসহ জনহীন নূতন দেশে আসিয়াও ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান ও গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেন। পরিত্যক্ত জন্মভূমি যখন তাঁহাদের নিকট স্মৃতির বিষয় হইয়া পড়িল, তখন পূর্ব্বপুরুষগণের নামকর্ম্মাদিসম্বলিত প্রাচীন গৌরব স্মরণ ও কীর্ত্তনে যে ইঁহারা শ্লাঘা অনুভব করিবেন, তাহা এই শ্রেণীর পূর্ব্বাচারনিষ্ঠ বংশগরিমাভক্ত লোকদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। অতএব ইতিহাসের জন্মের বহু পূর্ব্ব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক প্রাচীন কাহিনী উহাদের জন্ম-স্থানে লুপ্ত হইয়া গেলেও আইসলণ্ডীয় সমাজে প্রচলিত থাকে। আবার, এই ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও কার্য্যক্ষেত্র আইসলণ্ডে বাসগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কেহ বা প্রথমতঃ অর্কনী শেটল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দ্বীপপুঞ্জে বাসস্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য অধিবাসীগণের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কিছুকাল তথায় বাস করতঃ পরে আইসলণ্ডে আসিয়াছিলেন; কেহ জলপথে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ও বাল্টিক সাগর তীরস্থ দেশ সমূহের নানা স্থান লুণ্ঠন পূর্ব্বক অর্থ ও যশোলাভে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি শান্তিপূর্ণ কার্য্য পতিকে বহু নগর ও রাজসভা সন্দর্শন পূর্ব্বক বিদেশীয় সমাজ ও রীতিনীতির পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রথম বসতি কালেই নানা ঘটনার নায়কগণ সম্পর্কে স্মরণীয় ও কীর্ত্তনীয় বহুতর বিষয়ের স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু

(১২) Tristram, Parceval, Charlemagne প্রভৃতির বিষয়ে সাগা।

(১৩) যথা, Veralder Saga, Saga of Troy, Saga of Alexander.

আইসলণ্ডে বাসস্থাপন-কালেই আরও বহুবিধ স্মরণযোগ্য ব্যাপারের সংঘটন হইয়াছিল। এইসকল দৃঢ়মতি বীরেরা যে নূতন দেশে নির্ব্বিবাদে বসতি সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। সামান্য কারণে ইহাদের মধ্যে ঘোরতর কলহ বাধিত, এবং জাতীয়-প্রকৃতি-সুলভ প্রতিশোধ-পরায়ণতার তাড়নায় ইহা হইতেই বহুকালব্যাপী ব্যক্তিগত ও বংশগত ভীষণ বিবাদ সৃষ্ট হইয়া রক্তক্ষয়ের কারণ হইত। এইরূপ নানা ঘটনার নায়কগণের বীরকর্ম্ম ও অপকর্ম্মের স্মৃতি প্রতি জনপদেই সযত্নে রক্ষিত হইত।

কেবল অতীত ও বর্ত্তমান আইস্‌লণ্ডীয় বীরগণ-সম্পর্কিত ঘটনাই যে লোকের জ্ঞানবিষয়ীভূত হইত, তাহা নহে। দূর-সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপের অধিবাসী হইলেও কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরাঞ্চলের সমস্ত দেশেই আইস্‌লণ্ডীয়গণের যাতায়াত ছিল। তাহারা যে ভাষায় কথা বলিত, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেও সমগ্র স্কেণ্ডিনেভীয়া দেশে, রুশীয়ার অংশবিশেষে, স্কটলণ্ডের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, ইংলণ্ডের উত্তর ও পূর্ব্বভাগে, এবং নর্ম্মাণ্ডির অধিকাংশ স্থানে সেই ভাষাই প্রচলিত ছিল। প্রভু-পরায়ণ যোদ্ধা, সচ্চরিত্র ও সুচতুর ব্যবসায়ী, এবং উৎকৃষ্ট কবি ও কথক বলিয়া সর্ব্বদেশে আইস্‌লণ্ডবাসীগণ সমাদৃত হইত। স্কেণ্ডিনেভিয়া ও ব্রাটিশ দ্বীপপুঞ্জের রাজাজমিদারগণের বিশ্বস্ত অনুচররূপে অনেক আইস্‌লণ্ডীয়ের নাম দেখা যায়। এইরূপে তাহাদের এই সকল বিদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় ছিল, এবং তাহারাও তত্তৎদেশ-বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ অবহেলা করিত না। প্রবাসী আইস্‌লণ্ডীয়গণ বিদেশের ইতিবৃত্তাদি বিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দেশবাসীগণ উহা আগ্রহের সহিত শুনিত ও মনে রাখিত। উপনিবেশ সংস্থাপনের পরে অল্পকাল মধ্যেই প্রত্যেক মণ্ডলের অধিবাসীগণের সম্মিলনে টিং (Thing) নামে এক একটি সাধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় সম্মিলন উপলক্ষে জ্ঞানের আদান-প্রদান আরও সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহারা ভবিষ্যতে বিদেশে যাইয়া কোনও রাজা-জমিদারের আশ্রয়ে জীবিকার্জ্জনের অভিলাষ পোষণ করিত, তাহারা এই সুযোগে বৈদেশিক বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক ভাবী আশ্রয়দাতার স্তুতি-গাথার চনার উপাদান সংগ্রহ করিত। এইরূপে উত্তরাঞ্চলস্থ বহুদেশের ইতিহাস বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান আইসলণ্ডীয় সমাজে প্রচলিত ছিল।

ইহা হইতেই উপলব্ধি হইবে, সাগা-কাহিনীসকলের উপাদান প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। রচনার প্রবৃত্তির ও অনুকূল অবস্থারও অভাব ছিল না। সাগা-কাহিনীর উপাদানভূত এই সকল বিষয়ের স্মরণ ও কীর্ত্তনে আইস্‌লণ্ড বাসীগণের আগ্রহ ও অনুরাগ নানা কারণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। (১৪) তৎকালীন সরল জীবন-যাত্রার অবকাশ মধ্যে আইস্‌লণ্ডীয় প্রধান ব্যক্তিগণের সমক্ষে আমোদ-প্রমোদের বহু উপায় উন্মুক্ত ছি লনা। হয় ত গৃহের বাহিরে শারীরিক শক্তি ও কৌশলের পরিচায়ক ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া, নতুবা গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া চারণ বা কথকের মুখে পুরাকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতে হইত। এই কথকতা-শক্তি ভদ্র-জীবনের একটি ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। সামাজিক উৎসবাদিতে কথকগণ উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন, বহু ভদ্রব্যক্তি জীবিকাস্বরূপ কথকতা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। বিদেশে রাজরাজড়াদের কাহিনী কথনে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে যশোলাভ ও ধনাগম উভয়ই সহজসাধ্য হইত। সাগা-কথক (Saga-man) ও স্কাল্ড (Scald) বা কবিরূপে আইসলণ্ডীয়গণ

(১৪) The island though scantily peopled, enjoyed immense advantages for study...... The long rigorous winters, when neither farming, fishing, fighting, not seafaring was possible, proved highly favourable for reading, writing, and reciting; and hence the phenomenon that the history of medieval Iceland is more complete than that of any European country.—Ultima Thule, by R. F. Burton.

বিশেষ পটুতা এবং বিদেশীয় সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সাগা গদ্যে রচিত হইত, কিন্তু স্কাল্ড কবিতার রচনা করিতেন। দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে নরোয়ে দেশে কাব্য-কলার অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে কেবল ২।১ জন বাদে আইস্‌লণ্ডীয়গণ ব্যতীত আর কাহাকেও স্কাল্ড বা কবি-বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। কোনও নৃপতির আশ্রয়ে থাকিতে হইলে রাজসভায় তাঁহার কীর্ত্তি-সূচক স্বরচিত একটি স্তুতি-কবিতা আবৃত্তি করিয়া স্কাল্‌ড্ প্রথমতঃ রাজানুগ্রহ লাভ করিতেন। এই সমস্ত স্কাল্ড রচিত কবিতাতেও অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ থাকিত, এবং অনেক সময় সাগা-বর্ণিত ঘটনার যাথার্থ্য সমর্থন জন্য ঐ বিষয় অবলম্বনে রচিত স্কাল্ডীয় কবিতাও সাগার অন্তর্ভুক্ত হইত।

পূর্ব্বোক্তরূপে নানা প্রকারে আহৃত ঘটনাপুঞ্জ আইস্‌লণ্ড-বাসীগণের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং পূর্ব্ব-পুরুষগণের গৌরব-স্মৃতির প্রেরণাবশে ও উল্লিখিত অনুকূল অবস্থা-গতিকে এগুলি অবলম্বনে সাগা-কাহিনী রচিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ আইস্‌লণ্ডীর কোনও যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ব্ব ঘটনার আবৃত্তি-নিমিত্ত গদ্য কাব্যকাহিনীরূপে; পরে ইহারই লিখিতরূপে; তৎপর এই লিখিতরূপ অবলম্বনে অন্যান্য দেশীয় রাজগণ, সমকালীন ধর্ম্মাচার্য্য, অথবা প্রধান ব্যক্তির জীবনী সম্পর্কে, এমন কি কল্পনা-প্রসূত ঘটনা-বর্ণন ব্যপদেশে, এবং বিদেশের সাহিত্য হইতে লব্ধ বিষয় সম্পর্কে-নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া সাগা-নামক এই সাহিত্য-মূর্ত্তি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে বাস্তব অবাস্তব, অতীত বর্ত্তমান যে কোন প্রকার ঘটনা লইয়া এই সাগারূপ গদ্য-কাব্যের রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। হিরোয়িক আদর্শের বীর-কাহিনীর ভাষায় প্রকাশের উপযোগী এইরূপ সাহিত্য-রীতির উদ্ভাবন সাহিত্য-ক্ষেত্রে আইস্‌লণ্ডবাসীগণের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রমশঃ সমকালীন ঘটনা বর্ণনোপলক্ষে এই সাগারূপের প্রয়োগের ফলে অবশেষে এতদ্দ্বারা যে বর্ত্তমান ঘটনা সম্বলিত মহাকাব্যের রচনা সম্ভব হইল, ইহা সাগা-সাহিত্যের অতুলিত আবিষ্কার। এস্থলে আত্মজীবনী ও মহা-কাব্য এক হইয়া পড়িয়াছে, বর্ণিত ব্যাপারের অনুষ্ঠাতা ও বর্ণন-কর্ত্তার স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ঘটনার জ্ঞানলাভ ও সাহিত্যাস্বাদ-জনিত রসোল্লাসের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে।

এই অপরূপ সাহিত্যের লক্ষণগুলির নির্দ্দেশ ও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ভাব, ভাষা, ও ভাষারীতির সমন্বয়-ফলে সাগা-সাহিত্য যেমন একদিকে কাব্যকলার এক অপূর্ব্ব রূপ, তেমনি অন্যদিকে অবিকৃত হিরোয়িক আদর্শের ও জার্ম্মেণীয় জাতির আদিম অবস্থার এক অপরূপ চিত্র।

ভিগফুসন সাগার সাহিত্যরূপ বর্ণনায় বলিয়াছেন "আসল সাগা একপ্রকার গদ্যে রচিত মহাকাব্য স্বরূপ। ইহাতে কতক-গুলি বাঁধা নিয়ম, বাঁধা গৎ, গতানুগতিক বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ আছে। অপর উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ন্যায় ইহারও রচনা-রীতির প্রকার-ভেদ আছে বটে, কিন্তু এরূপ কতক-গুলি অলঙ্ঘ্য সীমাও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে

সাগা সাহিত্যের লক্ষণ

যে, উহারা পদ্য ছন্দের প্রয়োগের মত নানা বন্ধনে সাগার সাহিত্যরূপকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন আইস্‌লণ্ডীয় সাগাগুলিই এই সাগা প্রকৃতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং পরবর্ত্তী রচনা-সমূহ উহাদেরই ছাঁচে ঢালা। উহাদের আদিম আকার দেখিলে বলা যায়, ইহারা দশম বা একাদশ শতাব্দীর কোন আইস্‌লণ্ডীয় ভদ্র ব্যক্তির এক একটি জীবনী। ইহাতে প্রথমতঃ, যিনি আইস্‌লণ্ডে বসতি উঠাইয়া আনেন, সেই আদি পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া বংশ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর নায়কের প্রথম যৌবনের আশা, উদ্যোগ, পিতৃগৃহ ছাড়িয়া জীবন-পথে প্রবাস-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। আইস্‌লণ্ডের ভদ্রবংশীয় যুবকগণের পক্ষে এই প্রবাস-জীবনই উপযুক্ত শিক্ষাস্বরূপ ছিল। বাণিজ্য বা লুণ্ঠন ব্যপদেশে নানা দেশে যাতায়াত, অথবা কবি বা অনুচররূপে স্কেণ্ডিনেভীয় রাজগণের অধীন কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক বিদেশ হইতে মানুষের মত মানুষ হইয়া

তাহারা আইস্‌লণ্ডে ফিরিয়া আসিত। এতখানি ভূমিকার পর গল্পের সারভাগের আরম্ভ। ইহার পরে নানা খুঁটিনাটি-সহকারে এবং কাল-পর্য্যায় রক্ষা পূর্ব্বক নায়কের সহিত অন্যান্যের প্রীতি-বিরোধের বৃত্তান্ত, তাহার শৌর্য্যবীর্য্য ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা, পরিশেষে তাহার মৃত্যুর কথা উল্লিখিত হইত, প্রায়শঃ তদীয় আত্মীয়বর্গ কর্ত্তৃক তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ-গ্রহণের বর্ণনায় সমগ্র কাহিনীর পরিসমাপ্তি হইত। যেন কেহ আগ্রহের সহিত সোজাসুজী ভাবে মুখের কথায় কথায় কহিয়া যাইতেছেন, এরূপভাবে ছোট ছোট সহজ-বোধ্য বাক্যে এই কাহিনী বলা হইত। স্থল-বিশেষে প্রয়োজন হইলে বাক্য-যোজনায় বর্ত্তমান কালের ব্যবহার থাকিত, বা বুঝাইবার জন্য কথকের স্বকীয় উক্তিও দুই একটা থাকিত, সমগ্র রচনাটি একটি ব্যক্তি ও একটি স্থান লইয়া এরূপ ভাবে সাজান হইত, বিভিন্ন অংশগুলি এরূপ ভাবে মানানসই হইত, এবং একটির পর একটি করিয়া এরূপ স্বভাবিক পরিণতি লাভ করিত, যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে পাঠকের চক্ষে পড়ে না যে ইহাতে অপরূপ কলা-কৌশল আছে।"

আদিম আইসলণ্ডীয় সাগা বাস্তবিকই গদ্যে রচিত মহা-কাব্য স্বরূপ। ইউরোপে মহাকাব্য সাধারণতঃ পদ্যে রচিত হয়, কিন্তু আইসলণ্ডের সাগা গদ্যে রচিত। ভারতীয় সাহিত্যেও গদ্য কাব্য আছে বটে, কিন্তু কাদম্বরী প্রভৃতি ভারতীয় গদ্য কাব্যের সহিত সাগার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। ভারতীয় গদ্য কাব্যের সভ্য-ভব্য বেশে সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু উহা শিল্পীর কারু-কার্য্যে গঠিত সৌন্দর্য্য, আর আইস্‌লণ্ডের সাগার কাব্যরূপ স্বভাবজাত। কাদম্বরী প্রভৃতি রাজসভার উপযোগী ভব্যতা-বিশিষ্ট, কিন্তু সাগা সমগ্র জাতির সহজ প্রকৃতির নিরাভরণ সারল্য ও আন্তরিকতায় ভরপুর।

পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের রামায়ণ, গ্রীসের ইলিয়াড ও অডিসি প্রভৃতি জাতীয় মহাকাব্যের সহিতই সাগার কাব্য-রূপের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, লোক-প্রচলিত কীর্ত্তি-কাহিনী কথকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়া সাহিত্য রূপে পরিণত হইবার দরুণ, সাগাগুলিতে যেরূপ জাতীয় হৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেইরূপ কথিত কাহিনীর পরিণাম বলিয়া বাল্মিকীর রামায়ণ, চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রাসৌ, হোমারের ইলিয়াড বা অডীসী প্রভৃতি মহাকাব্যেও জাতির হৃদয়টি অবিকল প্রতিফলিত দেখা যায়। ফলতঃ জাতীয় কাব্য হিসাবে আইসলণ্ডীয় সাগার সহিত শেষোক্ত মহাকাব্যগুলিরই সাদৃশ্য রহিয়াছে। পার্থক্য এই যে, এগুলি পদ্যে রচিত, আর সাগাগুলি গদ্যে রচিত; নতুবা, গল্পগঠনে সরলতা, ঘটনা-বিবৃতিতে কাল-পর্য্যায় রক্ষা, বর্ণনায় বাঁধা গতের প্রয়োগ, এবং উদ্দিষ্ট বিষয় ছাড়িয়া অসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবতারণার অভাব প্রভৃতি, যেরূপ এই সকল মহাকাব্যে সেরূপ সাগাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকন্তু, ইউরোপীয় হিরোয়িক আদর্শের শিক্ষা-দীক্ষার চিত্র হিসাবে হোমরীয় কাব্য ও আইস্‌লণ্ডীয় সাগার মধ্যে যে একটা বিশেষ সাদৃশ্যও আছে তাহাও পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন (১৫)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আইস্‌লণ্ডবাসী বীরপুরুষের জীবন-কথা তদ্দেশীয় আদি যুগের উচ্চাঙ্গ সাগার বিষয়ীভূত। বীর গণের নাম ও অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমূহের নীরস বিবরণমাত্র দিয়াই এই সকল জীবনী পরিসমাপ্ত হয় না, পরন্তু নায়কগণের জীবন জীবন-যাত্রার একটি পরিপূর্ণ আলেখ্য প্রদান করে। আমরা

(১৫) যথা, The whole domestic situation in the Homeric poems—the free equality of the women, the military conditions, the life of the chiefs and retainers, closely resembles, allowing for differences of climate, that of the rich landowners of early Iceland as in the sagas.···Societies remarkably similar in mode of life were accommodated in dwellings similarly arranged—A. Lang—Homer and his Age.

দেখিতে পাই, এই সকল নায়কগণ কি চরিত্রের লোক, কি উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রণোদিত হন, দিনের পর দিন কি করিয়া তাঁহারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কিরূপ কার্য্যে তাঁহারা সময়পাতিপাত করেন, আবার যেন-তেন প্রকারেণ ঘটনা সমষ্টির উল্লেখ করিলেই চলিবে না। বিষয়-বর্ণনে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম রক্ষিত হওয়া আবশ্যক; নায়কের জন্ম, বা অনেক সময় জন্মের পূর্ব্ব হইতে সমারব্ধ হইয়া মৃত্যু বা তৎপর পর্য্যন্তও নিয়মিত ভাবে সমগ্র ঘটনা-রাজি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত হওয়া চাই।

এই সাহিত্যের রচনারীতিও সবিশেষ অনুধারনযোগ্য। সাধারণতঃ লিখিত ভাষা প্রয়োগ করিবার সময় কথ্য ভাষার স্বাভাবিক রীতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তন কলাগত্তিক হইলেও, ইহার ফলে লেখ্য ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে কৃত্রিমতা সঞ্জাত হয়। কিন্তু কথ্য কাহিনী-গুলিরই মূলগত আবৃত্তি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, এবং উহাদেরই লিখিত রূপ বলিয়া সাগার গদ্য-রীতিতে এরূপ কৃত্রিমতা ঢুকিতে পারে নাই। ফলতঃ উহা যেন কথ্য ভাষারই প্রকৃতি-অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিণতি—সে ভাষা সহজ, প্রাঞ্জল, অনতিপল্লবিত; উহাতে একটা নিরাভরণ সরলতা বিরাজিত, এবং কথাবার্ত্তার চলিত ভঙ্গী, এবং সোজাসুজি ও মুখামুখি ভাব সদা-প্রকাশিত। বক্তা-গণের কথা কাটাকাটিতে ভাবের ত্বরিত পরাবর্ত্তনে ও গল্প স্রোতের অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্যে সাগার রচনা-রীতিতে একটা প্রাণের চাঞ্চল্য অনুভূত হয়, বাছা বাছা শব্দ যোজনায় সুকৌশলে ঘটনাগুলি যেন চোখের সামনে একটি প্রত্যক্ষ চিত্রের মত ফুটিয়া উঠে। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উক্তি-প্রত্যুক্তি সকল ঠিক যেভাবে ও যে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যক্ষদর্শীর চক্ষুকর্ণের বিষয়ীভূত হইত, বর্ণনায় অবিকল তাহাই রাখা হইয়াছে। বর্ণনাকারী কোনরূপ উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখায় না, বা চরিত্র ও অবস্থা সকল উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ প্রদান করে না; এমন কি, ঘটনাসকলের আনুপূর্ব্বিক জ্ঞান থাকিলে যেরূপ ভাবে উপক্রমণিকা সহকারে বর্ণনা হইত, তাহা না হইয়া ঘটনা-কালে প্রত্যক্ষকারী ও পাত্রপাত্রীগণ মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে পরপর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আক্রান্ত হইতেন, সেই ভাবে বর্ণিত হয়। চরিত্রাঙ্কনেও অপরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও দু' একটি দোষগুণের উল্লেখ করিয়া, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে গল্পটিরই কার্য্য-গতিকে ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তন-পথে, এরূপ ব্যক্তিগত বিশেষত্ব এবং পরস্পরের পার্থক্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, যে সাগা-সাহিত্যে বর্ণিত নরনারীর সংখ্যা অগণ্য হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই চিত্র মানসপটে অঙ্কিত থাকিয়া যায়।

ভাষা বা ঘটনা উভয় বিষয়েই সংযম-রক্ষণ আর একটী লক্ষ্যের বিষয়। লোকের চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে যাহা আবশ্যক, কেবল সেই ঘটনাগুলিরই উল্লেখ হয়। যাহাতে ঘটনাটির সম্যক্ অর্থবোধ হয়, কেবল সেই সকল অবস্থাই সন্নিবেশিত হয়। কথাবার্ত্তায় যাহাতে অল্প কথায় বেশী বলা হয়, তাহারই প্রয়োগ করা হয়। বস্তুতঃ একটি সামান্য ব্যাপারে, একটি ক্ষুদ্র কথাতে এত অধিক অভিব্যঞ্জনা অন্য কুত্রাপি দেখা যায় না। নীয়োলার সাগা হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। গল্পের আদিতেই হলগার্ডা নাম্নী বালিকার বর্ণনা আছে। "একদিন এমনি ঘটিল যে হাউস্কুল্ড্ নিজের বন্ধুদিগকে একটা ভোজ দিলেন, আর তার ভাই হ্রুট (Hrut) তাহাতে যোগ দিল, এবং তাহার পার্শ্বের আসনে বসিল। হাউস্-কুল্ডের একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম হলগার্ডা। সে ঘরের মেজেতে আর কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। মেয়েটির মুখখানি সুন্দর, চেহারা লম্বাপানা, এবং চুলগুলি রেশমের মতই কোমল ছিল, আর সেগুলি লম্বা এত ছিল যে, কোমর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িত। হাউসকুল্ড ডাক দিয়া বলিলেন, 'আমার কাছে এস ত, খুকি'। তাই সে তাঁহার কাছে আসিল, এবং তিনি হাত দিয়া তাহার চিবুক ধরিলেন, চুমা দিলেন; তার পর সে চলিয়া গেল। তারপর হাউসকুল্ড হ্রুটকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমার এই মেয়ে সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর? এ দেখিতে সুন্দরী নয় কি?' হ্রুট চুপ করিয়া রহিল। হাউসকুল্ড্ আবার তাঁহাকে ঐ কথা বলিলেন, আর তখন

ছুট উত্তর দিলেন, 'বেশ সুন্দরী এই মেয়েটি, এবং অনেকে ইহার জন্য দুঃখ পাইবে; কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না, চোরের মত চোখ কোথা হইতে আমাদের বংশে আসিল।' ইহাতে হাউস্কুল্‌ড্ ক্রুদ্ধ হইল, এবং কিছুকাল দুই ভাইয়ের দেখাশুনা রহিল না।" হল্‌গার্ডার এই বর্ণনা ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করে, এবং নীয়োলোর সাগার গল্পের অশুভগ্রহ এই বালিকার চিত্র আমাদের মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া যায়।

সাগাগুলির ভাষায় অনুপ্রাস অলংকারের বহুল প্রয়োগ আছে, এবং মধ্যে মধ্যে নায়কগণের স্বরচিত কবিতার পংক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কতকগুলি গুণ আদিম স্তরের অর্থাৎ ১০৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম শ্রেণীর সাগা-সমূহেই লক্ষ্য করা যায়। তেমনই আবার সাগা-সাহিত্যের কতকগুলি দোষও আছে, যাহা পরবর্ত্তীকালের (দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরব্ধ) কাহিনী সম্বলিত ষ্টার্লুঙ্গা প্রভৃতি সাগা-সমূহে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হয় ত একজনের কথা কহিতে কহিতে কথঞ্চিৎ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবশে আরও একাধিক গোটা সাগা আসিয়া পড়াতে পূর্ব্বারব্ধ সাগার সঙ্গতি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কখনও নানা বিষয়ের খুঁটিনাটি বিবরণে মূল সূত্রের অনুসরণ দুরূহ হইয়া পড়ে। বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাবও আর একটি দোষ। দেখা যায়, বহু সাগাতে একই রকম কারণে একই রকমের কলহ সৃষ্ট হইতেছে, এবং একই ভাবে যুদ্ধ-ঘটনায় উহার অবসান হইতেছে। কখনও বা পাত্রপাত্রীগণের পরস্পর আত্মীয়তার সূত্র সূক্ষ্মভাবে ধরিয়া না চলিলে অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ দুর্ব্বোধ থাকিয়া যায়। আবার নামগুলির সাদৃশ্যবশতঃ এই আত্মীয়তা বুঝিয়া উঠাও ভার হয়। (১৬) এতদ্ব্যতীত অসংখ্য যুদ্ধকলহ, মামলা-মোকদ্দমা, ও বংশাবলীর অরণ্যেও পাঠকের দিশাহারা হইতে হয়।

(১৬) নিয়োলার সাগায় বর্ণিত নীয়োলার গৃহদাহের মূলীভূত কারণ সম্পর্কে হাউস্কুল্‌ড্ (Hauskuld) নামটী এই জাতীয়।

এই সাহিত্যের উৎপত্তির কথা ভাবিলেই এই সকল দোষগুণের কারণ বুঝা যাইবে। মধ্য যুগের আদিতে আইস্‌লণ্ডে যেরূপ সমাজে এই সমস্ত পুরাণ কথার উদ্ভব হইয়াছিল, তজ্জন্যই দোষে গুণে সাগা-সাহিত্যের এই বিশিষ্ট প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রথমতঃ এই সকল কাহিনী রোমক ও খৃষ্টীয় প্রভাবের বহির্ভূত স্থলে মুখে মুখে কথিত হইত। এই কারণেই ইহাদের ভাষা এক দিকে কথ্য ভাষার দেশজ ভঙ্গী বজায় রাখিতে পারিয়াছে, এবং উহার বাক্য-গঠন ও শব্দ-যোজনার রীতি লাটিন ধরণে আক্রান্ত হয় নাই। আবার আবৃত্ত ও শ্রুত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের আখ্যান-বস্তু ও ভাষা-রীতিতে কোন কোন বিষয়ে বৈচিত্র্যের অভাব ঘটাই স্বাভাবিক। যাহা আবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা ভালরূপ মুখস্থ থাকা দরকার। অনুরূপ বিষয় ও ভাষার বাঁধা গৎ থাকাতে কথক ও শ্রোতার উভয়েরই স্মৃতি-শক্তির সহায়তা হইত। অন্যান্য দোষগুণগুলিও এইরূপে প্রাচীন আইস্‌লণ্ডীয়গণের স্বভাব, প্রবৃত্তি, ও সামাজিক অবস্থার স্বতোজাত ফল বলিয়া বোধ হয়। সাগা-সাহিত্যে প্রাচীন আইস্‌লণ্ডীগণের যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, গৃহস্থের জীবনযাত্রা এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ভাগ করা ছিল। গ্রীষ্মকালে মাছ ধরা পক্ষিশীকার, মেষচারণ, ঘাস কাটা ও কাঠ কুড়ান প্রভৃতি বাহিরের কাজ হইত; ঘরের ভিতর বসিয়া কাপড় বুনা, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে দীর্ঘ শীতকাল অতিবাহিত হইত। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট উৎসবোপলক্ষে সম্মিলন দ্বারা বৎসরের কাল কয়েকটী ভাগে বিভক্ত হইত। বসন্তকালে কোন কোন উৎসব হইত, এবং স্থানীয় টিং বা সাধারণ সভা বসিত; গ্রীষ্ম-কালের মধ্যভাগে বৃহত্তর আলটিং (Althing) সভার অধিবেশন হইত; গ্রীষ্মাবসানে বিবাহাদি শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইত; এবং শীতের মাঝামাঝিও একটা বহুদিনব্যাপী উৎসব প্রচলিত ছিল। দেশের অধিবাসীবৃন্দ স্বাধীন (Free) ও পরাধীন (Slave) এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল।

স্বাধীন অধিবাসীরাই শাসন-ক্ষমতায় পরিচালনা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু সামাজিক আচার-ব্যবহারে দলপতি, সামান্য গৃহস্বামী ও দাস, ইহাদের কাহারও মধ্যে কোনও রূপ বাধানিষেধ তখন স্বাভাবিক ছিল না। প্রভুভৃত্য সকলে একই প্রকার জীবনযাপন করিত, একই খাদ্য আহার করিত, একই ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, বসনভূষণ আচার-ব্যবহারেও তাহাদের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইত না। পরাধীন শ্রেণীভুক্ত নফরেরাও একেবারে ক্রীত-দাসের মত ছিল না তাহাদেরও কতকগুলি বিধি-নির্দ্দিষ্ট অধিকার ছিল, এবং তাহাদের মূল্য আইনের বিধানে নির্দ্দিষ্ট হইত। হোমরীয় মহাকাব্যে চিত্রিত সমাজ-ব্যবস্থাতেও এইরূপ লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই উভয় স্থলেই হিরোয়িক যুগের অবিকল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ যুগের সমাজে উচ্চবংশীয়গণের প্রাধান্য বিরাজিত ছিল বটে, কিন্তু এই প্রাধান্য আধুনিক সমাজের বড়মানুষীর মত নহে। প্রাচীন হিরোয়িক সমাজের ইতর-ভদ্রের মধ্যে আজকালকার ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল না। পরস্পরের বৃত্তিভেদে যাহাতে প্রভুর মনে নফরের প্রতি বিজাতীয় অবজ্ঞার সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এরূপ কোনও শ্রমবিভাগ-নীতির তখনও প্রচলন হয় নাই। ভদ্র-বংশীয়েরা তখনও কর্ম্ম-বা চিন্তার এরূপ কোনও প্রকার-ভেদের আবিষ্কার করেন নাই যে, উহার ফলে তাঁহারা জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া পড়িবেন। নীচ শ্রেণীর লোকদের সাধারণ কর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, জীবনের এরূপ কোনও স্বতন্ত্র আদর্শের বা শিভ্যালরী যুগের লক্ষণভূত এরূপ কোনও বাঁধাবাঁধি আদব-কায়দার সন্ধানও ভদ্রবংশীয়গণ তখনও পান নাই। ফলতঃ সকলেই যে কার্য্য করে, বা করিতে পারে, যিনি প্রধান তিনি কেবল উহাতে বিশেষরূপে পারদর্শিতা-সম্পন্ন ছিলেন, এই মাত্র বলা যাইতে পারে উচ্চনীচের মধ্যে চিন্তার বিষয় লইয়া কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। হিরোয়িক ভাবাপন্ন সমাজে ইতর ও ভদ্রের জ্ঞান-কর্ম্মের ব্যবধান থাকিলেও, এরূপ বিভিন্নতা ছিল না যে, তাহারা ভদ্ধেতু ভিন্ন ভিন্ন পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সংসারের নিত্যকর্ম্মে তাহারা এক পথেরই পথিক হইত। সামান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উচ্চের গরিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত না। উচ্চবংশজাত বীরপুরুষও গোমহিষাদির দোষগুণ পর্য্যন্ত নিজেই দেখিয়া লইতেন। সমাজ-গঠন যতই জটিল হইতে থাকে, ততই উচ্চ-নীচের এরূপ মেলামেশা উঠিয়া যায়। মীয়োণা ও তাঁহার নফর টর্ডের (Tarde) মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা সহকারে ঘরোয়া কথাবার্ত্তা চলিত, বিশেষ কারণ না থাকিলে আধুনিক কালের প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। হিরোয়িক যুগের লোকেরা নানাবিষয়ে নির্ব্বোধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল সত্য, কিন্তু যে সকল কারণ বশতঃ তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত সেগুলি সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারিত। গোমেষাদি পালিত পশু, জলপথে লুণ্ঠন, জোর করিয়া কাহাকেও অপহরণ, নানাবিধ বাণিজ্যজাত, চোরাই মালের পুনরুদ্ধার, বৈরনির্য্যাতন, আত্মীয়-স্বজনের মর্য্যাদারক্ষণ, প্রভৃতি বিষয় লইয়া তাহারা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিত, এবং এই সকল ব্যাপার বুঝিতে কাহারও পক্ষে সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির প্রয়োজন হইত না।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল প্রাকৃত বিষয়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া সাগা-সাহিত্যের অবলম্বন হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে হিরোয়িক যুগের যে সকল লক্ষণ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তৎকালের উপাখ্যান-কাব্যে এই সকল সাধারণ ব্যাপারেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিবে। কারণ, এ সকল অত্যাবশ্যক বিষয় ছাড়িয়া দিলে তাহারা কি বৃত্তান্তে রাজরাজড়া ও বীর নায়কগণের কীর্ত্তিকথা পূর্ণ করিবে, কি দিয়াই বা শ্রোতৃগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে? হিরোয়িক যুগের সরল সহজ সমাজের লোকেরা মানুষ চিনিতে পারিত, অপর প্রত্যক্ষ ব্যাপার বুঝিতে পারিত, কিন্তু অশরীরী চিত্ত-বৃত্তির ধারণা করিবার মত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-শক্তি তাহাদের ছিল না। কাযের সম্পর্ক না থাকিলে তাহারা কেবল কথা গাঁথিতেও জানিত না। তাই সাগা-সাহিত্যের চরিত্রগুলিও এক একটা জীবন্ত মানুষের মত; তাই ঐ সাহিত্যে সংসারের সমস্ত বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহার ভাষার ভঙ্গীতে প্রাণের একটা সজীব স্পন্দন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রাচীন আইস্‌লণ্ডীয় সমাজ ও সাহিত্য যে কেবল হিরোয়িক ধর্ম্মাক্রান্ত ছিল, তাহাই নহে। আমরা পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি যে, প্রাচীন আইস্‌লণ্ডবাসীগণ যে সকল ভাব লইয়া আইস্‌লণ্ডে গিয়াছিলেন, উহা জার্ম্মেণীয় জাতির সাধারণ সম্পত্তি। স্বাধীন ভাবে জীবন-যাপন ইউরোপের উত্তরাপথের ভদ্রবংশীয় বীরপুরুষের আদর্শ ছিল। ইনি প্রতিবাসী অন্যান্য অনন্য-পরতন্ত্র গৃহস্থগণের নিকট চিরকাল সম্মান প্রাপ্ত হইতেন; সম্পত্তিবত্তায় ও উত্তরাধিকার-সূত্রে গ্রাম-ভাগের সকল কার্য্যের অধিনায়ক হইতেন; কিন্তু প্রজা, সামন্ত, বা কর্ম্মচারীরূপে স্বয়ং কখনও কোন রাজার অধীন হইতেন না; কেহ তাঁহার নিজের বা আত্মীয়ের অনিষ্ট বা অমর্য্যাদা করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আইনানুসারে উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে, বা আত্ম-শক্তিতে উহার যথাযোগ্য প্রতিশোধ দিতে না পারিলে, তাঁহার পক্ষে অসম্মানকর ও কর্ত্তব্যের ত্রুটিজনক বলিয়া মনে করিতেন, পরন্তু প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিশোধ অন্তে বৈরভাব ত্যাগ করিতেন। জার্ম্মেণীয় জাতির যে শাখা আইস্‌লণ্ডে চলিয়া যায়, তাঁহারা প্রচলিত রীতিনীতি আরও দৃঢ়তার সহিত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

এক একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও অনুগতগণ সমভিব্যাহারে এই দ্বীপে আসিয়া এক একটী জনপদ স্বাধিকারভুক্ত বলিয়া দখল করিয়া লইলেন। তিনিই এই জনপদের ভূমি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সঙ্গীগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। এইরূপে প্রত্যেকের এক একটি বাড়ী হইত। বাড়ীর মালিক এক একটি স্বতন্ত্র পরিবারের কর্তা ছিলেন। এইরূপ বাড়ীই আইস্‌লণ্ডীয় সমাজ-গঠনের মূলীভূত। কতকগুলি বাড়ীর সমষ্টিকে এক একটি টিং (Thing) বলিয়া ধরা হইত। এইরূপ টিং-সকলের সমবায়ে আইস্‌লণ্ডীয় সাধারণ-তন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। যিনি জনপদটি পূর্ব্বোক্তরূপে সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, তিনি স্বভাবতঃই দলপতিস্বরূপ তাহাদের নেতৃত্ব করিতেন। টিংএর অন্তর্গত জন-পদ মধ্যে পুরাতন ধর্ম্মানুযায়ী পূজা ও বলির উৎসবে তিনিই পৌরোহিত্য করিতেন, বিভিন্ন পরিবারের কর্ত্তারা টিং সভায় সম্মিলিত হইলে তিনিই সভাপতি হইতেন, এবং প্রয়োজন হইলে, টিংএর অধিবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ সমীপবর্ত্তী অপর জনপদের প্রধানগণের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেন। এই সকল দলপতিগণকে ভূম্যাধিকারী বা স্থানীয় শাসনকর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। কারণ, বাড়ীর মালিকগণ ইচ্ছা করিলে এক দলপতির পরিবর্ত্তে অপর দলপতির অধীনস্থ হইতে পারিতেন। আবার দলপতিও স্বয়ং অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার "দলপতি"-পদটি উত্তরাধিকার-সূত্রে কাহাকেও দিয়া যাইতে পারিতেন, বিক্রয় করিতে পারিতেন, কয়েক জনের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারিতেন, এমন কি, বন্ধকও রাখিতে পারিতেন। দেশে সাধারণ-তন্ত্র প্রচলিত থাকা পর্য্যন্ত দলপতিগণ প্রভূত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। নিকটবর্ত্তী দলপতিগণের ও তাহাদের অধীনস্থগণের পরস্পর বিবাদের ফলে, এবং কোন্ বিধি অনুসারে তৎসকলের মীমাংসা হইবে, তাহার অনিশ্চয়তা-বশতঃ পরিশেষে ৯৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সমগ্র দ্বীপটির জন্য আলটিং (Al-thing) নামে একটি "মহাসভার" প্রতিষ্ঠা হইল, এবং ইহার একজন সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইলেন। ইনি সমগ্র দেশের জন্য এক সাধারণ বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। এই সকল পর্য্যালোচনা

করিলে বুঝা যাইবে যে, যুদ্ধ কলহ, বংশ-পরিচয় ও আইনের বিধান লইয়া খুঁটিনাটি ব্যবস্থার তর্ক প্রভৃতি বিষয় আইস্‌লণ্ডের সাগা-সমূহে কেন পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়।

এই বিবরণ হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, প্রাচীন আইস্‌লণ্ডীয়গণের সাধারণ-তন্ত্র-গঠন দৈবগতিকে ঘটে নাই। তাঁহারা একটি সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া নির্দ্দিষ্ট মনে ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং বুঝিয়া সুঝিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথাকার সমাজ-বিধান বহু ব্যক্তির সম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ পূর্ণজ্ঞানে কার্য্য করা একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচলনের বৃত্তান্ত ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রথমতঃ, কতকগুলি লোক স্বেচ্ছায় খৃষ্টান হয়, আর কতকগুলিকে জোর করিয়া খৃষ্টান করা হয়। অতঃপর যাহারা পূর্ব্ব ধর্ম্মেই থাকে, তাহাদের সহিত খৃষ্টানগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে দেশবাসী সকলে আলটিং সভায় সমবেত হইয়া স্থির করে যে, খৃষ্টান বা অখৃষ্টান যাহাই হউক, একই ধর্ম্মের বিধানে সকলকেই থাকিতে হইবে। এই বিধান কোন্ ধর্ম্মানুযায়ী হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার জন্য যাঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হইল, তিনি তখনও পর্য্যন্ত খৃষ্টমতে অদীক্ষিতই ছিলেন। ইনি কিছুকাল হত্যা দিবার মত পড়িয়া থাকিলেন। পরে তন্নির্দ্ধারিত বিধান মান্য করিয়া লোক-সংস্থিতি কল্পে সকলেই যে একই মতে থাকিবে, এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ পূর্ব্বক, তিনি বিধান দিলেন যে, "আমাদের মধ্যে নূতন বিধির প্রচলন হইল যে, এতদ্দেশবাসী সকলেই খৃষ্টান হইবে"। (১৫)

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে আইস্‌লণ্ডীয় প্রকৃতিতে দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একদিকে জার্ম্মেণীয় জাতির নিজস্ব ভাব রক্ষণার্থ ইহারা একটা উন্নত আবেগবশে সমগ্র ইউরোপ পরিপ্লাবিনী নূতন সভ্যতা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া যেন ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে কাঁটা দিতেছে। আবার অপর দিকে সমাজ-গঠনে নিজেদের মন স্থির করতঃ অগ্রসর হইয়া তাহারা যে বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিতেছে, তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। আইস্‌লণ্ডের গদ্য সাহিত্য সাগা-সমূহেও জাতীয় প্রকৃতির এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিরোয়িক লক্ষণভূত বৈরসাধন ও বৈর-নির্য্যাতন, এবং বাধা-বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিবার শক্তি এই সাহিত্যে যেন আরও উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছে। অথচ এ প্রকার শৃঙ্খলাবিহীন পরতন্ত্রতাসহিষ্ণুতার বৃত্তান্তের যাহাতে প্রকৃষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে, উহা কিন্তু গদ্যে লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থ; উহাতে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নাই, এবং অলৌকিকতা বা কোন ছলাকলার ভাণ মাত্র নাই। এই সকল কারণেই আমরা বলিয়াছি যে, যেখানে হিরোয়িক আদর্শের সমাজ ও রাষ্ট্রবিধান জার্ম্মেণীয় জাতির স্বপ্রকৃতিবশে যথেচ্ছভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই আইস্‌লণ্ডের সাগাসমূহেই জার্ম্মেণীয় জাতির হিরোয়িক সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

---

(১৫) নিয়ালের সাগা ৯৬—১০১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনা—আমাদের আজকালকার সমালোচকগণের ন্যায়নিষ্ঠা লোকের পরিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের মতে বাঙ্গলা সাহিত্যের এখনও দুগ্ধপোষ্য অবস্থা দূরীভূত হয় নাই; অতএব, যে যাহাই করুক, তাহারই প্রশংসা করিতে হইবে। রাস্তার লোকের এরূপ ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এরূপ মত পোষণ করিলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হয়। তাঁহারা সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের সংরক্ষক বলিয়া দাবী করেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি কাহারও প্রতি অবিচার ঘটে, তবে পরিষৎ তজ্জন্য দোষের ভাগী হইবেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ মহাশয় প্রতি বৎসর পূর্ব্ব বর্ষের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ দিয়া থাকেন। এই বিবরণ যে বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক হয়, তাহা নহে। গত পৌষ মাসের ভারতবর্ষে ১৩২২ সনের বিবরণ সম্পর্কে ইহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী ভুক্ত 'মীনচেতন' গ্রন্থের নাম না করার কথা অমরেন্দ্র বাবুই নিরপেক্ষতাগুণে উল্লেখ করিয়াছেন। মীনচেতন প্রথমতঃ ১৩২২ বঙ্গাব্দের 'প্রতিভায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। অমূল্য বাবু প্রবন্ধের প্রথমাংশে বঙ্গভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনায় 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ ঐ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দের 'প্রতিভার' মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য রচিত কল্কি ভাসের নাটকের অনুবাদগুলিরও উল্লেখ করেন নাই, অথচ কথা-সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে অনুরূপ বিষয়ে অন্যত্র প্রকাশিত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে তিনি অধ্যাপক রাধাগোবিন্দের 'তৃতীয় গোপাল' ও রমেশচন্দ্রের 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতির উল্লেখের অবসর পান নাই। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির বর্ত্তমান সংখ্যাল্পতার দিনেও তিনি অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্রের 'অন বা দারু হরিদ্রা'দি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধের উল্লেখ করেন নাই। আধুনিক জগতের নব নব বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে গ্রন্থ-প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অমূল্য বাবু অনুভব করিয়াছেন, অথচ 'সোসিয়ালিজম' সম্বন্ধে 'প্রতিভা' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তিনি যে সকল বিষয়ে প্রবন্ধের উল্লেখাদি করিয়াছেন, তজ্জাতীয় ও গুণে তাহাদের সমকক্ষ বহু প্রবন্ধ তিনি 'প্রতিভার' পাতা খুলিলেই দেখিতে পাইতেন, ইহা দেখাইয়া দিবার জন্য আমরা দু একটির উল্লেখ করিলাম। তিনি তাহা করেন নাই কেন? 'প্রতিভা' পত্রিকার কি দোষ? আমরা অমূল্য বাবুকে বিনামূল্যে প্রতিভা দিই না, কিন্তু যিনি পরিষদের পাশ করা প্রবন্ধকার এবং সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ দিতেছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, তাঁহার অন্ততঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের পাঠাগারটিতে কি পাওয়া যায় উহার সন্ধান করা উচিত ছিল।

সাধারণতঃ আমরা আমাদের সম্বন্ধে কোন মতামতের সমালোচনা করি না। কিন্তু অমরেন্দ্র বাবু কথাটা তুলিয়াছেন বলিয়া, এবং এরূপ একদেশদর্শিতা ও অবিচারের প্রশ্রয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিরপেক্ষ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আমরা ইহার বিরুদ্ধে লিখিতে বাধ্য হইলাম। অমূল্য বাবু নিজের বাড়ীতে বসিয়া যাহা ইচ্ছা লিখিয়া আজকালকার মূল্যবান কালী ও কাগজের অপব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র বঙ্গ

সাহিত্যের পরিচয় দিতে হইলে পরিষৎকে যোগ্যতর বিচারকের সন্ধান করিতে হইবে। নতুবা যাহারা নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারের পক্ষপাতী তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

অভাগিনী

আমি যে ধুতুরাফুল—চির অভাগিনী!
নাহি মধু, নাহি ঘ্রাণ
তবু কানে দেছ স্থান
আমারে করেছ প্রভু শিবসোহাগিনী!
তোমা বিনা আর বা কে
পিনাকে পিয়ারে ডাকে?
আলয়-বিহীনা আমি প্রলয়-রাগিণী!
শ্মশানের ছাই আমি
তোমারি কৃপায় স্বামী
বিভূতি হয়েছি আজি—তাই সে মানিনী!
কখন দহন-শেষে
অলক্ষ্য গহনে এসে
কুড়ায়ে নিয়েছ বক্ষে—কিছু যে জানিনি।
কালরূপী কালকূটে
ধরেছ অধর-পুটে
বিষধর জটাকুটে—গলায় নাগিনী!
জরামৃত্যু কর পান
অমৃত তোমারি দান
শিঙা ফুঁকে ধর তান—জেগেও জাগিনি।
অমর করিয়া মোরে
রেখেছ স্নেহের ডোরে
তুমি বাঘাম্বর—আমি বাঘিনী ডাকিনী!
পতিতারে পায়ে দলি
রথীরা গিয়াছে চলি
নিশীথে মাঘের শীতে পথে একাকিনী!
আমার কলঙ্কখানি
শশাঙ্কের সঙে ছানি
লেপিলে ললাটে; তাই সেজেছি মোহিনী।
তোমার বিষাণ-বাদ্য
বুঝা কি আমার সাধ্য
কখনো ভৈরব রব, কখনো সোহিনী।
শূল নিয়ে রথে এসে
বুকে তুলে নিলে হেসে
বারাঙ্গনা আজি তব বরাঙ্গভাগিনী।
আমি তুচ্ছ ক্ষুদ্র অতি
তোমার ও রুদ্র রতি
সহিতে শকতি কোথা?—আমি অভাগিনী!
পতিতারে করিয়াছ পতি-সোহাগিনী।

শ্রীকুলচন্দ্র দে

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী

বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ

পরিশিষ্ট ভাগ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

১৩২৩ বঙ্গাব্দ

মুখবন্ধ

আমি যে সকল বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছি, তন্মধ্যে ৬০০ পুথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক দুই খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৬০০ পুথির মধ্যে অনেকগুলি পুথির একাধিক প্রতিলিপি আমার নিকট পূর্ব্বেও ছিল এবং এখনও আছে। উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরও অনেকগুলি পুথির একাধিক প্রতিলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। অথচ একখানি পুথির বিবরণ একবার লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সেই পুথির অপর প্রতিলিপিগুলির কোন বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করি নাই। এখন বুঝিতেছি, আমার নিকট যত সব প্রাচীন পুথি সংগৃহীত আছে, তাহাদের সমস্তেরই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। নতুবা পরে আমার অবর্ত্তমানে আমার সংগৃহীত পুথিরাশির কেহই কোন কুল-কিনারা করিতে পারিবেন না। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমার সংগৃহীত সমস্ত পুথিরই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি। এই বিবরণকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত "পুথির বিবরণের" পরিশিষ্ট ভাগ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মূল বিবরণে যে পুথি যেখানে সমালোচিত হইয়াছে, এই ভাগে প্রত্যেক পুথির বিবরণে যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়া দিয়াছি। তদ্দ্বারা পাঠকগণ সহজেই মূল বিবরণের সহিত পুথিগুলির তুলনা করিতে পারিবেন। আশা করি, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসালোচনায় আমার এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রত্নতত্ত্বানুরাগী পাঠক-বর্গের যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

আমার সংগৃহীত সংস্কৃত পুথিগুলির কোন বিবরণ এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তাহাদেরও একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইভাগে প্রকাশ করিয়া দিলাম। বিস্তরেণালমিতি।

চট্টগ্রাম
২০ শে ভাদ্র
১৩২৩ সন

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ।

"মীন-চেতন" গ্রন্থের ভূমিকা

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ইংরেজী ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাসে কুমিল্লা জেলায় প্রত্নানুসন্ধানে প্রেরিত হইয়া তিনটি মূল্যবান্ জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। প্রথমটী ভারেল্লা হইতে সংগৃহীত শ্রীমল্লয়হ চন্দ্র দেবের রাজ্যকালে শ্রীকুসুম দেবের পুত্র ভাবুদেব কর্ত্তৃক পুষ্যা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ নটেশ শিবমূর্ত্তির লিপিযুক্ত নিম্নাংশ,—তাহা বর্ত্তমানে পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়টী কবি ভবানীদাস বিরচিত ময়নামতীর পুঁথি, তাহা আমার এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয়ের সম্পাদনে ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয়টিই বর্ত্তমান গ্রন্থ মীনচেতন, বহুদিনের পরিশ্রমের পর ইহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল। কুমিল্লা ভ্রমণে বন্ধুবর বৈকুণ্ঠবাবু আমার সঙ্গী ছিলেন। একদিন তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে ভারেল্লার অদূরবর্ত্তী তালতলা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত অগ্নি কুমার দে নামক এক কায়স্থ ভদ্র লোকের বাড়ীতে অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে। সেইদিন মামুদপুর নামক এক গ্রামে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পরিদর্শন করিয়া সেই স্থানেই রাত্রি বাস পূর্ব্বক পরদিন ভোরে অগ্নি কুমার দের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমি ও বৈকুণ্ঠ বাবু প্রায় সম্পূর্ণ একদিন প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া কেবল মাত্র এই মীনচেতন নামক পুঁথিখানি অগ্নি কুমার বাবুর অনুমতি লইয়া ঢাকা-সাহিত্য পরিষদের জন্য লইয়া আসিলাম।

পুঁথি আবিষ্কার কাহিনী

পুঁথিখানা যখন পাইয়াছিলাম তখন ইহা প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গই ছিল। জীর্ণ প্রথম পাতাখানার উপরে গ্রন্থের নাম লিখা ছিল 'মীনচেতন' এবং মাঙ্গলিক চিহ্নের পরে 'অথ মীনচেতন লিখ্যতে' বলিয়া গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই আমি কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় যাই এবং পুঁথিখানা আমার সঙ্গে যায়। ইহার পরে যখনই যেখানে গিয়াছি, পুঁথিখানা সঙ্গে লইয়াছি, এই আশায় যে অবসর মত পাঠোদ্ধার করিব। অনেক সময় পাঠোদ্ধার করিতে বসিয়াছিও কিন্তু সম্যক্ অবসরাভাবে এবং তখন ময়নামতীর গানের সম্পাদনে নিযুক্ত থাকায় মীন চেতনের পাঠোদ্ধার আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অবশেষে আমার প্রিয় সুহৃৎ বালুরঘাট বাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র গতি রায় মহাশয়ের পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ টুকু সোৎসাহে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার এক বন্ধুর সহযোগে মীনচেতনের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ ভাজন হয়। সম্পাদন করিবার সময় আমি ফিরিয়া সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি মূল পুঁথির সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিয়া লইয়াছি এবং এই কার্য্যে প্রাচীন পুঁথি পাঠে অভ্যস্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ও অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ও পাঠোদ্ধার কাহিনী

পাঠোদ্ধার সমাপ্ত হইলে সম্পাদন ও ব্যাখ্যা কার্য্য সম্পূর্ণ আমারই করিতে হইয়াছে। মীনচেতনের শেষাংশে যোগতত্ত্ব বিষয়ক দুর্ব্বোধ্য উপদেশাবলি গ্রথিত থাকায় ব্যাখ্যা কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই, এবং স্থানে স্থানে রচনার কিছুই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই সকল স্থানে ব্যাখ্যার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অবিকল মূলানুগত পাঠোদ্ধারের দিকেই সম্পূর্ণ চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছি। যোগতত্ত্ব এবং সাঙ্কেতিক ভাষাভিজ্ঞ সুধীজনের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। পুঁথির অবশিষ্ট স্থানেও পাঠ সম্পূর্ণ মূলানুগত করিতেই চেষ্টা করিয়াছি কেবল প্রথম আট পৃষ্ঠায় শব্দের বর্ণবিন্যাস একটু মার্জ্জিত করা হইয়াছিল। এই পুঁথির দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইলে তখন এই ত্রুটী টুকু সংশোধন করিয়া দেওয়া যাইবে।

পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায়ই উক্ত হইয়াছে যে মীন-চেতন নাথ-পন্থের একখানা প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। বস্তুতঃ

নাথ উপাধিধারী যুগী জাতীয় লোক সমূহের চেষ্টায় ও যত্নেই নাথবর্গের প্রবর্ত্তক মৎস্যেন্দ্র নাথ বা মীন-নাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা, কালুফা ইত্যাদি মহাপুরুষগণের স্মৃতি নানা অলৌকিক কাহিনী বিজড়িত হইয়া গাথা ও কাব্যাকারে এখনও দেশ মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। মীনচেতন ও ময়নামতীর গান উক্তরূপ গাথা বা কাব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন এক সময় ছিল যখন আধুনিক কবি বা যাত্রার পালার ন্যায় এগুলি গ্রামে গ্রামে গীত হইত এবং জন সাধারণ এই সকল কাব্য হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জীবন পরিচালিত করিয়া ধন্য হইত। মীনচেতন এখনও কোথায়ও গীত হয় কিনা অবগত হইতে পারি নাই, কিন্তু ময়নামতীর গান রঙ্গপুর জেলায় পূজা, পার্ব্বণ, উৎসব, মেলা ইত্যাদি উপলক্ষে এখনও প্রত্যেক বৎসর গীত হইয়া থাকে। যুগী জাতীয় জনসমূহই সাধারণতঃ এই গাথার গায়ক বলিয়া সাধারণ্যে ইহা যুগীযাত্রা বলিয়া পরিচিত। গম্ভীরার উৎসবের ন্যায় যুগীযাত্রাও রঙ্গপুর জেলার এক প্রধান বিশেষত্ব। শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সন সাহেব এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ময়নামতীর গানের এক এক সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাও যুগী জাতীয় গায়কদের মুখের আবৃত্তি শুনিয়াই। এই সকল প্রমাণ হইতেই বুঝা যাইবে যে মীনচেতন এবং ময়নামতীর গান ইত্যাদি নাথপন্থের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ, এবং এই সকল কাব্য ও গাথা বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুগী সম্প্রদায়েরই সাহিত্য ও ধর্ম্মপুস্তক।

নাথপন্থ ও মীনচেতন

বস্তুতঃ মীনচেতন ও ময়নামতীর গান আলোচনা করিয়া এগুলি যে একটি বৃহৎ পালা বা মহাকাব্যেরই শাখাবিশেষ, আমার ক্রমশঃই এই ধারণা জন্মিতেছে। ইহাদের মূল ঘটনা চারিসিদ্ধার দুর্গাদেবীর নিকট শাপপ্রাপ্তি এবং তাহারই ফলে তাহাদের নানা দুর্গতি এবং বিস্তর ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে পুনঃ সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি। সিদ্ধাগণের সিদ্ধিবল পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হওয়ায় ভবানী এক দিন সিদ্ধাগণকে এক নিমন্ত্রণে আহ্বান করিবার জন্য শঙ্করকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সিদ্ধাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং পরিবেশনরতা ভবানীর রূপ দর্শনে এক গোরক্ষনাথ ভিন্ন সকলেই কামমোহিত হন। ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানী সিদ্ধগণকে অভিশপ্ত করেন। ভবানীর অভিশাপে মীননাথ কদলীপাটনে সিদ্ধি হারাইয়া রমণীর মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। হাড়িফা মেহারকুলে গিয়া হাড়িকর্ম্ম করিয়া অভিশপ্ত জীবন বহন করিতে থাকেন। মীননাথ এবং হাড়িফা ব্যতীত কালুফা এবং গাবুরসিদ্ধাও ভবানীর নিকট অভিশপ্ত হন, কেবল গোরক্ষনাথ মাতৃভাবে ভবানীকে দর্শন ও চিন্তা করিয়া একা এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাড়িফার মেহারকুল বাস লইয়াই ময়নামতীর গাথাগুলি রচিত হইয়াছে, এবং মীননাথের কদলীপাটনে রমণীর মোহে সিদ্ধিবিসর্জ্জন এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাহার উদ্ধার কাহিনীই মীনচেতনের বর্ণিতব্য বিষয়। কালুফা এবং গাবুর সিদ্ধার পতন ও পুনরুত্থানের কাহিনী লইয়া বোধ হয় এই পালা সম্পূর্ণ ছিল; কিন্তু এই দুই অংশ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মীননাথ ও হাড়িফার কাহিনীর জনপ্রিয়তায় অপর দুই জন সিদ্ধার কাহিনী অনেকটা অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; তাই এগুলির লুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। যদি লুপ্ত হইয়া না গিয়া থাকে তবে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানকারীগণ এই দুই কাহিনী খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই পালার সমস্ত অঙ্গের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবেন, আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি।

ময়নামতীর গান ও মীনচেতন একই বৃহৎপালার বিভিন্ন অংশ

ময়নামতীর গাথাগুলির বিভিন্ন সংস্করণে, সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে (বিশ্বকোষ ১৮শ ভাগ ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা) এবং মীনচেতনে এই দুর্গাদেবীর অভিশাপের বিষয় প্রায় একই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ভবানী দাসের ময়নামতীর পুঁথিতে ময়নামতী যেখানে পুত্র গোপীচাঁদকে হাড়িফার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলিতেছে এবং হাড়িফা হাড়িকর্ম্ম করে বলিয়া গোপীচাঁদ

ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে, সেখানে প্রসঙ্গ ক্রমে হাড়িফার পূর্ব্ব পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছেঃ—

"মৈনামতি বোলে বাপু শুনহ বচন।
গর্ক্ষনাথে জ্ঞান মোরে করে সমর্পণ॥
তুমি জ্ঞান শিখ বাপু হাড়িফার ঠাঞি।
হাড়িফার জ্ঞানে বাপু মুক্তিপদ পাই॥
শোন মাও মৈনামতি খাই মরিম বিষ।
তবেত না হইব আমি হাড়িফার শিষ্য॥
যদি জ্ঞান থাকিত হাড়িফার ধরে।
এক পেটের লাগি কেন হাড়িকর্ম্ম করে॥
হাড়ি নহে হাড়ি নহে জ্ঞান পবিতর।
লেথায় ডাঙ্গর হাড়ি ষোলশত (নফর)॥
মুণ্ডের চুলে ছাইতে পারে সাত পক্ষে ঘর।
হেন জনে বোল হাড়ি জ্ঞান নাহি তোর॥
চারি সিদ্ধায় সাপ পাইল দুর্গাদেবীর পাশে।
মিননাথ চলি গেল কদলির দেশে॥
গোর্ক্ষনাথে চলি গেল ব্রাহ্মণের ঘর।
কালুফা পাইল শাপ ডাড়ার সহর॥
হাড়িফাএ পাইল শাপ তোমা সেবিবার।
-তে কারণে দীনকর্ম্ম করে তোমার ঘর॥
মোহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে।
মোহাজ্ঞান আছে জ্ঞান হাড়িফার পেটে॥

ভবানীদাস—।

দুর্ল্লভ মল্লিক লিখিয়াছেন—

গুরু সাঁপে মীননাথ কদলির বনে।
কাফর হইল জোগী হারায়্যা মহাজ্ঞানে॥

৪৩পৃষ্ঠা

কালুফা বোলেন গোক্ষ্য কর অবধান।
কদলিতে তোমার গুরু হারায়াছে জ্ঞান॥
ভেড়ারূপে বান্ধা আছে কদলি নগরে।
উদ্ধার করহ পাছে আজিকালি মরে॥
সহরে পুরুষ নাই সব নারিগণ।
নটীনি হইয়া বাও গুরু অস্তাসন।

১২৪ পৃষ্ঠা।

শুকুর মহম্মদ লিখিয়াছেন—

হাড়িফাকে পুতিতে পারে কাহার শকতি।
পূর্ব্বে শম্প দিয়াছিল গোরীপার্ব্বতী॥

* * *

টলিল সকল সিদ্ধা জানিল ভবানী।
সকলেক সম্প দিল অসুর ঘাতিনী॥
নটি লইয়া মিননাথ থাকিবে কদলিতে।
গোক্ষের সম্প হইল গরু চড়াইতে॥
ডাহুকার গড়ে কানুফার কাটা যাবে কন্ধ।
মৃকুলে পুতিবে হাড়িকাক রাজা গোপীচন্দ্র।

ইত্যাদি।

বিভিন্ন স্থান হইতে আবিষ্কৃত গাথা গুলিতে এই বিষয়ে মিল বিশেষ লক্ষ্যের যোগ্য।

মীনচেতনের কাহিনী অংশে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। প্রথম পৃষ্ঠাটি লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে ঠিক কি ভাবে পুঁথি আরম্ভ হইয়াছিল বলা কঠিন ; তবে আভাসে বুঝা যায় যে, আদ্যাশক্তি ভগবতী হইতে জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বর্ণিত ছিল। আদ্যাশক্তি ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে প্রসব করিয়া গলিত শব দেহের রূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রতীরে তপস্যারত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নিকটে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুর্গন্ধে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অস্থির হইয়া উঠিলেন কিন্তু শিব মহা আনন্দে সেই গলিত শবকে টানিয়া উঠাইয়া আসন করিয়া বসিলেন এবং গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আদ্যাশক্তি তখন শিবের নিকটই স্বয়ংবরা হইয়া শিবের ঘরণী হইলেন। ১ম পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের ১০ম ১১শ লাইনে—

অনাদি কহেন তত্ব মনে হেতু করি।
কোন জনে গ্রহণ করিবা এই নারী॥

এবং ১৮শ হইতে ২১শ লাইনে—

তবে পুনি আজ্ঞা কৈল ধর্ম্মনিরঞ্জন।
হরগৌরী দুই জন করিল মিলন॥ — মীনচেতনে সৃষ্টিতত্ত্ব
শুন শুন মন্ত্র হর পাইলা এই নারী।
এহারে গ্রহণ কর মোর বাক্য ধরি॥

দেখিয়া মনে হয় যে শ্যামদাস সেনের মতে অনাদি বা ধর্ম্ম নিরঞ্জনের আজ্ঞায় হরগৌরীর উক্তবিধ মিলন ঘটিয়াছিল, গৌরীর স্বয়ংবরের ফলে নহে। শ্যামদাস সেন এক আদি পুরাণের দোহাই দিয়াছেন

আদি পুরাণেও জান এই মত কএ।
তাকে বিচারিয়া চাহ হএ কি না হএ॥
১।১।২৬-২৭

সহদেব চক্রবর্ত্তীও তাহার ধর্ম্মমঙ্গলে এই আদি পুরাণের দোহাই-ই দিয়াছেন। আদি পুরাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা অবগত নহি, আবিষ্কৃত হইলে, এই সকল কাহিনীর মূল ধরা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হরগৌরীর মিলন হইলে পর গৌরী হরকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দুইজনে ক্ষীরাম্বু সাগরের মধ্যে অবস্থিত টঙ্গির উপরে বসিয়া তত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন। মীন-রূপধারী মীননাথ সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া হুহুঙ্কার শব্দে দেবীর ত্রাস উৎপাদন করিল এবং হর তাহাকে "নারীর অধীন হও ও এই খানে যাহা শুনিলা তাহা বিস্মৃত হইয়া যাও" বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। ইহার পরেই দেবীর নিমন্ত্রণে সিদ্ধাগণের আগমন ও অভিশাপ প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। মীন নাথ অভিশাপ পাইয়া কদলীতে যাইয়া রাজা হইলেন এবং নারী লইয়া কেলিতে মত্ত হইয়া সিদ্ধি ভুলিয়া গেলেন। হাড়িফা মেহারকুলে ময়নামতীর ঘরে যাইয়া হাড়িকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

মীনের অভিশাপ প্রাপ্তি

গোরক্ষ নাথ মাতৃভাবে দেবীকে ভজনা করিয়া দেবীর শাপ এড়াইলেন বটে, কিন্তু দেবীর জেদ শিবের ব্যঙ্গ বাণীতে যেন চড়িয়া উঠিল।

গোর্কের চরিত্র শুনি হাসে মহেশ্বর।
মহা অবধূত গোর্ক জগতের ভিতর॥
তারে যদি দেবী তুমি না পার ছলিতে।
রাখিল মহিমা কিছু গোর্ক অবধূতে॥
দেবী বলে তাহারে ছলিমু আর রূপে।
দেখিব সকল হর জানিব সর্ব্বরূপে॥

গোরক্ষ নাথ যেখানে শান্ত মনে বকুলের তলে ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন সেই খানে গিয়া দেবী বিবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইলেন এবং নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু অটল অজেয় গোর্ক নাথ বিল্বপত্র দিয়া দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার পূজা ও আচ্ছাদন একত্রে সমাপ্ত করিয়া দিলেন। দেবী লজ্জা পাইলেন কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়িলেন না। মাছি রূপ ধরিয়া দেবী গোর্কের উদরে প্রবেশ করিলেন ও তাহাকে পীড়া দিতে লাগিলেন। যোগী গোর্কনাথ দশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন এবং দেবী উদরাভ্যন্তরে ছটফট করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পরাস্ত হইয়া ডাকিয়া বলিলেন,—

গোর্ক নাথের প্রলোভন

তুমি বড় সতী নাথ নিশ্চয় জানিল॥
পথ এড়ি দেয় মোরে জাম নিজ ঘরে।
বড় দুঃখ পাইল মুই তোমার ওদরে॥

গোর্কনাথ তখন দেবীকে নানা লাঞ্ছনা দিয়া উদর হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং আঘাত পাইয়া দেবী কাঁকাল ভাঙ্গিয়া এক স্থানে অচল হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এদিকে মহাদেব দেবীকে ঘরে না পাইয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন এবং গোর্ককেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে গালাগালি করিতে লাগিলেন। গোর্কনাথও গুরুর উপযুক্ত শিষ্য; তিনি উত্তর করিলেন যে, 'কোথায় তুমি নেশার ঘোরে তোমার স্ত্রী হারাইয়া আসিয়াছ, এখন আমাকে দায়ী করিলে চলিবে কেন?'

ভাঙধুতুরা খায়ে কি বলিব তোরে।
কথায় হারাইলা নারী ধর আসি মোরে॥

যাহা হউক অবশেষে যেখানে দেবী মাজা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন সেই 'রাড়ার সহরে' গিয়া এক কালীমূর্ত্তি দেবীর প্রতিভূ স্বরূপ স্থাপিত করিয়া শিবকে আনিয়া তাঁহার স্ত্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এইস্থানে পুঁথির কতকাংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া

বোধ হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও কাহিনার সূত্র ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। দেবীর এইরূপ অপমানে শিব একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং ঘটনাক্রমে এই সময় কোন এক কুমারী কন্যা উপবুক্ত স্বামীলাভ করিবার জন্য মহাদেবের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন। মহাদেব ভাবিলেন যে এই সুযোগে গোর্ক্ষনাথকে নারীর অধীন করিয়া দিই। তিনি সেই কন্যাকে বর দিলেন—'গোর্ক্ষনাথ তোমার স্বামী হউক'। গোর্ক্ষনাথ বিপদে পড়িলেন, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনও করিতে পারেন না, তাই কন্যার সহিত যাইতে হইল। কিন্তু কন্যা একটু ধ্যানস্থ হওয়া মাত্রই গোর্ক্ষনাথ দুগ্ধপোষ্য বালকের আকার ধারণ করিলেন। কন্যা বড়ই বিপদে পড়িল—

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজ কন্যাএ বলে আচা ভুয়া ॥
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়।
শুনিয়া কি বলিব মোর বাপ আর মায় ॥

কিন্তু একটু চিন্তা করিয়াই কন্যা বুঝিতে পারিল যে এ সকল গোর্ক্ষের "মায়ার চরিত্র"। কন্যার স্তুতিতে গোর্ক্ষকে তখন আবার নিজরূপ ধারণ করিতে হইল। অতঃপর কন্যাকে পুত্রবরে সন্তুষ্ট করিয়া এবং কর্পটি ধুইয়া জল খাওয়ার ফলে তাহার পুত্রের জন্ম হইলে পর তাহার নাম শ্রীকর্পটি নাথ রাখিয়া গোর্ক্ষনাথ আবার যাইয়া তরুতলে বসিলেন।

এমন সময় কালুফা শূন্য পথে তাঁহার গুরু হাড়িফাকে খুঁজিতে চলিয়াছেন, তাহার সহিত আলাপে গোর্ক্ষনাথ জানিতে পারিলেন যে তাঁহার গুরু মীননাথ কদলীপাটনে যাইয়া রমণীর মোহে ধরা দিয়াছেন।—

মীননাথের সংবাদ প্রাপ্তি

"বড়াই না ছাড় গোর্ক্ষ জিয়ান কোন ফলে।
তোমার গুরু পড়িয়াছে কদলির ভোলে ॥
দশন গলিত হৈল পাকা মাথার কেশ।
কামিনীর কোলে তার জীবন হৈল শেষ ॥
তিনদিন বাকী আছে আয়ু হৈল শেষ।
তাহাকে আনিতে যম করিছে আদেশ ॥
যদি খা না চায় গোর্ক্ষ কলঙ্কের ডর।
ত্বরিতে তবে ত গিয়া গুরু রক্ষা কর ॥"

কালুফার নিকট গুরুর এ হেন দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া গোর্ক্ষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রতিদানে কালুফাকে তাঁহার গুরু হাড়িফার সংবাদ জানাইয়া দিলেন।—

"তোমার গুরু আমা হৈতে শুনহ উদ্দেশ।
বন্দী হৈছে তোমার গুরু মেহার কুলেতে।
নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাতে ॥
মেহার কুলেতে আছে বড়হি ডাকিনী।
মৈনামতী নাম তার রাজার ঘরিণী ॥
বিধবা রমণী সে জে পুত্র রাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর ॥
তার পুত্র গুপীচান্দে বান্দিয়া রাখিল।
মাটীর করিয়া গড় তাহাতে থুইল ॥
হস্তি সব বান্দি থাকে তাহার উপর।
রাত্রি দিন বঞ্চে সিদ্ধা তাহার ভিতর ॥

এইরূপে দুই শিষ্যে দুই গুরুর উদ্দেশ পাইল—কালুফা মেহার কুলেতে চলিয়া গেল, গোর্ক্ষনাথ, কিরূপে গুরুর উদ্ধার সাধন করিতে পারিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া এই স্থির করিলেন যে প্রথমে যমের দুয়ার বন্ধ করা চাই। এই স্থির করিয়া গোর্ক্ষ

হাতে লাঠি লইল পানাহি লইল পাএ,

এবং অবিলম্বে যাইয়া যমপুরে উপস্থিত হইলেন। যমপুরে তাঁহার সম্মান প্রচুর!—

গোর্ক্ষরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে।
হাত ধরিল বৈসাহিল আপনা আসনে ॥

কিন্তু গোর্ক্ষ ইহাতে কিছুমাত্র নরম না হইয়া যমকে এমন শাসাইলেন যে যম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল;—

ক্রোধ দেখি গোর্ক্ষনাথের যম কাঁপে ডরে।
যতেক কাগজ আনি দিলেন্ত গোচরে ॥

আর গোর্ক্ষনাথ—

একে একে যত পড়ি চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা চাহে মন দিয়া ॥

শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।

খুঁছিল কাগজ চাহিয়া গুরুর লিখন।

এইরূপে গুরুর "যম দুয়ারে কাঁটা" দিয়া গোর্ক্ষনাথ আসিয়া আবার বকুলের তলে উপবেশন করিলেন। নন্দ ও মহানন্দ নামক শিষ্যদ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে ব্রাহ্মণের বেশে কদলির দেশে প্রবেশ করিয়া গুরুকে উদ্ধার করিবেন।

উদ্ধারের চেষ্টা

তদনুসারে ব্রাহ্মণের বেশ যোগাইবার জন্য বিশ্বকর্ম্মার উপর হুকুম জারি হইয়া গেল এবং গোর্ক্ষনাথ ব্রাহ্মণের বেশে যাইয়া কদলিতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিয়া সকলেই প্রণাম করিতে লাগিল—

যতিনাথে বলে নন্দ উঠ ফিরি যাই।

এহি মতে না পারিমু আনিতে গোসাঞি॥

দ্বিজরূপে দেখি সবে করে নমস্কার।

আশীর্ব্বাদ না করিলে লোকে কৈব ছাড়॥

দ্বিজার বচন বৃথা না হয় কদাচন।

আশীর্ব্বাদে দীর্ঘজীবী হৈব সর্ব্ব জন॥

কাজেই ব্রাহ্মণরূপে সুবিধা হইল না দেখিয়া পুনরায় যোগী রূপে গোর্ক্ষনাথ গুরুকে বুঝাইতে চলিলেন। রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গোর্ক্ষনাথ রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মীননাথ-খনিত সরোবরের উত্তর পারে বকুলের তলে আসন করিয়া বসিলেন। ইতি মধ্যে এক নাগরী সরোবরে জল লইতে আসিয়া গোর্ক্ষনাথকে দেখিয়া ভুলিয়া গেল এবং নানাপ্রকারে তাহাকে গৃহবাসী করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অটল গোর্ক্ষনাথ তাহাকে বর দিয়া তৃপ্ত করিয়া এবং শাপ দিবার ভয় দেখাইয়া তাগর হাত এড়াইলেন এবং তাহারই নিকট হইতে জানিয়া লইলেন যে কেবল নর্ত্তকী সকলেরই মীনের নিকট যাইবার আদেশ আছে। এই সংবাদ পাইয়া গোর্ক্ষনাথ পুনরায় বিশ্বকর্ম্মার নিকট হইতে বেশ ধার করিয়া নর্ত্তকীর রূপ ধারণ করিলেন এবং মীন নাথের প্রাসাদ দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

নর্ত্তকীর রূপ দেখিয়া দ্বারী যাইয়া মহারাণীকে খবর দিল, মহারাণী দৌড়িয়া আসিয়া নর্ত্তকী যাহাতে মীননাথের নিকট না যায় সেই জন্য তাহাকে সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল এবং অবশেষে পুরীর বাহির করিয়া দিল। নাছোড়বান্দা গোর্ক্ষনাথ মীননাথের দোহাই দিয়া মাদলে ঘা দিল এবং গোলমাল শুনিয়া মীননাথ সেখানে আসিয়া জুটিলেন, তখন গোর্ক্ষনাথ নানাছলে গুরুকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মীননাথের সহিত সাক্ষাৎ

ধীরে ধীরে মীননাথের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু মায়ার মোহ কি সহজে ছাড়ে, মীননাথ গোর্ক্ষনাথের সহিত তর্ক আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গুরু মহাদেবই যখন গঙ্গাগৌরী দুই নারী লইয়া গৃহবাস করিতে পারেন তবে তিনি কেন পারিবেন না?—

তান আছে গৃহবাস আমি কোন হই।

তান মোর এক গতি শুনরে গোর্ক্ষাই॥

গোর্ক্ষনাথ উত্তর করিলেন যে হর নারী লইয়া কেলি করেন বটে, কিন্তু তত্ত্বকথা তো কখনও বিস্মৃত হন না, কাজেই শিবের অনুকরণ করিতে গেলে চলিবে না। মীননাথ তখন বলিলেন যে, তিনি সকলই বুঝিতেছেন কিন্তু আর উপায় নাই, তিনি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, এই হীন অবস্থায়ই তাঁহার দিন কাটাইতে হইবে। অগ্নিগর্ভ ভাষায় তখন গোর্ক্ষনাথ গুরুকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন—

তিন তিহড়িত গুরু নাহিক জননী।

প্রদীপ নিবিলে গুরু অন্ধকার জানি॥

ঠগের হাতেতে গুরু সপিলা ভাণ্ডার।

চান্ধাত্তির হাতে ভরা সপীলা তোমার॥

মাছের প্রহরী দিলা দারুণ যে উদ।

বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ॥

মহাতেজ কুড়ালেত সমর্পিলা তরু।

ব্যার্ঘের সমুখে তুমি সমর্পিলা গরু॥

দরিদ্রেত থুইলা তুমি অমূল্য রত্তন।

কাষ্ঠের উপরে যেন অগ্নির স্থাবম॥

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু মীননাথের তবু চেতনা হয় না। গোরক্ষনাথ আবার অলঙ্ক ভাষায় তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, এবং আভাসে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন—

বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেনে উড়ে।
পথরিতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে॥
নগরে মণিস্য নাই ঘর চালে চালে।
অন্দনে দোকান দেএ থরিদ করে কানে॥
হেন ভ্রম দুর হউক চেতন হউক মীন।
ঝাপ দিয়া তরিতে চাহি সাগর গহিন॥
মুখখানি আনল জান জিহ্বাখান ফাল।
অমূল্ল পাটনে যার গরল নেহাল॥
উচ নীচ ভুমি থান তাতে হংসী হএ।
জে বা হএ গৃহবাসী সে ভুমি চসয়॥

* * *

কহিতে কহিতে নাথে হাতে মারে তালি।
বিচলিত মিননাথে করে হুলা স্থলি॥
উচাট উচাট করি বোলে কর্ণে লাগি।
ঘুণিয়া যে মহামন্ত্র ভ্রম গেল ভাঙ্গি॥

মীননাথ সচেতন হইয়া জাগিয়া বসিলেন। শুনিয়া কদলির যুবতী সকল সাজিয়া আসিল, মীননাথকে ধরিয়া রাখিবে। কিন্তু মীননাথ তাহাদিগকে মিষ্টকথায় বিদায় করিয়া দিতে চাহিলেন। তখন মহারাণী কমলা গার্হস্থ্যাশ্রমের মহিমা বর্ণনা করিয়া মীননাথকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন এবং মীনের মন অনেকটা নরম হইল—

বিন্দুনাথেরে দেবী রাজার কোলে দিয়া।
মোদ্দলা কমলা বৈসে রাজার বামে গিয়া॥
তখন— এতেক দেখিয়া মিনে জ্ঞান নাহি পাএ।
ডাহনে ডাকিয়া গোর্কে বোলে হাএ হাএ॥
এতেক জর্জনে গুরু করিলাম চেতন।
মায়া পাতি জুবতিএ ভুলাইল মন॥

হতাশ হইয়া গোর্ক্ষনাথ গুরুকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মীননাথ তখন আবার বিকল হইয়া গিয়াছেন, কে কাহার ভৎর্সনা শুনে? তখন গোর্ক্ষনাথ মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়া হাত বাড়াইয়া মীননাথের কোল হইতে বিন্দুনাথকে লইলেন। এমন সময় মীননাথ গোর্ক্ষনাথকে আদেশ করিলেন যে বিন্দুনাথকে 'পাখালিয়া' আন। গোর্ক্ষনাথ পুষ্করিণীতে গিয়া বিন্দুনাথকে আচ্ছা করিয়া ধুইয়া আনিল।—

এত ভাবি বালক লইয়া গেল সরবরে।
নৌথের য়াছাড়া দিয়া পেট খান চিড়ে॥
পেট ফারি বিন্দুনাথের ঝুলি নিকলিল।
ধোপাড় কাপড় যেন আছাড়িয়া ধুইল॥
বিছাইয়া রৌদ্রেত দিল সৈল মৎস্য জেন।
বালক দেখিয়া কান্দে কদলির গণ॥

মৃত বালককে ঘিরিয়া মীননাথ এবং অন্যান্য সকলে আকুল হইয়া কান্দিতে লাগিল। তখন গোর্ক্ষনাথ বলিলেন যে বিন্দুনাথকে ধুইতে বলিয়াছ, আমি ভাল করিয়া ধুইয়া আনিয়াছি, এখন কাঁদা বৃথা। যদি বালককে বাঁচাইতে চাহ—

শঙ্করের শিস্য তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
মহামন্ত্র য়াউতিআ জিয়াও তাহানে॥
পুত্র শোকে ভোর হইয়া কেনে মর তুমি।
তুমি যদি না পার জিয়াইয়া দিব আমি॥

তখন মীননাথ হাতে জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া জিয়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন্ত্র কিছুই মনে নাই, বালক প্রাণ পাইল না। গোর্ক্ষনাথ তখন মন্ত্র পড়িয়া তুড়ি দিলেন, মৃত বালক উঠিয়া বসিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কদলিগণ মীননাথকে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গোর্ক্ষ-নাথের আর সহ্য হইল না; তিনি কদলিগণকে ভীষণ অভিশাপ প্রদান করিলেন, সমস্ত কদলি বাদুর হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন গোর্ক্ষনাথ বিস্তৃত ভাবে মীননাথকে একবিংশ তত্ত্ব শুনাইতে লাগিলেন এবং মীননাথের ভ্রম সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল এবং বিন্দু, গোরক্ষনাথ ও মীননাথ কদলি পরিত্যাগ করিয়া বিজয় নগর চলিয়া গেলেন।

এই হইল মীনচেতনের মোটামুটি কাহিনী অংশ। ছাপান পুঁথি ৩৯ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে, ইহার অর্দ্ধেকেরও বেশী অংশ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যায় গিয়াছে, বাকী পৃষ্ঠায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, উপরের সারাংশ হইতেই বুঝা যাইবে যে তাহাতেও বৈচিত্র্য বড় কম নহে। এক সময়ে ইহা যে সারা দেশময় প্রচলিত ছিল. এমন কি বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও যে মীননাথের উদ্ধার কাহিনী ঘরে ঘরে উপকথার ন্যায় কথিত হইত, আমি স্বয়ংই এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারি। মীননাথের উদ্ধার-কাহিনী, মীননাথের সন্তানকে ভাল করিয়া ধুইয়া আনিবার কাহিনী, আমি শৈশবে পিসিমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, আমার স্পষ্ট মনে আছে। মীনচেতনের বিষয়ে গ্রাম্য সঙ্গীতের যে এখনও অভাব নাই, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত মহাশয় 'প্রতিভা'র গোড়ার দিকের এক সংখ্যায় ঐরূপ একটি গান তাঁহার ভাটিয়াল গান সংগ্রহে প্রকাশিত করিয়া দিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, এবং চেষ্টা করিলে আরও ঐরূপ গান সংগ্রহ করা কঠিন নহে। "চেৎ মীন নাথ, গোর্ক্ষা আয়া" ইত্যাদি বচন এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। স্থান বিশেষে গোর্ক্ষনাথ গাভীগণের ভাগ্য-বিধাতা গ্রাম্য দেবতার আকার ধারণ করিয়াছেন এবং এমন কি মুসলমানগণও গাভীর সুখপ্রসবের পরে গোর্ক্ষের লাড়ু দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করে।

মীন চেতন কাহিনীর প্রচার ও প্রসার

মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ ইত্যাদি সিদ্ধাগণ কাল্পনিক কি ঐতিহাসিক তাহার স্থির মীমাংসা করিবার উপায় এখনও আমাদের হাতে নাই, কারণ অবিশ্বাসীর সন্দেহ অবিসংবাদিত রূপে নিরসন করিতে চাহিলে যে সমস্ত উপকরণ চাই, ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তক বা ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে সে সমস্ত পাওয়া সম্ভবপর নহে। এই হিসাবে শঙ্কর, কুমারিল বা চৈতন্য মহাপ্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণও সুকঠিন। তবে শঙ্করভাষ্য ইত্যাদি যদি শঙ্কর নামা মহাপুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যায় তবে গোরক্ষ সংহিতা এবং মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক প্রণীত যোগ তত্ত্ব বিষয়ক নানা গ্রন্থাবলির অস্তিত্বও উপেক্ষা করা যাইবে না। নবম, দশম এবং একাদশ খৃষ্ট শতাব্দে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষের সহিত শৈবধর্ম্ম মূলক যোগ ও তন্ত্রাচার মিশ্রিত হইয়া নাথপন্থের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মীননাথ গোরক্ষনাথ ইত্যাদি এই পন্থা প্রবর্ত্তকগণের অগ্রণী, ইহার বেশী বর্ত্তমানে জোর করিয়া বলা নিরাপদ্ নহে।

মীননাথ ও গোরক্ষ নাথ

মীনচেতন গ্রন্থে কদলীর দেশ, বিজয়া নগর, ডাড়ার সহর ইত্যাদি স্থানের নাম পাওয়া যাইতেছে, কোন প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন ইহাদের অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন। রাজসাহীর অদূরে এক বিজয়-নগর আছে, এবং ডাড়ার সহর রাঢ় দেশের অন্তর্গত কোন নগর হইতে পারে, এইরূপ অনুমান মাত্র করা যায়; কিন্তু এইরূপ অনুমানের বিশেষ মূল্য নাই। অবশিষ্ট কদলী সহর সম্বন্ধেও তথৈবচ, কিন্তু কদলী শব্দটী মীনচেতনে এত বার ব্যবহৃত হইয়াছে যে ইহা একটু আলোচনার যোগ্য।

'কদলী' শব্দটী মীনচেতনে কখনও রমণী অর্থে, কখনও বা দেশ বিশেষের নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যথা, দেশার্থক—

কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন। ৪।২।১৮
কদলিতে দেখে মিনে নারীগণ প্রজা। ৪।২।১৯
কদলি সহরে মিন চলন্ত সত্তর। ৩।২।২৪
ব্রাহ্মণ হইয়া নাথে কদলিতে যায়।
একদৃষ্টে কদলির সভাএ রঙ্গ চায়। ১১।১।১৩—১৪
ইত্যাদি।

রমণী বাচক—

সোলস কদলি বাপু তোহ্মা থাকে বেড়ি।
মড়া গরু যকুনে না যাএ যেন ছাড়ি। ২২।২।১৫-১৬
সোলস কদলি মিনে দেখি একান্তর।
হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মচন্দর। ২৭।২।৫—৬
কদলি সকল আমি না দেখি নয়ানে।
ক্ষেণেক রহিতে আমি না পারি নির্জনে॥
৩১।১।১১-১২

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে যতেক কদলি। ৩১।২।২৬
সোলস কদলি কান্দে মিননাথে বেড়ি। ৩২।১।১৫
ইত্যাদি।

আপ্তের অভিধানে কদলীকৃতা একটি শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ সুন্দরী স্ত্রীলোক। কদলি এবং কদলীকৃতা যদি একই শব্দ হয়, তবে কদলি শব্দটি সাধারণতঃ সুন্দরী স্ত্রীলোক এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং "সুন্দরী রমণীর দেশ" এই অর্থে কদলী সহর, কদলি রাজ্য এবং এমন কি শুধু কদলী শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই পুরুষশূন্য সুন্দরী রমণীর দেশ কোথায়? বর্ণনা দেখিয়া বুঝা যায় তাহা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত রমণীপ্রধান কোন রাজ্যই হইবে। হয় ত কামরূপ, হয় ত বা মণিপুর, হয় ত বা ব্রহ্মদেশ, কিন্তু ঠিক করিয়া কিছুই বলিবার জো নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক পত্রে আমাকে আহোম রাজধানী কৈলা-সহরের নাম স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কৈলা সহর বোধ হয় কৈলাস সহরেরই রূপান্তর; না হইলেও এই সহর বেশী প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এইস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে যোগিনী তন্ত্রের উত্তর খণ্ড প্রথম পটলে কামরূপের উত্তরাঞ্চলকে নাকি কদলী বন বলা হইয়াছে। (শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত গোবিন্দচন্দ্রের গীত ৪৩ পৃষ্ঠা)।

সামাজিক রীতিনীতি

কাব্যে মাত্র প্রসঙ্গক্রমেই সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, কাজেই সামাজিক রীতিনীতির বিস্তৃত পরিচয় মীনচেতন হইতে পাওয়ার আশাও করা যায়না। তবে মধ্যে মধ্যে দুই এক ছত্রে যে দুই একটি বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। নাথপন্থের সন্ন্যাসীদের আকৃতির বর্ণনা দুই তিন স্থানে আছে; তাহাতে জানা যায় যে, হাতে লাঠি এবং লাউয়া অর্থাৎ লাউর খোলে নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র, কাণে সাতটি কড়ি, পৃষ্ঠে কাঁথা এবং ঝুলি, এবং পায়ে পানাহি বা জুতা,—ইহাই তাহাদের সাধারণ বেশভূষা। ইহার মধ্যে কাণে সপ্তকড়িই বোধ হয় নাথপন্থের বিশেষত্ব এবং সাধুসন্ন্যাসীর পায়ে পানাহি একটু বিস্ময়-জনক। গোর্ক্ষনাথের ব্রাহ্মণের রূপ গ্রহণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের সাজের বর্ণনা আছে। গলায় তিনগুণ পৈতা, কপালে ফোঁটা, হাতে কমণ্ডলু, মাথায় ছাতি, এবং পায়ে জুতা, এই হইল ব্রাহ্মণের বেশ। গোর্ক্ষনাথের নর্ত্তকীর বেশ ধারণ এবং কদলীর যুবতীগণের বর্ণনা উপলক্ষে রূপাভিমানিনীর সাজ সজ্জার একটা তালিকা পাওয়া যায়। গলায় ষোল ছড়ি হার, কপালে তিলক, নয়নে কাজল, হাতে কঙ্কণ, কাণে কুণ্ডল, পায়ে কাঁচলি, কমরে খিচলী অর্থাৎ কোমরবন্ধ, তাহাতে কিঙ্কিণী, চরণে নূপুর ইত্যাদি। যুগীদের সুতা কাটা এবং কাপড় বুনাই প্রধান ব্যবসায় ছিল। বহুবিবা বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। সামাজিক নিমন্ত্রণে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মাননীয় জনকে মধুভাণ্ড দিয়া অভ্যর্থনা করিবার রীতি ছিল। যুগীদের মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত করা হইত এবং অদ্যাবধি যুগীজাতীয় অনেকে এই নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকে।

বর্ণবিন্যাসে প্রাকৃত রীতি

মীনচেতনের প্রথম ভাগে বর্ণবিন্যাস একটু মাজা ঘষা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অবশিষ্টাংশের বর্ণবিন্যাস অবিকৃত এবং মূলানুযায়ী রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই সকলের মধ্যে এমন অনেক বর্ণবিন্যাস আছে, যাহা স্পষ্টই ভুল, কিন্তু এমন অনেকগুলি আছে যাহাদের ভুলের মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলা দেখা যায়। আমার বোধ হয় প্রাকৃত নিয়মানুসারে এগুলি ভুল নহে, বিশুদ্ধ প্রাকৃতরূপ। কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞতর ব্যক্তিগণের গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

ভাষা

ভাষার বিশেষত্ব বিশেষ কিছু লক্ষ্য করি নাই, অন্যান্য প্রাচীন পুঁথির ভাষা যেমন, মীনচেতনের ভাষাও তাহা হইতে অভিন্ন। কেবল কুমিল্লা জেলার পুস্তক বলিয়া দু' একটি কুমিল্লার কথিত ভাষার শব্দ স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে।

নিম্নলিখিত ছন্দে বা সুরে এই পালা গাওয়া হইত,—

ছন্দ — লাচাড়ী দীর্ঘ ছন্দ, খর্প ছন্দ, দীর্ঘছন্দ; পটমঞ্জরী রাগ; যুই বা সুহই রাগ, শ্রী-রাগ, রাগ মাইর এবং রাগ আহিরি। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যাক্তিগণ এই সকল ছন্দের বিশেষত্ব অবগত আছেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে বর্ত্তমান গ্রন্থের নাম মীনচেতন নহে, গোর্ক্ষ বিজয় এবং ইহার গ্রন্থকারের নাম শ্যামদাস সেন নহে, সেখ ফয়জুল্লা; আমরা একটা জাল গ্রন্থ ছাপিয়া বৃথা হৈ চৈ করিতেছি। কোন শ্রদ্ধের এবং প্রাচীন সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন কথা বলিয়া থাকিলে বড়ই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে, কারণ এই কথার অসারত্ব এতই স্পষ্ট যে প্রাচীন সাহিত্যালোচনার নেহাৎ শিক্ষানবীশও এমন অনাবধান কথা বলিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সকলেই জানেন একই আখ্যায়িকা লইয়া প্রাচীনকালে বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের গ্রন্থকারের সংখ্যা করা যায় না। রামায়ণেরও তথৈবচ; বেহুলার কাহিনী লইয়া ত্রিশ জনেরও বেশী কবির কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ময়নামতীর গানের বিভিন্ন কবি প্রণীত ছয়টি সংস্করণ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় ফয়জুল্লা নামক কবিই এই কাহিনীর একমাত্র কাব্যকার এমন কথা বলা চপলতা মাত্র। এই কাব্যের নাম গোর্ক্ষবিজয় হইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুঁথিতে নাম মীনচেতন পাইয়াছি তাই ইহার নাম মীনচেতন দিতে হইয়াছে। গোর্ক্ষবিজয় পাইলে গোর্ক্ষবিজয়ই দিতাম।

সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত এক গোর্ক বিজয়ের পরিচয় শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম তৎসংগৃহীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ" নামক গ্রন্থের ২৯—৩৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন। পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ পাওয়া যায় নাই। মুন্সী সাহেব পুস্তকের নাম গোর্ক্ষ বিজয় কেন দিয়াছেন তাহার কারণ কিছু উল্লেখ করেন নাই। সামান্য সামান্য উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া বুঝা যায় যে শ্যাম দাস সেনের পুঁথির সঙ্গে তাহার স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য মিল আছে। মুন্সী সাহেবের প্রাপ্ত পুঁথি এক হাঁড়ির নিকট ক্রীত এবং তাঁহারই মতে তাহা "একে অসম্পূর্ণ তার উপর লিপিকর প্রমাদে পুঁথিখানি পূর্ণ। শ্রীচানগাজি নামক জনৈক মুসলমান ইহার প্রতিলিপি কারক। লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ পুঁথির অনেক স্থল অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে।" কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত পুঁথি যুগী সম্প্রদায়ের এক প্রধান স্থান ময়নামতী পাহাড় সংলগ্ন ঘোষ নগরের অদূরে তালতলা নামক গ্রামের এক ভদ্র কায়স্থ ঘর হইতে সংগৃহীত। ইহার লেখক যুগী জাতীয় এক জন ভজুরাম দেবদাস নামক লোক। পাণ্ডুলিপি অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত এবং ১২০২৪ সনের ২৮ শে চৈত্র তারিখে প্রতিলিপি "যথা দৃষ্টিতং তথা লিখিতং" হইয়াছিল। শ্যাম দাসের ভণিতা এমন ভাবে এই পুঁথির মধ্যে আছে যাহাতে অন্যের নাম উঠাইয়া নিজের নাম বসান বলিবার বিশেষ কোন হেতু দেখা যায় না। মুন্সী সাহেবের পুস্তকে যে দুই লাইনে ফয়জুল্লার ভণিতা দেখা যায় সেই কয় লাইন আমাদের পুঁথিতে নাই। আমার পুঁথিতে ২৪।২।১১ তে এবং শেষ ৩৯।২।৮ তে শ্যাম দাস সেনের ভণিতা দেখা যায় কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই মুন্সী সাহেবের পুঁথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে শ্যাম দাস সেনের ভণিতা ছিল কিনা স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় না। এই অবস্থায় বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত বা এই পুঁথির অপর সুলিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই পুস্তক শ্যামদাস সেনের রচিত বলিয়াই ধরিতে হইবে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে পুঁথি মধ্যে শ্যামদাস সেনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। পুঁথির ভাষা দেখিয়া অনুমান হয় যে তিনি ত্রিপুরা অঞ্চলের লোকই হইবেন। কিন্তু কবিত্বে যে তিনি

শ্যামদাস সেন ও তাহার কবিত্ব — হীন নহেন তাহা তাঁহার কাব্য পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়। মীননাথকে উত্তেজিত করিবার জন্য গোরক্ষ নাথের মুখে যে সকল বাক্যাবলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন একটা জোর ও তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে,যে কবিকে সাধুবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না।

এক হাতে প্রুফ সংশোধন না হওয়ায় এবং শেষ প্রুফ সর্ব্বদা আমি নিজে না দেখিতে পারায় গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি ভুল রহিয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার প্রধান গুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	২০	পএ	পাএ	৮	২	৯	করিয়	করিয়া
৬	২	৩	পিনে	মিনে	৮	২	২৪	চলিল	বলিল
৭	১	৬	তুবি	তুমি	১২	১	৩১	সংসার	সমান
৭	১	৭	মিজ	নিজ	২২	১	২৫	এজ	এক
৭	১	২১	কে	কি	২৭	১	৮	আবুরালি	গাবুরালি
৭	২	২৮	প্রমাদ	প্রমাদে	৩০	১	৫	তোলেত	ভোলেত
৭	২	২৮	বাড়িয়া	পড়িয়া	৩১	১	২৬	ব	বা
৮	১	১১	স্তুতি	স্তুতি					
৮	১	২৭	করিরা	করিয়া					

পৃষ্ঠাঙ্ক ৪১ হইতে ৪৭ পর্য্যন্ত ৩৩ হইতে ৩৯ হইবে।

মীনচেতন প্রকাশ কার্য্যে যাঁহাদের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

কবিগান।

(১)

এসে কর্ম্মক্রমে, জন্মভ্রমে মা,
দিন গেল মোর কেটে। (১)
আছি বদ্ধ হ'য়ে কারাগারে,
মায়া মোহ অন্ধকারে,
মার আমারে বান্ধিয়াছে এটে॥ (২)
এবার হ'লনা মোর ইষ্ট সাধন,
কষ্টেতে দিন কাটি,
কেবল ভূতের বেগার খাটি;
মা, মাগো, কি হবে মা শেষের দিনে,
ধর্ব্বে যখন কাল শমনে,
কেউ যাবে না আমার সনে,
একা যেতে হবে খাটি॥ (৩)
ছয়টী বন্ধু (৪) সঙ্গে কইরে, এসেছিলাম ভবে,
তারা যার যেখানে চলে যাবে,
কেউ কর্‌বেনা মমতা।
আমি কার কাছে যাই,
কারে জানাই আমার দুঃখের কথা॥
যখন জননীর জঠরে ছিলাম জঠর যন্ত্রণায়,
তখন প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম, সাধনা করবো তোমায়,
হইল না তাই আমার ভাগ্যে,
নষ্ট হইল সে প্রতিজ্ঞে,
উপায় কি বা হবে দুর্গে,
অন্তে স্থান পাব কোথা।
কি হবে মা শিবে, আমি ভ্রমি যথা তথা॥
আমি কার কাছে যাই,
কারে জানাই আমার দুঃখের কথা॥
এবার ব্যাপার কর্ত্তে এলাম ভবে, হ'লনা বাণিজ্য,
সদাই করি কুকার্য্য,
মা, মাগো, যে ধন ছিল সঙ্গের পুঁজি,
হারাইলে সব না বুঝি,
বেহুঁসারি (১) মন কুপাজি,
সেত বোঝেনা মোর নেহ্য;
লেইখাছে শিব আপন করে,
ব্যক্ত ত্রিসংসারে,
জানি দুর্গা নামে দুঃখ হরে,
হয় না যে অন্যথা।
আমি কার কাছে যাই, কারে জানাই
আমার দুঃখের কথা॥
দুঃখে দুঃখে দিন গেল মা দুঃখ-হারিণী,
মা হ'য়ে সন্তানের দুঃখ দেখে এমন কোন্ পাষাণী;
হর মা এ দাসের দুঃখ,
অন্তে যেন পাই মোক্ষ,
দক্ষ নন্দিনী।
আমি বারে বারে বার, কত শত বার,
মইলেম হইলেম গো জননী॥
এবার দেখে কালীর ঘোর তর্জ,

(১) কেটে—কাটিয়া, অতিবাহিত হইয়া।
(২) এটে—দৃঢ়রূপে। (৩) খাটি—ঠিক, নিশ্চয়।
(৪) ছয়টী বন্ধু—কাম ক্রোধাদি ষড়্রিপু।

(১) বেহুঁসারি—অসতর্ক।

মা আতঙ্ক হয় প্রাণে;
হইল সন তের শ নয় সনে,
ঝঞ্ঝা বৃষ্টি স্থানে স্থানে,
কপাল গুণে ভয় করি তাই মনে;
ঢাকা পোস্তগোলা, নাঙ্গল বন্ধ, নাশিলা মা ঝড়ে,
উনপঞ্চাশ বায়ুর জোড়ে,
মা, মাগো, ব্রহ্মপুত্র তীর্থবাসী,
আর যত মা প্রবাসবাসী,
মইল (১) কত রাশি রাশি,
তারা ঘরের চাপায় পইড়ে।
কারো হাত ভেইঙ্গাছে, (২) শির কাইটাছে,
কেউ হইয়াছে খোড়া;
এখন কারো নাই মা ঘরের চিহ্ন,
উচ্ছিন্ন বৃক্ষ লতা।
আমি কার কাছে যাই, কারে জানাই
আমার দুঃখের কথা॥

---

(২)

বাজল রাই বৈলে শ্যামের বাঁশী পূর্ণ শশীতে,
শুইনে সে ধ্বনি, রঙ্গেতে রাই রঙ্গিনী,
উদয় হৈল রাসেতে।
রাসেশ্বরী রাই রাসে দেখে রাসেশ্বর,
ভাবে ভাবান্তর;
মন জানিতে বলে কপট কথায় নটবর,
তুমি রাধে রাজকুমারী, অতি গভীরা সর্ব্বরী;
গৃহে যাও গো রাজ কুমারী,
আমি ধরিতে মোর কমল কর।
তখন শ্রীকৃষ্ণের নিদয় বাক্য শুনতে পেয়ে,
কৃষ্ণ প্রেমেতে, কৃষ্ণের প্রতি অমনি কেন্দে বলে,
নাম ধৈরে বাজালে বাঁশী, তাইতে এ দাসী বনে আসি,
নিশাকালে।
যেমন তাপিত চাতকিনী,
আমি দুঃখিনী হে তেমনি প্রায়,
এইসেছি প্রেম পিপাসায়,
সে আশা বঞ্চিত কৈরে,
যেতে কও আমায় ফিরে;
কি দোষে এ দাসীরে বন্ধু নিদয় হৈলে॥

কি জন্যে শ্যাম আমায় বিদায় দিলে?
মধুর বংশীরব যখম পশে শ্রবণে,
রইতে পারিনে, মন প্রাণ ধইরে টানে;
লজ্জাধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়ে,
কলঙ্কের হার গলে দিয়ে,
কুলের ঘরে কপাট দিয়ে,
আমি ধেয়ে আসি বিপিনে;
তোমায় দরশনে, যত কষ্ট পথশ্রমে,
একবার দাঁড়াইলে তোমার বামে,
আমি যাই তাই ভুইলে॥
নাম ধ'রে বাজালে বাঁশী,
তাইতে এ দাসী বনে আসি নিশা কালে॥

বড় সাধ কৈরে আজ বন্ধু হে, এলেম বিপিনে,
এলেম বিপিনে,
তোমার চরণ ভিন্ন অন্য জানিনে;
বড় আশা আমার ছিল হে মনে,
যামিনী জাগিব প্রেম আলাপনে,
মনের আশা না পূরিতে,
বল গৃহে যেতে,
প্রাণ বেন্ধেছ কি পাষাণে॥

---

(৩)

বল্লে, (১) অবলার মন জানিতে কর্ল্লে (২) ছলনা।

---

(১) মইল—মরিল। (২) ভেইঙ্গাছে—ভাঙ্গিয়াছে।

(১) বল্লে—বলিলে। (২) কর্ল্লে—করিলে।

তোমার কথা শুইনে, (১) জলে মরি মনাগুণে,
অবোধ মন প্রবোধ মানে না।
তোমার চরণ ভিন্ন, দাসীর মনে অন্ত নয়,
তুমি ধর্ম্মময়,
অন্তর্য্যামী জান মনের কথা সমুদয়।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, কৃষ্ণরূপ যে নেত্রে দেখে;
বিচ্ছেদের বাণ হানি বক্ষে,
তার কি মন পরীক্ষা কর্ত্তে হয়।
দিলাম মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব ধন শ্রীচরণে;
তুমি বিহনে কি ধন নিয়ে, আমি গৃহেতে যাই॥
ছাড় বন্ধু কপটতা, তোমার মনের কথা বুঝেছি কানাই।
তুমি জগতের মনোরঞ্জন, জগতজীবন হে শ্যাম;
জানি সব ;
তুমি কৃষ্ণ জগত বল্লভ ;
আমা হইতে অধিকা, হবে কোন সুরসিকা,
বুঝি সে প্রাণাধিকা,
হায়! রাসে আসে নাই॥

বুঝেছি হে শ্যাম তোমায় বল্‌ব কি তাই॥
দিনমণির আছে বহু পদ্মিনী,
আছে পদ্মিনীর জানি, জানি মাত্র একা তার দিনমণি ;
তুমি আমার মনান্বিত, (২) কেহ নাই আর তোমার মত,
আমার মত কত শত, আছে তোমার মনমোহিনী।
তুমি জগতের ভালবাসা কালশশী
তোমায় কত আর ভাল বাসি;
আমি দুঃখিনী রাই।
ছাড় বন্ধু কপটতা,
তোমার মনের কথা বুঝেছি ত্রিভঙ্গ কানাই॥

তুমি ছল কৈরে (৩) অবলারে ভুলাও কটাক্ষে,
ভুলাও কটাক্ষে,
শেষে সময় পেয়ে হাসাও বিপক্ষে ;
বাঁশীর গানে নিয়ে যমুনার ঘাটে,
বসন ভূষণ সকল নিয়ে যাও লুটে;
বন্ধু, তোমার প্রেমের আশ,
যে করে বিশ্বাস,
বিচ্ছেদের বাণ হান তার বক্ষে॥

---

(৪)

একদিন নিশিতে নিধুবনে বিপিনবিহারী,
কর্লে অভিপ্রায়, প্রেমময়ীর প্রেমের দায়,
নইদে (১) হ'ব দণ্ডধারী।
রসময়ী রাই থেকে ত্রিভঙ্গের শয্যায়;
স্বপ্নে দেখ্‌তে পায়,
শ্যাম ত্রিভঙ্গ, হবে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ায়।
চেতন হইয়ে নিশিকালে,
কমলশ্যামের কোমল কোলে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ; বইলে, (২)
অম্নি নয়ন জলে ভেসে যায়।
তখন ধৈর্য্যময়ীর অধৈর্য্য প্রেমনেত্রে, হেইরে, (৩)
অম্নি বেণুধর (৪) বিনয় কইরে,
তখন রাইকে বলে॥
আজ কেন গো কান্দ প্রিয়ে,
দেখ হস্ত দিয়ে
আমি তোমার বক্ষস্থলে।
তুমি প্রাণের প্রাণ, অঙ্গের আধার,
প্রেমে বাঁধা গো রাই অনিবার,
হায়! তুমি প্রেমের মূলাধার ;
সাক্ষাতে আছি ধরা, পলকে হইনে হারা,
তবে কি দুঃখে চক্ষে ধারা, কি ধন হারাইলে॥

---

(১) শুইনে—শুনিয়া। (২) মনান্বিত—মনের মত। (৩) কৈরে—করিয়া।

(১) নইদে—নদীয়ায়। (২) বইলে—বলিয়া। (৩) হেইরে—হেরিয়া, দেখিয়া। (৪) বেণুধর - শ্রীকৃষ্ণ।

ভুলি নাই রাই, তোমার এ গকুলে।
আমি তোমার জন্তে ব্রজ গোপীর শত্রু হই,
নন্দের বাধা বই,
স্বপনে রাই জানি আমি সদায় তোমারই ;
মাধুর্য্য প্রেম কর্জ্জ কৈরে, প্রেম ঋণেতে ঋণী হইয়ে,
স্বহস্তে খত লিখে দিয়ে,
তোমার দাস হৈয়ে চরণে রই।
তোমার শ্রীচরণ ভিন্ন আমি জানিনে রাই,
গিয়ে বিপিনে বাঁশী বাজাই,
জয় জয় রাধা বইলে।
আজ কেন কান্দ প্রিয়ে, দেখ হস্ত দিয়ে;
আমি তোমার বক্ষস্থলে॥

তোমার ভাব দেখে গো ভাবিনি,
ভেবে বাঁচিনে, ভেবে বাঁচিনে ;
তোমার মনের দুঃখ ধনি বুঝিনে।
চন্দ্রাননেতে দেখি হাস্য বিহীন,
কি দুঃখেতে তোমার শ্রীমুখ মলিন,
যেমন দুঃখেতে মলিন থাকে প্রতিদিন,
কুমুদিনী ইন্দু বিহনে॥

---

(৫)
দেখ্‌লে স্বপনে নৈদে হ'ব আমি গৌরাঙ্গ,
ছেড়ে যাবে বৈলে, তাইতে দুঃখ হৃদ্‌কমলে,
উঠ্‌লো ও দুঃখের তরঙ্গ।
কেন্দো নাগো রাই, ঋণে বাঁধা হই তোমার,
শোধ হ'লনা আর,
তোমার জন্তে আমি জন্ম নিব পুনর্ব্বার;
তিন বাঞ্ছা অভিলাষে, উদয় হ'য়ে শচীর বাসে,
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে,
আমি শুধিব রাই প্রেমধার;
কাল স্বরূপেতে শোধ হল না প্রেম-ঋণ,
নিয়ে ডোর কপীন,
মন বাঞ্ছা আমার পুরাইব॥—
যে ভাব দেখ্‌লে স্বপ্নাবেশে, ব্রজলীলায় শেষে,
এ বেশে নদীয়ায় যাব।
রেখে অন্তরে কাল অঙ্গ, হ'ব বাহিরে গো গৌরাঙ্গ,
হায় করে নিয়ে করঙ্গ,
চাঁচর কেশ মুড়াইয়ে, প্রেম উদাসী হ'য়ে,
হরিনাম বিতরিয়ে,
জীবকে উদ্ধারিব।—

মনের দুঃখ রাই কারে জানাইব॥
আমি স্বহস্তে এ খত করেছি লিখন,
সদা সর্ব্বক্ষণ প্রেমে ভুলে রাধে তোমার বুঝি নাই স্মরণ;
দেখ সে খত দৃষ্টি করি, খতের নায়ক শ্রীহরি,
ইসাদি নবমঞ্জরী,
প্যারি তুমি প্রেমের মহাজন ;
খতের মুদ্দৎ দিয়াছি কলিযুগ ভ'রে,
কাঙ্গাল বেশেতে ভিক্ষা ক'রে,
ঋণে মুক্ত হ'ব।
যে ভাব দেখ্‌লে স্বপ্নাবেশে,
ব্রজলীলার শেষে এ বেশে নদীয়ায় যাব॥

ফল্‌বে গর্গ মুনির বাক্য গো এ ঋণের জন্ত,
হ'ব কলিযুগেতে গৌরবর্ণ,
গিয়ে আমি সুরধনীর (১) তীরে ;
ভক্তবৃন্দ সকল সঙ্গেতে কৈরে,
নিয়ে রাধা কান্তি অঙ্গে,
রাধা নাম প্রসঙ্গে,
তবে হবে বাসনা পূর্ণ।

---

(১) সুরধনী—সুরধুনী।

বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ

পরিশিষ্ট ভাগ

১। যোগ কালন্দর।

পুথিতে ইহার কোন নাম নাই। আলোচ্য বিষয় দেখিয়া বুঝা যায়, ইহা "যোগ কালন্দর" ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রতিলিপিতে পুথিখানি শেষ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যেও অনেক স্থল বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অনেক অশুদ্ধি আছে। পত্র-সংখ্যা ১২। দুই পিঠে লেখা। আটপেজী আকারের কাগজের বহির আকার। ১৮৪৬ ইংরেজী অব্দে লেখা। লিপিকরের নাম শ্রীমেকরাজ বরকন্দাজ, সাং গোপালপাড়া, জিলা চট্টগ্রাম।

ইহা সুপ্রসিদ্ধ কানু ফকির ওরফে আলি রাজার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু পুথিতে কোথাও তাঁহার নামের উল্লেখ নাই।

ইহা একখানি দরবেশী পুথি। কানু ফকিরের মত দরবেশের রচিত হওয়াই সম্ভব। এই সাধু পুরুষ চট্টগ্রাম—বাঁশখালী থানার অন্তর্গত ওশখাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বংশ আছে। তাঁহার রচিত অনেক বৈষ্ণব পদ ও দরবেশী সঙ্গীত পাওয়া গিয়াছে।

আরম্ভ :—

শ্রীযুত আল্লাহ গনি।
বিচমিল্লা রমান রহিম।
আল্লা হো মোহাম্মদ নবি।
জাহার হুকুমে হৈল ত্রিভুবন বানি।
নাছুত মোকাম জীন এ তিন তিহরি।
আজ্রাইল ফিরিস্তা তথা রাছন্ত পহরি॥ ইত্যাদি।

শেষ:—

চারি ডণ্ড থাকিতে ছাএয়া পদতলে জাইব।
এক পহর থাকিতে ছাএআ দক্ষিণে দেখিব॥
জেদিগে পর্দ্দিপ[১] জলে সেই দিগে ছাএআ।
সেইক্ষণে নিজ দেহ ছাড়ি জাইব কাএআ॥

বলা বাহুল্য, ইহা মোহাম্মদীয় মতে যোগ-সাধন-গ্রন্থ। সম্ভবতঃ,সুপ্রসিদ্ধ তাপস হজরত আবু আলি কলিন্দর সাহেবের অবলম্বিত যোগমার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার এরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে।

১। পর্দ্দিপ=প্রদীপ।

২। যোগ কালন্দর।

ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত পুঁথিই বটে। ইহার আরম্ভ আছে, কিন্তু শেষ নাই। তারিখাদিও অজ্ঞাত। ভণিতা পাওয়া যায় নাই।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণামো করি প্রভু নিরঞ্জন।
তার পাছে প্রণামি এ নবির চরণ ॥
করিম রহিম আল্লা পরওয়ার দেগার।
আঠার হাজার আলাম স্বজন জাহার ॥
ভুবন জানিয়া জান নবি বেয়াকুল।
বহুল ভাবনা কৈলা আল্লার রছুল ॥ ইত্যাদি ॥

৩। যোগ কালন্দর।

ইহাও পূর্ব্বোক্ত পুথি ; আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২—১১ পাত বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। কালিদাস নন্দীর হস্তলিপি ও ১২১৪।১৫ মঘীর লিখিত। ভণিতা পাওয়া যায় নাই।

২য় পাতের আরম্ভ :—

সে আনল যদি সে তথাতে নিবি জাএ।
জ্বালিবা আনল যত্নে জান সর্ব্বথাএ ॥
সরির অমর হএ সে আনল হোতে।
সাবধান আনল তেজে জেন মতে ॥ ইত্যাদি ॥

এই যোগ কালন্দর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ৩০৭ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

৪। সপ্ত পয়কর।

মহাকবি সৈয়দ আলাওল রচিত। আদ্যন্ত খণ্ডিত। প্রথমে কয়েক পাত নাই,—শেষ ১১০ পাত পর্য্যন্ত বিদ্যমান ; লিপিকর কালিদাস নন্দী। তারিখ নাই। দুই পৃষ্ঠে লিখিত। আরম্ভ :—

রানন্দে পাটেত বসি নির্প বহরাম।
অবধি নিকটে পুরাইতে মনস্কাম ॥
সপ্ত পয়ার সপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া জে পটে।
অবিরথ সেই মত মনান্তরে ঘটে ॥

ইহা একখানি বৃহৎ ও সুন্দর গ্রন্থ। পারস্য কবি মহাকবি নিজামীর 'হপ্ত পয়করের' অনুবাদ।

৫। সপ্ত পয়কর।

ইহাও পূর্ব্বোক্ত পুথি। আদ্যন্ত আছে। শেষপত্র-সংখ্যা ১০৪। উভয় পিঠে লেখা। বহির আকার। ১২০৫ মঘীর লেখা। শেষ এইরূপ :—

মূর্খ হীন পাপকারী শক্তি উক্তিহীন।
ভরসা প্রভুর পদে হৈতে মন লীন ॥
এবে কিছু কহি সুন নির্ণয় বিচার।
ধীর সবে করিবেক তাহার প্রচার ॥
মুছলমানী মন কাহি সুন গুণিগণ।
চন্দ্রযোগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন ॥ ইত্যাদি ॥

এই 'সপ্ত পয়কর' সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ১২১ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

৬। মুক্তাল হোসেন।

মোহাম্মদ খাঁর রচিত। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১০—৭৬ পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। ১২১৭ মঘীর লেখা। বৃহৎ আকার। উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ৯৯, ২৪১, ২৭৯ ও ২৮০ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

৭। মৃগলুব্ধ।

শিব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনচ্ছলে ইহাতে এক ব্যাধ ও মৃগের গল্প বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিজ রতিদেব কৃত এই নামের আর এক-খানি পুঁথি আছে। এইখানি রামরাজার রচিত।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। মোট ১৩ পাত আছে। শেষ নাই। দোভাজ করা কাগজ। এক পিঠে লেখা। তারিখ ও লিপি-করের নাম নাই। অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। প্রায় ২০০ বর্ষের প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ :—নম গণেসায়।

কৈলাস শিখরে হর পার্ব্বতী সহিত।
বসিয়া থাকিতে হর * * ॥
নানান উত্তম কথা প্রসঙ্গ করিআ।
জিজ্ঞাসিলা পার্ব্বতি শঙ্কর প্রণমিআ ॥ ইত্যাদি ॥

ভণিতা—

শঙ্কর কিঙ্কর সেই রাম রাজে গাএ।
নরক লৈক্ষণ গাই দ্বিতিয় অধ্যায় ॥

ইহার বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে"—১৪৯ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি পুথিখানি আমার সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। রাগনামা।

ইহা রাগ তালের পুঁথি। আদ্যন্ত খণ্ডিত। ৩—৪৪ পত্রগুলি বর্ত্তমান। তারিখ ও লিপিকরের নামাদি নাই। নানা কবির পদ ও গান আছে। অধিকাংশ পদই রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক। সে সকল পদ ইতিপূর্ব্বে নানা পত্রিকায় প্রকাশ করা গিয়াছে। এজন্য এখানে আর উদ্ধৃত করিলাম না। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ২, ১১২, ১৫৭ ১৭৪, ২১৫ ও ২৯৯ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

৯। লক্ষ্মণ-শক্তিশেল।

কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে। মোট পত্রসংখ্যা ২৭। দুই পিঠে লেখা। ১৭৪৪ শাকের লিখিত। পূর্ব্বে (আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ৪৫ সংখ্যক পুথিতে) এরূপ একখানি পুথির সমালোচনা করা গিয়াছে। এজন্য এখানে আর কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না।

১০। সত্যপীর পাঁচালী।

আরম্ভ :—ওঁ নমো গণেশায়।

প্রথমে প্রভুর নাম মনেতে ভাবিয়া।
জার নাম লোলে জাএ সমন তরিয়া ॥
প্রণমহ সত্যপীর পুরুস আকার।
জার নাম লোলে জএ অকিল সংসার ॥ ইত্যাদি

শেষ :—

রঙ্গুতের অর্ঘর্য্য স্থুবর্ণের জিন।
আসিবেন সত্য পির ছিম্বির জে দিন ॥
আসিবেন সত্য পীর বোসিবেন খাটে।
সৈত্যপিরের ছিম্বি হাতে হাতে বাটে ॥

"ইতি সত্যপীর পাঞ্চালী সমাপ্ত। সন ১৭৯৮৬, ২ পৌষ শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্ম্মা স্বাক্ষর।" পত্রসংখ্যা—২৯। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠে ৪ পংক্তি। ক্ষুদ্র আকার। ভণিতা নাই। ইহার বিবরণ আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ৪৩৮ ও ৪৬৮ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

১১। নিকট মঙ্গল-চণ্ডিকার পাঁচালী।

আরম্ভ :—

ওঁ নমো গনেশায়ঃ। সত্যঃসত্যো নমঃ।
প্রণমোহ গণপতি বিঘ্ন বিনাসন।
প্রণতি পূর্ব্বকে বন্দম সিবাদি চরন ॥
কায়মনে চিত্তে বন্দম প্রভু নারায়ন।
উৎপতি প্রলয় শ্রীষ্টি জাহার কারণ ॥ ইত্যাদি।

শেষ ও ভণিতাঃ—

জার স্নেহে মনকাম সিদ্ধি হএ তার।
পুস্তক বিসাল হএ ন লেখিল য়ার ॥
নিকট মঙ্গল চণ্ডি বন্দিয়া সিরেতে।
পাঞ্চালি রচিয়া কএ দ্বিজ রঘুনাথে ॥

ইতি নিকট মঙ্গলচণ্ডিকা পাঞ্চালি সমাপ্ত। ইতি সন ১২১২ মঘি তারিক মঙ্গলবার।

পত্র সংখ্যা—৪২। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি। ক্ষুদ্র আকার। লিপিকরের নাম ধাম নাই।

১০। লোলে = লৈলে। অকিল = অখিল।

আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" সমালোচিত ২২ সংখ্যক পুথি "মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী" ও ইহা অভিন্ন পুথি।

১২। বিদ্যাসুন্দর।

এখানি ভারতচন্দ্র রায় কৃত বিদ্যাসুন্দর। শেষাংশ খণ্ডিত। মোট কত পত্র আছে গণিয়া দেখি নাই। লিপিকরের নাম ও তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—

নমো গনেসাঅ নমো চণ্ডিকাঐ নমঃ।
কালিহ মোহাকালি কালিকা পরমেশ্বরি।
সর্ব্ব কাজ্য প্রিঅ দেবি নারাঅনি নমোস্তুতে॥
উর্দ্ধাসনে চাহি বন্দোম জননি গো মাতা।
বিধিএ বলিতে নারে জার গুণগাথা॥
কালিকা জননী বন্দোম শিবের ঘরিনী।
মোহামাআ ভিমকাআ হরি আরোহিণি॥ ইত্যাদি॥

আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে"—২০০ সংখ্যক পুথিতে এরূপ আর একখানি পুথি সমালোচিত হইয়াছে।

১৩। মল্লিকার সওয়াল।

এই পুথি ও "মল্লিকার হাজার সওয়াল" একই পুথি। রচয়িতাও সেই সের বাজ নামক কবি। ইহার প্রথম তিনটি পত্র খণ্ডিত। ৪—৬৭ পত্র বর্ত্তমান। বহির আকার—১২ × ৯ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ।

৪র্থ পত্রের আরম্ভ :—

* * * *

রচিল পাঞ্চালি ভাসে কিতাব কথন।
ফর্ক্যর নামা নামে এক কিতাব আছিল।
পীরের প্রভাবে কিছু প্রচার করিল॥
সচিপতি রাজ্য হস্তে সে রাজ্য বাখানি।
রাজ্য হস্তে ডাঙ্গর সে রুম রাজ্য খানি॥
পুণ্যবন্ত আছিলেক সেই নৃপবর।
আছিলেক সেই রাজ্যে হইয়া ঈশ্বর॥
তাহার দুহিতা বালা রূপে অনুপাম।
মল্লিকা যে ভানু ছিল সে কন্যার নাম॥ ইত্যাদি॥

শেষ :—

জাহার আছিল জান মাটীতে সয়ন।
সেইজন জাএ নিদ্রা খাট সিংহাসন॥
ললাটের লিখন জান না জাএ খণ্ডন।
সেই সে আবদুল্লা হৈল রুমের রাজন॥
ইতি মল্লিকার ছওয়াল সমাপ্ত।

"লিখিতং শ্রীসএথ সরফদ্দীন পীং আব্দিন মাহাম্মদ মোল্লা পরগনে সুন্দীপ সাং হারখীল হক মালীক শ্রীলাল মাহাম্মদ পীং মাহাম্মদ হোছএন পরগনে নেজামপুর সাং মাএনি জিলে চাটী-গ্রাম। ইতি সন ১২৩২ তারিখ ১১ কার্ত্তিক মঘী সন ১১৮৭ মাহে।"

১৪। মল্লিকার সওয়াল।

এখানিও পূর্ব্বোক্ত সের বাজের রচিত এবং আদ্যন্ত খণ্ডিত। রয়েল আটপেজি আকারের কাগজের বহি। ৪—৫২ পত্র বিদ্যমান। প্রতিলিপির তারিখ ও লেখকের নাম-ধাম নাই। প্রতিলিপির বয়স একশত বৎসরের কম নহে।

শেষঃ—

কলিকালের নারী সব হৈব হিআ বলি।
পুরুষ ঘরে থুই নিকলিব নারী॥
পঞ্চাশ নারীএ এক পুরুষ বরিব।
ভয় পাই সে পুরুষ কাকে না চাহিব॥

এই "মল্লিকার সওয়ালের" বিশেষ বৃত্তান্ত আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ৩০৫ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

১৫। ফকারনামা।

আমার প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণের" ২য় খণ্ডে ৫২৫ সংখ্যক পুথিতে "ফক্কর নামা" নামক একখানি খণ্ডিত পুথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। এইখানি ঠিক সেই পুথিই বটে। উক্ত বিবরণের ১ম খণ্ডে ৩০৫ সংখ্যক পুথিতে "মল্লিকার হাজার সওয়াল" নামক আর একখানি পুথির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, সেই পুথি আর এই ফকারনামা অভিন্ন জিনিস।

আলোচ্য প্রতিলিপিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১ম পাতা নাই। শেষে ৭৪ পাতা পর্য্যন্ত আছে। প্রাচীন সাদা বালি কাগজের বহির আকার। ১৫ × ১২ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ। দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম শ্রীজিন্নতআলি—মিচকিন। সাকিন অজ্ঞাত। সন ১২০৮ মঘীর লেখা।

২য় পত্রের আরম্ভ :—

জথ পএগাম্বর আর জথ নবিগণ।
সহস্র প্রণাম করি সে সব চরণ॥
মুক্ক চারি ফিরিস্তারে করিএ ছালাম।

কেরামিন কাতে বিন করিএ প্রণাম ॥

* * *
* * *

জথেক ওলমা আর আলিম সোভার।
খোন্দকার আলিম প্রনামি বারে বার ॥
বদরদ্দিন হএ জান সে পিরের নাম।
সহস্রে সহস্রে জান সে পদে প্রণাম ॥
আখেরে তপন তাপে হইলে বিকল।
সহায় হইআ নিবা বৈরাগের তল॥
এথেক জানিঅ পীর না হএ অসার।
গুরুপীর হস্তে জান মুরসিদ জে সার ॥
জনক জননী হস্তে মুরসিদ জে বেশ।
জাহার প্রসাদে পাএ পন্থের উদ্দেশ ॥

* * *
* * *

গুরু মৈদ্ধে আগে কহি শরিপ হাচন।
জনক জননী আর জথ গুনিগণ ॥

ভণিতা :—হিন সের বাজে কহে সবানের সাক্ষাতে।
রচিলুন পঞ্চালিকা শোবানে বুজিতে ॥
এবে আমি কহি জেন শুন দিআ মন।
রচিবাম পঞ্চালিকা কিতাব লিখন ॥
ফক্কার নামা করি এক কিতাব আছএ।
কহিমু সে সব কথা জানিঅ নিশ্চএ ॥
সকলে না বুজে জান ফারশি বচন।
কহিমু বাঙ্গলা ভাশে বাঙ্গলা কথন ॥

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত রতনপুরা মধ্যইংরেজী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাগর আলী সাহেব পুথিখানি আমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন।

১৬। ইমাম চুরি।

এই প্রতিলিপি খানি আদ্যন্ত খণ্ডিত। ২—১৬ পত্র বিদ্যমান। বহির আকার। ১২×১০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ।

শেষ :—

সির তুলি দেখে মাএ পুত্র দুই জন।
কথাএ আছিলা পুত্র পুছএ তখন ॥
নানা * সঙ্গে গিয়াছিলাম নমাজ পড়িতে।
দরিআর কূলে গেলাম তামসা চাহিতে ॥
আলাম সাধু ছিল জান এআছিন সহরে।
বানিজ্য করিতে গেল মানিক্য সহরে ॥
বনিজ করিআ সাধু ফিরি আইতে ঘর।
ডিঙ্গাতে বসিআ আমা দেখিল নজর ॥
চুরি করি লই গেল আমি দুই জন।
মুছার বাসরে বেচি লই গেল ধন ॥

* * *
* *

তবে বাবা গিআছিল এআছিন সহরে।
আমারা আনিআ দিছে তোমার গোচরে ॥

* * *
* * *

দুইপুত্র নিজস্থানে আসিলেক জবে।
জার পুত্র তার ঘরে মিলাইল তবে ॥

ভণিতা পাওয়া যায় নাই। প্রতিলিপির তারিখও নাই আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" সমালোচিত ৪০৯ সংখ্যক পুথি ও ইহা সম্ভবতঃ অভিন্ন পুথি।

১৭। ইমাম চুরি।

ক্ষুদ্র পুথি। ৩—১০ পাতা বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। লিপিকাল অজ্ঞাত। লেখকের নাম শ্রীনাগন ভং (ভট্টাচার্য্য)। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ চরণ আছে।

৩য় পত্রের আরম্ভ :—

* * যন্ত্র পাতাল ভুবন।
নুর হোতে মহা প্রভু করিলা সৃজন ॥
তবে প্রভু বোলে শুন নুর মোহাম্মদ।
চারিদিগে করি য়াইস করি ভেদাভেদ ॥

শেষ :—

প্রভু বোলে শুন জিব্রাইল কহিএ তোহ্মারে।
ফাতেমার হুঙ্কারে য়ামার সিংহাসন লড়ে ॥
ঘরে গিয়া কহ তুহ্মি ইমাম আলীর তরে।

* * *

হাছন হোছন মোর আল্লারে হাএ (?)।
কার জননী বসি কান্দে মদিনাএ ॥

---

* নানা—মাতামহ।

ভণিতা :—

পণ্ডিত সভায় পদে শিরেত জে মানি।

দ্বিজ রামতনু কহে আলীর কাহিনী॥

আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে"—৩০০ সংখ্যক পুথিতে ইহার বিববণ মুদ্রাকর প্রমাদে কতকটা উলট পালট ভাবে ছাপা হইয়া গিয়াছে।

পাঠকগণ দেখিবেন, কবি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও ইমাম হজরত হাছন হোছন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই! সেকালের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিরূপ উদার সদ্ভাব বিদ্যমান ছিল, এই ক্ষুদ্র পুথি তাহার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

১৮। রাসোৎসব-বিধিঃ।

সংস্কৃত পুঁথি। ক্ষুদ্র আকার। পত্র সংখ্যা ১৮। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি। তারিখ নাই। বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ :—/৭ ওঁ নমো গণেশায়ঃ।

অথ রাসোৎসববিধিঃ।

তদাহ ব্রহ্মপুরাণে।

প্রদোষসময়েত্যর্চ্চ্য কার্ত্তিকাং মধুসুদনং।

অষ্টশক্তি সমাযুক্তং অষ্টমূর্ত্তিসমন্বিতং॥

শেষ :—অষ্টমুক্তি অষ্টশক্তি সহিত শ্রীমধুসুদন পূজা পূর্ব্বক

হরে রাশোৎসব কর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থ মিত্যাদি। অছিদ্রং

কুর্য্যাৎভোজমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ।

ইতি হরে রাশোৎসববিধি সমাপ্তঃ। শ্রীঅখিলচন্দ্র স্বাক্ষর মিদং পুস্তিকেয়ং।

১৯। শ্যামা-স্তোত্রম্।

সংস্কৃত পুঁথি। পত্র সংখ্যা ১২। দুই পিঠে লেখা। প্রতিপৃষ্ঠায় দুই পংক্তি। আধুনিক কাগজ। বড় বেশী দিনের লেখা নহে।

শেষ :— কারাগারং কলয়তিচন্দ্রং কেলিকলয়াচিরং জিবন্মুক্তেঃ

সভবতি ভক্তঃ প্রতি জন্ম॥ ২২

ইতি মহাকাল বিরচিতং শ্যামাস্তোত্রং সমাপ্তং। ইতি-সন ১২৩২ তাং ৭ জৈষ্ঠ। শ্রীঅখিলচন্দ্র শর্ম্মনঃ পাঠত্বং।

২০। গ্রহ-পুরশ্চরণ-পদ্ধতিঃ।

সংস্কৃত পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৮। দুই পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পংক্তি। আধুনিক কাগজ।

আরম্ভ :—/৭ ওঁগ্রহেভ্যো নমঃ। নম স্বরস্বত্যৈ নমঃ।

প্রণম্য নবরণ্যাদীন শুভাশুভ ফল প্রদান

শ্রীমতা কাশীনাথেন পুরশ্চরণ মুচ্যতে॥

অথচ পুরশ্চরণবিধিঃ। ইত্যাদি।

শেষঃ—ইতি বিষ্ণু ধর্ম্মাত্তরীয়াৎ গ্রহান বিসর্জ্জয়েৎ

দক্ষিণা চ প্রদাতব্যা গ্রহানাঞ্চ বিসর্জ্জনং সমাপ্তে

জাপকং সুবর্ণ বস্ত্রাদিনা পরিতোষয়েৎ।

ইতি গ্রহ পুরচ্চরণ পদ্ধতিঃ সমাপ্ত। ইতি সন

১২৩৩ মথি তাংরিখ ১০ জৈষ্ঠ। শ্রীঅখিল চন্দ্র

শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং পুস্তিকেয়ং।

২১। বাস্তু পূজা।

সংস্কৃত পুঁথি। মোট তিনটি পত্র। দুই পিঠে লেখা। শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। কাগজ আধুনিক। তারিখ নাই।

আরম্ভ :—ওঁ নমো গণেশায়ঃ। অথ বাস্তু পুজা।

তত্র প্রথমং সুজ্যার্ঘং দত্বা স্বস্তি বাচন

পূর্ব্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ।

শেষঃ—ঘটজলে জজমানমভিসিঞ্চে দিতি।

দক্ষিণাং দদ্যাৎ বাস্তুপূজা কর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং

গাং বস্ত্র জুগ্ম সুবর্ণং ছিদ্রাব ধারণং।

শ্রী অখিলচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরমিদং পুস্তিকেয়ং।

২২। সুখ রাত্রি লক্ষ্মী-পূজা-বিধিঃ।

ক্ষুদ্র সংস্কৃত পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৪পংক্তি। আধুনিক কাগজ। তারিখ নাই।

আরম্ভঃ—ওঁ নমো গণেশায়ঃ। অথ সুকরাত্রি লক্ষ্মি

পুজা বিধি লিখ্যতে। তত্রোভয় দিনে প্রদোশলাভে

পরদিনে সর্ব্বং কর্ত্তব্যং প্রদোষে পুজয়েৎ

লক্ষ্মিং জথাক্রম।

শেষঃ—ইতি ভবিষ্যৎ পুরাণোক্ত সুখরাত্রি লক্ষ্মিপুজা

সমাপ্তঃ। শ্রীঅখিল চন্দ্র দেব সর্ম্মন
স্বাক্ষরমিদং পুস্তিকেয়ং।

২৩। রুচি-স্তবঃ।

সংস্কৃত পুথি। পত্র সংখ্যা ৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৫পংক্তি। পুরাতন কাগজ।

আরম্ভ—ওঁ নমো গণেশায়ঃ। ওঁ কৃষ্ণায় রুচিরুবাচ
অর্চ্চেতানাম মুর্ক্তানাং পিতৃনাং দীপ্ততেজসাং
নমস্যামি শদাতেসাং ধ্যাস্নিনং দিব্য
চক্ষুসাং। ইত্যাদি।

শেষ—ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে রুচ্য মন্বান্তরে পিত্রি
বর প্রধানো নাম রুচি স্তবঃ সমাপ্ত॥
শ্রীমাগন শর্ম্মন স্বায়াক্ষরং শ্রী সাছিরাম শর্ম্মণ
পাঠত্বং। শ্রীগুরুচরণে মম ভক্তিরস্তু। ইতি
সন১২০৮ মঘি তারিখ ২৪ ভাদ্রা বোজ বার।

২৪। আখ্যাত-বৃত্তিঃ।

সংস্কৃত ব্যাকরণ। পত্রসংখ্যা ২৩। দুই পিঠে লেখা। প্রাচীন কাগজ। প্রতিপৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি। তারিখাদি নাই।

শেষঃ—ইত্যাখ্যাতে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

২৫। সংস্কৃত ব্যাকরণ।

নাম নাই। ক্ষুদ্র আকার, পত্র সংখ্যা ২৯। উভয় পিঠে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠে ৪ পংক্তি। তারিখাদি নাই। বোধ হয় অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ—ওঁ নমো গণেশায়। ধাতুবিভক্তিবর্জ্জমর্থ বল্লিঙ্গং।
অর্থোহবিধেয়ং। ধাতুবিভক্তিবজ্জমর্থ বল্লিঙ্গ সজ্ঞস্তবতি
বৃক্ষঃ কৃণ্ডঃ কুমারী তীর্থঃ রাজপুরুষঃ॥ ইত্যাদি।

২৬। অনন্তব্রত-বিধিঃ।

সংস্কৃত পুথি। ক্ষুদ্র আকার। পত্রসংখ্যা—১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৪পংক্তি। উভয় পৃষ্ঠায় লেখা।

আরম্ভ :—ওঁ নমো গনেসায়।
অথানন্ত ব্রত বিধি লিখ্যতে।
তত্র প্রথমং * সূর্য্যার্ঘং দত্বা স্বস্তি বাচন পুর্ব্বক
* কুর্য্যাৎ * ভাদ্রে মাসি সুক্ল পক্ষে চতুর্দস্যা
স্তিথৌ ইত্যাদি।

শেষ নাই। লিপিকারকের নাম ও তারিখাদিও নাই। স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২৭। যোটক শুদ্ধিঃ।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র। রক্ষণার্থে এখানে সবটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—অথ জোটকশুদ্ধিঃ।

অকচটাতপয়শা
ক্রমে কহিবে বর্গবিশেষাঃ
পক্ষী বিড়াল সিংহশূনা
অহিমুষিক গজমেষাঃ
স্পষ্ট মাহ
অআদি পক্ষিঃ
ক বর্গ বিড়াল
চ বর্গ সিংহ
ট বর্গ কুকুর
ত বর্গ সর্পঃ
প বর্গ মূষিক
য র ল ব হস্তী
শ ষ স হ ভেড়া
পক্ষিয়ে নাগ সংহারে
বনবিড়ালে মুষিক মারে
সিংহে গজে নাহিক মেলা
কুকুরে পাইলে মারে ভেড়া
অথজাতি নির্ণয়ঃ।
কার্ক মীনালয়ো বিপ্রাঃ
ক্ষত্রাঃ সিংহ তুলা হযা
হযো ধনুরিত্যর্থঃ
বৈশ্যা যুগ্মাজ কুম্ভাশ্ব
শূদ্রা বৃষ মৃগাঙ্গনা
কর্কট মীন বিছা ব্রাহ্মণ
সিংহ তুলা ধনুঃ ক্ষেত্রিঃ
মিথুন মেষ কুম্ভ বৈশ্যঃ
বৃষমকর কন্যা শূদ্রঃ
অথ প্রশ্নঃ।
তিথি প্রহর সংযুক্তং তারকা বারমিশ্রিতং
মুনিভিশ্চ হরেদ্ভাগং শেষে কার্য্যশুভাশুভং

একে তত্র সংস্থানং দ্বিতীয়ে পথি গচ্ছতি
তৃতীয়ে চার্দ্ধ মার্গঞ্চ চতুর্থে গ্রামমাদিশেৎ
পঞ্চমে পুনরায়াতি ষষ্ঠে ব্যাধি সমাকুলং
সপ্তমে চ ভবেন্মৃত্যুঃ পান্থানাং প্রশ্নলক্ষণং

অথ বেধঃ।

অনল বৈষ্ণবে বেধ ব্রহ্মা শূন্যে গণি
বাণ একৈকেশে ঋতু নখে সাহু উন্নইসে জানি
বসু শক্রে ফনি মৈত্রে দিক পক্ষে মেলা
শিবা চান্দে দিবাকর পুষার সঙ্গে খেলা
কর ছাব্বিশে ভুবন পচিশে সাতি শতভিষা
ধনিষ্টা বিশাখা বেধ সপ্ত শলাকার ভাষা ॥

২৮। তুলাপুরুষ-পদ্ধতিঃ।

ইহা একখানি সংস্কৃত পুথি। সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ মানসিংহ ইহার রচয়িতা। নামেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সূচিত হইতেছে। শেষ পত্র সংখ্যা ৭৩। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। প্রায় ২০×৪ অঙ্গুলি পরিমিত আকারের কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৫ পংক্তি লেখা।

আরম্ভ :—ওঁ নমো গণেশায়।

প্রণম্য গোবিন্দ-পদার-বিন্দং নত্বা
গুরুঞ্চৈব তথা দ্বিজেন্দ্রান্।
ধর্ম্মার্থ-কামাদি-চতুষ্টয়ার্থং প্রকুর্ব্বতে
সদ্বিদূষাং মতেন ॥
বিচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি দান-সাগর-
সংহিতাং।
ক্রিয়তে মানসিংহেন তুলা-পুরুষ-পদ্ধতিঃ।

শেষ :—

ইতি শ্রীযুত-মহারাজ-মানসিংহ-কৃত-তুলা-পুরুষ-পদ্ধতিঃ সমাপ্তা।

বসু-চন্দ্র-মুনীন্দৌ চ শাকে মৃগস্থভাস্করে।
শ্রীতর্কভূষণেনৈব লিখিতেয়ঞ্চ পুস্তিকা ॥
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ ইত্যাদি শ্লোক।
মাঘে মাসি কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাস্তিথাবর্ক
বাসরে থিল্যষ্ট দণ্ড গতে লিখিতা
পুস্তিকা চেষা। শ্রীকালীচরণ দেব
শর্ম্মণা সমাপ্তোঽয়ং গ্রহস্ত ॥

এই পুথিখানি চট্টগ্রাম ফৌজদারী আদালতের মোক্তার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট আছে।

——(০)——

২৯। লোর চন্দ্রানীর পুথি।

কবিবর দৌলত কাজী ইহার রচয়িতা। গ্রন্থের অর্দ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর কাজী সাহেব পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে মহাকবি সৈয়দ আলাওল উহার শেষার্দ্ধ রচনা করিয়া দেন।

ইহার ১ ও ৬—২৬ পাতা বা বারমাসের আরম্ভ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। তার পর খণ্ডিত। সন তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—মিদঙ্গ মাধারি তালা বহুত বাজন।
সহস্র বদনে কৃতি জসস্ত গাহন ॥
গাহিতে গাহিতে বাণী গেল (সুরপুর)।
সুরপতি সুরলোকে সুনিতে মধুর ॥ ইত্যাদি।

৩০। লোর চন্দ্রানীর পুথি।

ইহাও পূর্ব্বোক্ত পুথি। ৩—৩৮ পাতা বর্ত্তমান। শেষে বার মাস বা ঋতু বর্ণনা পর্য্যন্ত আছে। তার পর খণ্ডিত। সন ১২০৫ মঘীর লেখা।

শেষ—

ছাতনে প্রসাদ দিয়া মালিনীকে সন্তোষিয়া
কাজ কহে আপনা ভারতী। ইত্যাদি।

ইহা অতি সুন্দর ও বৃহৎ গ্রন্থ। প্রকাশের সর্ব্বথা উপযুক্ত। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমার "প্রাচীন পুথির বিবরণে" ৭৪, ২৪৩ ও ৫১৭ সংখ্যক পুথিতে দ্রষ্টব্য।

☞ প্রাগুক্ত পুথিগুলির মধ্যে ২ সংখ্যক পুথির মালীক শ্রীযুক্ত আবদুল হাকিম সাকিন জঙ্গল খাইন পোঃ আঃ পটীয়া চট্টগ্রাম, ৩।৪।৬ সংখ্যক পুথিগুলির মালীক ঐ সাকিনের শ্রীযুক্ত আছদ আলী, ৫ সংখ্যক পুথির মালীক ঐ সাকিনের শ্রীযুক্ত ফজলর রহমান চৌধুরী, ৭।৮।৯ সংখ্যক পুথিগুলির মালীক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন আইচ সাং খিলপাড়া পোঃ আঃ আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, ১৩।১৪।১৬ সংখ্যক পুথিগুলির মালীক চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত টেরিআইল গ্রামের জনৈক লোক, ২৯ সংখ্যক পুথির মালীক শ্রীযুক্ত ঠাণ্ডা মিঞা পিতার নাম আনোয়ার আলী সাকিন উজিরপুর পোঃ আঃ পটীয়া চট্টগ্রাম, সংস্কৃত পুথিগুলির মালীক চট্টগ্রাম নয়াপাড়া নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। অবশিষ্ট পুথিগুলি আমার নিকট আছে।

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

চতুর্থ সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণী

(সন ১৩২১)

ভগবানের কৃপায় এবং সুধীজনের সানুগ্রহ সহানুভূতির ফলে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেন্দ্র সৃষ্টি করতঃ মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই এক্ষণে স্বীকার করেন। সেই প্রয়োজনের অনুরোধেই ১৩১৮ সনে ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বিগত চারি বৎসর যাবৎ এই পরিষৎ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত যথাশক্তি মাতৃভাষার সেবা করিয়া আসিতেছে। প্রথম বর্ষে ইহার মোট সভ্য সংখ্যা ৩১ জন ছিল। আলোচ্য চতুর্থ বর্ষে তাহা ৩৮৬ জনে পরিণত হইয়াছে। তন্মধ্যে

আজীবন সভ্য——————৮ জন

সাধারণ ও ছাত্র সভ্য—৩৭৩ "

পরিপোষক——————৪ "

বিশিষ্ট সভ্য——————১ "

মোট—৩৮৬ জন

ইহার মধ্যে—

সহরের সভ্য সংখ্যা——৩১৩ জন

মফস্বলের সভ্য সংখ্যা——৭৩ জন

৩৮৬ জন

বিগত ১৩২০ সন অপেক্ষা আলোচ্য ১৩২১ সনে সহরের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু মফঃস্বলের সভ্য-সংখ্যা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে মফঃস্বলে ভিঃপিঃযোগে পত্রিকা প্রেরিত হইলেই অনেকে তাহা ফেরত দিয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে অনেক মফঃস্বলের সভ্যের নাম আমাদের তালিকা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে। সহরস্থ সভ্যগণের চাঁদা গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক আদায় হইয়াছে। ইহা নিতান্তই সুখের বিষয়। যাঁহাদের নিকট বাকী পড়িয়াছে, ভরসা করি, তাঁহারা সত্বর তাহা প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন।

পরিষদের আজীবন সভ্যরূপে পরিষৎ ভাণ্ডারে আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এক কালীন ১০০৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, বার-এট-ল

(২) ,, ভাগবৎপ্রসন্ন সাহা শঙ্খনিধি

আমাদিগের মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় এতদ্ব্যতীতও আমাদিগকে নিয়মিত রূপে প্রতি মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেছেন। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ তাঁহার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। ফলতঃ তাঁহার মত মাতৃভাষা-সুবক্ত স্বদেশপ্রাণ বদান্য ব্যক্তির উৎসাহ ও আশ্রয় পাইয়া পরিষৎ কৃতার্থ হইয়াছে।

প্রতিভা পত্রিকা ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র। পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত ও অন্যান্য সারগর্ভ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুখের বিষয় যে পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ বি,এল ও শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বিএ, বি টি মহাশয়ের চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে প্রতিভা পত্রিকা নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিগত বৎসরে পরিষদের নিম্নলিখিত কয়েকটী অধিবেশন হইয়াছিল—

তারিখ	প্রবন্ধের নাম	লেখকের নাম
১৬ই জ্যৈষ্ঠ	বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণি (দ্বিতীয় অংশ)	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি এ, বি টি
২৭শে জ্যৈষ্ঠ	ময়নামতির গান	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম এ
২৭শে শ্রাবণ	বাঙ্গালার দৃশ্যকাব্য	,, ,, ,,
২১শে কার্ত্তিক	নাটুকে রামনারায়ণ	,, ,, ,,
২৯শে কর্ত্তিক	প্রাদেশিক সাহিত্যে শম্ভুনাথ রায় ও গোবিন্দ রায়	,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি এ, বি টি
৫ই পৌষ	সাহিত্যে স্বপ্নের প্রভাব	,, চিন্তাহরণ দে
২৬শে পৌষ	বঙ্গভাষার স্বর বা টোন্	,, দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, এম,এ
৭ই মাঘ (তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন)	স্বভাবকবি গোবিন্দদাস	কামিনীকুমার সেন এম এ, বি এল
২৮শে চৈত্র	লক্ষ্মী-চরিত্র	,, চিন্তাহরণ দে

গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর পরিষদের আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে :—

সন	মোট আয়	মোট ব্যয়
১৩২০	১২৬৬৻৯ পাই	১১৪৩।০ আনা
১৩২১	১৫৬০॥৶৩ পাই	১০৮৬৷৶৬ পাই

সুতরাং, দেখা যাইতেছে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আয় বেশী হইয়াছে, অথচ খরচ কম হইয়াছে। উত্তরোত্তর এইরূপ আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আয়ব্যয়ের হিসাব যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

পূর্ব্ব২ বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পুরাতত্ত্ব সমিতির যত্নে পুরাকীর্ত্তির অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কার্য্য চলিয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম এ, পি আর এস, মহাশয় প্রাচীন ভারত-ইতিহাস আলোচনার ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আমাদিগকে কতিপায় সুলিখিত প্রবন্ধ উপহার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বিএ. বি টি মহাশয়ও প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তাহার ফল পরিষদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র নন্দী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলীছড়া ও ভাটিয়াল গান সংগ্রহ কার্য্যে পূর্ব্ববৎ ব্যাপৃত আছেন, এবং অনেক সুললিত গ্রাম্যগান বিস্মৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

বাঙ্গালার সাহিত্য ও ইতিহাসে ময়নামতীর গানের মূল্য কিরূপ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ সংগৃহীত কতিপয় হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া তাহা প্রথমতঃ পরিষৎ পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে এবং পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই প্রণালীতে পরিষৎ সংগৃহীত মেয়েলী ছড়া ও ভাটিয়াল গান এবং কবি শ্যামদাস সেনের মীনচেতন ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে ভবিষ্যতে তাহাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

আলোচ্য বর্ষে বিশেষ কিছু পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি, হস্তলিখিত পুথি প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ সমস্ত রাখিবার জন্য উপযুক্ত স্থান আমাদের নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তদ্দারাই পরিষৎ কার্য্যালয়ের স্থান

পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানের অভাব দূরীভূত না করিয়া নূতন সংগ্রহে লিপ্ত হওয়া বিড়ম্বনা। ফলতঃ এই স্থানের অভাবই এইক্ষণ আমাদের ভাবী উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অভাব যতদিন দূরীকৃত না হইবে, ততদিন পরিষদের আশানুরূপ উন্নতি সুদূরপরাহত থাকিবে।

আলোচ্য বর্ষে, অর্থাৎ ১৩২১ সনে, কলিকাতার ধর্ম্ম সমবায়ের এক শাখা এই ঢাকা নগরীতে সংস্থাপিত হয়। উক্ত সমবায়ের প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ উকিল, এম এ, মহাশয় তাঁহাদের প্রাসাদোপম সমবায়ভবনের একাংশে পরিষৎ কার্য্যালয় স্থাপনের জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমাদিগের ৪৩নং আশক লেন স্থিত কার্য্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা নদীতীরস্থ সমবায় ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করি। যদি সমবায়ের এই শাখা এই স্থানে চিরস্থায়ী হইত তবে আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণতা জনিত কষ্ট অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘটনা ক্রমে আমাদের সে আশা ফলবতী হইল না। ১৩২১ সনের শেষ পর্য্যন্ত পরিষৎ কার্য্যালয় সমবায় ভবনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বটে, কিন্তু ১৩২১ সনে ধর্ম্ম সমবায়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমবায়ের ঢাকাস্থিত শাখা হঠাৎ উঠাইয়া নেন। সেই সময়ে ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ যে কি পর্য্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল তাহা এই কার্য্য-বিবরণীতে সবিস্তারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল প্রসঙ্গানুরোধে এই মাত্র বলাই যথেষ্ট যে পরিষদের গুরুভার প্রস্তর মূর্ত্তি ও জীর্ণ হস্তলিখিত পুঁথিগুলি পুনরায় বহুকষ্টে স্থানান্তরিত করতঃ পরিষৎ কার্য্যালয় ৪৩নং আশক লেনে পুনঃ স্থাপিত করা হয়।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে নিজস্ব স্থায়ী আবাস বাটীর অভাবে পরিষৎকে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। এই গুরুতর অভাব যে কেবল মাত্র পরিষদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে; পরন্তু ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও অনেকের মনে আশঙ্কা জন্মাইতেছে। সুতরাং এই অভাব দূরীকরণ এইক্ষণ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। এবং এই উদ্দেশ্যেই পরিষদের সুযোগ্য ও পরম হিতৈষী সভাপতি মহাশয় পরিষদের গৃহনির্ম্মাণকল্পে অর্থ-সংগ্রহের জন্য অল্প দিন হয় এক নিবেদনপত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্বয়ং এই শুভকার্য্যের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন—গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে আপাততঃ ১০০০৲ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার প্রাথমিক দানমাত্র; প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে তিনি এই দানের পরিমাণ আরও বৰ্দ্ধিত করিবেন। তাঁহার এই সদাশয়তার জন্য কিরূপে যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব তাহা জানি না। যাহা হউক, ভরসা করি, আমাদের দেশমান্য সহৃদয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বান এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একেবারে নিষ্ফল হইবে না। অল্পদিন যাবৎ এই নিবেদন-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত উহা সাধারণ্যে ভালরূপে প্রচারিত হইতে পারে নাই। অদ্য এই শুভদিনে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পূর্ব্ববঙ্গের সহৃদয় বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণের নিকট আমরা এ বিষয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হইব না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে যাঁহারা পরিষদের উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, কি আজীবন সভ্য কি পরিপোষকের পদ গ্রহণ করিয়া কি অন্য প্রকারে আমাদিগকে উৎসাহিত ও উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। প্রার্থনা করি, পরিষদের কর্ত্তব্য পালনে যেন কোনরূপ ত্রুটী না হয়। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পরিষৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরিষৎ যেন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারে। ভগবান্ আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায় হউন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

সম্পাদক

ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ

চতুর্থ বর্ষ

১৩২১

কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী, এম এ, বিদ্যাম্বুধি

সহকারী সভাপতিগণ—

রায়বাহাদুর ,, ভূপতি নাথ দাস, এম এ, বি এস সি

অধ্যাপক ,, দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বিদ্যারত্ন

,, শরৎচন্দ্র ঘোষ, বি এল

,, খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন

সম্পাদক—

,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, এম এ, বি এল,

সহকারী সম্পাদকগণ—

,, যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত

অধ্যাপক ,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম এ,

,, পরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়, এম এ,

,, উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ, বি এ, বি, টি,

,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী বি এল

প্রতিভা সম্পাদক—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, এম এ, বি এল,

প্রতিভার সহকারী সম্পাদক

,, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম এ,

ধনরক্ষক—

,, উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

হিসাব পরিদর্শক

,, শ্যামাশঙ্কর দাস গুপ্ত, বি এল,

,, কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ”

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ

মিঃ আর, কে দাস, ব্যারিষ্টার-এট-ল

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, সেন এম এ, বি এল,

,, বিভুচরণ গুহ ঠাকুরতা, বি, এল,

,, যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা বি, এল,

,, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এল,

,, যোগেশ চন্দ্র দাস

,, অমরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

,, গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, বি এ, বি টি,

,, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—ঢাকা বার লাইব্রেরী হল

তারিখ—৬ই চৈত্র রবিবার ১৩২২

সময়—পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয়

১। উদ্বোধন সঙ্গীত

২। গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ

৩। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম, এ, মহাশয়ের "পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব।"

৪। নূতন বৎসরের কর্ম্মাধ্যক্ষনিয়োগ।

৫। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব ও সভ্য নির্ব্বাচন

৬। আজীবন সদস্য নির্ব্বাচন।

৭। পরিষদের গৃহনির্ম্মাণের চাঁদা সংগ্রহাদির জন্য কমিটী স্থাপন।

৮। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

৯। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার-এট-ল,

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় (জমীদার, ধানকোরা)

" সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী (কৃষ্ণপুর)

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস এম, এ, বি, এস্ সি

" " চন্দ্রকুমার দত্ত

" " শশাঙ্কমোহন ঘোষ বি এল, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, ঢাকা

অধ্যাপক " দেবেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন এম,এ

" " বিধুভূষণ গোস্বামী এম,এ বিদ্যাম্বুধি

" " মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম,এ

" " অনুকূলচন্দ্র সরকার এম, এ পি, আর্, এস, পি, এইচ্ ডি, এফ সি এস

" " অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল

" " সুখরঞ্জন রায় এম, এ

" মিঃ এস্ সি বসু এম, এ

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ বি এল গবর্ণমেণ্ট প্লীডার (মৈমনসিংহ)

মি আর্ কে দাস বারএট্ ল

মিঃ পি, কে বসু বার-এট-ল

মিঃ আর দাস

শ্রীযুত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ,

ডাক্তার „ হরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত এম বি

" ত্রৈলোক্যনাথ বসু এম্ এ বি এল

" সুরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ (বরিশাল)

" দ্বিজেন্দ্রমোহন সেন এম্ এ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

" শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এল মুনসেফ

এবং অন্যান্য

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার্ এট্ ল মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে একটী বালিকা কর্ত্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তৎপরে পরিষদের সম্পাদক মহাশয় আলোচ্য বৎসরের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। এই বিবরণী হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে আলোচ্য বৎসরে সকল বিষয়েই পরিষদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাত্র ৩১জন সদস্য লইয়া চারি বৎসর

পূর্ব্বে ঢাকা সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু আলোচ্য বৎসরে মোট সদস্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৮৯। পরিষদের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ। কার্য্যবিবরণী অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত মহাশয় অনিবার্য্যকারণবশতঃ অনুপস্থিত থাকায়, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম,এ মহাশয় তদীয় "পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব" শীর্ষক সুলিখিত ও সুচিন্তিতপূর্ব্ব প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তদনন্তর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—

১ম প্রস্তাব—আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার এট্-ল মহাশয়কে পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ বসু এমএ বি-এল

সমর্থক— " বিধুভূষণ গোস্বামী এম এ বিদ্যাম্বুধি।

২য় প্রস্তাব। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের জন্য পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক—

(১) রায় শ্রীযুত ভূপতিনাথ দাস বাহাদুর এম, এ বি, এস্ সি
(২) রায় শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন ঘোষ বি এল বাহাদুর
(৩) শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম এ বিদ্যাম্বুধি
(৪) " দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ
(৫) " অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুত হেমচন্দ্র রায় (জমীদার)

সমর্থক—শ্রীযুত রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর।

৩য় প্রস্তাব। আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা হউক—

শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল—সম্পাদক

" অনুকূলচন্দ্র সরকার এম, এ, পি আর এস্ পি এইচ ডি, এফ সি এস
" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ
" যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত
" মন্মথনাথ মজুমদার
} সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি, এল—'প্রতিভা' সম্পাদক

" কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল—ধন-রক্ষক

" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল
" শ্যামাশঙ্কর দাসগুপ্ত বি এল
} হিসাব পরীক্ষক

প্রঃ মিঃ আর কে দাস

সঃ শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

৪র্থ প্রস্তাব। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া ১৫ জন করা হউক।

প্রঃ শ্রীবিধুভূষণ গোস্বামী এম,এ বিদ্যাম্বুধি

সঃ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এল্

৫ম প্রস্তাব। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত করা হউক,—

(১) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা বি এল
(২) " কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জমীদার)
(৩) " নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি এল
(৪) " রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল
(৫) " বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর
(৬) " ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়
(৭) " প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এমএ বি এল
(৮) " গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ, বি টি
(৯) " উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বিএ বি টি
(১০) " রমণীকান্ত দাস বার-এট ল
(১১) " প্রসন্নকুমার পাল, মোক্তার
(১২) " শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল,
(১৩) " অতুলচন্দ্র গুপ্তচৌধুরী বি এল
(১৪) " শ্রীভূপালকুমার দত্ত এম এ
(১৫) " শ্রীবিভূচরণ গুহঠাকুরতা বি এল

প্রঃ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বি এল
সঃ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার

৬ষ্ঠ প্রস্তাব। নিম্নলিখিত মহোদয়দ্বয়কে পরিষদের আজীবন সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক,—

(১) শ্রীযুত দেবকুমার রায়চৌধুরী (বরিশাল)
(২) " জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মুড়াপাড়া)

প্রঃ—সম্পাদক

সমর্থক—শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এমএ পি আর এস ইত্যাদি

(৭ম প্রস্তাব)—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া পরিষদের জন্য একটী গৃহনির্ম্মাণ সমিতি গঠিত করা হউক—প্রয়োজনানুসারে সমিতির সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বার এট ল—সভাপতি
" রজনীকান্ত গুপ্ত উকীল
" সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী (জমীদার)
" জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জমীদার)—সম্পাদক
" ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়
" হেমচন্দ্র রায় (জমীদার)
" দীনেশচন্দ্র রায় (জমীদার)
" কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জমীদার)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস রায় বাহাদুর
" অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ,
" রেবতীমোহন দাস
" যোগেশচন্দ্র দাস
রায়বাহাদুর " চন্দ্রকুমার দত্ত—ধন রক্ষক
" ভাগবৎপ্রসন্ন শঙ্খনিধি

প্রঃ শ্রীযুত ভূপতিনাথ দাস রায় বাহাদুর
সঃ " প্রিয়নাথ সেন।

প্রস্তাবক মহাশয় এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে আপাততঃ এক হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং সাধারণের নিকট হইতে আশানুরূপ চাঁদা উঠিলে, আরও দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। স্থানীয় জেনারেল পোষ্টাফিসের সুযোগ্য পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থলেই (প্রথম কিস্তি) দশ টাকা প্রদান করেন।

৮ম প্রস্তাব। অনন্তর নিম্নলিখিত পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে সম্পাদক মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন—

পুস্তকের নাম	গ্রন্থকার	উপহারদাতা
১। রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছ্বাস	শ্রীযুক্ত যামিনীকিশোর গুহ রায়	শ্রীযামিনীকিশোর গুহ রায়
২। গায়ে হলুদ	" প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম্ এ, বি, এল,	গ্রন্থকার
৩। পশু চিকিৎসা	" রঘুনাথ দাস	"
৪। ব্যথা	" বিশ্বপতি চৌধুরী	"
৫। অরণ্যবাস	" অবিনাশ চন্দ্র দাস	"
৬। ধর্ম্মপাল	" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"
৭। প্রাচীন মুদ্রা	"	"
৮। ধারা	" দেবকুমার রায় চৌধুরী	"
৯। প্রভাতী	"	"
১০। দেবদূত	"	"
১১। মাধুরী	"	"
১২। চিন্তালহরী	" নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত	"
১৩। গোধন	" গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	"
১৪। অদ্ভুত রামায়ণ	" রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীঅক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
১৫। মানব সমাজ	" শশধর রায় এম এ, বি এল	গ্রন্থকার
১৬। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী	"	"
১৭। স্বপ্নবাসবদত্তা	" গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ, বি টি,	সিটী লাইব্রেরী, ঢাকা

১৮। রত্নাবলী	শ্রীযুত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য বি এ, বি টি	সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা
১৯। বাল চরিত	"	"
২০। পঞ্চরাত্র	"	"
২১। বিক্রমোর্ব্বশী	"	"
২২। হাসি ও অশ্রু	" নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম এ,	গ্রন্থকার
২৩। বীরবিক্রম	"	"

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হন।—

নূতন সভ্যর নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১। Dr. N. Gupta Ph. D. Training Collg, Dacca	শ্রীযুত নলিনী কান্ত দাস গুপ্ত	সম্পাদক
২। শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বেদান্ততীর্থ পণ্ডিত, ট্রেণীং কলেজ, ঢাকা	ঐ	ঐ
৩। " উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম,এ অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা	শ্রীযুত অবনাশচন্দ্র মজুমদার ঐ	ঐ ঐ
৪। " নরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ১নং রামমোহন রায়ের ষ্ট্রীট, কলিকাতা	শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ সেন	ঐ
৫। " পরমেশ প্রসন্ন রায় বি, এ, Deputy Magistrtc, Asnsole	শ্রীযুক্ত অনুকুল চন্দ্র সরকার	ঐ
৬। " সতীশ চন্দ্র মজুমদার বি, এল, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা	শ্রীযুত প্রিয় গোবিন্দ দত্ত	ঐ
৭। " ভোলানাথ সাহা M Sc. ১০ সীংটোলা, ঢাকা	শ্রীযুত অনুকুল চন্দ্র সরকার	ঐ
৮। " সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস বিএ, ২০ দিগ্ বাজার ঢাকা	ঐ	ঐ
৯। " বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, অধ্যাপক, সিটিকলেজ, কলিকাতা	শ্রীযুত মন্মথনাথ মজুমদার	ঐ
১০। " কুলচন্দ্র দে ঘাটশিলা, সিংহভূম	শ্রীযুত অবনাশচন্দ্র মজুমদার	ঐ
১১। " রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ পোঃ বেতাগরি ময়মনসিংহ	ঐ	ঐ
১৩। শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ সব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা	শ্রীযুত অক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ

নূতন সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
১৪। মৌলবী সবাকাৎউল্লা ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার, ঢাকা	শ্রীযুত অক্ষয় ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	সম্পাদক
১৫। মিঃ হেমন্ত কুমার রাহা ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	ঐ	ঐ
১৬। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, বি এল, উকিল, বরিশাল	ঐ	ঐ
১৭। „ যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, উকিল নবাবপুর	শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার	সম্পাদক
১৮। „ আশুতোষ বসু গাবতলী, বৈন্তের বাজার পোঃ, ঢাকা	শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার	ঐ
১৯। „ কামাখ্যা চরণ বন্দোপাধ্যায় পোঃ গাউদিয়া, ঢাকা	শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়	ঐ
২০। „ সুরেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, ৬৬ হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল কলিকাতা	ঐ	ঐ
২১। „ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এম, এ, বি, এল, উকিল হাইকোর্ট কলিকাতা	শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার	ঐ
২২। „ গজেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি, এল, আর্ম্মাণীটোলা ঢাকা	শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী	ঐ
২৩। „ দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বি, এল, ৭ মালীটোলা, ঢাকা	ঐ	ঐ
২৪। „ অন্নদা কান্ত রায় বি, এল, তাঁতিবাজার, ঢাকা	ঐ	ঐ
২৫। „ উপেন্দ্রনাথ নিয়োগী বি, এল, ৩৭ কোর্ট হাউস রোড, ঢাকা	ঐ	ঐ
২৬। „ যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এল, ৪৪ দক্ষিণ মৈশণ্ডি, ঢাকা	ঐ	ঐ
২৭। „ সুনেন্দ্র কুমার গুহ বি, এ, ৮ কবিরাজের গলি, ঢাকা	শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র সরকার	ঐ
২৮। মিঃ আর, এন, সেন এম এ, এম এস্ সি, এফ সি এস্, অধ্যাপক; ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ শিবপুর হাবড়া	ঐ	ঐ
২৯। „ যতীন্দ্রমোহন মজুমদার ৪৫ জিন্দাবাহার ঢাকা	ঐ	

	নূতন সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
৩০।	,, ব্রজেন্দ্র লাল বসু জমীদার জিন্দাবাহার লেন ঢাকা	শ্রীযুত অমুকূলচন্দ্র সরকার	সম্পাদক
৩১।	,, সীতানাথ দে মোক্তার জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা	ঐ	ঐ
৩২।	,, রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ উকিল জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৩।	,, প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত কবিরাজ জিন্দাবাহার ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৪।	,, বরদা কুমার বসু মোক্তার জিন্দাবাহার ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৫।	,, গিরিবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, জিন্দাবাহার ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৬।	,, রাজেন্দ্র কুমার বসু জমীদার জিন্দাবাহার, ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৭।	,, নলিন মোহন মজুমদার জমীদার কুসুমহাটি পোঃ মহম্মদপুর, ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৮।	,, প্যারীমোহন মজুমদার জমীদার কুসুম হাটী পোঃ মহম্মদপুর, ঢাকা	ঐ	ঐ
৩৯।	,, যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, উকিল আলিপুর	ঐ	ঐ
৪০।	,, ধীরেন্দ্রনাথ গুহ বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট	ঐ	ঐ
৪১।	,, রেবতীমোহন মজুমদার ২নং সুবেদারের গলি, ঢাকা	ঐ	ঐ
৪২।	,, যতীন্দ্রমোহন দত্ত এম, এ, অধ্যাপক, মুরারীচাঁদ কলেজ শ্রীহট্ট	ঐ	ঐ
৪৩।	,, প্রতুলচন্দ্র সেন গুপ্ত B. Sc. Survey of India Cmp, Ten n escrim, Lower Burm	শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	ঐ
৪৪।	,, হেমচন্দ্র দত্ত বি, এল, শিলচর, কাছাড়	শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি,	ঐ
৪৫।	,, অমুকুলচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, ধুবড়ী	শ্রীযুত অমুকুলচন্দ্র সরকার	ঐ
৪৬।	মাননীয় শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দ শিলচর, কাছাড়	শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি,	ঐ

	নূতন সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
৪৭।	শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা	শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	ঐ
৪৮।	„ মুকুন্দমাধব চৌধুরী বি, এল, কুমিল্লা	ঐ	ঐ
৪৯।	„ রাজেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী School Sub Inspector বদরগঞ্জ (ফরিদপুর)	ঐ	ঐ
৫০।	„ ইন্দুভূষণ দত্ত এম, এ, হেড্ মাষ্টার, হাতীয়া হাইস্কুল, নোয়াখালী	শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার
৫১।	„ গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্ এ অধ্যাপক বহরমপুর কলেজ	শ্রীযত অনুকুলচন্দ্র সরকার	ঐ
৫২।	„ নদিয়াবিহারী দাস Deputy Inspector of Schools, গৌহাটী	শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি	ঐ
৫৩।	„ আদিনাথ সেন এম, এ, অধ্যাপক বহরমপুর কলেজ	শ্রীযুত অনুকুলচন্দ্র সরকার	ঐ
৫৪।	„ কুমারশঙ্কর রায় ৪৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিকাতা	শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, বি, টি,	সম্পাদক
৫৫।	„ মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সেটেলমেণ্ট সাব ডিপুটী রাজাবাড়ী ক্যাম্প, ঢাকা	শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	ঐ
৫৬।	„ রাধারমণ জ্যোতিষশাস্ত্রী ধামারণ পোঃ টঙ্গিবাড়ী (ঢাকা)	ঐ	ঐ
৫৭।	„ কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় উয়ারী, ঢাকা	ঐ	ঐ
৫৮।	„ তারিণীচরণ চৌধুরী এম, এ, রাজসাহী কলেজ	শ্রীযুত অনুকুলচন্দ্র সরকার	ঐ
৫৯।	„ কুঞ্জলাল মজুমদার Sub-overseer P. W. D, Sylhet	শ্রীযুত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত	ঐ
৬০।	„ গোবিন্দলাল বসাক প্রোপ্রাইটার অমরাপুর ক্যাবিনেট্ফার্ম নবাবপুর, ঢাকা	শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী	ঐ
৬১।	„ বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম, এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী	শ্রীযুত অনুকুলচন্দ্র সরকার	ঐ

১৮

আইক্ষের জলে রক্ত ভাইসা যায় ॥

যাইতে যমুনার জলে দেওয়ায় করল আন্দি,
হারাইয়া রাজপন্থ কৃষ্ণ বৈলে কান্দি।
(গ জলেরে যাইও না)।

কলসী ভরিয়া রাধে থুইল উচা পাড়ে,
কলসী ভাঙ্গিয়া গেল বিনোদ রাখালে।
(গ জলেরে যাইও না)।

খাশুড়ী ত দিব গালি, ভাই বান্ধইবা শোকী,
কিমতে ভাঙ্গিয়া আইলা সুবর্ণের কলসী।
(গ জলেরে যাইও না)।

বাড়ীর কাছে আছে আমার কুমারিয়া সইয়া,
এমন চাইয়া দিব কলসী রাধার মাজা চাইয়া।
(গ জলেরে যাইও না)।

সোনার কলসী দিব রূপার কান্দা,
কান্দার মধ্যে লেইখা দিব কলঙ্কিনী রাধা।
(গ জলেরে যাইও না)। (১৮)

১৯

শ্যামের বাঁশী রে তুমি আর বাজিও না।

সই, গ সই, উচ্চ পর্ব্বতে বসি, কৃষ্ণে বাজায় মোহনবাঁশী
বাঁশীর স্বরে হৈয়া নিল অবলার প্রাণ।

সই, গ সই, বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণে থুইল কদমডালে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী বলছে রাধা রাধা।

সই, যেই না দেশের বাঁশী ছিল, সেই দেশ করল আন্ধ
আমার দেশে আইল বাঁশী যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

সই, যেই না ঝাড়েব ছিল গ বাঁশী, ঝাড়ের লাগাল পাই,
জড়ে পরে উপাড়িয়া দরিয়ায় ভাসাই। (১৯)

২০

অ গ সই আরের লগে কও কথা॥
কেশ যে ছিড়িব, কঙ্কণ ভাঙ্গিব, পাষাণে কুটিব মাথা॥
গ সই, শ্যাম যে গিয়াছে মথুরা নগরে, রাধার আর কলঙ্ক
গেল না।
সই, গ সই, ভূমির উপরে বৃক্ষের বসতি, তার উপরে ডাল,
ডালের উপরে কংশাবি বসতি, জীবনের কত রাখি সাধ।

সই গ সই আঙ্গুল কাটিয়া, কলম বানাইয়া, নয়নের জলে
তার কালী,
কলিজা ছিড়িয়া সে লিখন লিখিয়া পাঠামু,
শ্যাম-বন্ধুর বাড়ী। (২০)

২১

সখী গ, সব না সখীর সনে মুই আইলাম জলেরে গ॥

মাইলা দেওয়ায় চালাইল বাও, দারুণ পবনের বায়
গায়ের বস্ত্র উড়াইল রে।
আমার সোনাবন্ধু দেখল সর্ব্ব গাও।
সখী অ গ না জানি রান্ধন, না জানি বাড়ন,
না জানি হলুদের বাটা,
দারুণ পাড়াপড়শী কি না নামটী রাখিল রে,
নামটী রাখল কলঙ্কিনী রাধা।

(১৮) আইক্ষের = চক্ষুর। আন্দি = অন্ধকার।
বান্ধইবা = বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন।
কুমারিয়া = কুমার, কুম্ভকার। মাজা = কোমর।
দেওয়া = মেঘ।

(১৯) লিলুয়া বাতাসে = মৃদুমন্দ বাতাসে।
দরিয়ায় = সমুদ্রে। না = নিষেধার্থক নহে।
(২০) আরের = অন্যের, শত্রুর। কুটিব = আঘাত করিব।

সখী অ গ আমি চাঁদেরে দিমু সেই ফুল বানাইয়া,
সূর্য্যেরে দিমু গলার হার,
আজ্‌কার চাঁদ সুরুয বিলম্বে উঠিস্ রে,
সোনাবন্ধু রৈয়া যাউক মন্দিরে আমার। (২১)

২২

আমার বন্ধুরে তোম্‌রা রাখ মানাইয়া গ সজনী।

কালা যায়, কানুয়া যায়, দূতী দেখ বাহির হৈয়া,
শ্রীরাধার বন্ধুয়া যায়, তোম্‌রা রাখ মানাইয়া।
(সজনী গ বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।

পর থম্‌কার যৌবন রাধে, কোটরায় সাজাইয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে দিল চন্দন পুষ্পেতে মিশাইয়া।
(সজনী গ বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।

দ্বিতীয়ার যৌবন রাধে অঞ্চলে ঢাকিয়া,
তৃতীয়ার যৌবন রাখ্‌ছি আমার বন্ধুর লাগিয়া।
(সজনী গ বন্ধুরে রাখ মানাইয়া)।

পাড়া না পড়শী রাধার প্রাণের বৈরী,
দুই চোরায় যুক্তি কৈরা ভাঙ্গিল পীরিতি।
(সজনী গ..................)।

মধুর স্বরে বাঁশী বাজে সখি অ গ শুইনা যা গ ত্বরা,
কৃষ্ণপ্রেমে দহে অঙ্গ, রাধার কি লইয়া ঘরে থাকা।
(সজনী গ........ ....)।

২৩

আমি রাধার এই হৈল ভাবনা সই গ বন্ধুয়া বন্ধুয়া বৈলে।

যমুনার জলেরে যাইতে প্রাণসখী গ (সখি অ গ)
দেওয়ায় করল আন্ধি।
হারাইয়া রাজপন্থ কৃষ্ণ বৈলা কান্দি।

তোমরা যতেক সখী (সখী অ গ) জলেরে নি গো যাইবা,
যাচিয়া যৌবনধন আমার বন্ধুরে নি গো দিবা।

যমুনার জলেরে যাইতে সখী (সখী অ গ) পন্থে পড়ল বাধা,
ভাঙ্গিল কাঙ্ক্ষের কুম্ভ, রাধার হস্তে রৈল কান্ধা।

হেন মনে লয় প্রাণসখী গ (সখী অ গ) পসার দোকান পাই,
তোলায় মাপিয়া বিষ খাইয়া মৈরা যাই।

২৪

কি বল কি বল সই গ কি বল আমারে।
আমি ঘরে না রহিতে পারি সই গ বন্ধুর বাঁশীর স্বরে।

আমি যে কলঙ্কী সই গ, লোকে মোরে দোষে,
সহইরা বাজাইরা লোকে মুখ চাইয়া হাসে।

বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী, সই গ মধ্যে ক্ষীরনদী,
উইড়া যাইবার সাধ ছিল পাখা না দেয় বিধি।

বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ী সই গ মধ্যে নলের বেড়া,
হাত বাড়াইয়া পান দিতে দেখ্‌ল কপালপোড়া।

আম ধরে ঝোপাঝোপা, তেঁতুল ধরে ব্যাকা,
দেশের বন্ধু বিদেশ গেলে আর না হবে দেখা।

ঝাকে উড়ে ঝাকে পড়ে, সই গ তারে বলে টিয়া।
মৈলে সে জিয়াইতে পারে দরশন দিয়া।

২৫

আমারে শুনাইও ঐ কৃষ্ণের নামটী গ প্রাণসখী আমার।

কি ক্ষণে জলেরে আইলাম প্রাণসখী গ (সখী অ গ)
কালা উঠে মনে,
কলসী ভাসিয়া যায় দুই নয়নের জলে।

কি ক্ষণে রান্ধনে আইলাম প্রাণসখী গ (সখী অ গ)
শুইলা বাঁশীর তান
মোর চিত্ত ভুইলা রইল শুইনা বাঁশীর গান।

(২১) না = নিষেধার্থক নহে। ৺কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় "আমার দেশ" নামক গানে "না" প্রয়োগ করিয়াছেন। মাইলা = দেশজ ভাষা, গালিবিশেষ, মরা অর্থপ্রকাশক। দেওয়া = মেঘ।

কি ক্ষণে রান্ধনে আইলাম প্রাণ সখী গ (সখী অ গ)
চাইলা দিলাম জল,
পোড়া চাউল ভাইসা উঠে, জলে না হয় তল।

কি অপরূপ দেইখা আইলাম প্রাণসখী গ (সখী অ গ)
চাঁদার উপর চাঁদা,
শুধা তনু লইয়া আইলাম ঘরে, প্রাণ রইল মোর বান্ধা।

আমি যদি মরি প্রাণসখী গ (সখী অ গ), তোম্‌রা সবে আইও
তোম্‌রা লইও কৃষ্ণের নাম মোর কানে শুনাইও।

আমি যদি মরি প্রাণসখী গ (সখী অ গ), না ভাসাইও জলে
মোরে নিয়া বাইন্ধা রাইখ তমাল গাছের ডালে।

হাত দিয়া দেখ প্রাণসখী গ (সখী অ গ), রাধার শরীর,
ধানটা দিলে খৈটা ছিটে. রাধার ফাটে যে অন্তর।

কালিয়ার চঞ্চল আখি সখী গ (সখী অ গ) যার পানে চায়,
নাগিনী দংশিলে যেমন বিষে অঙ্গ ছায়। (২৪)

২৬

তোরা বাইর হলো, বাইর হলো দূতী, কোন্ বনে লুকাইল কানাই।

দুতীর গলার কুন্দের মালা বৃন্দার গলায় দিয়ে,
যায় গো সুন্দরী রাধে মথুরা বেড়াইয়ে।
এই খানেতে দেখলাম কৃষ্ণ, এই খানেতে নাই,
ফুল বৃন্দাবনে আমি হারাইলাম কানাই।
আমি যদি মরি প্রাণে তোম্‌রা সবে আইও,
তোম্‌রা লইও কৃষ্ণের নাম মোর কানে শুনাইও।
আমি যদি মরি প্রাণে অ গ দূতী না ভাসাইও জলে,
মোরে নিয়া বাইন্ধা রাইখ তমাল গাছের ডালে।

(২৪) চাঁদার = চন্দ্রের। উপর = শ্রেষ্ঠ।

২৭

অরে বন্ধু সুজনের পীরিতি যে জন ভাঙ্গিবে, সেজন হইবে বধের ভাগী।
এই বাড়ী হ'তে বাদশার দরবারে যাইতে (অ প্রাণ-বন্ধুরে) কাওলায় কাটিল সর্ব্ব গাও,
কালুকা বিহানে সেই না জঙ্গল ছুটামু রে বন্ধু বাড়ৈর হাতে দিয়া ধারের দাও।
সকলের বন্ধুয়া আইসে ধলা ঘোড়ায় সওয়ারী (অ প্রাণবন্ধু রে)।
মুই নারীর বন্ধু আইসে ভূঁই পাও।
কালুকা বিহানে সেই না ঘোড়া কিনামু,
সোয়ামী বেচিয়া দিমু জিন্। (২৭)

২৮

যাইতে যমুনার জলে একটী চুলা দেখলাম রাজঘাটে,
ভিন্ন দেশী পরবাসী রান্ধৈ কৈরা খাইছে।
(হায় গ রসের ননদিনী)।
হাতে হাড়ি মাথে খড়ি (অ ননদিনী গ, ভিজানা কাষ্ঠ খড়িখানি,
কাঁচা চুলা রান্ধৈ করতে ঝ'রেছে সোনা আখির পানি
(হায় গ রসের ননদিনী)।
শৈল মচ্ছ, শালুয়া মূলা (অ ননদিনী গ), এক হাতে দেখছি রান্ধৈর হাড়ি,
আগুনের ছলে বন্ধু ফিরে বাড়ী বাড়ী
(হায় গ......ননদিনী)।
নারীর দেশে বাঘের ভয় (অ ননদিনী গ) একেলা পরবাসী বাইরে রয়;
ডাক দিয়া আন তারে আমার এই মন্দিরে।
(হায় গ......ননদিনী)। (২৮)

(২৭) কাওলা = একপ্রকার শণ। কালুকা = কল্য
বিহানে = প্রাতে।
বাড়ৈ = যাহারা সূত্রধরের কাজ করে, কিন্তু জাতিতে সূত্রধর নহে।
(২৮) রান্ধৈ = পাক।
শালুয়া মূলা = যে মূলা পাকিয়া গিয়া ভিতরে শক্ত হইয়া যায়।

২৯

অরে অ নাগর অবলার দেশে বরিষা রৈল্প যাওরে।

আইল বরিষা ছৈলানি বাইরে পেকচালা ভাজিয়া
আইলা নাটুয়া গাবর রে।

আইল বরিষা কদম্বের মূলে, কদম্বের রেণু খাইয়ে
ভোমরায় গুঞ্জরে রে।

আইল বরিষা থাবুর আর খুবুর করে, ঘরে রান্ধিয়া অন্ন
কৈ থাইবা বইসা রে।

বরিষা ছয় মাস না যাইও দূরে, কাটারি কাটিয়া ফেলমু
মুই নারী তোমারে রে।

মায় ত জিজ্ঞাসা করে অবলা গ ঝি, বৈদেশী নাগরের
সঙ্গে তোব সম্বন্ধ কি।

বৈদেশী না হয় মা গ মোর গলার হার, স্বদেশী কাটিয়া
দিমু বৈদেশীর পায়। (২৯)

পঞ্চগাভীর দুগ্ধ খায় (অ ননদিনী গ) কড়ার বল নাই
তোব ভাইয়ের গায়,

হেলিয়া দুলিয়া পড়ে যেমন গোড়ের সুন্ধিবেত।
(হায় গ… …ননদিনী)। (২৯)

৩০

কল্পতরু রে তোমরা নি দেইখাছ শ্যামরায়।

জবাফুলে গৌরব করে আমার সর্ব্ব অঙ্গ লাল,

আমায় নিয়া খেলা করে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল।

কচুয়ে গৌরব করে আমার লম্বা লম্বা ফুল,

আকালে পাকালে আমি রাখি জাতিকুল।

সাপলায় গৌরব করে আমি উত্তম জলে ভাসি,

সারারাত্র ভরিয়া আমি চন্দ্রের লগে হাসি।

কদম্বফুলে গৌরব করে আমার সর্ব্ব অঙ্গে রেণু,

মোরে নিয়া খেলা করে নন্দের ঘরের কানু।

চাঁদেত গৌরব করে আমি ল'য়ে উঠি তারা,

রাধিকায় গৌরব করে আমি কানুর গলের মালা।(৩০)

৩১

অরে নন্দ আর ত না যাব তোমার মাঠে।

নন্দ বে, ধেনু রাখতে যত তাপ, তাহা নাহি জান বাপ,

অরণ্য ভ্রমিতে লাগে ক্ষিধা, বাড়ী আইলে শুধা ভাত,

মিষ্ট জবান্ নাহি তাত, পরের মায় কি পরের বেদন
জানে রে নন্দ ঘোষ।

নন্দ রে ষোলশত গাভীর দড়ি,ইহারে দিয়া মার হে বাড়ী,
সোনা গায়ে চড়াইয়া দাগ রে নন্দ ঘোষ।

নন্দ রে, আম্কার ধেনু রাখ্লে পাঁচ বিয়া করাইত
মোরে,
দাসী দিত জনা চারিপাঁচ।

সোনার ছত্র মাথে দিয়ে গোধেনু চরাতাম গিরে,

অরে নন্দ দিনে দিত তিন সন্ধ্যা ভাত।

নন্দ রে যমুনা পার হৈয়া যামু, ভিন্ন দেশে মাইগা খামু,

অরে নন্দ পুত্র পুত্র বৈলে মরবি কাইন্দারে নন্দ ঘোষ।

---

(২৯) ছৈলানি = ছল্ছল করা।
পেকচালা = পঙ্কিল ক্ষেত্র।
নাটুয়া = নৃত্যকারী। গরের = জেলে।
থাবুর খুবুর = জলদিয়া হাটিবার সময় যে শব্দ হয়।
সুন্ধিবেত = একপ্রকার বেত। এই বেত সমস্তই মাটিতে
গড়াইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(৩০) আকালে পাকালে = দুর্ভিক্ষে।

৯৪৪। হান্ত ' ঘুড়ি, কপালদোষ।

৯৪৫। হাঁত্তা খ্রি, পাত্তা চুরি।
দিনে দিনে ঘর চুরি॥

৯৪৬। নদী ''ক্লেই চরা পড়ে।

৯৪৭। মারি হাতী,
লুটি ' ভাণ্ডার।

৯৪৮। কি ' লা ইন্দুরে কাট্‌ছে।

৯৪৯। মধ্যম হইলেই তিন ভাই।
এইয়াবে আর বুঝি নাই॥

এইয়্যরে—ইহা।

৯৫০। খাইয়া লইয়া পড়্‌ছে মনে।
উক্কাটা রইছে বেতাইক বনে॥

উক্কা—হুঁকা।

বেতাইক—বেতের অগ্রভাগ, বেত।

৯৫১। তর তর আছে
খাস্‌ বা'না খাস্‌,
সম্‌কে খাড়াইয়া ত নাচে॥

সম্‌কে—সম্মুখে।

৯৫২। যেমন তেমন দুই গাই।
যেমন তেমন দুই ভাই॥

৯৫৩। ন্যাকেলের ঞপাগাড়ি।

৯৫৪। যেইখানে গু, সেখানে চন্দন।
যেখানে গু নাই, সেখানে কান্দন॥

৯৫৫। এক বুড়ীর নানা দোষ।
নাকের আগে বিস্ফোট॥

৯৫৬। সুরির কুড়ি, বান্যার ছয়।
আর জাতের হয় বা না হয়॥

সুরি—শুঁড়ী।

বান্যা = বেণিয়া, বণিক।

৯৫৭। খায় মাগীর গলা বাড়ে।
বইয়া বইয়া বিরুদ করে॥

বইযা—বসিয়া।

বিরুদ—ঝগড়া, কলহ।

৯৫৮। বড়ই বিচি পাড়াইয়া।
হাতী মরে দাপাইয়া॥

৯৫৯। বয়স বাড়ে, আর দোষ বাড়ে।

৯৬০। বলদ কি বলদ,
চিনির বলদ॥

৯৬১। কপালের সিন্দুর দেখাই পিন্‌তে হয়।

পিন্‌তে—পরিধান করিতে।

৯৬২। যার হাড়িতে যার চাউল।

৯৬৩। অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর॥

৯৬৪। লম্বা নাকে গা' চুলকায়।

৯৬৫। এক বামনের দুই পুৎ।
একটা দান, একটা ভূত॥
যেইটাও ছিল ভাল।
সেইটাও উঠ্ছে সাল॥
দান—দৈত্য।

৯৬৬। তপ্ত খাওয়াইমু।
রক্ত আগাইমু॥

আগাইমু—হাগাইব।

৯৬৭। হাল কাম, কোদাল কাম,
সকল কামই হয়।
যে কাম মনে লয়,
সে কামই কর॥

৯৬৮। খাইতে যদি হয় সাধ।
হগ্‌লই হয় পস্‌সাদ॥
হগ্‌লই—সকলই।

পস্‌সাদ—প্রসাদ।

৯৬৯। জলেও ভাজ আছে,
কথায় ভাজ নাই।

ভাজ—ভেজাল।

৯৭০। সামলা মাথায় কাম্‌লা খাটা
রাজামশয়র আঙ্গুল চাটা।

৯৭১। ওঠের বলও বল।
দাতের বলও বল॥

ওঠের—ওষ্ঠের।

৯৭২। মাড়ির জোড়েই ওটের বল।

৯৭৩। পুরাণ কথা কেন।
ধর্ম্মনারায়ণ সেন॥

৯৭৪। হাজার কথা একদিকে।
আর এক কথা একদিকে॥

৯৭৫। সাবধানের মাইর নাই।

৯৭৬। সত্যের মাইর নাই।

৯৭৭। যাইতের সুম খাইতে দে।
ভুলা ভইরা কৈ মাছ দে॥

সুম—সময়।

৯৭৮। তিন শুদ্র একত্রে বনে না।

৯৭৯। একে বাধা,
দুইয়ে বিদ্ধি।
তিনে হয় কার্য্যসিদ্ধি॥

৯৮০। গেল গেল দাঁতটা,
ঠোটটা ত আছে॥

৯৮১। কিল খায়, গুতা খায়,
গালে খায় ঠোংনা।
ঘরের কোণে বইসা খায়,
শ্রীমতী বামনা॥

৯৮২। জামতা দেবতা।

৯৮৩। মন্দে আছাড় খায়।
নিমন্দে কয় ভূমিকম্প খায়।

৯৮৪। দেয়ইয়ার দিলে।
আপনা আপনিই মিলে॥

দেয়ইয়া—দাতা, যাহার দান করিবার অধিকার আছে।

৯৮৫। অনেকেই হাটে এক রাস্তায়।
কেহ ভালয় যায়,
আর কেউ বা উষ্টা খায়॥

উষ্টা—হোচট্।

৯৮৬। যার টা সে নিলে।
রাখা যায় না জোরে বলে॥

৯৮৭। খোচের জল সেই খোচেই যায়।
দুদিন কেবল চোক পাগায়॥

খোচ—নিম্ন স্থান।
চোক পাগায়—ভ্রূকুটিপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত।

৯৮৮। নায়ই যান, আর তরেই যান।
পথ আছে ঐ একখান॥

নায়—নৌকায়।
তরে—হাঁটিয়া।

৯৮৯। একে ম্যান্‌ম্যানি, দুইয়ে পাঠ।
তিনে গণ্ডগোল, চাইরে হাট॥

৯৯০। তেল বাড়্‌লেই কাম হাসিল। *

৯৯১। দোষে গুণে সৃষ্টি।
ঝড়ে বাণে বৃষ্টি॥

৯৯২। খুদ গলে না বউএর ডরে।
বেবাক খুদই উৎলাইয়া পড়ে॥

৯৯৩। ধীরে রান্ধে সুস্থে, খায়।
জুরাইলে স্যান স্বোয়াদ পায়॥

সুস্থে—সুস্থির মত॥

---

*এক বিধবার একটী মাত্র পুত্র ছিল। বড় আদরের ছেলেকে সুখের আশায় বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিল। এ বিবাহ কিন্তু বিধবার পক্ষে ভয়ঙ্কর কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বধূটীর সহিত একদণ্ডও বনিবনাত নাই। ছেলেটী উভয় সঙ্কটে পড়িয়া পরিশেষে এক বৃদ্ধের কাছে পরামর্শ চাহিল। বৃদ্ধ বলিল, "বাবা, একটা কাজ কর। বুড়ীর তেল ভাসাইতে পারিলেই তোমার কাম হাসিল হইবে। বাড়ী যাইয়া স্ত্রীকে বল, সে যেন তোমার মাকে খুব আদরযত্ন করে; কোনও কাজ করিতে না দেয়। তা'হলে বুড়ীর তেল বাড়বে, এবং তেল বাড়লেই, মরিয়া যাইবে।" ছেলে বাটী যাইয়া স্ত্রীর নিকট সব খুলিয়া বলিল। স্ত্রী শুনিয়া মহাখুসী, আপদ গেলেই হয়—তা' একটু কষ্ট হইলই বা। পরদিন হইতেই পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর যথাসাধ্য তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম ঠাট্টা মনে করিয়া বুড়ী রাগ করিল বটে, কিন্তু শেষে পুত্রবধূর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং দুইজনে মিলিয়া মিশিয়া নির্ব্বিবাদে সকল কাজ করিতে লাগিল। এরূপে কিছুদিন চলিল; ক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, শ্বাশুড়ী বৌ ছাড়া একতিল বাঁচে না; বৌরও শ্বাশুড়ী ব্যতীত একদণ্ড চলে না। যে বাড়ীতে শ্বাশুড়ী-বৌর দাপাদাপিতে এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারা অসম্ভব ছিল, সেখানে আজ কোনও গোল নাই দেখিয়া তখন বুড়ীর পুত্র একদিন স্ত্রীকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন গো, মায়ের তেল কতদূর ভাসিল? কবে তোমার আপদ শান্তি হইবে?" তদুত্তরে স্ত্রী অতি দুঃখিত ভাবে বলিল, না, গো না, অমন অলক্ষণের কথা মুখে এনো না মা আমার চিরকাল বেঁচে থাকুক, আমি যেন জন্মজন্ম অমন শ্বাশুড়ীই পাই; তেল ভাসানের আমার কাম নাই।

৯৯৪। ফল রইছে গাছে।
গাল ভাস কসে॥

৯৯৫। সাতবার খাইয়া যায় ঘরে।
তার ভাতই আগে বাড়ে॥

৯৯৬। কে নিল মোর ছালার চাউল।
কেবা করল আউল ঝাউল॥

৯৯৭। মরা আউজ খুইচ্চা খাইচ্চা।
জেতা আউজ গুইজ্জা গাইজ্জা॥

আউজ—অশৌচ।

৯৯৮। চিড়া খাইতে ব্যাপার গেল।

৯৯৯। যদি থাকে মেনা,
তবে পড়ায় তেনা।
যদি থাকে মেনী,
তবে বাঁচায় থানি॥

মেনা—গরুবিশেষ।

তেনা—ন্যাকড়া।

থানি—কিছু।

১০০০। গড়িতে কি সাউদ মরে।

গড়িতে—বিলম্বে।

সাউদ—সাধু, সৎব্যক্তি।

১০০১। [illegible]
মনও পোড়ে॥

১০০২। টাকা লাগায়ে চাইও না।
ঘর তুইলা ছাইও না॥
পূবের হাটে যাইও না॥
নিত্যি গাছের মুড়া খাইও।
তিন মাথার বুদ্ধি লইও॥

১০০৩। ছেড়ে দে মা কেন্দে বাঁচি।

১০০৪। বেকার থেকে
বেগার ভাল।

১০০৫। খড়াতি ভাই, খড়াতি ভাই,
আনারে এক্ কা লাটুম।
আরে, কই বা পাই কাঠ,
আর কইবা রইছে আল।

১০০৬। উত্তরের ঘইরা স্থানে স্থিতে।
দক্ষিণের ঘইরা মরে শীতে॥
পশ্চিমের ঘইরা খায় ভাত।
পূবের ঘইরা ফেলায় পাত॥
ঘইরা—গৃহস্বামী।

১০০৭। আম, জাম, কড়ুই।
ঘরে না লাগাইও বড়ই।
যদি লাগাও গইয়া।
ছ'মাস থাক্‌বা বইয়া।
বইয়া—বসিয়া।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।